শান্তনু বসু

পলাশির পরে

বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে



পলাশির পরে

শান্তনু বসু

পলাশির পরে







প্রথম প্রকাশ **ডিসেম্বর ২০২৩**
দ্বিতীয় মুদ্রণ **জানুয়ারি ২০২৪**

পত্রভারতী বুকস প্রাইভেট লিমিটেড, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত।

জয়ন্ত দে
অগ্রজ কথাসাহিত্যিককে

পত্রভারতী প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

বয়স্ক সাহিত্য

ফলতা থেকে পলাশি

কিশোর সাহিত্য

রুদ্র রায় ও খয়েরি পাঁঠা

কৈফিয়ত

সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বেরোনোর সময়ে খুবই জনপ্রিয় হয় ‘ফলতা থেকে পলাশি’র উত্তরাংশ বা সিক্যুয়েল ‘পলাশির পরে’। সামান্য সময়ের ব্যবধানে পরপর এই দুটি সুদীর্ঘ উপন্যাস প্রকাশ করার জন্য ওই পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হিমাংশু সিংহ, প্রাক্তন সম্পাদক জয়ন্ত দে, বর্তমান সম্পাদক তাপসী দাস ও সমগ্র সম্পাদকমণ্ডলীর আছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁরা খুবই যত্নের সঙ্গে উপন্যাস দুটিকে সুবিশাল এক পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

‘ফলতা থাকে পলাশি’-কে খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে বই আকারে উপস্থাপিত করেছে ‘পত্রভারতী’। উপন্যাসটি অগণিত পাঠকের ভালোবাসা পেয়েছে এবং এখনও পেয়ে চলেছে। ‘পলাশির পরে’ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু হওয়ার পরপরই ‘পত্রভারতী’র কর্ণধার শ্রীত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় আমাকে বলেছিলেন এই উপন্যাসটিও তাঁরা প্রকাশ করতে বিশেষ আগ্রহী। ত্রিদিবদার প্রতি ও সমগ্র পত্রভারতী পরিবারের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

আমার বন্ধুপ্রতিম কবি সমরেন্দ্র দাস এই উপন্যাসের প্রতিটি পর্বের পাণ্ডুলিপি পড়ে সুচিন্তিত মতামত দিয়ে এবং প্রুফ সংশোধন করে লেখাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

পলাশির যুদ্ধ শেষ। মুর্শিদাবাদ থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন সিরাজদ্দৌলা—এখানে শেষ হয়েছিল ‘ফলতা থেকে পলাশি’। তখন অনেক পাঠক আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘লেখাটা এভাবে শেষ করে দিলেন কেন? এর পরে কী হল?’ আমি তাঁদের আশ্বস্ত করেছিলাম এই বলে যে, ‘একটু অপেক্ষা করুন। পরের কাহিনি পৃথক উপন্যাসে আসবে।’ তবে সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকা, বিশেষ করে জয়ন্তদার তরফ থেকে তাগাদা না থাকলে ‘ফলতা থেকে পলাশি’-র সিক্যুয়েল এত দ্রুত লেখা হত কি না আমার সন্দেহ আছে।

‘পলাশির পরে’ উপন্যাসের শেষ পর্ব প্রকাশিত হওয়ার পর মুখোমুখি সাক্ষাতে, ফোনে, ফেসবুকে ফের প্রশ্নের মধ্যে পড়ি, ‘বই আকারে প্রকাশিত কবে হবে?’ পাঠকবন্ধুদের এই ভালোবাসায় আমি আপ্লুত। আজ বলতে দ্বিধা নেই, যাঁরা ‘ফলতা থেকে পলাশি’ বই আকারে পড়েছেন কিন্তু ‘পলাশির পরে’ ধারাবাহিকভাবে পড়েননি তাঁরা এবং যাঁরা ‘পলাশির পরে’ ধারাবাহিকভাবে বর্তমানে পড়েছেন তাঁরাও অনেকে এই উপন্যাসটিকে বই আকারে পাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। আশা করি, ‘ফলতা থেকে পলাশি’র মতো ‘পলাশির পরে’ও সকলের প্রত্যাশা পূরণ করবে।

১৭৫৭ সালে সিরাজদ্দৌলার মুর্শিদাবাদ থেকে পালিয়ে যাওয়া থেকে ১৭৬০ সালে রবার্ট ক্লাইভের ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত সময়কাল নিয়ে এই উপন্যাসের কাহিনির বিস্তার। উপন্যাসটি পড়ে অনেকের মনে হতে পারে, এবারেও যে শেষ হয়ে ঠিক শেষ হল না। মিরজাফর-মিরনের শেষ পরিণতি কী হল, জানা গেল না তো! মিরকাশিমের রাজত্বকালের কাহিনিই বা কোথায়? সকলকে আগাম জানিয়ে রাখি, এসবের উত্তর মিলবে এই সিরিজের তৃতীয় উপন্যাসে। আপাতত সেটি ভবিষ্যতের গর্ভে।

শান্তনু বসু

৪ নভেম্বর, ২০২৩

১

মুর্শিদাবাদ থেকে 'ভগবানগোলা। দূরত্ব খুব একটা বেশি নয়। তবু যেন অনন্ত পথ। কিছুতেই আর ফুরোতে চায় না। মনের মধ্যে সীমাহীন উৎকণ্ঠা নিয়ে সামনের দিকে চেয়ে আছেন সিরাজদ্দৌলা, পরাজিত, পলাতক নবাব। আলিশান দুই বলদের মসৃণ গায়ে ঘনঘন ছিপটির আঘাত করছে গাড়োয়ান। সে আঘাতে যেন ঝরে পড়ছে আর্তি—ছোট্ ছোট্। আরও জোরে ছোট্ বেটা। জোরসে চল্।

নিরীহ প্রাণীদুটিও যেন অনুভব করছে এই অভিযানের গুরুত্ব। এ তাদের মনিবের জিন্দেগি বনাম মওতের সওয়াল। নিরাপদে মানুষটাকে পৌঁছে দিতে হবে ভগবানগোলায়। বলদদুটির কোশিশে কোনও খামতি নেই। অবলা চারপেয়ে জীব নিমকহারামি করে না। তারা ক্রমশ গতি বাড়িয়ে চলেছে। ছাপিয়ে যেতে চাইছে নিজেদের জৈবিক সাধ্যকে। অন্ধকারের চাদর ফুঁড়ে আঁধির মতো ছুটে চলেছে সিরাজদ্দৌলার গো-গাড়ি। লোহার বেড় দেওয়া অতিকায় চারটি কাঠের চাকার একটানা গোঙানিতে রাতের স্তব্ধতা ভেঙে চৌচির।

আকাশ ঘন কালো। থেকে থেকে গুমরে উঠছে মেঘ। টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ভাঙাচোরা পথ। মাঝে মাঝে খানাখন্দে পড়ে তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে উঠছে গাড়ি। কেঁপে উঠছে থরথর করে। এই বুঝি ভেঙে চুরমার হয়ে গেল গো-গাড়ি। পণ্ড হল যাত্রা। থেকে থেকে শিউরে উঠছে লুৎফুন্নেসা—সুখে-দুঃখে, হর্ষে-বিষাদে, আফতে-আশরতে সে-ই সিরাজের একমাত্র সহচরী। শরিয়তি মতে সিরাজের সঙ্গে লুৎফার শাদি না হলেও সে-ই সিরাজের পহেলা বেগম। কোলের মধ্যে তিন বছরের উম্মেসায়েরাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে লুৎফা, গাড়ির তীব্র ঝাঁকুনিতে নবাবজাদি কোল থেকে যেন ছিটকে না পড়ে। উম্মেসায়েরা ঘুমিয়ে কাদা।

ভয়ানক অস্থির হয়ে পড়লেন সিরাজদ্দৌলা। আর কতদূর ভগবানগোলা? কতটা পথ এলেন, কোথায় এলেন, তার কোনও আন্দাজ পাচ্ছেন না পলাতক নবাব। বাইরে সূচিভেদ্য অন্ধকার। তবুও থেকে থেকেই তিনি বাইরের দিকে তাকাচ্ছেন। ভগবানগোলা বন্দর এলাকা। কাছাকাছি এসে পড়লে আলোর দেখা মিলবে। কিন্তু কোথায় আলো?

মনের অবচেতনে সিরাজ যেন শুনতে পাচ্ছেন, ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। মনে হচ্ছে পিছনে ধেয়ে আসছে একদল ঘোড়সওয়ার। প্রবল আতঙ্কে ঘাড় ঘুরিয়ে পিছন পানে চাইলেন। উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন। না—এ তাঁর মনের ভুল। পিছনে কেউ নেই। শুধু পাহাড়ের মতো পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে একরাশ কালো অন্ধকার। সেই অন্ধকারের আড়ালে পড়ে রয়েছে হিরাঝিল, চেহেল সেতুন, মোতিঝিল, মোরাদবাগ প্যালেস, চকবাজার, রাজধানী মুর্শিদাবাদ। সিরাজদ্দৌলার অতীত জীবনের যাবতীয় জলুস, রোশনাই, খুশিয়ারি। সব মিলিয়ে রংদার এক দুনিয়া।

সেই দুনিয়া সহসা বেরং হয়ে গেল ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশির প্রান্তরে কয়েক ঘণ্টার এক লড়াইয়ে। তারপরে অতলান্ত অন্ধকার।

পলাশির যুদ্ধে পরাজিত নবাব চুপিসারে পালিয়ে যাচ্ছেন মুর্শিদাবাদ থেকে।

বৃষ্টিভেজা নিঝুম রাতের বুক চিরে চলেছে গো-গাড়ি। চার চাকার একটানা কর্কশ যান্ত্রিক শব্দ যেন সিরাজের অন্তরের যন্ত্রণাকে ব্যক্ত করে চলেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলেন ভাগ্যহত নবাব। তাঁর হাতের উপরে হাত রাখে লুৎফা। প্রগাঢ় ভালোবাসার উষ্ণ স্পর্শ। বেগমের মুখের দিকে তাকালেন সিরাজ। দছমাল দিয়ে নবাবের কপালের শ্বেদবিন্দু মুছিয়ে দেয় লুৎফা। টিমটিম করে জ্বলতে থাকা চিরাগের আলোয় লুৎফার মুখটা বড় করুণ দেখায়। সিরাজের চোখ যায় ঘুমন্ত উম্মেসায়েরার দিকে। পাকিজা নিষ্পাপ মুখ। বেচারি নবাবজাদি। সিরাজের বুকটা সহসা গভীর বেদনায় মুচড়ে ওঠে। চোখের কোণ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে।

উম্মেসায়েরার নরম দেহে পরম স্নেহের সঙ্গে হাত বোলাতে থাকেন নবাব। একদৃষ্টে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। এই শিশুকন্যার দেহে বইছে তাঁর খুন। তাঁর একমাত্র শাদি করা বেগম উমাদাত উন্নেসার

গর্ভজাত উম্মেসায়েরা। এই বদকিসমতির দিনে সিরাজের সঙ্গী হতে চায়নি উমাদাত উন্নেসা। মেয়েকে সে তুলে দিয়েছে লুৎফার কোলে। নবাবের যদি নসিব ফেরে তবে নবাবজাদিরও নসিব ফিরবে। এই আশায়।

ভয়ানক আফশোস এখন সিরাজের মনে। ভুল ভুল। সবটাই তাঁর ভুল। আজকের এই গরদিশের জন্য তো তিনিই দায়ী। তাঁর ভাগ্য আজ অন্যরকম হতে পারত। ভাগীরথীর জলে তিনি ডুবিয়ে মারতে পারতেন ইংরেজদের। সব বরবাদ হয়ে গেল তাঁর নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য। কেন শেষ বিকেলে অচানক থামিয়ে দিলেন লড়াই? কেন শুনলেন না মোহনলালের কথা? কেন মোহনলালের উপর ভরসা না করে ভরসা রাখলেন মিরজাফরের জবানে। এতেই তো শেষ হয়ে গেল সব। প্রায় জিতে যাওয়া লড়াইকে তিনি ফেলে এলেন পলাশির প্রান্তরে। আর কৌশলে বাজিমাত করল ইংরেজরা।

তবুও হতাশার গহীন আঁধারে আলোর তলাশ করেন সিরাজদ্দৌলা। স্বপ্ন ভেসে বেড়ায় দু'চোখে। ফের তিনি লড়াই করবেন। নসিবের চাকা ঘোরাবেন। নবাব-বাদশাদের জীবনে নসিব তো ঘনঘন ঘর বদলায়। হিন্দুস্থানের ইতিহাসে এর নমুনা বড় একটা কম নেই। তখতে-তাউস হারিয়েও ফের নিজের তাগদে প্রবল ভাবে ফিরে এসেছিলেন হুমায়ূন বাদশা। আরজুমান্দ বেগম ও মাসুম বাচ্চাদের নিয়ে দিনের পর দিন বাগি জীবন কাটিয়ে, শাহি ফৌজের সঙ্গে লড়ে নিজের তাগদে তখতে বসেছিলেন শাজাহান। তিনি কি পারবেন না ফের সুবে বাংলার মসনদ দখল করতে?

মরীচিকা আশা ঘুরে বেড়ায় বুকে। পাটনার নায়েব রামনারায়ণ তাঁর একান্ত অনুগত। পাটনা গিয়ে রামনারায়ণের মদতে তিনি ফের এক জবরদস্ত ফৌজ গড়ে তুলবেন। তাছাড়া আছেন জাঁ ল। ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই বাঁধতে চলেছে একথা জানিয়ে ফৌজসহ তুরন্ত মুর্শিদাবাদে এসে পৌঁছনোর জন্য পলাশির যুদ্ধের ঠিক আগে তিনি চিঠি লিখেছিলেন ল-সাহেবকে। তিনি হয়তো অনেকটাই এগিয়ে এসেছেন। হয়তো পথেই মোলাকাত হয়ে যাবে ফরাসি বাহিনীর সঙ্গে। তারপর তিনি নিরাপদ, নিশ্চিন্ত। ভাবতে থাকেন সিরাজ। তাঁর নাগাল পাবে না মিরজাফর। কয়েক মাসের মধ্যেই বড়সড় ফৌজ নিয়ে তুফান হয়ে মুর্শিদাবাদের উপর আছড়ে পড়বেন সিরাজদ্দৌলা। ঘামাসান লড়াই করে ফের দখল করবেন বাংলার মসনদ, হিরাঝিল, চেহেল সেতুন, মোতিঝিল, মোরাদবাগ প্যালেস। তারপর ইংরেজদের দরিয়ার পানিতে ডুবিয়ে মারবেন। রেয়াত করবেন না বেইমানদের। রংদার খোয়াবে চোখদুটো চকচক করে ওঠে।

তবে এই চিন্তার সূত্র ছিন্ন হয়ে যায় অচিরেই। দূরে বিন্দু বিন্দু আলো চোখের পর্দায় ভেসে উঠতেই সচকিত হয়ে ওঠেন সিরাজদ্দৌলা। এ আলো ভগবানগোলা বন্দরের প্রাকারের উপরে জ্বলতে থাকা মশালের। কোনও ভুল নেই।

একদিকে ভাগীরথী আরেকদিকে জলঙ্গি। এই দুই নদী ছাড়া ভগবানগোলা বন্দর পরিখা ও কাঠের মজবুত প্রাকার দিয়ে ঘেরা। বন্দর এলাকায় প্রবেশের মুখে রয়েছে মস্ত দরওয়াজা। এই বন্দর পাহারা দেয় নবাবের নৌসেনা। জাহাজঘাটায় নোঙর ফেলে থাকে নবাবের নওয়ারা। এই বন্দরকে কেন্দ্র করে রেশম, নীল, শস্যের ব্যবসা জমজমাট। এর জলুসের কাছে কাশিমবাজার ম্লান হয়ে যায়। শুধু শস্য রপ্তানি থেকেই ভগবানগোলা বন্দরের আয় হয় বছরে তিন লাখ টাকা।

বন্দরে প্রবেশের মুখে জায়গায় জায়গায় মজুত সশস্ত্র ঘোড়সওয়ার বাহিনী। এ বাহিনী সিরাজদ্দৌলার একান্ত অনুগত। সিরাজের গো-গাড়ি পরিখার কাছে পৌঁছতেই সশব্দে নেমে এল কাঠের পাটাতন। সেতু পেরিয়ে বন্দরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন সিরাজদ্দৌলা। ঘাটে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে নৌকো। হুঁশিয়ার হয়ে রয়েছে মাঝিমাল্লারা।

পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয় হয়েছে। ভগবানগোলা বন্দর থেকে রাজমহলের দিকে পালিয়ে যাবেন বেইজ্জত নবাব– আগেই নওয়ারার দারোগা আবদুল করিমের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দিয়েছে নিজামতের এক বিশ্বস্ত কাসিদ । এ খবর গোপন রেখেছে আবদুল। আজ রাতে খুব বিশ্বস্ত কিছু

সেপাই ছাড়া বাকি সবাইকে তিনি কাজ থেকে ছুটি দিয়েছেন। ভগবানগোলা বন্দর থেকে নবাবের পলায়নের খবর বড় একটা যেন জানাজানি না হয়।

আলিবর্দির আমলের শেষ দিকে সিরাজদ্দৌলার সুপারিশে নিজামতের নোকরিতে আবদুলের যোগদান। সিরাজের প্রতি তার আনুগত্য অকৃত্রিম। গো-গাড়ি থেকে নামতেই নবাবের সামনে এসে কুর্নিশ জানায় আবদুল। গভীর কৃতজ্ঞতায় আবদুলের হাতদুটো চেপে ধরেন নবাব।

'তোমাকে ইয়াদ রাখব আবদুল।' চোখ থেকে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

আবদুলের চোখদুটোও জ্বালা করে ওঠে। সে বলে, 'এ তো আমার খুশনসিব।'

লুৎফা ও উম্মেসায়েরাকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত নৌকোয় চেপে বসলেন নবাব। সঙ্গে লটবহর অত্যন্ত কম। সাড়ম্বরে যাওয়ার উপায় নেই। লোকের নজরে পড়বে। পথের কড়ি বলতে সঙ্গে রয়েছে লুৎফার একটা বাক্স। জহরতে ঠাসা। এছাড়াও হিরে, মণি, মুক্তোখচিত অনেক বহুমূল্য গয়না বোরখার অভ্যন্তরে দেহের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে লুৎফা। যতটা নেওয়া যায়। এছাড়া নৌকোয় রয়েছে সামান্য রসদ।

নৌকোর কাছি খুলে দিল মাঝিরা। ভাগ্যের খোঁজে পাটনার উদ্দেশে ভেসে পড়লেন পরাজিত নবাব। চারজন মাল্লা প্রাণপণে দাঁড় টানতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই নবাবের নৌকো নদীর বুকে জমাট বাঁধা অন্ধকারে হারিয়ে গেল। নৌকোর গলুইয়ের উপর দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তটভূমির দিকে চেয়ে রইলেন সিরাজদ্দৌলা। বন্দরের আলো ক্রমশ ক্ষীণ হতে হতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সিরাজদ্দৌলার নৌকো চোখের পর্দা থেকে অদৃশ্য হতেই একটা তাগড়াই ঘোড়ার পিঠে চেপে অন্ধকারের মধ্যে অজানা ভবিষ্যতের উদ্দেশে রওনা হল আবদুলও। পরাজিত নবাবকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে সে। একথা হয়তো গোপন থাকবে না। গর্দান যাবে। বাদশাহি সড়ক হয়ে আবদুল ছুটে চলল বর্ধমানের দিকে। ঘুর পথে পাটনায় গিয়ে সে ফের মিলিত হতে চায় সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে।

বৃষ্টির বেগ বেড়েছে। নৌকোর সমুখে জ্বলতে থাকা মশালটা বাতাস ও বারিশের সঙ্গে লড়াই করে কোনওরকমে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। হুঁশ নেই সিরাজদ্দৌলার। গলুইয়ের উপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছেন।

একজন মাল্লা এসে কুরনিশ করে বলে, 'অন্দরে আসুন হজরত।'

শূন্য দৃষ্টিতে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে সিরাজদ্দৌলা বললেন, 'চলো।'

তাঁবুর চিলমন পর্দার ফাঁক দিয়ে ভোরের আলো এসে পড়েছে বিছানায়। চোখ মেললেন রবার্ট ক্লাইভ। পরম নিশ্চিন্তে বেহুঁশের মতো ঘুমিয়েছেন গতকাল রাতে। তবুও সারা দেহে ক্লান্তি। সেই যে গেল ডিসেম্বরে পা রেখেছিলেন ফলতায় তারপর থেকে আর ফুরসত মেলেনি। শুধু লড়াই। একটার পর একটা কঠিন বাজি জিতে ওঠা। এবার হয়তো কিছুদিন বিশ্রাম মিলবে।

মাথার কাছে চৌপাইয়ের উপর গরম কফি রেখে গিয়েছে আরদালি। বিছানায় উঠে বসে কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে চুমুক দিলেন ক্লাইভ। বাইরে থেকে ভেসে আসছে সৈন্যদের প্রাত্যহিক সকালের কুচকাওয়াজের শব্দ। পলাশি থেকে মুর্শিদাবাদের দিকে খানিক দূর এগিয়ে এসে গতকাল রাতে দাউদপুরে তাঁবু ফেলেছে ইংরেজবাহিনী।

বিছানা থেকে উঠে এসে তাঁবুর জানলার পর্দা সরিয়ে কর্নেল ক্লাইভ বাইরের দিকে তাকালেন। মেজর কিলপ্যাট্রিক ও আয়ারকুটের নেতৃত্বে প্যারেড করছে সৈন্যরা। দৃশ্যটা দেখে ভালো লাগল কর্নেলের। ডিসিপ্লিন। লড়াইয়ের ময়দানে ফৌজের ডিসিপ্লিনই শেষ কথা। সামান্য লোক নিয়ে গড়া একটা ডিসিপ্লিনড বাহিনী, বিরাট আকারের এক ডিসঅরগানাইজড বাহিনীর থেকে অনেক বেশি কার্যকর, এদেশে লড়াই

করতে গিয়ে বারে বারে এ কথা প্রমাণ করেছেন কর্নেল। তাই লড়াই জেতা মানে আবেগে ভেসে যাওয়া নয়। ফূর্তিতে গা ভাসানো নয়। সবসময় প্রস্তুত রাখো নিজেকে।

কিন্তু শুধুই কি ডিসিপ্লিন? অবশ্যই এর সঙ্গে রয়েছে কর্নেলের দুর্জয় সাহস আর ব্লেসিংস অফ দ্য গডেস অফ ফরচুন। ভাগ্যদেবী বরাবরই দুহাত ভরে আশীর্বাদ করেছেন দুঃসাহসী ক্লাইভকে। ভাগ্যদেবীর হাতের ছোঁয়াতেই তো তিনি আজ ব্যারন অফ প্ল্যাসি।

ক্লাইভের মনে পড়ে যায় গতকাল বিকেলের কথা। মোহনলালের বাহিনীর আক্রমণে ইংরেজরা তখন দিশেহারা। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন ক্লাইভ। কিন্তু পালাবেন কোথায়? দ্রুত নদী পেরিয়ে কাটোয়ায় ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। পিছু হটে আশ্রয় নেওয়ার জায়গাও নেই। যে ঝাঁঝের সঙ্গে আক্রমণ শানাচ্ছিলেন মোহনলাল আর মাত্র আধঘণ্টাখানেকের বেশি সেই হামলা ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা ছিল না ইংরেজদের। মিরজাফরের উপর রাগে ফুঁসছিলেন ক্লাইভ। এই কঠিন সময়ে কেন তিনি তার ফৌজ নিয়ে ইংরেজদের মদত দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসছেন না? মূর্খ মিরজাফর কি বুঝতে পারছেন না যে, ইংরেজরা মরলে তিনিও মরবেন!

তবুও আশা ছাড়েননি ক্লাইভ। তাঁর বিশ্বাস ছিল ভাগ্যদেবী ঠিক মুখ তুলে চাইবেন। মিরাকেল ঘটবেই। সত্যিই ঘটল। ওই অবস্থায় হঠাৎ কেন যে যুদ্ধ থামিয়ে দিলেন মোহনলাল, সেটা বুঝে উঠতে পারেননি ক্লাইভ। তবে যাই হোক স্বস্তি মিলল। গলায় ঝুলতে থাকা ক্রসটা ঠোঁটে ছুঁইয়ে চুম্বন করেছিলেন ক্লাইভ। পরিকল্পনা করেছিলেন গভীর রাতে অতর্কিতে নবাবের ক্যাম্পের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। যে কায়দায় বাজিমাত করেছিলেন কলকাতায়, হালসিবাগানের লড়াইয়ে। কিন্তু শেষ বিকেলের মরা আলোয় সুকৌশলে পিছন থেকে মোহনলালের বাহিনীকে আক্রমণ করে লড়াইটা তখনই শেষ করে দিলেন কিলপ্যাট্রিক। প্রায় জিতে যাওয়া লড়াই ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়ে উটের পিঠে চেপে পালিয়ে গেলেন নবাব। কয়েক ঘণ্টাতেই শেষ হয়ে গেল পলাশির যুদ্ধ।

পলাশির প্রান্তরে সাফল্য এলেও কর্নেল ক্লাইভ কিন্তু সতর্ক। এখনও মিরজাফরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি। ইয়ারলতিফ, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, মিরজাফরের মনের মধ্যে কী আছে কে জানে? তা ছাড়া ইংরেজদের হাতে নবাবের পরাজয়টা কী ভাবে দেখছে মুর্শিদাবাদের মানুষ, সেও এক ভাবনার বিষয়। তাই বাহিনী যেন সদা প্রস্তুত থাকে, ডিসিপ্লিনড থাকে এ নিয়ে কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন ক্লাইভ। মেজর কিলপ্যাট্রিক ও আয়ারকুট যে সে কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছেন তা দেখে কর্নেল খুশি হলেন।

তাঁবু লাগোয়া টয়লেটে ঢুকে ফ্রেশ হয়ে নব মুনশিকে তলব করলেন ক্লাইভ।

খানিকবাদে নবকৃষ্ণ এসে সেলাম ঠুকে বললেন, ‘গুড মর্নিং স্যার।’

‘গুড মর্নিং মুনশি। যা বলেছিলাম করেছ?’

‘বিলক্ষণ হুজুর। আশেপাশের গাঁ থেকে এই তো ঘুরে এলাম।’

‘কী বুঝলে?’

‘লোকে কেমন যেন থম মেরে গেছে।’

‘আর দে অ্যাংরি উইথ আস?’

‘বিষয়টা তা নয় হুজুর।’

‘তবে?’

‘লড়াই তো এদেশের লোকে আগেও ঢের দেখেছে। যারা জেতে তারা লুঠতরাজ করে, বাড়িতে আগুন দেয়। মানুষ খুন করে। জেনানাদের বলাৎকার করে। ইংরেজ ফৌজ পলাশিতে লড়াই জিতে নিল, অথচ এসবের কিছুই ঘটল না। আশেপাশের গাঁয়ের লোকে বড় তাজ্জব বনে গেছে। তাই ইংরেজবাহিনী সম্বন্ধে আমলোগের বেশ ভালোই ধারণা হয়েছে।’

পাইপ মুখে দিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে ক্লাইভ বললেন, 'ভেরি গুড।'

হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে ক্লাইভের তাঁবুতে প্রবেশ করলেন ওয়ারেন হেস্টিংস।

'হোয়াট হ্যাপেনড ওয়ারেন?' কৌতূহলী গলায় প্রশ্ন করলেন ক্লাইভ।

'মিরজাফর ইজ অ্যাপ্রোচিং আওয়ার ক্যাম্প উইথ অ্যা স্মল কন্টিনজেন্ট।'

দুদণ্ড কী যেন ভাবলেন কর্নেল। তারপর বললেন, 'প্লিজ অ্যারেঞ্জ অ্যা বিফিটিং রিসেপশন।'

দ্রুতগতিতে বিদায় নিলেন হেস্টিংস।

তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ালেন কর্নেল। দূরবীনে চোখ রেখে দেখলেন ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে আসছে একটা ছোটখাটো ফৌজ। হাতি, ঘোড়া, বন্দুকচি, ধানুকি সবই আছে সেই দলে। এদের কী মতিগতি কে জানে। গোলন্দাজদের প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিলেন ক্লাইভ।

একই সঙ্গে ক্লাইভের নির্দেশে নতুন নবাবকে বিলিতি কায়দায় স্বাগত জানানোর জন্য একদল বেয়নেটধারী গোরাপল্টনকে সার বেঁধে দাঁড় করানোর কাজে লেগে গেলেন আয়ারকুট ও হেস্টিংস।

আগুয়ান ফৌজের ঠিক মাঝখানে হাতির পিঠে হাওদায় বসে রয়েছেন মিরজাফর। ক্লাইভের চোখ দূরবীনে। মিরজাফরের বাহিনী আর একটু সামনে এগোতেই স্যালুট জানানোর কায়দায় বন্দুক উঁচিয়ে ধরল গোরা পল্টনেরা। ঘাবড়ে গিয়ে মিরজাফরের হাতিকে দাঁড় করিয়ে দিল মাহুত। সামনে উদ্যত বেয়নেট দেখে মিরজাফরের শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল রক্তস্রোত বইতে লাগল। স্যালুট জানানোর বিলিতি কায়দা জানা নেই মিরজাফরের। তিনি ভাবলেন গোরাপল্টনরা হয়তো তাঁর দিকে গোলাগুলি চালিয়ে বসবে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে মিরজাফরের সঙ্গের ফৌজিরাও। এখন কী করা উচিত তারা বুঝে উঠতে পারছে না।

গোলমালটা কোথায় অনুভব করলেন ক্লাইভ। নিজেই ছুটে এলেন সামনে।

নিরস্ত্র অবস্থায় হাসিমুখে কর্নেলকে ছুটে আসতে দেখে ভরসা পেলেন মিরজাফর। হাতির পিঠ থেকে নেমে এলেন। মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানিয়ে উষ্ণ কণ্ঠে কর্নেল বললেন, 'ওয়েলকাম! ওয়েলকাম নবাব। ওয়েলকাম টু আওয়ার ক্যাম্প।'

সার বেধে দাঁড়ানো গোরা পল্টনরা এক সঙ্গে দেহ ও মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল। ক্লাইভের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল মিরজাফরের মন। শুধু এই বাহাদুর মানুষটার জন্য তিনি আজ সুবে বাংলার মসনদে বসতে চলেছেন। কর্নেল ক্লাইভ ছাড়া তার একান্ত আপনজন ও শুভানুধ্যায়ী আর কে আছে? মাথা নুইয়ে ক্লাইভকেও সম্মান জানালেন মিরজাফর।

ফৌজি ব্যান্ডের তালে তালে পা মিলিয়ে মিরজাফরের হাত ধরে তাঁকে নিজের তাঁবুতে নিয়ে গেলেন ক্লাইভ। খাতির করে মিরজাফরকে কুরসিতে বসালেন। নিজে বসলেন তাঁর মুখোমুখি।

মিরজাফর বললেন, 'ইনকিলাবে কামেয়াবির জন্য আপনাকে বহুত বহুত সুক্রিয়া।'

এই সব শুকনো তোষামোদে ক্লাইভের মন ভরে না। তিনি কাজের লোক। সরাসরি কাজের কথায় চলে এলেন ক্লাইভ। শুধোলেন, 'সিরাজদ্দৌলা এখন কোথায়?'

জবাবে মিরজাফর বললেন, 'কাসিদরা খবর এনেছে, তিনি মুর্শিদাবাদ ছেড়ে চলে গিয়েছেন।'

ক্লাইভের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। 'পালিয়ে গিয়েছেন? কোথায়? কোনদিকে?'

'রাজমহলের দিকে।'

'রাজমহল? আমার আন্দাজ তিনি পাটনায় যেতে চান।'

খুশি ঝরানো গলায় মিরজাফর বললেন, 'সহি আন্দাজ। সিরাজের সঙ্গে রয়েছেন লুৎফা বেগম ও লেড়কি উম্মেসায়েরা।'

চিত্রটা ক্লাইভের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল। পাটনার নায়েব রামনারায়ণ সিরাজের অনুগত। এছাড়া পাটনায় রয়েছে ফরাসি জেনারেল জাঁ ল। যদি সিরাজদ্দৌলা এঁদের কাছে আশ্রয় নেন তাহলে সমূহ বিপদ। পরাজিত

নবাবকে গ্রেফতার করা মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। শুধু তাই নয়, ফৌজ গড়ে তুলে প্রত্যাঘাত করতে পারেন সিরাজ।

ক্লাইভ ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন, 'আপনি এখনই সিরাজদ্দৌলাকে পাকড়াও করার জন্য ফৌজ পাঠান। পাটনায় পৌঁছনোর আগেই তাকে গ্রেফতার করতে হবে।'

মিরজাফর হাসিমুখে বললেন, 'আপনি বেকার পরেসান হচ্ছেন কর্নেল। সিরাজ এখন ঢোঁড়া সাপ। আর কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।'

ক্লাইভ এবারে মিরজাফরকে প্রায় এক ধমক লাগিয়ে বললেন, 'আপনি এভাবে চুপ করে বসে থাকবেন না নবাব। যা বলছি তাই করুন। সিরাজদ্দৌলাকে গ্রেফতার করা চাইই। জিন্দা।'

ক্লাইভের মেজাজ দেখে মিইয়ে গেলেন মিরজাফর। তখনই বড় একটা ফৌজসহ সিরাজকে ধাওয়া করার জন্য জামাই মিরকাশিমকে ডেকে হুকুম করলেন।

ক্লাইভ বললেন, 'আউর এক বাত। নবাবের তোশাখানায় পাহারা বসান। কেউ যেন সেখান থেকে কিছু সরাতে না পারে।'

'ও কাম আমি আগেই পাকা করেছি কর্নেল সাহেব। পাহারা বসিয়েছি। তোশাখানার হুড়কো খোলা হবে আপনি মুর্শিদাবাদে হাজির হওয়ার পর। আপনার সামনে।'

ক্লাইভ মুচকি হেসে বললেন, 'সো কাইন্ড অফ ইউ। আপনি এবারে মুর্শিদাবাদে গিয়ে দ্রুত মসনদের দখল নিন।'

'আমি এখনই মুর্শিদাবাদ রওনা হব।' বললেন মিরজাফর।

'ভেরি গুড।'

'তবে আপনি মুর্শিদাবাদে হাজির না হলে আমি মসনদে বসব না। আমি কি আপনাকে বাদ দিয়ে খুশি মানাতে পারি?'

প্রবল আনুগত্য চুইয়ে পড়ল মিরজাফরের গলায়।

ক্লাইভ হেসে উঠে বললেন, 'ইউ আর রিয়েলি ভেরি সুইট।'

২

পলাশির প্রান্তরে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয় হয়েছে। জয় হয়েছে ইংরেজদের। সিরাজদ্দৌলা পলাতক। এ খবর ছড়িয়ে পড়েছে মুর্শিদাবাদের সর্বত্র। উত্তেজনায় কাঁপছে সুবে বাংলার রাজধানী। নিজামত কেল্লা লাগোয়া চকবাজার সুনসান। দোকানপাট বন্ধ। পথঘাট ফাঁকা।

নবাব বদলের আঁচে ঝলসে যাওয়ার আতঙ্কে আম-আতরফ মানুষের কেউ কেউ রাজধানী ছেড়ে পালিয়েছে। যারা পালিয়েছে তারা বেঁচেছে। যারা শহরেই রয়ে গিয়েছে, তারা দরজার আগল তুলে গৃহবন্দি করে রেখেছে নিজেদের। তবুও রেহাই নেই। দরওয়াজা উপড়ে ঘরে ঘরে ঢুকে তাণ্ডব চালাচ্ছে লুঠেরার দল।

সিরাজদ্দৌলার অনুগত—এই অজুহাতে বহু মানুষকে ঘর থেকে টেনে বের করে খুন করা হচ্ছে প্রকাশ্য রাস্তায়। জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাদের ঘরবাড়ি। এমনই হুকুম দিয়েছেন নতুন নয়া নবাবজাদা মিরন। সেই হুকুম অক্ষরে অক্ষরে তামিল করতে উঠে পড়ে লেগেছে চুনিলাল ও মুন্নিলাল–মিরনের দুই জঘন্য সহচর। খন্নাসিতে এদের জুড়ি মেলা ভার।

কোনও কোনও হাভেলির অন্দরমহল থেকে ভেসে আসছে নারীকণ্ঠের করুণ আর্তনাদ। জেনানাদের ইজ্জত লুঠছে শয়তানেরা। কোনও খুবসুরত লেড়কি বা আওরত নজরে পড়লে তাদের জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে চালান করছে জাফরাগঞ্জ প্যালেসে। মিরনের হারেমের জলুস বাড়ছে রোজই। কোন কিসিমের জেনানা নতুন নবাবজাদার মনে রং ধরাবে তা চুনিলাল ও মুন্নিলাল হারগিজ জানে। প্রায় রোজই তারা নতুন নতুন মেয়েমানুষ লুঠ করে হাজির করছে মিরনের সামনে। নবাবজাদার চোখে কদরদারির ভাষা দেখে তারা আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়ে। মিরজাফরের বয়স হয়েছে। তিনি মসনদে বসলেও আগামী দিনে মিরনই হবেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ইজফা, খেলাত, খেতাব, আবদার মঞ্জুর-নামঞ্জুরের মালিক। একথা চুনিলাল ও মুন্নিলাল বোঝে। তাই জুতসই তোফার আশায় বাড়াবাড়ি রকমের আনুগত্য দেখাতে তারা মরিয়া।

এদের ভয়ে মুখ লুকিয়েছে কোতোয়াল। নগর সুরক্ষার দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে কোতোয়ালির সেপাইরা। চুনিলাল ও মুন্নিলাল মিরনের জিগরি দোস্ত, কাজেই এদের বাধা দেওয়ার মুরোদ সেপাই-কোতোয়ালের নেই।

গোটা রাজধানী শহরজুড়ে ঘোর অরাজকতা। নিরীহ মানুষের রক্তে ভাসছে রাজপথ। পথের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে লাশ। আগুনে জ্বলতে থাকা চকবাজারের দোকানপাট থেকে উড়ছে কালো ধোঁয়া। নিজামত কেল্লার ঝরোকায় দাঁড়িয়ে এই ধ্বংসলীলা দেখছিলেন শরফ উন্নেসা—আলিবর্দির বেগম, সিরাজের নানি বেগম। ঝরোকায় দাঁড়ালে শহরটা অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। শরফ উন্নেসা দেখছেন জায়গায় জায়গায় দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন। খেয়ালি বাতাসে মানুষের কপাল পোড়ানো আগুনের ধোঁয়া হামলা চালাচ্ছে চেহেল সেতুনের অন্দরে।

ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করছে শরফ উন্নেসার। পোড়া ইট, কাঠ, কাপড়ের গন্ধে নানিবেগমের দম বন্ধ হয়ে আসছে। কী আলিবর্দির সময়ে, কী সিরাজের সময়ে নিজামতের শাসন সংক্রান্ত অনেক বিষয়েই শরফ উন্নেসার মতামতই ছিল শেষ কথা। একদা দোর্দণ্ডপ্রতাপ সিরাজের নানি বেগম আজ চেতনাহীন কাঠের পুতুলের মতোই স্থবির। লবেজান, মাজুর এক জেনানা।

চেহেল সেতুনের চারপাশে জমায়েত হয়েছে মিরজাফরের সেনারা। আলিবর্দির খানদানের বরবাদির বার্তা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তাদের হর্ষে-উল্লাসে, কাড়ানাকাড়ার শব্দে। এভাবেই একদা বরবাদ হয়ে গিয়েছিল মুর্শিদকুলির খানদান। সেদিন আলিবর্দির কুদরতি আতশবাজির রোশনির মতো ঝরে পড়েছিল। গিরিয়ার ময়দান থেকে সরফরাজ খাঁর নিথর দেহ নিয়ে শাহি হাতি ফিরে এসেছিল এই চেহেল সেতুনে।

বহুত পুরোনো কিসসা তো নয়। সেদিন এই মুর্শিদাবাদ নগরী, আঁধারে নিমজ্জিত আজকের এই চেহেল সেতুন বেহেস্ত হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিল নানি বেগমের চোখে। আজ সেই প্রাসাদ যেন তাঁর কাছে এক দোজখ। শরফ উন্নেসার ইচ্ছে করছে সিরাজের মতোই পালিয়ে যেতে। দূরে কোথাও। কিন্তু সে উপায় নেই। পলাশির যুদ্ধের হকিকত মুর্শিদাবাদে এসে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে মিরজাফরের সেনারা এসে জড়ো হয়েছে চেহেল সেতুনের সদর দরওয়াজায়। নানি বেগম গৃহবন্দি। এর পরে নসিবে কী আছে জানা নেই। শরফ উন্নেসার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। গলা বুজে আসে কান্নায়।

বিকেলের আলো মরে এসেছে। বড় বড় থামগুলোর লম্বা ছায়া পড়েছে অলিন্দে। অন্দরমহলে আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। এই সময় কাজে লেগে যায় বাতিকরের দল। আলোয় আলোয় ছয়লাপ হয়ে ওঠে গোটা প্রাসাদ। আজ কাজে ঢিল দিয়েছে বাতিকরেরা। কাজ ফেলে সহবতের তোয়াক্কা না করে জায়গায় জায়গায় জড়ো হয়ে গুলতানি করছে গোলাম, বান্দা, বাঁদিরা। বদলে গিয়েছে তাদের চোখের ও দেহের ভাষা। নানি বেগমকে আর ঘন ঘন তসলিম, কুর্নিশ জানাচ্ছে না কেউ। এদের চোখে নানি বেগম এখন যেন আজনবী এক জেনানা। বিনা অধিকারে তিনি যেন বিলাসবহুল মহলখানা এখনও দখল করে আছেন। যার সামান্য

অনুগ্রহের জন্য গোলাম-বাঁদিরা এতকাল মুখিয়ে থেকেছে, সেই শরফ উন্নেসাই যেন তাদের কাছে এখন অনুগ্রহ, উপহাসের পাত্র।

নানি বেগমের হুকুম তুরন্ত তামিল করতে কেউ আর ব্যস্ত নয়। শরফ উন্নেসার নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসে। বুকের কাছে কেমন যেন একটা চাপ অনুভূত হয়। এই পাষাণপুরী থেকে থেকে পালিয়ে যেতে পারলে তিনি যেন সব অবসাদ থেকে নিস্তার পেতেন। কিন্তু মিরজাফরের হুকুম ছাড়া আপাতত কোথাও নড়ার উপায় নেই। অলিন্দ দিয়ে স্খলিত পদক্ষেপে হেঁটে এসে নিজের মহলে প্রবেশ করেন নানি বেগম।

'আম্মিজান।'

ছোটি বেটি আমিনা বেগমের গলা শুনে ঘুরে তাকান শরফ উন্নেসা।

আমিনা বেগমের চোখেমুখে ঘোর আতঙ্কের ছাপ। বাইরে থেকে ভেসে আসছে চেহেল সেতুন ঘিরে ফেলা মিরজাফরের ফৌজের সেপাইদের উল্লাস। শরফ উন্নেসার দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসেন আমিনা।

'আম্মিজান! মেরা বেটা–মির্জা–' কথা আটকে যায়। মায়ের বুকে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন আমিনা বেগম।

মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেন শরফ উন্নেসা। বলেন, 'মনে ভরসা রাখ বেটি।'

'আমাদের ওরা বাঁচতে দেবে না। আমার মির্জাকে ওরা মেরে ফেলবে।'

'এসব কথা মনে আনিস না বেটি। সিরাজ পাটনায় পৌঁছে গেলে আর ভাবনা নেই। ওখানে রামনারায়ণ আছেন। ল-সাহেব আছেন। ফরাসি ফৌজ আছে।'

'আমার ভীষণ ভয় করছে আম্মিজান। শুনলাম কাসিম আলি বিরাট ফৌজ নিয়ে ধাওয়া করেছে সিরাজের পিছনে।'

'মনে সাহস আন আমিনা। তুই দেখে নিস সিরাজ ফের কামিয়াবি ইনসানের মতো ফিরে আসবে। ফের কুর্শি দখল করবে।'

মেয়েকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কথাগুলো বললেও মনের মধ্যে যেন কোনও জোশ পান না শরফ উন্নেসা। অভিজ্ঞ শরফ উন্নেসা বোঝেন, এ অবস্থায় নসিবের চাকা ঘোরানো বড় শক্ত কাজ।

আমিনা বেগম বলেন, 'আমার বেটা যেন জিন্দা থাকে। স্রেফ এইটুকুই। আমি আর কিচ্ছু চাই না আম্মিজান। চলো আমরা ক্লাইভ সাহেবের পা ধরে সিরাজের জীবন ভিখ মাঙি।'

অচানকই নারীকণ্ঠের খল অট্টহাসির শব্দ শুনে চমকে ওঠেন মা ও বেটি। তাঁদের নাকে ভেসে আসে জরদা ও আতরের উগ্র গন্ধ। শরফ উন্নেসার মহলের দরজায় এসে দাড়িয়েছেন ঘসেটি বেগম। পরনে জরি বসানো ঝকমকে মসলিনের ঘাঘরা ও কুর্তি। মুখে উগ্র প্রসাধনের চিহ্ন। মাথার চুল বাহারি নকশায় চুড়ো করে বাধা। গা ভর্তি দামি পাথর বসানো হিরের গয়না। ঠোঁট তাম্বুলরাঙা। দুই চোখে সুরমা। পাশে দাঁড়ানো বাঁদির সাজসজ্জাও রংদার। তার হাতে রুপোর পিকদান।

ঘসেটি বেগম বলেন, 'লেকিন ক্লাইভ সাহেব কি তোমাদের মির্জাকে জিন্দা ছাড়বে? ইংরেজরা কি এতই বেওকুফ? তাজা দুম্বার মতো কুরবানি হবে তোমাদের মির্জা।'

'ঘসেটি!' শরফ উন্নেসার গলা চড়ে যায়।

'বাপরে! এখনও এতো খুনজোশি?' এই বলে পিচিক করে পিকদানে পানের পিক ফেললেন ঘসেটি বেগম। তারপরে বলেন, 'বলছিলাম ক্লাইভ সাহেবের পা ধরে ভিখ মেঙে কোনও সুরাহা হবে কি? কেউটের বাচ্ছাকে কেউ কি জিন্দা ছেড়ে দেয়? মরবে। তোমার পেয়ারের নাতি মরবে।'

'চুপ কর ঘসেটি। চুপ কর।' চিৎকার করে ওঠেন শরফ উন্নেসা।

তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে ঘসেটি বেগম বলে ওঠেন, 'এখনও তেজ মরেনি দেখছি। জেনে রেখো তোমার কপালেও মওত নাচছে।'

পিচিক করে রুপোর পিকদানে ফের পানের পিক ফেলেন ঘসেটি বেগম।
আমিনা বেগম বলে ওঠেন, 'আম্মিজানকে এসব তুমি কী বলছ বড়ে বহেন?'
'দূর হয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে।' গর্জন করে উঠে বড় মেয়ের দিকে কয়েক পা এগিয়ে যান শরফ উন্নেসা।
'উরিব্বাস! মারবে নাকি? এত গুমানি কিসের? আমি ফালতু বকবক করছি না। তোমাদের বরবাদি দেখে আজ খুশি মানাবে ঘসেটি বেগম। একদিন ঘসেটির তাগদ জোশ সব কেড়ে নিয়েছিল তোমার সিরাজ। সেদিন তোমরা হেসেছিলে। আজ ঘসেটি হাসবে।'
কাতর গলায় আমিনা বেগম বলে ওঠেন, 'আমার বেটাকে রহেম করো বড়ে বহেন। তার জন্য দোয়া মাঙো।'
দেহ দুলিয়ে হেসে ওঠেন ঘসেটি বেগম।
রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে শরফ উন্নেসা বলেন, 'তোর বেতমিজি বরদাস্ত করেও সিরাজ তোকে জিন্দা রেখেছে, ইমানদারির সঙ্গে তোর জিন্দেগি গুজরানের বন্দোবস্ত করেছে। আজ তুই তার মওত চাইছিস?'
'আমি থোড়ি চাইছি। চাইছেন নবাব মিরজাফর খাঁ, ক্লাইভ সাহেব, মুর্শিদাবাদের বেবাক আমআদমি। সবাই চাইছে আলিবর্দির খানদানের বরবাদি। বদলা নেওয়ার আগুন জ্বলছে সকলের চোখে।'
'তুইও যে সেই আগুনে পুড়ে মরবি।'
সজোরে হেসে উঠে ঘসেটি বেগম বলেন, 'তোমার দিমাগ ঠিক নেই নানি বেগম। ঘসেটি ইংরেজদের দোস্ত। মিরজাফরের মদতদার। সিরাজের দুশমন। সে নয়া জমানায় তাজা গুলাবের মতো সৌগন্ধ ছড়াবে। জিন্দা থাকবে। মরবে তুমি, আমিনা আর তোমার পেয়ারের নাতি।'
সহসা অলিন্দ থেকে ভেসে আসে তুমুল কোলাহলের শব্দ। ঝড়ের গতিতে শরফ উন্নেসার মহলে প্রবেশ করে একদল সৈন্য। এদের সঙ্গে রয়েছে হারেমের দারোগা খুশিবানু ও তার বাহিনী। ভয় পেয়ে মাকে জড়িয়ে ধরেন আমিনা বেগম।
শরফ উন্নেসা শুধোন, 'কী ব্যাপার?'
খুশিবানু বলে, 'আপনাকে গ্রেফতার করতে এসেছি বেগম সাহেবা। পরোয়ানা আছে।'
দীর্ঘশ্বাস ফেলে শরফ উন্নেসা বলেন, 'চলো।'
ঘসেটি বেগম ফের হেসে উঠে বলেন, 'এই তোমার বরবাদির শুরুয়াত নানি বেগম।'
খুশিবানুর দলের কয়েকজন মহিলা সেপাই এগিয়ে এসে শক্ত করে দুপাশ থেকে ধরতে যায় নানি বেগমকে।
শরফ উন্নেসা সহসা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। 'খামোশ! এতকাল আলিবর্দির খানদানের নিমক খেয়েছ খুশিবানু। এখন তাঁদের ইজ্জতটুকু অন্তত বজায় রাখো। মামুলি এক কয়েদির মতো আমাদের গ্রেফতারির প্রয়োজন নেই। আমরা বাধা দেব না। কোথায় নিয়ে যাবে চলো।'
সম্ভ্রম দেখিয়ে সরে দাঁড়ায় মহিলা সেপাইরা। শরফ উন্নেসা ও আমিনা বেগম মহল ছেড়ে বেরিয়ে যান।
সজোরে হেসে ওঠেন ঘসেটি বেগম। তারপর বলেন, 'সাবাশ খুশিবানু। ইনাম মিলবে। লেকিন থোড়া কম। এদের কোমরে দড়ি বেঁধে মামুলি কয়েদির মতোই নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।'
এবারে ঘসেটি বেগমের সামনে এসে দাঁড়িয়ে খুশিবানু বলে, 'আপনিও চলুন বেগম সাহেবা।'
খুশিবানুর প্রশ্নের ভঙ্গিমায় চমকে উঠে বিস্ফারিত চোখে শুধোন, 'কোথায়?'
'আপনাকেও কয়েদ করার হুকুম আছে।'
'তুমি ঝুট বলছ।' ঘসেটি বেগম চেঁচিয়ে ওঠেন।
শান্ত গলায় খুশিবানু বলে, 'পরোয়ানা আছে আমার সঙ্গে।'

'নেহি। ইয়ে নেহি হো সাকতা।' প্রায় আর্তনাদ করে ওঠেন ঘসেটি বেগম।

'নবাবজাদা মিরনের দস্তখত করা পরোয়ানা আমার কাছে আছে মালকিন।'

'ঘসেটি বেগম সিরাজের দুশমন। এই দুশমনি বহুত দিনের। এই নয়া জমানায় সে কয়েদ হতে পারে না। তুমি ঝুট বলছ খুশিবানু।'

এই বলে প্রবল আক্রোশে খুশিবানুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন ঘসেটি বেগম।

মুহূর্তের মধ্যে কয়েকজন মহিলা সেপাই এসে ঘসেটি বেগমকে জাপটে ধরে মহল থেকে বের করে নিয়ে যায়। এদের সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তি বেধে যায় আলিবর্দির বড়ি বেটির। মহিলা সেপাইরা বলপ্রয়োগ করে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে থাকে ঘসেটি বেগমকে।

ঘসেটি বেগম চিৎকার করতে থাকেন, 'ছাড়ো আমাকে। ছেড়ে দাও। একবার অন্তত মিরজাফর খাঁর সঙ্গে কথা বলতে দাও।'

মহিলা সেপাইরা এসব কথায় কর্ণপাত করে না। কারাকক্ষে নিক্ষেপিতা হন ঘসেটি বেগম। লোহার দরওয়াজা সশব্দে বন্ধ হয়। প্রবল হতাশায় গরাদ ধরে ঝাঁকিয়ে চিৎকার করতে থাকেন ঘসেটি বেগম। 'রহেম করো আমাকে। ছেড়ে দাও।'

অন্ধকার কারাকক্ষের অভ্যন্তরে কালো পাথরের মেঝেতে পাতা ছেড়া বনাতের উপর হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসেছিল নিজামুদ্দিন। মাত্র সাত দিনেই তার শরীরটা শুকিয়ে গিয়েছে অনেকখানি।

দেওয়ান মোহনলালের উপর হামলা করার দায়ে অভিযুক্ত নিজামুদ্দিন। এ কোনও ঝুটা ইলজাম নয়। চকবাজারে আমজনতার চোখের সামনেই ঘটেছিল ঘটনাটা। অনেকেই দেখেছে। অকুস্থলেই নিজামুদ্দিন ধরা পড়ে। আসলে নিজামতের বদশাসনের উপর, নবাব সিরাজদ্দৌলার উপর, মোহনলালের উপর বহুদিনের আক্রোশ চকবাজারের আতরের কারবারি নিজামুদ্দিনের।

বেশ পুরোনো কহানি। তখন সুবে বাংলার মসনদে আসীন আলিবর্দি খাঁ। নবাবের আদরের নাতি সিরাজ ও তার দোস্তদের বেনজির জুলুমে সাধারণ মানুষ জেরবার। গঙ্গার উপর যাত্রীবোঝাই নৌকো উলটে দিয়ে মজা লুটত সিরাজ ও তার দোস্তের দল। ডুবন্ত মানুষের অসহায় আর্তনাদ দেখে পৈশাচিক উল্লাসে ফেটে পড়ত তারা। এসব কাজে সিরাজের অন্যতম দোসর ছিল মোহনলাল ও মেহেদি নিসার খাঁ। এই মজা লোটার খেলায় বহু মানুষ তাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছে। নিজামুদ্দিন হারিয়েছিল তার পেয়ারের বিবিকে।

সেদিন শ্বশুরালে যাচ্ছিল নিজামুদ্দিন। নৌকো ছিল যাত্রীতে ঠাসা। সেই নৌকোর দিকে ধেয়ে এসে ধাক্কা মারে সিরাজের বজরা। নৌকো উলটে যায়। বর্ষায় ফুলে ওঠা নদীতে হাবুডুবু খেতে থাকে মানুষগুলো। নিজামুদ্দিনের বিবির গর্ভে বেড়ে উঠছিল একটা ছোট্ট প্রাণ। নিজামুদ্দিনের রক্তের উত্তরাধিকার। বাঁচার প্রবল আকুতিতে জলের উপরে প্রসারিত বিবিজানের মেহেন্দি রাঙানো হাতখানা নিজামুদ্দিন চোখ বুজলেই দেখতে পায়। প্রাণপণে সাঁতার দিয়ে কাছে গিয়েও বিবির হাতখানা সে ধরতে পারেনি। চোখের সামনেই তলিয়ে যায় তার বিবি। তখন সিরাজের বজরা থেকে ভেসে আসছিল হাসির হররা।

এই শারারতির কোনও সুবিচার পায়নি নিজামুদ্দিন। কোতোয়ালিতে নালিশ জানাতে গিয়েছিল। আঁতকে উঠেছিল দারোগা। নবাবের নাতির বিরুদ্ধে ইলজাম আনতে চায় মামুলি এক আদমি! চাবুক মেরে নিজামুদ্দিনকে কোতোয়ালির কাছারি থেকে বের করে দেয় দারোগা। কোতোয়ালি থেকে বেরিয়ে এসে রক্তাক্ত দেহে ফুঁসতে থাকে নিজামুদ্দিন। দুচোখে ধকধক করে জ্বলতে থাকে প্রতিশোধের আগুন। সেই আগুন বহুদিন ধরে বুকের মধ্যে জ্বালিয়ে রেখেছিল নিজামুদ্দিন। আলিবর্দির মওত হল। মসনদে বসলেন

সিরাজদ্দৌলা। দেওয়ান হলেন মোহনলাল। যারা নিজামুদ্দিনের সুখের জীবনটাকে বরবাদ করল তারা হয়ে উঠল দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। হায় রে দুনিয়াদারের খায়েশ!

দিন সাতেক আগে ফৌজ নিয়ে পলাশির পথে চলেছিলেন মোহনলাল। সঙ্গে হাতি, ঘোড়া, উট, লোকলস্কর, সেপাই-পেয়াদা। কাড়ানাকাড়া বাজিয়ে চলেছে বিরাট বাহিনী। পলাশির প্রান্তরে নাকি নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই বাধতে চলেছে। চকবাজারের পথের ধারে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছিল নিজামুদ্দিন। শাহি হাতির পিঠে নবাবি কেতায় মোহনলালকে বসে থাকতে দেখে হঠাৎই নিজামুদ্দিনের মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। মনের মধ্যে দীর্ঘ দিন পুষে রাখা আক্রোশের বিস্ফোরণ ঘটল সহসা। পথের পাশ থেকে একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে সে মোহনলালের মাথা লক্ষ্য করে ছুড়ে মেরেছিল নিজামুদ্দিন। অল্পের জন্য পাথর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। কিন্তু কোতোয়ালির সেপাইদের হাতে নিজামুদ্দিন ধরা পড়ে যায়। তারপর কয়েদ হয় নিজামত কেল্লার। এখনও সে বন্দি।

নবাব যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় এখনও বিচার শুরু হয়নি। সুবে বাংলার সর্বশক্তিমান দেওয়ানজির উপরে হামলার ফরিয়াদ তার নামে। নিজামতের কানুনে এমন অপরাধের একমাত্র সাজা হল মওত। তাই নিজামুদ্দিন কারাকক্ষে বসে মৃত্যুর দিন গুণে চলেছে। কয়েদখানার অভ্যন্তরে সবসময়ই জমাট আঁধার। কখন দিন হয়, কখন রাত নামে তা টের পাওয়া যায় না। বাইরের খবর কয়েদখানার পাথরের দেওয়াল ভেদ করে ভিতরে আসে না। পলাশির প্রান্তরে কী ঘটে গিয়েছে, নিজামুদ্দিনের জানা নেই।

সহসা সচকিত হয়ে ওঠে নিজামুদ্দিন। অনেকজোড়া পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে কারাকক্ষের দিকে। পায়ের শব্দের সঙ্গে ভেসে আসছে একটা কোলাহলের শব্দ। সে শব্দ যেন উল্লাসের। কীসের কোলাহল? কীসের উল্লাস? কারা অভ্যন্তরে তো কয়েদিদের আর্তনাদ ও কান্না ছাড়া আর কোনও শব্দ শুনতে পাওয়া যায় না। কৌতূহলী হয়ে মোটা গরাদ দেওয়া দরওয়াজার দিকে ছুটে যেতে চায় নিজামুদ্দিন। পায়ে যে লোহার বেড়ি বাঁধা রয়েছে খেয়াল নেই। নিজামুদ্দিন হুমড়ি খেয়ে পড়ে পাথরের মেঝের উপরে। কপাল ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে।

কারাকক্ষের সামনে এসে দাঁড়ায় একদল সেপাই। মুখ তুলে তাকায় নিজামুদ্দিন। অন্তিমক্ষণ কী উপস্থিত? সেপাইরা কি তার মওতের পরোয়ানা নিয়ে এসেছে?

সশব্দে দরজার হুড়কো খোলে সেপাইরা। দুজন এগিয়ে এসে তার পায়ের বেড়ি খুলে দেয়।

একজন বলে ওঠে, 'ভাগ জলদি। খালাস।'

খালাস? নিজের কানদুটোকে বিশ্বাস হয় না নিজামুদ্দিনের। তাকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে এক সেপাই বলে, 'নবাব মিরজাফর খাঁ সাহেব নিজামত কেল্লার সব কয়েদিকে খালাস করে দেওয়ার পরোয়ানা দিয়েছেন। বহুত খুশনসিব তোর।'

'নবাব মিরজাফর খাঁ! তার মানে?' নিজামুদ্দিন বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করে।

'আরে বেওকুফ পলাশির লড়াই হাসিল করেছে ইংরেজরা। বরবাদ হয়ে গেছেন নবাব সিরাজদ্দৌলা। মুর্শিদাবাদ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। মিরমদনের মওত হয়েছে। মোহনলালও ভেগেছে।'

নিজামুদ্দিনের মুখটা খুশিতে ঝলমল করে ওঠে। পয়গম্বরের উদ্দেশে সে বহুত বহুত সুক্রিয়া জানায়। এতকাল সে মনে মনে যা চেয়ে এসেছে, তা সত্যি হয়েছে। খোদাতালা মুখ তুলে চেয়েছেন। ইনসাফ মিলেছে। বরবাদ হয়েছে আলিবর্দির খানদান। সিরাজদ্দৌলা মসনদ ছেড়ে পালিয়েছেন। ভেগেছেন মোহনলাল। এবারে তার বিবির আত্মা শান্তি পাবে। আনন্দে নিজামুদ্দিনের দু'চোখ পানিতে ভাসে।

সূর্য ডুবেছে খানিক আগে। আকাশের বুকে অস্তরাগের লালিমা। আঁধার এসে আঁচল বিছিয়ে বসবে খানিক বাদেই। নিজামুদ্দিনের মনে আশা নতুন জমানায় আমলোগ সুশাসন পাবে। বন্ধ হবে জুলমাত। চকবাজারের পথ ধরে এগোতে থাকে নিজামুদ্দিন। নয়া জমানায় সে নিজের মতো করে খুশি মানাতে চায়। নিজামুদ্দিন

মনে মনে ঠিক করে, কাল সে বিনি পয়সায় মিঠাই খাওয়াবে সব খদ্দেরকে। ফুল, লতাপাতায় সাজিয়ে তুলবে দোকানটাকে। এই পার্থিব জগতে চকবাজারের ওই দোকানটাই তো তার অকালে চলে যাওয়া বিবির তসবির। দোকানের নাম জিনাত মঞ্জিল। বিবির নামে নাম।

অনেকদিন বন্ধ পড়ে আছে দোকানটা। এখনই গিয়ে দোকান খুলে সাফসুতরো করতে হবে। কাঠের তাকে ঠাসা রয়েছে আতর, গুলাব জলের শিশি। ওসবে এতদিনে ধুলো পড়েছে নিশ্চয়ই। কাঁচের বোয়েমে ঠাসা ছিল শুকনো ফল, মোরব্বা। সে সবের কী অবস্থা কে জানে। তবকে মোড়া লাড্ডুগুলো কি চুহার পেটে গেল? এসব নানা কথা ভাবতে ভাবতে হাঁটার গতি বাড়ায় নিজামুদ্দিন।

৩

নিজের দোকান 'জিনাত মঞ্জিলের' সামনে এসে নিজামুদ্দিন চমকে ওঠে। বিস্ফারিত হয়ে ওঠে তার চোখ দুটো। মুখ ফুটে বেরিয়ে আসে অস্ফুট আর্তনাদ। 'হায় আল্লা!'

পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে তার দোকানঘর। ঘরের মাথায় লাগানো কাঠের ফলকের গায়ে খোদাই করা 'জিনাত মঞ্জিল' লেখাটা আধপোড়া হয়ে উঁকি দিচ্ছে ছাইয়ের স্তূপের মধ্যে থেকে। এখনও ছাই চাপা আগুন থেকে ধোঁয়া উঠছে অল্প অল্প। আশেপাশের দোকানগুলোতেও ভাঙচুর করে তাণ্ডব চালানো হয়েছে। কোনও কোনওটার দশা তারই দোকানের মতো। কার রোষে, কার অভিশাপে এভাবে লোকসান হল বহু মানুষের?

গোটা চকবাজার থমথমে। নিত্যদিনের সেই জমজমাট ভাবটা উধাও। পথের দুপাশে দোকানিদের চবুতরাগুলো খাঁ-খাঁ করছে। শুধু এদিকে ওদিকে জটলা করে আছে কিছু অতি কৌতূহলী মানুষজন। তাদের চোখেমুখে গভীর উদ্বেগের ছাপ।

স্তম্ভিত নিজামুদ্দিন স্খলিত পদক্ষেপে নিজের আগুনে ঝলসে যাওয়া দোকানঘরের ভিতরে ঢোকে। ছাত ভেঙে পড়েছে। মাথার উপরে দেখা যাচ্ছে খোলা আকাশ। বুকটা মুচড়ে ওঠে নিজামুদ্দিনের। শুধু আর্থিক ক্ষতির জন্য নয়। নিজের মরহুম বিবির নামে দোকানের নাম রেখেছিল নিজামুদ্দিন। আজ সেটাও শেষ। ছাইয়ের গাদার মধ্যে হাঁটু মুড়ে বসে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে আধপোড়া কাঠের ফলকটা টেনে বের করতে গিয়ে নিজামুদ্দিনের চোখদুটো জ্বালা করে ওঠে। আঁসুতে ঝাপসা হয়ে যায় তার চোখের দৃষ্টি।

পিছন থেকে কেউ একজন এসে হাত রাখে নিজামুদ্দিনের কাঁধে। ঘুরে তাকিয়ে সে দেখে কাপড়ের কারবারি বুড়ো আফতাব আলি। নিজামুদ্দিনের দোকান থেকে কিছু দূরেই আফতাব আলির মস্ত দোকান। শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিজামুদ্দিন প্রশ্ন করে, 'কী করে এমন হল চাচা? কেন এই আখেজ?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আফতাব আলি বলে, 'শহরটা দোজখ হয়ে গেল রে বেটা। আমার দোকান থেকেও কয়েকহাজার টাকার মাল লুটে নিয়ে গেল আজ। শুধু তাই নয় রে বেটা, আমার নাতনি রাবেয়াকে জোর করে ঘর থেকে তুলে নিয়ে গেছে ইবলিশের দল।'

রাবেয়া চোদ্দো-পনেরো বছরের ফুলের মতো একটি মেয়ে। তাকে চেনে নিজামুদ্দিন। ঈদের দিনে আফতাব চাচার সঙ্গে একদিন তার দোকানে আতর কিনতে এসেছিল।

নিজের শোক-দুঃখ ভুলে উত্তেজিত হয়ে উঠে নিজামুদ্দিন বলে, 'কী বলছ চাচা?'

গলার স্বরটা বোধ হয় একটু বেশিই চড়ে গিয়েছিল। শিউরে উঠে আফতাব আলি বলে, 'গলা নামিয়ে কথা বল বেটা। শয়তানগুলোর নজরে পড়লে খুন হয়ে যাবি। ওরা সব ধারেকাছেই আছে।'

'কারা শহরটাকে এমন দোজখ করে তুলল চাচা?'

‘শাহজাদা মিরনের শাগরেদ চুনিলাল-মুন্নিলাল ও তার দলবল। শাহজাদা মিরনই এসব শারারতির মদতদার।’

‘শাহজাদা মিরন?’

‘সে নাকি সিরাজদ্দৌলার দিলপিয়ারাদের ঢিট করতে চায়।’

‘আজব বাত! তোমার আমার মতো আমআদমি নবাবের দিলপিয়ারা হয় কী করে?’

‘এ একটা অছিলা। জমানা বদলের সুযোগ নিয়ে খন্নাসি। চুনিলাল ও মুন্নিলাল কাউকেই ছাড়ছে না। শকুনেরা টাকা আর আওরত, জেনানা, লেড়কি লুঠের পরোয়ানা পেয়েছে। তাই এই খন্নাসি।’

হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠে আফতাব আলি বলে, ‘আমার রাবেয়াকে কী করে ফেরত পাই বল দেখি? শুনেছি শয়তানের আওলাদেরা মেয়েটাকে জাফরাগঞ্জের হারেমে নিয়ে তুলেছে।’

রাগে ফুটতে থাকে নিজামুদ্দিনের গোটা শরীর। সে তো চেয়েছিল সিরাজদ্দৌলার বরবাদি। ভেবেছিল মসনদ থেকে সিরাজদ্দৌলা হটে গেলে নিজামতের সব জুলমাতের অবসান হবে। আমআদমি ভালো থাকবে। যেমন ছিল মুর্শিদকুলি, সুজাউদ্দিনের আমলে। কিন্তু এ কী হল? কাদের হাতে গেল নিজামতের ক্ষমতা। নতুন জমানাকে স্বাগত জানাতে চকবাজারের আজ খুশিতে ভাসার কথা। কুরসি বদল হতে না হতেই নগরটাকে দোজখ বানিয়ে ছাড়ল মিরন ও তার শাগরেদেরা?

আফতাব আলি বলে, ‘পালিয়ে যা বেটা। পালিয়ে যা। এ জমানায় জানে বাচবি না। এ জাহান্নাম ছেড়ে পালিয়ে যা।’

সহসা একটা গোলমালের শব্দ ভেসে আসে।

পথের উপরে ছুটে এসে আতঙ্ক জড়ানো গলায় আফতাব আলি বলে ওঠে, ‘ভাগ নিজামুদ্দিন। হার্মাদের দল!’

এক দৌড়ে চোখের নিমেষে একটা গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায় আফতাব আলি। ছুটোছুটি পড়ে যায় জটলারত মানুষগুলোর মধ্যেও।

একদল লোক দৌড়ে আসছে। তাদের হাতে তরোয়াল, বল্লম, ছুরি, সড়কি।

ক্ষণিকের জন্য বিহ্বল হয়ে পড়েছিল নিজামুদ্দিন। নিজামত কেল্লার নাকের ডগায় যে এরকম অরাজকতা চলতে পারে, এ তার ঠিক যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। হার্মাদের দল বেশ কাছে এসে পড়েছে। বাঁচতে হবে। এবারে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ছুটতে শুরু করে নিজামুদ্দিন। চকবাজারের অলিগলি ধরে এঁকেবেঁকে ছুটতে থাকে।

আঁধার নেমেছে। অন্যান্য দিন এসময়ে মশাল ও বাতিদানের রেড়ির তেলের আলোয় ঝলমল করে চকবাজার। ঝকমক করে জেল্লাদার দোকানপাট। মানুষের কলরবে মুখর হয়ে থাকে গোটা মান্ডি। মাঝে মাঝে এসে তেলের আধারে তেল ঢেলে দিয়ে যায় বাতিকরেরা। ঝিমিয়ে আসা আলোক-স্তম্ভ ফের সজাগ হয়ে ওঠে। কোথায় সেই চেনা চকমান্ডি? পরিচিত সেই সব গলি যেন প্রেতলোকের মতোই বীভৎস।

নিজামতের কয়েদখানার আধপেটা অখাদ্য আহারে দুর্বল হয়ে গিয়েছে নিজামুদ্দিনের শরীরটা। আর ছুটতে পারছে না সে। দম যেন ফুরিয়ে আসছে। কলিজা ফেটে যাওয়ার জোগাড়। পিছনে পাথর বাঁধানো পথের উপরে পায়ের শব্দ ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। নিজামুদ্দিনের কানে ভেসে আসছে শরাবের নেশায় উন্মত্ত জহ্লাদবাহিনীর ছুড়ে দেওয়া অশ্রাব্য গালিগালাজ। ‘ভাগতা হ্যায় শালা কুত্তা। মার শালাকে। খতম করে দে।’ এরা চুনিলাল ও মুন্নিলালেরই দলবল। খুন, ধর্ষণ, রাহাজানিতে এদের পৈশাচিক আনন্দ।

গলির বাঁকের মুখে রয়েছে তছনছ হয়ে যাওয়া একটা গোলদারি দোকান। আগলবিহীন দরজা দিয়ে দ্রুত তার ভিতরে ঢুকে পড়ে নিজামুদ্দিন। অন্ধকার হাতড়ে সে টের পায় একদিকে মজুত করা রয়েছে বেশ কিছু

চালের বস্তা। সুগন্ধি চালের সুবাসে ম-ম করছে চারিদিক। হার্মাদরা সবটুকু চেঁছেপুছে নিয়ে যেতে পারেনি। স্তূপীকৃত চালবোঝাই বস্তার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেলে নিজামুদ্দিন।

খানিকবাদেই বাইরে বেশ কয়েকজোড়া পায়ের শব্দ শোনা যায়। দোকানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে শয়তানের দল। তাদের হাতে জ্বলন্ত মশাল। আড়াল থেকে তাদের চোখমুখগুলো দেখে নিজামুদ্দিন শিউরে ওঠে। লোকগুলোকে চিনতে পারে সে। চকবাজারে এরা লুকিয়েচুরিয়ে নিষিদ্ধ মাদকের কারবার করত। এমন কোনও জঘন্য কাজ নেই যা এরা করতে পারে না। হায় রে! এরাই এখন নবাবজাদা মিরনের জিগরি দোস্ত। সিরাজদ্দৌলার জমানা এর চেয়ে খারাপ কী ছিল?

বস্তার আড়ালে প্রায় শ্বাস বন্ধ করে বসে রয়েছে নিজামুদ্দিন। কিছুক্ষণ মশাল হাতে হাতে এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করে ফিরে যায় দুষ্কৃতীরা। বাইরে তাদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যায়। আরও কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে নিজামুদ্দিন। কান খাড়া করে রাখে। না বাইরে কারও সাড়াশব্দ নেই।

আরও কিছুটা সময় অতিবাহিত করে বস্তার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে চমকে ওঠে নিজামুদ্দিন। তার চোখে পড়ে অদূরে একটি ছায়ামূর্তি।

চাপা গলায় নিজামুদ্দিন শুধোয়, 'কে?'

'আমাকে বাঁচান।' খুশ ইলহান কিশোরী কণ্ঠ রিনরিন করে বাজে। দ্বিগুণ চমকিত হয় নিজামুদ্দিন।

'কে তুমি?'

'রাবেয়া।'

'রাবেয়া? আফতাবচাচার নাতনি?'

'জি। আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি। আপনি তো নিজামুদ্দিন চাচা। তাই না?'

খানিকটা বিস্মিত হয়ে নিজামুদ্দিন বলে, 'জি। লেকিন তুমি এখানে?'

'ওরা ঘর থেকে জোর করে উঠিয়ে নিয়ে এসেছিল।' মেয়েটি কেঁদে ফেলে।

'ভয় নেই রাবেয়া। ঘাবরাও মাত। ওদের হাত থেকে তুমি ছাড়া পেলে কী করে?'

'কোমরে ছুরি গোজা ছিল। এক কামিনেকে জখম করে ছুটে পালাই। ওরা তেড়ে আসছিল পিছনে। ছুটতে ছুটতে এই দোকানের মধ্যে ঢুকে লুকিয়ে পড়ি। আল্লার রহেমে বেঁচে গেছি। আমাকে ঘরে পৌঁছে দেবেন চাচা?'

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে নিজামুদ্দিনের হাত চেপে ধরে হাঁপাতে থাকে রাবেয়া। হাতের স্পর্শে নিজামুদ্দিন বুঝতে পারে মেয়েটি ভয়ে থরথর করে কাঁপছে।

নিজামুদ্দিন বলে, 'ডরো মাত রাবেয়া। এসো আমার সঙ্গে।'

রাবেয়ার হাত ধরে চুপিসারে পথে নেমে আসে নিজামুদ্দিন। অন্ধকার পথ। চারিদিকে জনমানুষের চিহ্ন নেই। দূর থেকে ভেসে আসছে একটা হইচইয়ের শব্দ। ওদিকের আকাশের গায়ে লালচে আভা। হয়তো শয়তানের দল আগুন লাগিয়েছে কারও বাড়িতে।

আচমকাই অন্ধকার ভেদ করে নিজামুদ্দিনের উপর ঝাপিয়ে পড়ে দুই ছায়ামূর্তি। পলকে নিজেকে সামলে নিয়ে দুই ছায়ামূর্তির সঙ্গে লড়তে থাকে নিজামুদ্দিন। আকস্মিক এই হামলায় হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে রাবেয়া। নিজামুদ্দিন চেঁচিয়ে ওঠে 'ভাগো, রাবেয়া ভাগো।'

ছুটতে শুরু করে রাবেয়া। নিজামুদ্দিন সেয়ানে সেয়ানে লড়তে থাকে দুই হার্মাদের সঙ্গে। ছুটতে ছুটতে রাবেয়ার হুঁশ হয় সে তার বাড়ির কাছে এসে পড়েছে। ছুটে গিয়ে বাড়ির সদর দরজায় পাগলের মতো আঘাত করতে থাকে রাবেয়া। চিৎকার করতে থাকে, নানাজি! নানাজি! দরওয়াজা খোলো।

রাবেয়ার গলার আওয়াজ শুনে লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে আসেন আফতাব আলি।

'রাবেয়া!'

'নানাজি!' এই বলে দাদুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাবেয়া। থরথর করে কাঁপছে সে। ধীরে ধীরে কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। ঠোঁট দুটো ফাঁক করে কিছু বলতে চায় সে।

'রাবেয়া রাবেয়া!' চেঁচিয়ে ওঠেন আফতাব আলি।

'নিজামুদ্দিন চাচাকে বাঁচাও।' এই বলে পথের দিকে অঙ্গুলিসংকেত করে নানাজির হাতের বাঁধনের মধ্যেই চেতনা হারায় রাবেয়া।

'রাবেয়া বেটি!' ছুটে আসেন আফতাব আলির বিবি। রাবেয়ার নানি। নাতনিকে পাঁজাকোলে করে তিনি ভিতরে নিয়ে যান।

চোয়াল শক্ত হয় আফতাব আলির। ইতিমধ্যে আফতাব আলির বাড়িতে কোনও বিপদ হয়েছে ভেবে ছুটে এসেছে আশেপাশের কয়েকজন লোক। তাদের হাতে লাঠি, বল্লম, সড়কি। আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাওয়া নয়। কোতোয়ালির সেপাইরা যখন আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় অপারগ তখন নিজের হাতেই আইন তুলে নেবে তারা। এই তাদের সংকল্প।

রাবেয়ার দেখানো অঙ্গুলিসংকেত লক্ষ্য করে ছুটতে থাকে তারা। সবার সামনে আফতাব আলি। তার এক হাতে মশাল, আরেক হাতে লাঠি।

খানিক দূর এগোনোর পরেই তারা দেখতে পারে একটা লোক টলমল পায়ে ছুটে আসার চেষ্টা করছে সামনে, অদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই ছায়ামূর্তি। মারমুখী জনতাকে ছুটে আসতে দেখে দুই ছায়ামূর্তি উলটোদিকে দৌড় লাগায়। টলমলে পায়ে সামনের দিকে ছুটতে চাওয়া মানুষটা পথের উপরে মুখ থুবড়ে পড়ে।

লোকটার পাশে এসে হাঁটু মুড়ে বসে পড়েন আফতাব আলি।

'নিজামুদ্দিন! বেটা!'

শিউরে ওঠেন আফতাব আলি। নিজামুদ্দিনের পিঠটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। পিঠের মাঝে আমূল গেঁথে রয়েছে একটা ছোরা। নিজামুদ্দিনের মাথাটা নিজের কোলের মধ্যে টেনে নেন আফতাব।

'বেটা ইয়ে ক্যায়সে হুয়া?'

'মেরা অন্তিম পল হাজির চাচা। লেকিন রা-বে-য়া-'

কথাটা শেষ করতে পারে না নিজামুদ্দিন। মাথাটা হেলে যায় একদিকে। ঠোটের কোণ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে।

দাউদপুর ছেড়ে এগিয়ে এসে কাশিমবাজারের কাছে ময়দাপুরে তাঁবু ফেলেছে ইংরেজ ফৌজ। সিরাজদ্দৌলার পরাজয় ও পলায়নের পর রাজধানীর সাধারণ মানুষের কী প্রতিক্রিয়া, মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করার আগে তা ভালো করে যাচাই করে নিতে চান কর্নেল ক্লাইভ। পা ফেলতে চান একেবারে হিসেব কষে। মোটামুটি সব ঠিকঠাকই ছিল কিন্তু আজ সকালে হাতে এসে পড়া একটা চিঠি ক্লাইভকে ঘোর দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। চিঠিটা উইলিয়াম ওয়াটসকে লিখেছিলেন জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ।

'...কর্নেল ক্লাইভকে আমার সেলাম জানাবেন। মুর্শিদাবাদ শহরে আসার সময় উনি যেন হুঁশিয়ার থাকেন। কেননা মুর্শিদাবাদ শহরে ঢুকলেই ওঁর উপর হামলা হতে পারে। কর্নেলকে খতম করার একটা চক্রান্ত চলছে।...'

২৫ জুন ১৭৫৭। সেদিনই মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার কথা ছিল ক্লাইভের। ফৌজ প্রস্তুত হয়েই ছিল। আপাতত যাত্রা বাতিল করলেন কর্নেল।

ওদিকে ক্লাইভ রাজধানীতে না এসে পৌঁছলে মসনদে বসতে পারছেন না মিরজাফর। তিনি অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। দ্রুত আসার জন্য ক্লাইভকে বারবার বার্তা পাঠাচ্ছেন এই মর্মে,

'...তার জীবনের এই চরম খুশির দিনে সাবিৎ জঙ্গ ক্লাইভ যদি হাজির না থাকেন, তাহলে তার হর খুশি বরবাদ হয়ে যাবে।'

মিরজাফরের বার্তায় যে গভীর আন্তরিকতার ছোঁয়া রয়েছে সে নিয়ে ক্লাইভের কোনও সন্দেহ নেই। তবুও নিজের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত না করে মুর্শিদাবাদের পথে কর্নেল আপাতত আর এক পাও এগোতে রাজি নন। জগৎশেঠের পাঠানো সতর্কবার্তাকে তিনি উড়িয়ে দিতে পারছেন না।

ইংরেজদের হাতে নবাবের পরাজয় মুর্শিদাবাদের সাধারণ মানুষ কী ভাবে দেখছে তা নিয়ে কর্নেলের মনে ধন্দ রয়েছে। মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করলে যদি স্বতস্ফূর্ত জনরোষ ইংরেজদের উপর আছড়ে পড়ে তাহলে পালানোর কোনও পথ থাকবে না। সামান্য কয়েকজন সৈন্যকে নিয়ে হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভ কী করে সামাল দেবেন তিনি! এসব ভেবে আগে থেকেই শঙ্কিত ছিলেন ক্লাইভ। তার উপরে গোল বাধিয়েছে জগৎশেঠের চিঠিটা। কর্নেল ক্লাইভের উপর হামলা করার ষড়যন্ত্রটা যে কার তা নিয়ে অবশ্য কোনও ইঙ্গিত দেননি শেঠজি।

চিন্তিত হয়ে নিজের ক্যাম্প অফিস লাগোয়া বারান্দায় পায়চারি করছিলেন কর্নেল। ঠোঁটে গোঁজা রয়েছে পাইপ। মুখটা গম্ভীর। ঘন ঘন ধোঁয়া ছেড়ে চলেছেন।

নবকৃষ্ণ এসে সেলাম জানিয়ে বললেন, 'কাসিদ মুর্শিদাবাদের খবর নিয়ে এসেছে হুজুর।'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ক্লাইভ শুধোন, 'কী খবর মুনশি?'

নবকৃষ্ণ চিন্তিত গলায় বলেন, 'রাজধানীতে ভয়ানক গোলমাল শুরু হয়েছে।'

'হোয়াট? কীসের গোলমাল?' ভুরু কুঁচকে যায় ক্লাইভের।

'রাজধানী একেবারে দোজখ হয়ে উঠেছে হুজুর। দেদার লুঠতরাজ, খুনজখম হচ্ছে।'

বিস্মিত হয়ে ক্লাইভ শুধোন, 'এসব কী বলছ? এর কারণ?'

'গোল পাকিয়েছে মিরজাফরের বেওকুফ ছেলেটা। সিরাজের তাঁবের লোকজনদের খতম করতে হবে বলে হুকুম জারি করেছেন তার শাগরেদদের উপর। শাগরেদ মানে যতসব গুণ্ডা, বদমাশের দল। নবাবজাদার হুকুমতের বলে যার-তার উপর হামলা চালাচ্ছে তারা। মিশকিন থেকে রইস আদমি কেউই রেহাই পাচ্ছে না। আহাম্মকি আর কাকে বলে?'

প্রচণ্ড বিরক্তির সঙ্গে ক্লাইভ বলেন, 'বলছ কী মুনশি, এ তো ডেঞ্জারাস অ্যাকশন।'

'ডেঞ্জারাস মানে? ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস হুজুর।'

'আর ইউ সিওর? ভেরিফাই করেছ? এসব খবর সত্যি?' সন্দিগ্ধ গলায় প্রশ্ন করেন ক্লাইভ।

'এ তো আর কেবল কাসিদের জবান নয় হুজুর। চিরকুট পাঠিয়েছেন রায়দুর্লভ।'

'রায়দুর্লভ!'

'ইয়েস স্যার। আপনার হেল্প চেয়েছেন। এই যে চিঠি।'

'কী লিখেছেন? ব্রিফলি বলো আমাকে।'

'বাপ মসনদে বসবে। এই খুশিতে ব্যাটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। খুন ঝরাচ্ছে, বাড়ি জ্বালাচ্ছে, জেনানা লুঠছে। সাধারণ লোকে ভয়ানক পরেশানির মধ্যে পড়েছে। মিরজাফর খাঁকে শাপশাপান্ত করছে। কোম্পানিকেও দুষছে। বলছে, সিরাজদ্দৌলাকে দেশছাড়া করে আমআদমির কপাল পুড়িয়েছে ইংরেজ কোম্পানি। রায়দুর্লভের উপরেও মিরনের আক্রোশ রয়েছে। দেওয়ানজি ভয়ে ভয়ে রয়েছেন। গুপ্তঘাতকের হাতে তাঁর প্রাণটা না যায়।'

এই বলে চিরকুটটা ক্লাইভের হাতে তুলে দেন নবকৃষ্ণ।

কাগজটায় একবার চোখ বুলিয়ে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে গর্জন করে ওঠেন ক্লাইভ। 'রাবিশ! অল ননসেন্স। অ্যাবসোলিউট স্টুপিডিটি।'

এ সময়ে এই অযাচিত ঝুটঝামেলা কর্নেল ক্লাইভের একেবারেই পছন্দ নয়। নবাব সিরাজদ্দৌলার সময়ের অপশাসনের অবসান ঘটিয়ে সুশাসন দেবেন মিরজাফর। তাই সিরাজের বিরুদ্ধ গোষ্ঠীকে মদত দিয়েছে ইংরেজরা—একথাই এখন প্রতিষ্ঠা করতে হবে সাধারণ মানুষের মনে। তাদের আস্থা অর্জন করতে হবে। বোঝাতে হবে সিরাজদ্দৌলাকে হটিয়ে ইংরেজরা সুবে বাংলার মঙ্গলই করেছে। এসময়টা মাথা গরম করার নয়, গোলমাল করার নয়, ডিপ্লোম্যাট রবার্ট ক্লাইভ এসব ভালোই বোঝেন। অথচ অকারণে পরিস্থিটা ঘোরালো করে তুলছে মিরজাফরের বেওকুফ ছেলেটা।

মিরনের উপরে হাড়েহাড়ে চটে গেলেন কর্নেল। রাগে তাঁর মুখটা লাল হয়ে উঠল। কর্নেলের মনে হল চিঠিতে যে কন্‌সপিরেসির কথা শেঠজি লিখেছেন, সেটা মিরনেরই মস্তিষ্কপ্রসূত। চিঠি যদি কোনওভাবে ফাঁস হয়ে যায়, এই ভয়ে হয়তো জগৎশেঠজি মিরনের নামটা উল্লেখ করেননি।

মিরজাফরকে হাতের মুঠোয় রেখে অবাধে একচেটিয়া বাণিজ্য করে যাবে ইংরেজরা। নয়া নবাবকে দম ফেলার ফুরসত দেবে না। এতদিনে ইংরেজদের ব্যবসার যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা কড়ায়গণ্ডায় আদায় করে ছাড়বেন ক্লাইভ। বহিরঙ্গে পরম অনুগত ভাবটা বজায় রেখে নিখুঁত ডিপ্লোম্যাসির প্যাঁচে তিনি নবাবের টুঁটি টিপে ধরতে চান। এসব ক্লাইভের মনের প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধি। এখনও বাহিনীর মেজর ও ক্যাপটেনদের সঙ্গে এ নিয়ে কোনও আলোচনা তিনি করেননি। তবে মিরন কি পড়ে ফেলেছে তাঁর মনের কথা? তাঁর হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে খোলা আকাশে আজাদ চিড়িয়ার মতো ডানা মেলে ওড়ার খোয়াব দেখছে? তাই তাঁকে খতম করার ভাবনা দেখা দিয়েছে মিরনের মাথায়? কিন্তু ওই ছোকরাকে দেখে তো মনে হয় না এতটা ইনটেলিজেন্ট। এসব নানা কথা ভাবতে ভাবতে হাতদুটোকে পিছন দিকে জড়ো করে ফের পায়চারি করতে লাগলেন ক্লাইভ।

নবকৃষ্ণ জোড়হাত হয়ে বলেন, 'একটা কথা ছিল হুজুর।'

হাঁটতে হাঁটতেই ক্লাইভ বললেন, 'বলো মুনশি।'

'শুনলাম নানি বেগম, আমিনা বেগম, ঘসেটি বেগম কয়েদ হয়েছেন। মিরজাফরের বেটা এই সময় দুম করে আলিবর্দির রিসতেদারদের কোতল করে না বসে। তাহলে কিন্তু চরম গোলমাল উপস্থিত হবে।'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ক্লাইভ বললেন, 'ইউ আর রাইট মুনশি। এক কাজ করো তো, চট করে একবার মেজর আয়ারকুটকে খবর দাও। বলো আমি ডাকছি।'

নবকৃষ্ণ শশব্যস্ত হয়ে চলে যান।

খানিকবাদে আয়ারকুট হন্তদন্ত হয়ে এসে স্যালুট করেন কর্নেলকে।

ক্লাইভ গম্ভীর মুখে বলেন, 'গুড মর্নিং মেজর।'

'গুড মর্নিং স্যার।' মুখে একথা বললেও ক্লাইভের থমথমে মুখখানা দেখে আয়ারকুট বুঝলেন মর্নিং মোটেই গুড নয়।

আয়ারকুটকে দ্রুত পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে দিয়ে ক্লাইভ হুকুম করেন, 'ইমিডিয়েটলি প্রসিড টু মুর্শিদাবাদ উইথ টু হান্ড্রেড কনটিনজেন্ট। আই ওয়ান্ট ইমিডিয়েট রেস্টোরেশন অফ পিস। আরেকটা কথা মিরনকে কড়া ভাবে বুঝিয়ে দিও, আমি এখানে হাজির থাকতে আলিবর্দির কোনও রিসতেদারের খুন যেন না ঝরে।'

'ইয়েস স্যার।'

ক্লাইভের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কয়েকঘণ্টার মধ্যেই ফৌজসহ মুর্শিদাবাদের পথে রওনা হয়ে গেলেন আয়ারকুট। সঙ্গী ওয়ারেন হেস্টিংস।

পলাশির যুদ্ধের পরেই বাসা বদল করেছেন মিরজাফর খাঁ। বেগম, বাঁদি, গোলাম, বান্দা, রিসতেদারসহ জাফরাগঞ্জের প্রাসাদ ছেড়ে হিরাঝিল প্যালেসে এসে উঠেছেন। ক'দিন আগেও নবাব সিরাজদ্দৌলার ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যপ্রীতির পরিচায়ক ছিল হিরাঝিল প্যালেস। ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়ে মনসুরগঞ্জে এর অবস্থান। তাই কেউ কেউ বলে মনসুরগঞ্জের প্যালেস। ঘসেটি বেগমের মোতিঝিল প্রাসাদের গরিমাকে ম্লান করতে এই প্রাসাদ গড়েছিলেন সিরাজদ্দৌলা।

মোতিঝিলের আদলেই এই প্রাসাদকে ঘিরে রেখেছে অশ্বখুরাকৃতি একটি ঝিল। অবশ্য মোতিঝিলের মতো প্রাকৃতিক নিয়মে এর জন্ম নয়। সিরাজের খায়েশে খনন করা হয়েছিল। মোতিঝিলের চেয়েও আকারে বড়। 'হিরাঝিল' নামকরণ সিরাজেরই করা।

প্যালেস তো নয় যেন খোয়াবে দেখা একটুকরো রঙিন দুনিয়া। বেহেস্তের মতো সুন্দর। গতকাল বাসা বদলের ধকলে গোটা প্যালেসটা ঘুরে দেখার অবকাশ পাননি মণি বেগম—হিরাঝিল প্যালেসের নয়া মালকিন। আজ সকাল থেকেই তিনি মহলে মহলে ঘুরছেন। দেখে দেখে যেন আশ আর মিটছে না বেগম সাহেবার।

শিশমহলের চকমিলানো মেঝেতে দাঁড়িয়ে দেওয়ালে ও ছাতে গাঁথা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়নায় নিজের হাজার হাজার প্রতিবিম্ব দেখে মণি বেগম স্তম্ভিত। যেদিকেই তাকাচ্ছেন চোখ ঝলসে যাচ্ছে। তাঁর রূপের জলুসে গোটা শিশমহল যেন হাসছে। পুরুষের চোখে তারিফের ভাষা দেখে কিশোরী বয়স থেকেই মণি বেগম বুঝতেন তিনি অপরূপা। খোদাতালা তাঁকে নিপুণ ভাবে গড়েছেন। আজ যেন হিরাঝিলের অশুমার আয়নায় নিজের রূপকে নতুন করে আবিষ্কার করলেন বুডঢা মিরজাফরের যুবতী ভার্যা। নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মণি বেগমের মনে হল, দর্পণে যাকে দেখছেন, এ যেন তিনি নন, বেহেস্তের কোনও হুরী।

ছেলেমানুষি খেয়ালে কত্থক নাচের ভঙ্গিতে কয়েকবার পাক খেলেন নৃত্যপটীয়সী বেগম সাহেবা। মুহূর্তেই যেন ঝড় উঠল। নিপুণ পায়ের ছন্দ। অপূর্ব দেহভঙ্গিমা। গোটা শিশমহল ঝলমল করে উঠল। নিজের এই ছেলেমানুষিতে হাসি পেয়ে গেল বেগম সাহেবার। সজোরে হেসে উঠলেন। সে হাসিতে যেন মুক্তো ঝরে পড়ল।

শিশমহল থেকে বেরিয়ে এসে বাগানের পথ ধরে হিরাঝিলের নৌকোঘাটের পানে হেঁটে চললেন মণি বেগম। ঠিক যেন চলমান এক যৌবনবহ্নি। বেগম সাহেবার পরনের পেশোয়াজ ও কুর্তি গায়ের সঙ্গে সেঁটে আছে। বড় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যৌবন সুবাসে ভরপুর নারীদেহের অবয়ব। তাঁর গলায় জড়ানো আশমানি ওড়না উড়ছে বাতাসে। চলার ছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দুলছে চিকন কোমর ছাড়িয়ে গুরুনিতম্বের উপরে এসে পড়া লম্বা বেণী। জরির ফিতে দিয়ে বাঁধা। বেণীর গায়ে গাঁথা রয়েছে কয়েকটা তাজা গুলাব। লাল রঙের। বেগম সাহেবার ঠোঁট তাম্বুলরাঙা। দুই চোখে সুরমা। মসৃণ দুই গালে আফশাঁর প্রলেপ। মণি বেগম হেঁটে চলেছেন। চলার পথ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে আতরের সুগন্ধ।

নিজেকে কী করে মোহিনী রূপে সাজিয়ে তুলতে হয় মণি বেগম তা জানেন। সৌন্দর্য, আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিত্বের অসামান্য নিদর্শন বছর পঁচিশের এই নারী। প্রায় সাত-আট সাল তো হয়ে গেল মিরজাফরের সঙ্গে তাঁর শাদি হয়েছে। এখনও মণি বেগমের মুখপানে তাকালে বহেরা বনে যান বুডঢা মিরজাফর। বুড়ো খসমের কামনামদির চোখদুটো দেখে হেসে ফেলেন মণি বিবি। হাসিন মুখের সেই হাসি দেখে মিরজাফরের বোধবুদ্ধি সব কেমন যেন গুলিয়ে যায়। স্থানকাল ভুলে বিবিকে সবলে আকর্ষণ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। পাশেই

যে গোলাম-বাঁদিরা রয়েছে সে হুঁশ থাকে না। এমন অবস্থায় খসমের মান রাখতে ধরা না দিয়ে কৌশলে পিছলে যান মণি বেগম। নরম আঙুল দিয়ে মিরজাফরের গালে ঠোনা মেরে বলেন, 'বেশরম বুড্‌ঢা কাঁহেকা।' বিবির মুখে এই তিরস্কার শুনে বেওকুফের মতো হেসে ওঠেন মিরজাফর। মণি বেগম বোঝেন, বোকাসোকা এই বুড্‌ঢা মানুষটা তাঁর তালুবন্দি।

নুড়ি বিছানো পথের দুপাশে কেয়ারি করা বাগিচা নতুন বর্ষার সমাগমে যেন বেশি রকমের সবুজ হয়ে উঠেছে। ঘন সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে ফুটে রয়েছে রং বেরঙের সুগন্ধি ফুল। গোটা পথ জুড়ে জায়গায় জায়গায় মাথার উপরে ধনুকের ছিলার মতো বাহারি নকশার কাঠামো আঁকড়ে বেড়ে উঠেছে মাধবীলতা। মণি বেগম থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। মুখের কাছে নুয়ে পড়েছে মাধবীলতার কচি সবুজ পাতায় ভরা একটি ডাল। ফের ছেলেমানুষি পেয়ে বসে বেগম সাহেবাকে। সবুজ পাতা দুই আঙুলে ধরে নিজের নরম গালে বোলাতে থাকেন। চোখ বুজে যায় আবেশে, সুখে।

মণি বেগম ভাবেন, তিনি বহুত খুশনসিব এক আওরত। যা ঘটে গেল তার জীবনে তা কোনও সুনহরি খোয়াব? নাকি সত্যি? ছিলেন সামান্য এক তওয়ায়েফ। পরে সিপাহসালার মিরজাফরের বেগম। এখন নবাব-বেগম। হিরাঝিল প্যালেসের নয়া মালকিন। খোদার বহুত মেহেরবানি! নৌকোঘাটে পৌঁছে বিদ্যুৎগতিতে কয়েক ধাপ নীচে নেমে প্রশস্ত চাতালের উপর সহসা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন তিনি। আরও কিছু ধাপ নীচে ছলাৎছলাৎ করে পাড়ে এসে ধাক্কা খাচ্ছে হিরাঝিলের জলরাশি, প্রায় কাঁচের মতো স্বচ্ছ। সেদিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন বেগম সাহেবা। চোখের পর্দায় সহসা চলমান হয়ে ওঠে অতীতের তসবির।

নবাব আলিবর্দি খাঁর পেয়ারের নাতি সিরাজদ্দৌলার শাদি হবে। মুর্শিদাবাদ তাই রংদার। সুবে বাংলার রাজধানী উৎসবের ফূর্তিতে ভাসছে। ত্রিপোলিয়া তোরণদ্বার পার হয়ে চেহেল সেতুনের দিকে এগিয়ে চলেছে কয়েকখানা পালকি। আরোহীরা হল জেহানাবাদের নামী তওয়ায়েফ বিশু বেগ ও তার দলবল। এরা আসন্ন উৎসবে মুজরোর দাওয়াত নিয়ে এসেছে।

পালকিতে বসে চিকের আড়াল থেকে মুর্শিদাবাদ শহরটাকে দু'চোখ ভরে দেখছিল ষোলো বছরের এক কিশোরী। তার নাম মণি। মেয়েটির পরনে সস্তা শালোয়ার ও কুর্তা, জায়গায় জায়গায় তালিতাপ্পি মারা। সে হল তওয়ায়েফ বিশু বেগের মেয়ে বুব্বু বাইয়ের বাঁদি।

সেকেন্দ্রার কাছে বলকুন্ডা নামে এক অখ্যাত গ্রামের এক গরিব পরিবারে মণির জন্ম। দুবেলা ভালো করে খাবার জুটত না। তার বাপ কে মণি জানে না। জ্ঞান হতে দেখে আসছে তার গরিব মাকে। মেয়ের রূপ আছে। এই রূপই হয়তো একদিন নসিব ফেরাতে পারে। এই ভেবে গরিব মা মেয়েকে তুলে দিলেন বাইজি বিশু বেগের হাতে।

ঠিকমতো তালিম পেলে মণিও হয়তো একদিন নামজাদা বাইজি হয়ে উঠতে পারে। তাহলে মেয়ের খাওয়াপরার ভাবনা থাকবে না। মণির মা এমনই ভেবেছিলেন।

বিশু বেগ ঠাঁই দিলেন মণিকে। তবে সে ভাবে নাচ শেখার সুযোগ হল না মণির। বব্বুরই বয়সি মণি। বিচক্ষণ বিশু বেগ ঠিকই বুঝেছিলেন রাজা-বাদশার মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো রূপ মণির। এ মেয়ে তালিম পেয়ে পাকা তওয়ায়েফ হয়ে উঠলে বব্বুর কোনও কদর থাকবে না।

বিশু বেগ যখন তালিম দিতেন বব্বুকে, মন দিয়ে দেখত মণি। গভীর মনোযোগের সঙ্গে নজর করত বিশু বেগের হাতের মুদ্রা, পায়ের চলন। রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে মণি গোপনে সেই নাচের তরিকা, ছন্দ রপ্ত করত। সারাদিনে তো ফুরসত মেলে না। বব্বুর খিদমত খাটতে হয়। পান থেকে চুন খসলে পিঠে পড়ে কোড়ার আঘাত।

মণির এই কসরত বিশু বেগের নজর এড়ায়নি। কিন্তু মুখে কিছু বলেননি তিনি। মেয়েটির অধ্যবসায় ও প্রতিভা বিশু বেগকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি ঠিক করলেন আগে তার নিজের মেয়ে বব্বু প্রতিষ্ঠা পাক,

তারপরে তিনি আসরে পেশ করবেন মণি বাঁদিকে।

চেহেল সেতুন যাওয়ার পথে অন্য একটা ডুলিতে বসে চিকের আড়াল থেকে মণি বাঁদির মতো বিশু বেগও মুর্শিদাবাদ নগরীকে অবাক চোখে দেখছিলেন। পথঘাট, দোকানপাট, কুঠি-হাভেলি সবেতেই সমৃদ্ধির ছোঁয়া। ডুলিতে বসে রঙিন এক খোয়াব দেখতে থাকেন বিশু বেগ। তওয়ায়েফ হয়ে হিন্দুস্তানে দিন গুজরান করা এখন বেশ কঠিন। জাহাঙ্গির, শাহজাহান বাদশার আমলের রবরবা এখন তুজুকে ঠাঁই নিয়েছে। অযোধ্যার নবাব, বেনারসের রাজারও সেই কড়ির জোর আর নেই। বাইজির কদরদারি করবে কে? তবে মুর্শিদাবাদের জলুস এখনও অটুট আছে। নাচের আসরে এখানকার কোনও রইস আদমির যদি বব্বুকে মনে ধরে, তবে তার একটা হিল্লে হয়। বাকি জীবনটা নিশ্চিন্তে কাটাতে পারেন বিশু বেগ। কিন্তু দুনিয়াদার কি তাঁকে এতটা দয়া করবেন?

সিরাজদ্দৌলার বিয়ের অনুষ্ঠান উপলক্ষে মেহফিল বসল চেহেল সেতুনে। তামাম সুবে বাংলার জমিদার, আমির, ওমরাহরা সব হাজির। নরম গালিচার উপরে নেচে চলেছে বব্বু বাই। বীণকার, সারেঙ্গিবাদক, তবলচি ঝড় তুলছে বাজনায়। নাচতে নাচতে বব্বু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। পা চলছে না। একসময় নাচ থামিয়ে দেয় সে। থেমে যায় বীণকার, তবলচি, সারেঙ্গিবাদক। বীণকারের পাশে বসে গাইছিলেন বিশু বেগ। তিনিও থমকে গেলেন।

হইহই করে ওঠে সিরাজির নেশায় মাতাল রসিকের দল। মনের তুষ্টি হয়নি তাঁদের। তাঁরা আরও নাচ দেখতে চায়।

'কেয়া হুয়া বাইসাহেবা?' প্রশ্ন করেন মিরজাফর।

'গোস্তাকি মাফ কিজিয়ে হুজুর। বব্বু বাই থক গয়ি।' মাথা নুইয়ে জবাব দেন বিশু বেগ।

'তো কেয়া? দুশরা কিসিকো পেশ কিজিয়ে।'

সকলে গলা মেলায়। 'বেশক।! জরুর।'

কী করবেন বিশু বেগ। নিজেই নামতে পারেন আসরে। কিন্তু গত কয়েকদিনের জ্বরে ধরে তাঁর শরীরটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। আসরে নাচার মতো দম নেই। আমির-ওমরাহরা সব নাচের নেশায় মেতে উঠেছে, এখন আসর ছেড়ে চলে যাওয়া মানে ঘোর বেইজ্জতি।

অগত্যা মণি বাঁদিকে আসরে পেশ করলেন বিশু বেগ।

মাথায় সলমা চুমকি বসানো আসমানি ওড়না। পরনে জরির কাজ করা কাঁচুলি, পেশোয়াজ ও ঘাঘরা সজ্জিত, আসরে দাঁড়িয়ে মাথা নুইয়ে সকলকে কুর্নিশ জানায় মণি বাঁদি। আবির্ভাবেই বাজিমাত। মণি বাঁদির মুখের দিকে তাকিয়েই আমির-ওমরাহদের কলিজার খুন ছলকে ওঠে।

সুর তোলে বীণকার। গান ধরেন বিশু বেগ। তবলচি চাঁটি মারে তবলায়। সুর ছড়ায় সারেঙ্গি। নিমেষে নাচের ছন্দে ঝড় তোলে মণি। আশ্চর্য হয়ে যান বিশু বেগ। পাকা তওয়ায়েফওয়ালির মতো নাচের কায়দা, চোখের চাহনি, মরদের কলিজা থেকে খুন ঝরানোর এত ছলাকলা কী করে রপ্ত করল দেহাতের আনপড় এই মেয়েটা?

সামনের সারিতে বসে সিপাহসালার মিরজাফর খাঁ সাহেব একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন মণির মুখের দিকে। চোখের পলক পড়ে না। মণির দুচোখের চাহনি তার হৃদয়কে মাতাল করে দেয়।

পরের দিনই বিশু বেগের কুঠিতে এসে হাজির হন মিরজাফর। কোনও ভণিতা ছাড়াই সুবে বাংলার সিপাহসালার বলেন, 'মণিকে এক রাতের জন্য হারেমে নিয়ে যেতে চাই বাই সাহেবা।'

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট বুঝতে পারেন বিশু বেগ। তাঁর অহংবোধে আঘাত লাগে। এক সময়ে তামাম হিন্দুস্থানে বহু নবাব-বাদশার দরবারে মুজরো করেছেন বিশু বেগ। ভরা যৌবনে তাঁর রূপের কদরদারও কম ছিল না। কিন্তু

এমন কুৎসিত প্রস্তাব কেউ কখনও তার সামনে পেশ করার হিম্মত করেনি। বিশু বেগ সব সময় নিজের সম্ভ্রম বজায় রেখেছেন। সকলকে বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি একজন কলাকার। কসবি নন।

বিশু বেগকে চুপ করে থাকতে দেখে মিরজাফর খাঁ বলে ওঠেন, 'যা ইনাম চান, তাই পাবেন বাই সাহেবা।'

'ইয়ে নেহি হো সাকতা।' দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেন বিশু বেগ।

মিরজাফরের মুখের সব খুশির রং এক লহমায় মিলিয়ে যায়।

গলার স্বরটা বোধ হয় একটু বেশিই চড়ে গিয়েছিল। আর যাই হোক, মিরজাফর খাঁ ইমানদার আদমি। সুবে বাংলার সিপাহসালার।

বিশু বেগ পরক্ষণেই মাথা ঝুঁকিয়ে বলেন, 'গোস্তাকি মাফ করবেন হুজুর। আমরা কলাকার। কসবি নই। আমরা নাচ দেখিয়ে পয়সা কামাই। শরীর নিয়ে সওদা করি না।'

কেউ যেন সপাং করে চাবুক দিয়ে আঘাত করে মিরজাফরের মুখের উপর। তিনি বাক্যিহারা হয়ে গেলেন। মাথা নিচু করে উঠে দঁড়িয়ে রইলেন।

'আপনি সত্যিই মণিকে চান?' প্রশ্ন করেন বিশু বেগ।

চকিতে চোখ তুলে তাকান মিরজাফর। ব্যস্ত হয়ে জবাব দেন, 'জরুর।'

'মণিকে শাদি করে বেগমের ইজ্জত দিতে পারবেন?'

মুহূর্তের জন্য থমকে যান মিরজাফর। বেশ কয়েক বছর আগে ফৈজিকে দেখে মিরজাফর খাঁ মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তাকে নিয়ে রতিসুখে মেতে ওঠার কোনও উপায় ছিল না খাঁ সাহেবের। ফৈজি ছিল সিরাজের পিয়ারি। গতরাতের মেহফিলে মণি বাইয়ের নাচ দেখতে দেখতে ঘোর লেগেছিল মিরজাফরের চোখে। কে এই হুরি? ভাবে, ভঙ্গিতে, দেহের গড়নে ঠিক যেন ফৈজি।

সিপাহসালারকে নিরুত্তর দেখে তাঁর মুখের দিকে কৌতূহলী চোখে চেয়ে থাকেন বিশু বেগ।

ক্ষণিকের স্তব্ধতা ভেঙে মিরজাফর বলে উঠলেন, 'বেশ আমি রাজি। শাদিই করব মণিকে।'

মণির না হয় একটা গতি হয়ে গেল। কিন্তু কী হবে বব্বুর? বিশু বেগ এবারে একটা মোক্ষম চাল দিলেন। বললেন, 'মণি ও বব্বু দুজনেই আমার মেয়ে। দো বহেন। বব্বু আমার নিজের মেয়ে। মণিকে আমি লালন করেছি। মণিকে পেতে হলে বব্বুকেও শাদি করতে হবে আপনাকে। দুজনকেই বেগমের ইজ্জত দিতে হবে।'

মিরজাফর বললেন, 'মঞ্জুর। এ তো আমার খুশনসিব।'

সিরাজের শাদির অনুষ্ঠান মিটে যাওয়ার কিছুদিন পরেই ঘটা করে মণি বাই ও বব্বু বাইয়ের সঙ্গে মিরজাফরের বিয়ে হল। পুরুষের মন জয়ের ছলাকলায় মণির মতো প্রতিভা নেই বব্বুর। জাফরাগঞ্জের জেনানামহলের অন্দরে মামুলি আর পাঁচজন জেনানার মতো দিন কাটতে লাগল তার। বব্বু এতেই খুশি। সে জানে, না আছে তার মণির মতো রূপ, না আছে মায়ের মতো নাচের প্রতিভা। তবুও সে যা পেল, তা নিয়ে দুনিয়াদারের কাছে তার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

কিন্তু মণি বাই কিন্তু অন্য ধাতুতে গড়া। শুধু বিত্তে, গয়নায়, দিন গুজরানের নিরাপত্তায় তার মন ভরে না। গরিব ঘরে জন্মে একদিন পদে পদে লাঞ্ছিত হয়েছে মণি। আজ সে চায় তাগদ, জোশ, হুকুম করার ক্ষমতা।

কাছাকাছি কোথাও একটা পাখি খুব সুন্দর সুরে ডাকছে। মণি বেগমের হুঁশ ফেরে। এলোমেলো হাওয়ায় থিরথির করে কাঁপছে হিরাঝিলের জল। ঘরমুখো হন বেগম সাহেবা।

পলাশির যুদ্ধে হেরে পালিয়ে গিয়েছেন সিরাজদ্দৌলা। মসনদে বসতে চলেছেন মিরজাফর। বোকাসোকা বুড়ো মিরজাফরকে হাতের মুঠোয় রেখে চালনা করা তেমন কোনও কঠিন কাজ নয়, মণি বেগম বোঝেন। মিরজাফরের আড়ালে থেকে সুবে বাংলার শাসনযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান তিনি। আরও একটা খায়েশ আছে আছে তাঁর। নিজের গর্ভজাত পুত্র নজমউদ্দৌলাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে যাওয়া।

একদিন সুবে বাংলার নবাব হবে নজমউদ্দৌলা—এই সুখ কল্পনায় মণি বেগম রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন। তবে এর বাস্তব রূপায়ণ যে খুব সহজ নয়, একথাও বোঝেন বুদ্ধিমতী এই নারী। মিরজাফরের অবর্তমানে তাঁর বড় পুত্র মিরনই মসনদের প্রথম হকদার। কিন্তু খোদার কী খায়েশ তা কে বলতে পারে? এসব এলোমেলো নানা কথা ভাবতে ভাবতে হিরাঝিলের নৌকাঘাট থেকে প্রাসাদের দিকে ফিরে চললেন মণি বেগম। তার পিছন পিছন হাঁটতে থাকে বাঁদির দল।

'আম্মিজান।' দূর থেকে ছয় বছরের বালক নজমউদ্দৌলার চিকন গলার আওয়াজ ভেসে আসে।

মণি বেগম সচকিত হয়ে ওঠেন।

এই অচেনা পরিবেশে অনেকক্ষণ মাকে না দেখে উতলা হয়ে পড়েছিল নজমউদ্দৌলা। বাঁদির কোল থেকে জোর করে নেমে সে মায়ের দিকে দৌড়ে আসে।

মণি বেগম দুহাত বাড়িয়ে দেন। ছেলে এসে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

জাফরাগঞ্জের প্রাসাদটা পুত্র মিরন ও তাঁর পরিবারের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন মিরজাফর। তাঁর প্রথম বিবি, আলিবর্দির দুঃসম্পর্কের বোন শাহ্‌ খানম হিরাঝিলে যাননি। পুত্র মিরনের সঙ্গেই তিনি রয়েছেন।

পলাশি জয়ের খুশি মানাতে আলোয় মুড়েছে জাফরাগঞ্জ প্যালেস। মজলিশ বসছে রোজ। চলছে খানাপিনা আর হুল্লোড়। আতর, গুলাব, কাবাব, দুনিয়াজা শরাব সব মিলিয়ে এক উগ্র গন্ধে সবসময় ম-ম করছে জাফরাগঞ্জের প্রাসাদ। ইতর গোছের, বিকৃত রুচির দুই মোসাহেব চুনিলাল ও মুন্নিলালকে নিয়ে রোজ রাতে এখানে আসর জমিয়ে তোলে মিরন।

সারাদিন শহরে তাণ্ডব চালিয়ে সন্ধেবেলা জাফরাগঞ্জের মজলিশে হাজির হয় চুনিলাল ও মুন্নিলাল। শরাবের পাত্র হাতে নিয়ে তেল চপচপে ভাজা মাংস, গোস্তের দুনিয়াজা মৌজ করে চিবোতে চিবোতে তারা তাদের দৈনিক কুকর্মের খতেন পেশ করে নবাবজাদা মিরনের কাছে।

হররোজের মতো সেদিনও মজলিস জমে উঠেছিল জাফরাগঞ্জে।

শরাবের পাত্রে চুমুক দিয়ে চুনিলাল গর্বের সঙ্গে বলে, 'আজ তিন লেড়কিকে আপনার হারেমে নিয়ে তুলেছি। খুবসুরত চিজ। একেবারে তাজা গুলাব। খুশবুদার।'

মিরন চুনিলালের পিঠে একটা চাপড় মেরে বলে, 'বহুত আচ্ছা।'

'হুজুর খুশ, তো দুনিয়া খুশ।' খোশামুদে হাসি হাসে চুনিলাল।

গলায় শরাব ঢেলে মিরন বলে, 'খুশ আর কি করে থাকি চুনিলাল? আমার দিল জখম হয়ে আছে লুৎফুন্নেসার জন্যে। উয়ো হাসিনা ভেগে গেল।'

মুন্নিলাল বলে, 'সে তো জানি। লুৎফা বেগম হুজুরের কলিজা।'

চুনিলাল ভাজা মাংসের টুকরো চিবোতে চিবোতে বলে, 'ভেগে আর যাবে কোথায় হুজুর? জরুর পাকড়াও করবে কাসিদ রা। তারপর চালান হবে হুজুরের হারেমে। হারেমে একখানা ঘর সাজিয়েগুছিয়ে রেখেছি। গুলাবের পাপড়ি ছড়ানো বিছানায় লুৎফাকে নিয়ে আপনি খুশি মানাবেন।'

কামার্ত দৃষ্টি শূন্যে ভাসিয়ে মিরন বলে, 'লেকিন জিন্দা পাকড়াও হবে তো?'

চুনিলাল বলে, 'হবে হবে। খোদা মেহেরবান। বেশক হুজুরের খায়েশ পূরণ করবেন।'

চিন্তিত গলায় মিরন বলে, 'হারেমে আসতে যদি নারাজ হয়, বহুত জিদ্দি আওরত!'

চুনিলাল বলে, 'এ ক'দিনে জিদ্দি আওরত তো কম দেখলাম না হুজুর। সবাই তো আপনার হাতে পড়ে সিধে হয়ে গেল।'

মুন্নিলাল খ্যা খ্যা করে বিশ্রি রকম হেসে উঠে বলে, 'বহুত রগড় হবে। সিরাজের পিয়ারি হবে হুজুরের বাঁদি।'

'চুপ রহো বেওকুফ।' মুন্নিলালের মাথায় জবরদস্ত এক চাঁটি মেরে ধমকে ওঠে মিরন। মুন্নিলালের হাতে ধরা শরাবের পাত্র থেকে শরাব ছলকে পড়ে গালিচায়।

মিরন বলে, 'বাঁদি নয় বেগম হবে। শাদি করব।'

চুনিলাল বলে, 'ইয়ে তো জব্বর খুশি কা বাত। ফির হুজুরের শাদি হবে।'

মুন্নিলাল বলে, 'খানাপিনা হবে, মেহফিল হবে, ফূর্তি হবে।'

হঠাৎই ভয়ানক গম্ভীর হয়ে মিরন বলে, 'ফূর্তির আরও অনেক কিসিম আছে মুন্নিলাল। মওত নাচাব চেহেল সেতুনে। আলিবর্দির হর রিসতেদারের মওত।' এই বলে হিংস্র হাসিতে ফেটে পড়ে মিরন। চুনিলাল ও মুন্নিলালও সেই হাসিতে যোগ দেয়।

ঠিক তখনই হন্তদন্ত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করে মিরনের খাস গোলাম কাদির। তার চোখেমুখে ভয়ের ছাপ। গোলামের ত্রস্ত ভাব দেখে মিরনের ভুরু দুটো কুঁচকে যায়। সে শুধোয়, 'কেয়া হুয়া কাদির?'

'হুজুর হাতিয়ারবন্ধ গোরা পল্টন। প্রায় একশো জন। কুঠির দেউড়িতে।'

'গোরা পল্টন?' ভয় ধরে মিরনের চোখেমুখেও। চুনিলাল ও মুন্নিলালও ত্রস্ত।

'সঙ্গে তোপের গাড়িও আছে।'

মিরন, চুনিলাল ও মুন্নিলালের মেহফিলের মেজাজ, শরাবের নেশা ছুটে যায়।

একটা চিরকুট মিরনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে কাদির বলে, 'হিরাঝিল থেকে এসেছে।'

কাদিরের হাত থেকে চিরকুটটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরে মিরন।

মিরজাফরের হাতের লেখা চিনতে তার কোনও অসুবিধা হয় না। চিরকুটে লেখা আছে 'বেটা তুরন্ত একবার হিরাঝিল প্যালেসে এসো। এখনই। বহুত জলদি।'

৫

মেজর আয়ারকুট গর্জন করে উঠলেন। 'হোয়াট ডু ইউ থিংক? ক্যান ইউ ডু হোয়াটএভার ইউ ওয়ান্ট? হোয়াই দেয়ার ইজ কমোশন অল ওভার দ্য সিটি?'

ফারসিতে অনুবাদ করে শান্ত গলায় কথাটা বুঝিয়ে দিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস।

মিরজাফর নরম গলায় বললেন, 'আপনারা ভুল বুঝছেন। আমি এসবের কিছুই জানি না।'

হেস্টিংস বললেন, 'আপনি মসনদে বসবেন দু'দিন পরে। রাজধানীতে কী ঘটছে তা জানি না বলে তো আপনি জিম্মেদারি এড়াতে পারেন না।'

'রাজধানীর দেখভালের ভার আমি বেটা মিরনের হাতে দিয়েছিলাম।'

'হোয়াই ইজ হি মেকিং দ্য সিচুয়েশন সো কমপ্লিকেটেড?' আয়ারকুটের গলায় বিরক্তি।

হিরাঝিল প্যালেসের দরবার ঘর থমথমে। মাথা নিচু করে বসে রইলেন মিরজাফর।

'চুনিলাল-মুন্নিলাল কে? তাদের নামে ইতনা শিকায়ত কেন?' প্রশ্ন করলেন হেস্টিংস।

'আমার বেটা মিরনের দোস্ত ওরা।'

আয়ারকুট ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বললেন, 'কর্নেল ক্লাইভ ইজ ভেরি মাচ অ্যানয়েড উইথ অল দিজ আনওয়ান্টেড ট্রাবল্স।'

মিরজাফরের উদ্দেশে শান্ত গলায় হেস্টিংস বললেন, 'আপনি উড বি নবাব। এভাবে আম আদমির তকলিফ বাড়ালে তারা কি খুশদিলে আপনাকে কুর্নিশ জানাবে? যদি এই শারারতি চলতে থাকে তাহলে কর্নেল আসবেন না মুর্শিদাবাদে।'

চকিতে চমকে উঠে হেস্টিংসের পানে চাইলেন মিরজাফর।

হেস্টিংস বললেন, 'কাশিমবাজার থেকেই কর্নেল ফিরে যাবেন কলকাতায়। আপনার হয়ে কর্নেল লড়াই করেছেন পলাশিতে। কর্নেলের মদতে সিরাজদ্দৌলাকে হটিয়ে আপনি মসনদে বসতে চলেছেন। আগর আপনার জমানার শুরুয়াতেই যদি মুর্শিদাবাদ বেচ্যায়েন হয়ে ওঠে তার জিম্মেদারি তো কর্নেলের ঘাড়ে এসেও পড়বে।'

আয়ারকুট ধমকে উঠলেন, 'ইউ ক্যান্ট স্পয়েল দ্য গুড ইমেজ অফ কর্নেল।'

ওয়ারেন হেস্টিংস ফের মোলায়েম স্বরে বললেন, 'আপনার সুবা আপনি চালাবেন। এর মধ্যে মাথা গলানোর কোনও ইচ্ছে নেই কর্নেলের। কিন্তু তাঁর দিকটা ভেবে দেখুন। তিনি এখানে থাকাকালীন এই জুলমাত চলতে পারে না। এতে তিনি বেইজ্জত হচ্ছেন।

একদিকে তোপ দাগার মতো আয়ারকুটের তর্জন-গর্জন ও অন্যদিকে হেস্টিংসের মাখনের মতো মোলায়েম ভাষায় চালানো ছুরি, দুইয়ের মাঝে পড়ে মিরজাফরের অসহায় অবস্থা। মৃদু কণ্ঠে তিনি বললেন, 'আপনি কর্নেলকে বুঝিয়ে বলবেন। তিনি যেন গুসসা না করেন। মুর্শিদাবাদ আসতে নারাজ না হন। আমি জিম্মেদার থাকলাম। আর ঝুট ঝামেলা হবে না।'

এই সময় মিরন এসে প্রবেশ করল দরবার ঘরে। সঙ্গে চুনিলাল ও মুন্নিলাল। শরাবের প্রভাবে এদের সকলেরই চোখ জবাফুলের মতো লাল। তবে জাফরাগঞ্জ প্যালেস ও হিরাঝিল প্যালেসের বাইরে তোপের গাড়িসহ সঙিন হাতে তাগড়াই চেহারার গোরা পল্টনদের খাড়া থাকতে দেখে এদের নেশা ছুটে গিয়েছে।

দরবার ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পায়চারি করছেন আয়ারকুট। ওয়ারেন হেস্টিংস শান্ত, ধীরস্থির। বসে আছেন কুরসিতে। মিরজাফরের উলটো দিকে। দীর্ঘদেহী আয়ারকুটের কোমরের একদিক থেকে ঝুলছে তরবারি, আরেক কোমর থেকে ঝুলছে পিস্তল। মেজর আয়ারকুটের আগুনে চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে চুনিলাল ও মুন্নিলালের বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল।

কড়া চোখে মিরনের দিকে তাকিয়ে জবাবদিহি চাওয়ার ঢঙে মিরজাফর প্রশ্ন করলেন, 'শহরে এত জোরজুলুম চলছে কেন?'

মিরন জবাব দিল, 'পলাশির কামেয়াবির খুশিতে আমার দোস্তরা একটু ফূর্তি মানাচ্ছিল।'

ভুরু কুঁচকে গেল হেস্টিংসের। 'হোয়াট? ইউ আর কিলিং পিপল, অ্যাবিউজিং ওম্যান, ডেস্ট্রয়িং প্রপার্টি। একে বলে ফূর্তি মানানো?'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল মিরন। তার আগেই মিরজাফর ধমকে উঠলেন, 'খামোশ!'

মিরন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

চুনিলাল ও মুন্নিলালকে জরিপ করে আয়ারকুট প্রশ্ন করলেন, 'হু আর দিজ টু গাই?'

ভয়ে কাঁপতে লাগল চুনিলাল ও মুন্নিলাল। মিরন মৃদু গলায় বলল, 'মেরা দোস্ত। চুনিলাল আউর মুন্নিলাল।'

'ও! ইউ আর দ্য ইনফেমাস ডুয়ো বিহাইন্ড অল সর্টস অফ ট্রাবল্স।'

চুনিলাল ও মুন্নিলালের সামনে এসে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালেন আয়ারকুট। বললেন, 'লিসন কেয়ারফুলি। ইফ ইউ রেইজ হ্যান্ড এগেইনসট এনিওয়ান অফ আলিবর্দিস ফ্যামিলি, দেন কর্নেল ক্লাইভ উইল রুইন বোথ অফ ইউ।'

সাহেবের ভাষা বুঝতে না পেরে হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল চুনিলাল ও মুন্নিলাল। কথাটা এই দুজনের উদ্দেশে বলা হলেও আসল লক্ষ্য যে মিরজাফর ও মিরন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ফারসিতে কথাটা ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন হেস্টিংস।

তারপর জুতোর শব্দ তুলে দরবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন দুই সাহেব। ব্যস্ত হয়ে তাদের পিছন পিছন ছুটে এলেন মিরজাফর।

মিরনের সারা শরীর অপমানে জ্বলতে লাগল। চুনিলাল ও মুন্নিলাল নবাবজাদার মুখের দিকে তাকিয়ে তার অন্দরের উত্তাপের আঁচ পেল। সেই আগুনকে আর একটু উসকে দেওয়ার জন্য চুনিলাল বলল, 'ইয়ে তো মুশকিল কি বাত। নবাব কৌন হ্যায়? মিরজাফর খাঁ ইয়া কর্নেল ক্লাইভ?'

দাঁতে দাঁত চেপে মিরন বলল, 'কিছুদিন চুপচাপ থাকো তোমরা। তারপর দেখছি।'

হিরাঝিল প্যালেস থেকে বেরিয়ে আসার পথে এর বৈভব ও সমৃদ্ধি মন দিয়ে জরিপ করছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। সিরাজদ্দৌলার তৈরি এই প্যালেসের স্থাপত্য গৌরবের কথা তিনি শুনেছেন অনেকের মুখে। আগে কখনও দেখা হয়নি। পাকা জহুরির মতো চোখ বুলিয়ে থামের গড়ন, খিলানের নকশা সব মনের মধ্যে গেঁথে নিচ্ছিলেন তিনি। কোনওদিন যদি সুযোগ আসে তবে এরকম একটা প্যালেস গড়ে উপহার দেবেন স্ত্রী মেরিকে। কিন্তু এমন সৌভাগ্য কি তার হবে? এরকম একটা প্যালেস গড়তে গেলে যা বিত্তের প্রয়োজন, তা কোথায় পাবেন তিনি? কোম্পানির চাকরির বাঁধা মাইনেতে মনের মতো সাজানোগোছানো একটা বাংলোর মালিক হওয়াই যে দুষ্কর।

হঠাৎ এই রাতে হিরাঝিল প্যালেসে গোরা পল্টনদের আগমনে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন মণি বেগম। কী মতলব ইংরেজদের?

বাঁদি এসে জানাল, মিরজাফর খাঁ সাহেবের সঙ্গে কোনও ব্যাপারে আলোচনা করতে এসেছিলেন দুই সাহেব। তাঁরা ফিরে যাচ্ছেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মণি বেগম। বেগম মহলের চিলমনের আড়াল থেকে দেখলেন, মোরামের পথের উপর দিয়ে সদর দেউড়ির দিকে এগিয়ে চলেছেন দুই সাহেব। তাদের পাশে পাশে হাঁটছেন মিরজাফর। বাগানের ঝলমলে আলোয় তাদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ওয়ারেন হেস্টিংসের উপর চোখ আটকে গেল মণি বেগমের। সত্যিই সুপুরুষ যুবক এই সাহেব। মাথায় তেকোনা হ্যাটের নীচ থেকে নেমে এসেছে সোনালি চুল। হাঁটার ভঙ্গিতে প্রখর আত্মবিশ্বাসের ছাপ। বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। মণি বেগম অপলক চোখে হেস্টিংসকে দেখতে লাগলেন।

দেউড়ির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুটো পালকি। অপেক্ষা করছে কাহারের দল। পালকিতে ঢুকে পড়লেন হেস্টিংস। আরেকটা পালকিতে উঠলেন আয়ারকুট। কাহাররা পালকি দুটো উঠিয়ে দ্রুত সদর দেউড়ি দিয়ে বেরিয়ে গেল।

মণি বেগমের নজর থেকে হারিয়ে গেলেন হেস্টিংস সাহেব। বেগম সাহেবা অনুভব করলেন তাঁর বুকের রক্ত কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

আয়ারকুট ও হেস্টিংসের দৌত্যে কাজ হল। মুর্শিদাবাদের সর্বত্র যে নৃশংশতার আগুন জ্বালিয়েছিল মিরন, তা দ্রুত নিভে গেল। গুন্ডামি, রাহাজানি, লুঠতরাজ ছেড়ে গা ঢাকা দিল দুষ্কৃতিরা। শান্তি ফিরল রাজধানীতে।

গোরা ফৌজিদের এখন খোলাখুলি কুরনিশ জানাচ্ছে আমলোগ। তসলিম জানাচ্ছে গভীর কৃতজ্ঞতায়। বহু মানুষের জান ও দৌলত রক্ষা পেয়েছে কর্নেল ক্লাইভের সৌজন্যে—শহরের সর্বত্র একথা লোকের মুখে মুখে ফিরছে। শয়তানদের সবক শিখিয়ে ছেড়েছেন ক্লাইভ। তাঁর নির্দেশে ফৌজসহ আয়ারকুট ও হেস্টিংস এসে পড়তেই জুড়িয়ে গিয়েছে উত্তপ্ত শহর।

হ্যাঁ। কর্নেল ক্লাইভই মসিহা। তিনি থাকলেই সব ধাতে থাকবে, ছন্দে চলবে–মুর্শিদাবাদের অনেক ওমরাহের অন্তরের এই একিন এখন সাধারণ প্রজাদের মনেও শিকড় গেড়েছে। এর আন্দাজ পাচ্ছে চকবাজার। মানুষের মন কি বাত উড়ছে হাওয়ায়। কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে।

সিরাজদ্দৌলা অতীত। মুর্শিদাবাদ ছেড়ে চলে গিয়েছেন তিনি। তাঁর কী হল এ নিয়ে আমজনতার তেমন মাথাব্যথা নেই। কুরসি বদল তারা আগেও দেখেছে। পুরোনো জমানা চলে যায়, নয়া জমানা আসে। কেউ নবাব থেকে ফকির হয়, কেউ বা ফকির থেকে নবাব। কেউ বরবাদ হয়ে আঁধারে ডুবে যায়, কারও জিন্দেগি হয়ে ওঠে রংদার, তাগদ ও দৌলতের জলোয়ায় জেল্লাদার।

আমআদমি জানে, কুরসি বদল স্রেফ চেহেল সেতুনের অন্দরে, ক্ষমতার অলিন্দে পরিবর্তন আনে। এসবের সঙ্গে সাধারণ মানুষের দিন গুজারের কোনও সম্পর্ক নেই। জহমতে ভরা তাদের জীবনকে নয়া জমানা সহসা সুখের আফশাঁয় মুড়ে দেবে, এমন দুরাশা তারা করে না। সুবহ্‌শাম রুটিরুজির ভাবনা যাদের করতে হয়, তারা চায় কেবল চ্যায়েন—স্বস্তি। পলাশির লড়াইয়ের পরে সহসা জ্বলে ওঠা আগুনে জনগণের কপাল পুড়তে বসেছিল অনেকের। ক্লাইভের হস্তক্ষেপে তারা স্বস্তি পেয়েছে।

'সিচুয়েশন ইজ নর্ম্যাল। সাধারণ মানুষের মনে ইংরেজদের প্রতি কোনও অ্যাডভার্স ফিলিং নেই'—জানিয়েছিলেন আয়ারকুট। তবুও কোনও ঝুঁকি নিতে চান না কর্নেল ক্লাইভ। তিনি সতর্ক। তাঁর ইচ্ছায় ও মিরজাফরের হুকুমে নগরীর শান্তিরক্ষায় কোতোয়ালির সেপাইদের পাশাপাশি মোতায়েন হয়েছে গোরা পল্টন।

২৯ জুন ১৭৫৭ সাল। সকালের আলো ফুটতে না ফুটতেই চকবাজারে এসে ভিড় জমাচ্ছে অগণিত কৌতূহলী মানুষ। দুঃস্বপ্নের প্রহর কাটিয়ে গতকালই ছন্দে ফিরেছে চকবাজার। ফুলমান্ডির বিপণিগুলি রঙের বাহারে ফের ঝলমলে। আতর-গুলাল-মিঠাই-মোরব্বার দোকান আগের মতোই দ্রব্যসম্ভারে ঠাসা। কোনও কোনও দোকান উপচে মালের পসরা হুমড়ি খেয়ে প্রায় পথের উপরে এসে পড়েছে। আশপাশের সরাই, চটি থেকে ভেসে আসছে কাবাব, দুনিয়াজা, দমপোক্তের স্বাদু গন্ধ। দুধ, মালাই, শরবত, লস্যি বিকোচ্ছে দেদার। চবুতরার নীচে বসে গণৎকার-নজ্জুম, ফকির, দরবেশ মানুষকে ইয়াদদস্ত করে, করকোষ্ঠী বিচার করে ভবিতব্যের আন্দাজ দিচ্ছে। এ সবই খুশদিল চকবাজারের টুকরো টুকরো তসবির। খুবই পরিচিত।

আজ অবশ্য এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাড়তি কিছু। চাপা গলায় গুলতানিতে মশগুল লোকজন। তাদের চোখেমুখে উত্তেজনা। এ উত্তেজনা আতঙ্কের নয় কৌতূহলের। সকলেরই দৃষ্টি পথের দিকে। রোদের ঝাঁ-ঝাঁ উত্তাপ মাথায় নিয়ে লোকজন দাঁড়িয়ে থাকলেও কারও মধ্যেই বিরক্তির ভাব নেই। আছে কেবল জিন্দা তুজুক হয়ে ওঠা একটা মানুষকে একবার চোখে দেখার ছটফটানি।

পথের দুপাশে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে মিরজাফরের রিসালার সৈন্যরা। মোতায়েন রয়েছে দশাসই চেহারার সব গোরা পল্টনেরাও। তাদের হাতে ধরা সঙিনের মাথায় ঝকঝক করছে ভয় ও সম্ভ্রম জাগানো ইস্পাতের ফলা। কড়া নিরাপত্তার বেষ্টনীতে মুড়ে ফেলা হয়েছে রাজপথ। জনতা দাঁড়িয়ে আছে ফৌজিদের এই বেষ্টনীর পিছনে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এই পথ দিয়ে তিনি হেঁটে যাবেন। পলাশির যুদ্ধের ছয় দিন পর এই প্রথম কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ পা রাখতে চলেছেন মুর্শিদাবাদের মাটিতে। কাশিমবাজার থেকে মুর্শিদাবাদ নগরীর উপকণ্ঠ পর্যন্ত হাতির পিঠে চড়ে এসেছেন কর্নেল ক্লাইভ। সেখান থেকে ফৌজসহ পায়ে হেঁটে তিনি নগরীতে প্রবেশ করবেন।

'দূর বাস! দূর বাস!' বলতে বলতে কোড়া হাঁকিয়ে দৌড়ে গেল দুই ঘোড়সওয়ার।

হইচই পড়ে গেল চারিদিকে। এইবার তিনি আসছেন। এতদিন তার মুর্শিদাবাদে আসার নানা গুজব ডানা মেলে বাতাসে উড়েছে। এবারে সত্যিই আসছেন তিনি। চঞ্চল হয়ে উঠল পথের দু'পাশের লোকজন। পথের ধারে নিরাপত্তার বেষ্টনী তৈরি করা নিজামতের বরকন্দাজ ও গোরা পল্টন দুই দলই ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

দূর থেকে মিলিটারি ব্যান্ডে ভেসে আসছে বিলিতি গানের সুর। একেবারে সামনে ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে দুজন ঘোড়সওয়ার। তারা এগোচ্ছে পাশাপাশি। একটি ঘোড়ার পিঠে বসে আছে মিরজাফরের রিসালার একজন সেপাই। তার হাতে নিজামতের নিশান। পাশের ঘোড়াটির পিঠের সওয়ার জনৈক গোরা পল্টন। তার হাতে ধরে রাখা দণ্ডের মাথায় উড়ছে কোম্পানির ঝান্ডা। এদের পিছনে এগোচ্ছে ছোটখাটো একটা গোলন্দাজ বাহিনী। সঙ্গে রয়েছে দুটো ফিল্ড পিস কামান। গো-গাড়ির উপর চাপানো।

গোলন্দাজ বাহিনীর ঠিক পিছনে রয়েছে মিলিটারি ব্যান্ড। তার পিছনে দিশি সেপাইরা। হাতে ফ্লিন্টলক রাইফেল। তাদের পিছনে কর্নেল ক্লাইভ। তাঁর একপাশে মিরন ও আরেকপাশে জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ ও দেওয়ান রায়দুর্লভ। কর্নেলের ঠিক পিছনে হাঁটছেন মেজর কিলপ্যাট্রিক, মেজর গ্র্যান্ট, স্ক্র্যাফটন, ওয়ালশ, ওয়াটস, লাশিংটনসহ আরও অনেকে। সব শেষে রয়েছে গোরা পল্টনেরা। লোকজন হাঁ করে দেখছে ইংরেজবাহিনীর এই কুচকাওয়াজ। কৌতূহলী অসংখ্য, জোড়া জোড়া চোখ খুঁজছে কর্নেল ক্লাইভকে। জিন্দা তুজুক হয়ে ওঠা সেই মানুষটা কোথায়?

চকবাজারের পথ ধরে বেশ দ্রুত গতিতে হেঁটে চলেছেন ক্লাইভ। পরনে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা কোট ও ব্রিচেস। মাথায় হ্যাট। কোমরের একপাশে ঝুলছে পিস্তল। আরেক পাশ থেকে ঝুলছে তরবারি। প্রতি পদক্ষেপে ফুটে উঠছে প্রখর ব্যক্তিত্ব ও আত্মবিশ্বাস। তাঁর হাঁটার ছন্দের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছে মিরন। হাঁফ ধরেছে জগৎশেঠ ও রায়দুর্লভেরও।

রাস্তার পাশ থেকে গুঞ্জন উঠছে, 'ওই তো সাবিৎ জঙ্গ। ওই যে নবাবজাদা মিরনের পাশে।'

কামানের গাড়ির চাকার ঘড়ঘড় শব্দ ও ইংরেজবাহিনীর ভারী বুটের শব্দে চকবাজার যেন থরথর করে কাঁপছে। এদেশি লোকেরা নবাবকে যুদ্ধে যেতে দেখেছে। হাজার হাজার পদাতিক, বরকন্দাজ, বন্দুকচি, ধানুকি, লোকলস্কর, হাতি ঘোড়া উট, মুটে, মজুর বেলদার নিয়ে যুদ্ধে যায় নবাব। মেলা হইচই আর চিৎকার চেঁচামেচিতে চারিদিক কেমন যেন একটা গোল পেকে ওঠে। গোটা বাহিনী এগোয় বিশৃঙ্খল ভাবে। মনে হয় একের সঙ্গে অপরের যেন কোনও তালমিল নেই। যে যার খুশখেয়ালে চলেছে। কিন্তু ইংরেজ ফৌজের এই তিনশো দেশি সেপাই আর দু'শো গোরা পল্টন পা ফেলছে একসঙ্গে। গোটা ফৌজ এগোচ্ছে একই ছন্দে। এই অদৃষ্টপূর্ব শৃঙ্খলা দেখে জনতা অভিভূত।

হাঁটতে হাঁটতেই চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন কর্নেল ক্লাইভ। জরিপ করে নিচ্ছেন শহরটার মেজাজ। ক্লাইভের চোখে পড়ছে পথের দুপাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা পেল্লায় পেল্লায় সব ইমারত। পথের উপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়া চকবাজারের বিপণিগুলির সাজসজ্জা ও সেসবে মজুত উমদা পসরা দেখে কর্নেল স্তম্ভিত। মনে মনে ভাবছেন, সুবে বাংলার রাজধানীর এই জলুস ও জেল্লার কাছে হার মানবে লন্ডন নগরী। সুন্দর নকশায় গড়ে ওঠা পথের দুপাশের সুবিশাল হাভেলিগুলো স্পষ্টই বুঝিয়ে দিচ্ছে এখানকার রইস আদমিদের কড়ির জোর কতখানি।

নাহ্! একসঙ্গে এত বিত্তশালী লোকের বসবাস লন্ডন শহরে নেই, মনের গহীনে তারিফদারি থাকলেও ক্লাইভের অভিব্যক্তিতে তার কোনও বহিঃপ্রকাশ নেই। মুখটা অসম্ভব রকম গম্ভীর।

নহবত বাজছে ত্রিপলিয়া তোরণদ্বারে। ক্লাইভকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানাতে মিরজাফরের কোশিশে কোনও খামতি নেই। সানাইয়ের সুরের সঙ্গে মিলেমিশে যাচ্ছে মিলিটারি ব্যান্ডের আওয়াজ। বিচিত্র এই ঐকতান ছড়িয়ে দিচ্ছে খুশির বার্তা। এসে পড়েছেন ক্লাইভ। ইনকিলাব খতম। সিরাজদ্দৌলা অতীত। এবারে মসনদে বসবেন মিরজাফর।

ত্রিপলিয়া তোরণদ্বার পার হয়ে ক্লাইভ এগিয়ে চলেন নিজামত কেল্লার ঘাটের দিকে। সেখানে অপেক্ষা করছে সুদৃশ্য ময়ূরপঙ্খী বজরা। তাতে চড়ে ক্লাইভ যাবেন ওপারে। ফৌজসহ ঘাঁটি গাড়বেন মোরাদবাগ প্যালেসে।

‘গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম।’ কামানের গর্জনে সহসা কেঁপে উঠল গোটা নগরী। চমকে উঠলেন ক্লাইভও। মুহূর্তের জন্য কুঁচকে গেল তাঁর সোনালি ভুরুযুগল। হাঁটার গতি স্লথ হল কিছুটা।

রায়দুর্লভ জানালেন, ‘নিজামত কেল্লা তোপ দেগে আপনাকে সেলাম জানাচ্ছে।’

প্রসন্ন হলেন কর্নেল। মিলিয়ে গেল ভ্রুকুঞ্চন। মুখে দেখা দিল মৃদু হাসির রেখা। দূরে দেখা যাচ্ছে নিজামত কেল্লার মিনার, বুরুজ। সেদিকে তাকিয়ে মাথা থেকে টুপিটা খুলে নিয়ে সামান্য মাথা নোয়ালেন ক্লাইভ।

আমজনতা হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ল।

কেল্লার নৌকোঘাটে এসে বজরায় উঠলেন ক্লাইভ। বহরদারেরা দাঁড় বাইতে লাগল। ছাতে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে রইলেন ক্লাইভ। চোখে পড়ছে আড়ে-বহরে বিশাল, সুন্দর নকশায় গড়া মোরাদবাগ প্যালেস। সকালের রোদ্দুরে ঝকমক করছে আকাশের বুকে জেগে থাকা মার্বেল পাথরে মোড়া উদ্ধত মিনারগুলো। পাতলা লাল গৌড়ীয় ইটে গড়া প্রাসাদ। ইটের জায়গায় জায়গায় রয়েছে শ্বেতপাথরের বাহারি কাজ। জানলার জাফরিগুলোও শ্বেতপাথরের। পুব আকাশে সঞ্চারমান সূর্যের আলোয় গোটা প্রাসাদ যেন হাসছে।

ক্লাইভের মুখ থেকে অস্ফুট স্বরে বেরিয়ে এল একটা শব্দ। ‘বি-উ-টি-ফু-ল!’

পাশেই দাড়িয়েছিলেন জগৎশেঠ। কথাটা তাঁর কানে গেল। তিনি ঠোঁটে একটা মুচকি হাসি ঝুলিয়ে ক্লাইভের কথার রেশ ধরে বললেন, ‘সহি বাত। খুবসুরত মকান। ক’দিন আগেও ওটা ছিল দেওয়ান মোহনলালের হাভেলি।’

ক্লাইভ চকিতে মুখ তুলে জগৎশেঠের দিকে চেয়ে শুধোলেন, ‘মোহনলাল এখন কোথায়?’

‘ভেগেছে। লেকিন মোহনলালের বহেন হিরা বেগম গ্রেফতার হয়েছে। জানেন তো হিরা বেগমের সঙ্গে সিরাজদ্দৌলার আশনাই ছিল।’

এসব কেচ্ছাকাহিনি শোনার অভিপ্রায় নেই ক্লাইভের। তিনি প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে প্রশ্ন করেন, ‘আই থিংক সামবডি ইজ চেজিং বিহাইন্ড হিম?’

জগৎশেঠ বলেন, ‘বিলকুল। বেশক গ্রেফতার হবে মোহনলাল।’

দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন ক্লাইভ। তাঁর চোখে পড়ল আরও একটা প্যালেস। অনেকটাই ঢাকা পড়েছে সবুজের আড়ালে। তবে জায়গায় জায়গায় দ্বীপের মতো জেগে আছে গম্বুজ, মিনার, উঁচু চবুতরার আচ্ছাদন। ক্লাইভ শুধোলেন, ‘ওটা কোন প্যালেস?’

জগৎশেঠ জবাব দেন, ‘হিরাঝিল। আগে ছিল নবাব সিরাজদ্দৌলার প্যালেস। এখন মিরজাফর খাঁ দখল নিয়েছেন।’

হিরাঝিলের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থেকে ক্লাইভ বললেন, ‘ইট ইজ টু গুড।’

মহাতপচাঁদ অর্থাৎ জগৎশেঠ চোখের ইশারায় তাঁর দেওয়ান রণজিৎ রায়কে ডাকলেন।

রণজিৎ রায় এগিয়ে এলেন। পিছনে একজন দাখিলা। তাদের হাতে ধরা সুন্দর কাজ করা রুপোর একটা বড়সড় রেকাবি। তার উপরে রয়েছে মণিমুক্তো খচিত একটি সুদৃশ্য পানপাত্র।

মহাতপচাঁদ জোড় হাত হয়ে বলেন, ‘আপনার জন্য আমার তরফ থেকে মামুলি এক তোফা।’

ক্লাইভ পানপাত্রটা নেড়ে চেড়ে দেখলেন। তাঁর চোখেমুখে ফুটে ওঠে তারিফির ভাষা।

মহাতপচাঁদ হেসে বলেন, ‘আপনার জন্য অনেক কসরত করে জোগাড় করেছি।’

ক্লাইভ মুচকি হেসে পানপাত্রটা আবার রুপোর রেকাবির উপরে রেখে দেন।

জগৎশেঠ অবাক হওয়া গলায় প্রশ্ন করেন,‘পসন্দ হয়নি আপনার?’

‘এসবের জরুরত নেই শেঠজি। নতুন নবাবকে মসনদে বসাতে এসেছি। সুবে বাংলায় আইনের শাসন চালু করাই আমার মুসিবত। আমরা চাই চ্যায়েন—শান্তি। যাতে বিনা তকলিফে সওদা করতে পারি।’

মহাতপচাঁদ বেশ অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'ইয়ে তো মামুলি এক তোফা।'

জগৎশেঠের কথার জবাব না দিয়ে ক্লাইভ এগিয়ে গেলেন সামনে। কাঠের রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন ওপারের দৃশ্য। মনে মনে বললেন, শেঠজি, তোমার চেয়ে আমি কয়েকশো গুণ ধুরন্ধর। বেওকুফ ঠাওরিও না আমায়। শুধু দামি তোফা দিয়ে রবার্ট ক্লাইভকে ভোলাতে পারবে না। আমার লক্ষ্যটা অনেক বড়। কী ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে আমার মনের মধ্যে, তার নাগাল পাওয়া এখনই তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।'

মোরাদবাগ প্যালেসের নৌকোঘাটের খুব কাছে এসে পড়েছে বজরা। নহবতখানা থেকে ভেসে আসছে সানাইয়ের সুর। ক্লাইভকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ঘাটে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মিরজাফর খাঁ ও অনেক গণ্যমান্য ওমরাহ্।

বজরা থেকে নেমে এলেন ক্লাইভ। বেজে উঠল কাড়ানাকাড়া। গর্জন করল তোপ। কান ফাটানো শব্দে আকাশবাতাস কেঁপে উঠল। বজরা থেকে নেমেই ক্লাইভ দেখলেন, ঘাট থেকে প্যালেসে যাওয়ার পথে বিছানো রয়েছে লাল গালিচা। এর উপর দিয়ে তাঁকে হেঁটে যেতে হবে।

৬

সুলুপ-পানসি-বজরা নিয়ে গড়া এক নৌবহর ভাগীরথীর জলরাশি তোলপাড় করে এগিয়ে চলেছে। পলাতক নবাবের খোঁজে ফৌজসহ রাজমহল অভিমুখে চলেছেন মিরকাশিম।

এখনও মুর্শিদাবাদের দরবারি রাজনীতির অলিগলিতে মিরকাশিমের নাম খুব একটা আলোচিত নয়। স্বনামে পরিচিত হওয়ার মতো তেমন কোনও কীর্তিস্তম্ভও তাঁর নামের পিছনে নেই। লোকে তাঁকে মিরজাফরের দামাদ বলেই চেনে।

মিরকাশিমের পয়দায়িস ও পরবারিস পাটনা শহরে। পাটনার কাছে লোহানিপুরের একজন ছোটখাটো জায়গিরদার ছিলেন তাঁর আব্বাহুজুর রাজি খান। পরদাদা ইমতিয়াজ খাঁ ইস্পাহান থেকে সপরিবারে এদেশে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন পড়িলিখি বুজুর্গ আদমি, নামজাদা এক শায়ের। কিছুদিন পাটনার দেওয়ানের পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পরিবারে লেখাপড়ার চর্চা থাকায় মিরকাশিমও অনেকটা লেখাপড়া শিখেছেন। গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত। সৎ চরিত্র, বড়ে খানদান দেখে তাঁর সঙ্গে মিরজাফরের বেটি ফতিমা বিবির বিয়ের রিসতা পাকা করেছিলেন স্বয়ং নবাব আলিবর্দি খাঁ। প্রচুর যৌতুক তিনি দিয়েছিলেন নবদম্পতিকে। সেই সঙ্গে তিনি মিরকাশিমের জন্য ধার্য করেছিলেন দুশো টাকা মাসোহারা।

মিরকাশিম হিসেবি মানুষ। খুবই সাদামাঠা তার দিন গুজরানের তরিকা। অন্যান্য ওমরাহদের মতো সিরাজি ও জেনানার প্রতি তেমন তীব্র ঝোঁক তাঁর নেই। তিনি পয়সা ওড়ানোর চেয়ে সঞ্চয়ে বেশি মনোযোগী। এই গুণের জন্য উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি ও সামান্য মাসোহারা নিয়েই তিনি যথেষ্ট বিত্তশালী।

সিরাজদ্দৌলাকে মসনদচ্যুত করার জন্য গোটা দরবার যখন উত্তাল, নসিবের চাকা ঘোরানোর জন্য জীবনজুয়ায় মত্ত মনসবদার, বেনিয়ান, ওমরাহ, জমিদারেরা, ইনকিলাবের ডামাডোলে কে কত মুনাফা লুঠতে পারে, তার হিসেব হিসেবনিকেষে তাঁরা যখন মহাব্যস্ত, মিরকাশিম তখন এসব থেকে অনেক দূরে। আবেগে ভেসে হঠকারিতা করার মতো মানুষ তিনি নন। মিরকাশিম পা ফেলতে পছন্দ করেন গণিতের সূত্রে বাঁধা ছকে, একেবারে ঠান্ডা মাথায়, হুশিয়ার আদমির মতো রীতিমতো তজবিজ করে। যাতে লোকসানের ঝুঁকিটা কম হয়।

তবে পলাশির প্রান্তরে ইনকিলাব ঘটে যাওয়ার পর থেকে মিরকাশিমের মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মসনদে বসতে চলেছেন শ্বশুর মিরজাফর খাঁ। এবার দরবারে বড় একটা পদ জুটতে পারে। না—শুধু এই নয়, মিরকাশিমের মনের গভীরে রয়েছে আরও কিছু। মিরজাফরের বয়স হয়েছে। কতদিন নবাবগিরি করতে পারবেন তার ঠিক নেই। মিরন মূর্খ, নালায়েক। মিরজাফরের অবর্তমানে মসনদে বসে রাজ্যপাট চালানো মিরনের পক্ষে আদৌ সম্ভব কি? তাহলে তো বাংলার ভবিষ্যৎ...না! এখনই এতটা ভাবতে রাজি নন মিরকাশিম। বিচক্ষণ এই মানুষটা বোঝেন সহসা উচ্চাকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ তাঁর জীবনের পক্ষে খতরনক হয়ে উঠতে পারে। পা ফেলতে হবে চুপিসারে, কৌশলে। উপযুক্ত সময়ের জন্য ইন্তেজার করতে হবে। গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান অনুকূল কি না, তা যাচ-ইমতেহানি করে দেখতে হবে। তবেই তো নিশ্চিত হবে কামেয়াবি। এই হল মিরকাশিমের জীবনদর্শন।

তবুও থেকে থেকে অস্থির হয়ে উঠছে তাঁর মন। ভাবীকালের গর্ভে কী আছে তা জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন মিরজাফরের দামাদ। বজরার ভিতর নিজের কক্ষে ফরাসের উপর বসে ফরসির নল মুখে দিয়ে চিন্তিত মুখে চেয়ে আছেন সামনে বিছানো কাগজে আঁকা নিজের রাশিচক্রের উপর। কপালে ভাঁজ। ময়ূরের

পালকের কলমটা কালিতে চুবিয়ে আঁকিবুঁকি কাটছেন কাগজের উপরে। গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান অনুকূলে আসতে কত দেরি, সেই হিসেব কষে চলেছেন মিরজাফরের দামাদ। পাশে পড়ে রয়েছে জ্যোতিষশাস্ত্রের মোটামোটা পুঁথি—তালেনামা।

অনেকক্ষণ বই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে চোখদুটো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তার উপরে আলো কমে এসেছে ঘরে। খানিকবাদে দাখিলারা এসে আলো জ্বেলে দেবে ঘরে। একটানা বসে কাজ করতে করতে পিঠটাও কেমন যেন ব্যথা ব্যথা করছে। লেখাপড়ার সরঞ্জাম গুটিয়ে রেখে বজরার উন্মুক্ত পাটাতনের উপরে এসে দাঁড়ালেন মিরকাশিম।

সন্ধে নামতে আর বেশি দেরি নেই। মেঘ জমেছে পশ্চিমাকাশে। বৃষ্টি এল বলে। বজরা-সুলুপ-পানসি সবই পাড়ের দিকে ঠেলছে মাঝি-মাল্লারা। আজকের মতো যাত্রা সাঙ্গ হল। আবার চলা শুরু হবে কাল ভোরে।

মিরকাশিমের অধীনে স্থলসেনারা নৌবহরের সঙ্গে তালমিল রেখে নদীর তটরেখা বরাবর এগোয়। স্থলবাহিনীর কাসিদরা ঘোড়া দাবড়ে সারাদিন বিভিন্ন এলাকা ঘুরে পলাতক নবাব সিরাজদ্দৌলার খোঁজ করে বেড়ায়। দিনের শেষে নৌবহর যেখানে নোঙর করে সেখানে পৌঁছে মিরকাশিমের কাছে সারাদিনের কাজের খতেন পেশ করে।

প্রত্যেকদিনই আশায় আশায় থাকেন মিরকাশিম। আজ বুঝি কাসিদরা কোনও খুশির খবর আনবে। কিন্তু দিনের শেষে একরাশ অবসাদ ও হতাশা মিরকাশিমকে গ্রাস করে। তার সামনে এসে কাসিদরা মাথা ঝুঁকিয়ে চেয়ে থাকে ভূমির দিকে। না এখনও সিরাজের কোনও খোঁজ মেলেনি। জ্যোতিষের পুঁথি ঘেটে মিরকাশিম গণনা করে জেনেছেন সামনে তার শুভ সময় আসছে। কিন্তু যে কাজের গুরুভার মিরজাফর তার কাঁধে চাপিয়েছেন সে কাজে সফল হতে না পারলে আদৌ তার নসিবের চাকা ঘুরবে কি? কোথায় সিরাজদ্দৌলা?

মিরকাশিম চিন্তিত মুখে মেঘে ছাওয়া আকাশের দিকে চেয়ে থাকেন।

হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দুলে উঠল নৌকাটা। ভয় পেয়ে সিরাজের হাতটা চেপে ধরল লুৎফুন্নেসা। লুৎফার কোলে মধ্যে ঘুমন্ত উম্মেসায়েরা ঘুম থেকে জেগে উঠে কেঁদে উঠল। তাকে শান্ত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল লুৎফা।

সিরাজদ্দৌলা ব্যস্ত গলায় মাঝিদের উদ্দেশে শুধোলেন, 'কী হল?'

উত্তরের অপেক্ষা না করে দ্রুত ছইয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন সিরাজ। হতাশ গলায় মাঝিদের দলপতি কওসর জানাল, 'নৌকা চরায় আটকে গিয়েছে হুজুর।'

'হায় আল্লা! সর্বনাশ। কী হবে এখন?' আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সিরাজ।

চারজন মাঝি বেশ কিছুক্ষণ কসরত করে আটকে যাওয়া নৌকোটাকে ফের ভাসালো জলে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন সিরাজদ্দৌলা। প্রশ্ন করলেন, 'এটা কোন জায়গা?'

কওসর জানায়, 'নজদিকে নাজিরপুরের মোহনা হজরত।'

'তাহলে তো রাজমহল প্রায় এসেই গিয়েছি। দ্রুত এগিয়ে চলো।'

'লেকিন হুজুর—' কথা অসমাপ্ত রেখে মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কওসর।

'কী হল?' সিরাজের গলায় প্রকাশ পেল বিরক্তি।

'সামনে আর এগোনো যাবে না।'

'কী?' সিরাজের গলাটা বেশ চড়ে যায়। প্রশ্নের ভঙ্গিতে পুরোনো শাহি মেজাজের ছায়া পড়ে। কওসর কেঁপে ওঠে।

'গুস্তাকি মাফ করবেন হজরত। নাও বাওয়ার জন্য জেয়াদা পানি নেই দরিয়ায়।' গুজারেশ করে কওসর।

সিরাজের মুখ এক নিমেষে অন্ধকার হয়ে যায়। কওসরকে প্রশ্ন করে জানলেন, নাজিরপুরের মোহনা এখান থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ। মোহনায় পৌঁছতে পারলে গঙ্গা বেয়ে রাজমহল একেবারে নাগালের মধ্যে। সেখান থেকে উট বা ঘোড়ার পিঠে চেপে পাটনা পৌঁছতে তেমন কিছু তকলিফ হবে না। সিরাজ ভাবেন, তার চিঠি পেয়ে জাঁ ল এতক্ষণে নিশ্চয়ই পাটনা ছেড়ে মুর্শিদাবাদের পথে রওনা হয়ে গিয়েছেন। পথেই ল সাহেবের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। সবই পরিকল্পনা মতো এগোচ্ছিল, হঠাৎই বাধ সাধল নদী।

অসহায় গলায় সিরাজ শুধোলেন, 'কী হবে কওসর? উপায় কী?'

'এখানে অপেক্ষা করা ছাড়া কোনও উপায় নেই হজরত। তেজ বারিস না হলে নাও বাওয়ার পানি মিলবে না।'

সিরাজ চকিতে আসমানের পানে চাইলেন। এক চিলতে মেঘ নেই আকাশে। কবে তেজ বারিশের হদিশ মিলবে কে জানে। দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠেন সিরাজ।

কওসর বলে, 'নজদিকে একটা গ্রাম আছে হজরত। সেখানে গেলে হয়তো দানাপানি মিলবে।'

দানাপানির কথায় সহসা যেন হুঁশ ফিরল সিরাজের। সঙ্গের রসদ শেষ হয়ে গিয়েছে। গত তিন দিন ধরে তিনি, লুৎফা ও উম্মেসায়েরা তিনজনেই অভুক্ত। হিরাঝিলের আয়েশ-আসরতে যাদের দিন-গুজরান করার কথা সিরাজের বদ-কিসমতির ভাগীদার হয়ে তারা আজ বেসাহারা হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। মাথার উপর ছাত নেই, পেটে ভাত নেই। তিনিই তো দায়ী এ জন্যে। সিরাজের দুচোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে।

হুকুমের ইন্তেজারে জোড় হাত করে সামনে দাঁড়িয়ে আছে কওসর। তার দেহেও ক্লান্তির ছাপ। অভুক্ত অন্যান্য মাঝি-মাল্লাদের শরীরেও যেন আর দাঁড় বাওয়ার এক বিন্দু শক্তিও নেই। খিদের জ্বালায়, ক্লান্তিতে সব ধুকছে। আহারের সংস্থান করা এখন সবচেয়ে জরুরি।

সিরাজদৌলা হুকুম করলেন, 'পাড়ে নৌকা ভেড়াও কওসর।'

'জি হজরত।'

সত্যিই নদীতে জল খুব কম। লগা দিয়ে ঠেলে নৌকোটাকে পাড়ের দিকে নিয়ে গেল কওসর ও তার সঙ্গী তিনজন মাঝি। লুৎফা ও উম্মেসায়েরাকে নিয়ে পাড়ে নামলেন সিরাজদ্দৌলা।

পাড়ে নেমে গ্রামের কোনও চিহ্ন দেখতে পেলেন না সিরাজদ্দৌলা। যদিও কওসর বলেছিল কাছেই একটা গ্রাম আছে। চারিদিকে শুধু ঘন ঝোপ আর জঙ্গল। এদিকে বেলা ফুরিয়ে আসছে। রাত কাটানোর জন্য আশ্রয় দরকার। তার চেয়েও জরুরি আহার জোগাড় করা। কওসরের জিম্মায় বেগম লুৎফা ও বেটি উম্মেসায়েরাকে বসিয়ে রেখে সিরাজ গেলেন জনবসতির সন্ধানে।

একটা ঝাঁকড়া বটগাছের গায়ে ঠেস দিয়ে বসল ক্লান্ত লুৎফা। তার কোলে নিস্তেজ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তিন দিনের অভুক্ত উম্মেসায়েরা। তার গায়ে পরম মমতায় হাত বোলাতে থাকে লুৎফা। কী বুঝদার এই একরত্তি মেয়ে! আব্বাজানের বদ-কিসমতির আন্দাজ তার শিশুমনও নিশ্চয়ই পেয়েছে। কষ্টকর এই নৌযাত্রায় উম্মেসায়েরা বিশেষ বিরক্ত করেনি। অভুক্ত থাকলেও খিদেয় কাঁদেনি। কখনও সিরাজের কোলে, কখনও লুৎফার কোলে চুপ করে শুয়ে থেকেছে। মাথাটা সামনে ঝুঁকিয়ে উম্মেসায়েরার কপালে চুমু খায় লুৎফা।

সন্ধের মুখে ঘরে ফিরছে পাখিরা। তাদের কিচিরমিচির শব্দে চারিদিক একেবারে মুখর হয়ে উঠেছে। সিরাজ যে-পথে আশ্রয় ও আহারের সন্ধানে গিয়েছেন সে দিকে চেয়ে লুৎফা ভাবতে থাকে, শয় শয় গোলাম-বাঁদিরা যার হুকুমের অপেক্ষা করেছে, ছেলেবেলা থেকে যে কোনও কিছু চাইতে না চাইতেই খিদমতদারেরা সব কিছু এনে যার সামনে হাজির করেছে, চাঁদ পেড়ে আনতে বললেও, তা পালন করার জন্য জান কবুল করেছে বান্দারা, সেই সিরাজ আজ সাধারণ এক মরদের মতো বেটি ও বিবির জন্য আশ্রয়

আর আহার্যের সন্ধান করে বেড়াচ্ছে অচেনা এক গাঁয়ে। সিরাজের বদনসিবের কথা ভেবে দুঃখে ভরে ওঠে লুৎফার মনটা। মসনদই তো সিরাজের মুসিবতের মূল কারণ।

লুৎফা ভাবে, আহা, সিরাজ যদি আলিবর্দির নাতি না হয়ে, নবাব না হয়ে সামান্য এক মরদ হত, এমন একটা অচিন গাঁয়ে সিরাজের সঙ্গে যদি ঘর বাঁধতে পারত সে, আর পাঁচজন আদমি ও আওরাত দেহাতে যেভাবে ঘর বাঁধে ঠিক সে ভাবে, তাহলে কত নিবিড় ভাবে কাছে পাওয়া যেত সিরাজকে। মসনদ মানেই তো রক্ত, কাঁটা, ষড়যন্ত্র! নবাব-বাদশার জীবনের চেয়ে আমআদমির জীবন খারাপ কীসে? সে জীবনে অর্থের অভাব থাকলেও সুখ তো কিছু কম নেই। বাংলা মুলুক ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে, মিরজাফর ও ইংরেজদের নাগালের বাইরে চলে গিয়ে কোনও একটা অচেনা জায়গায় ঘর বেঁধে সে আর সিরাজ কি একটা সুখের ঘর গড়ে তুলতে পারে না? পরক্ষণেই নিজেকে ধিক্কার দেয় লুৎফা। কী স্বার্থপরের মতো ভাবনা তার। শুধু একান্তভাবে কাছে পাওয়ার জন্য মামুলি এক মরদের মতো সিরাজকে কি সে বেঁধে রাখতে পারে?

আজ না হয় ভাগ্যের পরিহাসে সিরাজ মসনদচ্যুত। কিন্তু পাটনার নায়েব রামনারায়ণের মদত ও ফরাসিদের সাহায্য পেলে আবার হয়তো অচিরেই বাংলার মসনদ দখল করবে সিরাজ। আকাশের দিকে মুখ তুলে দোয়া মাঙে লুৎফা– হে সর্বশক্তিমান আল্লা! তাই যেন হয়। সিরাজের জিন্দেগি ফের শান-শওকত-রওশনে ভরিয়ে দাও।

ঠিক তখনই কাছাকাছি কোথাও ডেকে ওঠে একটা হুতোম প্যাঁচা। বড় মনহুস আওয়াজ। লুৎফার বুক কেঁপে ওঠে। আঁধার নেমে আসছে দ্রুত। কোথায় গেল সিরাজ?

কিছুদূর এগোনোর পর একটা মসজিদ দেখে আশান্বিত হয়ে উঠলেন সিরাজদ্দৌলা। মসজিদ যখন আছে তখন নিশ্চয়ই মুসাফিরদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থাও থাকবে। সামনে এগিয়ে গিয়ে কয়েক ধাপ মাটির সিঁড়ি বেয়ে মসজিদের দাওয়ায় উঠলেন সিরাজদ্দৌলা। চারিদিক নিঝুম। কোনও জনমানবের অস্তিত্ব নজরে পড়ছে না। মসজিদের দরজায় হুড়কো লাগানো রয়েছে।

খানিকটা হতাশ হয়ে মসজিদের দাওয়া থেকে নেমে এলেন সিরাজ।

'কে আপনি? কাকে খুঁজছেন?'

প্রশ্নটা শুনে চমকে গিয়ে সিরাজ ঘুরে তাকালেন।

দেখলেন অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন মাঝবয়সি একজন মানুষ। পরনে কালো রঙের খিরকা। তার উপরে রঙবেরঙের কাপড়ের টুকরো দিয়ে তাপ্পি মারা রয়েছে। লোকটির মুখে রুক্ষ দাড়ি। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। চুল ও দাড়িতে পাক ধরেছে। তাঁর দুচোখের কৌতূহলী দৃষ্টি সিরাজের মুখের উপরে স্থির হয়ে রয়েছে।

সিরাজ এগিয়ে গেলেন তার দিকে।

লোকটি শুধোয়, 'কে আপনি? কোত্থেকে আসছেন?'

জবাবে সিরাজ বলেন, 'আমি এক মুসাফির। আসছি জাহাঙ্গিরনগর থেকে। যাব সাসারাম। নদীতে পানি নেই। আর এগোতে পারছি না। চরায় নৌকো আটকে গিয়েছে, তাই এখানেই নেমে পড়লাম। সঙ্গে জেনানা ও মাসুম বাচ্চা আছে।'

'কোথায় তারা?' কৌতূহলী গলায় প্রশ্ন করে লোকটি।

'নদীর ধারে বসিয়ে রেখে এসেছি। আমাদের একটু আশ্রয় দেবেন?'

'আপনি তো আচ্ছা বেওকুফ আদমি। জেনানা, বাচ্চা নিয়ে ভেসে পড়েছেন দরিয়ায়। এই সময় এখানে যে নাহানে পানি থাকে না, তা জানতেন না?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দুদিকে মাথা নাড়েন সিরাজ। দেহভঙ্গিতে ঝরে পড়ে হতাশা।

লোকটি বলে, 'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে বড্ড তকলিফের মধ্যে আছেন।'

সিরাজ বললেন, 'রসদ ফুরিয়ে গিয়েছে। আমরা গত তিন দিন ধরে দানাপানি জোটেনি।'

'সে কী?' চমকে ওঠে লোকটি।

'আমার বেটির উমর তিন সাল। সেও ভুখা রয়েছে।'

লোকটি ব্যস্ত হয়ে বলে, 'বলছেন কী? আপনি শিগগিরই পরিবারকে এখানে নিয়ে আসুন। মসজিদের পিছন দিকে একখানা ঘর আছে। ওটাই মুসাফিরখানা।'

এ কথা শুনে খুশি হয়ে সিরাজ বলেন, 'বহুত সুক্রিয়া।'

লোকটি ফের বলে, 'কেউ তো বড় একটা আসে না এ তল্লাটে। ঘরখানা পড়েই থাকে। ভাঙাচোরা ছোট্ট একখানা ঘর। পরিবার নিয়ে থাকতে হয়তো আপনার তকলিফ হবে।'

'না না কোনও তকলিফ হবে না। যা পাওয়া যাচ্ছে এই আমাদের কাছে অনেক।'

'তবে আলাদা রসুই ঘর আছে। কুয়োতলাও আছে।'

'এ তো দিব্যি ব্যবস্থা। জলদি সামান্য কিছু আহারের আনজাম করতে পারেন?'

'জরুর। এই গরিবখানায় আপনার যত্নআত্তির কোনও ত্রুটি হবে না। এখনই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। যতক্ষণ না নদীতে নাও বাওয়ার পানি পাচ্ছেন ততদিন এখানেই থাকুন। আমি ভবঘুরে লোক। ঘুরে ঘুরে বেড়াই। আজ এখানে থাকি তো কাল আরেক জায়গায়। তবে আপনার ভাবনার কোনও কারণ নেই। সেলিমের ঘর কাছেই।'

'সেলিম কে?'

'আমার মুরিদ। সেই আপনাদের দেখভালের সব আনজাম করবে।'

সিরাজ মৃদু গলায় বলেন, 'বহুত বহুত সুক্রিয়া। আপনার পরিচয়?'

লোকটি হাসে। 'কী পরিচয় দেব? আমি একজন ফকির। বলতে পারেন আমি খোদাতালার পথের রাহী।'

সিরাজ শুধোন, 'শুভ নাম?'

'পিরজাদা শাহদানা।'

৭

রাত গভীর। আজ পূর্ণিমা। চরাচর জ্যোৎস্নায় মাখামাখি। তিরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে বোকাইনগর দুর্গের দিকে ছুটে চলেছে এক ঘোড়সওয়ার।

ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত বোকাইনগর দুর্গ, ময়মনসিংহের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত। দুর্গ এখন অবশ্য নামেই। জঙ্গলাকীর্ণ এলাকার মধ্যে কোনওরকমে এখনও অস্তিত্ব গৌড়ীয় ইট ও মাটি দিয়ে গড়া প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত এই সৌধ। এক সময়ে পরিখা বেষ্টিত দুর্গের প্রাকার মাটির মোটা প্রলেপ দিয়ে খুব মজবুত করে গড়া হয়েছিল। কালের যাত্রাপথে সেই মাটির প্রলেপ খসে পড়ে এখন ইট বেরিয়ে পড়ছে। কোনও কোনও জায়গায় প্রাকার সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে দুর্গের অভ্যন্তরকে বেআব্রু করে দিয়েছে। কথিত আছে বোকাই নামে এক কোচ-উপজাতি প্রধান এই দুর্গটি নির্মাণ করেন। তাঁর নামেই দুর্গের নাম। পরে পাঠানদের হাত ঘুরে জাহাঙ্গিরের আমলে এই দুর্গ মোগলদের দখলে আসে।

নদীর চরের অদূরে একটা উঁচু ঢিবির উপরে দুর্গ। একসময় সুবাদারের বিরাট এক বাহিনী মজুত থাকত এখানে। ঢাকা থেকে রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরের পর বোকাইনগর কেল্লার গুরুত্ব কমে যায়। বর্ষাপ্রধান

অঞ্চলে বাংলা ইট ও মাটি দিয়ে গড়া কেল্লাটা ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে পুরোপুরি ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। শেষে পরিত্যক্ত হয়ে যায়।

পরিত্যক্ত সেই ইমারত এখন পুরোপুরি ভেঙে পড়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাথার উপর ছাত অটুট থাকলেও জরার চিহ্ন এর দেহের সর্বত্র। চারিপাশ দিয়ে বেড়ে ওঠা আগ্রাসী সবুজ এই কেল্লাকে পুরোপুরি প্রায় আচ্ছাদিত করে ফেলেছে। দূর থেকে এর অস্তিত্ব বিশেষ চোখে পড়ে না।

পলাশির যুদ্ধের পর পাঁচ বছরের শিশুপুত্র শ্রীমন্তলালকে নিয়ে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে পালিয়ে আসেন মোহনলাল। তাঁর সঙ্গে অনুগমন করে দুই দেহরক্ষী ও বহুদিনের বিশ্বস্ত সহচর বাসুদেব। দিনদুয়েক হল এই পরিত্যক্ত দুর্গে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন।

স্যাঁতস্যাঁতে মেঝেতে বিছানো শুকনো ঘাসের উপর সুজনির মতো বিছানো রয়েছে কলাপাতার আচ্ছাদন। তার উপরে শুয়ে ঘুমে অচেতন শ্রীমন্তলাল। মশালের আলোয় বড় মলিন দেখাচ্ছে মুখখানা। পাশে বসে পরম মমতায় তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন মোহনলাল। দুই রক্ষী বন্দুক হাতে বাইরে মজুত আছে পাহারায়। বাসুদেব গিয়েছে রসদের সন্ধানে। এখনও ফিরল না। গত দুদিনে আহার্য বলতে জুটেছে সামান্য কিছু বুনো ফল।

সন্ধের দিকে করুণ মুখে একবার ভাত চেয়েছিল খিদেয় কাতর শ্রীমন্তলাল। কথাটা শুনে সুবে বাংলার প্রাক্তন দেওয়ানের বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠেছিল।

শ্রীমন্তলালের মাথায় হাত বুলিয়ে মোহনলাল বলেছিলেন, 'এই তো আর কয়েক পল ইন্তেজার করো বেটা। বাসুদেব চাউল খরিদ করতে গেছে। আসল বলে। তারপরে আমরা ভাত খাব।'

ভাতের অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত শ্রীমন্তলাল একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। অস্থির হয়ে কিছুক্ষণ অলিন্দে পায়চারি করেন মোহনলাল। তারপর জীর্ণ এক মিনারের উপর দাঁড়িয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন দূরে। ঝাঁকড়া গাছের ফাঁক দিয়ে তার চোখের সামনে প্রতিভাত হয় জোছনামাখা চরাচর। পূর্ণিমার চাঁদ। অশ্বের পদসঞ্চারের প্রতীক্ষা করে কান খাড়া করে থাকেন মোহনলাল।

নাঃ! চারিদিক নিস্তব্ধ। গেল কোথায় বাসুদেব? এত দেরি হচ্ছে কেন? কোনও বিপদ হল না তো? মিরজাফরের গুপ্তচরেরা তাঁদের খোঁজে চষে বেড়াচ্ছে গোটা বাংলা। তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সুদূর এই ময়মনসিংহে পালিয়ে এসেছেন মোহনলাল। প্রতিমুহূর্তে তাড়া করে বেড়াচ্ছে ভয়। তবে সে ভয় নিজের জন্য নয়। যে করেই হোক বাঁচিয়ে রাখতে হবে শ্রীমন্তলালকে।

এই জীর্ণ দুর্গের অভ্যন্তরে কোনও শ্বাপদের ঢুকে পড়াটা অসম্ভব কিছু নয়। ঘরে একা ঘুমিয়ে রয়েছে শ্রীমন্তলাল। একথা মনে হতেই মিনার থেকে নেমে এসে দ্রুত কক্ষে প্রবেশ করলেন মোহনলাল। শ্রীমন্তলালের পাশে এসে বসলেন। তার মুখের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সহসা চমকে ওঠেন মোহনলাল। অবিকল সিরাজের মুখের আদল।

বহেন হিরার কথা মনে পড়ে গেল মোহনলালের। এখন কোথায় আছে সেই অভাগিনী? কী করছে কে জানে! সহসা মোহনলালের মাথার মধ্যে দপ্ করে যেন আগুন জ্বলে ওঠে। সে আগুন ছড়িয়ে পড়ে শিরায় শিরায়। সিরাজের প্রতি তীব্র বিদ্বেষে ভরে ওঠে মনটা। নিজের নির্বুদ্ধিতায় পলাশির প্রান্তরে অনেকের সৌভাগ্য-সূর্য নিভিয়ে দিয়েছেন সিরাজদ্দৌলা। যা হওয়ার ছিল না, তাই হয়েছে। খুশনসিবকে তিনি পায়ে ঠেলেছেন। মোহনলালের মনে হয়, আজ হিরা, শ্রীমন্তলালসহ আরও অনেকের এই বদকিসমতির জন্য দায়ী একমাত্র সিরাজদ্দৌলার হঠকারী সিদ্ধান্ত।

প্রবল ক্রোধে মোহনলালের দেহের সমস্ত রোমকূপ খাড়া হয়ে ওঠে। মনে হয়, এখন যদি তিনি সিরাজকে নাগালের মধ্যে পেতেন তো তাঁর বুকে তরবারি ঠেকিয়ে কৈফিয়ত চাইতেন—কেন সিরাজ সেদিন পলাশির প্রান্তরে প্রায় জিতে যাওয়া লড়াই ছেড়ে ফিরে আসতে তাঁকে বাধ্য করেছিলেন।

জয়ের সৌগন্ধ তখন যুদ্ধে অভিজ্ঞ মোহনলালের নাকে ভেসে আসছে। মোহনলালের কুদরতি তখন কহানি হয়ে ওঠার মুখে। পলাশির আমবাগানের ভিতরে ক্রমশ পিছু হঠছে ক্লাইভের বাহিনী। ক্রমশ হতাশায় ডুবছে ইংরেজরা। সিনফ্রের দাগা কামানের গোলায় ভেঙেচুরে পড়ছে ইংরেজ ঔদ্ধত্য। আমবাগানের আগল ফুরিয়ে যাবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। তারপর বেআব্রু হয়ে যাবে কোম্পানির ফৌজ। আতঙ্কের প্রহর গুনছেন ক্লাইভ-কিলপ্যাট্রিক-আয়ারকুট।

ঘোড়ার পিঠে দুর্বার গতিতে আগুয়ান মোহনলাল তখন চেঁচিয়ে উজ্জীবিত করে চলেছেন তাঁর বাহিনীকে—'মারো! মারো! শেষ করে দাও এই টোপিওয়ালা বেতমিজদের। চিরকালের মতো বাংলা ছাড়া করে দাও এই ধূর্ত বণিকের দলকে।'

ক্লাইভ দিশেহারা। কী করবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না। মোহনলালের আক্রমণের ঝাঁঝ আর বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা কার্যত অসম্ভব। তিনি অলৌকিক কিছু ঘটার প্রত্যাশা করছেন। মনে মনে অভিসম্পাত দিচ্ছেন মিরজাফর ও রায়দুর্লভকে। এই দুঃসময়ে ফৌজ নিয়ে ইংরেজদের সাহায্য করতে কেন তাঁরা এগিয়ে আসছেন না?

এমন একটা সময়ে মোহনলালের কাছে চিরকুট পাঠালেন সিরাজ। আজকের মতো লড়াই থামিয়ে ফিরে এসো। ক্ষিপ্ত মোহনলাল ছুড়ে ফেলে সেই চিরকুট। নবাবের নির্দেশ উপেক্ষা করলেন। কিছুক্ষণ পর আবার বার্তা এল নবাবের কাছ থেকে। যা বলছি শোনো। ফিরে এসো। ফিরে এসো। নবাবের হুকুমত অমান্য করে নিজের ইচ্ছেয় তুমি লড়াই চালিয়ে যেতে পার না।

বিরক্ত মোহনলাল লড়াই থামিয়ে দিলেন। তারপরেই ঘটে গেল চরম বিপর্যয়। পিছন থেকে আচমকা আক্রমণ করে নবাবের ফৌজকে তছনছ করে দিল ইংরেজরা। সিরাজ পালালেন লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে। মোহনলালও বাধ্য হলেন ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে যেতে।

ঘুমের মধ্যে নড়েচড়ে ওঠে শ্রীমন্তলাল। 'হিরা বুয়া! হিরা বুয়া! কোথায় তুমি?'

মোহনলালের সম্বিৎ ফিরল। হাত বোলাতে লাগলেন শ্রীমন্তলালের গায়ে।

পাশ ফিরে আবার গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে শ্রীমন্তলাল। তার মুখের দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইলেন মোহনলাল। এই বালকের মুখের আদল অবিকল সিরাজের মতো।

ক্ষণেক আগেই সিরাজের বিরুদ্ধে রাগে ফুসছিলেন মোহনলাল। সহসা সে রাগ যেন জল হয়ে গেল। সিরাজের প্রতি করুণায় আর্দ্র হল মোহনলালের মন। আহা রে! কোথায় এখন সিরাজ! কত কষ্টই না করতে হচ্ছে তাঁকে।

গরিবের ঘরে জন্ম মোহনলালের। জীবনে তাগদ, দৌলত, রওশন—যা ছিল তার কাছে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো, সে সবই তিনি যে পেয়েছিলেন, সে তো কেবল সিরাজের জন্যই। অপরিণত যুবক সিরাজ বিভ্রান্ত হয়েছিলেন মিরজাফরের কূট চালে। সরলমতি সিরাজ তখনও ভাবছেন মিরজাফর তাঁর প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী। বারবার যুদ্ধ থামানোর জন্য চাপ দিয়ে সিরাজকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন মিরজাফর। সেই চাপে দিশেহারা হয়ে মিরজাফরের প্রস্তাবই মেনে নিলেন সিরাজ। মস্ত বড় একটা ভুল। সেই ভুলের খেসারত সিরাজ নিজেও তো এখন দিচ্ছেন। মোহনলাল কি তাঁর উপরে দোষারোপ করতে পারেন, তাঁকে অভিসম্পাত দিতে পারেন? বরং তার কল্যাণকামনায় ঈশ্বরের কাছে তার দোয়া মাঙা উচিত। যেন বিশ্বাসঘাতকেরা তাঁর নাগাল না পায়।

আর বহেন হিরা? মোহনলালের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে।

কাশ্মীর থেকে পিতা-মাতার সঙ্গে ভাগ্যের খোঁজে সুবে বাংলায় এসেছিলেন মোহনলাল। হিরা তখন নিতান্তই শিশু। মোহনলাল সবে কৈশোরে পা দিয়েছেন। মুর্শিদাবাদে আসার পর কিছুদিনের মধ্যেই পিতা ও মাতাকে হারিয়ে এ দুনিয়ায় একাকী হয়ে গেল ভাই ও বোন। জীবনে লড়াই ছিল বড় কঠিন। দু-বেলা দুমুঠো

ভাত জোগাড় করা ছিল বড় কষ্টের। তবু বোনের গায়ে আঁচটুকুও লাগতে দেননি মোহনলাল। পরম যত্নে হিরা বহেনকে তিনি আগলে রেখেছিলেন।

কৈশোরে চন্দ্রকলার মতো একটু একটু করে বিকশিত হতে লাগল হিরার রূপলাবণ্য। মোহনলাল তখন ভিড়েছেন সিরাজের বাউন্ডুলে ইয়ারদোস্তদের দলে। কাশ্মীরি এই ছেলেটিকে বেশ পছন্দ করেন আলিবর্দির আদরের নাতি মির্জা মহম্মদ। তখনও সে সিরাজদ্দৌলা হয়ে ওঠেনি।

দরবারি সহবতের তোয়াক্কা না করে হঠাৎই একদিন মোহনলালের বাড়িতে এসে হাজির হল মির্জা। কড়া নাড়েন দরজায়। মোহললাল ঘরে ছিলেন না। ভাইয়া ফিরেছে ভেবে দরজা খুলে মির্জাকে দেখে চমকে উঠে দ্রুত উড়নির আচ্ছাদনে মুখ ঢাকে হিরা।

মির্জা স্তম্ভিত। বাক্যহারা। ক্ষণেকের জন্য যে রূপরাশি তার চোখের সামনে প্রতিভাত হল, তা যেন অপার্থিব। এ মোহনলালের বহেন না সুনহারি খোয়াবে দেখা বেহস্তের কোন হুরি?

মির্জা শুধোয়, ‘মোহনলাল কোথায়?’

উড়নির আড়াল থেকে ভেসে আসে খুশ ইলহান আওয়াজ, ‘ভাইয়া তো ঘরে নেই!’

মুগ্ধ চোখে মির্জা চেয়ে থাকে উড়নির আড়ালে ঢাকা মুখখানির দিকে।

প্রবল অস্বস্তিতে পড়ে যায় হিরা। উড়নির আড়াল থেকে সিরাজের চোখের ভাষা পড়ে শরমে সে লাল হয়ে ওঠে, আনত চোখে অধর দংশন করে।

এখন কী করবে হিরা? মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। নবাব আলিবর্দির নাতি, দাঁড়িয়ে আছে কয়েক হাতের মধ্যে। তাকে কি ভাইয়া ঘরে নেই বলে দুয়ার থেকে ফিরিয়ে দেওয়া যায়? ভিতরে আসতে বললেও এই গরিবখানায় কোথায় সে বসতে দেবে আলিবর্দির নাতিকে?

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে হিরা।

মুশকিল আসান করে মির্জা নিজেই। বলে, ‘তুমি যদি নারাজ না থাক তো ঘরে একটু বসি।’

‘ভিতরে আসুন।’

খুশ ইলহান আওয়াজ ফের মির্জার বুকের রক্তে তুফান তোলে।

ঘরের অন্দরে সর্বত্র গরিবির ছাপ। ভালো একখানা কুরসিও নেই। হিরা সংকুচিত হয়ে পড়ে। এসব নিয়ে অবশ্য মির্জার মাথাব্যথা নেই। হোক না গরিবের ঘর। যে ঐশ্বর্যের সন্ধান সে পেয়েছে এই গরিবখানায় এসে, তার কাছে ধন-দৌলত, হিরে-জহরত, খানদানের গরিমা-ইজ্জত সব তুচ্ছ। মির্জা ভাবে, ভাগ্যিস সে এসেছিল মোহনলালের খোঁজে। না হলে এই সম্পদের হদিশই হয়তো সে কোনওদিনও পেত না।

হিরার হঠাৎ মনে হয় মেহমানের জন্য এক গেলাস পানি নিয়ে আসা উচিত।

এক ছুটে সে পাশের ঘরে যায়। পাথরের গেলাসে করে জল নিয়ে এসে উড়নির আড়াল থেকে মৃদু কণ্ঠে বলে, ‘পানি।’

মির্জা বরাবরই অস্থির ও অধৈর্য। মাঝে মাঝে আকাশের চাঁদ পেড়ে আনার মতো অসম্ভব কিছু সে দাবি করে নানাজির কাছে। এই চাঁদ তার নাগালের মধ্যেই রয়েছে। সহসা হিরার হাতটা ধরে এক ঝটকায় তাকে বুকের মধ্যে টেনে নেয় মির্জা। হিরা চমকে ওঠে। একই সঙ্গে শিহরন ও পুলকের অনুভূতিতে সে বিহ্বল হয়ে যায়। হাত থেকে পাথরের গেলাস মাটিতে পড়ে গড়িয়ে যায়।

মাথার উড়নি সরিয়ে হিরার অপার্থিব সুন্দর মুখমণ্ডলে পাগলের মতো চুমু খেতে থাকে মির্জা।

লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে হিরা। মৃদু বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে।

‘ছাড়ুন। ভাইয়া এসে পড়বে।’

‘আমি বুঝি ভয় পাই তোমার ভাইয়াকে?’ এই বলে হিরাকে দুই বাহু দিয়ে আরও নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করে মির্জা। আর কথা বলার সুযোগ পায় না হিরা। তার অধরপল্লবে দৃঢ়ভাবে চেপে বসে সিরাজের পুরু

ঠোঁটদুটো। এক অনাস্বাদিত অপার্থিব সুখে ভেসে যায় হিরা।

দরজা খোলা। দুজনে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ। হিরা তখন নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করেছে মির্জার উন্মত্ত ভালোবাসার কাছে। এমন সময় দরজায় এসে দাঁড়ায় মোহনলাল। এই দৃশ্য দেখে চকিতে সে আড়ালে সরে যায়। মোহনলালের মন ভরে ওঠে অন্য এক খুশিতে। এবারে নসিবের চাকা ঘুরবে।

বেশ কিছুক্ষণ পর ঘরের বাইরে থেকে হিরার নাম ধরে ডেকে উঠেছিলেন মোহনলাল। যেন ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে ফিরলেন। মোহনলালের গলার আওয়াজ শুনে সংযত হয় মির্জা। তার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে অন্দরমহলে ছুটে পালায় হিরা।

মোহনলাল ঘরে ঢুকেই সিরাজকে দেখে উষ্ণ গলায় বলেছিলেন, 'সেলাম হুজুর! আপনি এই গরিবখানায় এসেছেন। বহুত খুশি কি বাত। মেরা খুশনসিবি।'

কুরসি ছেড়ে উঠে এসে মোহনলালকে বুকে জড়িয়ে ধরে মির্জা বলে, 'খুশনসিবি কখন যে কার হাত পাকড়ে ধরে তা কে বলতে পারে মোহনলাল?'

সেই থেকে মোহনলালের সঙ্গে মির্জার ঘনিষ্ঠতার শুরু। কারণ যে বহেন হিরা তা বুঝতে পারেন মোহনলাল। অচিরেই তিনি হয়ে উঠলেন মির্জার পহেলা দোস্ত, ছায়াসঙ্গী। দিনে দিনে হিরার সঙ্গে মির্জার ঘনিষ্ঠতা বেড়ে চলল। কিছুদিন পরে সিরাজদ্দৌলা উপাধিতে ভূষিত হল মির্জা। তাঁকে মসনদের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করলেন নবাব আলিবর্দি খাঁ।

মোহনলাল খুশিতে যেন প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। বাংলার হবু নবাবের বেগম হবে তাঁর আদরের বহেন। তিনি হবেন নবাবের রিসতেদার। এত সৌভাগ্য তার মতো এক মামুলি ইনসানের ললাটে লিখে রেখেছেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! কী অসীম করুণা তাঁর!

সিরাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে কিছু কাল পরে গর্ভসঞ্চার হল হিরার। এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিল সে। সমাজে কী পরিচয় হবে পুত্রের? বেগমের স্বীকৃতি চাইল হিরা। ভাবনায় পড়লেন সিরাজদ্দৌলা। এ রিসতা আলিবর্দি মেনে নেবেন তো?

নাহ্। মানলেন না নবাব আলিবর্দি খাঁ। আদরের নাতির কাতর প্রার্থনাও তার মন টলাতে পারল না। আজনবি এক লেড়কি, বলার মতো কোনও পরিচয় নেই যার খানদানের, সে কী করে সিরাজের বেগম হবে? নানাজির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার সাহস ছিল না সিরাজের। বাধ্য হয়েই হিরার সঙ্গে সম্পর্কতে ইতি টানতে হল তাঁকে।

ম্লান মুখে এসব মেনে নিল হিরা। শুধু অনুরোধ করল শিশুপুত্রটিকে তাঁর কাছ থেকে যেন কেড়ে নেওয়া না হয়। এতে সম্মত হলেন আলিবর্দি খাঁ। নিদান দিলেন, সিরাজ ও হিরার অবৈধ পুত্র থাকবে হিরার কাছে মোহনলালের হাভেলিতে। সকলে জানবে এই শিশুপুত্রটি মোহনলালের। সিরাজ ও হিরার পুত্রের নামকরণও করে দিলেন আলিবর্দি—শ্রীমন্তলাল।

প্যাঁচার ডাকের বিকট আওয়াজে হুশ ফেরে মোহনলালের। সেই শ্রীমন্তলাল- নবাব সিরাজদ্দৌলার পুত্র। নসিবের ফেরে আজ পরিত্যক্ত বোকাইনগর দুর্গের অভ্যন্তরে এক কক্ষের মেঝেতে ঘাসের বিছানায় শুয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। মোহনলাল একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন তার মুখের দিকে। সিরাজের রক্ত বইছে শ্রীমন্তের ধমনীতে। বইছে মোহনলালের খানদানের রক্তও। দুশমনেরা যেন তার খোঁজ না পায়। তাই মুর্শিদাবাদ থেকে পালিয়ে আসার সময় শ্রীমন্তলালকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন মোহনলাল। তিনি কথা দিয়েছিলেন হিরাকে, একদিন মসনদের উপর শ্রীমন্তলালের অধিকারকে তিনি প্রতিষ্ঠা করবেন। হারতে রাজি নন মোহনলাল। এখনও তার শরীরের রক্ত উষ্ণ। তিনি বাঁচিয়ে রাখতে চান শ্রীমন্তলালকে, বাঁচিয়ে রাখতে চান হিরার গর্ভজাত সন্তানকে।

মুর্শিদাবাদ থেকে পালানোর সময় হিরার বুক থেকে শ্রীমন্তকে উপড়ে আনতে কম কষ্ট হয়নি মোহনলালের। কিন্তু সিরাজপুত্রের নিরাপত্তার স্বার্থে এ ছাড়া অন্য উপায় যে ছিল না।

বাইরে থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে আসে মোহনলালের কানে। মোহনলাল ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসেন অলিন্দে। চাঁদের আলোয় তিনি স্পষ্ট দেখতে পান বাসুদেবকে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন মোহনলাল।

খানিকবাদে বাসুদেব এসে কুরনিশ জানায়।

মোহনলাল শুধোলেন, 'রসদ?'

বাসুদেব বলে, 'এনেছি হুজুর। তবে এক বস্তা চাল ও খানিকটা নুন ছাড়া আর কিছু মিলল না। তাও বহুত চড়া দাম দিতে হল। পলাশির হকিকৎ সবাই জেনে গিয়েছে। চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে মিরজাফরের কসিদেরা। মান্ডিতে মান্ডিতে ঢোল-শোহরৎ হয়েছে—এলাকায় অপরিচিত কাউকে যেন রসদ বিক্রি করা না হয়। মান্ডিতে অচেনা কোনও মুখ দেখলেই যেন ফৌজদারের কাছে খবর পাঠানো হয়। এ জায়গা আর নিরাপদ নয়। অবিলম্বে আমাদের পালাতে হবে এখান থেকে।'

হতাশ গলায় মোহনলাল বলেন, 'তাড়াতাড়ি ভাত চড়াও বাসুদেব। শ্রীমন্তলাল খিদেয় কাতর হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।'

'জি হুজুর।'

শ্রীমন্তলালকে ঘুম থেকে উঠিয়ে নুন মেশানো গরম ভাত নিজের হাতে খাওয়ালেন মোহনলাল। খুব খিদে পেয়েছিল। নুন মেশানো ভাতই গোগ্রাসে খেয়ে নিল শ্রীমন্তলাল। তারপর ঘাসের বিছানাতেই পরম তৃপ্তিতে ফের ঘুমিয়ে পড়ল। রাতের আহার শেষ করে বাসুদেবের সঙ্গে জরুরি আলোচনায় বসলেন মোহনলাল।

নিজেকে নিয়ে নয়, মোহনলালের ভাবনা শ্রীমন্তলালকে নিয়ে। মোহনলাল জানেন ধরা পড়লে মিরজাফর খাঁ তাকে জিন্দা ছাড়বে না। মরতে ভয় নেই মোহনলালের। কিন্তু মিরজাফর ও ইংরেজদের প্রতিহিংসার হাত থেকে কী করে বাঁচাবেন শ্রীমন্তকে?

'কী করা যায় বাসুদেব? এইটুকু ছেলে কাহাতক আর এই বনে জঙ্গলে পালিয়ে বেড়ানোর ধকল সামলাবে?'

'উপায় একটা আছে হুজুর।' বলে বাসুদেব।

'কী উপায়?'

'আমার কাকা বিনোদ রায় আমহাটি গ্রামে বাস করেন। তাঁর বাটিতে শ্রীমন্তকে রাখা যায়।'

'তিনি কি রাজি হবেন?'

'আমার প্রস্তাবে অমত করবেন না। কাকা যথেষ্ট স্নেহ করেন আমাকে।'

'কিন্তু কী পরিচয় দেবে ওর?'

'অনাথ ব্রাহ্মণ সন্তান। নদীর ঘাটে ভিক্ষে করছিল।'

'যদি কোনও ভাবে সত্য প্রকাশ পায় যে সিরাজদ্দৌলা ও হিরার অবৈধ সন্তান শ্রীমন্তলাল?'

'এ সত্য প্রকাশ হওয়া অসম্ভব। নবাব আলিবর্দি খাঁ গত হয়েছেন। নানি বেগম, নবাব সিরাজদ্দৌলা, আপনি, আমি আর হিরা বেগম ছাড়া আর কেউ তো জানে না একথা।'

'তা অবশ্য ঠিক।' এই বলে চিন্তিত মুখে মোহনলাল কালো মেঝের দিকে চেয়ে রইলেন।

বাসুদেব বলে, 'আপাতত শ্রীমন্তলাল আমহাটিতে থাকুক। পরে অন্য ব্যবস্থা করা যাবে।'

চকিতে চোখ তুলে বাসুদেবের মুখপানে তাকালেন মোহনলাল।

হঠাৎই ঘুমের মধ্যে নড়েচড়ে উঠল শ্রীমন্তলাল। 'হিরা বুয়া! হিরা বুয়া!'

মোহনলাল ঘুরে তাকালেন। ব্যস্ত হয়ে উঠল বাসুদেব। শ্রীমন্তলাল পাশ ফিরে শুল।

মোহনলাল সামনে ঝুঁকে পড়ে তার কপালে হাত বুলিয়ে দিলেন। ফের গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল শ্রীমন্ত। গায়ের উড়নি দিয়ে তাকে বাতাস করতে লাগল বাসুদেব।

ঘরের মধ্যে গুমোট গরম। একটুও হাওয়া নেই। রাত কয় প্রহর, ঠিক আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে না। খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন মোহনলাল। আকাশে জেগে আছে পূর্ণিমার গোল চাঁদ। মেঘহীন কালো আকাশ নক্ষত্রখচিত। কালো বনাতের গায়ে অজস্র হিরের কুচি কেউ যেন সুতো দিয়ে গেঁথে রেখেছে। ঝিঁঝি ডেকে চলেছে একটানা। আশেপাশের কোনও গাছ থেকে বিকট সুরে ডেকে উঠল একটা হুতোম প্যাঁচা। কর্কশ বিশ্রী আওয়াজ। মোহনলালের বুক কেঁপে উঠল। এ কি আরও কোনও বিপর্যয়ের সংকেত? প্রতিহিংসাপরায়ণ শত্রুর হাত থেকে শ্রীমন্তলালকে তিনি রক্ষা করতে পারবেন তো?

মোহনলাল শুধোলেন, 'অন্য কী ব্যবস্থার কথা বলছিলে বাসুদেব?'

'কাকা দরিদ্র মানুষ। অভাবের সংসার। বিত্তের সিন্ধুর মধ্যে বড় হয়েছে শ্রীমন্ত। তার ভরণপোষণ করা কাকার পক্ষে সম্ভব নয়। আপাতত কিছুদিন সে থাকুক কাকার গৃহে, তারপরে না হয়—'

'কী তারপরে?' অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করেন মোহনলাল।

'সে ব্যবস্থা আপনাকেই করতে হবে।'

'যা বলতে চাইছ তা স্পষ্ট করে বলো বাসুদেব।'

'বাসুদেব ইতস্তত করে বলে, নবাব সিরাজদ্দৌলার বিশেষ অনুগত ছিলেন ময়মনসিংহের জমিদার শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী। আপনার সঙ্গেও তাঁর সুসম্পর্ক রয়েছে। তিনি যদি রাজি হন—'

'কী বিষয়ে রাজি হবেন?' কৌতূহলের সঙ্গে প্রশ্ন করেন মোহনলাল।

'শ্রীমন্তকে তিনি যদি দত্তক নেন–'

মুচকি হাসেন মোহনলাল। খানিকটা হতাশা জড়ানো গলায় বলেন, 'যা ভাবছ, বাস্তবে তার রূপায়ণ সম্ভব কি?'

'কেন সম্ভব নয়?'

'সনাতন হিন্দু জমিদার। ধার্মিক ব্রাহ্মণ। সিরাজের অবৈধ পুত্রকে কি দত্তক নিতে চাইবেন?'

'শ্রীমন্তর আসল পরিচয় প্রচ্ছন্ন রাখলেই হল।'

এ তো ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর সঙ্গে একপ্রকার তঞ্চকতা। বাইরের অন্ধকারের দিকে চুপ করে ক্ষণেকের জন্য চেয়ে থাকেন মোহনলাল। তারপর ভাবেন, বুদ্ধিটা মন্দ বাতলায়নি বাসুদেব। পথে পথে পালিয়ে বেড়ানোর ধকল শ্রীমন্ত আর সইতে পারছে না। চৌধুরীমশায়ের গৃহে সে ঠাঁই পেলে আর কোনও ভাবনা থাকে না। শ্রীমন্তের নিরাপদ জীবনের স্বার্থে এটুকু মিথ্যের আশ্রয় নেওয়াই যায়। আরেকটা ভাবনাও উঁকি দেয় মোহনলালের মনে। আজ সিরাজ ক্ষমতাচ্যুত। মোহনলাল আজ কোন পরিচয়ে গিয়ে দাঁড়াবেন শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর কাছে?

হঠাৎ দূর থেকে অশ্বখুরের শব্দ ভেসে আসে। একটি নয়, অনেক অশ্বের পদসঞ্চার।

বাসুদেব ও মোহনলাল দুজনেই উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন।

চকিতে ছুটে গিয়ে ঘরে জ্বলতে থাকা মশালটা নিভিয়ে দিয়ে বাসুদেব চাপা গলায় বলে, 'নির্ঘাত মিরজাফরের গুপ্তচর বাহিনী।'

অলিন্দে ছুটে যায় বাসুদেব। দূরে দেখা যায় অনেক মশালের বিন্দু বিন্দু আলো। খানিকবাদে আলোকবিন্দু হারিয়ে যায় গহীন আঁধারের গর্ভে। ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে যায় দূরে।

কক্ষে ফিরেই বাসুদেব চাপা গলায় বলে, 'চলুন আজ রাতেই বেরিয়ে পড়ি আমহাটির উদ্দেশে।'

'ঠিকই বলেছ বাসুদেব। এ স্থান আর নিরাপদ বলে বোধ হচ্ছে না।'

মশালের আলো অনেক বেশি উজ্জ্বল। দুশমনের চোখে পড়ে যেতে পারে। সাবধানতার জন্য ছোট্ট একটি প্রদীপ জ্বালে বাসুদেব।

গায়ে মৃদু ধাক্কা দিয়ে শ্রীমন্তকে জাগিয়ে তোলেন মোহনলাল। সহসা কাঁচা ঘুম ভেঙে পরিত্যক্ত দুর্গের এই কক্ষের ভিতরে এই আলো আঁধারি পরিবেশে কেমন যেন ত্রস্ত হয়ে পড়ে শ্রীমন্তলাল।

স্নেহের সুরে মোহনলাল বলেন, 'বেটা!'

মোহনলালকে আঁকড়ে ধরে ফুপিয়ে কেঁদে উঠে শ্রীমন্ত বলে, 'আমি হিরা বুয়ার কাছে যাব।'

পরম স্নেহে তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে মোহনলাল বলেন, 'চলো বেটা। এখনই যাব। জলদি বেরিয়ে পড়ি আমরা।'

প্রদীপের আলো হাতে পথ দেখায় বাসুদেব। শ্রীমন্তলালকে কোলে নিয়ে নীচে আগাছায় ভরা খাড়াই সিঁড়ি বেয়ে সন্তর্পণে নেমে আসেন মোহনলাল। চাপা গলায় ডাকেন দুই রক্ষীকে।

ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে তারা মোহনলালকে সেলাম জানায়।

মোহনলাল বলেন, 'চলো এখনই বেরোতে হবে।'

কেল্লার পিছনে প্রায় ভেঙে পড়া আস্তাবলে বাঁধা আছে ঘোড়াগুলো। দুই রক্ষী দ্রুত ছুটে যায় আস্তাবলের দিকে।

দূর থেকে ফের ভেসে আসছে অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের শব্দ। সেই সঙ্গে অন্ধকার ফুঁড়ে ভেসে উঠেছে অনেকগুলো আলোকবিন্দু। অশ্বারোহীর দল খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে পরিত্যক্ত এই কেল্লার দিকে। ঘোড়ার খুরের শব্দ জোরালো হচ্ছে ক্রমশ।

মোহনলাল চাপা গলায় বললেন, 'ওরা এদিকেই আসছে।'

শ্রীমন্তলালকে নিয়ে দ্রুত ঘোড়ায় চেপে বসলেন মোহনলাল। ঘোড়ায় চেপে বসল বাসুদেব ও সঙ্গের দুই রক্ষীও। চোখের নিমেষে চারটি ঘোড়া ক্ষিপ্রগতিতে মিলিয়ে যায় অন্ধকারে।

৮

হিরাঝিল প্যালেসের নহবতখানা থেকে ভেসে আসছে সানাইয়ের সুর। প্যালেসের চৌহদ্দিতে ঢোকার মুখে সদর দরওয়াজার একপাশে কাড়ানাকাড়া, ঢাক, ঢোল, শিঙা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে কয়েকশো বাজনদার। এদের দলপতি কেশবলাল সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মোরাদবাগ প্যালেস অভিমুখে চলে যাওয়া পথের দিকে। নিরাপত্তার খাতিরে সেই পথের দু'পাশে মোতায়েন শয়ে শয়ে হাতিয়ারবন্ধ সেপাই।

খানিকবাদেই ওই পথ ধরেই মোরাদবাগ থেকে হিরাঝিল প্যালেসে আসবেন ব্যারন অফ প্ল্যাসি, কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ। নামটার মাহাত্ম্য যে কী, তা বাজনদারদের দলপতি মিশিরলালও বোঝে। তাই সে হুঁশিয়ার। গোরাপল্টন পরিবেষ্টিত ঝালরদার পালকিটাকে এগিয়ে আসতে দেখলেই বাজনার আওয়াজে কাঁপন ধরাতে হবে আকাশে-বাতাসে।

প্রস্তুত হয়ে আছে হিরাঝিলের বুরুজে গোলন্দাজের দলও। বাজনা বেজে উঠলেই তারা শূন্যে তোপ দাগতে শুরু করবে। এভাবেই হিরাঝিল কুরনিশ জানাবে হবু নবাব মিরজাফরের বহুত খাতিরের মেহমান কর্নেল রবার্ট ক্লাইভকে।

সদর দরওয়াজার মুখে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ ও মিরন। ক্লাইভকে হিরাঝিল প্যালেসে স্বাগত জানানোর জন্য মিরজাফরের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁরাও প্রস্তুত।

মিরজাফর নিজেও এই দলে সামিল হতে চেয়েছিলেন। তাঁকে নিরস্ত করেছেন স্বয়ং ক্লাইভ। যিনি বাংলার মসনদে বসতে চলেছেন, পথে দাঁড়িয়ে ইংরেজ সেনাপতির জন্য তাঁর অপেক্ষা করাটা দিশি লোকেদের চোখে একটু বেমানান ঠেকতে পারে।

এই সব খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে ক্লাইভ ইদানীং ভয়ানক সচেতন। মুর্শিদাবাদ ছেড়ে পালিয়ে গেলেও সিরাজদ্দৌলা নামটা কাঁটার মতো বিঁধে আছে কর্নেলের মনের মধ্যে। কিছুতেই কাঁটাটা পুরোপুরি উপড়ে ফেলে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। একদল বণিক সুবে বাংলার নবাবকে মসনদ ছাড়া করল– এই ব্যাপারটাকে যে কী ভাবে দেখছে আমআদমি, কী প্রতিক্রিয়া তাদের অন্তরে তা নিয়ে কর্নেলের ভাবনার অন্ত নেই।

ওয়াটস, কিলপ্যাট্রিক, স্ক্র্যাফটন, মুনশি নবকৃষ্ণ যতই তাঁকে বোঝান যে, সিরাজের বরবাদিতে দরবারের ওমরাহরা খুশি মানাচ্ছে, খুশি হয়েছে তামাম সুবে বাংলার জমিদারেরা, প্রজারাও স্বস্তি পেয়েছে, তবুও ক্লাইভের সন্দিগ্ধ মন চট করে বিশ্বাস করতে চায় না এসব কথা। ইংরেজদের দুশমন সমঝে সুবে বাংলার রাজধানীর আমআদমি যদি আচমকা ফুঁসে ওঠে, প্রত্যাঘাত করতে চায়, তবে বাঁচার পথ থাকবে না। গণবিক্ষোভের ভয়ে কাঁটা হয়ে আছেন ক্লাইভ।

ওদিকে নানা রঙের গুলাব ও লতাপাতার সাজসজ্জায় ঠিক যেন একখণ্ড বেহেস্ত হয়ে উঠেছে হিরাঝিলের আমদরবার। ঘরের এক মাথায় সামান্য উঁচুতে মঞ্চের উপরে রয়েছে সুন্দর কারুকাজ করা মেহগিনি কাঠের বড়সড় একখানা কুরসি। কাঠের গায়ে জায়গায় জায়গায় সাঁটা রয়েছে নকশাদার রুপোর পাত। কুরসিতে বসার নরম গদি সমুদ্রনীল মখমলে মোড়া। কুরসির উপরে ছাউনির মতো রয়েছে রুপোর চাঁদোয়া। তা চারকোণা কনকদণ্ডের সঙ্গে বাঁধা।

চতুষ্কোণ ছাউনির নীচে ঠিক মাঝখানে মঞ্চের উপর স্থাপিত এই কুরসিই হল সুবে বাংলার বহুকাঙ্ক্ষিত মসনদ। যা দখলের জন্য ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার, সরফরাজ খাঁর মওত, ঘসেটি বেগমের বরবাদি, শওকত জঙের দেহান্ত, মিরজাফরের জশন, সিরাজের জহমত।

নিজের উচ্ছ্বাস গোপন করতে পারছেন না মিরজাফর। দু'চোখে উপচে পড়ছে খুশি। আর কয়েক পল পরেই তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে হয়ে উঠবেন সুবে বাংলার নবাব। শুধু কর্নেলের পৌঁছনোর অপেক্ষা। ইনসানের নসিব কী করে বদলায় তা ভেবে মিরজাফর অভিভূত। পয়গম্বরকে সুক্রিয়া জানানোর ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না।

আরব দেশের নজফ থেকে এসে মুর্শিদকুলির জামাই নবাব সুজাউদ্দিনের অধীনে সামান্য এক সৈনিক হিসেবে নিজামতের নোকরিতে যোগদান মিরজাফরের। আলিবর্দির আমলে বহাল হন মেদিনীপুরের ফৌজদারের পদে। এই তাঁর খুশনসিবির শুরুয়াত।

কিছুকাল পরে নবাবের ফৌজের সিপাহসালারের পদে অভিষিক্ত হলেন মিরজাফর। কিন্তু বর্গি দমনে অকর্মণ্যতার জন্য ওই পদ থেকে অপসারিত হলেন। পরে তদ্বির করে ফের ফিরে পেলেন পুরোনো পদটি। এ ভাবে মিরজাফরের জীবনে বারবার ঘর বদলেছে নসিব।

সিরাজের আমলের শুরুতে মিরজাফর ছিলেন নবাবের অপছন্দের তালিকায়। ১৭৫৬ সালে কলকাতা আক্রমণের সময় বাহাদুরের মতো লড়াই করে নবাবের সুনজরে এলেন তিনি। কিন্তু অল্পকাল পরেই নবাবের বিষনজরে পড়লেন। সিরাজ অনুভব করলেন যারা তাঁকে মসনদচ্যুত করতে চায় সে দলে মিরজাফরও আছেন। সিপাহসালারের পদটা গেল। কিন্তু অপরিণত সিরাজ সেনাবাহিনীর মধ্যে ঐক্যস্থাপনের উদ্দেশে অনেকের নিষেধ সত্ত্বেও পলাশির যুদ্ধের ঠিক আগে ওই পদটি মিরজাফরকে ফের ফিরিয়ে দিলেন।

বিশ্বাসঘাতকতা করলেন অকৃতজ্ঞ মিরজাফর। পলাশির যুদ্ধে সিরাজকে মদত না দিয়ে তিনি নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করলেন। এ নিয়ে মিরজাফরের মনে অবশ্য কোনও অনুশোচনা নেই। এটাই তো দরবারি

রাজনীতির তরিকা। সুযোগসন্ধানী না হলে, বিবেকের কাঁটা উপড়ে না ফেলতে পারলে যে উপরে ওঠা যায় না!

একদা দরবার রাজনীতিতে কোণঠাসা হয়ে পড়া যে মিরজাফর খাঁ চূড়ান্ত বরবাদির প্রহর গুনছিলেন, আজ সেখান থেকে তাঁর উত্তরণ সুবে বাংলার নবাবের পদে। তবু এখনও যেন ঘটনাটা পুরোপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না মিরজাফর। প্রবল উত্তেজনায় তিনি ছটফট করছেন। থেকে থেকেই দৃষ্টি চলে যাচ্ছে মসনদের দিকে। কয়েক পল। আর মাত্র কয়েক পল!

মিরজাফর বসে আছেন মসনদের অদূরে মামুলি একখানা কুরসিতে। ওমরাহ, জমিদারেরা জনে জনে এসে কুরনিশ জানিয়ে যাচ্ছে। পেশ করছে নজর। এসবে মিরজাফরের তেমন কোনও মনোযোগ নেই। যন্ত্রের মতো সেলাম, তসলিম, কুরনিশ গ্রহণ করছেন। নজরানা, পেশকাশ এসব চালান করে দিচ্ছেন পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দাখিলাদের হাতে।

উমিচাঁদ এগিয়ে এসে নজর পেশ করে খোশামোদি ঢঙে বললেন, 'ভরা দরবারে শূন্য মসনদ বড় বেমানান লাগছে। আপনি মসনদে বসুন জাঁহাপনা। এ কুরসির মালিক তো এখন আপনিই!'

মুচকি হাসলেন মিরজাফর।

যে যাই বলুক না কেন, কর্নেল ক্লাইভ এসে না পৌঁছনো পর্যন্ত কিছুতেই তিনি মসনদে বসবেন না। ক্লাইভ হাত ধরে তাঁকে মসনদে বসিয়ে দেবেন– এই হল মিরজাফরের খায়েশ। কোনও লুকোছাপা নেই, ঘনিষ্ঠ বৃত্তে এসব তিনি কবুলও করেছেন। সে কথা লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। দরবারে উপস্থিত অভ্যাগতদের অনেকেই এ নিয়ে কানাকানি, ফিসফাস করছে। কেউ কেউ নবাব মিরজাফর খাঁকে ইতিমধ্যেই ক্লাইভের গর্ধভ বলে ভূষিত করেছেন। এসব মিরজাফর মোটেই গায়ে মাখছেন না। কর্নেল ক্লাইভের প্রতি রয়েছে তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা।

দুঃসহ হয়ে উঠেছিল জীবন। হররোজ ত্রাসের আবহে দিন কাটানো। এই বুঝি গর্দান গেল। এক সময় সিরাজের চোখের দিকে তাকালে মিরজাফরের বুক কেঁপে উঠত। সহসা সেই দুঃসহ জীবনের উপর যেন নেমে এল বেহস্তের কওসর। তার ধারাস্নানে মিরজাফরের জিন্দেগি রঙ্গিলা হয়ে গেল।

ক্লাইভের কুদরতিতেই তো তাঁর এই খুশনসিবি। কর্নেলই তো তাঁর পয়গম্বর। আবেগে মিরজাফরের দু'চোখে চিক চিক করে ওঠে পানি। এসব ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে পড়েছিলেন হবু নবাব। সহসা কেঁপে উঠলেন কাড়ানাকাড়া, ঢাক, ঢোল, শিঙার শব্দে। কেঁপে উঠল দরবারে উপস্থিত অভ্যাগতরাও। হিরাঝিলের আনাচেকানাচে বসত গেড়ে থাকা কয়েক হাজার সফেদ কবুতর ভয় পেয়ে আকাশে চক্কর কাটতে লাগল।

ওই যে তিনি আসছেন!

খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন মিরজাফর। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল দরবার ঘরে উপস্থিত সকলে। হিরাঝিলের দরবার কক্ষে প্রবেশ করলেন কর্নেল ক্লাইভ। সঙ্গে কিলপ্যাট্রিক, আয়ারকুট, ওয়াটস, ওয়ালস, স্ক্র্যাফটন, লাসিংটন, মুনশি নবকৃষ্ণ-সহ আরও অনেকে। সমুখে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছেন মিরন, জগৎশেঠ ও রায়দুর্লভ।

হাসিমুখে মিরজাফরের দিকে এগিয়ে গেলেন ক্লাইভ। প্রবল উত্তেজনায় কুরসি ছেড়ে সামনে কয়েক পা এগিয়ে আসতে গিয়ে মিরজাফরের হোঁচট খাওয়ার উপক্রম হল। পরনের জরিদার ঝলমলে জোব্বা সূচ্যগ্র বাহারি নাগরায় আটকে গিয়ে প্রায় বেসামাল হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে এসে মিরজাফরকে ধরে ফেললেন কর্নেল ক্লাইভ। না হলে হয়তো দরবারে সবার সমুখে গালিচার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তেন নতুন নবাব। বেসহবত, বেনজির কাণ্ড ঘটে যেত একখানা।

মাথা ঝুঁকিয়ে ক্লাইভ বললেন, 'সেলাম নবাব বাহাদুর। সহি সালামত থাকুন।'

মাথা ঝুঁকিয়ে ক্লাইভের হাত দুটো নিজের কপালে ঠেকিয়ে মিরজাফর বললেন, 'বহুত সুক্রিয়া।'

ক্লাইভ বললেন, 'আমার মনে হয় এতদিন যারা সুবে বাংলা শাসন করেছেন ইউ আর দ্য মোস্ট ওয়ার্দি অফ দোজ। সবসে কামিল ইনসান। এটা তামাম বাংলার খুশনসিব।'

মিরজাফর খাঁ আবেগে বিগলিত। আপনার মেহেরবানি। তাই আমার এই তকদির।'

'আসুন নবাব বাহাদুর। মসনদে বসুন। প্রোটেক্ট দ্য ডিগনিটি অফ দিস চেয়ার।'

এই বলে মিরজাফরের হাত ধরে মসনদের দিকে এগিয়ে গেলেন ক্লাইভ। সেই মুহূর্তে মিরজাফরের মনে হল, গোটা দুনিয়ার হর খুশি যেন বারিশ হয়ে ঝরে পড়ছে গোটা দরবার ঘরে। ক্লাইভের হাত ধরে তিনি যেন পৌঁছে গিয়েছেন বেহস্তের খুবসুরত এক গুলবাগিচায়।

মসনদে বসলেন মিরজাফর। ক্লাইভের মুখে লেগে আছে মৃদু হাসি। ওমরাহ, জমিদার ও অন্যান্য অভ্যাগতরা সবাই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। চৌতিতে খুশির সুর বিলিয়ে দিতে লাগল দরবারি নহবত। সেই সঙ্গে বেজে উঠল বিলিতি ব্যান্ডের বিউগল, ব্যাগপাইপ, ট্রাম্পেট। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বাদ্যযন্ত্রের এক বিচিত্র ঐকতান। গোটা দরবার মাথা ঝুঁকিয়ে তসলিম জানাল।

মিরজাফর মসনদে বসার পর কয়েক পা পিছিয়ে এলেন ক্লাইভ। মাথা নুইয়ে তসলিম জানালেন নতুন নবাবকে। দ্রুত পিছন থেকে এগিয়ে এলেন লাশিংটন। ক্লাইভের হাতে তুলে দিলেন রুপোর উপরে মিনার কাজ করা অপূর্ব সুন্দর একটা বাক্স। ক্লাইভ ফের এগিয়ে গেলেন সামনে। বাক্সটা খুললেন। ভিতরে লাল ভেলভেট কাপড়ের উপরে ঝলমল করছে সোনাদানা, হিরে-জহরত।

ক্লাইভ বললেন, 'হুজুর এই আমার নজরানা।'

মিরজাফরের মুখে ফের জমাট বাঁধল খুশি। চকচক করে উঠল চোখদুটো। বাক্সটা হাতে নিয়ে আর্দ্র গলায় বললেন, 'বহুত বহুত সুক্রিয়া। আপনার ফয়েজে আমার জিন্দেগির সুখা জমিন অচানকই গুলিস্তান বনে গেল।'

মুচকি হাসলেন ক্লাইভ। তারপর এবারে নাটকীয় ভঙ্গিতে দরবারে উপস্থিত অভ্যাগতদের দিকে ঘুরে বললেন, 'অনারেবল অডিয়েন্স। কয়েকটা কথা আপনাদের উদ্দেশে আমার বলার আছে।'

মিরজাফরের দু'চোখে অসীম উৎকণ্ঠা। ওমরাহ, জমিদারেরা সবাই স্থানুবৎ। বেবাক চোখগুলোর দৃষ্টি জড়ো হয়েছে কর্নেল ক্লাইভের মুখের উপর।

ক্লাইভ বললেন, 'এই কথাগুলো এই ওয়াক্তে আপনাদের খুলে না বললে আপনারা হয়তো ইংরেজ কোম্পানিকে ভুল বুঝবেন।'

আনত চোখে একবার ভূমির দিকে চাইলেন ক্লাইভ, তারপর চোখ তুলে সকলের উদ্দেশে বললেন, 'এ দেশে সওদা করতে এসে নবাব বাদশার সঙ্গে লড়াই করা মোটেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তামান্না নয়। আমরা চিরকালই এদেশের কানুনকে ইজ্জত দিয়েছি। আমরা সওদা করেছি শাহ সুজার ফরমানের জোরে। কিন্তু নবাব সিরাজদ্দৌলা বারবার আমাদের বেইজ্জত করতে চেয়েছেন, সুবে বাংলায় আমাদের বিজনেস রাইটস কেড়ে নিতে চেয়েছেন, আলিনগরের সুলেনামার কন্ডিশনগুলো ভায়োলেট করেছেন, ফরাসি জেনারেল বুসির সঙ্গে হাত মিলিয়ে, ফরাসি ফৌজিদের সুবে বাংলায় ডেকে এনে চিরকালের মতো আমাদের বরবাদ করতে চেয়েছেন। তাই বাধ্য হয়েই পলাশিতে নবাবের সঙ্গে আমাদের লড়তে হয়েছে। এর দায় আমাদের নয়, সিরাজদ্দৌলার। অলমাইটি গড অন্যায়ের প্রতিকার চেয়েছেন, তাই পলাশিতে সঙ্গদিল সিরাজদ্দৌলার এই পরিণাম। সিরাজদ্দৌলার পরিবর্তে যিনি মসনদে বসলেন, তিনি একজন সাচ্চা আদমি। কামিল ইনসান। আমি মনে করি বাংলায় এবারে শান্তি ফিরবে।'

ক্লাইভের মুখ থেকে নিজের প্রশংসা শুনে আহ্লাদে প্রায় গলে পড়ছেন মিরজাফর। মুখে মৃদু হাসি। চোখের তারায় খেলা করছে তামাম দুনিয়ার হর খুশির রং।

ক্লাইভ বলে চললেন, 'নবাব মিরজাফরের ইনভিটিশনে আমি ফৌজ নিয়ে মুর্শিদাবাদে এসেছি। এখানে ক্যাম্প করে বসে থাকার কোনও ইচ্ছে বা সময় আমার নেই। কয়েকদিনের মধ্যেই উই উড রিটার্ন টু ক্যালকাটা অ্যান্ড অ্যাটেন্ড সোললি টু কমার্স। দ্যাটস অল আই ডিজায়ার্ড টু কনভে টু ইউ।'

ওমরাহ ও জমিদারেরা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানালেন ক্লাইভকে।

মিরজাফর কুরসি ছেড়ে উঠে এসে ক্লাইভের হাতদুটো ধরে বললেন, 'আপনি আমাদের মেহমান। আমার জিন্দেগির এই খুশির ওয়াক্তে যতদিন আপনার ইচ্ছে হয়, মুর্শিদাবাদে থাকুন। খুশি মানান। নবাব মিরজাফর খাঁ বেইমান নয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যাতে এদেশে বিনা তকলিফে সওদা করতে পারে, তা আমি নিশ্চই দেখব। এবারে একটা কাজ আছে জনাব। আমরা সিরাজদ্দৌলার তোশাখানা খুলিনি। আপনার জন্যেই ইন্তেজার করছিলাম। আপনাদের যে তোফা দেব বলে আমি কবুল করেছি, চলুন এই ওয়াক্তে মিটিয়ে ফেলি। আপনার সমুখেই তোশাখানার দরওয়াজা খুলতে চাই আমি। কী দৌলত আছে নবাবের তা আপনি খোদ নিজেই দেখে নিন।'

এই বলে কর্নেল ক্লাইভের হাত ধরে দৃঢ় পদক্ষেপে দরবার ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন মিরজাফর।

খানিকবাদে হিরাঝিলের তোশাখানার সামনে জড়ো হল সবাই। সুবে বাংলার নবাবের ধন-দৌলতের অনেক রংদার কহানি শুনেছেন ক্লাইভ। তা কতটা সত্যি আর কতটা মিথ্যে তার সহি আন্দাজ পাওয়া শক্ত। আজ নিজের চোখে তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ। ক্লাইভ তাই উত্তেজিত। তীব্র উত্তেজনা ও কৌতূহল ওয়াটস, কিলপ্যাট্রিক, স্ক্র্যাফটন, ওয়ালস, হেস্টিংস, লাশিংটনের চোখেমুখেও। যেন অ্যারাবিয়ান নাইটসে পড়া কোনও রত্নভান্ডারের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা।

জুলজুলে চোখে তোশাখানার লোহার দরজায় লাগানো মস্ত বড় হুড়কোটার দিকে চেয়ে আছেন নবকৃষ্ণ। ভাবছেন, এ কক্ষের অন্দরে যা আছে, তার ছিটেফোঁটা হাতে এলেও দিব্যি কেউকেটা বনে যাওয়া যাবে। কড়ির জোরে ছড়ি ঘোরনো যাবে কলকাতার গোটা হিন্দু সমাজের মাথায়।

মাসিক ষাট টাকা বেতনের মুনশি নবকৃষ্ণ। সিরাজদ্দৌলার রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে নিজের জীবন বাজি রেখে ফলতায় রসদ পাঠিয়ে তিনি মদত দিয়েছিলেন ইংরেজদের। নিজের নসিবকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন ইংরেজদের নসিবের সঙ্গে। ভাবীকালের সঠিক আন্দাজ পেতে তার ভুল হয়নি। কর্নেল ক্লাইভের তিনি একান্ত স্নেহভাজন। কামেয়াবির এই ওয়াক্তে কর্নেল কি তাকে বঞ্চিত করবেন, না দৌলতের ছিটেফোঁটা ছুড়ে দেবেন তাঁর দিকে!

সবুরে মেওয়া ফলে খুবই ভালো বোঝেন নবকৃষ্ণ। আগ বাড়িয়ে লোভী মানুষের মতো তিনি আবদার করতে চান না ক্লাইভের কাছে। চোখ বুজে গোবিন্দকে একবার স্মরণ করলেন নবকৃষ্ণ। কিন্তু মনের পর্দায় ভেসে উঠল অন্য একটা মুখ। কোথায় সেই শ্যামবর্ণ, মনোমোহিনী বংশীধারী? নব মুনশি চোখ বুজে দেখতে পাচ্ছেন ক্লাইভের মুখটা। আপনমনে মুচকি হাসেন মুনশি। ক্লাইভই তো তাঁর গোবিন্দ।

দেওয়ান রায়দুর্লভের নির্দেশে দু'জন দাখিলা বেশ কসরত করে সশব্দে খুলে ফেলল হুড়কোটা। তারপর হাত লাগাল আরও কয়েকজন। ভীষণ ভারী লোহার পাল্লা দু'টো ঠেলে দরজা উন্মুক্ত করা মাত্র দু-একজন মরদের কাজ নয়।

এগিয়ে এল বেশ কয়েকজন দাখিলা। সশব্দে পাল্লা দু'টো ঠেলে সরিয়ে দিল তারা। ভিতরে ঘন কালো অন্ধকার। বাতিদান হাতে ছুটে এল কয়েকজন বাতিকর। অভ্রের পাত জ্বলা উজ্জ্বল আলোয় পথ দেখাল তারা। তোশাখানার অন্দরে প্রবেশ করলেন রায়দুর্লভ, মিরজাফর, জগৎশেঠ ও মিরন। এদের পিছনে কর্নেল ক্লাইভ, ওয়াটস, ওয়ালস, স্ক্র্যাফটন, কিলপ্যাট্রিক, লাশিংটন ও নবকৃষ্ণ।

ঘরখানা বিশাল। ওপ্রান্তের দেওয়াল আলো-আঁধারিতে দূরে কোথাও হারিয়ে গিয়েছে। একদিকের দেওয়ালজুড়ে সারি সারি কাঠের মোটা তক্তা দিয়ে তৈরি তাক। সেগুলো নানা দ্রব্যসামগ্রীতে ঠাসা।

দেওয়ালের আরেকদিকে ঘেঁষে রয়েছে অনেকগুলো বড় বড় সিন্দুক। মেঝের উপরেও জায়গায় জায়গায় রয়েছে শ্বেতপাথরের চৌপাই, লোহার মস্ত মস্ত তোরঙ্গ। পোড়া মাটির বড় বড় কলসি। মুখে উলুপ দেওয়া।

ইংরেজদের জোড়া জোড়া কৌতূহলী চোখগুলো ঘুরছে চারিদিকে। দাখিলাদের হাতে ধরা বাতিদানের আলো গোটা ঘরটাকে আলোকিত করার জন্য যথেষ্ট নয়। দেওয়ালের গায়ে জায়গায় জায়গায় রয়েছে দেওয়ালগিরি। বাতিকরেরা জ্বালিয়ে দিল দেওয়ালগিরির আলোগুলো। উজ্জ্বল রোশনিতে ঝলমল করে উঠল গোটা তোশাখানা। প্রস্তুত হয়েছিল কর্মচারীরা। দেওয়ান রায়দুর্লভের নির্দেশে তারা একের পর এক সিন্দুকের কপাটগুলো উন্মুক্ত করতে লাগল। খুলে দিল তোরঙ্গের ডালা, মাটির জালার মুখের উলুপ।

ক্লাইভের চোখ ঝলসে গেল। তোরঙ্গে, সিন্দুকে, মাটির জালার ভিতরে বোঝাই হয়ে রয়েছে হিরে, জহরত, মণি, মুক্তো, সোনা, রুপোর বহু মূল্যবান অলংকার, স্তূপীকৃত আশরফি, সিক্কা টাকা। একের পর এক শ্বেতপাথরের টেবিলের উপরে সাজানো রয়েছে বেলজিয়াম কাচের বহুমূল্যবান ঝাড়বাতি, রুপোর বাসনপত্র, ঘর সাজানোর শৌখিন বিলিতি জিনিপত্র। হিরে-জহরত, খচিত অলংকার এবং ঝাড়বাতির পলকাটা কাচের গা থেকে প্রতিফলিত আলোর জলুসে গোটা ঘর যেন অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে।

রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, মিরজাফরের মুখে বার বার ইংরেজরা শুনেছে নবাবের তোশাখানার সে জলুস আর নেই। আলিবর্দির সময়ে বর্গির আক্রমণ সামাল দিতে গিয়ে সব প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। চমকিত চোখে অলংকারে ঠাসা একটা সিন্দুকের দিকে চেয়ে স্ক্র্যাফটন ভাবছিলেন, এই যদি প্রায় উজাড় হয়ে যাওয়া নবাবের ঐশ্বর্যের নমুনা হয়, তাহলে তার ভরভরাট অবস্থাটা কেমন হতে পারত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সামান্য বাঁধা মাইনের চাকুরে, ঘুস ছাড়া যারা বাবুগিরি ফলাতে পারে না, তাদের কাছে সুবে বাংলার নবাবের দৌলতখানার অবশিষ্ট এই ঐশ্বর্যই মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

মসনদে বসানোর শর্ত হিসেবে মিরজাফরকে দিয়ে যে চুক্তিপত্র সই করিয়ে নিয়েছিল ইংরেজরা সেই মোতাবেক ইংরেজদের এক কোটি সাতাত্তর লাখ টাকা দেওয়ার কথা নতুন নবাবের। কোম্পানির ঘরে ঢুকবে এক কোটি টাকা। কলকাতা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ইংরেজরা পাবে পঞ্চাশ লাখ, হিন্দুরা বিশ লাখ ও আরমানিরা সাত লাখ। চুক্তির বাইরেও কিছু টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মিরজাফর। সে টাকা নবাব হওয়ার খুশিতে দেওয়া পেশকাশ। ঢুকবে ক্লাইভসহ অন্যান্য গণ্যমান্য ইংরেজ সাহেবদের পকেটে। কর্মচারীদের এই ব্যক্তিগত মুনাফার কথা কোম্পানি অবশ্য জানতে পারবে না। এর পরিমাণও কম নয়। বাহান্ন লাখ টাকা। সব মিলিয়ে ইংরেজদের দাবি অনুযায়ী মিরজাফরকে মেটাতে হবে দু'কোটি উনত্রিশ লাখ টাকা।

প্রাথমিক চমকের ঘোর কাটিয়ে উঠে তোশাখানায় মজুত সম্পদের আর্থিক মূল্য কত হতে পারে তা জানার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ক্লাইভ। ইংরেজদের উপস্থিতিতেই বেশ কয়েক ঘণ্টা কসরত করার পর তোশাখানার কর্মচারীরা যে হিসেব পেশ করল, তা দেখে ভাঁজ পড়ল ক্লাইভের কপালে। ইংরেজদের প্রাপ্য বলে যত টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মিরজাফর তত টাকার সম্পদ তোশাখানায় নেই।

গম্ভীর গলায় মিরজাফর, রায়দুর্লভ ও জগৎশেঠের উদ্দেশে ক্লাইভ বললেন, 'উই মে অ্যাকসেপ্ট ইনস্টলমেন্টস। বাট ইউ হ্যাভ টু ক্লিয়ার আওয়ার ডিউস উইদিন অ্যা শর্ট পিরিওড অফ টাইম। জগৎশেঠের হাভেলিতে বসে এ বিষয়ে কাল কথা হবে।'

গটমট করে তোশাখানা থেকে বেরিয়ে এলেন ক্লাইভ। দেহভঙ্গিমা দেখে মনে হল রুষ্ট হয়েছেন। নবকৃষ্ণসহ অন্যান্য ইংরেজ সাহেবরাও ক্লাইভকে অনুসরণ করলেন।

ক্লাইভের সম্মানে ডিনারের এলাহি আয়োজন করা হয়েছিল হিরাঝিল প্যালেসে। তা উপেক্ষা করে পালকিতে চেপে বসলেন ক্লাইভ। অনেক চেষ্টা করেও রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, মিরজাফর তাঁর মত পরিবর্তন করতে পারলেন না। ইংরেজ বাহিনী ফিরে চলল মোরাদবাগ প্যালেসে।

ক্লাইভকে বিদায় জানিয়ে হিরাঝিল প্যালেসে এসে ঢুকলেন নবাব মিরজাফর। ক্ষুব্ধ হয়েছেন কর্নেল। ইংরেজদের পাওনা মেটাতে হবে দ্রুত। একবারে মেটানো সম্ভব না হলেও মেটাতে হবে ধাপে ধাপে, কিস্তিতে। কিন্তু কোথা থেকে আসবে টাকা? কোনওরকমে ইংরেজদের পাওনা না-হয় মেটালেন, কিন্তু তাঁর নবাবির খরচ? সেনাবাহিনীর খরচ? এসব আসবে কোথা থেকে? চোখে অন্ধকার দেখলেন মিরজাফর। সহসা তাঁর মনে হল, মসনদের স্বাদ নোনতা।

৯

প্রায় দশ-বারো বছর আগের কথা। বাংলার নবাব তখন আলিবর্দি খাঁ।

আগ্রা থেকে এসে কাটরা মসজিদের পাশে এক অশ্বত্থ গাছের নীচে আখড়া বানিয়েছে এক ফকির। নাম শাহ দানা। বয়স চল্লিশের আশেপাশে হবে। সেই ফকির বলে থাকেন, কোনও পিরের বংশে নাকি তাঁর জন্ম। তিনি একজন পিরজাদা।

লোকে বলে পিরজাদা ফকির শাহ দানা ত্রিকালদর্শী। করকোষ্ঠী বিচার করে তিনি নাকি মানুষের ভূত-ভবিষ্যতের খতেন প্রায় নিখুঁত বলে দেন। ইনসানের বদনসিবকে খুশনসিবে পরিণত করতে শাহ দানা পাথর, মাদুলি, তাবিজ, কবচও দেন। সকাল থেকেই ভিড় লেগে থাকে তাঁর আখড়ায়। দূরদূরান্ত থেকে লোকে আসে। হাত দেখিয়ে ভাগ্য গুনিয়ে নিয়ে যায়। ফকির সাহেবের মোবারকে ভিড়ের কমতি নেই। মিঠাইওয়ালা, চুড়িওয়ালা, শরবতওয়ালা, ফলওয়ালা, বাঁশিওয়ালারা এসে আখড়ার পাশে রোজ পসরা নিয়ে বসে। শাহ দানার দৌলতে এদেরও দু'পয়সা উপায় হয়।

সেদিনও সকাল থেকে ছিল জমাট ভিড়। সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ভক্তেরা প্রতীক্ষা করছিল। ছন্দে চলছিল সব কিছুই। তাল কাটল হঠাৎই।

কাটরা মসজিদের সামনের পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছে একটা পর্দাঢাকা ডুলি। তার সামনে পিছনে হাতিয়ারবন্ধ পাইক-বরকন্দাজ। হঠাৎই শাহ দানার আখড়ার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ডুলিবাহকেরা। ডুলি নামিয়ে দিল মাটিতে। পাইক-বরকন্দাজরা অপ্রস্তুত। পথে ডুলি নামানোর হুকুম নেই। হিরাঝিল প্যালেসে পৌঁছতে হবে জলদি।

ডুলি থেমেছে এই ডুলির আরোহীর মর্জিতে। ডুলি থেকে নেমে এল সে। বোরখা পরিহিতা এক জেনানা। বড় একটা বট গাছের নীচে ফকির সাহেবের আখড়া। বাইজি এগিয়ে যায় সেদিকে। ইনি যে বিশেষ কেউ সেটা তার সঙ্গের হাতিয়ারবন্ধ সেপাইদের দেখেই আন্দাজ পাচ্ছে পথ চলতি আম-আদমি। কৌতূহলী চোখে তারা অবগুণ্ঠিতা রমণীকে দেখছে।

পাইক-বরকন্দাজরা স্তম্ভিত। কী করবে তারা ভেবে পাচ্ছে না। এই জেনানার খুশখেয়ালে বাধা দেওয়ার হিম্মত তাদের নেই। ওদিকে হিরাঝিলে পৌঁছতে দেরি হলেও বিপদ। পথে এই জেনানা ডুলি থেকে নেমে পড়ে আমআদমির ভিড়ের মধ্যে মিশে কোন এক ফকিরের ডেরায় গিয়ে উঠেছিলেন এ কথা মির্জা মহম্মদের কানে গেলে নোকরি যেতে পারে। নোকরি তো তাও মামুলি বস্তু। গর্দান থাকবে কি না তারও ঠিক নেই। পাইক-বরকন্দাজরা স্বাভাবিক কারণেই ত্রস্ত।

গোটা দলটা থমকে গিয়েছে টের পেয়ে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সামনে থেকে ছুটে পিছনে এলেন পাইক-বরকন্দাজদের দলপতি মেহেদি নিসার খাঁ। আলিবর্দির নাতি মির্জার দিল-পিয়ারা। ঘটনাটা দেখে তার তো চক্ষুস্থির। পথের ধারে ধুলোয় ফকির সাহেবের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছে মির্জার পিয়ারি। কী বেসহবত কাণ্ড!

মেহেদি নিসারের নির্দেশে হাতিয়ারবন্ধ পাইক-বরকন্দাজদের আখড়ার দিকে এগিয়ে যেতেই ছুটে পালায় আখড়ায় ভিড় জমানো আমলোগ। পসরা ফেলে পালায় মিঠাইওয়ালা, শরবতওয়ালা, চুড়িওয়ালা। এক নিমেষে গোটা চত্বর বেবাক খালি হয়ে যায়। হাতের ইশারায় পাইক-বরকন্দাজদের তফাতে যেতে বলে অবগুণ্ঠিতা।

ফকির শাহ্ দানা বিব্রত এবং খানিকটা ত্রস্তও।

'গোস্তাকি মাফ করবেন ফকির সাহেব। আমার জন্য আপনার বোধহয় বহুত পরেসানি হল। আপনার নাম শুনেছি। নসিবে কী আছে জানতে চাই। হাতটা যদি একটু—'

বোরখার আড়াল থেকে জেনানার কণ্ঠের শিরিন আওয়াজ শুনে শাহ্ দানা চমকে ওঠেন। বাচনভঙ্গিতে মিশে রয়েছে সামান্য কৌতুক। ধন্দে পড়ে যান শাহ্ দানা। গলার আওয়াজটা খুবই চেনা ঠেকছে। একজনের সঙ্গে বড্ড বেশি মিল। পশ্চিমের রুক্ষ এক দেহাতে পাশাপাশি ঘর ছিল তাদের। তার মুখটা শাহ্ দানা ভোলেননি আজও। এই জীবনে কখনও ভুলতে পারবেন না।

গরিবের ঘরে জন্মেও সে মেয়ের ছিল বেহেস্তের হুরির মতো মাথাঘোরানো রূপ। যৌবনের শুরুয়াতে সেই রূপ দেখে বহেরা বনে গিয়েছিলেন শাহ্ দানা। মনে মনে একান্তভাবে তাকে চেয়েছিলেন কিন্তু মনের কথা খুলে বলার অবকাশ পাননি। হঠাৎই সে হারিয়ে যায় একদিন। তারপর থেকেই ঘরের বাঁধনে শাহ্ দানার অনাশক্তি, তিনি হয়ে গেলেন খোদার পথের রাহী।

শাহ্ দানা বলেন, 'মালুম হচ্ছে আপনি কোনও বড় খানদানের আওরত। কে আপনি?'

'খানদান না জেনে আপনি বুঝি কারও কররেখা বিচার করেন না?'

ফের চমকে ওঠেন শাহ্ দানা। অবিকল একই রকম খুশ ইলহান আওয়াজ। তার নাম ছিল গুলরুখ। শাহ্ দানার মনে প্রবল কৌতূহল, মুখটা যদি একবার দেখা যায়। কিন্তু জেনানা বোরখার আগল না সরালে দেখার উপায় নেই। কিন্তু তা কী করে সম্ভব? সে কী করে আসবে এই বাংলা মুলুকে? কোথায় সেই মরুভূমির কোলঘেঁষা রুক্ষ দেহাত আর কোথায় এই সুবে বাংলা!

শাহ্ দানা ফের জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার পরিচয়?'

'ধরে নিন আপনার বাঁদি।'

বোরখার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে দুটো হাত। দুই হাতের আটটা আঙুলে ঝলমল করছে দামি দামি পাথরের আংটি। চিকন ডান হাতের কবজিতে আঁকা উলকিটা দেখে শাহ্ দানার হৃৎপিন্ডের গতি দ্রুততর হয়।

গরিবের গুলবাগিচায় ফুল বেশিদিন থাকে না। তাগদবাজেরা ছিঁড়ে নেয়। একদিন এক ওমরাহ্ দলবল সমেত ঘোড়া হাঁকিয়ে এসে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়েছিল গুলরুখকে। তারপর থেকে তার আর কোনও খবর শাহ্ দানা আজও জানেন না।

'কী ভাবছেন ফকির সাহেব?' প্রশ্ন করে জেনানা।

ঘোর থেকে জেগে উঠে শাহ্ দানা বলেন, 'কোথায় ঘর আপনার?'

হাসি ঝলকায় বোরখার আড়ালে। হাসি থামিয়ে জেনানা বলে, 'তা জেনে আপনার কী হবে? আপনি আমার নসিবের কথা বলুন।'

শাহ্ দানা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। তাঁর সামনে প্রসারিত জেনানার দুই করতল।

'ফকিরসাহেব বুঝি জেনানাদের নসিব গুনতে জানেন না?' এই বলে ফের হেসে ওঠে রহস্যময়ী।

জেনানার এই কথায় ও হাসিতে অপ্রতিভ হয়ে পড়ে জেনানার কোমল দুই হাতের কররেখার উপর মনোনিবেশ করেন শাহ্ দানা। বোরখার আড়াল থেকে কৌতুক ভরা একজোড়া চোখের দৃষ্টি যে তার মুখের

উপরে যে স্থির হয়ে রয়েছে, তা তিনি টের পেলেন না। নিজের বাঁ হাতের তালুর উপরে কোমল ডানহাতখানি রেখে সামনে ঝুঁকে পড়েন শাহ দানা।

পিছন থেকে দ্রুত এগিয়ে এসে প্রবল বিরক্তির সঙ্গে মেহেদি নিসার খাঁ বলে, 'বিসমিল্লা। এ কিন্তু বেসহবত কারবার হয়ে যাচ্ছে বাইসাহেবা। আপনি আমআদমি মাফিক পথের ধারে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন। ইজাজত দেন তো এই ফকিরকে উঠিয়ে নিয়ে যাই।'

'নেহি। চুপ রহো।' বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে কথাগুলো বলে ওঠে অবগুণ্ঠিতা।

অপ্রতিভ হয়ে পড়ে নিসার খাঁ বলে, 'মির্জার মাশুকা আপনি, তাঁর দিল কি রানি। পথে আপনি ডুলি থেকে নেমেছেন জানলে আমার গর্দান যাবে।'

বোরখার আড়াল থেকে খিলখিল করে হেসে উঠে জেনানা বলে, 'বেশ তো। গর্দান থাকবে না যাবে সেটা ফকির সাহেবের কাছে পুছতাছ করে নাও নিসার খাঁ।'

এবার নিসার খাঁর রাগ গিয়ে পড়ে শাহ দানার উপর। 'আরে এ উজবুক! বেতমিজ কাঁহিকা। বাইসাহেবা কা হাত পাকাড়কর কিউ বইঠে হো? মনে পেয়ারের তুফান ছুটছে বুঝি? জো কহানা হ্যায় জলদি সে বোলো।'

নিসার খাঁর ধমক খেয়ে ঘাবড়ে গিয়ে জেনানার হাত ছেড়ে দেন শাহ দানা।

বোরখার আড়াল থেকে হিসহিসে গলায় নিসার খাঁকে ধমকে ওঠে অবগুণ্ঠিতা, 'চুপ রহো বেতমিজ। ইমানদার আদমির সঙ্গে বাত করার সবক জান না? তফাত যাও। ভুলে যেও না আমি ফৈজি ফয়জান। মির্জাকে বলে তোমার কলিজাখানা আজই ছিঁড়ে নিতে পারি।'

শাহ দানা চমকে ওঠেন। ফৈজি ফয়জান! কসবী! যাকে নিয়ে তামাম মুর্শিদাবাদ জুড়ে এত আলোচনা?

অপমানিত হয়ে খানিকটা তফাতে গিয়ে দাঁড়ায় মেহেদি নিসার খাঁ। কড়া চোখে চেয়ে থাকে শাহ দানার দিকে।

সামনে হাত প্রসারিত করে ফৈজি বলে, 'বিসমিল্লা। কসুর মাফ করুন ফকির সাহেব। আমার নসিবের কথা বলুন।'

শাহ দানা বলে, 'বড় আজব আপনার করকোষ্ঠী। মালুম হচ্ছে আপনার জিন্দেগি স্রেফ শাহি শান-শওকতে ভরাট। লেকিন অচানক এক আঁধিতে তছনছ হয়ে যেতে পারে সব। তবে এখনই কোনও নিদান হাঁকতে চাই না। তালেনামা ঘেঁটে দেখতে হবে। কাল একবার আসবেন।'

'আপনার কোঠিতে? আকেলা?' এই বলে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে ফৈজি।

শাহ দানা হঠাৎ বলে ওঠেন, 'আমি চিনেছি তোমাকে। তুমি গুলরুখ।'

'গলত বাত। আমি ফৈজি ফয়জান। মির্জার দিল কি রানি।' এই বলে দ্রুত পায়ে হেঁটে গিয়ে ডুলিতে চড়ে বসে ফৈজি। ডুলিটা চলে যায়।

খানিকবাদেই কোতোয়ালির একদল সেপাই এসে শাহ দানাকে টেনে হিঁচড়ে ধরে নিয়ে গেল হিরাঝিল প্যালেসে। হাজির করল মির্জা মহম্মদ ও মেহেদি নিসার খাঁর সামনে।

ঘটনার নাটকীয়তায় শাহ দানা বাক্যহারা। কেন এই জুলুম মনে মনে তার উত্তর হাতড়ে চলেন। সামনে কুরসিতে বসে থাকা মির্জার চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে তাঁর বুক কেঁপে ওঠে।

মেহেদি নিসার খাঁ উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে, 'এই সেই ফকির হুজুর। বাইসাহেবার হাত ধরেছিল। ওর চোখে আমি মহব্বতের ঝিলিক দেখেছি। বেশরম ভণ্ড শয়তান। এর ফকিরি ঝুটা।'

মির্জার দু'চোখে আগুন জ্বলে ওঠে। সুকুমার মুখটা যে অমন ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে তা শাহ দানা কল্পনাও করতে পারেননি। আল্লাকে স্মরণ করতে থাকেন তিনি।

মির্জা গর্জন করে ওঠে, 'নিসার খাঁ!'

'হুজুর!'
'উসকি কান কাট দো।'
দু'কান চেপে ধরে আর্তনাদ করে ওঠেন শাহ দানা। 'মাফ করুন হুজুর।'
মির্জা গর্জন করে ওঠে, 'স্রেফ দো কান। শুধু খোদার পথের রাহী বলে জিন্দা ছেড়ে দিলাম।'
খঞ্জর হাতে নিসার খাঁ এগিয়ে আসে। শাহ দানা মরিয়া গলায় চিৎকার করে ওঠেন, 'রহেম করুন হুজুর, রহেম করুন।'

দু'জন পেয়াদা এসে জাপটে ধরে শাহ দানাকে। মির্জা মহম্মদের সামনে শির ঝুঁকিয়ে বসতে বাধ্য হন শাহ দানা। বলির পাঠার মতো কাঁপতে থাকেন। পৈশাচিক উল্লাসে খঞ্জর চালায় নিসার খাঁ। নরম দুটো মাংসপিণ্ড খসে পড়ে বহুত কিমতি গালিচার উপর। সেই সঙ্গে টপ টপ করে ঝরতে থাকে রক্ত। গাঢ় লাল গালিচার রঙের সঙ্গে খুনের রঙ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। শাহ দানা সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন সেই গালিচার উপরেই।

পরে হেকিমি দাওয়াইয়ে সুস্থ হয়ে উঠলেও মির্জার হুকুমে মুর্শিদাবাদ থেকে বাস ওঠাতে হয় তাঁকে। রাজমহলের কাছে পরিত্যক্ত এক মসজিদে ডেরা বাঁধেন শাহ দানা। কিছুদিনের মধ্যে কয়েকজন মুরিদও জুটে যায়। ফকির সাহেবের যে দু'কান কাটা তা জানে না কেউই। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা ঝাকড়া চুল সর্বদা ঢেকে রাখে শ্রবণযন্ত্রের উন্মুক্ত ছিদ্রদুটো।

মির্জার সেদিনের সেই ভয়ংকর মুখটা এই দশ বছরেও একদিনের জন্য ভোলেননি শাহ দানা। তাঁর মনে কোনও সন্দেহ নেই, তার কৈশোরের ভালোবাসা গুলরুখই ফৈজি ফয়জান। ভাবীকালের আন্দাজ নিতে এসেছিল ফৈজি। কয়েক মাসের মধ্যে আলিবর্দির নাতি মির্জার হাতে পড়ে তার কী হাল হয়েছিল, তা বিভিন্ন লোকের মুখে শুনেছেন শাহ দানা। সে কথা এখনও তামাম হিন্দুস্থানের ঘরে ঘরে চর্চা হয়। জ্যান্ত গোর দেওয়া হয়েছিল ফৈজিকে। খবরটা শুনে শাহ দানার বুকটা দুঃখে হুহু করে উঠেছিল।

সেদিনের সেই মির্জা মহম্মদই কয়েক সাল পরে হয়ে গেলেন তামাম সুবে বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলা। হায় আল্লা। ইনসাফ মিলবে কবে? তার সঙ্গে ঘটা অন্যায়ের, গুলরুখের সঙ্গে ঘটা অন্যায়ের বিচার করবেন না দুনিয়াদার? গত দশ-বারো সাল ধরে শাহ দানা মোনাজাত করেছেন দিনরাত। দুচোখ ভরে দেখতে চেয়েছেন সিরাজদ্দৌলার বরবাদি। এতদিনে আল্লা তার মোনাজাত মঞ্জুর করেছেন।

মাসুম বাচ্চা ও জেনানাসহ নাও নিয়ে নদীতে ভেসে পড়া, পানির অভাবে নদীতে আটকে যাওয়া, ক্ষুধার্ত হয়ে আহার ও আশ্রয়ের সন্ধানে মসজিদে এসে হাজির হওয়া মুসাফিরের বেশধারী লোকটি যে নবাব সিরাজদ্দৌলা শাহ দানা এক ঝলক দেখেই বুঝেছেন। না, কোনও ভুল নেই। সেই চোখ, সেই মুখমণ্ডল। দাড়ি-গোঁফের আড়ালেও চিনতে অসুবিধা হয়নি শাহ দানার। তা ছাড়া ওই মুসাফিরের নাগরায় বসানো রয়েছে বহুমূল্যবান হীরকখণ্ড। নবাব ছাড়া এমন জুতো পায়ে দেওয়ার সৌভাগ্য কার হয়? অবশ্যই উনি সিরাজদ্দৌলা।

পলাশির ময়দানে সিরাজদ্দৌলার পরাজয় হয়েছে। নবাব পালিয়ে গিয়েছেন মুর্শিদাবাদ থেকে। মিরজাফরের দামাদ মিরকাশিমের বাহিনী খুঁজে বেড়াচ্ছে তাঁকে। ফৌজ নিয়ে মিরকাশিম ছাউনি ফেলেছেন কয়েক ক্রোশ দূরে। তাদের আন্দাজ রাজমহল অভিমুখে গিয়েছেন সিরাজদ্দৌলা। দু'দিন আগে মুর্শিদাবাদ থেকে আসা এক দরবেশের মুখ থেকে এসব কথা শুনেছেন শাহ দানা। সবই মিলে যাচ্ছে। কোনও ভুল নেই। ওই মুসাফিরই সিরাজদ্দৌলা।

জোছনায় ভাসছে চরাচর। চিকচিক করছে নদীর জল। তটভূমি বরাবর তিরবেগে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলেছেন শাহ দানা। আজ তাঁর গোটা শরীরে যেন নবযৌবনের জোশ। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ঘোড়া। ফেনা বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে। এ তো আর ফৌজি ঘোড়া নয়। গৃহস্থের ঘরের মোট বওয়া নাজুক নড়বড়ে ঘোড়াটাকে শাহ দানার

মুরিদ সেলিম একজনের থেকে ধার নিয়ে এসেছে। এ ঘোড়া এত ধকল সইতে পারবে কেন? কিন্তু শাহ দানা নাছোড়বান্দা। দ্রুত তাকে পৌঁছতে হবে মিরকাশিমের শিবিরে। পায়ের গোড়ালি দিয়ে ঘোড়ার পেটে ফের এক জবরদস্ত খোঁচা মারেন ফকির সাহেব। নিজের জান বাজি রেখে ছুটতে থাকে ঘোড়া।

'উসকি কান কাট দো'—কথাটা যেন চারপাশ থেকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে শাহ দানার কানে। তিনি ভাবতে থাকেন, দুনিয়াদারের কী বিচিত্র খেল। তামাম সুবে বাংলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সিরাজদ্দৌলা, একদা যার হাতে শাহ দানার হেনস্থা, তাঁর কলিজা এখন তাঁর হাতের মুঠোয়।

সেলিম জানে না ওই মুসাফিরের আসল পরিচয়। শাহ দানাও ভেঙে কিছু বলেননি। সেলিমকে শুধু বলে এসেছেন তিনি একদিনের জন্য একটা বিশেষ কাজে যাচ্ছেন এক মুরিদের গৃহে। মসজিদের হুজরায় আশ্রয় নেওয়া মুসাফির ও তার পরিবারের যেন কোনও অযত্ন না হয়।

সিরাজদ্দৌলা যে তাঁকে চিনতে পারেননি, সে বিষয়ে শাহ দানা নিশ্চিত। এই দশ বছরে শাহ দানার চেহারাটা অনেক ভেঙেছে। ঘাড় অবধি লম্বা চুল ও লম্বা দাড়িগোঁফের জঙ্গলে হারিয়ে গিয়েছে পুরোনো মুখটা। আগের মেদবহুল চেহারাটা হয়েছে পাকানো দড়ির মতো।

শাহি রিয়াসতে একজন পরাজিত নবাব বিজয়ীপক্ষের হেফাজতে গেলে তাঁর কী পরিণতি হতে পারে শাহ দানা ভালোই জানেন। প্রতিহিংসার আগুন ঝলকাচ্ছে শাহ দানার দুই চোখে। সিরাজদ্দৌলাকে কিছুতেই রহেম করতে পারবেন না তিনি। পলাতক নবাবের খবর তিনি মিরকাশিমের কাছে পৌঁছে দেবেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ হওয়ার খুশিতে সহসা উন্মাদের মতো অট্টহাস্য করে ওঠেন শাহ দানা। সে হাসি তাঁর নিজের কানেই বড় বীভৎস শোনায়। সহসা ফকির সাহেবের চোখে পড়ে অসংখ্য বিন্দু বিন্দু মশালের আলো। নিঃসন্দেহে ওখানেই মিরকাশিমের ছাউনি। শাহ দানা ফের সজোরে হেসে ওঠেন। ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে চলেন।

নানা দুশ্চিন্তায় তোলপাড় হয়ে আছে মিরকাশিমের মন। একটা একটা করে দিন চলে যাচ্ছে। এখনও সিরাজদ্দৌলার সন্ধান মিলল না। ক্রমশ অধৈর্য হয়ে পড়ছেন মিরকাশিম।

দরবার রাজনীতিতে উত্থানের এই তো দারুণ সময়। কামিল ইনসান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে নিজেকে। যে কাজের ভার শ্বশুর মিরজাফর তাঁর কাঁধে চাপিয়েছেন সে কাজে সফল হতে হবে। গ্রেফতার করতে হবে সিরাজদ্দৌলাকে। জিন্দা।

রাজনীতির হকিকত বুদ্ধিমান মিরকাশিম ভালোই বোঝেন। পলাশির পরে সুবে বাংলায় ইংরেজদের উপেক্ষা করার আর কোনও উপায় নেই। ভবিষ্যতে মসনদে বসতে হলে ইংরেজদের সাহায্য চাই। কিন্তু মিরজাফরের অবর্তমানে মিরনকে ছেড়ে কেন তাঁর পিছনে বাজি ধরবে ইংরেজরা। তিনি তো এখনও ইংরেজদের কাছে অপরিচিত একজন মানুষ।

মিরকাশিম জানেন সিরাজদ্দৌলাকে গ্রেফতার করার জন্য মিরজাফর খাঁর চেয়েও বেশি মরিয়া কর্নেল ক্লাইভ। পাটনায় পালিয়ে যেতে পারলে নিজের শক্তিকে ফের সংহত করে প্রত্যাঘাত করতে পারেন সিরাজদ্দৌলা। এ নিয়ে মিরজাফর যতটা না চিন্তিত তার চেয়ে বেশি চিন্তিত ক্লাইভ। তাই এখন কর্নেলের মূল লক্ষ্য সিরাজকে যত দ্রুত সম্ভব গ্রেফতার করা। আর এই কাজের গুরু দায়িত্ব মিরকাশিমের কাঁধে।

এ কাজে সফল হলে মিরকাশিম দু'দিক থেকে লাভবান হবেন। নিজামতের শাসনযন্ত্রে বড় একটা পদ তিনি আশা করতে পারেন আর সেই সঙ্গে কর্নেল ক্লাইভও খুশি হবেন তাঁর উপরে। কামিল ইনসান হিসেবে ইংরেজ মহলে তাঁর নামটা ছড়িয়ে পড়বে। এসবই অংকের সূত্রে বাঁধা। গণিতের মেধাবী ছাত্র মিরকাশিম সবই বোঝেন। কিন্তু কার্যসিদ্ধি হচ্ছে কোথায়? কোথায় সিরাজদ্দৌলা?

আজও তো কাসিদরা পলাতক সিরাজের কোনও সংবাদ আনতে পারল না।

সামনে খোলা রয়েছে তালেনামা। নদীর জল ছুয়ে ছুটে আসা শীতল বাতাসে এলোমেলো ভাবে উলটে যাচ্ছে পুঁথির পাতা। পাঠে মন নেই মিরকাশিমের। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে চিন্তিত মুখে ফরসির নলে টান দিয়ে চলেছেন। তাঁবুর জানলা দিয়ে এক মুঠো জোৎস্না এসে পড়েছে ফরাসের উপরে। চরাচর ভয়ানক চুপচাপ। শুধু কানে ভেসে আসছে ঝিঁঝির কলতান।

খাস বান্দা এসে জানাল, 'হুজুর একজন ফকির আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়।'

চিন্তামগ্ন মিরকাশিম কথাটা যেন ঠিক শুনতে পেলেন না। তাকিয়ে আছেন জানলা দিয়ে দৃশ্যমান কালো ঝাঁকড়া গাছগাছালির মাথায় আকাশে ভেসে থাকা গোল চাঁদটার দিকে।

বান্দা ফের বললে, 'হুজুর!'

মুখ ঘোরালেন মিরকাশিম।

বান্দা গুজারেশ করে 'একজন ফকির আপনার সাক্ষাৎ চায়।'

ফরসির নলে টান দিতে গিয়ে থমকে গেলেন মিরকাশিম। 'ফকির? এই অনওয়াক্তে?'

'বললে বহুত জরুরি বাত। কেবল আপনার মোবারকেই গুজারেশ করতে চায়।'

কপালে ভাঁজ পড়ে মিরকাশিমের। প্রশ্ন করেন, 'পরিচয়?'

'জানি না। ফকির বললে কাছেই থাকে। নাম শাহ দানা।'

ফকিরের নামটা শুনেই চমকে উঠলেন মিরকাশিম। মনের পর্দায় ভেসে উঠল বারো বছর আগের এক তসবির।

কাটরা মসজিদের পাশে আখড়া গেড়েছিল এক ফকির। এক রিস্তেদারের মুখে মিরকাশিম শুনেছিলেন, লোকটা নাকি জ্যোতিষবিদ্যায় পারদর্শী। ভাবীকালের নিখুঁত আন্দাজ দেয়।

নিজের পরিচয় গোপন করে মিরকাশিম একদিন গিয়েছিলেন তাঁর আখড়ায়। বয়সে তরুণ ফকির সাহেবকে দেখে মিরকাশিমের মনে প্রথমে বড় একটা ভক্তি জাগেনি।

মিরকাশিমের কপালের দিকে তাকিয়ে সেই ফকির বলে উঠেছিলেন, 'ইন্তেজার করুন। আপনার জিন্দেগিতে শান-শওকত, রওনকের পল খুব দূরে নয়।'

খুশি হয়ে ফকিরকে একটা মোহর উপহার দিয়েছিলেন মিরকাশিম। কয়েকদিন পরে শুনেছিলেন মির্জার হাতে বেইজ্জত হয়েছেন সেই ফকির। কারণটা কেউই সঠিক জানে না। তবে ফকিরের কান দুটো কেটে নিয়েছেন আলিবর্দির পেয়ারের নাতি। মুর্শিদাবাদ থেকে বাস উঠিয়ে সেই ফকির নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছেন।

মিরকাশিম ব্যস্ত গলায় বলেন, 'ফকির সাহেবকে এখানে নিয়ে এসো। তুরন্ত।'

'জি হুজুর।' বান্দা চলে যায়।

১০

এই অনওয়াক্তে হাজির হয়ে কী গুজারেশ করতে চান শাহ দানা? কোনও খুশখবর কি? যে খবরের জন্য তিনি পড়ে রয়েছেন এই আইরান প্রান্তরে। উত্তেজিত মিরকাশিম ফরসির নলে ঘনঘন টান দিতে থাকেন।

খানিকবাদে তনসুখ কাপড়ের পর্দা সরিয়ে তাঁবুর অন্দরে প্রবেশ করেন শাহ দানা। মিরকাশিমকে তসলিম জানিয়ে বলেন, 'আল্লার রহেমে সহি সালামত থাকুন মালিক। আমি পিরজাদা শাহ দানা। আপনার বান্দা।'

একদৃষ্টে শাহ দানার দিকে চেয়ে থাকেন মিরকাশিম। ফকিরের পরনে মলিন কুর্তা ও জোব্বা। চোখদুটো কোটরে ঢোকা। শীর্ণ ঋজু চেহারা। মাথায় কান ঢাকা ঝাঁকড়া চুল। মুখে ঘন দাড়ি বুক পর্যন্ত লম্বা। পাক

ধরেছে চুল ও দাড়িতে। এই মুখের সঙ্গে বারো সাল আগে দেখা মুখের মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

মিরকাশিম বলেন, 'বসুন ফকির সাহেব।'

'বহুত সুক্রিয়া।' এই বলে ফরাসের এক কোণায় সংকোচের সঙ্গে উপবেশন করেন শাহ দানা।

মিরকাশিম শুধোন, 'কাটরা মসজিদের পাশে আপনার আখড়া ছিল কি একসময়?'

উৎসাহিত গলায় শাহ দানা বলেন, 'জি মালিক। বহুত পুরানি বাত। ইয়াদ আছে আপনার?'

'সিরাজদ্দৌলার হাতে আপনার বেইজ্জতির কথা আমি জানি।'

কানের পাশের চুল সরিয়ে শাহ দানা বলেন, 'এই যে মালিক সেই নিশান এখনও বয়ে বেড়াচ্ছি।'

শিউরে ওঠেন মিরকাশিম। চোয়ালের সামান্য উপরে জেগে আছে শুধু একটা ছিদ্র। আলিবর্দির আদুরে নাতির খুশখেয়ালের দাগ।

'ইয়ে মেরা বদ কিসমতি হুজুর।'

চোখ নামিয়ে নেন মিরকাশিম। বলেন, 'কী চাই? ফরমায়েশ করুন ফকির সাহেব।'

ফরাসের উপরে পড়ে থাকা জন্মছক আঁকা কাগজ ও জ্যোতিষশাস্ত্রের পুঁথিগুলোর দিকে চেয়ে শাহ দানা বলেন, 'মালুম হচ্ছে আপনি তকদির-তলাশ করছিলেন।'

মিরকাশিম মৃদু হেসে বলেন, 'এ বিদ্যা আমি কিছুটা জানি। এ বিষয়ে আপনার কুদরতির কথাও জানি।'

শাহ দানা অবাক হয়ে মিরকাশিমের দিকে তাকালেন।

মিরকাশিম বলেন, 'কাটরা মসজিদের পাশে আপনার ডেরায় একবার গিয়েছিলাম। আমার কপাল দেখে আপনি বলেছিলেন একদিন শান-শওকত-রওশনে ভরে যাবে আমার জিন্দেগি।'

'তাই বুঝি?'

সম্মতিসূচক মাথা নাড়েন মিরকাশিম।

শাহ দানা বলেন, 'মালুম হচ্ছে আপনি আপনার পরিচয় ছুপিয়ে এসেছিলেন হুজুর। না হলে আপনার কথা আমার ইয়াদ থাকত।'

'শুনেছিলাম আপনার নিদান অব্যর্থ। তাই যাচ-ইমতেহানি করতে গিয়েছিলাম জালসাজিসে।'

'কী বুঝছেন এখন?' শাহ দানার মুখে মৃদু হাসির রেশ।

'কোথায় শান-শওকত-রওশন ফকির সাহেব? লক্ষণ তো কিছু নজরে পড়ছে না।'

'শাহ দানার নিদান ঝুটা হতে পারে না হুজুর।'

'ভরসা যে পাচ্ছি না ফকির সাহেব। এখানে তাঁবুর উর্দু গেড়ে কী খুঁজে বেড়াচ্ছি জানেন?'

'জানি। খুশনসিবি।'

'জানেন, কী সেই খুশনসিবি?'

'সিরাজদ্দৌলার গ্রেফতারি।'

শাহ দানার এই উত্তরে খুব একটা অবাক হলেন না মিরকাশিম। সিরাজের খোঁজে তার কাসিদরা ঘুরে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। গ্রামে গ্রামে ঢোলশোহরত হয়েছে। ঢোল পিটিয়ে, শিঙা ফুকে তারা জানিয়েছে পলাশির লড়াই ফতে করেছে ইংরেজরা। মসনদে বসেছেন মিরজাফর। সিরাজদ্দৌলা পলাতক। যে তাঁর হদিশ দিতে পারবে, মোটা ইনাম পাবে।

মিরকাশিম বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই ঢোলশোহরত শুনেছেন?'

'না হুজুর। শুনিনি।'

'তাহলে কেমন করে জানলেন আমি পলাতক সিরাজদ্দৌলাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি?'

'এ কথা তো তামাম বাংলার লোক জানে। এক দরবেশের মুখে শুনেছি।'

আনত চোখে ভূমির দিকে চেয়ে মিরকাশিম বললেন, 'লোকে বলবে মিরকাশিম নালায়েক।'

'কেন বলছেন একথা?'

'সিরাজদ্দৌলার হদিশ তো এখনও মিলল না। সিরাজকে জিন্দা গ্রেফতার করতে না পারলে আমার ঘোর বেইজ্জতি হবে। সত্যিই সাবুত হবে মিরকাশিম নালায়েক। আমার নসিবের চাকা ঘুরবে কী করে?'

শাহ দানা হাসেন। শীর্ণ মুখটা ঝলমল করে ওঠে।

'হাসছেন যে?' প্রশ্ন করেন মিরকাশিম।

'আপনার খুশনসিবির খবর আমি বয়ে নিয়ে এসেছি।'

ফরসির নলে টান দিতে গিয়ে থমকে যান মিরকাশিম। অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন, 'মতলব?'

মুখে মৃদু হাসি ঝুলিয়ে রেখে শাহ দানা বলেন, 'সিরাজদ্দৌলার খবর আমি জানি। সেই খবরটা আপনাকে দিতেই আমার এখানে আসা।'

শিহরিত হয়ে ওঠেন মিরকাশিম। চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। শিরদাঁড়া টানটান করে সোজা হয়ে বসে ভয়ানক ব্যস্ত গলায় প্রশ্ন করেন, 'কোথায় সিরাজদ্দৌলা?'

'মুসাফিরের ছদ্মবেশে বিহার মুলুকের দিকে যাচ্ছিলেন। আমার ডেরায় আশ্রয় নিয়েছেন।'

'সচ বলছেন আপনি?' উত্তেজিত হয়ে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মিরকাশিম।

উঠে দাঁড়ালেন শাহ দানাও। জবাবে বললেন, 'বিলকুল। আপনি নয়া নবাবের দামাদ। ঝুটমুট বললে আপনি আমার গর্দান নিতে পারেন।'

'কোথায়? কোথায় আপনার ডেরা?' মিরকাশিম ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে পড়েন।

'এখান থেকে করিব ছয় ক্রোশ দূরে। নাজিরপুরের মোহনার কাছে। মুসাফিরের জালসাজিশে নাও নিয়ে ভেসে যাচ্ছিলেন পরাজিত নবাব। যাদা পানি নেই মোহনায়। নাও আটকে যায় চরায়। এই মুসিবতে পড়ে সিরাজদ্দৌলা আশ্রয় নিয়েছেন মসজিদ লাগোয়া হুজরায়। সঙ্গে আছে এক মাসুম লেড়কি ও এক জেনানা।'

মিরকাশিম উল্লাসে চেচিয়ে ওঠেন। 'ইনসাল্লা। আপনি বিলকুল সচ বলছেন।'

'খুশনসিবি আপনার মুঠঠিতে। জলদি চলুন মালিক।'

খানিক বাদেই নদীতে ভেসে পড়ে পাঁচ-ছখানা ছিপ নৌকা। গভীর রাতে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে থাকা নদী সহসা চঞ্চল হয়ে ওঠে।

ভোরের আলো সবে ফুটেছে। সিরাজদ্দৌলা ঘুম ভাঙ্গার পর অভ্যাসের বসে দাখিলাদের ডাকার জন্য ঘন্টির ডোরিটা খোঁজেন। পরক্ষণেই ভুল ভাঙে। এতো হিরাঝিল প্যালেস নয়। তিনি শুয়ে আছেন অজানা এক গাঁয়ের মসজিদ লাগোয়া মাটির ঘরের মেঝেতে বিছানো জীর্ণ একখানা মলিদার উপরে।

মনটা বিষাদে ভরে যায়। সিরাজের মনে হয়, মাথার উপরে কেউ চাপিয়ে দিয়েছে পাষাণভার। অদূরে এক খণ্ড পাথরে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমোচ্ছে ক্লান্ত লুৎফা। গালের উপরে শুকিয়ে গিয়েছে চোখের জলের দাগ। লুৎফার কোলের কাছে শুয়ে রয়েছে উম্মেসায়েরা। তার গায়ের উপরে বিছানো রয়েছে লুৎফারই পাতলা একখানা উড়নি।

কাল রাতে উম্মেসায়েরার জ্বর এসেছিল। স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে ছেঁড়া মলিদার উপরে শুয়ে হু-হু করে কাঁপছিল একরত্তি নবাবনন্দিনী। গায়ের উড়নিখানা দিয়ে তাকে জড়িয়ে রেখেছিল লুৎফা তবুও কাঁপছিল সায়েরা। লুৎফা রুমাল ভিজিয়ে জলপট্টি দিচ্ছিল সায়েরার মাথায়। মেয়ের পাশে বসে ছিলেন অসহায় সিরাজ। তারপর ক্লান্ত শরীরটা কখন যে ঢলে পড়েছিল গভীর ঘুমে, তা আর খেয়াল নেই সিরাজের।

মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে সিরাজ দেখলেন জ্বরটা একটু কমেছে, তবে পুরোপুরি যায়নি। কোথায় হেকিম, কোথায় দাওয়াই, কী দিয়ে ইলাজ করবেন মেয়ের? বুকের মধ্যে জমাট বাঁধে কষ্ট, বোবা কান্নায় গলা বুজে

আসে সিরাজের। ফকির সাহেবের কাছে হয়তো কোনও জ্বর উপশমের জড়িবুটি মিলতে পারে। কিন্তু গতকাল বিকেলে জরুরি কাজে কোথাও গিয়েছেন। বলে গিয়েছেন ফিরবেন ক'দিন বাদে। এ সময় ফকিরকে পাশে পেলে খুব সুবিধে হত।

ঘরের বাইরে এসে মাটির দাওয়ায় বসেন সিরাজ। খানিক্ষণ হল, ভোরের আলো ফুটেছে। ঝকঝকে সকাল। আশপাশের গাছগাছালি থেকে ভেসে আসছে পাখির কলকাকলি। দূরে নদীর পাড়ে পড়ে রয়েছে নৌকাখানা। দেখতে পাচ্ছেন সিরাজ। কাত হয়ে থাকা নৌকাটা তাঁর বদকিসমতির নিশান। নাহানে পানির আকাল। না হলে এতক্ষণে রাজমহলে পৌঁছে যাওয়া যেত।

দাওয়া থেকে নামলেই কুয়ো। তারপরে রসুইঘর ও দস্তরখানা। কুয়োতলায় পড়ে রয়েছে গলায় পাটের দড়ি বাঁধা মাটির একটা কলসি। কুয়োতলায় এসে কলসিটা কুয়োর ভিতরে নামিয়ে দেন সিরাজ। বগবগ শব্দে জল ভরতে থাকে কলসিতে। ধীরে ধীরে ভরন্ত কলসিটা ডুবে যায়। টান পড়ে দড়িতে। মামুলি এক দৃশ্য। তবু ঝুঁকে পড়ে দড়ি হাতে কলসির ডুবে যাওয়াটা মন দিয়ে দেখছিলেন সিরাজ। দড়িতে টান পড়তে জলভরা কলসিটা টেনে উপরে তুলে আনলেন। কলসির জল ঢেলে দিলেন কুয়োতলায় পড়ে থাকা একটা শূন্য চিলুমচিতে।

চিরকাল এসব কায়িক শ্রমের কাজ করে এসেছে গোলাম-দাখিলারা। নবাব ঘুম থেকে উঠতেই তারা রুপোর পাত্রে হাতমুখ ধোয়ার গুলাবজল এগিয়ে দিয়েছে। আজ গোলামদের মতো এই গোদা কাজ করতে সিরাজের মন্দ লাগল না। গাড়ুতে করে চিলুমচি থেকে জল তুলে সিরাজদ্দৌলা হাতমুখ ধুলেন। চোখেমুখে শীতল জলের ঝাপটা দিয়ে বেশ আরাম লাগল।

তারপরে মসজিদ চত্বরে পদচারণা করতে লাগলেন সিরাজ। বেশ জায়গাটা। সিরাজের হঠাৎ মনে হল, এমন কোনও এক অচেনা দেহাতে লুৎফাকে নিয়ে যদি ঘর বাঁধতে পারতেন তাহলে কেমন হত? একখানা ঘর, দাওয়া, এক চিলতে উঠোন, কুয়োতলা, তারপরে রসুইঘর—সব মিলিয়ে মিয়া-বিবির ছোট্ট সাজানো সংসার। নাই বা থাকল, হিরাঝিল প্যালেসের আরাম-আয়েশ! গোলাম-দাখিলা-বাঁদি-বান্দা দিয়ে পরিবৃত জীবনের চেয়ে দেহাতের সামান্য এক আদমির মতো দিন গুজরান বোধ হয় অনেক সুখের হত।

কাল রাতে খানা পাকিয়েছিল লুৎফা নিজেই। মোটা চালের খিচুড়ি আর লাবড়া। পরম তৃপ্তিতে খেয়েছেন সিরাজ। রসুইঘরে লুৎফা যখন আহারের আনজামে ব্যস্ত ছিল তখন দরজার চৌকাঠে সামনে পা ছড়িয়ে বসেছিলেন সিরাজ। বাবার কোলের মধ্যে চুপ করে বসেছিল উম্মেসায়েরা। পরম মমতায় মেয়ের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন সিরাজ আর মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে লুৎফাকে দেখছিলেন। গৃহস্থালির কাজে ব্যস্ত লুৎফা ঠিক যেন দেহাতের এক বিবি। আগুনের আঁচে গলদঘর্ম।

তামাম সুবে বাংলার দেহাতে দেহাতে আমআদমি তো এভাবেই দিন গুজরান করে। মরদেরা গতর খাটিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সামান্য উপায় করে। ক্লান্ত হয়ে দিনের শেষে ঘরে ফেরে। বিবি খানা পাকায়। বাল-বাচ্চার দেখভাল করে। রাতে বাড়ির দাওয়ায় বসে মরদ তার বিবি সুখ-দুঃখের গল্প করে, জীবনের খুব ছোটছোট আশা পূরণের খোয়াব দেখে। জীবনের অনেক আশাই হয়তো তাদের পূরণ হয় না, তবু সিরাজের মনে হল, তাদের জীবনে অনেক সুখ। নবাবের তকদিরে মসনদ, তাজ, দৌলত, তাগদ, রোশনি যেমন আছে তেমনই আছে গহীন আঁধার, কাঁটা, খন্নাসি, সাজিসি, গদ্দারি। আর সব সময় আছে অতল কালো গহ্বরে তলিয়ে যাওয়ার ভয়। সব কিছু হারিয়ে ফেলার ভয়। জীবনকে উপভোগ করার ফুরসত যেন ঠিক মেলে না। শুধু তাগদ-ক্ষমতা ধরে রাখার ভাবনায় জেরবার হতে হয়।

কাল রাতে অপূর্ব রান্না করেছিল লুৎফা। সে রান্নার স্বাদ সিরাজের মুখে এখনও যেন লেগে আছে। পাশাপাশি খেতে বসেছিলেন সিরাজ ও সেলিম। খাদিমদারি করছিল লুৎফা নিজেই। শাহ দানার মুরিদ এই

সেলিম ছেলেটির বয়স বেশি না। খুব জোর সতেরো-আঠেরো হবে। প্রথমদিন সেলিম নিজেই রান্নাবান্না করে খাইয়েছিল তাদের। পরের দিন থেকে রান্নার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে লুৎফা।

খিচুড়ি মুখে দিয়ে সেলিম বলে, 'ভাবীজি আপনার রসুইয়ের তরিকতই আলগ। কেয়া খুশনসিব দাদাজির।'

ঘুংঘুটের আড়ালে নিঃশব্দ মলিন হাসি খেলে যায় লুৎফার ঠোঁটে।

সেলিম হঠাৎ শুধোয়, 'পলাশির হকিকত জানেন?'

সিরাজ চমকে ওঠেন। নিজেকে সামলে নিয়ে মুখে গ্রাস তুলতে গিয়ে থমকে গিয়ে নিখুঁত অভিনয়ের ভঙ্গিতে শুধোন, 'কী হকিকত?'

'জানেন না? নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই বেঁধেছিল।'

শঙ্কায় কেঁপে ওঠে লুৎফা। শ্বাস বন্ধ করে স্থির হয়ে বসে থাকে। নেকাবের আড়াল থেকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে সেলিমের মুখের দিকে।

সিরাজ বলেন, 'তাই বুঝি?'

সেলিম বলে, 'মুর্শিদাবাদ থেকে এক দরবেশ যাচ্ছিল মুঙ্গেরে। রাতে মুসাফিরখানায় আশ্রয় নিয়েছিল। তার মুখে শুনেছি ইনকিলাবের কথা।'

'কী শুনেছ?' প্রশ্ন করেন সিরাজ।

'ইংরেজরা লড়াই ফতে করেছে। নবাব সিরাজদ্দৌলা পলাতক। মসনদে বসবেন মিরজাফর খাঁ। আপনি তো ওদিক থেকেই আসছেন। জানেন না?'

'মুর্শিদাবাদ নয় ভাই, আসছি জাহাঙ্গিরনগর থেকে।'

'পথে শোনেননি কিছু?'

মুচকি হেসে সিরাজ বলেন, 'না ভাই। আমরা আমআদমি। নবাব-বাদশার কিসসা-কহানির খতেন জেনে আমাদের ফয়দা কী?'

সেলিম বলে, 'এ বোধ হয় ভালোই হল।'

'কী ভালো হল?' প্রশ্ন করেন সিরাজ।

'সিরাজদ্দৌলার বরবাদিতে তামাম সুবে বাংলার নসিব ফিরবে।'

একথা শুনে সিরাজের বুকে যেন শেল বিঁধল। সামান্য প্রজাদের মনেও কি তার প্রতি এতটুকু সহানুভূতি অবশিষ্ট নেই? সবার চোখেই কি তিনি আজ খলনায়ক? আলিবর্দির দৌহিত্র তিনি। বর্গির আক্রমণ থেকে যে আলিবর্দি বারো বছর ধরে লড়াই করে সুবে বাংলার মানুষদের বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, তার জন্য কি কোনও কৃতজ্ঞতা বোধ নেই সাধারণ মানুষের? আজ তাঁর দৌহিত্রের বরবাদিতে এরা সবাই খুশি?

মসনদে তো বেশিদিন বসেননি সিরাজ। নবাব হওয়ার পর এক বছর ঘুরতে না ঘুরতেই পলাশিতে তাঁর পরাজয়। শাসক হিসেবে তিনি ভালো কি মন্দ তার আন্দাজ কেমন করে পাবে সাধারণ মানুষ? তবু তাঁর প্রতি সকলে নারাজ কেন? মিরজাফর-আলিবর্দি-জগৎশেঠ এরা সবাই মিলে নিশ্চয় সাধারণ মানুষের মনে তাঁর প্রতি গভীর নফরতি জাগিয়ে তুলেছে সুকৌশলে।

সিরাজ শুধোলেন, 'একথা বলছ কেন?'

সেলিম বলে, 'অনেকে বলে নবাব সিরাজদ্দৌলা নাকি সঙ্গদিল আদমি ছিলেন। হোসেনকুলি খাঁকে অন্যায় ভাবে কোতল করেছিলেন। ফৈজি নামে এক জেনানাকে জ্যান্ত গোর দিয়েছিলেন। ফকির সাহেবের মুখে শুনেছি এসব কথা।'

মাথা নিচু করে গ্রাস তুলতে তুলতে সিরাজ বলেন, 'তেমন আমিও শুনেছি। তবে সেলিম আমরা তো শুধু একদিকের কথা জানি। নবাবের অন্তরের কথা তো জানি না। হয়তো তাঁর সঙ্গদিল হওয়ার পিছনে কোনও কারণ ছিল। এখন এসব আলোচনা থাক। তুমি খাও।'

সেলিম হেসে বলে, 'মালুম হয় নবাব-বাদশার জিন্দেগি বড় পরেসানির। তার চেয়ে ফকিরিই ভালো। কী বলেন দাদাজি?'

লুৎফা শুধোয়, 'নাও বাওয়ার পানি কবে মিলবে বলতে পার সেলিমভাই?'

'এখানে বুঝি ভাবীজির ভালো লাগছে না?' লুৎফার দিকে চেয়ে শুধোয় সেলিম।

লুৎফা বলে, 'আজমের শরিফ যাব বলে বেরিয়েছি আমরা। পথে শুধু শুধু আটকে থাকতে কি ভালো লাগে?'

সেলিম হেসে বলে, 'ইয়ে সহি বাত।'

মাথা নিচু করে চুপচাপ খেতে থাকেন সিরাজদ্দৌলা।

সেলিম ফের বলে, 'শুনলাম এখান থেকে করিব ছ'-সাত ক্রোশ তফাতে ফৌজি তাম্বু পড়েছে।'

মুখে গ্রাস তুলতে গিয়ে থমকে যান সিরাজ। মুখ তুলে সেলিমের দিকে তাকিয়ে শুধোলেন, 'ফৌজি তাম্বু?'

'হুঁ। মিরজাফর খাঁর দামাদ মিরকাশিম ফৌজ নিয়ে এসেছেন।'

'কেন? লড়াই বাঁধবে বুঝি?'

'না না ফের লড়াই কীসের? লড়াই তো পলাশিতে খতম হয়ে গেছে। ফৌজ এসেছে নবাব সিরাজদ্দৌলার খোঁজে। সেরকমই তো শুনলাম।'

ছ'-সাত ক্রোশের মধ্যে মিরকাশিমের তাঁবু! মিরজাফরের ফৌজ খুঁজে বেড়াচ্ছে সিরাজকে। লুৎফা ও সিরাজ দুজনেই ভিতরে ভিতরে কেঁপে উঠলেন।

মসজিদের চৌহদ্দিতে পদচারণা করতে করতে গতকাল রাতে সেলিমের কথাগুলো ভাবছিলেন সিরাজদ্দৌলা। মনের মধ্যে নানা চিন্তার ঝড় বইছে। মাত্র ছয়-সাত ক্রোশ দূরত্বের মধ্যে ফৌজ নিয়ে ছাউনি ফেলেছেন মিরকাশিম। এতক্ষণে রাজমহল পার হয়ে চলে যাওয়া যেত। নদীর পাড়ে কাত হয়ে থাকা নৌকোটার দিকে চোখ যায় সিরাজের। গলুইয়ের উপরে নিশ্চিন্তে খেলে বেড়াচ্ছে কয়েকটা হলদে রঙের পাখি। মাঝিরা বোধহয় এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। এই বন-জঙ্গলে ভরা এলাকা চারিদিকে জল দিয়ে ঘেরা। নদীতে নাও বাওয়ার মতো জল না পেলে এ জায়গা ছেড়ে এগোনোর উপায় নেই।

'মেহের?'

হঠাৎই মানুষের গলার আওয়াজ শুনে চমকে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন সিরাজ। লুৎফা এসে সিরাজের পাশে দাঁড়াল।

সদ্য ঘুম থেকে উঠেছে লুৎফা। সিরাজ মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন। ভোরের মিঠে আলোয় লুৎফাকে বড় অপূর্ব দেখাচ্ছে।

লুৎফা বলে, 'সায়েরার জ্বরটা কমেছে। আল্লার বহুত মেহেরবানি।'

'সায়েরা ঘুমোচ্ছে বুঝি?'

'হুঁ। আপনি কখন উঠেছেন?'

'অনেকক্ষণ।'

'আমাকে ডাকেননি কেন?' প্রশ্ন করে লুৎফা।

'অঘোরে ঘুমোচ্ছিলে তুমি। ডাকতে মায়া হল। তোমারও তো বিশ্রাম দরকার।'

ব্যস্ত হয়ে লুৎফা বলে, 'আমি পানি এনে দিই। হাতমুখ ধুয়ে নিন।'

'সে সব সারা হয়ে গেছে।'

'পানি কোথায় পেলেন?'

'কুয়ো থেকে তুলে নিয়েছিলাম।'

'এ কিন্তু আপনার ভারি অন্যায়।'

'এমন বলছ কেন?'

'আমাকে ডাকা উচিত ছিল।'

'কেন আমি কি নিজের কাজ নিজে করে নিতে পারি না?'

লুৎফা বলে, 'বাঁদির কাজ আপনি করবেন কেন? আপনি তামাম সুবে বাংলার নবাব।'

'নবাব এখন মিরজাফর। সিরাজদ্দৌলা বরবাদ হয়ে গেছে।'

'ইয়ে গলত বাত। আমি মানি না।'

'এ তো তোমার খুশখেয়ালের কথা। নিজের মুসিবতকে কী করে অস্বীকার করব?'

'নসিবের চাকা ঘুরবেই মেহের। কিছুদিন পরে ফের মসনদের মালিক হবেন আপনি। হরপল আমি দোয়া মাঙছি আল্লার কাছে। আমি জানি, খোদাতালা আমার খায়েশ পূরণ করবেন।'

'আমি যে আর নবাব হতে চাই না।'

লুৎফা অবাক চোখে সিরাজের মুখের দিকে তাকায়।

সিরাজ বলেন, 'তোমাকে নিয়ে অচেনা এক দেহাতের এক প্রান্তে ঘর বাঁধতে চাই লুৎফা। সিরাজদ্দৌলা চিরকালের মতো হারিয়ে যাক। কেবল তুজুক হয়ে থাক। তাতে আমার কোনও খেদ নেই। আমি মির্জা মহম্মদ—এক আম-আতরফ আদমির মতো বাঁচতে চাই। মাটির ঘর, মাটির দাওয়া, ছোট্ট এক চিলতে উঠোন, সায়েরা ছুটোছুটি করে খেলে বেড়াবে সেখানে। মেহনত করে আয়-উপায় করব আমি। তুমি ঘরের দেখভাল করবে। কেউ জানবে না আমাদের আসল পরিচয়।'

লুৎফার জল ছলছলে দুই চোখের তারায় খুশির খোয়াব বড় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সিরাজ বলে চলেন, 'হিরাঝিল, মসনদ, দৌলত, হুকুমত—এসব এক অভিশাপ। নাহানে পানি এলেই ভেসে পড়ব আমরা। ভেবেছিলাম পাটনা গিয়ে ল সাহেব আর রামনারায়ণের মদতে ফের ফৌজ গড়ে তুলব। এর কোনও জরুরত নেই লুৎফা। কর্মনাশা নদী পার হয়ে বাংলা মুলুক ছেড়ে আমরা চলে যাব। অনেক দূরে। কোনও এক দেহাতে। কেউ আমাদের নাগাল পাবে না।'

প্রবল আবেগে লুৎফার হাতদুটো ধরে সিরাজ বলে ওঠেন, 'তুমি আমার পাশে থাকবে তো লুৎফা? কোনও তকলিফ হবে না তো তোমার?'

সিরাজের বুকে মাথা রেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে লুৎফা।

লুৎফার মাথায় হাত রেখে সিরাজ শুধোন, 'কাঁদছ যে?'

চোখের জল মুছে মুখ তুলে লুৎফা বলে, 'আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, আপনাকে ছেড়ে কি আমি থাকতে পারব? আপনি পাশে থাকলে আমার আবার তকলিফ কী?'

'কোনওরকমে কর্মনাশা নদীটা পেরিয়ে গেলেই হল লুৎফা। মিরজাফর খাঁর কাসিদরা, ইংরেজরা আমাদের নাগাল পাবে না। দোয়া মাঙো লুৎফা। খোদাতালা এই খায়েশ যেন মঞ্জুর করেন।'

ঠিক সেই সময় পিছন থেকে সমবেত পৈশাচিক হাসির শব্দ ভেসে আসল। চুরমার হয়ে গেল মসজিদ চত্বরের অপার্থিব শান্তির পরিবেশ। সিরাজ চমকে উঠে ঘুরে তাকালেন। ঘুরে তাকিয়ে চিত্রার্পিত হয়ে গেল লুৎফা।

অদূরে কুয়োতলায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছেন ফকির শাহ্ দানা ও মিরকাশিম। দু'জনের মুখে এখনও লেগে আছে খল হাসির রেশ। তাঁদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে জনা পঁচিশ সেপাই।

১১

অশান্তির মেঘ জমছে উমিচাঁদের মনে। হিসেবে সব কেমন যেন গরমিল হয়ে যাচ্ছে। বেশ বুঝতে পারছেন, পলাশি-উত্তর পরিস্থিতিতে ধীরে ধীরে কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন তিনি। পলাশির ষড়যন্ত্রে মদতদারির তোফা হিসেবে প্রাপ্য টাকার দর কষাকষি করতে গিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের তাল কেটেছে। নতুন নবাব মিরজাফরের সঙ্গে দোস্তিও তেমন নেই। সব মিলিয়ে উমিচাঁদ নয়া জমানায় বেশ বেকায়দায় পড়েছেন।

একদিকে নবাব সিরাজদ্দৌলা, আরেকদিকে ইংরেজ—একসময়ে যুযুধান দু'পক্ষকেই ইচ্ছে মতো নাচিয়েছেন উমিচাঁদ। ইংরেজদের কথা নবাবের কানে, নবাবের কথা ইংরেজদের কানে তুলে দু'দিক থেকেই ফায়দা লুটেছেন। কিন্তু চিরকাল কি সবার একইরকম যায়? রাজনীতি, কূটনীতির পথ বড় পিচ্ছিল। এখানে ধুরন্ধর মানুষও মাঝে মধ্যে পিছলে পড়েন। উমিচাঁদের হয়েছে সেই দশা।

পলাশির ষড়যন্ত্র রূপায়ণের চাবিকাঠি নিজের হাতে রাখতে চেয়েছিলেন উমিচাঁদ। তাঁর তাঁবেদার, দু'হাজারি মনসবদার ইয়ারলতিফ খানকে সিরাজের পরিবর্তে মসনদে বসানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কর্নেল ক্লাইভ সেই প্রস্তাব খারিজ করে দেওয়ার পর থেকে দরবার রাজনীতিতে উমিচাঁদ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েন।

পলাশির ষড়যন্ত্রটা চূড়ান্ত রূপ পায় উমিচাঁদের অগোচরে। তিনি সব কিছু যখন জানলেন, তখন মিরজাফরের সঙ্গে ইংরেজদের আলোচনা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। শুধু টাকাকড়ির লেনদেন সংক্রান্ত চুক্তিপত্রটা সই হতে বাকি। ভয়ানক দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন উমিচাঁদ। টাকাকড়ির ভাগ-বাটোয়ারা থেকে তিনি না শেষে বাদ পড়ে যান।

উমিচাঁদ তো বেওকুফ নন, তাই তিনি আগেভাগেই মিরজাফরের কাছ থেকে ইংরেজদের প্রাপ্য টাকার উপর পাঁচ শতাংশ দাবি করে বসেন।

এই থেকে ইংরেজদের সঙ্গে উমিচাঁদের মন কষাকষির শুরু। ইংরেজদের মনে হয় ধূর্ত এই বণিকের লোভ বড্ড বেশি। তিনি আকাশের চাঁদ ধরতে চাইছেন। মনে মনে বিরক্ত হলেও নিজেদের মনের ভাব গোপন রাখে ইংরেজরা। উমিচাঁদকে বশে রাখতে তার দাবি মেনে নিয়ে তারা লাল কাগজে একটা চুক্তি সম্পাদন করে। তার পাওনা বিশ লাখ টাকা—একথা লিপিবদ্ধ হয় চুক্তিতে। উমিচাঁদ খুশি হন।

তবুও উমিচাঁদকে বিশ্বাস করেনি ইংরেজরা। যদি তিনি ষড়যন্ত্রের কথা সিরাজদ্দৌলার কাছে ফাঁস করে দেন, তাহলে ইংরেজদের সমস্ত পরিকল্পনা মাঠে মারা যাবে, এই ভয়ে পলাশির যুদ্ধের আগে তাঁকে মুর্শিদাবাদ থেকে দূরে রাখতে ইংরেজরা সচেষ্ট হয়। লিউক স্ক্র্যাফটন উমিচাঁদকে ভুলিয়ে কলকাতা নিয়ে আসেন।

ইংরেজদের এই পরিকল্পনা পরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল উমিচাঁদের কাছে। কিন্তু তখন তিনি ইংরেজ শিবিরে নজরবন্দি।

ইংরেজরা তাঁকে এখন আর বিশ্বাস করছে না টের পেরে উমিচাঁদ বড়ই ভাবনায় পড়েছেন। উমিচাঁদ জানেন যে ইংরেজরা মিরজাফরের সঙ্গে সাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী নিজেদের প্রাপ্য টাকা আদায় করে ছাড়বে।

ভালোয় ভালোয় আদায় না হলে, মিরজাফরকে ধমকে চমকে ঠিক আদায় করে নেবে। কিন্তু যে টাকা ইংরেজরা তাকে দেবে বলে কবুল করেছে তা তিনি পাবেন তো? যদি তা না হয়, তিনি তো আর ধমকে চমকে ইংরেজদের কাছ থেকে নিজের প্রাপ্য আদায় করতে পারবেন না। কী হবে তখন? হকের পাওনা ফসকে যাবে?

তবে এখনও ইংরেজরা তাঁর প্রাপ্য টাকা দিতে অস্বীকার করেনি। এই যা আশার কথা। কিন্তু এই আশার আড়ালে হতাশার সুরটিও প্রচ্ছন্ন রয়েছে। পলাশির যুদ্ধ হয়ে মিটে গেল। সিরাজদ্দৌলা পলাতক। মসনদে বসেছেন মিরজাফর। উমিচাঁদের পাওনা নিয়ে ইংরেজরা মুখে রা কাড়ছে না কেন? নিজের পাওনার বিষয়টা ঝালিয়ে নিতে কর্নেল ক্লাইভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন উমিচাঁদ। দু-দু'বার কোশিশ করেও ক্লাইভের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পাননি। তাকে হাঁকিয়ে দিয়েছেন ক্লাইভের সেক্রেটারি ওয়ালশ সাহেব। ক্লাইভ তাঁর বিষয়ে এখন এত উদাসীন কেন? তাহলে কি তিনি যা আশঙ্কা করছেন সেটাই সত্যি হবে? নাঃ! সব মিলিয়ে উমিচাঁদ মোটেই স্বস্তিতে নেই।

অভিজ্ঞ উমিচাঁদ বুঝতে পারছেন, পলাশির যুদ্ধ বাংলার রাজনীতির সমীকরণ বদলে দিয়েছে। আগে নবাব ছিলেন শক্তিশালী। এখন শক্তিশালী ইংরেজরা। মিরজাফর খাঁ ইংরেজদের হাতের পুতুল। কর্নেল ক্লাইভের ভয়ে তিনি তটস্থ। ক্লাইভই এখন সুবে বাংলার ভাগ্যনিয়ন্ত্রক। তিনি যা চাইবেন তাই হবে। তাঁর ইচ্ছেই এখন শেষ কথা।

আলিবর্দি খাঁ বা সিরাজদ্দৌলার জমানা হলে চুক্তির টাকা অনাদায়ী হলে নবাবের কাছে গিয়ে ইংরেজদের নামে নালিশ ঠুকতে পারতেন উমিচাঁদ। এখন ক্লাইভ যদি তাঁর প্রাপ্য দিতে না চান, তাহলে কার কাছে গিয়ে উমিচাঁদ ক্লাইভের নামে শিকায়ত করবেন?

পালকিতে বসে ফের একবার লাল কাগজের চুক্তিতে লেখা শর্তগুলো চোখের সামনে ভাসিয়ে তোলার কোশিশ করতে লাগলেন উমিচাঁদ। স্পষ্ট যেন দেখতে পাচ্ছেন অক্ষরগুলো। তাঁর প্রাপ্য বিশ লাখ টাকা। লাল কাগজের উপর কালো কালিতে লেখা ছিল। শর্তগুলোর নীচে ক্লাইভের উজ্বল সইটাও বেশ স্পষ্ট বলে প্রতিভাত হল তাঁর মানসচক্ষে।

বড্ড কি নেতিবাচক ভাবনা ভাবছেন না তিনি? ইংরেজরা যে তাঁকে তাঁর প্রাপ্য দিতে ইনকার করবে তা কেন মনে করছেন তিনি? আগে তো কখনও ইংরেজরা কথার খেলাপ করেনি।

তবুও উমিচাঁদের মন মানে না। কিন্তু কেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন না ক্লাইভ? উমিচাঁদ মনকে বোঝান, হয়তো যুদ্ধের ধকলে বড্ড ক্লান্ত ছিলেন কর্নেল। তাই সাক্ষাৎ করতে চাননি। ইংরেজরা ইমানদার জাত। আর যাই হোক, চুক্তি খেলাপ করে তাঁকে ধোঁকা দেবে না নিশ্চয়ই।

মনে মনে হাসলেন উমিচাঁদ। বয়স তো তার কম হয়নি। পঞ্চাশ পেরিয়ে গিয়েছেন। পাক ধরেছে চুলে। বয়স হলে মানুষ বোধ হয় বেশি ভাবে। যেয়াদা দুশ্চিন্তা করে। ফালতু ভাবনায় জেরবার হয়।

পালকি এসে থামল জগৎশেঠের হাভেলির দেউড়িতে। থলথলে শরীরটাকে বাঁকিয়েচুরিয়ে পালকি থেকে বেরিয়ে এলেন উমিচাঁদ। মোটা শরীর নিয়ে পালকির মধ্যে ভাঁজ হয়ে বসে থাকা বেশ কষ্টকর।

উমিচাঁদকে দেখে এগিয়ে এলেন জগৎশেঠের দেওয়ান রণজিৎ রায়। উচ্ছ্বসিত গলায় তিনি বলে উঠলেন, 'সুস্বাগতম উমিচাঁদজি। আসুন। আসুন।'

জগৎশেঠের দেওয়ান, ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন এই রণজিৎ রায় লোকটিকে মোটেই পছন্দ করেন না উমিচাঁদ। আজ তিনি যে খানিকটা বেকায়দায় পড়েছেন তার জন্যে এই লোকটির অবদান কম নয়। ১৭৫৬ সালের জুন মাসে সিরাজদ্দৌলা যখন কলকাতা তছনছ করে দিলেন, তখন আসরে নেমে মধ্যস্থতা করে নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের ঝামেলাটা মিটিয়ে দিয়ে উমিচাঁদ নাম কিনেছিলেন।

কয়েক মাস পরে ১৭৫৭ সালের গোড়ায় কলকাতার হালসিবাগানে নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াইয়ের পর ফের দু'পক্ষের ঝামেলাটা মেটানোর কৃতিত্ব নিতে চেয়েছিলেন উমিচাঁদ। কিন্তু রণজিৎ রায়ের কূট চালে সব ভেস্তে গেল। উমিচাঁদকে ছেড়ে জগৎশেঠকে মুরুব্বি ঠাওরালেন কর্নেল ক্লাইভ। আসরে নেমে বাজিমাত করে বেরিয়ে গেলেন জগৎশেঠ। ইংরেজদের অনুকূলে আলিনগরের সুলেনামা সাক্ষরিত হওয়ার মূল কৃতিত্ব জগৎশেঠেরই। এরপর পলাশির ষড়যন্ত্রের রূপরেখা চূড়ান্ত করতে জগৎশেঠের উপরেই বেশি ভরসা করল ইংরেজরা। উমিচাঁদ পিছিয়ে পড়লেন।

যাই হোক মুখে একটি যান্ত্রিক হাসি ঝুলিয়ে উমিচাঁদ বললেন, 'হে হে রায়মোশায়! খুশ তবিয়ত আছেন তো?'

'ওই একরকম আছি। কিন্তু আপনার কী ব্যাপার বলুন তো? অনেকদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই। হাওয়া হয়ে গিয়েছিলেন কোথায়?'

'কলকাতায় গিয়েছিলাম।' দায়সারা ভাবে জবাব দিলেন উমিচাঁদ।

রসিকতা করে রণজিৎ রায় বললেন, 'সে কী? এদিকে ইনকিলাব ঘটে গেল। নয়া জমানার শুরুয়াত হল, কত কী ঘটে যাচ্ছে রাজধানীতে, আপনি কলকাতায় পড়ে রইলেন?'

মুখে খানিকটা গাম্ভীর্য এনে উমিচাঁদ বললেন, 'ইংরেজদের সঙ্গে কিছু বোঝাপড়ার বিষয় ছিল। তবে কলকাতা থেকে ফিরেছি যুদ্ধের আগেই। ইংরেজদের ছাউনিতে ছিলাম।'

হাসলেন রণজিৎ রায়। 'তাই বলুন। এদিকে উমিচাঁদজি গেলেন কোথায় ভেবে ভেবে আমি হয়রান। আমারই আহাম্মকি মশাই। আগেই বোঝা উচিত ছিল, আপনি পাকা মাথার মানুষ। এখন তো কর্নেল ক্লাইভই হর্তাকর্তা, আর আপনি আগেভাগেই ইংরেজ ছাউনিতে বসে থেকে কর্নেলের সঙ্গে সম্পর্কটা ঝালিয়ে নিলেন। নয়া জমানায় বিপদে আপদে আমাদের একটু দেখবেন মশাই।'

মোরাম বিছানো পথ ধরে সদর দেউড়ি থেকে জগৎশেঠের হাভেলির দরবার ঘরের দিকে আসতে আসতে কথা হচ্ছিল উমিচাঁদ ও রণজিৎ রায়ের। দরবার ঘরের বাইরে মজুত প্রচুর গোরা পল্টন। হাতে সঙিন।

আজ জগৎশেঠের বাটিতে পাওনাগন্ডা নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে নবাব মিরজাফরের চূড়ান্ত ফয়সালা হওয়ার কথা। সে বৈঠকে উমিচাঁদ অবশ্য আমন্ত্রিত নন। তিনি এসেছেন নিজের তাগিদে। আজ যে ভাবেই হোক কর্নেলকে ধরে নিজের পাওনার বিষয়টা বুঝে নিতে।

রণজিৎ রায়ের কথার আড়ালে ঠাট্টার সুরটা উমিচাঁদের পছন্দ হচ্ছে না। প্রসঙ্গ পালটানোর জন্য তিনি শুধোলেন, 'কর্নেল ক্লাইভ এসে পড়েছেন বুঝি?'

'হুঁ। ভিতরে দরবার চলছে।'

'আপনি বাইরে যে?'

'নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের বোঝাপড়া। এ মামলার ভিতরে আমি থেকে কী করব বলুন? আমি সামান্য মানুষ।'

রসিকতার ঢঙে উমিচাঁদ এবারে বললেন, 'কে বলে আপনি সামান্য? জগৎশেঠজির কুদরতির পিছনে আপনার মদত কি কম?'

রণজিৎ রায় হেসে বলেন, 'আরে এ কী কথা বলছেন? পাঁচজনে শুনে ফেললে আমার নোকরি যাবে। জগৎশেঠজি আমার মনিব।'

'নোকরি গেলেই বা ক্ষতি কি? আপনার মতো লোকের কি নোকরির অভাব হবে?'

রণজিৎ রায় জিভ কেটে বললেন, 'দিব্যি সুখে আছি। জগৎশেঠজি তো কোনও অভাব রাখেননি আমার। খামোখা নোকরিটা খোয়াতে যাব কেন বলতে পারেন?'

'আজ কিন্তু আমার একটা উপকার করতে হবে রায়মোশায়।'

'ফরমায়েশ করুন। আপনার সেবায় বান্দা হাজির।'

'দরবারের পর কর্নেলের সঙ্গে কিন্তু একবার মোলাকাত করিয়ে দিতে হবে।'

'সে হবেখন। এখন ভিতরে চলুন তো। আয়েশ করুন। পান-শরবত-মিঠাই খান।'

রণজিৎ রায়ের নির্দেশে দুজন খিদমতদার এসে উমিচাঁদকে ভিতরে নিয়ে যায়।

রুদ্ধদ্বার বৈঠক চলছে জগৎশেঠের দরবার ঘরে। বড় একটা শ্বেতপাথরের টেবিলের একদিকে বসে রয়েছেন ক্লাইভ, স্ক্র্যাফটন, ওয়াটস, ওয়ালস, আয়ারকুট, কিলপ্যাট্রিক, ওয়ারেন হেস্টিংস প্রমুখ। আরেকদিকে মিরজাফর, জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ, রায়দুর্লভ ও মিরন।

টেবিলের উপরে পরিবেশন করা আছে নানারকম সুখাদ্য। সেসবে ইংরেজদের রুচি নেই। ক্লাইভের মুখটা থমথমে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে তিনি বেশ বিরক্ত। উলটো দিক থেকে বারবার ক্লাইভের মুখের দিকে তাকিয়ে ক্লাইভের মেজাজটা জরিপ করার চেষ্টা করছেন মিরজাফর। নবাবের পক্ষ নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে কথা চালাচালি করছেন জগৎশেঠ।

ক্লাইভ গম্ভীর গলায় বললেন, 'এমন তো কথা ছিল না।'

মহাতপচাঁদ বললেন, 'সে কথা আমরা মানছি জনাব। তোশাখানা তো আপনার সমুখেই খোলা হয়েছে। সবই তো আপনি নিজের চোখেই দেখেছেন।'

ক্লাইভ চোখদুটো টেবিলের উপর রেখে, ভুর কুঁচকে ধোঁয়া টানতে লাগলেন।

নিঃশব্দতা ভেঙে জগৎশেঠ বলে ওঠেন, 'আমি যা গুজারেশ করেছি ওটাই সহি তরিকা। আপাতত নবাব আপনাদের দাবির অর্ধেক মিটিয়ে দেবেন। এর দুইয়ের তিন ভাগ টাকায়। বাকিটা হিরে, জহরত আউর বহুত কিমতি সামানো কে সাথ। আপনাদের পাওনা বাকি অর্ধেক টাকা তিন কিস্তিতে তিন সালের মধ্যে নবাব মিটিয়ে দেবেন।'

গুম মেরে বসে রইলেন ক্লাইভ। থমথম করছে গোটা ঘর।

ক্লাইভকে নিশ্চুপ দেখে মরিয়া গলায় মিরজাফর বলে উঠলেন, 'এই বাত আপনি মেনে নিন জনাব। পুরোনো নবাবের আমল থেকে ফৌজিদের বেতন বাবদ অনেক টাকা বকেয়া পড়ে আছে। তাদের দাবিও মেটাতে হবে।'

ক্লাইভ নির্বোধ নন। মুর্শিদাবাদের হাঁড়ির হাল এই ক'দিনে বুঝে নিয়েছেন। সত্যিই নবাবকে কোতল করে ফেলার হুমকি দিলেও সব দিক বাঁচিয়ে ইংরেজদের দাবি এক ধাক্কায় মিটিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর নেই। তা ছাড়া ক্লাইভ আশাও করেননি যে মাত্র তিন বছরের মধ্যে ইংরেজদের দাবি মতো সব টাকা মিটিয়ে দিতে রাজি হবেন মিরজাফর। তবুও ক্লাইভের মুখ গোমড়া। মুখে অখুশির ভাব। ডিপ্লোম্যাসিতে চোস্ত ক্লাইভ জানেন কী করে চাপ তৈরি করতে হয়।

মিরজাফর ফের বললেন, 'আল্লার কসম খেয়ে বলছি শেঠজি যা ওয়াদা করলেন তা আমরা ইস্তেমাল করব।'

ক্লাইভের উদ্দেশে জগৎশেঠ বললেন, 'দিল্লির বাদশার কাছে দরবার করে আপনাদের নামে নতুন পরোয়ানা আমি আনিয়ে দেব, যাতে অন্যান্য সওদাগরদের তুলনায় আপনাদের কম শুল্ক দিতে হয়।'

গম্ভীর মুখে ক্লাইভ বললেন, 'ওকে। অলরাইট। আই অ্যাকসেপ্ট ইওর প্রোপোসাল।'

ক্লাইভের এই কথায় দরবারের গুমোট ভাবটা কেটে গেল। হাসি ফুটল মিরজাফরের মুখে।

এমন সময় রণজিৎ রায় দরবার ঘরে প্রবেশ করে জগৎশেঠের পাশে গিয়ে কিছু একটা বললেন। জগৎশেঠের মুখে ফুটে উঠল বিরক্তি। মনের ভাব দমন করে ক্লাইভের উদ্দেশে জগৎশেঠ বললেন, 'জনাব

উমিচাঁদজি একবার আপনার সাক্ষাৎ চাইছে।'

ক্লাইভের গোমড়া মুখে এবার হাসি ফুটল। বললেন, 'উমিচাঁদ! দ্য ক্লেভার ফক্স!'

'ইন্তেজার করতে বলব?'

'নো নো। আওয়ার মিটিং ইজ ওভার। প্লিজ কল হিম।'

রণজিৎ রায় চলে গেলেন। খানিকবাদে হাসি হাসি মুখ করে ঘরে ঢুকলেন উমিচাঁদ। জোড়হাত হয়ে ক্লাইভের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'অনওয়াক্তে এসে পড়লাম বোধহয়।'

ক্লাইভ হেসে বললেন, 'ইটস ওকে। মিটিং ইস ওভার। হাউ আর ইউ মি. উমিচাঁদ?'

উমিচাঁদ খোশামুদে হাসি হেসে বললেন, 'হে-হে আপনার ফয়েজে খুশ তবিয়ত আছি।'

'প্লিজ সিট।' অদূরে একটা কুরসিতে উমিচাঁদকে বসতে বললেন ক্লাইভ। তারপর বললেন, 'ফরমাইয়ে। আপনার তকলিফ কী আছে?'

'হে-হে। তকলিফ আর আমার কোথায়? তকলিফ হল তো আপনাদের। এত বড় একটা লড়াইয়ের ধকল গেল!'

মুখে মৃদু হাসি ঝুলিয়ে একদৃষ্টে উমিচাঁদের দিকে চেয়ে রইলেন ক্লাইভ।

খানিকটা ইতস্তত করে উমিচাঁদ বললেন, 'আমার পাওনার ব্যাপারটা যদি একটু তাড়াতাড়ি!'

ভারি অবাক হওয়ার মতো মুখচোখ করে ক্লাইভ শুধোলেন, 'কিসের পাওনা?'

'বিশ লাখ রুপেয়া। আপনাদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল।'

'ও মাই গড! বিশ লাখ? কিন্তু আমি তো এ ব্যাপারে কিছু জানি না। ফর হোয়াট সেক ইউ আর ডিমান্ডিং টুয়েন্টি লাখস?'

উত্তেজিত হয়ে উমিচাঁদ বলেন, 'লাল কাগজের চুক্তি।'

'লাল কাগজ?' আরও অবাক হওয়ার ভান করেন ক্লাইভ।

উমিচাঁদ ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠেন, 'পলাশির যুদ্ধের পর কে কত তোফা পাবে সে সব কথা লেখা ছিল ওই চুক্তিতে। আমার নামে লেখা ছিল বিশ লাখ টাকা। আমি নিজের চোখে দেখেছি। শর্তগুলোর নীচে আপনার দস্তখত ছিল। স্ক্র্যাফটন সাহেব আমাকে দেখিয়েছিলেন।'

ভারি আশ্চর্য হওয়ার অভিনয় করে স্ক্র্যাফটনের দিকে তাকালেন ক্লাইভ।

স্ক্র্যাফটন বললেন, 'আই কান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড এনিথিং।'

উমিচাঁদ ফোঁস করে উঠলেন। 'নোটঙ্কি মাত করুন স্ক্র্যাফটন সাহেব। আমি বেওকুফ নই।'

ক্লাইভ শান্ত গলায় বললেন, 'মি. উমিচাঁদ। আমার মনে হচ্ছে কোথাও ভুল হচ্ছে আপনার।'

'আমি বিলকুল ঠিক বলছি জনাব।' উমিচাঁদ বেশ জোরেই বলে উঠলেন কথাটা।

ক্লাইভ শান্ত গলায় বললেন, 'লেকিন আমি তো একটাই এগ্রিমেন্টের কথা জানি। লড়াইয়ের আগে তাতে দস্তখত করেছিলেন নবাব মিরজাফর খাঁ।'

উত্তেজনায় কুরসি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে উমিচাঁদ বললেন, 'হাঁ হাঁ হাঁ! আমি ওই কথাই বলছি।'

ক্লাইভ এবার হুকুমের সুরে বললেন, 'মি. স্ক্র্যাফটন।'

'ইয়েস স্যার।'

'কাগজটা বের করো। প্লিজ শো হিম দ্য ট্রিটি ইনফ্রন্ট অফ এভরিবডি।'

স্ক্র্যাফটন একটা গোটানো শাদা কাগজ টানটান করে টেবিলের উপর মেলে ধরলেন।

উমিচাঁদ ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'এ কী? এ তো শাদা কাগজ!'

ওয়াটস বলে ওঠেন, 'এটাই তো অরিজিনাল ট্রিটি। আমাদের কথায় আপনার যদি একিন না হয় তো নবাব মিরজাফর খাঁ, জগৎশেঠজিকে জিজ্ঞেস করুন।'

জগৎশেঠ বলে ওঠেন, 'আপনার দিমাগ ঠিক আছে তো উমিচাঁদজি? একটাই তো চুক্তি হয়েছিল। সকলের সাক্ষরও রয়েছে এতে। লাল কাগজ আপনি কোথায় পেলেন?'

উমিচাঁদ হতভম্ব।

স্ক্র্যাফটনের উদ্দেশে হুকুমের সুরে ক্লাইভ বললেন, 'প্লিজ রিড আউট দ্য কন্ডিশনস স্পেসিফায়েড ইন দ্য ট্রিটি।'

স্ক্র্যাফটন উঠে দাঁড়িয়ে চুক্তির শর্তগুলো পরপর পড়ে গেলেন। গোটা চুক্তিতে উমিচাঁদের নামের কোনও উল্লেখই নেই। তার বিশ লাখ টাকা পাওনার কথা লিপিবদ্ধ থাকা তো অলীক কল্পনা।

পাইপটা ঠোঁটের ফাকে গুঁজে ক্লাইভ বললেন, 'এবারে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে ইওর ডিম্যান্ড ইজ ফিকটিশাস।'

উত্তেজনায় দরবারের আদব-কায়দা ভুলে, নবাবের উপস্থিতিকে উপেক্ষা করে উমিচাঁদ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ইয়ে ঝুটা কাগজ। জাল দলিল। লাল কাগজটা কোথায়? লাল কাগজ? লাল কাগ...' কথা শেষ করতে পারলেন না উমিচাঁদ। জ্ঞান হারিয়ে টলে পড়ে যাচ্ছিলেন। তাকে জাপটে ধরে ফেললেন স্ক্র্যাফটন।

ধূর্ত উমিচাদকে ঠকানোর জন্য যে পরিকল্পনা করেছিলেন ক্লাইভ, তা সফল ভাবে রূপায়িত হল। পলাশির যুদ্ধের আগে নিজের পাওনা নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে দরকষাকষি করতে গিয়েছিলেন উমিচাঁদ। দাবিমতো পাওনা না পেলে নবাব সিরাজদ্দৌলার কাছে ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দেবেন বলে ইংরেজদের প্রচ্ছন্ন হুমকিও দিয়েছিলেন।

উমিচাঁদের এই আচরণে খুব বিরক্ত হয়েছিলেন ক্লাইভ। তবে তখন উমিচাঁদকে গুড হিউমারে রাখতে একটা মোক্ষম চাল চেলেছিলেন তিনি। দু'টি চুক্তি তৈরি হয়েছিল। একটা লাল কাগজে আরেকটা শাদা কাগজে। লাল কাগজের চুক্তিটা জাল। তাতে উমিচাঁদের কথা মতো তাঁর বিশ লাখ টাকা পাওনার কথা লেখা ছিল। শাদা কাগজে লেখা চুক্তিতে উমিচাঁদের কোনও উল্লেখই ছিল না। উমিচাঁদকে বাগে রাখতে ক্লাইভের পরিকল্পনা মতো দুটি কাগজেই সই করেছিলেন মিরজাফর, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ ও ক্লাইভ। ওয়াটসন জাল কাগজে সই করতে চাননি। ওতে ওয়াটসনের সই নকল করেছিলেন লাশিংটন।

দরবারের সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ক্লাইভ অচঞ্চল। এক মনে পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে চলেছেন।

জগৎশেঠের হুকুমে ছুটে এল গোলাম-বান্দারা। উমিচাঁদকে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে পাশের কক্ষে বিছানায় শুইয়ে দিল তারা। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চোখেমুখে জলের ঝাপটা দেওয়ার পর চোখ খুললেন উমিচাঁদ। চোখ খুলেই কেঁপে উঠলেন থরথর করে।

তার মুখের উপর ঝুঁকে রয়েছেন স্ক্র্যাফটন ও ওয়াটস। তাদের মুখদুটো উমিচাঁদের চোখে কেমন যেন বীভৎস ঠেকল। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন উমিচাঁদ। দুটো হাত বাড়িয়ে স্ক্র্যাফটনের গলাটা চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'লাল কাগজ? কাঁহা হ্যায়? আভি নিকালো।'

যুবক স্ক্র্যাফটনের সঙ্গে গায়ের জোরে পেরে উঠবেন কেন উমিচাঁদ? স্ক্র্যাফটন এক ঝটকায় নিজের গলা থেকে উমিচাঁদের হাতদুটো ছাড়িয়ে নিলেন। নিস্তেজ হয়ে পড়ে উমিচাঁদ বিড়বিড় করতে লাগলেন, 'লাল কাগজ! লাল কাগজ! লাল কাগজ!...'

বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন কর্নেল ক্লাইভ। সামনে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'মি. উমিচাঁদ আপনার তবিয়ত বোধ হয় ঠিক নেই। ভিজিট দ্য হোলি প্লেসেস। কিছুদিন ঘুরে আসুন। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ঘোলাটে চোখে উমিচাঁদ তখনও বিড়বিড় করে চলেছেন, 'লাল কাগজ! লাল কাগজ!...

রাজমহলের কাছে তেলিয়াগড়িতে একটা পাথুরে টিলার উপর দাঁড়িয়ে আছেন ফরাসি সেনাপতি জাঁ ল। চোখে দূরবিন। দৃষ্টি দূরে। দুই ফরাসি ঘোড়সওয়ারের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করছেন ল সাহেব। বাংলার হালহকিকত নিয়ে তিনি চিন্তিত। তাই আগাম খবর সংগ্রহের জন্য পাঠিয়েছেন দুই অতি বিশ্বস্ত সহকর্মীকে। পরিস্থিতি বুঝে তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন, বাহিনী নিয়ে সামনে এগোবেন, না ফিরে যাবেন পাটনায়।

জাঁ ল'র মন চাইছে সামনে এগোতে। সেইমতো শুভ সংবাদের প্রত্যাশা করছেন তিনি। টিলার পাদদেশ থেকে শুরু করে সামনে বহুদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে ধুধু রুক্ষ প্রান্তর। নাঃ! ঘোড়সওয়ারদের দেখা নেই। গলায় ঝোলানো দূরবিনটা নামিয়ে রেখে চুরুট ধরালেন জাঁ ল। দৃষ্টি গেল নীচের দিকে।

টিলার পাদদেশে দাঁড়িয়ে আছে তিরিশটি গো-গাড়ি। ত্রিপল দিয়ে ঢাকা। কামান, গোলা-বন্দুক রসদে বোঝাই। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে চারটি হাতি স্তূপীকৃত সবুজ পাতা সাবাড় করে চলেছে। পাটনা থেকে মুর্শিদাবাদের দিকে আসার সময় নিজের বাহিনীকে শক্তিশালী করতে পাটনার নায়েব রামনারায়ণের কাছ থেকে হাতি চারটি ধার করেছেন জাঁ ল। তিরিশটি গো-গাড়ি, চারটি হাতি, তাঁবু-বরদার, মুটে-মজুর ছাড়া মাত্র দু'শোজন সৈন্য রয়েছে ল'র সঙ্গে। সৈন্যরা হাতিয়ার হাতে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। প্রস্তুত তাঁবু-বরদারেরাও। জেনারেলের হুকুম হলেই দ্রুত তাঁবু গুটিয়ে ফের পথ চলতে হবে।

উপর থেকে ফরাসি বাহিনীকে অতি ক্ষুদ্র দেখাচ্ছে। এ যেন বাংলায় বিলীন হওয়ার প্রহর গুনতে থাকা ফরাসি শক্তির প্রতীক। টিলার নীচে সরু রেখার মতো কয়েকসারি তাঁবুর মাথায় উড়ছে ফরাসি পতাকা। সেদিকে চেয়ে হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলেন জাঁ ল। বুকের মধ্যে কেমন একটা কষ্ট যেন পাক দিয়ে ওঠে। চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়।

চিরশত্রু ইংরেজদের কাছে অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেতে হল সুবে বাংলায়। নবাবের চোখের সামনেই অন্যায় ভাবে ইংরেজরা ফরাসিদের চন্দননগরের উপনিবেশ গুঁড়িয়ে দিল। নবাব সিরাজদ্দৌলার প্রতি কোনও অনুযোগ নেই ল সাহেবের। নবাব তো অন্যায়ের প্রতিকার করতেই চেয়েছিলেন। রায়দুর্লভের নেতৃত্বে ফৌজও পাঠিয়েছিলেন। হুগলির ফৌজদার নন্দকুমারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ইংরেজরা চন্দননগর আক্রমণ করলে তিনি যেন ফরাসিদের সাহায্য করেন। কিন্তু নবাবের হুকুম তামিল হল না। উৎকোচের লোভ দেখিয়ে নন্দকুমারকে নিষ্ক্রিয় করে রাখল ইংরেজরা। ক্লাইভের ভয়ে ভীত রায়দুর্লভ থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন হুগলি থেকে অনেক দূরে। গায়ের জোরে ইংরেজরা চন্দননগর গুঁড়িয়ে দিল।

কী করবেন সিরাজদ্দৌলা? তিনি যে ঘরে-বাইরে শত্রু পরিবৃত। কথা ছিল ফরাসিদের সঙ্গে ঘটা অন্যায়ের প্রতিকার করতে ফরাসি জেনারেল বুসি নৌবহর নিয়ে বাংলায় আসবেন। আশায় বুক বেঁধেছিল ফরাসিরা। ফরাসি নৌবহর এলে ইংরেজদের কড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে ফেলা যাবে ভেবে আশান্বিত হয়েছিলেন সিরাজদ্দৌলাও। প্রতীক্ষাই সার হল, বুসি এলেন না।

তবুও হাল ছাড়েননি জাঁ ল। মনে ভরসা ছিল এই যে, কাশিমবাজারের কুঠিটাতো এখনও রয়েছে। রয়েছেন নবাব সিরাজদ্দৌলা। তিনি ফরাসিদের বন্ধু। সিরাজদ্দৌলার মদতে অচিরেই হয়তো ফরাসিদের সুদিন ফিরবে। জাঁ ল প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—ষড়যন্ত্রের আঁচ লাগতে দেবেন না সিরাজের গায়ে। জান কবুল করে তাঁকে আগলে রাখবেন তিনি। কিন্তু কী হল? বদকিসমতি দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করে বেড়াচ্ছে ফরাসিদের।

চুরুটের আগুন নিভে গিয়েছে। আধপোড়া চুরুটটা ছুড়ে ফেললেন ল সাহেব। সূর্যকে ঢেকে দিচ্ছে হঠাৎ ছুটে আসা আষাঢ়ের কালো মেঘ। খানিকবাদেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামবে। ফের একবার দূরবীনে চোখ রাখলেন জাঁ ল।

নাঃ! ঘোড়সওয়ারদের দেখা নেই।

অস্থির ভাবে পায়চারি করতে করতে ল ভাবছিলেন সিরাজদ্দৌলার নির্বুদ্ধিতার কথা। দরবারের ওমরাহদের প্রায় সবাইকে দুশমন করে তুললেন নবাব। তাঁর দোস্ত বলতে ছিল কেবল মোহনলাল ও মিরমদন। আর ছিলেন জাঁ ল। দরবারে সিরাজের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র পেকে উঠছে তার স্বরূপ অনেক আগেই ধরা পড়েছিল ল'র চোখে। এই সাজিশির কথা তিনি নবাবের কাছে ফাঁস করে দিতে চেয়েছিলেন। দুর্ভাগ্য সিরাজের। দুর্ভাগ্য ফরাসিদের। ল'র হুশিয়ারি হেসে উড়িয়ে দিলেন সরলমতি নবাব।

ইংরেজরা টের পেয়েছিল ল সাহেবের অভিসন্ধি। তিনি সিরাজের আশেপাশে থাকলে ষড়যন্ত্রকে রূপ দেওয়া কঠিন। ফরাসিদের কাশিমবাজার থেকে বিতাড়িত করবার জন্য নবাবের উপর চাপ তৈরি করলেন ক্লাইভ, ওয়াটসন ও ওয়াটস। স্নায়ুর চাপে দিশেহারা হয়ে গেলেন অপরিণত যুবক সিরাজদ্দৌলা। তাঁর হুকুমে দলবল নিয়ে কাশিমবাজার থেকে পাটনায় যেতে বাধ্য হলেন জাঁ ল।

বিদায়বেলায় সিরাজদ্দৌলা বলেছিলেন, 'কোনও গোলমাল বুঝলে পাটনা থেকে আপনাকে আমি ডেকে নেব। তুরন্ত চলে আসবেন।'

জবাবে ল বলেছিলেন, 'সে সুযোগ বোধহয় আপনি আর পাবেন না হুজুর। মনে হচ্ছে এই আমাদের শেষ দেখা।'

আজ ল ভাবছেন অন্য কথা। হৃদয়ের অন্তঃস্থল পরমেশ্বরের প্রতি প্রার্থনা জানাচ্ছেন। যে ভবিষ্যৎবাণী তিনি করেছিলেন সিরাজদ্দৌলার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার প্রাক্কালে, তা যেন সত্যি না হয়। সুবে বাংলায় ফরাসি উপনিবেশের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য সিরাজদ্দৌলাকে ল সাহেবের আজ বড়ই প্রয়োজন।

২২ জুন ১৭৫৭। সিরাজদ্দৌলার চিঠি এসে পৌঁছয় ল সাহেবের হাতে।

'...লড়াই বাঁধতে চলেছে ইংরেজদের সঙ্গে। জনাব ফৌজ নিয়ে জলদি মুর্শিদাবাদে চলে আসুন...'

এই পত্র পেয়ে দ্রুত পাটনা থেকে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে চলেছেন জাঁ ল। তেলিয়াগড়িতে এসে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। আজ ১ জুলাই। তাঁর মনে শঙ্কা হল এই যে তিনি মুর্শিদাবাদে পৌঁছনোর আগেই সিরাজদ্দৌলা যদি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন, তবে তাঁর পক্ষে জিৎ হাসিল করা খুবই কঠিন। কারণ নবাব চারিদিক থেকে শত্রু পরিবৃত। তিনি যদি লড়াইয়ে হেরে যান তবে মুর্শিদাবাদে পা দিলেই জাতশত্রু ইংরেজদের হাতে ফরাসিদের আরেকপ্রস্থ নাকাল হতে হবে।

জাঁ ল এখন মনেপ্রাণে চাইছেন, নবাব যেন ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই না বাঁধিয়ে কোনও অছিলায় সময় নষ্ট করেন। তাঁর জন্য যেন অপেক্ষা করেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামনে থেকে নবাবের ফৌজকে নেতৃত্ব দিতে চান ল সাহেব। দুরমুশ করে দিতে চান ইংরেজদের। সিরাজদ্দৌলার সাহায্য নিয়ে বাংলা থেকে ইংরেজদের উৎখাত করে চন্দননগরে ফরাসিদের বিপর্যয়ের বদলা নেওয়ার স্বপ্ন ভেসে বেড়ায় ল'র দুই চোখে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে গলায় ঝোলানো ক্রসটায় হাত দিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন ল। ভগবান যিশুর উদ্দেশে বলেন, 'প্রভু, আমার মন যা চাইছে, তাই যেন হয়। আমি মুর্শিদাবাদে না পৌঁছনো পর্যন্ত যেন নিরাপদে থাকেন সিরাজদ্দৌলা।'

হঠাৎ অনেক দূরে একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী চোখে পড়ায় ব্যস্ত হয়ে দূরবীনটা ফের চোখে লাগালেন জাঁ ল। তিরবেগে ছুটে আসছে একজন ঘোড়সওয়ার। পরনে ফরাসি সৈনিকের পোশাক। মুখটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। টিলার ঢাল বেয়ে দ্রুত নীচে নেমে আসেন ল।

ফরাসিদের তাঁবু দেখে ঘোড়ার গতি শ্লথ করে ঘোড়সওয়ার। টিলার পাদদেশে এসে থামে। এই ঘোড়সওয়ার হলেন গোলন্দাজ সিনফ্রে। বিধ্বস্ত তাঁর চেহারা।

সিনফ্রেকে হঠাৎ এভাবে হাজির হতে দেখে জাঁ ল-এর মন অমঙ্গল আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে। ব্যস্ত গলায় তিনি প্রশ্ন করেন, 'Quoi de nouf?—কী সংবাদ মঁসিয়ে?'

ম্লান মুখে সিনফ্রে জবাব দেন, ‘Le destin de Sirajdaula a été ruiné dans le désert de Plassy—পলাশির প্রান্তরে সিরাজদ্দৌলার ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে।’

‘লড়াই খতম?’

‘Oui—হ্যাঁ। জঙ্গ ফতে করেছে ইংরেজরা। সিরাজদ্দৌলা পলাতক। আমি কোনওরকমে পালিয়ে এসেছি।’

সহসা চোখে যেন অন্ধকার দেখেন জাঁ ল। ইংরেজদের বাংলা থেকে বিতাড়ন করার আশা, ফরাসিদের অপমানের বদলা নেওয়ার স্বপ্ন নিমেষে চুরমার হয়ে যায়।

এমন সময় বাতাসে ভেসে আসে দ্রুতগামী ঘোড়ার খুরের শব্দ। দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ল দেখেন, যে দুই ফরাসি ঘোড়সওয়ারের ফিরে আসার প্রতীক্ষা তিনি করছিলেন, তারা ফিরে আসছে। প্রচণ্ড বেগে। ল পতাকা উড়িয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাদের।

দুই ঘোড়সওয়ার এসে জানায়, ‘Extr-mement mauvaise nouvelle—ঘোর দুঃসংবাদ মঁসিয়ে। আজ সকালে এখান থেকে বিশ মাইল দূরে মিরকাশিমের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন সিরাজদ্দৌলা। আমাদের খোঁজে বিরাট ফৌজ নিয়ে এদিকে ধেয়ে আসছেন রাজমহলের ফৌজদার মির দাউদ। এখনই তাঁবু গুটিয়ে দ্রুত আমাদের পিছু হটতে হবে।’

প্রবল হতাশায় মাথা ঝুঁকিয়ে দু’হাতে মুখ ঢাকেন জাঁ ল।

খবরটা ছড়িয়ে পড়েছিল দুপুরের দিকেই। সেই থেকে পথের দু’পাশে ভিড় জমিয়ে তুলছিল আমআদমি, এখন চারিদিক লোকে লোকারণ্য। ভিড় সামলাতে ব্যস্ত কোতোয়ালির সেপাই ও নিজামতের সেনারা। দৃশ্যটা দেখে গোটা চকবাজার স্তম্ভিত। পথের দু’পাশে ভিড় জমাট বাঁধলেও কারও মুখে কথা নেই। কোনও কলরব নেই, হুড়োহুড়ি নেই, গুঞ্জন নেই। চারিদিক অদ্ভুতরকম থমথমে। লোকজন বাক্যিহারা। হতচকিত।

পথের ধারের হাভেলিগুলোর অলিন্দে, ছাতেও অগণিত মানুষের ভিড়। এই জনতার কারও কারও বুকে বাজছে বিষাদের সুর, অন্তরে গুমরে উঠছে শুধু নীরব কান্না। চোখদুটো অশ্রুসজল। কারও কারও চোখে অবশ্য খুশির ঝিলিকও নজর করা যাচ্ছে।

যাই হোক, হর্ষে পুলকিত বা বিষাদে মুহ্যমান কারওরই যেন ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না, চর্মচক্ষে এই মুহূর্তে তারা যা দেখছে সেটা স্বপ্ন না সত্যি! মাত্র ক’দিন আগেও যিনি ছিলেন নবাব, তামাম বাংলা-বিহার-ওড়িশার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, যাঁর খায়েশে জারি হত ফরমান, যাঁর আরজুতে কারও কপালে জুটত খেলাত-খেতাব-তোফা, যাঁর হুকুমে কারও জীবনে নেমে আসত জাহান্নমের দিগদারি, সেই সিরাজদ্দৌলাকে মিরকাশিমের সেনারা কোমরে দড়ি বেঁধে আর পাঁচজন সাধারণ কয়েদির মতো চকবাজারের পথ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে!

সত্যিই কি বন্দি ওই যুবকের নাম সিরাজদ্দৌলা? ওই যুবকটি আলিবর্দির স্নেহপুত্তলি? চেহারাটা দেখে তাই তো মালুম হচ্ছে। হায় রে নসিবের খুশখেয়াল!

কুরসি বদল মুর্শিদাবাদ আগেও দেখেছে। মুর্শিদকুলির নাতি সরফরাজ খাঁকে হটিয়ে মসনদে বসেছিলেন আলিবর্দি। তামাম মুর্শিদাবাদ আগে যা দেখেনি, তা আজ প্রত্যক্ষ করছে। ভূতপূর্ব একজন নবাবের এই বেনজির বেইজ্জতি। সরফরাজের মুদ্দত নিয়ে শাহি হাতি চেহেল সেতুনে ফিরে এসেছিল চুপিসারে। গভীর রাতে অনাড়ম্বরে দাফন করা হয়েছিল সরফরাজকে। কেউ জানতে পারেনি। গিরিয়ার যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে একদিক থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন মুর্শিদকুলির নাতি। সিরাজদ্দৌলার মতো গদ্দারদের হাতে এমনতর দিগদারি তাঁর হয়নি।

কালি পড়েছে সিরাজের দু’চোখের তলায়। উসকোখুসকো চুলে ধুলোর আস্তরণ। গোধূলির মরা আলোয় সুকুমার মুখখানাকে বড় মলিন দেখাচ্ছে। পরনে ময়লা পিরান ও হাঁটু পর্যন্ত গোটানো তহবন্দ। কোমরে এঁটে

বসা শক্ত করে বাঁধা দড়ির দুই প্রান্ত শক্ত করে ধরে রেখেছে তাগড়াই চেহারার দু'জন পেয়াদা। সিরাজের পাশে পাশে হাঁটছে জল্লাদের মতো চেহারার দুই লস্কর। তাদের হাতে উদ্যত কোড়া। তারপরেও প্রাক্তন নবাবকে উন্মুক্ত তরবারি হাতে ঘিরে রেখেছে একদল আহেদি। তারা অত্যন্ত সতর্ক। সিরাজদ্দৌলাকে নির্বিঘ্নে পৌঁছে দিতে হবে নবাব মিরজাফর খাঁর হেফাজতে।

সিরাজের হাতদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। মাথা নিচু করে চকবাজারের পাথর বাঁধানো পথ ধরে খালি পায়ে হেঁটে চলেছেন যন্ত্রের মতো। দীর্ঘপথ হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। পাথরে, কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে পা দুটো। পায়ের গোড়ালিতে শুকিয়ে আছে রক্ত। কষ্ট হচ্ছে পা ফেলতে। তবুও রেহাই নেই। তাঁকে হাঁটতে হচ্ছে ফৌজিদের চলার গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

ভিড়ের মধ্যে থাকা মানুষজনদের অনেকেই অত্যন্ত চাপা গলায় ফিসফাস করছে। সিরাজের খুশখেয়ালে যাদের জীবনে নেমে এসেছিল দুর্বিপাক, জহমত, যারা তার বরবাদি চেয়ে হরবখত দোয়া মেঙেছে আল্লার কাছে, পলাশির প্রান্তরে সিরাজের পরাজয়ের খবর শুনে যাদের মনে খুশির তুফান উঠেছিল, চকবাজারের পথে সিরাজের এই আওকাত দেখে তাদের অন্তরেও মোচড় দিচ্ছে সূক্ষ্ম ব্যথা। তারাও বলছে, আর যাই হোক, আলিবর্দির দৌহিত্রের প্রতি আর একটু সম্মান দেখাতে পারতেন মিরজাফর। দু'দিন আগেও যিনি ছিলেন সুবে বাংলার নবাব, তাঁকে মামুলি এক তস্করের মতো, জনসমক্ষে হাঁটিয়ে এমন বেইজ্জত না করলেই ভালো হত।

শাহি রিয়াসতে অবশ্য এসব আবেগের কোনও দাম নেই। যে জঙ্গ ফতে করে তার জিন্দেগি গুলশন বনে যায়। গালিবের দুনিয়া তাগদের জলোয়ায় জেল্লাদার হয়ে ওঠে। আর যে হেরে যায়, তার নসিবে লেখা থাকে বেইজ্জতি, জিন্দানখানার আঁধারে দিন গুজারের অভিশাপ, অন্তহীন দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা। যা অন্ত হয় দাফনে। তাগদবাজেরা তাগদ হারিয়ে এ ভাবেই শেষ হয়ে যায়। জঙ্গবাজির ময়দানে যে কামেয়াব হয় সে তার প্রতিপক্ষকে চিরতরে বিনাশ করতে চায়। দুশমনের মওত না হলে গালিবের বেতাব দিলের আখেজ, আদাওতি, খুনজোশীর চ্যায়েন হয় না।

ফূর্তিতে মাতোয়ারা মিরকাশিমের বাহিনী। সকলকে মোটা ইনাম দেবেন বলে কড়ার করেছেন মিরকাশিম। বাজনদারেরা সেই খুশিতে কাড়ানাকাড়ার শব্দে কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে। বাজনা বাজিয়ে তামাম মুর্শিদাবাদকে মিরকাশিম জানাচ্ছেন তার কামালিয়তের কিসসা। বন্দি সিরাজদ্দৌলা এই কামালিয়তের সাবুত।

শোভাযাত্রার একেবারে সামনে অশ্লীল ভঙ্গিতে কোমর দুলিয়ে নাচতে নাচতে চলেছে মিরনের দুই জঘন্য শাগরেদ—চুনিলাল ও মুন্নিলাল। তাদের পিছনে রয়েছে বাজনদারেরা। এদের পিছনে সেনা পরিবৃত হয়ে যন্ত্রের মতো হেঁটে চলেছেন সিরাজদ্দৌলা। তাঁর পিছনে মিরকাশিম। বসে আছেন হাতির পিঠে আম্বারীতে। চোখেমুখে কামেয়াবির খুশির ঝিলিক। একেবারে পিছনে আসছে ফৌজের বাকি সেপাই-আহেদিরা।

শারীরিক ধকলে ও গভীর অবসাদে সিরাজের শরীরটা একেবারে যেন ভেঙে আসছে। এরপরে কী অপেক্ষা করে আছে তাঁর নসিবে, জানেন না। তাগদ-ক্ষমতা-জোশ এসব আর কিচ্ছু ফিরে পেতে চান না সিরাজ। খোদার দুনিয়া বহুত সুন্দর। শুধু বাঁচতে চান সিরাজ। কিন্তু গদ্দারেরা তাঁকে রেয়াত করবে কি?

মসনদের প্রতি সিরাজের মনে জন্মেছে তীব্র বিতৃষ্ণা। ভেবেছিলেন, মুর্শিদাবাদ থেকে পালিয়ে পাটনায় গিয়ে নায়েব রামনারায়ণ ও ল সাহেবের সঙ্গে মিলিত হয়ে ফের ফৌজ গড়ে তুলবেন। তারপর তুফান হয়ে আছড়ে পড়বেন মুর্শিদাবাদে। সবক শিখিয়ে ছাড়বেন ইংরেজদের। কোতল করবেন গদ্দারদের। এসব ভাবনা মন থেকে একেবারে ঝেড়ে ফেলেছেন সিরাজ। এই হিন্দুস্তানের কোনও এক অজানা দেহাতে একজন আমআদমির মতো অনাড়ম্বরে বাঁচতে চান তিনি। লুৎফা আর উম্মেসায়েরাকে নিয়ে ছোট্ট একটা সুখের নীড় গড়ে তুলতে চান। তার এই আরজু কি খোদাতালা মঞ্জুর করবেন?

লুৎফা ও উম্মেসায়েরার কথা মনে হতেই সিরাজের বুকটা হুহু করে ওঠে। কোথায় লুৎফা? কোথায় উম্মেসায়েরা? এখন কোথায় আছে তারা? কী লাঞ্ছনা জুটছে তাদের নসিবে সিরাজ কিছুই জানেন না। গ্রেফতারির পরেই মিরকাশিমের সেনারা তাঁর থেকে লুৎফা আর উম্মেসায়েরাকে আলাদা করে দিয়েছে। বিষাদে ভরা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন সিরাজদ্দৌলা। শ্লথ হয়ে গিয়েছে হাঁটার গতি। হঠাৎই পাশ থেকে তাঁর গায়ের উপর এসে পড়ে কোড়ার আঘাত। যন্ত্রণায় কাতর আর্তনাদ করে ওঠেন সিরাজদ্দৌলা। এই দৃশ্য দেখে শিউরে ওঠে আমজনতা।

গোধূলির আলো নিভছে। সন্ধে নামছে। খানিবাদেই আঁধারে ডুববে রাজধানী। সিরাজকে নিয়ে শোভাযাত্রা এগিয়ে চলে নিজামত কেল্লার নৌকোঘাটের দিকে। গন্তব্য হিরাঝিলের প্রাসাদ। চকবাজারের মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে তখন ভেসে আসছে আজানের সুর—

আশহাদু-আল্লা-মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।
আশহাদু-আল্লা-মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।
হাইয়া আলাস সালাহ।
হাইয়া আলাস সালাহ।
হাইয়া আলাল ফালাহ।
হাইয়া আলাল ফালাহ।

সিরাজ আকাশের দিকে মুখ তুলে মোনাজাত করেন, রহেম করো আল্লা। রহেম করো আমাকে।

অবেলায় নিদ্রা গিয়েছিলেন মিরজাফর।

সন্ধে নামল। আলোয় ঝলমল করে উঠল হিরাঝিল প্রাসাদ। মিরজাফর তখনও ঘুমোচ্ছিলেন। হিরাঝিলের হারেমে। অর্ধনগ্ন অবস্থায়, নিরাবরণ এক গুলবদন যুবতীর নগ্নবাহুতে মাথা রেখে।

গুলকারি সুজনিতে ঢাকা পাখির পালক দিয়ে তৈরি নরম গদির উপরে সুখনিদ্রায় নিমজ্জিত নবাব মিরজফরকে ডেকে তুলল মিরন।

একজন খোজার মারফত হারেমের অভ্যন্তরে মিরনের পাঠানো চিরকুটে চোখ বুলিয়ে সিরাজের গ্রেফতারির খবরটা শুনে খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন মিরজাফর। বেশবাস সামলে দরহাল ছুটে বেরিয়ে এলেন অন্দরমহল থেকে। তাঁর নির্দেশে তখনই দূত ছুটল মোরাদবাগ প্যালেসের উদ্দেশে। কর্নেল ক্লাইভকে এই শুভ সংবাদটা জানাতে হবে।

মুখে মৃদু হাসির রেশ নিয়ে মিরজাফরের সামনে এসে তসলিম জানালেন মিরকাশিম। আবেগে দামাদকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন মিরজাফর।

জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ প্রমুখ প্রবীণ ওমরাহেরাও সিরাজের গ্রেফতারির খবর পেয়ে ছুটে এলেন হিরাঝিল প্রাসাদে। সিরাজের ভবিতব্য কী হবে তা নির্ধারণ করার জন্য তখনই দরবার বসল।

এই সেই হিরাঝিল। আলিবর্দি যখন সিরাজকে তার উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করলেন, সিরাজ বলেছিলেন, দশজন ফকির একটা জীর্ণ কম্বল গায়ে দিয়ে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু একই প্রাসাদে দুইজন নবাবের থাকাটা ভালো দেখায় না।

দৌহিত্রের কথার ইঙ্গিতটা বুঝলেন আলিবর্দি। তারপরেই ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে দৌহিত্রের জন্য একটি রাজকীয় প্রাসাদ গড়ে তোলার উদ্যোগ নিলেন তিনি। সিরাজ নিজে দেখভাল করে গড়ে তুলেছিলেন

বেহেস্তের মতো সুন্দর এই প্রাসাদ। কারিগরেরা এসেছিল দিল্লি আগ্রা থেকে। গৌড়ের পরিত্যক্ত হাভেলিগুলো ভেঙে নিয়ে আসা হয়েছিল পাথর।

এই প্রাসাদের দেখভাল নিমিত্ত কর আদায়ের জন্য পাশেই একটা গঞ্জ স্থাপন করেছিলেন আলিবর্দি। মনসুর-উল-মুলক উপাধি পেয়েছিলেন সিরাজদ্দৌলা। সেই থেকে গঞ্জের নাম হয় মনসুরগঞ্জ। হিরাঝিল প্রাসাদকে অনেকে বলে থাকেন মনসুরগঞ্জের প্রাসাদ।

মিরজাফরকে সুবে বাংলার মসনদে বসাতে এসে হিরাঝিল প্যালেসের বৈভব ও সাজসজ্জা দেখে মাথা ঘুরে গিয়েছিল কর্নেল ক্লাইভের। প্রকাশ্যেই তিনি কবুল করেছিলেন, আলিশান এই প্রাসাদে আড়েবহরে এতটাই বড় যে একসঙ্গে তিনজন ইউরোপীয় রাজা এখানে অনায়াসে বসবাস করতে পারেন।

সন্ধের আলোয় ঝলমল করছে হিরাঝিল প্রসাদ। গোটা বাগান জুড়ে বাহারি শামদানে জ্বলছে অভ্রের পাত। নতুন নবাব মিরজাফরকে স্বাগত জানাতে ফুল, লতাপাতায় সেজেছে গোটা প্যালেস। সর্বত্র বিরাজ করছে বেহস্তের খুশি। নহবতখানা থেকে ভেসে আসছে সানাইয়ের সুর। রংমহলে চলছে মুজরোর প্রস্তুতি। কানে ভেসে আসছে তবলা ও সারেঙ্গির আওয়াজ। সন্ধের শীতল বাতাস ঢেউ তুলছে হিরাঝিলের জলে। বাতাসে ভেসে আসছে সুগন্ধিফুলের সুবাস।

চেনা ছবি, চেনা গন্ধ। বহুকালের পরিচিত সবকিছু। তবুও কেমন যেন অচেনা। প্রাসাদে প্রবেশের মুখে প্রিয় হিরাঝিল প্যালেসকে অবাক চোখে দেখছিলেন সিরাজদ্দৌলা। নজরে পড়ছিল গোলাম-বাঁদি-বান্দাদের অতিপরিচিত মুখগুলো। সেই চোখগুলোর ভাষায় আজ মিশে রয়েছে তাঁর প্রতি সীমাহীন তাচ্ছিল্য। জমানা বদলে গেলেই সবাই বদলে যায়।

হিরাঝিল প্রাসাদে এনে সিরাজকে রাখা হয়েছে অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে এক কারাকক্ষে। পাথরের মেঝের উপরে পাতা জীর্ণ একখানা চাটাইয়ের উপরে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসেছিলেন সিরাজ। চোখ বুজে আসছে ক্লান্তিতে। হঠাৎ শিউরে উঠলেন সিংহের গর্জন শুনে। অদূরেই হিরাঝিল প্রাসাদের পশুশালা। গর্জন করছে সিরাজের পোষা সিংহ আলাদিন। সে কি টের পেয়েছে যে তার মনিব আজ নিজের হাভেলিতেই গদ্দারদের হাতে বন্দি? আলাদিনের গলার আওয়াজ শুনে সিরাজের অশান্ত মনে কিছুটা হলেও যেন শান্তির প্রলেপ লাগল। পোষা জানোয়ার সবসময়ই তাঁর মনিবের অনুগত। সে কখনও বেইমানি করে না।

খানিকবাদে কয়েকজন পেয়াদা এসে কারাকক্ষের দরজা খুলল। ডাক পড়েছে। দরবার ঘরে যেতে হবে। অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়ালেন সিরাজ। মাথা টলছে।

১৩

জরুরি দরবার বসেছে হিরাঝিল প্রাসাদে। মসনদে আসীন মিরজাফর। তাঁর দুপাশে বসে আছেন রায়দুর্লভ ও জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ। সকলেরই মুখের অভিব্যক্তিতে প্রকাশ পাচ্ছে উৎকণ্ঠা।

জগৎশেঠের পাশে মিরন। উত্তেজনায় সে স্থির হয়ে বসতে পারছে না। বারবারই কুরসি ছেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে। তাগদ-জোশ-জলুস সব হারানো বেদৌলত, বেইজ্জত, সিরাজদ্দৌলার বিধ্বস্ত, যন্ত্রণাক্লিষ্ট চেহারাটা দেখে খুশিতে ফেটে পড়ার অপেক্ষায় রয়েছে মিরন। সেই সঙ্গে তার মনে উঁকি দিচ্ছে লুৎফুন্নেসার খুবসুরত মুখটা। আপাতত চেহেল সেতুনে বন্দিনী হয়ে আছে লুৎফা। দীর্ঘকাল ধরে ধরে যে নারীকে সে মনের গহীনে কামনা করেছে, সে আজ তার হাতের মুঠোয়। লুৎফাকে নিয়ে রংদার তসবির মনের পর্দায় আঁকতে আঁকতে সুখের আবেশে মিরন বিভোর। আশনাই-আশরতের খোয়াবে মশগুল।

রায়দুর্লভের পাশে মিরকাশিম বসে আছেন শান্ত হয়ে। সকলের তারিফদারি পেয়ে তাঁর চিত্ত প্রসন্ন। তাঁর পিঠ চাপড়ে বাহবা দিয়েছেন মিরজাফর, রায়দুর্লভ ও জগৎশেঠ। তবে মিরন এ ব্যাপারে নিরুত্তাপ। খুশি মনে সে একবারও মিরকাশিমকে তারিফ জানায়নি। বরং আড়ালে বলছে, এর মধ্যে মিরকাশিমের কুদরতি কোথায়? পলাতক সিরাজ আজ না হলে কাল তো ধরা পড়তই। হাজার হাজার কসিদের নজর এড়িয়ে সুবে বাংলায় সিরাজের পক্ষে নিজেকে লুকিয়ে রাখা তো কোনওভাবেই সম্ভব ছিল না। যেকোনও আনপঢ় আদমিও সিরাজকে গ্রেফতার করতে পারত।

ভাঙের নেশা আর নারীবিলাসে মজেছেন মিরজাফর। এতেই বুদ হয়ে থাকেন দিনরাত। নিজামত চলে মিরনের খায়েশে। সম্বন্ধীর কাছ থেকে তারিফ না পেলেও একটি ঘটনায় মিরজাফরের দামাদ খুব খুশি। মোরাদবাগ থেকে একটা চিরকুট এসে পৌঁছেছে তাঁর হাতে। কর্নেল ক্লাইভ পাঠিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'বহুত সুক্রিয়া। আপনার কুদরতিতে তামাম সুবে বাংলা সত্যিই এবার খুশি মানাতে পারবে।' মিরকাশিমের কামালিয়তকে স্বীকৃতি দিয়েছেন স্বয়ং কর্নেল ক্লাইভ। আর কী চাই?

সহসা বেজে উঠল কাড়ানাকাড়া। সিরাজদ্দৌলাকে নিয়ে দরবার ঘরে প্রবেশ করল পেয়াদারা। গোটা দরবার আলো করা প্রকাণ্ড বেলোয়ারি ঝাড়বাতির নীচে এসে দাঁড়ালেন সিরাজ। কোমরে বাঁধা দড়ি। হাতদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। পায়ে লোহার বেড়ি।

মিরজাফর, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ—সকলেরই চোখগুলো বিস্ফারিত হয়ে উঠল। কে দাঁড়িয়ে আছে তাদের সামনে? ইনি সিরাজদ্দৌলা? শেষ দেখা হয়েছিল পলাশির প্রান্তরে। নবাবের উষ্ণীষটা তখনও ছিল তাঁর মাথায়। বিপদ বুঝে উটের পিঠে চেপে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন ছিল ২৩ জুন, আজ ২ জুলাই। প্রায় দশ দিন পরে ফের সামনাসামনি দু'তরফের মোলাকাত।

এ ক'দিনে কী চেহারা হয়েছে সিরাজের? কোথায় সেই সুকুমার মুখমণ্ডলে ভেসে থাকা রাগী চোখদুটো? কোথায় সেই গুমানি? এ যে জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়া একজন অসহায় মানুষ। দেহের উজ্জ্বল গৌরবর্ণে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে কেউ। কোটরাগত চোখদুটো ক্লান্তিতে যেন বুজে আসতে চাইছে। সত্যিই কি ইনি আলিবর্দির দৌহিত্র মনসুর-উল-মুলক—সিরাজদ্দৌলা—শাহকুলি খাঁ—মিরজা মহম্মদ—হায়বৎজঙ্গ বাহাদুর? যাঁকে চোখের সামনে বচপনকাল থেকে বেড়ে উঠতে দেখেছেন এই প্রবীণ মানুষেরা, কয়েকদিন আগেও যিনি ছিলেন তামাম সুবে বাংলার নবাব, যাঁর হাতে কোতল হওয়ার ভয়ে সদা শঙ্কিত ছিলেন মিরজাফর, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, তিনিই আজ বন্দি হয়ে তাদের সামনে বিচারপ্রার্থী? এই উলটপুরাণ কোনও খোয়াব নয়তো?

গিরদায় ঠেস দিয়ে কাত হয়েছিলেন মিরজাফর। সিরাজদ্দৌলাকে দেখে বিস্মিত চোখে সোজা হয়ে বসলেন। সিরাজের তৈরি হিরাঝিলে, তাঁরই চোখের সামনে মসনদে আসীন মিরজাফরের মনের গহীনে কোথায় যেন কাঁটা বিঁধছে। আলিবর্দির মতো বাহুবলে মসনদ দখল করেননি তিনি। সুবে বাংলার নবাবের বিরুদ্ধে মাত্র আড়াই হাজার সেনা নিয়ে কামেয়াব হওয়ার কথা নয় ইংরেজদের। চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার ঘোড়সওয়ার নিয়ে এসেও বারো বছরে বাংলার নবাবকে কাবু করতে পারেনি বর্গিরা। যা প্রায় অসম্ভব ছিল পলাশির প্রান্তরে তাই সম্ভব হয়েছে মিরজাফর-রায়দুর্লভ-জগৎশেঠের মতো কিছু মানুষের গদ্দারি ও কর্নেল ক্লাইভের কুদরতিতে।

সিরাজের চোখের দিকে তাকাতে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছেন মিরজাফর। মনে হচ্ছে, তাঁর চোখের সামনে থেকে পেয়াদারা সিরাজকে সরিয়ে নিয়ে গেলে তিনি স্বস্তি বোধ করবেন।

'এই আসামীর কী বিচার করবেন হুজুর?'

জগৎশেঠের প্রশ্ন শুনে রায়দুর্লভের দিকে তাকালেন মিরজাফর।

রায়দুর্লভ গুজারেশ করলেন, 'হয় জিন্দেগিভর জিন্দানখানায় দিন গুজার নয়তো মওত।'

মিরন উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, 'জিন্দানখানা কভি নেহি। জিন্দা দিন গুজার করার কোনও হকই নেই এই আসামীর। মওতই একমাত্র নিদান হওয়া উচিত।'

মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন সিরাজ। এবারে মুখ তুলে কাতর কণ্ঠে বললেন, 'আপনারা কী আমাকে একটু রহেম করতে পারেন না? মসনদ-দৌলত-তাগদ-জলুস এসব আমি আর কিচ্ছু চাই না। আপনারা আমাকে বাঁচতে দিন। স্রেফ এক আমআদমির মাফিক। এই মুলুক ছেড়ে আমি চলে যাব। আমি ভিখ মাঙছি আপনাদের কাছে। একটু রহেম করুন।'

সিরাজের এই কাতর আর্তি শুনে বিশ্রি ভঙ্গিতে হেসে উঠল মিরন। হাসি থামিয়ে সিরাজের উদ্দেশে বলল, 'খরিশের বাচ্ছাকে কেউ কি জিন্দা রাখে জনাব?'

জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ বলে উঠলেন, 'পলাশিতে জিৎ-হাসিল করলে আমাদের কি আপনি জিন্দা ছেড়ে দিতেন? আপনাকে জিন্দা রাখা মানে তো আমাদের জানকে খতরার মধ্যে ফেলা।'

মিরন উত্তেজিত হয়ে জোর গলায় বলে উঠল, 'বেশক। সাচ্চা বাত। মওকা পেলেই খরিশের বাচ্চা ফের ছোবল মারতে চাইবে।'

প্রবল উত্তেজনায় কুরসি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নবাব মিরজাফরের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে তসলিম জানিয়ে মিরন বলল, 'আপনি হুকুম করুন হুজুর। এখনই কোতল করি আজাজীলের এই আওলাদকে। হয় ভাগীরথীর পানিতে ডুবিয়ে মারব নয়তো চকবাজারের রাস্তায় শূলে চড়াব। মুর্শিদাবাদের হর আদমি দু'চোখ ভরে দেখুক সিরাজদ্দৌলার বরবাদি। তারপর শেষ করব আলিবর্দির হর রিসতেদারকে। এক এক মওতের হবে এক এক রকমের কিসিম। আলিবর্দির খানদানের নাম মুছে যাবে সুবে বাংলা থেকে। তুজুক স্রেফ ইয়াদ রাখবে মিরজাফর ও তাঁর খানদানকে।'

মিরজাফর বলে উঠলেন, 'নেহি। শান্ত হও বেটা।'

মিরজাফরের এই প্রতিক্রিয়ায় স্তম্ভিত মিরন। কী বলছেন আব্বাহুজুর? সিরাজদ্দৌলাকে জিন্দা রাখতে চান?

খানিকটা যেন আশার আলো দেখতে পেয়ে মুখ তুলে মিরজাফরের মুখপানে চাইলেন সিরাজ।

মিরজাফর বললেন, 'ক্লাইভ সাহেবের সঙ্গে আলোচনা না করে এই মামলায় আমি কোনও ফয়সালা করতে রাজি নই। সবকিছু জানিয়ে এখনই একবার হিরাঝিলে আসার জন্য কর্নেলের কাছে আমি চিঠি পাঠিয়েছিলাম। উনি জানিয়েছেন, তবিয়ত আচ্ছা নেই। আজ আসতে পারবেন না। আসবেন আগামীকাল। আপাতত জিন্দানখানায় বন্দি করে রাখা হোক সিরাজকে। তাঁর কী সাজা হবে সেটা আগামীকালই চূড়ান্ত করা যাবে।'

মিরজাফরের প্রস্তাব রায়দুর্লভ, মিরকাশিম ও জগৎশেঠের মনে ধরল। তাঁরাও ভেবে দেখলেন, সিরাজের বিষয়ে তড়িঘড়ি কোনও সিদ্ধান্ত নিতে গেলে বিপদ হতে পারে। তামাম মুর্শিদাবাদের বহু মানুষের কাছেই আলিবর্দি হলেন প্রায় পয়গম্বরের সমান। তাঁর দৌহিত্রকে রাতারাতি কোতল করে ফেললে প্রজা বিক্ষোভ হতে পারে। তাছাড়া কর্নেল ক্লাইভকে আঁধারে রেখে এমন গুরুত্বপূর্ণ মামলার ফয়সালা করা মোটেই উচিত নয়। সিরাজের বিষয়ে তিনি কী চান সেটা জানা দরকার। কাল অবধি অপেক্ষা করাই ভালো। ঠিকই বলছেন মিরজাফর।

এ সিদ্ধান্তে মিরন মোটেই খুশি নয়। ভুরু কুঁচকে গেল তার। রাগে ফুঁসতে লাগল সে। আব্বাজানের মুখে শুধু ক্লাইভ, ক্লাইভ আর ক্লাইভ শুনতে শুনতে মিরন তিতিবিরক্ত। ইনকিলাব ঘটে গিয়েছে মুর্শিদাবাদে। সিরাজদ্দৌলা অতীত। মসনদে বসেছেন মিরজাফর। এখন আর ওই টোপিওয়ালা ইংরেজদের মুরুব্বি ঠাওরানোর কী আছে? দেশ চলবে নবাবের খুশখেয়ালে। চিরকাল যেমন চলে এসেছে, তেমনই। ক্লাইভের মুখের দিকে নবাবকে চেয়ে থাকতে হবে কেন? এভাবে চলতে থাকলে তো ইংরেজরাই একদিন মসনদের দখল নিয়ে নেবে। আপাতত নিজের মনের ভাব গোপন করে গোমড়া মুখে বসে রইল মিরন।

মিরকাশিম প্রশ্ন করলেন, 'সিরাজকে কি হিরাঝিলেই কয়েদ করে রাখা হবে?'

মিরজাফর বললেন, 'না। সিরাজ থাক মিরনের হেফাজতে। জাফরাগঞ্জের জিন্দানখানায়।'

এই নিদান শুনে মিরনের মুখে হাসি ফুটল। সিরাজের ভবিতব্য কী হবে, দরহালই তা সে মনে মনে নির্ধারণ করে ফেলল।

মিরজাফর বললেন, 'দেখো বেটা, সিরাজের উপর যেন কোনও জুলমাত না হয়।'

মিরন মুখে হাসির রেশ বজায় রেখে বলল, 'বান্দা আপনার এই বাত ইয়াদ রাখবে।'

পেয়াদারা সিরাজদ্দৌলাকে নিয়ে চলে গেল দরবার ঘর ছেড়ে। মসনদ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মিরজাফর। দরবার ভাঙল।

জাফরাগঞ্জের কয়েদখানায় বন্দি হলেন সিরাজদ্দৌলা। এখন তিনি মিরনের হেফাজতে।

স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার খুপরি ঘর। সিরাজকে কারাকক্ষের ভিতরে ঢুকিয়ে পেয়াদারা খুলে দিয়েছে পায়ের বেড়ি। শিকলের শক্ত বাঁধনে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে টনটন করছিল পা দুটো। পায়ের বাঁধন খোলায় খানিকটা যেন আরাম বোধ করলেন সিরাজ। হাত দুটোও কারারক্ষী মুক্ত করে দিয়েছে অসীম অনুগ্রহে।

পাথরের মেঝের উপর বিছানো মলিন একটা চটের উপরে হাঁটু মুড়ে নামাজ আদায়ে বসলেন সিরাজদ্দৌলা। নামাজ শেষ করে উপরের দিকে মুখ তুলে বেশ জোর গলাতেই বলে উঠলেন, 'রহেম করো আল্লা! একটু রহেম করো আমায়!'

পাথরের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হল সিরাজের আর্তি। তাঁর মনে হল, কেউ যেন খিলখিলিয়ে হেসে উঠে ব্যঙ্গ করল তাঁকে। খুবই চেনা নারীকণ্ঠের খুশ ইলহান আওয়াজ।

'কে তুমি?' প্রশ্ন করলেন সিরাজদ্দৌলা।

'আমি ফৈজি ফয়জান। মনে পড়ে জ্যান্ত গোর দিয়েছিলেন আমায়?'

কাতর গলায় সিরাজ বলেন, 'আমাকে মাফ করো ফৈজি।'

'মাফ করার আমি কে হুজুর? আপনার বিচার করবেন দুনিয়াদার।'

'তুমিও কি চাও আমার মওত?'

'আমার চাওয়া না চাওয়ায় কী এসে যায় হুজুর? আমি তো মামুলি এক জেনানা। আপনার কামনার পুতুল ছিলাম আমি। আমায় নিয়ে আপনি খেলা করেছেন। তারপর নিজের হাতেই জ্যান্ত গোর দিয়েছেন। খেলা শেষ হলে মাসুম বাচ্চারা যেমন হাতের পুতুলকে আছড়ে ভাঙে, তেমনই আমাকে শেষ করে দিয়েছিলেন আপনি। আপনার মতোই আমিও তো বাঁচতে চেয়েছিলাম কিন্তু দুনিয়াদার আমার এই তামান্না মঞ্জুর করলেন না।'

সিরাজ দু'হাতে কান চেপে ধরে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'চুপ করো, ফৈজি চুপ করো।'

'বদকিসমতি আমারই।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফৈজি।

'আমি জানি। তোমার প্রতি বেনজির জুলমাত করেছি আমি। রহেম করো আমায়।'

'জানেন হজরত—চারিদিকে দেওয়াল গাঁথা অন্ধকূপে বন্দি হয়ে শুধু একমুঠো বাতাস খুঁজেছি আমি। সামান্য একঝলক বাতাস যে এত কিমতি, সিনা ভরে শ্বাস নেওয়া যে আল্লার কতখানি মেহেরবানি তা আগে কখনও বুঝিনি। আমার কলিজা ফেটে যাচ্ছিল। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। একটু বাতাস—শুধু একটু বাতাস বলে আমি চেঁচিয়েছি। গলা চিরে খুন ঝরেছে। তবু কেউ শোনেনি আমার কথা। একফোঁটা জলের জন্য আমি ছটফট করেছি।'

সিরাজ ফের চেঁচিয়ে ওঠেন, 'খামোশ। থামো ফৈজি। থামো।'

‘আপনার খুশখেয়ালে আমার জহমত। বদনসিবি। মওতের পরে আজাদি পেয়েছি আমি। এই আখিরাতে সিনা ভরে শ্বাস নেওয়ার জন্য আমি শুধু বাতাস খুঁজে বেড়াই।’

সিরাজদ্দৌলা কাতর কণ্ঠে বলে ওঠেন, ‘ফৈজি মাফ করো। রহেম করো আমায়।’

পাথরের দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হল কথাগুলো। হুঁশ ফেরে সিরাজদ্দৌলার। তাঁরই হুকুমতে জ্যান্ত গোর দেওয়া হয়েছিল ফৈজিকে। তার মওত হয়েছে বহুদিন আগে। কোথা থেকে সে আসবে এই কয়েদখানায়। বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন সিরাজদ্দৌলা। অপরাধবোধ আজ যেন তাঁকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

বহু অর্থ ব্যয় করে দিল্লি থেকে বাইজি ফৈজি ফয়জানকে মুর্শিদাবাদে আনিয়েছিলেন সিরাজ। হিরাঝিল প্রাসাদে ফৈজিকে নিয়ে আশনাই, আশরতে দিব্যি খুশির দিনগুলো কাটছিল। হঠাৎই একদিন সিরাজ জানতে পারলেন ফৈজির সঙ্গে তাঁর ভগিনীপতি সৈয়দ মহম্মদ খাঁর প্রণয়াভিসার চলছে। নিমেষে চুরমার হয়ে গেল সিরাজের মনের মধ্যে গড়ে ওঠা মহব্বতের আলিশান ইমারত। আশিকের নরম চোখদুটোয় জ্বলে উঠল ঈর্ষার আগুন। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ফৈজিকে জ্যান্ত গোর দেওয়ার নিদান দিয়েছিলেন সিরাজদ্দৌলা।

শুধু তো ফৈজি নয়। সিরাজের মনের অবচেতনে আজ বারবার উঁকি দিচ্ছে হোসেনকুলি খাঁও। প্রকাশ্য রাজপথে হত্যা করা হয়েছিল হোসেনকুলিকে। তবে এই হত্যার পিছনে সিরাজ ছিলেন নিমিত্তমাত্র।

ঘসেটি বেগম ও আমিনা বেগম—দু’জনেই হোসেনকুলির সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। আলিবর্দির দুই বেটির কিসসার কথা কানাকানি হতে হতে চেহেল সেতুনের দিওয়ার টপকে তামাম মুর্শিদাবাদ শহরে ছড়িয়ে পড়ে মুখরোচক আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। আলিবর্দির খানদানের মান-ইজ্জত ধুলোয় মিশে যাওয়ার উপক্রম। হোসেনকুলিকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ চাইলেন শরফ উন্নেসা। সিরাজের নানি বেগম। তিনি উত্তেজিত করে তুললেন সিরাজকে। সিরাজেরই মদতে বাড়ি থেকে টেনে বের করে প্রকাশ্য রাস্তায় খুন করা হল হোসেনকুলিকে। আলিবর্দির দৌহিত্রের নৃশংস আচরণ দেখে শিউরে উঠেছিল তামাম মুর্শিদাবাদের মানুষ। মওতের পর কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছিল হোসেনকুলির দেহ। রক্তে ভেসে গিয়েছিল রাজপথ।

কারাকক্ষের বাইরে বাতিদানে জ্বলছে রেড়ির তেলের আলো। গরাদের ফাঁক গলে সেই আলোর এক ফালি এসে ঢুকেছে ভিতরে। এই আলো-আঁধারিতে হঠাৎই নিজের দুই করতলের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলেন সিরাজদ্দৌলা। মনে হল, দুই করতল রক্তে রাঙা। সেখান থেকে টপ টপ করে রক্ত ঝরে পড়ছে কয়েদখানার মেঝেতে। এ রক্ত হোসেনকুলির, এ রক্ত ফৈজির, এ রক্ত সেই সব আজনবি মানুষের, একদা খুশখেয়ালে খেলার ছলে ভাগীরথীর বুকে নৌকো উলটে যাদের জলে ডুবিয়ে মেরে ইয়ারদোস্তদের নিয়ে মজা লুটেছিলেন তিনি।

ডুকরে কেঁদে উঠে সিরাজদ্দৌলা বলেন, ‘হে দুনিয়াদার! মাফ করো আমাকে। তাগদ, তাকাব্বুরি, খুনজোশী–ইনসানকে অন্ধ করে দেয়। গুমরাহী করে তোলে। ন্যায়-অন্যায়বোধ হারিয়ে যায় শান-শওকতের গুমানিতে। আজ আমি এসব অন্তর থেকে উপলব্ধি করতে পারছি। আমাকে রহেম করো খোদাতালা। শুধু একটু বাঁচতে দাও আমায়!’

জাফরাগঞ্জ প্রাসাদের ঘড়িয়াল ঘণ্টা পিটিয়ে জানায় রাত তিন প্রহর।

কারাকক্ষের বাইরে থেকে ভেসে আসে পদচারণার শব্দ। কেউ আসছে এদিকে। কে আসছে কারাকক্ষের দিকে এই অনওয়াক্তে? অজানা আশঙ্কায় সিরাজের বুক কেঁপে ওঠে।

ক্লান্ত, অবসন্ন শরীরটা চাইছে বিশ্রাম। চোখদুটো আধ বোজা। শুয়ে আছেন পাথরের মেঝেতে। মলিন জীর্ণ চটের আস্তরণের উপরে। পায়ের শব্দ শুনে দেহটাকে উত্তলিত করেন সিরাজ। এক ছায়ামূর্তি কারাকক্ষের বন্ধ

দরওয়াজার সমুখে এসে দাঁড়াল।

সিরাজ শুধোন 'কে?'

উত্তর দেয় না ছায়ামূর্তি। আবছা আলোয় তার দেহের অবয়ব দেখে আগন্তুককে কেমন যেন চেনা চেনা বোধ হয় সিরাজের। ভুরু কুঁচকে জরিপ করার কোশিশ করেন।

বিকারগ্রস্ত সিরাজদ্দৌলা ফের প্রশ্ন করেন, 'কে তুমি? হোসেনকুলি? ইনসাফ চাইতে এসেছ?'

সশব্দে হেসে উঠে ছায়ামূর্তি বলে, 'হোসেনকুলি! নামটা এখনও ইয়াদ আছে আপনার?'

'রহেম করো হোসেনকুলি। রহেম করো আমাকে।'

'আমি তো আপনাকে রহেম করতেই এসেছি জনাব।'

'সত্যি বলছ?'

ঠিক এই সময় একজন দাখিলা এগিয়ে এসে কারাকক্ষের দরজার মুখে একটা শামাদান রেখে যায়। অভ্রের পাতজ্বলা জোরালো আলোয় পুরোপুরি আলোকিত হয়ে ওঠে প্রায়ান্ধকার কক্ষ।

আগন্তুকের চেহারাটা অনেকটা স্পষ্ট হয় সিরাজের চোখে। খুবই চেনা মুখ। তবুও কেমন যেন অচেনা ঠেকে সিরাজের আছে। কোথায় দেখেছেন একে? মনে পড়ে না। কৌতূহলের সঙ্গে তিনি শুধোন, 'তুমি তো হোসেনকুলি নও। কে তুমি?'

'আমি মহম্মদী বেগ। আমাকে ইয়াদ নেই আপনার?'

দুই রক্ষী এসে লোহার দরজাটা খুলে দিয়ে চলে যায়। কারাকক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে মহম্মদী বেগ। সিরাজের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়।

এবারে ধীরে ধীরে সব কথা মনে পড়ে যায় সিরাজের। একসময় নিজামত কেল্লায় আলিবর্দির খাস বান্দাদের সর্দার ছিল মহম্মদী। একদা বর্গির আক্রমণে, পিতা-মাতা সবাইকে সে হারিয়েছিল। পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল তাদের বসতবাটি। চকবাজারের পথের একপাশে পড়ে থাকা ক্ষুধায় কাতর, তোশদান হাতে বসে থাকা মহম্মদীর করুণ চোখদুটো দেখে করুণার উদ্রেক হয় আলিবর্দির মনে। তিনি তাকে চেহেল সেতুনে নিয়ে আসেন। গোলামের কাজে নিয়োগ করেন। স্বভাবগুণে কিছুদিনের মধ্যেই আলিবর্দির প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে মহম্মদী। অনাথা এক বালিকার সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছিলেন শরফ উন্নেসা। নবদম্পতিকে অনেক যৌতুকও দিয়েছিলেন। একান্তে সংসার পাতার জন্য মহম্মদী বেগকে একটা হাভেলি উপহার দিয়েছিলেন আলিবর্দি। নিজামত কেল্লা ছেড়ে যাওয়ার সময় আলিবর্দির পা জড়িয়ে ধরে মহম্মদী ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল। বলেছিল, 'আমি জিন্দেগিভর আপনার গোলাম হয়ে থাকব হুজুর।'

এই কারাকক্ষে রাত তিন প্রহরে আলিবর্দির স্নেহধন্য, তাঁর একান্ত অনুগত মহম্মদী বেগের আগমন সিরাজের কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত। সিরাজের ভগ্নহৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়। তবে কি মহম্মদী তাঁকে আজাদ করে দিতে এসেছে?

সিরাজ আবেগজড়িত গলায় বলেন, 'তুমি...তুমি মহম্মদী?'

'জি হুজুর। চিনতে পারছেন না?'

'তুমি এসেছ? তোমাকে আমার কাছে আসতে দিল ওরা?'

সিরাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মুচকি হাসে মহম্মদী বেগ।

সিরাজ বলেন, 'মহম্মদী তুমি নিশ্চয়ই আমাকে আজাদ করে দিতে এসেছ?'

'জি হুজুর। সহি আন্দাজ আপনার।'

'কেউ জানতে পারলে তোমার যে পরেশানি হবে।'

অন্ধকারে শ্বাপদের চোখের মতো ধকধক করে জ্বলছে মহম্মদীর চোখদুটো। মুচকি হেসে সে বলে, 'আমার জন্য আপনি ভাববেন না জনাব। আলিবর্দি খাঁর খানদানের হর আদমির সেবা করাই আমার মজবুরি।'

সিরাজদ্দৌলা আবেগে মহম্মদী বেগের হাতদুটো চেপে ধরে বলেন, 'তোমাকে আমি চিরকাল ইয়াদ রাখব মহম্মদী। জলদি আমাকে এই জিন্দানখানার বাইরে নিয়ে চলো। আমি সুবে বাংলা ছেড়ে চলে যাব। মসনদ, তাগদ, শান-শওকত এসব আর কিচ্ছু চাই না। হিন্দুস্তানের কোনও এক দেহাতে আজনবি এক আম-আদমির মতো বাঁচতে চাই আমি। আমাকে মুক্তি দাও মহম্মদী। তুমি বেশক পয়গম্বরের দূত। তাই এই মুসিবত থেকে আমাকে উদ্ধার করতে এসেছ। আমার জহমত জুড়িয়ে দাও মহম্মদী। জুড়িয়ে দাও।'

'জরুর। আপনার হর জহমত-তকলিফ নিভানোর জন্যই তো আমি এসেছি।'

এই বলে চকিতে কোমরবন্ধনী থেকে একটা খঞ্জর বের করে সিরাজদ্দৌলার বুকে আমূল বিঁধিয়ে দেয় মহম্মদী বেগ।

সিরাজের তীব্র আর্তনাদ জাফরাগঞ্জের পাষাণপুরীর দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। রাতের স্তব্ধতা খান খান হয়ে যায়। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা মুখ থুবড়ে পড়লেন পাথরের মেঝের উপরে। অস্ফুট স্বরে শুধু বললেন, সে-লা-ম! ম-হ-ম্ম-দী সে-লা-ম।

নিথর হয়ে গেল সিরাজের দেহ। তাজা রক্তস্রোত পাথরের মেঝের উপর দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে কারাকক্ষের বাইরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

সিরাজদ্দৌলার রক্তস্নাত নিষ্প্রাণ দেহটার দিকে তাকিয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল মহম্মদী বেগ। রক্তমাখা দু'হাতে মুখ ঢেকে সে আর্তনাদ করে উঠল, ' হায় আল্লা! এ আমি কী করলাম?'

১৪

কয়েদখানার লোহার দরজার নীচ দিয়ে গলগল করে বাইরের অন্ধ অলিন্দে বেরিয়ে আসে উষ্ণ রক্তস্রোত। পাথুরে মেঝের ঢাল বেয়ে নদীর মতো এঁকেবেঁকে, সর্পিল গতিতে গড়িয়ে যায়। এ রক্ত সিরাজদ্দৌলার। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের মওতের সাবুৎ। এ রক্ত কালান্তরের নিশান।

দেওয়ালগিরির আলো লক্ষ্য করে ছুটে যাওয়া একটা ক্ষুদ্র পতঙ্গ সহসা দিকভ্রষ্ট হয়ে পাথুরে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে আছড়ে পড়ে রক্তস্রোতের মধ্যে। আহত, অসহায় পতঙ্গটা ফরফর শব্দে পাখা নাড়িয়ে ফের ওড়ার চেষ্টা করে। আঁঠালো রক্তে পড়ে ভারী হয়ে গিয়েছে তার দেহ। পতঙ্গটা আর উড়তে পারে না। খানিকবাদে নিষ্পন্দ হয়ে যায়।

কয়েদখানার ভিতর থেকে বিধ্বস্ত চেহারায় বেরিয়ে আসে মহম্মদী বেগ। খঞ্জরবিদ্ধ সিরাজের কলিজা থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্তে সে চিত্রিত। তার পোশাকে রক্ত, হাতে রক্ত, মুখে রক্ত। রক্তের দাগ লেগেছে তার মাথার শিরপেচেও।

মহম্মদী অপ্রকৃতিস্থ, ভূতগ্রস্তের মতো তার দশা। চোখ দুটো বিস্ফারিত। যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মহম্মদীর মনে হচ্ছে কেউ যেন তার মাথায়, বুকে পাষাণভার চাপিয়ে দিয়েছে। টলছে মাথা। থরথর করে কাঁপছে হাত-পা। পদচালনা অসংলগ্ন। টলমলে পায়ে এগিয়ে চলে মহম্মদী। তার মনকে সহসা আচ্ছন্ন করেছে পাহাড়প্রমাণ অপরাধবোধ। অনুশোচনায় সে দগ্ধ। সে সিরাজের ঘাতক—একথা ভাবলে মহম্মদী নিজেই বিস্মিত হচ্ছে। কেবলই উন্মাদের মতো অস্ফুটস্বরে সে বলে চলেছে, 'হায় আল্লা! এ আমি কী করলাম। কেন করলাম?'

পিছন থেকে ধেয়ে আসা রক্তের স্রোত মহম্মদীর পা ছুঁয়ে সামনে বয়ে যায়। সেদিকে চোখ পড়তেই ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে মহম্মদী। 'রক্ত! রক্ত! সিরাজের রক্ত!' ছুটে পালাতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পাথরের

মেঝেতে আছড়ে পড়ে মহম্মদী। হাঁটুতে আঘাত লাগে। ফের সে আর্তনাদ করে উঠে বলে, 'আস্তাগফেরুল্লাহ!'

মহম্মদীর আর্তনাদ জাফরাগঞ্জের প্রাসাদের পাথরের দেওয়ালে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে বারবার প্রতিধ্বনিত হয়। মনহুশ সে আওয়াজ গোঙানির মতো শোনায়। ঠিক এই সময় ঘণ্টা পিটিয়ে রাত চার প্রহরের সমাপ্তি ঘোষণা করে জাফরাগঞ্জ প্রাসাদের ঘড়িয়াল। ভোর হল বলে! মসজিদ থেকে ভেসে আসে ফজরের নামাজের আজান।

গতকাল সন্ধ্যায় হিরাঝিল থেকে জাফরাগঞ্জে ফিরে এসেই বেশ কয়েকজনকে ডেকে পাঠিয়েছিল মিরন। মহম্মদী বেগও নবাবজাদার ডাক পেয়ে উৎসাহে ছুটে গিয়েছিল।

জাফরাগঞ্জ প্যালেসের রংমহলে মিরনের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ায় সকলে। খানিক আগেই মুজরো সেরে বিদায় নিয়েছে বাইজি। ফরাসের উপর গিরদায় ভর দিয়ে কাত হয়ে শুয়েছিল মিরন। হাতে ধরা শরাবের পাত্র প্রায় শূন্য। তখনও গোটা রংমহলে ম-ম করছিল শরাব ও ভাজা মাংসের উগ্র গন্ধ। সেই গন্ধে মহম্মদীর দম যেন আটকে আসছিল।

কেন নবাবজাদার এই জরুরি তলব, কেউ জানে না। সকলেরই চোখে বিস্ময়ের ঘোর। সেই সঙ্গে ভয়, দহসত। কোনও কসুর হল কী?

মাথা ঝুঁকিয়ে নবাবজাদাকে তসলিম জানায় সকলে।

মহম্মদী বলে, 'হুজুর সহি সালামত।'

মৃদু হেসে মিরন শুধোয়, 'কেমন আছ মহম্মদী? খুশ তবিয়ত তো?'

'জি হুজুর।'

মিরনের অদূরে ফরাসের উপর হাঁটু মুড়ে বসেছিল তার জিগরি দোস্ত চুনিলাল। তার হাতে চামড়ার একটা খেরিয়া। বেশ মোটা। খেরিয়াটা ইচ্ছে করেই দোলায় চুনিলাল। ঝনঝন শব্দে বেজে ওঠে একগাদা আশরফি।

মিরন বলে ওঠে, 'হাজার আশরফি ইনাম।'

একজন চমকে উঠে বিস্ফারিত চোখে বলে ওঠে, 'হা-জা-র আ-শ-র-ফি!'

মুচকি হেসে মিরন বলে, 'নেহায়েত কম নয়। যে কাজটা হাসিল করতে পারবে, সে পাবে।'

একজন শুধোয়, 'লেকিন হজরত কাম কী আছে?'

মিরন হেসে বলে, 'ছোটি সি এক কাম। মেহনত জেয়াদা নেই। ইনাম জেয়াদা।'

সরু গোঁফের একপ্রান্ত হাত দিয়ে পাকাতে থাকে মিরন। মুখে খল হাসির রেশ। চুনিলাল ধুয়ো ধরে, 'সহি বাত। ইনাম জেয়াদা। পরেশানি ভি নেই।'

অবাক হয় প্রায় সকলেই। কম মেহনতের কী এমন ছোট কাজ, যার জন্য হাজার আশরফি ইনাম ঘোষণা করছেন স্বয়ং নবাবজাদা?

'হাসিল করতে পারবে কাজটা?' এই বলে চোখ ঘুরিয়ে সকলের মুখগুলো ইয়াদদস্ত করতে থাকে মিরন।

মহম্মদী গুজারেশ করে, 'আপনি হুকুম করুন হুজুর। এই বান্দা বেশক তামিল করবে।'

মিরন বলে, 'বেশ। সিরাজদ্দৌলার গ্রেফতারির খবরটা শুনেছ?'

'জি হুজুর।' সকলে প্রায় একসঙ্গে বলে ওঠে।

চুনিলাল বলে, 'সিরাজ এখন হুজুরের হেফাজতে। জিন্দানখানায় কয়েদ হয়ে আছে। এই হাভেলিতে। সব খন্নাসি খতম।'

মিরন বলে ওঠে, 'সিরাজকে কোতল করতে হবে। এখনই। আজ রাতেই। এই হল কাজ।'

রংমহলে সহসা যেন বাজ পড়ল। স্তম্ভিত হয়ে গেল মহম্মদী বেগ সহ সকলে।

শরাবের পাত্রে রাখা তলানিটুকু গলায় ঢেলে মিরন বলে, 'চ্যায়েন সে শোচো। হাজার আশরফি ইনাম। কোয়ি মামুলি তোফা নয়। সেই সঙ্গে নিজামতের নোকরি।'

আলিবর্দির দৌহিত্র, কয়েকদিন আগেও যিনি ছিলেন সুবে বাংলার নবাব, মনসুর-উল-মুলক—সিরাজদ্দৌলা-শাহকুলি খাঁ—মিরজা মহম্মদ—হায়বৎজঙ্গ বাহাদুর! তাঁকে কোতল করতে হবে? এখনই? মহম্মদী ছাড়া বাকি সকলেরই বুক কেঁপে ওঠে ভয়ে। বর্গির হাত থেকে মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করার জন্য আলিবর্দিকে এখনও পয়গম্বরের মতো শ্রদ্ধা করে মুর্শিদাবাদের হর আদমি। তাঁর দৌহিত্র, নবাব সিরাজদ্দৌলাকে হত্যা করলে মানুষের সব রোষ হয়তো এসে পড়বে ঘাতকের উপর। পথে বেরোলে ক্ষিপ্ত জনতা হয়তো প্রবল ঘৃণায় পাথর ছুড়ে মেরে ফেলবে। এই ভেবে নারাজ হল মহম্মদী ছাড়া আর সকলেই। ফিরে গেল তারা। জাফরাগঞ্জ থেকে বেরিয়ে এসে বুক ভরে শ্বাস নিয়ে বাঁচল।

শুধু মিরনের সামনে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মহম্মদী বেগ। একেবারে নিশ্চুপ। ভাবলেশহীন মুখ। তার চোখের দৃষ্টি মিরনের মুখের উপরে স্থির হয়ে আছে। হা-জা-র আ-শ-র-ফি! সুখস্বপ্নে মহম্মদী তখন বিভোর। নিজের বিবি-বাচ্চার জন্য সুখ খরিদ করতে চায় সে। এমন মওকা আর আসবে কি?

চুনিলাল বলে, 'সব বেওকুফের দল। বুজদিল কাঁহিকা। মোটা ইনাম হেলায় হারাল।'

'তুমিও কী নারাজ মহম্মদী?' হিমশীতল গলায় প্রশ্ন করে মিরন।

'না হজরত। বান্দা আপনার হুকুম তামিল করবে।'

আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠে সোজা হয়ে বসে মিরন বলে, 'বহুত খুব। সহি আন্দাজ ছিল আমার। বলেছিলাম না চুনিলাল, আর সব লোক বেওকুফ হতে পারে, লেকিন মহম্মদী বেওকুফ নয় হুশিয়ার, আকলমন্দ আদমি।'

মহম্মদীর মুখচোখ পাথরের মতো শক্ত। তার মুখের দিকে চেয়ে মুখে খল একটা হাসির রেশ ঝুলিয়ে মিরন বলে, 'পহেলে হাজার আশরফি ইনাম। বাদমে থোড়া আউর কুছ। ইয়ানে নিজামতের নোকরি। জিন্দেগির রং বদলে নাও মহম্মদী। হরপল মিশকিনের মতো দিন গুজার করবে কেন? কাজটা হাসিল করো। খুশনসিবির জলোয়ায় জিন্দেগি মালামাল হয়ে যাবে।'

ফরাস ছেড়ে উঠে এসে মহম্মদীর হাতে একটা খঞ্জর ধরিয়ে দেয় চুনিলাল।

মিরন প্রশ্ন করে, 'কোই বরখেলাপ- গড়বড় হবে না তো?'

'না হুজুর। বান্দা আপনাকে বেইজ্জত করবে না।'

'ইয়ে বহুত খুশি কি বাত। এই বলে ডোরি টেনে ঘন্টি বাজায় মিরন। দু'জন দাখিলা এসে তসলিম জানায় তাকে। তাদের উদ্দেশে মিরন বলে, 'মহম্মদীকে কয়েদখানায় নিয়ে যাও।'

চুনিলাল বলে, 'তুরন্ত কাম হাসিল করা চাই। নবাবজাদা জানাজার আনজাম করে রেখেছেন।'

মিরন বলে ওঠে, 'সিরাজের মুণ্ডুটা ধড় থেকে আলাদা করে দিও।'

মিরনকে তসলিম জানাতে জানাতে দরজার দিকে পিছিয়ে যায় মহম্মদী বেগ।

বাতাসে মিলিয়ে যায় আজানের সুর। ফজরের নামাজ শুরু হল।

হাঁটুর চোট সামলে উঠে দাঁড়ায় মহম্মদী। জীবনকে সম্ভোগ করতে চেয়েছিল সে। চেয়েছিল নিজের বিবি-বাচ্চাকে সুখে রাখতে। সিরাজকে কোতল করে সুখ খরিদ করতে।

হাজার আশরফি কম তো নয়। গোলাম-বাঁদি সহ একটা হাভেলির সংস্থান হয়ে যাবে। গোলাম এসে ফরসির নল ধরিয়ে দিয়ে যাবে হাতে—অম্বুরি তামাকের সুবাসে ম-ম করবে চারিদিক। নিজামতের নোকরি–

বাঁধা মাসমাইনে সেই সঙ্গে উপরি আয়—রিসওয়াত। কারাগারে বন্দি অসহায় একটা মানুষকে খুন করা কীই বা এমন মুশকিলের কাজ? মওতই তো লেখা আছে সিরাজদ্দৌলার কিসমতে। তিনি কিছুতেই বাঁচতে পারেন না।

শাহি রিয়াসতে কুরসি বদল হলে পরাজিত নবাব-বাদশাকে কেউ জিন্দা ছাড়ে না। রেহাই পাননি মুর্শিদকুলির দৌহিত্র সরফরাজ খাঁ। রেহাই পাবে না সিরাজদ্দৌলাও। সে নারাজ হলে অন্য কেউ কোতল করবে সিরাজকে। সে তো নিমিত্তমাত্র। খুশনসিবি খরিদের এই মওকা হাতছাড়া করা মস্ত বেওকুফি হয়ে যাবে—এমনই ভেবেছিল মহম্মদী। চুনিলালের হাতে ধরা খেরিয়ার ভিতরে আশরফির ঝনঝন শব্দ মহম্মদীর কানে মশহুর এক নাচনেওয়ালির পায়ে বাঁধা নুপুরের শিরিন আওয়াজের মতো বাজছিল।

কিন্তু এখন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে কেন? জশন নয়, জহমতে কেন ভরে উঠছে দিল? সুখ কিনতে এসে কেন এই পর্বতপ্রমাণ আফশোশ? মহম্মদী জানে না, মানুষের মনের গতি বড় বিচিত্র। তার সহি আন্দাজ পায় না কেউই।

মনের মধ্যে গড়ে তোলা স্বপ্নসৌধের মিনার থেকে কে যেন ধাক্কা মারল মহম্মদীকে। অতলে তলিয়ে যাচ্ছে সে। পাপবোধে তার অন্তর ক্ষতবিক্ষত। চোখের পর্দায় ভেসে উঠছে নবাব আলিবর্দি খাঁ ও বেগম শরফ উন্নেসার তসবির। তাঁরা যেন জবাব চাইছে মহম্মদীর কাছে—'এ তুমি কী করলে মহম্মদী? আমরা তোমাকে পথ থেকে তুলে এনে প্রতিষ্ঠা দিলাম জীবনে, সেই তুমি খুন করলে আমাদের সিরাজকে? মাত্র হাজার আশরফির লোভে নিজের ইমানদারিকে কুরবানি দিলে তুমি? যে সুখ খরিদ করতে চেয়েছিলে, সেই সুখের নাগাল কি তুমি পাবে এই জীবনে?'

মহম্মদীর মনশ্চক্ষে ভেসে উঠছে আরও অনেক অনেক মুখ। তারা ক্ষিপ্ত। উত্তেজিত। মারমুখী। চেঁচিয়ে যেন বলছে, 'মহম্মদী তুমি নিমকহারাম! তোমার ক্ষমা নেই।'

দু'হাতে নিজের মুখ ঢেকে মহম্মদী ফের চেচিয়ে ওঠে, 'আস্তাগফেরুল্লাহ। খোদাতালা রহেম করুন আমাকে।'

এগিয়ে আসছে কয়েকজোড়া পায়ের শব্দ। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মহম্মদী। চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি।

মহম্মদীর মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় মিরন। সঙ্গে চুনিলাল ও মুন্নিলাল। মিরনের কাঁধে বসে আছে তার পোষা বাজপাখি। মহম্মদীকে দেখে সজোরে হেসে উঠে মিরন বলে, 'সাবাশ মহম্মদী। কাম হাসিল? তোমার এই কামালিয়তে খোদ নবাবজাদা আজ খুশি মানাবে।'

চুনিলাল ধুয়ো ধরে, 'বান্দা বহুত জলদি হুকুম তামিল করেছে হুজুর।'

মুন্নিলাল হেসে বলে, 'ইয়ে বান্দা কামিল-ই-ইনসান।'

মিরনের পায়ের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে মহম্মদী বেগ।

মিরন ভাবে মহম্মদীর এই কান্না কামেয়াবির খুশিতে। মহম্মদীর পিঠ চাপড়ে দিয়ে সে বলে, 'সাবাশ বান্দা। তুজুক তোমাকে ইয়াদ রাখবে।'

তাজা রক্তের গন্ধ পেয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে মিরনের পোষা বাজপাখি। গায়ে হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত করে মিরন।

'আস্তাগফেরুল্লাহ।' হঠাৎই মর্মন্তুদ আর্তনাদ করে ওঠে মহম্মদী। তারপর পাগলের মতো নিজের বুক চাপড়াতে থাকে।

উন্মাদের মতো মহম্মদী বেগের এই আচরণ দেখে অবাক হয় মিরন। চুনিলালের দিকে চেয়ে বলে, 'আরে দোস্ত হুয়া কেয়া? অ্যায়সা কিউ কর রাহা হ্যায়?'

চুনিলাল মুচকি হেসে বলে, 'লাগতা হ্যায়, হাজার আশরফির খোয়াবে দিমাগ বিগড়ে গেছে।'

'জরুর মিলবে ইনাম। হাজার আশরফি।' এই বলে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক গোলামের হাত থেকে চামড়ার খেরিয়া নিয়ে মহম্মদীর মুখের সামনে ঝাঁকায় মিরন। ঝনঝন শব্দে বাজে আশরফি।

মহম্মদী পাগলের মতো চিৎকার করে ওঠে, 'না-না-না। আশরফি চাই না।'

'নারাজ কেন? এ তো তোমার কামেয়াবির কিস্মত। হকের পাওনা।'

'মাফ করুন হজরত। আমি নিমকহারাম। দোজখেও ঠাঁই হবে না আমার। এই বদিয়তির মাফ নেই। আলিবর্দির নিমক খেয়ে আমি বড় হয়েছি। সেই আমি কি না সিরাজদ্দৌলাকে কোতল করলাম! আমি বেইমান। নিমকহারাম।'

মিরনের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে, মহম্মদীর চুলের মুঠি শক্ত করে চেপে ধরে বলে, 'কী বললি বেতমিজ?'

বুক চাপড়ে মহম্মদী বলে, 'হুজুর আমি নিমকহারাম। নিজের জন্য সুখ খরিদ করতে গিয়ে খুন করেছি সিরাজদ্দৌলাকে। বেইমানি করেছি আলিবর্দির খানদানের সঙ্গে। দোজখেও যে আমার ঠাঁই হবে না। আমার জন্য একটু দোয়া মাঙুন হুজুর।'

'বেতমিজ কাঁহিকা! আলিবর্দিকা কুত্তা!' এই বলে মহম্মদীকে প্রচণ্ড জোরে এক লাথি মারে মিরন। মহম্মদী মুখ থুবড়ে পড়ে। বয়ে যাওয়া রক্তস্রোতে মাখামাখি হয়ে যায়।

মুন্নিলাল বলে, 'হারামি বলে কিনা দোজখেও ঠাই হবে না। আসলে বলতে চায় আপনারও দোজখে ঠাঁই হবে না হুজুর।'

পা দিয়ে মহম্মদীর গলাটা চেপে ধরে মিরন। মহম্মদী হতচকিত হয়ে যায়। একদলা থুতু মহম্মদীর দিকে ছুড়ে দিয়ে বলে, 'ইবলিশের বাচ্চা! তোকে আজ দোজখেই পাঠাব।'

প্রাণভয়ে মহম্মদী বলে ওঠে, 'রহেম করুন হুজুর। রহেম করুন।'

আসুরিক শক্তিতে পা দিয়ে মহম্মদীর গলায় চাপ দিতে থাকে মিরন। দম বন্ধ হয়ে আসে মহম্মদীর। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। জিভ বেরিয়ে আসে। থরথর করে কেঁপে ওঠে তার দেহ। খানিকবাদে নিথর হয়ে যায় ।

মহম্মদীর নিষ্প্রাণ দেহটাকে প্রবল আক্রোশে লাথি মারতে মারতে হাঁপিয়ে পড়ে মিরন। হাঁপাতে হাঁপাতে কপালের ঘাম মুছে বলে, 'আলিবর্দি আর সিরাজের প্রতি হামদর্দি যে দেখাবে, তাকে এভাবেই জাহান্নমে পাঠাব চুনিলাল।'

চুনিলাল বলে, 'হুজুরের তাগদ দেখে তাজ্জব বনে গেলাম।'

মুন্নিলাল বলে, 'হাজার আশরফি বেঁচে গেল। বহুত ফূর্তি হবে।'

মিরন বলে, 'জরুর হবে। তবে এখন বহুত কাম বাকি। মহম্মদীর দেহটা বস্তায় মুড়ে হাভেলির বাইরে নিয়ে গিয়ে কুয়োয় ফেলে দেওয়ার আনজাম করো মুন্নিলাল। হারামির জেবের ভিতরে শরাবের বোতল ঢুকিয়ে দাও। আমলোগের একিন হবে, শরাব পিয়ে বেএক্তিয়ার মহম্মদীর মওত হয়েছে কুয়োয় পড়ে।'

মিরনের হুকুম তামিলে ব্যস্ত হয়ে পড়ে মুন্নিলাল।

চুনিলালকে সঙ্গে নিয়ে মিরন এগিয়ে যায় সামনে। পাথুরে মেঝের উপর বুকে খঞ্জরবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে সিরাজের নিথর দেহ। মিরন ও চুনিলাল কারাকক্ষের দরজায় এসে দাঁড়ায়।

ভুরু কুঁচকে বিরক্তির সঙ্গে মিরন বলে, 'বেতমিজ মহম্মদী কামচোর। বলেছিলাম মুণ্ডুটা ধড় থেকে আলগ করে দিতে। হুকুম তামিল করেনি।'

চুনিলাল বলে, 'হুজুরের হুকুম তামিল না হলে সাজা পেতেই হবে। ঠিকই হয়েছে। ইবলিশের বাচ্চা জাহান্নমে গেছে।'

'বাকি কাজ তোমাকে খতম করতে হবে চুনিলাল।'

'জি হুজুর। ইয়ে তো বান্দার খুশনসিবি।'

কোমরবন্ধনী থেকে ঝুলতে থাকা চামড়ার খাপের ভিতর থেকে শমশের বের করে কারাকক্ষের ভিতরে প্রবেশ করে চুনিলাল। কোমরে হাত দিয়ে আয়েশ করে দরজার মুখে দাঁড়ায় মিরন। দ্বিখণ্ডিত হবে সিরাজের দেহ। এদৃশ্য প্রত্যক্ষ করে সে সুখদরিয়ায় ডুব দিতে চায়।

মোরাদবাগ প্যালেসের নৌকাঘাটে ছয়কোণা একটা বিরাট চওড়া রানার উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মেজর কিলপ্যাট্রিক। রানার পাথরে বাঁধানো দেওয়াল উঠেছে জলের ভিতর থেকে। অনেক নীচে পাথুরে দেওয়ালের গায়ে ছলাৎ ছলাৎ করে ধাক্কা খাচ্ছে ভাগীরথীর ঘোলাটে জলরাশি।

সারি সারি নৌকোর ভিড় ঘাটে। উপর থেকে সেগুলোকে সব যেন মোচার খোলার মতো দেখাচ্ছে। মৃদুমন্দ দুলছে জলের ঢেউয়ে। কিলপ্যাট্রিকের কানে ভেসে আসছে কুলি-মজুরদের কোলাহল। গত দু'দিন ধরে এই নৌকোঘাটে চলছে তুমুল ব্যস্ততা। শ'দুয়েক নৌকোয় চাপানো হচ্ছে, আশরফি, সিক্কা টাকার খেরিয়া, সেই সঙ্গে হরেক কিসিমের মাহেঙ্গা চিজ। চুক্তি অনুযায়ী মিরজাফর খাঁ মিটিয়ে দিয়েছেন ইংরেজদের প্রাপ্য প্রথম কিস্তি। পলাশির কিস্মত। সেসব নৌকায় তোলা হচ্ছে। দিন কয়েকের মধ্যেই নৌকোগুলো পাড়ি দেবে কলকাতার উদ্দেশে।

এই মাল বোঝাইয়ের কাজ তদারক করতে সাত সকালে ঘাটের রানায় এসে দাঁড়িয়েছেন কিলপ্যাট্রিক। ভোরের আলো এসে পড়েছে তার মুখে। সে আলোর রং কাঁচা সোনার মতো। আকাশ আজ বেশ পরিষ্কার। ঘন নীল আকাশের বুকে গুমরাহী রাহগিরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে আষাঢ়ের ছেঁড়া ছেঁড়া ছাইরঙা মেঘ। ধারাবর্ষণের উমিদ তাতে নেই।

সকালের মিঠে আলো কিলপ্যাট্রিকের বেশ ভালো লাগছিল। তিনি ভাবছিলেন, আহা কী সুন্দর এই সুবে বাংলা। কত আলো, সবুজের কত সমারোহ। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে বাইরের দিকে তাকালেই দিল খুশ হয়ে যায়। তার নিজের দেশে তো বছরের অনেকটা সময় মুখ ভার করে থাকে আকাশ। সকালে চোখ মেলে বাইরের দিকে তাকালেই মন খারাপ হয়ে যায়।

বছর খানেক আগে মাদ্রাজ থেকে বাংলায় আসার কথা শুনে বিরক্ত লেগেছিল মেজর কিলপ্যাট্রিকের। মন চাইছিল না আসতে। তিনি শুনেছিলেন, বাংলা হল স্যাঁতসেঁতে বিচ্ছিরি এক জায়গা। সেখানকার এক জ্বর খুবই কুখ্যাত। মানুষের জীবন কেড়ে নেয়। কিন্তু একজন ফৌজির জীবনে নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে তো কিছু থাকে না, শুধু উপরওয়ালাদের হুকুম তামিল করতে হয়। তাই কিলপ্যাট্রিককেও আসতে হয়েছিল বাংলায়। আড়াইশো ফৌজিকে সঙ্গে নিয়ে মাদ্রাজ থেকে ফলতার উদ্বাস্তু শিবিরে এসে তিনি পৌঁছেছিলেন। সে ছিল ইংরেজদের কাছে ঘোর দুঃসময়।

তারপর কেটে গেল একটা বছর। বাংলায় ইংরেজরা এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। এখন তাদের সুখের সময়। বাংলায় আসার জন্য কিলপ্যাট্রিকের মনে এখন অবশ্য কোনও খেদ নেই। বরং বাংলায় না এলে অনেক পার্থিব সুখ থেকে তিনি বঞ্চিত হতেন। ভাগ্যিস এসেছিলেন—আজ এমনই মনে হচ্ছে মেজরসাহেবের।

ইংরেজ মেজর, ক্যাপটেনদের খুশি করতে শুধু তো তাদের পায়ে আশরফি, সিক্কা টাকা আর হরেক মাহেঙ্গা চিজ উজাড় করে দেননি মিরজাফর। দিয়েছেন বাড়তি আরও কিছু। রতিসুখের সন্ধান। সিরাজদ্দৌলার হারেম থেকে বাছাই করে খুব সুরত জেনানাদের তুলে দিয়েছেন ইংরেজ সাহেবদের হাতে। গতকাল সারারাত ভাগীরথীর বুকে বজরায় সিরাজেরই এক পিয়ারিকে নিয়ে ফূর্তি করেছেন কিলপ্যাট্রিক। অনেকদিন পর নারী শরীরের গন্ধে, স্পর্শে মাতাল হয়ে গিয়েছিলেন মেজরসাহেব।

রানার উপরে দাঁড়িয়ে কিলপ্যাট্রিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন দূরে। নদীর ওপারে গাছপালার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে জাফরাগঞ্জ প্যালেস। ওদিক থেকে ভেসে আসছে ঢাক, ঢোল, কাড়া-নাকাড়ার শব্দ। গ্রেফতার

হয়েছেন সিরাজদ্দৌলা। নিশ্চয়ই খুশি মানাচ্ছে জাফরাগঞ্জ।

হঠাৎ কিলপ্যাট্রিকের নজরে পড়ল, যাত্রী বোঝাই অনেকগুলো দিশি নৌকো এপারের বিভিন্ন জায়গা থেকে ছুটে যাচ্ছে নিজামত কেল্লার পাশের নৌকোঘাটের দিকে। এত লোক এই সাতসকালে চলেছে কোথায়? খটকা লাগে কিলপ্যাট্রিকের মনে। এমন দৃশ্য তো আগের কয়েকদিনে তাঁর চোখে পড়েনি। খুব দ্রুত দাঁড় বাইছে মাঝিরা। অগুনতি নৌকো। সবই যাত্রীতে বোঝাই। আজ নেটিভদের কোনও পরব আছে নাকি?

মোরাদবাগ প্যালেসের ঘাটের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে একটা বজরা। তার মাথায় উড়ছে কোম্পানির নিশান।

দূরবীনে চোখ রাখলেন মেজর সাহেব। দেখলেন, পাটাতনের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন ওয়ারেন হেস্টিংস ও লাশিংটন। দু'জনেরই মুখ থমথমে ও গম্ভীর।

ঘাটে এসে ভিড়ল বজরা। কাঠের পাটাতন বেয়ে দ্রুত নেমে এলেন হেস্টিংস ও লাশিংটন। দু'জনেই দেখতে পেয়েছেন কিলপ্যাট্রিককে। মেজর সাহেব হাত নাড়েন তাদের উদ্দেশে। খুবই দ্রুততার সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলেন ওয়ারেন হেস্টিংস ও লাশিংটন।

কিলপ্যাট্রিকের কপালে ভাঁজ পড়ল। ঘাটের রানা থেকে তিনি তড়িঘড়ি নেমে আসতে লাগলেন নীচের দিকে। কোনও একটা গোলমালের গন্ধ পাচ্ছেন অভিজ্ঞ মেজর সাহেব।

১৫

কয়েক ধাপ নেমে এসে একটা চাতালের উপরে থমকে দাঁড়ালেন মেজর কিলপ্যাট্রিক। কর্নেল ক্লাইভের ডেপুটি। দোর্দণ্ডপ্রতাপ এই সেনানায়কের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন হেস্টিংস ও লাশিংটন। খুব দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে আসার ধকলে দুজনেই হাঁপাচ্ছেন। এরা যে কোনও সুসংবাদ বহন করে আনেননি, তা আন্দাজ করতে পারছেন কিলপ্যাট্রিক। মেজরসাহেবের কপালের ভাঁজ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। প্রবল উৎকণ্ঠার সঙ্গে হেস্টিংসের উদ্দেশে শুধোলেন, 'হোয়াট হ্যাপেনড?'

ক্লাইভ ও কিলপ্যাট্রিক ফৌজের বড় একটা অংশ নিয়ে মোরাদবাগ প্যালেসে ঘাঁটি গাড়লেও, ক্লাইভের নির্দেশে মেজর আয়ারকুট রয়েছেন ভাগীরথীর ওপারে। আয়ারকুটের সঙ্গে রয়েছেন হেস্টিংস, লাশিংটন এবং শতখানেক গোরাপল্টন। এঁরা উঠেছেন নিজামত কেল্লার কাছেই বিলাসবহুল এক অতিথিনিবাসে।

পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজদের কী চোখে দেখছে মুর্শিদাবাদের আমআতরফ আদমি, তা নিয়ে কর্নেলের দুশ্চিন্তা এখনও দূর হয়নি। এপারে মোরাদবাগ প্যালেসে বসে নদীর ওপারে কী ঘটছে তা জানা সম্ভব নয়। তাই মেজর আয়ারকুটের উপর ক্লাইভের কড়া নির্দেশ—ওপারে কোনও গোলমালের আঁচ পেলে মোরাদবাগে যেন তুরন্ত খবর পাঠানো হয়। জাফরাগঞ্জের উপরে কড়া নজর রাখাই ক্লাইভের মূল উদ্দেশ্য। বেআক্কেলে, বেওকুফ, সঙ্গদিল মিরনকে তাঁর বিশ্বাস নেই। বেহুদা কোনও হুজ্জুতি পাকিয়ে ইংরেজদের না কোনও মুসিবতের মধ্যে ফেলে।

কিলপ্যাট্রিকের প্রশ্নের জবাবে হেস্টিংস বললেন, 'সিচুয়েশন ইজ ভেরি গ্রেভ স্যার।'

'হোয়াট? গ্রেভ মানে? হোয়াট হ্যাপেনড?'

'লাস্ট নাইট মিরন কিলড সিরাজদ্দৌলা।' কথা গুলো কেটে কেটে বললেন লাশিংটন।

ভয়ানক চমকে উঠে কিলপ্যাট্রিক বললেন, 'বলছ কী? মিরজাফর খাঁ ওয়াদা করেছিলেন হেসটিলি সিরাজদ্দৌলার বিষয়ে কোনও ডিসিশন নেবেন না। ইন স্পাইট অফ দ্যাট–' থমকে গেলেন কিলপ্যাট্রিক। চোয়াল শক্ত হল।

হেস্টিংস বললেন, 'মিরজাফর খাঁ এমন হুকুম করেছিলেন বলে আমার মনে হয় না। সবই ওই স্কাউনড্রেল মিরন ছোকরার ব্রেন চাইল্ড! ছোকরা আরও কী করেছে শুনলে আপনি আঁতকে উঠবেন। দ্যাট ভেনচার মে রুইন আওয়ার ফরচুন।'

'হোয়াট আর ইউ সেয়িং? হোয়াট এলস হ্যাজ হি ডান?' বিস্ফারিত হয়ে উঠল কিলপ্যাট্রিকের চোখদুটো। মেজর সাহেব ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে পড়লেন।

দূরে কালচে সবুজ গাছপালার ফাঁক দিয়ে দৃশ্যমান জাফরাগঞ্জ প্যালেসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হেস্টিংস বললেন, 'মিরন অ্যারেঞ্জড অ্যা গর্জিয়াস প্রসেশন উইথ দ্য হিউম্যান রিমেইনস অফ সিরাজদ্দৌলা।'

আঁতকে উঠে কিলপ্যাট্রিক বলে উঠলেন, 'ও মাই গড! হাউ ডেঞ্জারাস! দ্যাট উইল ইনফিউরিয়েট দ্য মব।'

লাশিংটন বললেন, 'রাইট স্যার। দ্য প্রসেশন ইজ নাউ পাসিং থ্রু দ্য সিটি।'

নদীর দিকে তাকিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস বললেন, 'সি দ্য বোটস স্যার। অল ওভারপ্যাকড। এপার থেকে আমআদমি ওপারে যাচ্ছে। টু পে হোমেজ টু দ্য নবাব।'

'স্টুপিড! রেকলেস ফেলো।' গর্জন করে উঠলেন কিলপ্যাট্রিক।

'বাজনার শব্দ শুনতে পাচ্ছেন স্যার?' হেস্টিংস শুধোলেন।

ঢাক, ঢোল, কাড়ানাকাড়া, দিগর, পণবের আওয়াজ নদীর ব্যবধান টপকে ওপার থেকে এপারে ভেসে আসছে।

'ইয়েস। ইয়েস। দ্যাট ইজ কানট্রি ব্যান্ড।'

'দ্য ব্যান্ড লিডস দ্য প্রসেশন।'

প্রবল বিরক্তির সঙ্গে বাঁ হাতের মুষ্ঠি দিয়ে ডান হাতের তালুতে ঘুষি মারলেন কিলপ্যাট্রিক।

হেস্টিংস বললেন, 'দ্য ইডিয়ট প্রিন্স মেড দ্য সিচুয়েশন ভেরি কমপ্লেক্স ফর আস। আমরা পলাশিতে ইনকিলাব ঘটিয়েছি। সাচ ডিসপ্লে অফ নবাবস করপস ইন দ্য ক্রাউড মে এনরেজ দেম এগেইনস্ট আস।'

লাশিংটন বললেন, 'ইন ফ্যাক্ট উই উইটনেসড মেনি অ্যাংরি ফেসেস অন দ্য রোড।'

হেস্টিংস যোগ করলেন, 'আউট অফ হেটরেড এরা যদি একটা করে পাথর আমাদের দিকে ছুড়ে মারতে শুরু করে তাহলে পালানোর পথ থাকবে না। উই উইল বি ইন অ্যা ডিপ স্যুপ।'

'কাম উইথ মি।' এই বলে হেস্টিংস ও লাশিংটনের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষা না করে কিলপ্যাট্রিক হনহন করে হাঁটতে শুরু করলেন মোরাদবাগ প্যালেসের সদর দেউড়ি অভিমুখে।

তাঁর পিছু নিলেন হেস্টিংস ও লাশিংটন।

জাফরির ফাঁক দিয়ে ঘরে এসে পড়া সকালের নরম আলো বাহারি ফুলে নকশা এঁকেছে মেঝেতে। বিলাসবহুল বিছানায় খানিক আগে ঘুম ভেঙেছে কর্নেল ক্লাইভের। তবে এখনও বিছানা ছেড়ে ওঠেননি। বেহেস্তের মতো সুন্দর মোরাদবাগ প্যালেসের বাগান থেকে ভেসে আসছে পাখির কলতান। এই শিরিন আওয়াজ বেশ ভালো লাগছে কর্নেলের।

জানলা থেকে ঝোলানো তনসুখ কাপড়ের পর্দা এলোমেলো ভাবে উড়ছে হাওয়ায়। ভাগীরথীর বুক ছুঁয়ে ছুটে আসা বাতাস এখনও বেশ শীতল। তবে বেলা বাড়লেই গরম বাড়বে। এদেশে জুন-জুলাই মাসে, বিশেষত, ভরা বর্ষার মরশুমে ভ্যাপসা ভিজে গরমটা খুবই অস্বস্তিকর। শরীর হাঁসফাঁস করে। ক্লাইভ ফলতায় এসে পৌঁছেছিলেন গত বছর ডিসেম্বরে। শীতের মরশুমে। কাজেই সুবে বাংলার সামারের সঙ্গে এবারেই তাঁর প্রথম মোলাকাত। বিশ্রি ভিজে গরম আর কালান্তক জ্বর—এই দুই উৎপাত বাদ দিলে ক্লাইভের চোখে সুবে

বাংলা বেশ খাসা জায়গা বলেই প্রতিভাত হয়েছে। এদেশের রং, রোশনি, জলুসে তিনি সম্মোহিত। কী যে জাদু আছে বাংলার মাটিতে কে জানে! মজেছিলেন জোব চার্নক। মজলেন ক্লাইভও।

পলাশিতে জিত হাসিলের কথা ক'দিন আগে লিখে পাঠিয়েছেন মাদ্রাজে। কর্নেল জানেন, এবার মাদ্রাজ থেকে তাগাদা আসবে– তুরন্ত ফিরে এসো।

কিন্তু কর্নেলের অভিপ্রায় অন্য। পলাশির যুদ্ধে জয়লাভ হয়েছে ঠিকই তবে এদেশের মাটিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আরও অনেক কাজ বাকি—এই কথা আগেভাগেই চিঠিতে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন মাদ্রাজের বড় কর্তাদের। বাংলা ছেড়ে এখনই যাতে মাদ্রাজে পাড়ি দিতে না-হয়, তার জন্য গৌরচন্দ্রিকা সেরে রেখেছেন। ক্লাইভের দু'চোখে ভাসছে বিরাট বড় এক স্বপ্ন। ভবিষ্যৎ তিনি দেখতে পাচ্ছেন। মামুলি এক চাকুরিজীবী হয়ে থাকতে চান না কর্নেল। তিনি ইতিহাস গড়বেন।

মাথার কাছে রুপোলি ডোরিতে টান দিলেন কর্নেল ক্লাইভ। রুপোর রেকাবির উপরে রাখা কফি ভর্তি সুদৃশ্য চিনেমাটির পট ও পেয়ালা নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল অর্ডারলি। রেকাবি রেখে দিয়ে বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে। বিছানায় কাত হয়ে কর্নেল নিজেই পট থেকে কাপে কফি ঢেলে নিলেন। তারপর চুমুক দিলেন আয়েশ করে।

কর্নেলের মেজাজ এখন বেশ শরিফ। নবাব মিরজাফরের কাছ থেকে প্রাপ্য টাকার প্রথম কিস্তি আদায় হয়েছে। নৌকো বোঝাই হচ্ছে আশরফি, মোহর ও হরকিসিমের বেহেতেরিন কিমতি চিজে। কম নয়, প্রায় শ'দুয়েক নৌকা। কোম্পানির প্রাপ্য বুঝে নিতে কয়েকজন দিশি কর্মচারীকে নিয়ে দু'দিন আগে কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদে এসে হাজির হয়েছে কোম্পানির দেওয়ান রামচাঁদ রায়।

অল্প কিছুদিন আগে কোম্পানির নোকরি নিয়ে হুগলিতে উকিলের পদে যোগ দিয়েছিলেন রামচাঁদ। উদ্যমী যুবক। পৈতৃক ভদ্রাসন আন্দুলে। ক্লাইভের সুনজরে এসে তাঁর পদোন্নতি হল। হুগলি কাছারির উকিল থেকে ফোর্ট উইলিয়ামের দেওয়ান। কর্নেলের জবানে কঠিন কাজ সহজে হাসিল করতে নব মুনশির মতোই রামচাঁদও তুখোড়। সাহেবদের অনেকে বলে কর্নেল ক্লাইভ চতুর্ভুজ। নিজের দুই হাত তো আছেই। বাকি দুই হাত হল নবকৃষ্ণ ও রামচাঁদ। সম্প্রতি এই দু'জনকে একটা গোপন কাজে লাগিয়েছেন ক্লাইভ। অ্যাডমিরাল ওয়াটসন ও ফৌজের অন্যান্য মেজর ক্যাপটেনরা এ বিষয়ে বিন্দুবিসর্গও জানেন না। কর্নেলের স্থির বিশ্বাস পারলে নবকৃষ্ণ ও রামচাঁদই পারবে কাজটা উদ্ধার করতে। সেক্ষেত্রে খুশনসিবির জলোয়ায় ফের একবার ঝলমল করে উঠবেন তিনি।

কফি শেষ করে বিছানা থেকে নেমে এলেন ক্লাইভ। খোলা জানলার পাশে এসে দাঁড়ালেন। চকমকি পাথর ঠুকে পাইপ ধরিয়ে বেশ তৃপ্তির সঙ্গে ধোঁয়া ছাড়লেন।

দোতলার জানলা দিয়ে দূরে দেখা যাচ্ছে নৌকোঘাট। ঘাটের কাছে জড়ো হয়ে আছে সারি সারি নৌকো। কুলি-মজুরে, লোকে-লস্করে ছয়লাপ নৌকোঘাট। মাল বোঝাই চলছে পুরোদমে। মাঝ নদীতে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে যুদ্ধজাহাজ কেন্ট। মোরাদবাগ প্যালেসে এসে ওঠেননি অ্যাডমিরাল ওয়াটসন। আপাতত কেন্ট জাহাজই তাঁর আস্তানা। তিনি কলকাতায় ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এ নিয়ে ওয়াটসনের সঙ্গে গতকাল ক্লাইভের একপ্রস্থ আলোচনা হয়েছে। ঠিক হয়েছে সামনে ও পিছনে যুদ্ধজাহাজের পাহারায় মূল্যবান সামগ্রীতে বোঝাই দু'শো নৌকোর কনভয় নিয়ে দিন দুয়েকের মধ্যেই কলকাতায় পাড়ি দেবেন অ্যাডমিরাল।

দৃশ্যটা ভাবতে ভালো লাগছে ক্লাইভের। গণিমতে বোঝাই শদুয়েক নৌকা। প্রত্যেকটার মাথায় মাথায় উড়ছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পতাকা। ভাগীরথীর জল কেটে ছুটে চলেছে কলকাতার দিকে। নৌকোগুলোর সামনে ও পিছনে পাহারাদার যুদ্ধজাহাজ। জাহাজের ডেকে ফৌজি ব্যান্ডে বাজছে রুল ব্রিটানিয়া। নদীর

দুপাড়ে দাঁড়িয়ে তামাম বাংলার প্রজারা বিস্মিত চোখে দেখছে ইংরেজদের কুদরতি। মুর্শিদাবাদের জলুস চালান হয়ে যাচ্ছে কলকাতায়।

নদীর ওপারে জাফরাগঞ্জ প্যালেসের কয়েকটা মিনার সবুজের আড়াল টপকে মাথা তুলে আছে। সেদিকে নজর পড়তেই ক্লাইভের মনে পড়ে গেল সিরাজের কথা। গতকাল সন্ধেবেলা মিরজাফরের পাঠানো চিরকুটে পলাতক নবাবের গ্রেফতারির খবরটা জেনে খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন কর্নেল।

ফরাসিদের সঙ্গে মোলাকাত হওয়ার আগেই ধরা পড়েছেন সিরাজদ্দৌলা। ল-এর নেতৃত্বে ফরাসিরা তেলিয়াগড়ি পৌঁছে গিয়েছিল। সিরাজদ্দৌলার কিসমত জানার পর তারা পিছু হটে পাটনার দিকে ফিরে চলেছে। সময়ের সামান্য হেরফের হলেই হয়তো ফরাসিদের হেফাজতে চলে যেতেন সিরাজদ্দৌলা। সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে উঠত। মোরাদবাগ প্যালেসের আরাম-আয়েস ছেড়ে আবার লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে হত। আকাশের দিকে মুখ তুলে ভাগ্যদেবীকে ফের একবার সুক্রিয়া জানালেন ক্লাইভ।

তবে জাঁ ল এখনও কর্নেলের মনের মধ্যে অশান্তির এক কাঁটা হয়ে বিঁধে আছে। ল ও তার বাহিনীকে গ্রেফতার করতে না পারলে ফরাসি শক্তিকে সুবে বাংলা থেকে পুরোপুরি উৎখাত করা যাবে না। হিন্দুস্তানের পরিস্থিতি ভালো নয়। তাগদ হারিয়ে ঢোঁড়া সাপে পরিণত হয়েছেন মোগল বাদশা। এই সুযোগে মাথা তুলছে প্রাদেশিক নবাব ও রাজা-রাজড়ারা। কর্মনাশা নদী পেরিয়ে ল যদি সুজাউদ্দৌলার রাজত্বে ঢুকে যান, তাহলে তাকে গ্রেফতার করা মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। সুজাউদ্দৌলা বেশ শক্তিশালী। তাঁর সঙ্গে আঁতাত করে ইংরেজদের বেকায়দায় ফেলতে ফরাসিরা হানা দিতে পারে বাংলায়।

এখনই ল-এর পিছনে ক্লাইভ ফৌজ পাঠাতে চান। এ জন্য নবাবের শীলমোহর প্রয়োজন। এই বিষয়টা নিয়ে একটা হেস্তনেস্ত করে তবে সিরাজকে নিয়ে ভাবতে চান কর্নেল। আপাতত তাঁর ইচ্ছে সিরাজকে রাজকীয় মর্যাদায় কোনও প্যালেসে গৃহবন্দি করে রাখা হোক।

'...দরবারের অনেকেই চাইছে তাঁকে হত্যা করতে। কী করা যায়? জনাব আপনার ইরাদা কী জানাবেন।...' মিরজাফরের কাছ থেকে জরুরি চিঠি পেয়ে কাল রাতেই উত্তর দিয়েছেন ক্লাইভ–

'...ধৈর্য ধরুন হুজুর। এখনই গুরুতর কিছু করে বসবেন না।...'

ওয়াশরুম থেকে হাতমুখ ধুয়ে বেরোতেই ঝড়ের গতিতে ক্লাইভের ঘরে ঢুকলেন কিলপ্যাট্রিক। তাঁর সঙ্গে ওয়ারেন হেস্টিংস ও লাশিংটন। কিলপ্যাট্রিক রাগে ফুঁসছেন। ক্লাইভের সামনে এসেই ক্ষোভ উগরে দিলেন তিনি। 'স্যার, দ্য ইডিয়টিক অ্যাকশন অফ মিরন মে পুট আস ইন পেরিল।'

কিলপ্যাট্রিক, লাশিংটন ও হেস্টিংসের সহসা এই নাটকীয় প্রবেশে ও কিলপ্যাট্রিকের প্রতিক্রিয়ায় চিন্তিত মুখে ক্লাইভ শুধোলেন, 'কী হয়েছে মেজর?'

'মিরন কিলড সিরাজদ্দৌলা লাস্ট নাইট। মি. হেস্টিংস অ্যান্ড মি. লাশিংটন ব্রট দিস নিউজ।'

কথাটা শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ক্লাইভ। মুখে জমাট বাঁধল রক্ত। ঝড়ের আভাস পেলেন হেস্টিংস ও লাশিংটন।

কিলপ্যাট্রিক ফের বললেন, 'দ্য স্টুপিড ফেলো অলসো অ্যারেঞ্জড অ্যা গরজিয়াস প্রসেশন উইথ দ্য হিউম্যান রিমেইন্স অফ সিরাজদ্দৌলা। থাউজ্যান্ডস অফ পিপল অ্যাসেম্বলড বিসাইড দ্য রোড টু পে হোমেজ। অল আর এজিটেটেড।'

কিলপ্যাট্রিকের কথার কোনও জবাব না দিয়ে গটমট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ক্লাইভ।

কিছুক্ষণ বাদেই ছোটখাটো একটা ঘোড়সওয়ার বাহিনী মোরাদবাগ প্যালেস থেকে হিরাঝিল প্রাসাদের দিকে তিরবেগে ছুটে চলল। সামনে পাঁচটি ঘোড়ার পিঠে ক্লাইভ, কিলপ্যাট্রিক, হেস্টিংস, লাশিংটন এবং নবকৃষ্ণ। তাদের পিছনে পথের লাল ধুলো উড়িয়ে ছুটছে জনাকুড়ি হাতিয়ারবন্ধ গোরা ঘোড়সওয়ার।

মুর্শিদাবাদের আকাশে-বাতাসে বিষাদের হাহাকার। সিরাজ নেই।

গতকাল রাতে জাফরাগঞ্জ প্রাসাদের কারাকক্ষে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়েছে সুবে বাংলার প্রাক্তন নবাব আলিবর্দির দৌহিত্রকে। তাঁর নশ্বর, নিষ্প্রাণ দেহটা নিয়ে শোভাযাত্রার আয়োজন করেছে নবাবজাদা মিরন ও তার ইয়ারদোস্তরা—একথা জানতে পেরে ঘর থেকে বেরিয়ে পথে নেমে আসছে শয় শয় মানুষ। দৃশ্যটা দেখে সকলে স্তম্ভিত। মৃত নবাবের দেহ নিয়ে এমন জমকালো শোভাযাত্রা হতে পারে?

সিরাজের দেহটা শায়িত আছে তারই প্রিয় হাতির পিঠে গাদেলায়। অসম্মানে, অবহেলায়। চটের বস্তাবন্দি দেহটাকে অযত্নে ফেলে রাখা হয়েছে। সিরাজের দেহের উপরে ফুল ছড়িয়ে দেয়নি কেউ, কাফনও বিছিয়ে দেয়নি। মৃতদেহ থেকে চুইয়ে পড়া রক্তে ভিজে উঠেছে বস্তাটা। কয়েক ফোঁটা রক্ত হাতির পিঠে পড়ে গড়িয়ে গিয়েছে। রক্তের দাগ স্পষ্ট হয়ে আছে হাতির মসৃণ চামড়ার উপরে। তাগদের নৃশংস, কুৎসিত, বীভৎস প্রদর্শনী।

শোভাযাত্রার একেবারে সামনে বাজনা বাজাতে বাজাতে চলেছে একদল বাজনদার। কাড়ানাকাড়া, ঢাক, ঢোল, দিগর, পণবের আওয়াজে ভয়ানক উন্মত্ততা। কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে শব্দ। শরাবের নেশায় মত্ত বাজনদারেরা নাচতে নাচতে চলেছে। থেকে থেকে লাফ দিয়ে উঠছে। ঢোলে চাটি মেরে শূন্যে পাক খাচ্ছে ঢোলবাদক। তাদের পিছনে কলের পুতুলের মতো হেঁটে চলেছে একদল সেপাই। হুকুমের দাস। তাদের হাতে ঝকঝক করছে উন্মুক্ত তরোয়াল।

এদের পিছনে সিরাজদ্দৌলার দেহটাকে বয়ে নিয়ে চলেছে হাতি। তার চোখদুটো বড় করুণ। মনিব যে আর ইহলোকে নেই তা নিশ্চয়ই সে টের পেয়েছে। মাহুতের নির্দেশ মেনে ধীর পায়ে হেঁটে চলেছে। হাতির দুপাশে ও পিছনেও রয়েছে সশস্ত্র সেপাই-পেয়াদা। এদের পিছনে অসভ্যের মতো দু'হাত তুলে লাফাচ্ছে একদল যুবক। এরা প্রবল হর্ষে আকাশের দিকে ছুড়ে দিচ্ছে মুঠো মুঠো রং-বেরঙের আবির। এদের মধ্যমণি চুনিলাল ও মুন্নিলাল। মিরনের দুই জঘন্য শাগরেদ। এই দুই শয়তান অশ্লীল ভঙ্গিতে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে ভাঁড়ের মতো নাচতে নাচতে চলেছে।

এই দলের পিছনে ঘোড়ার পিঠে চলেছে নবাব মিরজাফরের ভাগনে খাদিম হোসেন খাঁ। একেবারে পিছনে হাতির পিঠে চড়ে তামাশা দেখতে দেখতে এগোচ্ছেন মিরন। চুনিলাল ও মুন্নিলালের নাচ দেখে আমোদে হেসে খুন। মিরনকে ঘিরে রেখেছে বিরাট নিরাপত্তা বাহিনী।

পথঘাট সুনসান। রাস্তার দুপাশে জমাট ভিড়, পথের দুপাশের হাভেলিগুলোর ছাতে, অলিন্দে থিকথিক করছে মানুষজন। কুরসিবদল আমআদমি মেনে নিয়েছে। সিরাজদ্দৌলা অতীত, মিরজাফর বর্তমান একথাও মেনে নিতে কারও তকলিফ নেই। নবাবি রিয়াসতে এমন তো হয়ে থাকে। কিন্তু প্রাক্তন নবাবের মৃতদেহ নিয়ে এই কদর্য শোভাযাত্রা মেনে নিতে পারছে না প্রায় কেউই। অনেকেই ক্ষোভে ফুঁসছে। কেউ কেউ এই করুণ দৃশ্য দেখে ডুকরে কেঁদে উঠছে। বুক চাপড়ে হাহাকার করছে। কারও কারও মন চাইছে—এখনই এই শয়তানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সিরাজদ্দৌলার দেহটা ছিনিয়ে নেয়। মর্যাদার সঙ্গে দাফন করে আলিবর্দির দৌহিত্রকে। শুধু সেপাইদের হাতে ধরে রাখা উদ্যত তরবারির ভয়ে মনের ইচ্ছাকে দমিয়ে রেখেছে এরা। তবে ভিড়ের মধ্যে থেকে উড়ে আসছে মিরন ও মিরজাফরের উদ্দেশে কটুবাক্য ও

গালিগালাজ। 'মিরজাফর নিমকহারাম! নবাবজাদা মিরন নিমকহারাম!' মিরজাফরকে মসনদে বসানোর জন্য কেউ কেউ ইংরেজদেরও দুষছে।

নিজামত কেল্লার কাছেই অতিথিনিবাসে অলিন্দে দাঁড়িয়ে এই শোভাযাত্রা দেখছিলেন মেজর আয়ারকুট। মানুষের ক্ষোভের উত্তাপে তিনি ত্রস্ত। সিরাজের মুসিবতের জন্য ইংরেজদের দায়ী করে এই সমবেত জনতা সত্যিই যদি পথের পাশ থেকে একটা করে নুড়ি কুড়িয়ে ছুড়ে মারতে শুরু করে তাহলে মাত্র হাজার দুই সেনা দিয়ে তাদের থামানো যাবে না। মুর্শিদাবাদে বসেই মরতে হবে ইংরেজদের। পলাশির যুদ্ধ জয় বিফলে যাবে।

উত্তেজনায় অস্থির হয়ে পায়চারি করতে লাগলেন আয়ারকুট। কর্নেল ক্লাইভের কাছ থেকে কী নির্দেশ আসে তার অপেক্ষায় রয়েছেন তিনি। হেস্টিংস ও লাশিংটনের প্রত্যাগমনের জন্য উতলা হয়ে পড়েছেন। নিজের ফৌজকে প্রস্তুত করে রেখেছেন। থেকে থেকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন নদীর দিকে। চোখ রাখছেন দূরবিনে। না, কোম্পানির বজরাটা মেজর আয়ারকুটের চোখে পড়ছে না।

মিরজাফরকে দরবার ঘরে ঢুকতে দেখেই কোনও ভূমিকা ছাড়াই গর্জন করে উঠলেন ক্লাইভ। 'ডু ইউ নো হোয়াট মিরন ডিড?'

এই কথা চালাচালির মধ্যে দোভাষীর কাজে লেগে পড়লেন নবকৃষ্ণ।

নির্বোধের মতো ক্লাইভের দিকে চেয়ে রইলেন মিরজাফর। সত্যিই তিনি কিছু জানেন না। জানার অবকাশই বা তাঁর কোথায়? সিরাজকে মিরনের হাতে সঁপে দিয়ে হারেমে ফূর্তি করছিলেন তিনি। ক্লাইভের আগমন সংবাদ পেয়ে তড়িঘড়ি ছুটে এসেছেন দরবার ঘরে। মাথার চুল উসকোখুসকো। পিরানের সব কটা ফিতে বেঁধে ওঠার সময় পাননি। পায়জামার দড়িটাও ভালো করা বাঁধা হয়নি।

'কিছু জানেন না আপনি?' ক্লাইভের মুখচোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে। মুখে জমাট বেঁধেছে রক্ত। ক্লাইভ যে কেন এত ক্ষিপ্ত তার আন্দাজ পাচ্ছেন না মিরজাফর। কর্নেলের আগুনে মেজাজের সামনে পড়ে ভয়ে কাঁপছেন তিনি। দরদর করে ঘামছেন। কিলপ্যাট্রিক, লাশিংটন ও হেস্টিংসের মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর হাতড়াতে থাকেন নবাব—কেন হঠাৎ এমন রুষ্ট হয়ে উঠলেন কর্নেল? কী এমন ঘটল?

ক্লাইভ চড়া গলায় বললেন, 'লাস্ট নাইট মিরন কিলড সিরাজদ্দৌলা। ডু ইউ নো?'

এ কথা শুনে ভয়ানক চমকে উঠলেন মিরজাফর। ভাং-আফিমের নেশায় ও অনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়বিলাসে শিথিল হয়েছে স্নায়ু। হাত কাঁপছে মিরজাফরের। মৃদু গলায় বললেন, 'হুকুম দিয়েছিলাম, সিরাজকে কয়েদ করে রাখা হোক। তার উপরে কোনও জুলমাত যেন না হয়। বিচার পরে হবে।'

'কেমন নবাব আপনি? আপনার হুকুম তামিল হয় না?'

ক্লাইভের ধমক খেয়ে অপরাধীর মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন মিরজাফর।

ফের বিস্ফোরণ ঘটালেন ক্লাইভ। 'নবাবজাদা আরও কী করেছে জানেন? অ্যারেঞ্জড অ্যা প্রসেশন উইথ দ্য হিউম্যান রিমেইনস অফ সিরাজদ্দৌলা। খুশি মানাচ্ছে। হাজার হাজার লোক জমায়েত হয়েছে পথে। দে আর অ্যাংরি উইথ ইউ। অ্যাংরি উইথ আস। পলাশিতে ইনকিলাব ঘটিয়েছি আমরা। আপনাকে মসনদে বসিয়েছি। পিপল উইল ব্লেম আস ফর সিরাজ'স ডেথ। আগর ইতনা আদমি জুদাই-জহমতে বেচ্যায়েন হয়ে উঠলে তার জিম্মেদারি কে নেবে? কে সামাল দেবে তাদের তফরানি?'

মিরজাফর অনুনয় করেন, 'আপনি শান্ত হোন জনাব।'

'আপনারা বেইজ্জত করছেন কোম্পানিকে। এখনই পরোয়ানা লিখে দিন। প্লিজ ইস্যু অর্ডার টু স্টপ দ্য প্রসেশন।'

ব্যস্ত গলায় মিরজাফর বললেন, 'জরুর জনাব। এখনই লিখে দিচ্ছি।'

খাস মুনশিকে তলব করলেন মিরজাফর। কী লিখতে হবে তা বলে দিলেন ক্লাইভ। আদেশনামা দ্রুত মুসাবিদা করে ফেলল মুনশি। তাতে একবার চোখ বুলিয়ে দস্তখত করে দিলেন মিরজাফর। সেটা নবাবের হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিলেন লাশিংটন। তারপর তিনি ও হেস্টিংস দ্রুত নৌকোঘাটে এসে বজরায় চড়ে বসলেন।

১৬

ডুম-ডুম-ডুম-ডুম! ডুম-ডুম-ডুম-ডুম! ঢাক-ঢোল-কাড়ানাকাড়ার শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠছে মুর্শিদাবাদ। হাতের মুঠি শূন্যে ছুড়ে চুনিলাল ও মুন্নিলাল চেঁচিয়ে উঠল—

'দেখো দেখো নবাবজাদার কামালিয়ত কুদরতি।

সিরাজদ্দৌলার লাশ নিয়ে চলে নিজামতের হাতি।

নবাবজাদা মিরন কামিল ই ইনসান

জহান্নামে আলিবর্দির খানদান।'

পথের দু'পাশে শুধু সারি সারি কালো মাথা। গলি দিয়ে পিল পিল করে বেরিয়ে আসছে লোকজন। তারা দাঁড়িয়ে পড়ছে মূল সড়কের পাশে। এ পথ চলে গিয়েছে নিজামত কেল্লার দিকে। হাতির পিঠে বসে এই বিপুল জমায়েত দেখে দারুণ খুশিতে নবাবজাদা মিরন মনে মনে সাবাশি দিচ্ছেন নিজেকে– 'বেবাক আমআদমি দেখে যাও। মিরনের কেরামতি দুচোখ ভরে দেখো। মুর্শিদাবাদের কোনও নবাবের লাশ নিয়ে এমন জলুস কী দেখেছ কেউ কখনও? মনে রেখো, মিরন ভয়ানক, দানবের মতোই বীভৎস। শুধু দুশমনকে খতম করেই তার খুনজোশি শান্ত হয় না। সে চায় আরও বাড়তি কিছু।'

হঠাৎ পথের উপরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল হাতি। মাহুত বিব্রত। বহুত কোশিশ করেও নড়ানো যাচ্ছে না হাতিটিকে। অঙ্কুশের ঘনঘন আঘাতেও সে অটল।

হাতি থমকে যাওয়ায় শোভাযাত্রার তাল কাটল। মিরনের যে উচ্ছৃঙ্খল ইয়ারদোস্তরা নাচতে নাচতে এগোচ্ছিল, তাদেরও দাঁড়িয়ে পড়তে হল। বাজনদারেরা বাজনা থামিয়ে দিয়েছে। ফূর্তিতে ব্যাঘাত ঘটায় রে রে করে মাহুতের উপরে হামলে পড়ল চুনিলাল ও মুন্নিলাল। ঘোড়া দাবড়ে পিছন থেকে ছুটে এল খাদিম হোসেন খাঁ।

'এ উল্লুক! হুয়া কেয়া?' এই বলে মাহুতের উদ্দেশে চাবুক চালাল খাদিম হোসেন।

সপাং শব্দে কাঁটাওয়ালা চাবুক মাহুতের পিঠে আছড়ে পড়ল। যন্ত্রণায় কাতরে উঠল মাহুত। দাগ বসে গেল তার পিঠে। খুন ঝরল।

শুঁড় উঁচিয়ে ভয়ানক কর্কশ স্বরে ডেকে উঠল পাহাড়ের মতো হাতিটা। রাগ প্রকাশ করে মাথাটা ঝাঁকাতে লাগল। যেন খাদিম হোসেনের আচরণের প্রতিবাদ জানিয়ে বলতে চাইল—'মারছ কেন মাহুতকে? তার কসুর কী? আমার খায়েশ, তাই দাঁড়িয়ে পড়েছি। কেন যে দাঁড়িয়েছি, তা তোমরা বুঝবে না।'

হাতির আচরণ দেখে ভয় পেয়ে চিঁ-হি-হি-হি করে ডেকে উঠে খাদিম হোসেনের ইরানি ঘোড়া চকিতে সরে গেল কিছুটা দূরে। অশ্বের এলোমেলো পদবিক্ষেপে বেসামাল হয়ে গেল খাদিম হোসেন। সামনে ঝুঁকে কোনওরকমে সামলে নিল নিজেকে।

হাতির কাছাকাছি যে সৈন্যরা ছিল তারাও ভয়ে সরে গিয়েছে খানিকটা। বিস্ফারিত চোখে তারা দেখল হাতির পিঠে রাখা বস্তায় মোড়া সিরাজের মৃতদেহ থেকে পথের ধুলোয় ঝরে পড়ল কয়েক ফোঁটা রক্ত।

কেউ কেউ চেঁচিয়ে উঠল, 'খুন! খুন! খুন ঝরছে!'

এই রক্তক্ষরণ মনে করিয়ে দিল পুরোনো একটা ঘটনার কথা। সেই স্মৃতি এখনও অনেকের মনেই তরতাজা। খুব পুরোনো কিসসা তো নয়। মাত্র বছর দুয়েক আগের কথা। ওই যে দেখা যাচ্ছে হোসেনকুলি খাঁর হাভেলি। এই তো সেই জায়গা যেখানে একদা সিরাজের নির্দেশ একদল সেপাই হাভেলি থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করে হোসেনকুলিকে নৃশংস ভাবে খুন করেছিল।

'কী আশর্য! যেখানে পথের উপরে উপুড় হয়ে পড়েছিল হোসেনকুলির ছুরিবিদ্ধ রক্তাক্ত দেহটা, রক্তে ভেসে যাচ্ছিল রাজপথ ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে হাতি...' মানুষের এই সমবেত গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। হাতি কি তার মরহুম মনিবের হয়ে মাফি মাঙছে?

যে মাটি সিক্ত হয়েছিল হোসেনকুলির রক্তে সেই মাটি ফের ভিজল সিরাজের দেহ থেকে ঝরে পড়া ফোঁটা ফোঁটা রক্তে। মুর্শিদাবাদকে অলবিদা জানানোর প্রাক্কালে নিজের রক্ত ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে যেন সব গুনাহের কিম্মত চুকিয়ে দিয়ে গেলেন সিরাজদ্দৌলা। ফের সচল হল হাতি। শোভাযাত্রা এগোতে লাগল।

বাতাসে শুধু কান্না আর বিষাদের সুর। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন শরফ উন্নেসা– আলিবর্দির বেগম। সিরাজের নানি বেগম। দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে সামনের দিকে পা দুটো ছড়িয়ে বসে আছেন। উদাস দৃষ্টি কড়িকাঠ থেকে ঝুলে থাকা ঝাড়বাতিটার উপর নিবদ্ধ। নানি বেগম যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। মৃতের মতো নিশ্চুপ। অভিব্যক্তিহীন।

সিরাজের গ্রেফতারির খবরটা গতকালই পেয়েছিলেন। তখনও আশা ছিল মনে। বন্দি করলেও সিরাজকে হয়তো বাঁচিয়ে রাখবেন মিরজাফর খাঁ। যদি মৃত্যুদণ্ডাদেশ হয় তবে কর্নেল ক্লাইভের পা জড়িয়ে ধরে তিনি সিরাজের জীবন ভিক্ষা চাইবেন নানি বেগম। এমনই ছিল ইরাদা। কিন্তু আজ সকালে ঘুম থেকে উঠতেই খাস গোলাম-বাঁদিদের মুখে শুনলেন সেই মর্মান্তিক সংবাদ—সিরাজ নেই। গত রাতে জাফরাগঞ্জ প্রাসাদে তাঁকে কোতল করা হয়েছে। বেহেস্তবাসী হয়েও নিষ্কৃতি পায়নি সিরাজ। সিরাজের খণ্ডিত দেহ নিয়ে শোভাযাত্রা বেরিয়েছে রাজপথে। উল্লাসে মেতেছে মিরন ও তাঁর ইয়ারদোস্তরা। এসব শুনে থরথর করে কেঁপে উঠে মূর্ছা গিয়েছিলেন শরফ উন্নেসা। দুই বাঁদি জাপটে ধরে না ফেললে আছড়ে পড়তেন মাটিতে।

জ্ঞান ফেরার পর থেকে শরফ উন্নেসা একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছেন। ঘোলাটে দৃষ্টিতে কেবল চেয়ে রয়েছেন আসমানের দিকে। প্রভুপুত্র সরফরাজ খাঁকে হত্যা করে মসনদে বসেছিলেন আলিবর্দি। পুত্রশোকে কাতর জেনেতুন্নেসার করুণ আর্তনাদ এখনও কানে বাজে শরফ উন্নেসার। এই বেইমানি, গুনাহের কিম্মত আলিবর্দির হয়ে তাকেই মিটিয়ে যেতে হবে। এন্তেকাল হওয়ায় রেহাই পেয়েছেন আলিবর্দি। কিন্তু তাঁর মুক্তি নেই। জিঞ্জির, জহমত, আর এই জিগরপস্তানি সবই মুখ বুজে সহ্য করতে হবে তাঁকে। দু'চোখে একফোঁটাও জল নেই। বোবা কান্না আটকে আছে নানিবেগমের গলার কাছে।

নবাব মিরজাফরের প্রতি বাড়াবাড়ি রকমের আনুগত্য দেখাতে নিজামত কেল্লার দারোগা আলিবর্দির বেগম ও বেটিদের একটা ঘুপচি অপরিসর ঘরে জানোয়ারের মতো কয়েদ করে রেখেছিল। কিন্তু ক্লাইভের পরামর্শে দেওয়ান রায়দুর্লভ জিন্দানখানার অন্দরের দুঃসহ জীবনযাপন থেকে তাঁদের অব্যাহতি দিয়েছেন। নিজামত কেল্লারই এক প্রান্তে প্রশস্ত এক মহলে আপাতত তারা নজরবন্দি। জীবনের স্বাভাবিক আরাম-আয়েস থেকে আলিবর্দির রিশতেদারদের বঞ্চিত করেননি রায়দুর্লভ। আলিবর্দি খাঁর কৃপাতেই তো মুর্শিদাবাদের দরবার রাজনীতির অলিন্দে রায়দুর্লভের উত্থান। পুরোনো মনিবের খানদানের প্রতি অতটা নির্দয় হতে পারেননি নিজামতের নতুন দেওয়ান সাহেব। আলিবর্দির বেগম ও দুই বেটির জন্য বরাদ্দ হয়েছে তিনটি পৃথক কক্ষ। খিদমত খাটার জন্য নিযুক্ত হয়েছে গোলাম-বাঁদিরাও। যদিও এই ব্যবস্থার কথা শুনে মোটেই খুশি নন মিরন। শিকায়ত জানিয়েছেন নবাব মিরজাফরের কাছে। এ প্রসঙ্গে নবাব অবশ্য নিশ্চুপ।

শরাবের নেশায় বেহুঁশ আমিনা বেগম নিজের কক্ষে গালিচার উপরে লুটিয়ে পড়ে আছেন। এই গরদিশ, খেজালত, দিগদারি ভুলতে শরাবকেই অব্যর্থ ইলাজ হিসেবে আঁকড়ে ধরেছেন সিরাজ-জননী। সকালে যখন চোখ মেললেন, তখন অনেকটা বেলা হয়ে গিয়েছে। জাফরির ফাঁক দিয়ে চড়া আলো এসে পড়েছে তাঁর মুখের উপরে। আলোর ঝলকানিতে আমিনা বেগমের চোখ কুঁচকে যায়। ভার হয়ে আছে মাথা। গোটা শরীর জুড়ে গভীর অবসাদ। জাফরাগঞ্জের কয়েদখানায় মামুলি এক কয়েদির মতো বন্দি হয়ে আছে তাঁর আদরের পুত্র, এ কথা মনে পড়তেই আমিনা বেগম চিৎকার করে কেঁদে ওঠেন।

খাস বাঁদি কোয়েল ছুটে আসে।

'বেগম সাহেবা।'

কোয়েলের গলা শুনে কান্না থামিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকান আমিনা বেগম। আঁসু মুছে ব্যস্ত গলায় বলেন, 'সিরাজের কোনও খবর জানিস কোয়েল?'

কোয়েল নিশ্চুপ।

'চুপ করে আছিস কেন?'

'চিলুমচিতে পানি নিয়ে আসি। হাতমুখ ধুয়ে নিন। অনেক বেলা হয়ে গেছে। এখনও যে নাস্তা সারা হয়নি আপনার।'

আমিনা বেগম শুধোলেন, 'কাল রাতে ওরা আমার মির্জাকে খেতে দিয়েছে কিছু? জানিস? কোমরে দড়ি বেঁধে কতটা পথ হাঁটিয়ে এনেছে মির্জাকে। বল তো কত কষ্ট হয়েছে ওর! একবার যদি দেখা করতে পারতাম মির্জার সঙ্গে? চিরকুটটা পাঠিয়েছিলি দেওয়ান সাহেবের কাছে?'

'আপনার গুজারেশ নামঞ্জুর হয়েছে।' কোয়েল জবাব দেয়।

'কেন ওরা আমাকে মির্জার সঙ্গে একবার দেখা করতে দেবে না?' আমিনা বেগম চিৎকার করে ওঠেন।

জল ছলছলে চোখে বেগম সাহেবার দিকে অসহায় ভাবে চেয়ে থাকে কোয়েল।

'তুই জানিস না কিছু? কেমন আছে আমার মির্জা?' ব্যাকুল হয়ে পড়েন আমিনা বেগম।

কোয়েল আনত চোখে চেয়ে থাকে মেঝের দিকে।

'বোবা হয়ে গেলি যে? কাল যে একমুঠো আশরফি দিলাম, কী করলি? জাফরাগঞ্জ থেকে খবর আনতে পারিসনি? সেপাই পেয়াদাদের সওগাত দিলেই তো কাজ হাসিল হয়ে যায়। কিছুই কি পারিস না তুই?'

'এনে দেব খবর। হাতমুখ ধুয়ে নিন। চিলুমচি নিয়ে আসি।' এই বলে কোয়েল চলে যায়।

সহসা বাইরে থেকে তুমুল শোরগোলের আওয়াজ ভেসে আসে। ঢাক-ঢোল-দিগর-পণবের শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা নিজামত কেল্লা। কীসের আওয়াজ? এত হইচই কেন? উঠে দাঁড়িয়ে জানলার কাছে ছুটে যান আমিনা বেগম।

জাফরির ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে রাজপথ। বিশাল জমায়েত পথের দুপাশে। পথ দিয়ে চলেছে এক শোভাযাত্রা। মাঝখানে একটা হাতিকে ঘিরে রেখেছে সেপাই-পেয়াদারা। আমিনা বেগম চিনতে পারেন হাতিটিকে। স্তম্ভিত হয়ে যান বেগম সাহেবা। এ তো সিরাজেরই হাতি। হাতির পিঠে গাদেলায় একটা বস্তা। খুনের রঙের ছোপ ছোপ দাগ বস্তার গায়ে। কী আছে ওতে? একদল উচ্ছৃঙ্খল যুবক উন্মত্তের মতো লাফাচ্ছে আর মুঠো মুঠো গুলাল উড়িয়ে দিচ্ছে হাওয়ায়। কেন? কোন খুশিতে?

সহসা নীচ থেকে ভেসে আসে উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের সমবেত হর্ষধ্বনি।

'দেখো দেখো নবাবজাদার কামালিয়ত কুদরতি।
সিরাজদ্দৌলার লাশ নিয়ে চলে বেহেদর হাতি।
তামাম দুনিয়ার আশরত

সিরাজদ্দৌলার মওত।’

নিমেষে বুঝে গেলেন আমিনা বেগম, কেন এই শোভাযাত্রা। ‘মি-র-র-র-জা!’ তীব্র আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি। তারপরেই পাগলিনীর মতো কক্ষ থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন। জলভর্তি চিলুমচি হাতে তার কক্ষের দিকে আসছিল কোয়েল। ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে সে। পাথরের মেঝের উপর দিয়ে গড়িয়ে গেল রুপোর চিলুমচি। অলিন্দ দিয়ে পাগলিনীর মতো ছুটে চলেছেন আমিনা বেগম। হুলুস্থুল পড়ে গেল নিজামত কেল্লায়। সিরাজ-জননী ঝড়ের গতিতে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে আসেন। পরনে ঘাগরা ও চোলি। মাথার চুল অবিন্যস্ত। গলায় উড়নি নেই। পায়ে নেই পয়জার। চোখের নিমেষে সদর দেউড়ি পার হয়ে পথে নেমে ছুটতে লাগলেন আমিনা বেগম।

‘মি-র-র-র-জা! মি-র-র-র-জা! মি-র-র-র-জা!’

এই মর্মন্তুদ আর্তনাদ শুনে সচকিত হয়ে উঠল পথে জমায়েত লোকজন। অগণিত মানুষের ব্যূহ ভেদ করে সড়কের উপরে এসে দাঁড়ালেন সিরাজদ্দৌলার আম্মিজান।

শোভাযাত্রায় সামিল সেপাই-পেয়াদারা ভেবেছিল কোনও মিশকিন আওরাত বোধ হয় খয়রাতির আশায় আচমকা পথের উপরে ছুটে এসেছে। কোড়া হাঁকাতে গিয়ে থমকে গেল পেয়াদা। বিসমিল্লা। ইনি যে আলিবর্দির বেটি। সিরাজদ্দৌলার জননী। আমিনা বেগমকে দেখে পথের উপরে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল হাতি। পাগলিনীর মতো রক্তে ভেজা বস্তাটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন পুত্রহারা মা। ভেঙে পড়লেন হাহাকারের কান্নায়।

পুত্রশোকে কাতর মায়ের এই করুণ কান্না শুনে কারও চোখের জল বাধ মানল না। সেপাই-পেয়াদারা মাথা ঝুঁকিয়ে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। জল তাদের চোখেও।

বস্তার ভিতরে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন সিরাজের মাথাটা দেখে তীব্র আর্তনাদ করে উঠলেন আমিনা বেগম। ছেলের মাথাটা বুকের মধ্যে চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়লেন ধুলোয়। ছেলের রক্ত ভেজা চুলে, দুই গালে, চোখের পাতায় বারবার চুমো খেতে লাগলেন মা। তারপর সংজ্ঞা হারিয়ে নিস্তেজ হয়ে পথের ধুলোতেই পড়ে রইলেন।

ভিড়ে দাঁড়িয়ে থাকা আলিবর্দির অনুগত অনেক সেপাই পেয়াদা ওমরাহ চঞ্চল হয়ে উঠল। নবাব আলিবর্দি খাঁর খানদানের একী ঘোর বেইজ্জতি! আলিবর্দির ছোটি বেটি জনসমক্ষে এভাবে ধুলোয় পড়ে আছেন? রোষে ফুঁসে উঠল জনগণ। তাদের মারমুখী মেজাজ সামাল দিতে গিয়ে মিরনের সেপাই-পেয়াদাদের হিমসিম অবস্থা। সহসা ঘোড়া দাবড়ে সামনে এগিয়ে এলেন খাদিম হোসেন খাঁ। লাফ দিয়ে নামলেন ঘোড়া থেকে। তারপর আমিনা বেগমের চুলের মুঠি ধরে তাঁকে টেনে হিচড়ে নিয়ে গেল নিজামত কেল্লার অন্দরে।

এই বর্বর আচরণের প্রতিবাদে উত্তেজিত জনতা শোভাযাত্রার পথ আটকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের সঙ্গে মিরন ও তার বাহিনীর খণ্ডযুদ্ধ বেধে যাওয়ার উপক্রম। এমন সময় শোনা গেল ঘোড়ার খুরের টগবগ শব্দ। ধুলো উড়িয়ে ছুটে আসছে একদল ঘোড়সওয়ার। একেবারে সামনের দুই ঘোড়সওয়ারের হাতে ধরা রয়েছে কোম্পানির নিশান। পতপত করে উড়ছে হাওয়ায়।

আওয়াজ উঠল, ‘কোম্পানির ফৌজ! কোম্পানির ফৌজ!’

রাশ টেনে মিরনের হাতির পাশে ঘোড়া দাঁড় করালেন ক্যাপটেন আয়ারকুট। তাঁর দুপাশে হেস্টিংস ও লাশিংটন।

আয়ারকুট গর্জন করে উঠলেন, ‘স্টপ দিস প্রসেশন ইমিডিয়েটলি।’

হাতির পিঠ থেকে নেমে এল মিরন। নিজামতের সেপাই-পেয়াদারা বেয়নেটধারী গোরা পল্টনদের দেখে ভয়ে কাঁপছে।

আয়ারকুটের উদ্দেশে মিরন হাসিমুখেই বলল, 'মালুম হচ্ছে জনাব খুব পরেশানির মধ্যে রয়েছেন?'

'প্রসেশন বন্ধ করুন।' মেজর আয়ারকুট ভয়ানক উত্তেজিত।

মিরন মুচকি হেসে বলে, 'নবাবজাদার কসুর হয়েছে বলতে চান?'

আয়ারকুট চেচিয়ে উঠলেন, 'আপনি কি উন্মাদ হয়ে গেছেন? কী করছেন এসব?'

'মওত হয়েছে দুশমনের। একটু ফূর্তি হবে না?'

মিরজাফরের দস্তখত করা চিরকুটটা মিরনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বিরক্তির সঙ্গে হেস্টিংস বললেন, 'বন্ধ করুন এই ক্রুয়েলটি। নবাবের হুকুমত।'

কপালে ভাঁজ পড়ল মিরনের। চিরকুটের লেখাটা পড়ে তার চোয়াল শক্ত হল। এই আমোদ বন্ধ করতে বলা যে ইংরেজদেরই কারসাজি সেটা বুঝতে পারল মিরন। রাগে গা জ্বলে গেল তার। প্রতিমুহূর্তে চোখ রাঙাচ্ছে ইংরেজরা। দূর থেকে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন কর্নেল ক্লাইভ। তাঁর ভয়ে তটস্থ হয়ে আছেন নবাব মিরজাফর খাঁ। আব্বাহুজুরের উপরেও ভয়ানক রাগ হল মিরনের। ইংরেজরা যা বলছে তাই তিনি মেনে নিচ্ছেন। মাঝের থেকে ইয়ারদোস্তদের কাছে বার বার বেইজ্জত হতে হচ্ছে তাকে। সুবে বাংলার নবাব চলবেন নিজের খুশখেয়ালে। তিনি ইংরেজ বণিকদের মর্জির গোলাম হবেন কেন? ক্লাইভই যদি সর্বেসর্বা হন, তবে নবাব সেজে মসনদে বসে থেকে লাভ কী?

ওয়ারেন হেস্টিংস বললেন, 'সিরাজের দেহটা দাফন করার আনজাম করুন।'

আয়ারকুট বললেন, 'আস্ক ইওর পারসনস টু ডিসপার্স।'

ফারসিতে কথাটার অর্থ বুঝিয়ে দিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস।

ভয়ংকর হিংস্র হয়ে উঠল মিরনের চোখদুটো। আয়ারকুটের মুখের উপর দৃষ্টি স্থির রেখে সে বলল, 'জরুর। লেকিন সিরাজের দেহ দাফন করার দায় আমার নয়। আপনারা তার আনজাম করুন। আমি নবাবের হুকুম তামিল করছি। বন্ধ্ করছি এই জানেজা।'

পিঠের উপরে মনিবের লাশ নিয়ে এখনও মাটিতে বসে আছে সিরাজের হাতি। মিরনের নির্দেশে চুনিলাল ও মুন্নিলাল বস্তার ভিতর থেকে সিরাজের দেহের খণ্ড খণ্ড অংশগুলো তীব্র ঘৃণায় ছুড়ে ছুড়ে ফেলতে লাগল পথে। বীভৎস, নারকীয় দৃশ্য। শিউরে উঠল জমায়েত হওয়া লোকজন। আয়ারকুট, হেস্টিংস ও লাশিংটন স্তম্ভিত।

জলুস ভেঙে দিয়ে উচ্ছৃঙ্খল ইয়ারদোস্তদের নিয়ে ফিরে চলল মিরন। রাস্তার পাশে ভিড় করে থাকা আমআদমি ঘটনার অভিঘাতে বাক্যহারা। পথের উপরে পড়ে রয়েছে সিরাজের মাথা ও দেহের বিভিন্ন অংশ। সকলের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে একটাই প্রশ্ন—এ দোজখ, না মুর্শিদাবাদের রাজপথ?

সহসা ভিড়ের মধ্যে থেকে এগিয়ে এল জনৈক এক ব্যক্তি। খোশবাগে আলিবর্দির সমাধির দেখভাল করে সে। অনেক যত্ন করে গুলাব ফোটায় খোশবাগের বাগিচায়। হররোজ কবরের উপরে ছড়িয়ে দেয় লাল গুলাবের পাপড়ি। সন্ধেবেলা চিরাগ জ্বেলে দেয়। ধূপ জ্বালায়।

সিরাজের দেহখণ্ডগুলো মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে সে জড়ো করল এক জায়গায়। হঠাৎই কয়েকজন মানুষ এনে হাজির করল মেহগিনি কাঠের তৈরি একটি পালঙ্ক। সিরাজের দেহখণ্ডগুলোকে তার উপরে সাজিয়ে দিল লোকটি। ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ একজন এগিয়ে দিল তরন্দাম মসলিনের একখানা শাদা কাপড়। লোকটি সেই কাপড় দিয়ে সিরাজের দেহকে আচ্ছাদিত করল। এবারে একে একে এগিয়ে এল জমায়েত মানুষজন। তারা আচ্ছাদনের উপরে ঢেলে দিল গুলাব জল ও দামি আতর। সুগন্ধে ম ম করে উঠল চারিদিক। তারপর রাশি রাশি গুলাব ফুলে, বেল, জুঁই-এর মালায় ঢাকা পড়ল সিরাজের দেহ। মেহগিনি কাঠের পালঙ্কটা আমজনতাই ধরাধরি করে চাপিয়ে দিল হাতির পিঠে।

অপরিণত কিশোর সিরাজের খুশখেয়াল একসময় যাদের সিদ্দতের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যারা চেয়েছিল সিরাজদ্দৌলার বরবাদি তারাও আজ চোখের জল ফেলল সিরাজের করুণ পরিণতি দেখে। মিরনের নৃশংসতা, হৃদয়হীন, বর্বর আচরণ সিরাজের সব কলঙ্ক, অপযশ এক লহমায় মুছে দিয়ে মানুষের হৃদয়ের মসনদে তাঁকে চিরস্থায়ী করে দিল। ক্লাইভ ভেবেছিলেন, সিরাজদ্দৌলাকে খলনায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে নিজের পাপের দায় ঝেড়ে ফেলবেন। কিন্তু সিরাজের প্রতি সহানুভূতির খরস্রোতে তাঁর এই কৌশল ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল।

সিরাজের দেহখণ্ডগুলোকে যে মানুষটি পথ থেকে তুলে নিয়ে যত্ন করে সাজিয়ে দিল পালঙ্কের উপরে, সেই লোকটিকে অবাক চোখে এতক্ষণ দেখছিলেন মেজর আয়ারকুট। এবারে হাতের ইশারায় তাকে ডাকলেন।

এগিয়ে এসে মেজর সাহেবকে তসলিম জানাল লোকটি।

'কী নাম তোমার?'

'জয়নাল আবেদিন। খোশবাগে নবাব আলিবর্দি খাঁর সমাধির দেখভাল করি। একসময়ে নবাব আলিবর্দি খাঁর গোলাম ছিলাম। এখনও তাঁর গোলামি করি।'

ওয়ারেন হেস্টিংস শুধোলেন, 'কোথায় দাফন করবে সিরাজের দেহ?'

'খোশবাগে হুজুর। তাঁর খানদানের সকলের সমাধির জন্য ওই জায়গাটি বাছাই করে গিয়েছেন স্বয়ং আলিবর্দি খাঁ।'

খানিকবাদে সিরাজের দেহ নিয়ে মানুষের শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল নিজামত কেল্লার নৌকোঘাটের দিকে। হাতির পিঠে গাদেলায় ফুলে ফুলে ঢাকা সিরাজের দেহ। হাতির সামনে ও পিছনে চুপচাপ হেঁটে চলেছে অগণিত মানুষজন। এদের পিছনে ঘোড়ার পিঠে চেপে ধীর গতিতে এগিয়ে চললেন আয়ারকুট, হেস্টিংস ও লাশিংটন। একেবারে পিছনে গোরা পল্টনেরা।

বজরায় চাপিয়ে নদীর ওপারে খোশবাগে নিয়ে যাওয়া হল সিরাজের দেহ। সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। সন্ধের মুখে সিরাজকে সমাহিত করা হল আলিবর্দির সমাধির ঠিক পাশে। অবশেষে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোনোর অবকাশ পেলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা।

১৭

পাথরের দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে বসেছিল লুৎফুন্নেসা। দৃষ্টি উপরের দিকে। অনেক উঁচুতে ছোট একটা জানলা দিয়ে ঢুকে আসা এক চিলতে আলো মলিন মুখখানার একপাশে এসে পড়েছে। চেহেল সেতুনের অন্দরের প্রায়ান্ধকার এই কারাকক্ষের সঙ্গে বাইরের দুনিয়ার একমাত্র সংযোগ চতুষ্কোণ ওই ক্ষুদ্র জানলাটাই। ও পথ দিয়েই এই অন্ধকূপে শ্বাস-প্রশ্বাসটুকু সচল রাখার জন্য বিশুদ্ধ বাতাসের অনুপ্রবেশ ঘটে। দিনের বেলা সামান্য আলো ঘরে এসে পড়ে। নজরে আসে একচিলতে খোলা আকাশ। রাত নামলে অন্তহীন অন্ধকার।

রাজমহল থেকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসার পর এই কক্ষে বন্দি করে রাখা হয়েছে লুৎফুন্নেসাকে। কোথায় আছে উম্মেসায়েরা? কোথায় আছে সিরাজ? লুৎফা জানে না। গ্রেফতারির পরপরই তারা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন।

সিরাজের সঙ্গে রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় লুৎফা সঙ্গে নিয়েছিল অনেক গয়না, হিরে, জহরত। শরীরের গোপন স্থানে পোশাকের অভ্যন্তরে পুটুলিবদ্ধ অবস্থায় যতটা নেওয়া যায়। সেসব হাত করেছে

মিরকাশিমের অনুচরেরা। দেহতল্লাশির নামে সেপাই-পেয়াদারা তার শরীরটাকে অপবিত্র করতে পারে, একথা ভেবে লুৎফা নিজেই বের করে দিয়েছিল সব কিছু।

আর যাই হোক, মিরকাশিম লুৎফার সম্ভ্রম নষ্ট করেননি। পর্দা ঢাকা ডুলিতে চাপিয়ে লুৎফাকে নিয়ে আসা হয় মুর্শিদাবাদে। তারপর থেকে সে এই কারাগারে বন্দি। বাইরের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন।

অনেক উঁচুতে ক্ষুদ্র জানালাটার দিকে চেয়ে লুৎফুন্নেসা ভাবছিল তার ক্ষুদ্র জীবনটার কথা। কী বিচিত্র সেই জীবনের গতি। অতীত তার অন্ধকারে মোড়া। কে তার বাপ, কে তার মা লুৎফা জানে না। বাপ-মার স্নেহ-ভালোবাসার সঙ্গে লুৎফার কোনও জান-পহেচান নেই। জ্ঞান হতে সে দেখে আসছে নবাব আলিবর্দির খানদানে সে একজন আশ্রিতা। আলিবর্দির আদরের দৌহিত্র সিরাজের জারিয়া। কী ভাবে তাঁর ঠাঁই হয়েছিল নবাব-পরিবারে, লুৎফা জানে না। জানার কোশিশও করেনি। কী লাভ নিজের অন্ধকার অতীতটাকে খুড়ে বের করে!

কৈশোরে পৌঁছে লুৎফা পেল সিরাজের একনিষ্ঠ ভালোবাসা। শরিয়তি মতে সিরাজের সঙ্গে তার শাদি হল না ঠিকই, তবে সে অর্জন করল নবাব বেগমের মর্যাদা। বাঁদি থেকে বেগম।

দিব্যি চলছিল সব। হঠাৎই যেন ছুটে এল, সর্বনাশা এক আঁধি। ওলটপালট হয়ে গেল সব কিছু। লুৎফার জীবনের হর খুশি, হর রং এক লহমায় মুছে দিলেন দুনিয়াদার। পলাশির প্রান্তরে সিরাজের মুসিবতে লুৎফার সুখের দুনিয়াটা ভরে গেল জহমতে-দুঃখে।

দৌলত-তাগদ-জলুস—এসব হারিয়ে লুৎফার অবশ্য কোনও খেদ নেই। এসব তো সে কিছুই চায়নি জীবনে। শুধু নিবিড় ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখতে চেয়েছিল সিরাজকে। সিরাজ সুখে থাক, খুশি থাক, তাগদে-জোশে-জশমে-আশরতে ভরপুর হয়ে উঠুক তাঁর জীবনটা—এই ছিল লুৎফার আরমান। কিন্তু এ কী হল? দুনিয়াদার তার প্রতি এত নির্দয় হলেন কেন? লুৎফার বুকটা মুচড়ে ওঠে ব্যথায়। কোথায় আছে সিরাজ? ভালো আছে তো? কবে দেখা হবে তাঁর সঙ্গে? আশা-নিরাশার দোলাচলে বেচ্যায়েন হয়ে ওঠে লুৎফার মন। সে ভাবে, আর যাই হোক, নিশ্চয়ই আলিবর্দির রিশতাদার নবাব মিরজাফর খাঁ জানে মারবেন না সিরাজকে। বেঁচে থাক সিরাজ। জিন্দেগিভর কয়েদ হয়ে থাকলেও বেঁচে থাক। খোদাতালার কাছে এর চেয়ে বেশি লুৎফার আর কিছু চাওয়ার নেই।

'হুজুরাইন!'

আগন্তুকের সম্বোধন লুৎফার কানে যায় না। কখন যে সেপাইরা এই জিন্দানখানার দরওয়াজা খুলে দিয়েছে, দরওয়াজার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে মুন্নিলাল, কিছুই সে টের পায়নি। সিরাজের কল্যাণকামনায় নিবিষ্ট চিত্তে মোনাজাত করে চলেছে লুৎফা– 'হে দুনিয়াদার। ভালাই করো আমার সিরাজের। তাঁকে সহি সালামত, খুশ তবিয়ত রাখো।'

টলমলে পায়ে কিছুটা এগিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মুন্নিলাল। গত রাতের মেহফিল-ফূর্তির রেশ রয়েছে এখনও। খোয়ারি পুরোপুরি কাটেনি। চোখদুটো করমচার মতো লাল। মুন্নিলাল সহসা যেন বাক্যিহারা হয়ে যায়। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে লুৎফার মুখপানে। আলোছায়ায় অপার্থিব সুন্দর হয়ে উঠেছে মুখখানা। ঠিক যেন বেহেস্তের গুলবাগিচার তাজা একটা গোলাপ।

সিরাজদ্দৌলার পিয়ারিকে আগে দেখার সৌভাগ্য হয়নি মুন্নিলালের। হবেই বা কোত্থেকে! মুন্নিলাল ছিল নিজামতের সামান্য এক নোকর। লোকমুখে শুনেছিল লুৎফার রূপের কথা। এমন রূপসী জেনানা নাকি তামাম হিন্দুস্থানে বিরল। তা হওয়ারই তো কথা। না হলে সামান্য এক জারিয়া কি সুবে বাংলার নবাবের খাস বেগম হয়ে উঠতে পারে?

মুন্নিলালের মগজে ঘুমিয়ে থাকা শয়তানটা জেগে ওঠে নিমেষে। নখ-দাঁত বার করে লালসা। রঙিন খোয়াবে লুৎফার সঙ্গে রতি-সম্ভোগের কল্পনায় কামার্ত হয়ে পড়ে মুন্নিলাল। লোভী চোখদুটো লুৎফার গোটা

শরীরের উপর দিয়ে ঘুরে বেড়ায় নির্বিচারে। চোখ দিয়ে মুন্নিলাল লেহন করতে থাকে লুৎফার দেহটাকে। এই লোভী নজর এসে স্থির হয় লুৎফার উন্মুক্ত নাভিদেশের উপর। শয়তানের চোখের পলক পড়ে না।

সহসা অদৃশ্য কেউ যেন সপাটে একটা চড় কষায় মুন্নিলালের গালে। তার অন্তরাত্মা ভয়ে কেঁপে ওঠে। খোয়াবের দুনিয়া ছেড়ে ধাতে আসে মুন্নিলাল। স্বয়ং নবাবজাদা মিরন যাকে কামনা করেন তার দিকে কুনজর দিয়েছে সে, একথা কোনওভাবে প্রকাশ পেলে তার গর্দান যাবে। নিজেকে সংযত করে মুন্নিলাল।

‘হুজুরাইন। সহি সালামত। আমি আপনার গোলাম মুন্নিলাল। নবাবজাদা মিরনের দিলপিয়ারা।’ মুন্নিলাল বিনয়ে গলে পড়ে।

সম্বিৎ ফেরে লুৎফার। চোখ নামিয়ে মুন্নিলালের দিকে তাকায়। মুন্নিলালের ঠোঁটের কোণায় মৃদু হাসি। কী মতলব এই শয়তানের কে জানে। চকিতে কাঁচুলির অভ্যন্তর থেকে রাংতায় মোড়া জহরের পুরিয়া হাতে নেয় লুৎফা।

মৃদু হাসির রেশ ধরে রেখেই মুন্নিলাল বলে, ‘নবাবজাদা মিরন পাঠিয়েছেন আমাকে।’

‘কেন?’ তীক্ষ্ণ চোখে মুন্নিলালের দিকে চেয়ে প্রশ্ন ছুড়ে দেয় লুৎফা।

‘সিরাজদ্দৌলার এন্তেকাল হয়েছে। গতকালই খোশবাগে তাকে দাফন করা হয়েছে। নবাবজাদা মিরনের হুকুমতে জাফরাগঞ্জের কারাগারে তাঁকে কোতল করা হয়েছিল। সিরাজের লাশ হাতির পিঠে চড়িয়ে ঘোরানো হয়েছিল গোটা শহরে। বহুত ফূর্তি হয়েছে। তামাম মুর্শিদাবাদ তা দেখেছে। নবাবজাদা এ আখবার আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়ার ফরমায়েশ করেছেন এই বান্দার উপরে।’

সিরাজ নেই! বলছে কী শয়তানটা! লুৎফার বুকের মধ্যে সহসা পাক দিয়ে ওঠে তীব্র এক কষ্ট। ধারালো এক ছুরির ফলা যেন বিদ্ধ করে তার কলিজা। অবশ হয়ে আসে হাত পা। চোখের সামনে গোটা দুনিয়া যেন টলে যায়। প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মতো বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায় কান্না। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নেয় সে। শক্ত করে মনকে। কখনোই সে তার অন্তরের বেদনাকে ব্যক্ত করবে না এই শয়তানের সমুখে। লুৎফা বোঝে, তার কান্না, আর্তনাদ, জহমত, জিগরপস্তানি তৃপ্তি দেবে সিরাজের ঘাতকদের। তাদের খুনজোশিকে আরও মস্ত করে তুলবে। তীব্র ঘৃণায় পরিপূর্ণ একটা দৃষ্টি মুন্নিলালের দিকে ছুড়ে দিয়ে লুৎফা চোখ নামিয়ে নেয়।

সিরাজের মওতের কহানি শুনেও লুৎফুন্নেসা নিশ্চুপ! এ প্রতিক্রিয়া সত্যিই প্রত্যাশা করেনি মুন্নিলাল। সে ভেবেছিল মাটিতে আছড়ে পড়বে লুৎফা, ভেঙে পড়বে কান্নায়। সে রগড় দেখবে। দেলাসা, হামদর্দির অছিলায় একবার ছুঁয়ে দেখবে বহু মরদের কামনার ধন গুলবদন এই যুবতীর শরীরটাকে।

কিন্তু লুৎফা যে পাথরের মতো অটল! ভাবলেশহীন। মুন্নিলাল বেওকুফ বনে যায়। নিজের হতবুদ্ধি ভাবটা গোপন করে সে বলে, ‘আপনাকে তকলিফ দেওয়া নবাবজাদার তামান্না নয়। সিরাজদ্দৌলার মওত হয়েছে। এবারে আপনার কমবখতির অন্ত হবে হুজুরাইন।’

আহত বাঘিনীর মতো চকিতে মুখ তুলে ধারালো চোখে তাকায় লুৎফা। ফের চোখ নামিয়ে শীতল, কঠিন গলায় সে বলে, ‘আমাকে একা থাকতে দিন।’

‘এ ওয়াক্ত তো জহমতে দিন-গুজরানের নয়, খুশির। হাবুজখানা-তনহাই-সদমা– এসব আপনার জন্য নয়। আমি ডুলি নিয়ে এসেছি। আপনাকে জাফরাগঞ্জ প্যালেসে নিয়ে যাওয়ার হুকুম হয়েছে আমার উপর। হুকুম তামিল না হলে এই গরিবের গর্দান যাবে হুজুরাইন। আপনি কি তা চান? আমি যে আপনার গোলাম।’ এই বলে মুচকি হাসে মুন্নিলাল।

তীব্র ঘৃণায়, অপমানে সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে লুৎফার। নিজের মনোভাব দমন করে শান্ত গলায় সে বলে, ‘আমাকে জাফরাগঞ্জে যেতে হবে?’

মুন্নিলাল মাথা ঝুঁকিয়ে বলে, ‘জি হুজুরাইন। হুজুরের ফরমায়েশ। আপনার জন্যে মস্ত এক হাভেলি সাজানোর আনজাম করেছেন নবাবজাদা। বেস্তারায় বসরাই গুলাবের পাপড়ি ছড়িয়ে রেখে আপনাকে ইয়াদ করছেন।’

‘তা এই খোশ আমদের কারণ?’ হালকা তাচ্ছিল্যের হাসি সমেত প্রশ্নটা ছুড়ে দেয় লুৎফা।

‘বিসমিল্লা। আপনি যে হুজুরের পিয়ারি।’

‘চুপ রহো কমিন! বেতমিজ কাঁহিকা। জেনে রেখো লুৎফা স্রেফ সিরাজেরই। কী দুনিয়ায়, কী জন্নতে।’ প্রখর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ঝাঁঝাল গলায় কথাগুলো বলে লুৎফা।

‘বেওকুফের মতো এ কি বাত বলছেন হুজুরাইন? নবাবজাদা মিরন আপনার কথা ভেবে ভেবে বহেরা বনে গিয়েছেন। বহুত খুশনসিব আপনার। নবাব বেগম ছিলেন, ফের নবাব বেগম হবেন। মিরজাফর খাঁ বুড্ডহা হয়েছেন। সবাই জানে, তার দেহান্ত হলেই মসনদে বসবেন নবাবজাদা মিরন। হুজুরাইন আপনি হবেন তাঁর খাস বেগম। ইয়ে সচ বাত। আপনাকে শাদি করতে চান নবাবজাদা। শরিয়তের কানুন মেনে। সিরাজদ্দৌলা তো শাদি করেননি আপনাকে। আমলোগ জানে, আপনি ছিলেন সিরাজদ্দৌলার কসবি। আপনাকে ইমান দেননি সিরাজদ্দৌলা। নবাবজাদা মিরন দেবেন।’

‘খামোশ।’ চেঁচিয়ে ওঠে লুৎফা। পাথরের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হয় শব্দটা।

বিনয়ে ফের মাথা নুইয়ে জোড়হাত হয়ে মুন্নিলাল বলে, ‘গোলামের গোস্তাকি মাফ করবেন হুজুরাইন। যে বাত আমি বলছি, তা আমার জবান নয়। এসব কথাই নবাবজাদা লিখে পাঠিয়েছেন। আপনি ছিলেন ঝুটা বেগম। নবাবজাদা মিরনের সঙ্গে শাদি হলে শরিয়তের কানুন মেনে সাচ্চা বেগম হবেন। ইমানদারির সঙ্গে দিন গুজরান করবেন। এসব কথাই নবাবজাদা লিখেছেন চিঠিতে। এই যে আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি।’

এই বলে কোমর-বন্ধনী থেকে পাকানো একটা কাগজ বের করে লুৎফার দিকে এগিয়ে দেয় মুন্নিলাল। হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিয়ে কী লেখা আছে তাতে না দেখেই তীব্র ঘৃণায় সেটা কুটিকুটি করে ছিড়ে মাটিতে ফেলে দেয় লুৎফা।

মুন্নিলাল বলে, ‘এ কী করলেন হুজুরাইন? চিঠিটা ছিড়ে ফেললেন? একথা পাঁচ কান হলে যে হুজুরের ঘোর বেইজ্জতি হবে।’

‘বেহুদা, বেতরিবত আদমির ইজ্জত বলে কি কিছু থাকে যে বেইজ্জতি হবে?’

‘ইতনা কেরাহিয়াত! নবাবজাদার মহব্বতকে আপনি ইনকার করছেন?’ মুন্নিলালের গলার স্বর রুক্ষ হয়।

লুৎফুন্নেসা ফুঁসে উঠে বলে, ‘সহি আন্দাজ আপনার। আমার হয়ে নবাবজাদাকে বলবেন, যে চিরকাল হাতির পিঠে চেপেছে, সে কখনও গর্ধবের পিঠে সওয়ার হতে পারে না।’

এ কথার প্রতিক্রিয়ায় বিশ্রিভাবে হেসে ওঠে মুন্নিলাল। পানের ছোপ ধরা নোংরা দাঁতগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

‘বেওকুফের মতো হাসছেন যে?’ লুৎফা শুধোয়।

‘হুজুরাইনের সমুখে গোলামের হাসতে নেই জানি। তবুও হাসছি আপনার বেওকুফি দেখে। নিজের খুশনিসিবিকে পায়ে ঠেলছেন আপনি।’

‘আপনি এখন আসুন। আমাকে একা থাকতে দিন।’

মুন্নিলাল মুচকি হেসে বলে, ‘খালি হাতে ফিরে যাওয়ার হুকুম নেই হুজুরাইন।’

‘মানে?’ ভুরুযুগল কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করে লুৎফা।

‘নারাজ হলে জবরদস্তি আপনাকে জাফরাগঞ্জে নিয়ে যাওয়ার পরোয়ানা নিয়ে এসেছি।’

‘সে হিম্মত আপনাদের নেই।’ কঠিন গলায় বলে লুৎফা।

'বলছেন কী হুজুরাইন! হাবুজখানায় কয়েদ হয়ে হিম্মতের বড়াই করছেন আপনি? সিরাজদ্দৌলার জমানা চলে গিয়েছে। তিনি এখন খোশবাগে ঘুমিয়ে আছেন। তামাম সুবে বাংলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হলেন নবাবজাদা মিরন। চলুন হুজুরাইন। আপনার সঙ্গে সোহাগরাত মানিয়ে আমার হুজুরের বেতাব দিলের চ্যায়েন হোক।'

'মুন্নিলাল!'

সহসা পিছন থেকে নারী কণ্ঠের গর্জন শুনে চমকে গিয়ে ঘুরে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় মুন্নিলাল। কারাকক্ষের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন মণি বেগম। বেগমসাহেবার দু'পাশে দু'জন বাঁদি। পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত দেহরক্ষীর দল। সকলে হাতিয়ারবন্ধ।

'বেগমসাহেবা আপনি?' ত্রস্ত হয়ে ওঠে মুন্নিলাল।

মণি বেগমের দু'চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছে। ধকধক করে জ্বলছে চোখদুটো। নবাববেগমকে দেখে মুন্নিলাল একেবারে হকচকিয়ে যায়। স্তিমিত হয়ে যায় তার খুনজোশি। এই ওয়াক্তে এই হাবুজখানায় মণি বেগমের হাজির হওয়াটা মুন্নিলালের কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

বেগমসাহেবার গলার স্বর শুনেই মুন্নিলাল মালুম পেয়েছে যে তার উপরে তিনি রুষ্ট হয়েছেন। নবাব মিরজাফরের উপর মণি বেগমের প্রভাব যে কতটা, তা মুন্নিলাল বিলক্ষণ জানে। এটাও সে জানে যে, মণি বেগমের খায়েশ হলে এই জমানায় অনেকেরই জিন্দেগি বরবাদ হয়ে যেতে পারে।

বিপদ আন্দাজ করে অকুস্থল থেকে নিমেষে হাওয়া হয়ে যায় মুন্নিলাল।

রাগে ফুঁসছে লুৎফা। মণি বেগম এসে তার সামনে দাঁড়ালেন। শান্ত গলায় বললেন, 'ভয় নেই বহেন। আমি আছি। তোমার উপর কেউ জুলমাত-জবরদস্তি করবে না।'

লুৎফার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইছে। আনত চোখে ভূমির দিকে চেয়ে থাকে সে।

মণি বেগম বলেন, 'নবাবকে তুমি অভিশাপ দিও না বহেন। রহেম করো তাঁকে। আমি জানি এক মাসুম জেনানার আঁসু অনেকের জিন্দেগিকে কহরে, মুসিবতে ভরিয়ে তোলে। আমাদের রহেম করো বহেন।'

'সিরাজ! মেরা সরতাজ!'

লুৎফার আর্তনাদে যেন কেঁপে উঠল গোটা চেহেল সেতুন। এতক্ষণ নিজের সঙ্গে লড়াই করে অন্তরের আবেগকে রুদ্ধ করে রেখেছিল লুৎফুন্নেসা। সহসা সেই বাঁধ ভাঙল। লুৎফার মনের মধ্যে পাক খেতে লাগল কয়েকটা কথা—সিরাজ নেই। আর কোনওদিনই সে দেখতে পাবে না তার প্রাণের চেয়ে প্রিয় মানুষটাকে। কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে।

ছলছল করে উঠল মণি বেগমের চোখদুটো। মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসে তিনি লুৎফার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'আমাদের উপর কোনও আখেজ রেখো না বহেন। মিরজাফর খাঁ চাননি সিরাজের মওত হোক। যা হয়েছে তা মিরনের খায়েশেই হয়েছে। আমি জানি সিরাজের প্রতি তোমার মহব্বত ছিল বেহেস্তের কওসরের মতো পবিত্র। এমন মহব্বতের নিশান এ দুনিয়ায় অনেক তজবিজ করেও মেলে না। ডরো মাত বহেন। আমি আছি। তোমার এই পেয়ারকে কেউ বেইজ্জত করবে না। তোমার দিল থেকে সিরাজকে উপড়ে ফেলার জন্য কেউ তোমার উপর জুলমাত করবে না, কোনও জবরদস্তি করবে না। তোমার শরীরকে কেউ অপবিত্র করার কোশিস করবে না। আমি নবাবকে দিয়ে কড়ার করিয়ে নিয়েছি।'

মুখ তুলে তাকিয়ে চোখের জল মোছে লুৎফা। বলে, 'কোনও জুলমাত, জবরদস্তিকে আমি ভয় করি না বেগম সাহেবা। জহরের পুরিয়া সঙ্গেই আছে। বড্ড কড়া। জিভে ছোঁয়ালেই মওত। কেউ জোর খাটাতে গেলে আমাকে পাবে না। শুধু আমার লাশটাই পাবে।'

'অ্যায়সা মাত শোচো বহেন। তুমি বাঁচবে। সিরাজের জন্যেই বাঁচতে হবে তোমাকে। আমি তোমাকে আজাদ করে দিতে এসেছি।'

'আজাদি?' এই বলে জল ছলছল চোখে মণি বেগমের দিকে তাকায় লুৎফা।

'হ্যাঁ আজাদি। এখন থেকে খোশবাগের দেখভাল করবে তুমি। যেখানে তোমার সিরাজ শুয়ে আছে। তুমি ফুল ছড়িয়ে দেবে কবরে। হররোজ চিরাগ জ্বেলে দেবে। আগরবাতি জ্বালাবে। জেয়ারাত করবে সিরাজের সমাধি। তোমার সিরাজ নিশ্চিন্তে ঘুমোবে। কহানি হয়ে বেঁচে থাকবে তোমাদের মহব্বত।'

'আপনি সচ বলছেন?' আবেগে গলা কেঁপে যায় লুৎফার।

'একিন হচ্ছে না তোমার? এই দেখো নবাবের পরোয়ানা।' পাশে দাঁড়ানো বাঁদির হাত থেকে একটা গোটানো কাগজ নিয়ে লুৎফার সামনে মেলে ধরেন মণি বেগম। 'এই যে নবাবের শিলমোহর।'

'আর উম্মেসায়েরা? তার আখবর আপনি কিছু জানেন?'

'ভেবো না। সায়েরা ভালো আছে। সে তোমার কাছেই থাকবে।'

'আপনার বহুত মেহেরবানি বেগমসাহেবা।' এই বলে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে লুৎফা।

মণি বেগম উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সাচ্চা পেয়ার এ দুনিয়ায় বহুত কিমতি চিজ বহেন। সবাই তলাশ করে। কেউ পায়। কেউ পায় না। তুমি পেয়েছিলে। তুমি এক খুশনসিব আওরত। তোমাকে আমি ঈর্ষা করি।'

লুৎফা জল ছলছল চোখে মুখ তুলে তাকাল।

মণি বেগম বলে চললেন, 'তোমার মতোই কোনও এক মামুলি খানদানে আমার পয়দায়িস ও পরবারিশ। আজ না হয় নবাব-বেগম। কাল কী হবে আমি জানি না। তবে মণি বেগম একজন আওরত হয়ে আরেকজন আওরতের ইমান, ইজ্জত রাখতে জানে। আমি আসি বহেন। খানিকবাদে ডুলি আসবে। তোমাকে খোশবাগে নিয়ে যাবে। ডরো মাত। জাফরাগঞ্জের হারেম নয়, তোমার ঠিকানা এখন থেকে খোশবাগ।'

এই বলে মণি বেগম আর দাঁড়ালেন না। দ্রুত পায়ে ফিরে চললেন। বেগমসাহেবা অনুভব করলেন তাঁর চোখের দৃষ্টি ঝাপসা। দু'চোখে টলটল করছে জল। মনে মনে বললেন, 'রহেম করো আল্লা। কোনও গুণাহ-পাপ যেন আমার দুই বেটা নজমদ্দৌলা ও সইফদ্দৌলাকে স্পর্শ না করে।'

কারাকক্ষের দরওয়াজা বন্ধ করে সেপাইরা। লুৎফা মুখ তুলে উপরের দিকে তাকায়। অনেক উঁচুতে জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাইরের উন্মুক্ত নীল আকাশের একফালি। সেদিকে চেয়ে লুৎফা অঝোরে কাঁদতে থাকে।

খানিকবাদে ঘড়ঘড় শব্দে খুলে যায় কারাগারের দরওয়াজা। অন্দরে প্রবেশ করে জয়নাল। খোশবাগে আলিবর্দির সমাধির দেখভাল করে সে। আলিবর্দির গোলাম ছিল জয়নাল। লুৎফার একান্ত পরিচিত। জয়নালকে দেখে চোখের জল মুছে দ্রুত এগিয়ে এসে লুৎফা শুধোয়, 'আপনি?'

জয়নালের বিষণ্ণ মুখে ক্ষীণ একটা হাসির রেখা ফুটে ওঠে। সে বলে, 'চলুন হুজুরাইন। আপনাকে খোশবাগে নিয়ে যাওয়ার হুকুমত নিয়ে এসেছি। ডুলি অপেক্ষা করছে।'

১৮

ওমর বেগের মুখ থেকে কথাটা শুনেই চমকে উঠেছিলেন মিরজাফর। ক্লাইভ আসতে চাইছেন হিরাঝিল পালেসে। মুনশি নবকৃষ্ণ ও দেওয়ান রামচাঁদকে সঙ্গে নিয়ে, গভীর রাতে অত্যন্ত গোপনে। কিন্তু কেন?

মিরজাফরের দিকে ওমর বেগ এগিয়ে দিলেন ক্লাইভের লেখা ছোট্ট চিঠিটা। তাতে চোখ বুলিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন নবাব। তাঁর হাতে ধরা চিঠিখানা বাঁশপাতার মতো কাঁপতে লাগল।

ক্লাইভ লিখেছেন, '...সিরাজদ্দৌলার অর্জিত অঢেল সম্পদ অতিগোপনে গচ্ছিত আছে হিরাঝিল প্যালেসের অন্দরে। এর মূল্য করিব চার কোটি টাকা...' কোথায় লুকোনো আছে এই বিপুল অর্থ? সে ইঙ্গিত অবশ্য দেননি কর্নেল। শুধু বলেছেন, '...জনাব গুপ্তধনের হদিশ আমি পেয়েছি। এই দৌলত আপনার ও জনাব ওমর বেগের সঙ্গে আমি ভাগ করে নিতে চাই। হুঁশিয়ার থাকবেন। আর কেউ যেন এ বিষয়ে কিছু জানতে না

পারে। আপনি রাজি থাকলে আগামীকাল গভীর রাতে এই দৌলতের তলাশে আমি হিরাঝিল প্রাসাদে আসব। অতি গোপনে। এ বিষয়ে আপনার মতামত তুরন্ত জানাবেন।...'

মিরজাফরের মাথাটা কেমন যেন চক্কর দিয়ে উঠল। কী আশ্চর্য ব্যাপার! হিরাঝিল প্যালেসের অন্দরে লুকোনো আছে করিব চার কোটি টাকা! এই প্রাসাদের দখল নেওয়ার পর থেকে গোপনে রক্ষিত সিরাজদ্দৌলার ধনসম্পদের সন্ধানে কম খানাতল্লাশি করেননি মিরজাফর। লেকিন তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কানাকড়ির খোঁজ তিনি পাননি।

মিরজাফরের মনের মধ্যে উঁকি দেয় সন্দেহ। কী করে ক্লাইভ জানলেন গুপ্তধনের কথা? যা তিনি লিখেছেন, এসব কি সত্যি? নাকি এই চিঠি একটা কৌশল। কর্নেল ক্লাইভ গভীর রাতে অতি গোপনে হিরাঝিল প্রাসাদে আসতে চাইছেন অন্য কোনও মতলবে। বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন মিরজাফর। ওমর বেগের মুখপানে চেয়ে শুধোলেন, 'কর্নেল যা লিখেছেন, তা সব সত্যি?'

ওমর বেগ মাথা ঝুঁকিয়ে বলে, 'আন্দাজ সহি না হলে কর্নেল খোদ আসতেন না।'

'লেকিন খাজানার কথা কী করে জানলেন কর্নেল?'

'সন্ধান দিয়েছে মুনির খাঁ।' চাপা গলায় বললেন ওমর বেগ।

'মুনির খাঁ! সিরাজের খাস গোলাম?' মিরজাফর বিস্মিত।

'জি হুজুর।'

'বলছেন কী জনাব? মুনির খাঁ জিন্দা আছে?' হতচকিত নবাবের গলা থেকে ছিটকে বেরোয় কথাগুলো।

'বিলকুল। খুশ তবিয়ত আছে। সহি সালামত আছে।' ওমর বেগ জবাব দেন।

'কোথায় সে? কোথায় ছুপিয়ে রেখেছে নিজেকে।'

'মুনির খাঁ এখন কর্নেল ক্লাইভের হেফাজতে।'

একেবারে হাঁ হয়ে যান মিরজাফর। বিস্ময়ের পর বিস্ময়। গোটা হিরাঝিল প্রাসাদ ঢুঁড়েও কানাকড়ির হদিশ না পেয়ে মুনির খাঁর অনেক খোঁজ করেছিলেন তিনি। সন্ধান মেলেনি। রায়দুর্লভ, জগৎশেঠসহ অনেকেই বলেছিলেন– হিরাঝিল প্রাসাদে কোনও গোপন জায়গায় সিরাজের খাস দৌলত ছুপানো আছে। বেশক আছে। এর সন্ধান একমাত্র মুনির খাঁই দিতে পারে। সেই তো সামলাত সিরাজের বিষয়-আশয়। কিন্তু পলাশির যুদ্ধের পর থেকে মুনির খাঁ নিখোঁজ।

নিজামতের কাসিদরা গোটা বাংলা ঢুঁড়েও যার সন্ধান পেল না, কর্নেল ক্লাইভ কী করে তার হদিশ পেলেন? মিরজাফরের মাথা ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। হাঁ-মুখ করে তিনি ওমর বেগের দিকে চেয়ে রইলেন।

দিন কয়েক আগের কথা। সেদিন ছিল পূর্ণিমা।

গঙ্গাবক্ষে বজরার ছাতে আরামকেদারায় গা এলিয়ে বিশ্রাম করছিলেন ক্লাইভ। হাতে ফরসির নল। খুবই ধীর গতিতে নদীর বুকে ভেসে চলেছে বজরাটা। অদূরে দৃশ্যমান মোরাদবাগ প্যালেস। সারি সারি চিরাগবাতির আলোয় স্পষ্ট তার অবয়ব। এর খানিকটা উত্তরে অন্ধকার ভেদ করে অত্যুজ্জ্বল হিরাঝিল প্রাসাদের আলোকমালা। হিরাঝিলের নহবতখানা থেকে সানাইয়ে ভেসে আসছে মারুবেহাগের সুর। মাথার উপর ঝকঝকে উন্মুক্ত আকাশে জেগে রয়েছে আধখানা চাঁদ। কালো আকাশের বুকে হিরককুচির মতো জ্বলজ্বল করছে অজস্র নক্ষত্র।

কর্নেলের মেজাজটা আজ বিশেষ শরিফ নেই। নবাব মিরজাফর খাঁ ইংরেজদের পাওনা মেটাবেন তিন কিস্তিতে, তিন বছরে। তাও প্রথম কিস্তি পাওয়া যাবে অর্ধেক টাকায়, বাকি অর্ধেক বহুত কিমতি চিজে। জগৎশেঠের হাভেলিতে বসে লম্বা আলোচনার পর একপ্রকার নিরুপায় হয়েই ক্লাইভকে মেনে নিতে হয়েছে

এই বন্দোবস্ত। এ ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। নবাবের দৌলতখানা তজবিজ করে কর্নেল বুঝেছেন, সত্যিই ইংরেজদের দাবি মেটানোর মতো নগদ টাকা নেই নবাবের।

কোম্পানির পাওনা আদায়ের পাশাপাশি মোটা অংকের একটা টাকা নিজের পকেটে পোরার খোয়াব দেখেছিলেন ক্লাইভ। আপাতত তাঁর সেই স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। কর্নেলের আফশোস এই যে–পলাশির যুদ্ধের এত বড় ঝুঁকিটা কাঁধে নিয়ে, সসম্মানে কোম্পানিকে উতরে দিয়েও ব্যক্তিগত মুনাফা হল খুবই সামান্য। যা পেয়েছেন তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি আদায়-উশুলের উমিদ ছিল তাঁর। মাদ্রাজে বসে সুবে বাংলার নবাবের দৌলতের কহানি শুনে লোভ-লালসা উপচে পড়েছিল ক্লাইভের চোখেমুখে। নৌবহরসহ বাংলায় আসার পথেই ওয়াটসনের সঙ্গে আলোচনা করে লুঠতরাজের খসড়া পরিকল্পনা ছকে ফেলেছিলেন কর্নেল ক্লাইভ। কিন্তু কোথায় দৌলত? বাংলার জলুসের রংদার কহানির সঙ্গে বাস্তবের মিল কোথায়? পলাশির যুদ্ধের গনিমত আদায় হল খুব সামান্যই। তবে একটা কথা ক্লাইভ মানছেন—নবাবের জাঁকজমক, জলোয়ার অনেকটাই শুষে নিয়ে গিয়েছে বর্গিরা।

ক্লাইভের চোখেমুখে বিরক্তি। চুপচাপ ফরসির নলে টান দিয়ে চলেছেন কর্নেল। অম্বুরি তামাকের গন্ধে গঙ্গাবক্ষের বাতাস আমোদিত। অদূরে নিচু দুটো চৌপাইয়ের উপর পাশাপাশি বসে আছেন মুনশি নবকৃষ্ণ ও কোম্পানির দেওয়ান রামচাঁদ। প্রথম কিস্তির পাওনা নৌকো বোঝাই করে কী করে পাঠাতে হবে কলকাতায় তা নিয়ে আলোচনার জন্য নবকৃষ্ণ ও রামচাঁদকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ক্লাইভ। প্রায় শদুয়েক নৌকোয় মালপত্র চাপিয়ে নৌকোগুলোকে সারিবদ্ধ ভাবে নিয়ে যেতে হবে কলকাতায়। এ কাজের দায়িত্ব মূলত দেওয়ান রামচাঁদের ঘাড়ে। নবকৃষ্ণ সাহায্য করছেন তাঁকে। কর্নেলের আদেশ-হুকুমের অপেক্ষায় বসে আছেন দু'জনে। আধঘণ্টাখানেক হয়ে গেল। ক্লাইভ নিশ্চুপ। জগৎশেঠের হাভেলি থেকে ফেরার পর থেকে তাঁর মেজাজটা কেমন যেন খিঁচড়ে রয়েছে। পলাশিতে ইনকিলাবের কিস্মত আদায় হবে তিন কিস্তিতে, তিন বছর ধরে—এটা মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না কর্নেল। তিনি নগদ আদায়ে বিশ্বাসী।

হঠাৎ নীচ থেকে একটা শোরগোলের শব্দ ভেসে এল। সচকিত হয়ে উঠলেন ক্লাইভ। নবকৃষ্ণ ও রামচাঁদ সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে গেলেন নীচে।

আরামকেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ক্লাইভ। কীসের গোলমাল?

খানিকবাদে একটা লোককে টেনে হিচড়ে সেপাইরা নিয়ে এল বজরার ছাতে। তাদের পিছনে নবকৃষ্ণ ও রামচাঁদ। দু'জনেই উত্তেজিত।

নবকৃষ্ণ বললেন, 'হুজুর লোকটা একটা ছিপ নৌকো নিয়ে বজরার কাছে এসে বজরায় উঠে পড়তে চাইছিল। সেপাইরা একে পাকড়াও করেছে।'

একদৃষ্টে লোকটাকে ইয়াদদস্ত করতে লাগলেন ক্লাইভ। দেখে মালুম হচ্ছে, লোকটা বেজায় ক্লান্ত ও অবসন্ন। চোখদুটো কোটরে ঢোকা। টলমল করছে তার পা দুটো। সোজা হয়ে দাঁড়ানোর শক্তি যেন তার নেই। ডান পায়ে গভীর ক্ষত। সেখান থেকে রক্ত চুইয়ে পড়ছে। পোশাক ময়লা, জীর্ণ। কাঁধ থেকে ঝুলছে চামড়ার একটা খরিতা। তার মুখচোখ দেখে মনে হচ্ছে ভয় পেয়েছে সে।

লোকটাকে শক্ত করে ধরেছিল দুই সেপাই। তাদের চলে যেতে বললেন ক্লাইভ। সেপাইরা লোকটাকে ছেড়ে দিতেই কাটা কলা গাছের মতো সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। অবসন্ন, ক্লান্ত গলায় কোনওরকমে বলল, 'হুজুর আমার জান বাঁচান। আমি মুনির খাঁ।'

মুনির খাঁ! রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণ স্তম্ভিত। বিস্ফারিত হয়ে উঠল তাদের চোখগুলো।

ক্লাইভ বিচলিত। তার সামনে লুটিয়ে পড়ে আছে লোকটা। অচৈতন্য। তার উপরে ঝুঁকে পড়ল নবকৃষ্ণ ও রামচাঁদ।

ক্লাইভ ব্যস্ত গলায় শুধোলেন, 'ইজ দ্য ম্যান ডেড?'

নবকৃষ্ণ বললেন, 'না হুজুর। জিন্দা আছে। বেহুঁশ হয়ে গেছে। শ্বাস পড়ছে।'

'হু ইজ দ্যাট ম্যান? চেনো?'

নবকৃষ্ণ জবাব দেন, 'সিরাজদ্দৌলার খাস গোলাম হুজুর। মুনির খাঁ।'

রামচাঁদের হাঁকডাকে ছুটে এল কয়েকজন সেপাই।

ক্লাইভ হুকুম করলেন, 'একে অন্দরে নিয়ে যাও। ইলাজ করাও।'

সেপাইরা মুনির খাঁকে ধরাধরি করে নীচে নামিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর নবকৃষ্ণ বললেন, 'এ মনে হচ্ছে আপনার খুশনসিব হুজুর।'

'হোয়াট ডু ইউ মিন মুনশি?'

'খুশনসিব নয়? মুনির খাঁ নিজে এসে ধরা দিল আপনার কাছে।'

'সো হোয়াট?'

উৎসাহের সঙ্গে নবকৃষ্ণ বলেন, 'নিজামতের কাসিদরা বহুত তলাশ করে লোকটার হদিশ পায়নি।'

অবাক চোখে নবকৃষ্ণর দিকে তাকালেন ক্লাইভ।

নবকৃষ্ণ বললেন, 'সিরাজদ্দৌলার বহুত পেয়ারের আদমি ছিল মুনির খাঁ। হিরাঝিলের অন্দরের অনেক গোপন কথা জানে। আরও শুনেছি সিরাজদ্দৌলা একে খুব বিশ্বাস করতেন।'

রামচাঁদ যোগ করলেন, 'শুধু তাই নয় হুজুর, শোনা যায় সিরাজদ্দৌলার দৌলতের খতেন রাখত মুনির খাঁ।'

এ কথা শুনে চকচক করে উঠল ক্লাইভের চোখদুটো। অবসন্ন স্নায়ু সতেজ হয়ে উঠল নিমেষে। তিনি বললেন, 'আই থিংক, নবাবের পারসোনাল ট্রেজার হিরাঝিল প্রাসাদে যদি কোথাও হিডেন থাকে তো সেটা নিশ্চয়ই মুনির খাঁ জানবে।'

নবকৃষ্ণ বললেন, 'একেবারে মোক্ষম আন্দাজ করেছেন হুজুর।'

ক্লাইভ বললেন, 'তোমাদের আমি মুনির খাঁর জিম্মাদার করলাম। লোকটাকে ভালো করে খাতির করো। ইলাজ করাও। ওর কাছ থেকে গোপন কথাটা টেনে বের করার চেষ্টা করো। আমি জানি, তোমরা পারবে। এ বিষয়ে আর কেউ যেন কোনও কিছু জানতে না পারে।'

রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণ প্রায় একসঙ্গে বলে ওঠেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন হুজুর।'

এবারে বেশ আবেগ জড়িত গলায় ক্লাইভ বললেন, 'ইউ টু আর ভেরি ডিয়ার টু মি। তোমরা আমাকে যা মদত দিয়েছ সেটা আমি ভুলতে পারি না।'

নবকৃষ্ণ বললেন, 'ও কী কথা বলছেন হুজুর? আমরা আপনার দাস। ওবিডিয়েন্ট সারভেন্ট।'

'আই ট্রাস্ট ইউ মোর দ্যান এনি ইংলিশম্যান।'

নবকৃষ্ণ হাত কচলে বলে, 'সে আমাদের পরম সৌভাগ্যি হুজুর।'

'মাই ফিলোজফি ইজ এফিসিয়েন্ট পারসনস মাস্ট বি রেমুনারেটেড। কোম্পানির জন্য তো তোমরা কম করোনি। সামান্য মাইনে ছাড়া আর কী পেলে তোমরা? কী দিয়েছে তোমাদের কোম্পানি?'

ক্লাইভের কথার সুরে যেন মধু ঝরে পড়ে নবকৃষ্ণ ও রামচাঁদের কানে। ইঙ্গিতটা দু'জনের কাছেই খুব স্পষ্ট। তাঁরা সঠিক আন্দাজ করতে পেরেছিলেন ইংরেজরাই দেশের ভবিষ্যৎ। তাই পরিবার পরিজন ভুলে একনিষ্ঠ ভাবে দু'জনেই মদত দিয়ে গিয়েছেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে। কর্নেল ক্লাইভকে। ইংরেজদের চরম বিপদের দিনেও তাদের পাশ থেকে এঁরা সরে যাননি। পলাশির যুদ্ধের পর লুঠ হচ্ছে মুর্শিদাবাদ। ইংরেজ সাহেবরা যে যার দাবি মতো টাকা ভরছে পকেটে। আদায় করছে গনিমত। দস্যুর মতো গায়ের জোরে নয়। ভদ্রবেশে। কৌশলে। কর্নেল যাকে বলেন স্ট্র্যাটেজি। কিন্তু নবকৃষ্ণ বা রামচাঁদের কথা ভাবছে কে? ঝুঁকির বিনিয়োগে মোটা মুনাফা– এই তত্ত্বে বিশ্বাসী নবকৃষ্ণ ও রামচাঁদ মনে মনে প্রত্যাশা করেছেন মোটা ইনাম,

কিন্তু মনের কথা প্রকাশ করেননি কারও কাছে। সে কথা আজ ভাবছেন স্বয়ং কর্নেল ক্লাইভ। কথাই তো আছে, সবুরে মেওয়া ফলে।

নবকৃষ্ণ বললেন, 'কোম্পানি নাই বা আমাদের কথা ভাবল, আমরা যে আপনার সেবা করতে পেরেছি, এতেই আমরা ধন্য।'

'আই ক্যান নট ফরগেট ইওর ডেডিকেটেড সারভিস টু কোম্পানি। কোম্পানি তোমাদের কথা ভাববে না আমি জানি। কিন্তু আমি ভাবছি। যদি সিরাজদ্দৌলার পারসোনাল ট্রেজার ট্রেস আউট করা যায়, সে কথা আমি কোম্পানিকে বা আমার কোনও ইংলিশ কলিগকে জানাতে চাই না। হাতে যা আসবে তা থেকে, তোমাদের আমি মোটা ইনাম দেব। মুনির খাঁর কাছ থেকে কথা আদায় করো। দেয়ার মাস্ট বি হিডেন ট্রেসারস ইন হিরাঝিল ক্যাম্পাস।'

নবকৃষ্ণ বলে উঠলেন, 'জয় গোবিন্দ।'

রামচাঁদ বলে উঠলেন, 'করুণাসিন্ধু রাধামাধব।'

রামচাঁদের মুখপানে চেয়ে ক্লাইভ শুধোলেন, 'নবকিসেনের গোবিন্দকে আমি জানি। বাট হু ইজ রাধামাধব?'

রামচাঁদ বললেন, 'আমাদের মাইথোলজিতে যেই গোবিন্দ, সেই রাধামাধব। একই দেবতা। হরেক নাম।'

ক্লাইভ দুহাতে দুজনের পিঠে চাপড় মেরে বললেন, 'ভেরি কনফিউজিং।'

নবকৃষ্ণ বললেন, 'হুজুর আপনিই আমাদের গোবিন্দ। আপনিই রাধামাধব।'

ক্লাইভ হাসলেন। তারপর জেবের ভিতর থেকে পাইপটা বের করে ঠোঁটে গুঁজলেন। দুটো চকমকি পাথর হাতে দ্রুত এগিয়ে এলেন নবকৃষ্ণ। পাথর ঘষে আগুন ধরিয়ে দিলেন পাইপে। একটা লম্বা সুখটান দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী বাতাসে উড়িয়ে দিলেন ক্লাইভ। তারপর বললেন, 'নাউ লেট আস ফোকাস অন মুনির খাঁ অ্যান্ড টু অ্যাচিভ আওয়ার মিশন।'

নবকৃষ্ণ ও রামচাঁদের তত্ত্বাবধানে দিনকয়েকের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠল মুনির খাঁ।

সেদিন সন্ধেবেলা মোরাদবাগ প্যালেসের ছাতে বসে মুনির খাঁর সঙ্গে আলাপ করছিল দু'জনে। নীচের প্রশস্ত লনে তখন সাহেবদের ডিনার পার্টি চলছে।

এই গোরা সাহেবদের সব কিছুই ভালো লাগে নবকৃষ্ণ ও রামচাঁদের। পছন্দ হয় না শুধু খানাপিনার নামে এই হুল্লোড়বাজি। ফূর্তির আসুরিক বহিঃপ্রকাশ। এদেশি নবাব-বাদশাদের মতো ঝিম মেরে খুশইলহান বাইজির সঙ্গীতসুধা উপভোগ করা নয়, রীতিমতো দামালপনা। বেহেড মাতাল হয়ে কলহ, বিবাদ, এমনকি হাতাহাতি। আড্ডা, গুলতানির মাঝে মাঝে হেড়ে গলায় পিলে চমকে দেওয়া অট্টহাস্য। বাড়াবাড়ি রকমের কিছু একটা না হলে সাহেবদের সেলিব্রেশন জমে না।

ছুতো পেলেই ডিনার পার্টি লাগিয়ে দেয় সাহেবরা। মুর্শিদাবাদ থেকে ধনদৌলত ছেঁচে নিয়ে কলকাতা রওনা দেবে দুশো নৌকো। সেই খুশিতে আজকের এই সেলিব্রেশন। মোরাদবাগ প্যালেসের লনে টেবিলের উপরে সাজানো রয়েছে রকমারি মদের বোতল—শ্যাম্পেন, ক্লারেট, ওয়াইন, বিয়ার। আরেকদিকে চাঁদোয়ার নীচে টেবিলের উপর রুপোর রেকাবিতে সাজানো হয়েছে মাংসের হরেকরকম মসল্লাদার পদ। দমপোক্ত, দুনিয়াজা, গোস্তের সুরুয়া, তন্দুরি। মোগলাই খানায় মজেছে সাহেবরা। স্বাদু গন্ধে ম-ম করছে গোটা মোরাদবাগ প্যালেস।

নীচ থেকে ভেসে আসছে মেজর আয়ারকুটের চিৎকার। পাশাপাশি শোনা যাচ্ছে উইলিয়াম ওয়াটসের হেঁড়ে গলা। মদের নেশায় বেসামাল হয়ে কাজিয়া বাঁধিয়েছেন দু'জনে। সাহেবদের পার্টিগুলোতে এই এক

উৎপাত। নেশা একটু চড়তে না চড়তেই সকলে দামাল হয়ে ওঠে। এ ওকে গালিগালাজ করে। হাতাহাতি বাধিয়ে দেয়। কেউ কেউ মৌতাতে মাটিতে লুটোয়। ডুয়েল লড়ার জন্য কখনও সখনও বেরিয়ে পড়ে বন্দুক। তুলনামূলকভাবে প্রকৃতিস্থ যারা, তারা ছুটে এসে দুপক্ষকে শান্ত করে। গোলমাল ঝামেলা মেটায়। আজও তার ব্যতিক্রম নেই। ঘুষি বাগিয়ে ওয়াটসের দিকে ছুটে যেতে চাইছেন আয়ারকুট। ওয়াটসও আস্তিন গোটাচ্ছেন। আয়ারকুটের কোমর জাপটে ধরে তাকে সামলানোর কোশিশ করছেন লাশিংটন ও স্ক্র্যাফটন।

নীচ থেকে ভেসে আসা অশ্রাব্য ইংরেজি গালিগালাজের শব্দ শুনে ঘাবড়ে যায় মুনির খাঁ। শুধোয়, 'কাজিয়া কীসের বাবুজি? কী বাত বলছে এরা?'

নবকৃষ্ণ হেসে বলেন, 'কাজিয়া কোথায়? একে অপরের সুখ্যাতি করছে।'

রামচাঁদ বলেন, 'শরাবের মৌতাতে সবারই মেজাজ এখন বেশ শরিফ। তাই এই খুনজোশি।'

মুনির খাঁ ঘাবড়ে যাওয়া গলায় বলে, 'লেকিন মালুম হচ্ছে লড়াই বাধবে।'

নবকৃষ্ণ বলেন, 'না না ওসব কিছু নয়। স্রেফ ফূর্তি। এ তুমি বুঝবে না। সাহেবদের বোলচাল, কেতা, আদব-কায়দা সবই আলগ।'

রামচাঁদ শুধোলেন, 'শরাব তোমার চলে?'

লাজুক হাসি হাসে মুনির খাঁ।

নবকৃষ্ণ বলেন, 'বুঝেছি। তুমি রসিক আদমি। দাঁড়াও তোমার আমোদ-আশরতের আনজাম করছি।'

১৯

এক গোলামকে ডেকে রকমারি মাংসের পদ নিয়ে আসার হুকুম করলেন নবকৃষ্ণ।

মুনির খাঁ লাজুক গলায় বলে, 'বহুদিন খাইনি। দিল চাইছে। থোড়া শরাব মিলবে বাবুজি?'

নবকৃষ্ণ বলেন, 'মিলবে না মানে? আলবত মিলবে।'

রামচাঁদ প্রশ্ন করেন, 'বিলিতি শরাব চেখে দেখেছ কখনও?'

মুনির খাঁর চোখ দুটো চকচক করে ওঠে। 'বিলাইতি? আছে আপনাদের কাছে?'

'জরুর আছে। তুমি ছিলে নবাবের খাস গোলাম। তোমার কেতা-তরবিয়ত আর পাঁচ জন হেঁজিপেজি লোকের থেকে আলগ তো হবেই। দিশি মদে কি আর তোমার পিয়াসা মিটতে পারে?' এই বলে পিরানের জেবের ভিতরে হাত চালিয়ে বিলিতি মদের একটা বোতল বের করে নবকৃষ্ণ।

সুদৃশ্য কাঁচের বোতলটা দেখেই মুনির খাঁ চঞ্চল হয়ে ওঠে। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে।

নবকৃষ্ণ বললেন, 'এর নাম ক্ল্যারেট। শুনেছি অতি উৎকৃষ্ট বস্তু। মৌতাত জবরদস্ত হয়। খোদ ক্লাইভ সাহেবের পছন্দের চিজ।'

বেহায়ার মতো নব মুনশির হাত থেকে বোতলটা প্রায় ছিনিয়ে নেয় মুনির খাঁ। ছিপি খুলে ঢকঢক করে বেশ খানিকটা গলায় ঢেলে বলে, 'বহুত আচ্ছা। বহুত বহুত সুক্রিয়া বাবুজি।'

রামচাঁদ বলেন, 'আয়েশ করে পান করো মুনির ভায়া। অঢেল আছে।'

'আপলোগ শরিফ আদমি। আল্লা আপনাদের ভালাই করুন।'

'তা তুমি এতদিন ছিলে কোথায় ভায়া?' প্রশ্ন করেন নবকৃষ্ণ।

'পলাশির ময়দান থেকে ভেগে গিয়ে মাদিপুরের জঙ্গলে ঠাঁই নিয়েছিলাম। সে বহুত তকলিফ কি বাত। সিপাহীলোগ মুঝে ঢুন্ড রহে থে। নয়া জমানায় আমি খুন হয়ে যেতাম। ধরা পড়লে গর্দান যেত। মাদিপুরের জঙ্গলেও হানা দিয়েছিল একদল সেপাই। আমি আরও গভীর জঙ্গলে ঘুসে যাই। বহুত পরেশানি হয়েছে

বাবুজি। তিনদিন ভুখা ছিলাম। বুখার ভি থা। উসকে উপার ফির খতরনক জানয়ার কা ডর। শেরের আওয়াজ ভি শুনেছি। মালুম হচ্ছিল শেরের হাতেই খতম হয়ে যাব।'

'বল কী হে? তারপর?' চোখ গোল্লা করে প্রশ্ন করেন রামচাঁদ।

'শেরের শিকার হতে কারই বা আরজু হয় বাবুজি? নসিবে যা আছে তাই হবে অ্যায়সা শোচকর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসি। নদীর কিনারে পৌঁছে একখানা ছিপনৌকোর কাছি খুলে ভেসে পড়ি জলে। শরীর আর চলছিল না বাবুজি। হাত দু'খানা অবশ হয়ে আসছিল। অচানকই দূর থেকে বজরাটা দেখতে পাই আমি। তখনও আলো পুরো মরেনি। কোম্পানির নিশানটা নজরে আসে। নিজামতের সেপাইদের হাতে পড়লে নির্ঘাত জান যাবে। আর ইংরেজলোগের পায়ের পাকড়ে ধরলে হয়তো বেঁচে যাব, অ্যায়সা শোচকর কর্নেল সাহেবের বজরায় কোনওরকমে উঠে পড়ি।'

রামচাঁদ বললেন, 'তুমি তো দেখছি বাহাদুর আদমি।'

নবকৃষ্ণ বললেন, 'নসিব তোমার খাসা মুনিরজি। ক্লাইভ সাহেবের পায়ে এসে পড়লে বলে বেঁচে গেলে। সাহেব দয়ার সাগর। শুধু কথাটা তোমার মনিব বুঝলে না। তাই তাঁর এই মুসিবত।'

ক্ল্যারেটের দ্বিতীয় বোতলটা খালি করে মুনির খাঁ বলে, 'বহুত আচ্ছা চিজ! থোড়া আউর মিলবে কি বাবুজি?'

নবকৃষ্ণের হুকুমে এক আর্দালি খানিকবাদে একটা রুপোর রেকাবির উপরে সাজানো অনেকগুলো মদের বোতল রেখে যায়।

মুনির খাঁ চোখ কপালে তুলে বলে, 'ইয়ে তো বড়িয়া আনজাম।'

নবকৃষ্ণ বলেন, 'আমাদের শাস্ত্রে বলে অতিথির সেবা করলে পুণ্য হয়।'

রেকাবি থেকে দ্রুত একটা মদের বোতল তুলে নিয়ে মুনির খাঁ বলে, 'আপ শরাব নেহি পিতে?'

নবকৃষ্ণ বলেন, 'মুনিরজি। তোমার দেহে আফগানি খুন বইছে। তুমি বিলিতি শরাবের রসিক হতে পার। আমরা হলাম গিয়ে যাকে বলে কলকেতার ভেতো বাঙালি। এ আমাদের পেটে সইবে না। তুমি খাও।'

লাজুক হাসি হাসে মুনির খাঁ।

একজন গোলাম এসে রেকাবি বোঝাই করা কাবাব, দুনিয়াজা, রোস্ট ও রকমারি শুকনো ফল রেখে যায়।

মুনির খাঁ বলে, 'বহুত বহুত সুক্রিয়া।'

একের পর এক মদের বোতল খালি করে দিতে থাকে মুনির খাঁ। সেই সঙ্গে পেটে চালান করতে থাকে মাংস ও শুকনো ফল। কিছুক্ষণ পর ঢুলুঢুলু হয়ে আসে তার চোখদুটো। জমাট মৌতাতে শাহি মেজাজ বেশ জাঁকিয়ে বসে। জড়ানো গলায় সে বলে, 'আপলোগ বহুত আচ্ছা আদমি। আমি আপনাদের ইনাম দেব।'

রামচাঁদ বলে ওঠেন, 'সে তো আমাদের খুশনসিব। তা কী ইনাম দেবে মুনির ভায়া?'

চাপা গলায় মুনির খাঁ বলে, 'ইয়ে বাত নিজের মধ্যেই রাখবেন বাবুজি। পলাশিতে আমার মনিবের মুসিবত হল। উনি পালিয়ে গেলেন। লুঠপাট শুরু হয়ে গেল ছাউনিতে। আমিও সেই তালে নবাবের ফরসি আর গলার একছড়া মুক্তোমালা নিয়ে ভেগে গেলাম। সঙ্গেই আছে। আমার খরিতায়। বহুত কিমতি চিজ। আপনাদের দেব।'

রামচাঁদের মুখপানে চেয়ে চোখ টিপে হাসি মুখে নবকৃষ্ণ বললেন, 'বুঝলে ভায়া রামচাঁদ আগেই বলেকয়ে নিচ্ছি। পরে যেন ভুল বোঝাবুঝি না হয়। ফরসি আমার। মুক্তোমালা তোমার।'

প্রত্যুত্তরে রামচাঁদ বলেন, 'আপনি আমার অগ্রজ। যা হুকুম করবেন তাই হবে। লেকিন এ তো মামুলি তোফা। এতে তো আমার মন ভরবে না। আপনার ভরবে কি?'

মাথা নেড়ে নবকৃষ্ণ বলেন, 'হক কথাই বলেছ। মুনির খাঁ আর একটু দরাজ দিল হলে আমাদের নসিবের চাকা ঘুরতে পারে।'

‘শরাব! আউর থোড়া শরাব।’ জড়ানো গলায় বলে মুনির খাঁ।

ক্ল্যারেটের আরও একটা বোতলের ছিপি খুলে মুনির খাঁর হাতে ধরিয়ে দেন রামচাঁদ।

নবকৃষ্ণ বলেন, ‘শুনেছি নবাবের ধনদৌলতের খতেন রাখতে তুমি। কথাটা সত্যি নাকি হে?’

‘সহি বাতই শুনেছেন।’

রামচাঁদ শুধোলেন, ‘হিরাঝিল প্রাসাদে কোথায় ছুপিয়ে রাখা আছে তোমার মনিবের দৌলত?’

গলায় মদ ঢালতে গিয়ে ক্ষণিকের জন্য থমকে যায় মুনির খাঁ। ঢুলু ঢুলু চোখে রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণকে একবার জরিপ করে।

রামচাঁদের দিকে চেয়ে চোখ টিপে নবকৃষ্ণ বলেন, ‘আরে এসব কী বলছ ভায়া রামচাঁদ? শুনেছিলাম তো সিরাজদ্দৌলা বেদৌলত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ধনদৌলত হিরাঝিল প্রাসাদে গোপনে গচ্ছিত থাকতে পারে কি? আর যদি থেকেও থাকে তা এতক্ষণে মিরজাফর খাঁ সাহেবের হস্তগত হয়েছে।’

বোতলের তলানিটুকু গলায় উপুড় করে দিয়ে মুনির খাঁ বলে, ‘ইয়ে ঝুট বাত। আপনারা কিচ্ছু জানেন না।’

কৌতূহলের সঙ্গে মুনির খাঁর মুখের উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নবকৃষ্ণ ও রামচাঁদ। ক্ষণিকের জন্য ছেদ পড়ে সংলাপে। নীচ থেকে ভসে আসছে ডিনার পার্টির হইহুল্লোড়ের শব্দ।

শূন্য বোতলটা ঠক করে মাটিতে নামিয়ে রেখে মুনির খাঁ জড়ানো গলায় বলে, ‘গোটা হিরাঝিল তজবিজ করলেও আমার মনিবের খাজানার হদিশ পাওয়া মিরজাফর খাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।’

‘ধনদৌলত তাহলে আছে বলছ?’ প্রশ্নটা ছুড়ে দিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে মুনির খাঁর মুখপানে চেয়ে থাকেন নবকৃষ্ণ। তাঁর চোখের পলক পড়ে না।

‘বেশক আছে।’

‘কী করে এত জোর দিয়ে বলছ ভায়া? পক্ষকাল হয়ে গেল ওই প্রাসাদের দখল নিয়েছেন মিরজাফর খাঁ। গোটা প্রাসাদের প্রতিটা পাথরের ফাঁকফোকর তজবিজ করে দেখা নবাবের পক্ষে কী এমন মুশকিলের ব্যাপার?’

‘মুশকিল তো বটেই। আমি মদত না দিলে ও দৌলতের হদিশ পাওয়া অসম্ভব।’

‘নেশার ঘোরে ফালতু বকছ না তো?’ প্রশ্ন করেন নবকৃষ্ণ।

মুনির খাঁ বেশ জোরের সঙ্গে বলে, ‘বিলকুল নেহি। ভুলভুলাইয়ার অন্দরে কোথায় সরাতে হবে ছোট্ট একটা পাথরের ফলক তা কী করে মালুম পাবে আনপড় আদমি? আর শুধু পাথর সরালেই তো হল না। দেওয়ালের গায়ে দেখা যাবে একটা চাবি ঢোকানোর ছিদ্র। তারপর খুঁজে বের করতে হবে চাবিটা। সে চাবি রাখা আছে ভুলভুলাইয়ার ভিতরে। অন্য একটা পাথরের আড়ালে। এসব কথা জানতেন নবাব সিরাজদ্দৌলা আর জানি আমি।’

নবকৃষ্ণ ও রামচাঁদ মুখ চাওয়াচাওয়ি করেন। দু’জনের মুখেই খেলে যায় চওড়া হাসি।

মুনির খাঁ এবারে গলা খাটো করে বলে, ‘লেকিন ইয়ে বাত আপনাদের মধ্যেই রাখবেন বাবুজি। আর কেউ যেন না জানতে পারে। ভুলভুলাইয়ার অন্দরে রয়েছে করিব চার কোটি টাকা।’

‘সাবাশ।’

অচানকই শূন্য ছাতের উপরে পিছন থেকে গম্ভীর গলার আওয়াজ শুনে চমকে ঘুরে তাকায় তিনজনেই। রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণ ত্রস্ত হয়ে ওঠে। মুনির খাঁ হতবাক। ছাতের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে আছেন ক্লাইভ। হাত দুটো কোমরে রাখা। ঠোঁটে গোঁজা পাইপ। সেই পরিচিত উদ্ধত ভঙ্গিমা।

রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণ দ্রুত ছুটে যান ক্লাইভের কাছে।

ক্লাইভ বলেন, ‘ওয়েলডান নবকিসেন। ওয়েলডান রামচাঁদ। আমি সব শুনেছি।’

ছাতে জ্বলতে থাকা মশালের আলোয় নবকৃষ্ণ ও রামচাঁদের চোখে পড়ে, খুশিতে ঝলমল করছে ক্লাইভের মুখটা। তাঁর দিকে কেমন যেন বোধশূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মুনির খাঁ। ধীরে ধীরে হেঁটে এসে তার মুখোমুখি দাঁড়ালেন ক্লাইভ। কর্নেলের মুখে লেগে আছে মৃদু হাসি। চোখের দৃষ্টি ধারালো ছুরির মতো তীক্ষ্ণ। কোমরের একদিকে ঝুলছে তলোয়ার, আরেকদিক থেকে ঝুলছে পিস্তল।

মুনির খাঁ ভয়ে কাঁপতে থাকে। মদের নেশা তার ছুটে গিয়েছে। সে বিলকুল মালুম পাচ্ছে নেশার ঘোরে গোপন কথা বলে ফেলে ফাঁদে পড়েছে।

ক্লাইভ বললেন, 'ডরো মাত। তোমাকে আমি জিন্দা ছেড়ে দেব। চাও তো কলকাতায় গিয়ে খুশ তবিয়তে থাকতে পার। লেকিন এক বাত। হিরাঝিল প্যালেসে কোথায় ছুপানো আছে দৌলত সেটা তুমি আমাকে দেখিয়ে দেবে।'

'জি হুজুর।'

ক্লাইভের চিঠিটা ভাঁজ করে পাশে রাখা শ্বেতপাথরের চৌপাইয়ের উপর রাখলেন নবাব মিরজাফর খাঁ। মুখটা ভয়ানক গম্ভীর। উলটোদিকে কুরসিতে মুখোমুখি বসে ওমর বেগ চেয়ে আছেন তাঁর মুখের দিকে। নবাবের মনের গতির আন্দাজ পাওয়ার কোশিশ করছেন। তুরন্ত জবাব চান কর্নেল ক্লাইভ। কী জবাব দেবেন মিরজাফর খাঁ? ঝড় বইছে ওমর বেগের মনে। কেননা বিষয়টায় জড়িয়ে আছে তারও স্বার্থ। খুশনসিবির হাতছানি। অর্থ প্রাপ্তির তামান্না। তবে ওমর বেগের মনের উমিদ এই যে কর্নেল ক্লাইভের প্রস্তাব ইনকার করার হিম্মত হবে না নবাবের।

মিরজাফরের কপালে ভাঁজ। নজর ভূমির দিকে। মনের মধ্যে ভয়ানক আফশোস। হিরাঝিল প্রাসাদের ভিতরেই লুক্কায়িত রয়েছে চার কোটি টাকা। সিরাজের ব্যক্তিগত ধনদৌলত। কোষাগারের হিসেবের জাবেদা খাতার বাইরের টাকা। পুরোটাই আত্মসাৎ করতে পারতেন মিরজাফর, অথচ তিনি এর হদিশই পেলেন না।

টাকার অভাবে ইদানীং চোখে অন্ধকার দেখছেন নবাব। ইংরেজদের দাবি অনুযায়ী প্রথম কিস্তি মিটিয়ে হাতে যা থাকবে, তা দিয়ে কী করে চলবে রাজ্যপাট, সৈন্যদের বকেয়া মেটাবেন কোথা থেকে? এ চিন্তায় মিরজাফর খাঁর ঘুম উড়েছে। ফৌজিরা বেতন না পেয়ে ক্ষোভে ফুঁসছে।

ওদিকে পাটনায় বসে বহাল তবিয়তে রাজ্যপাট চালাচ্ছেন নায়েব রামনারায়ণ। সিরাজদ্দৌলার অনুগত। মিরজাফর মসনদে বসলেন, অথচ রামনারায়ণ এখনও তাঁর প্রতি আনুগত্য জানালেন না। পাঠাননি নজরানা। রামনারায়ণের শক্তি কম নয়। ওদিককার জমিদারেরা সবাই তারই পক্ষে। রামনারায়ণকে টিট করার জন্য বড়সড় এক ফৌজ পাঠানোর দরকার পাটনায়। সেপাই-পেয়াদা-আহেদিদের পাওনাগণ্ডা না মিটিয়ে ফের পাটনা অভিযানের কথা তুললেই হয়তো তারা হল্লা করবে। বাগিপনা দেখাবে। তাদের এই বাগিপনায় মদত দেওয়ার জন্য অনেক বড় বড় মাথার যে অভাব হবে না, সেটা মিরজাফর ভালোই জানেন।

বেহাল কোষাগারের জন্য টান পড়ছে নবাবের ফূর্তি-আশরতেও। হারেমের খুবসুরতিদের শখ-শৌখিনতা, আহ্লাদ-আবদার মেটাতেও মোটা টাকার প্রয়োজন। এই খরচে রাশ টানতে বলেছেন দেওয়ান রায়দুর্লভ। মিরজাফর অসহায়। নবাবের হালত দেখে আড়ালে টিপ্পনী কাটছে হারেম-সুন্দরীরাও—নবাব হয়েছেন, অথচ নবাবগিরি ফলানোর মুরোদ নেই।

অথচ ঘরের মধ্যেই লুকোনো রয়েছে চার কোটি টাকা। আফশোস। ভয়ানক আফশোস। হিরাঝিলে লুকোনো খাজানার কথা কানাঘুষোয় শুনেছিলেন মিরজাফর। সিরাজের কাছ থেকে হয়তো জানা যেত এর হদিশ। অথচ তার সুযোগ কোথায় পেলেন তিনি। নির্বোধ মিরন তাঁর অজান্তেই কোতল করে বসল

সিরাজকে। হিরাঝিল প্রাসাদের লুকোনো সম্পদের কথা আর জানত মুনির খাঁ। নিজামতের অপদার্থ কাসিদরা সারা বাংলা তজবিজ করেও খুজে পেল না লোকটাকে। অথচ তার সন্ধান পেয়ে গেলেন ক্লাইভ।

একেই বলে বদ কিসমতি। যে দৌলতের সবটা তারই প্রাপ্য ছিল, সে দৌলত এখন ভাগ করে নিতে হবে ক্লাইভের সঙ্গে। ওমর বেগের সঙ্গে। তাঁর নিজের ভাগে কতটুকুই বা পড়বে। তবে সান্ত্বনা একটাই এই যে কোম্পানির বকেয়া বাবদ পুরো টাকাটাই দাবি করেননি ক্লাইভ।

যাই হোক, ক্লাইভের সঙ্গে টাকা ভাগ করে নেওয়াটা তবুও না হয় মেনে নেওয়া যায় কিন্তু টাকার ভাগ কেন দিতে হবে ওমর বেগকে? মন মানতে চাইছে না এই বন্দোবস্ত। কিন্তু কী করবেন মিরজাফর? প্রস্তাব দিয়েছেন স্বয়ং ক্লাইভ।

ওমর বেগের সঙ্গে ক্লাইভের সুসম্পর্কটা খুবই অল্প দিনের। এই মানুষটির প্রতি ক্লাইভের কৃতজ্ঞতা কম নয়। পলাশির যুদ্ধের আগে এক সংকটজনক মুহূর্তে মিরজাফরের সাক্ষর করা চুক্তিপত্র জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওমর বেগই চন্দননগরে পৌঁছে দিয়েছিলেন ক্লাইভের কাছে। তারপরই ইংরেজবাহিনী চন্দননগর ছেড়ে পলাশির দিকে এগিয়ে যায়।

মোরাদবাগ প্যালেসে বসে ক্লাইভের মুখ থেকে নিজের অর্থপ্রাপ্তির কথা শুনে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন ওমর বেগ। কর্নেলের হাতদুটো পাকড়ে ধরে আনন্দে কেঁদে উঠে বলেছিলেন, 'হুজুর আপনি খোশ-আখেলাক আশরফ আদমি। আল্লা আপনার ভালাই করুন।'

মুচকি হেসে ক্লাইভ বলেছিলেন, 'আমি আপনাকে বাড়তি কিছু দিচ্ছি না। ইউ ডিসার্ভ দিস।'

এরপর চিঠিটা ওমর বেগের হাতে দিয়ে ক্লাইভ বলেন, 'আই ওয়ান্ট কুইক রিপ্লাই।'

'বেশক। আমি আজই নবাবের জবাব আপনাকে পৌঁছে দেব।'

'হুশিয়ার থাকবেন। নবাব ছাড়া আর কেউ যেন এ ব্যাপারে কিছু জানতে না পারে।'

'জি হুজুর।'

'আর নবাবের উপর একটু নজর রাখবেন। তিনি নিজে যেন খাজানা তজবিজের আনজাম না করেন।'

মাথা ঝুকিয়ে ওমর বেগ ফের বলেন, 'জি হুজুর।'

খুশিতে ভাসতে ভাসতে তড়িৎ গতিতে বিদায় নেন ওমর বেগ। পাইপ মুখে ঘরের মধ্যে দিয়ে পায়চারি করতে করতে মুচকি হাসির রেখা ফুটে ওঠে ক্লাইভের মুখে। ওমর বেগকে টাকার লোভ দেখিয়ে দুটো কাজ এক সঙ্গে হাসিল করে নিলেন তিনি।

মিরজাফরকে না জানিয়ে তার প্রাসাদে তস্করের মতো ঢোকা যায় না। কেন যেতে চান হিরাঝিল প্যালেসে সেটা প্যালেসের মালিককে জানানো দরকার। তাছাড়া গভীর রাতে হিরাঝিল প্যালেসে প্রবেশ করার পিছনে তাঁর যে অন্য কোনও ফন্দি নেই সেটা স্পষ্ট করে দিলেন ক্লাইভ। নবাব যেন অন্য কিছু সন্দেহ না করেন।

চিঠিটা ক্লাইভ পাঠালেন ওমর বেগের হাত দিয়ে। হালফিলে মিরজাফরের বিশ্বস্ত লোক ওমর বেগ। তাঁকে প্রলুব্ধ করলেন গুপ্তধনের লোভ দেখিয়ে। নিজের স্বার্থেই কথাটা পাঁচ কান করবেন না ওমর বেগ। এটাই স্বাভাবিক। আর এই একই কারণে তিনি নজর রাখবেন মিরজাফরের উপরে, যাতে লুকোনো সম্পদ একাই আত্মসাৎ করার কোশিশ না করতে পারেন নবাব।

আরও একটা বিষয়ে ক্লাইভ নিশ্চিত এই যে, নবাব মিরজাফর খাঁ, এসব কথা কোনওমতেই অন্য কারও কাছে ফাঁস করবেন না। তাহলে উমেদারের সংখ্যা বেড়ে যাবে।

নীরবতা ভেঙে ওমর বেগের মুখপানে চেয়ে মিরজাফর শুধোলেন, 'কী করা যায় এখন?'

ওমর বেগ বললেন, 'কর্নেল ক্লাইভ তুরন্ত জবাব চেয়েছেন।'

'গদ্দার মুনির খাঁ।' অসহায় আস্ফালন করে উঠলেন মিরজাফর।

ওমর বেগ বললেন, 'ইয়ে সহি বাত। মুনির খাঁর জবান যদি সচ হয়, আউর করিব চার কোটি টাকা সচমুচ যদি পাওয়া যায়, তাহলে আপনার হাতেও আসবে সেই টাকার মোটা একটা অংশ। বকেয়া হিসেবে পুরোটাই চাইতে পারতেন কর্নেল। আপনি খারিজ করতে পারতেন না। ইকরারনামা মোতাবেক ইংরেজদের দাবি মেটাতে আপনি বাধ্য। কর্নেল আপনাকে ইমান দিয়েছেন। সিরাজদৌল্লার দৌলতের একটা ভাগ দিতে চাইছেন। এ বন্দোবস্ত মেনে নেওয়াই ভালো।'

ওমর বেগের কথায় মাথা নাড়িয়ে সায় দিলেন মিরজাফর। একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'বেশ কর্নেলকে জানিয়ে দিন। তিনি যা চাইছেন তাই হবে।'

জায়গায় জায়গায় বাতিদানে জ্বলছে অভ্রের আলো। আলোছায়ায় ঢাকা আঁকাবাঁকা পথ। কখনও সরু, কখনও প্রশস্ত। সে পথের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা শিরা-উপশিরার মতো ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। এ হল হিরাঝিল প্রাসাদের ভুলভুলাইয়া। এর অন্দরের নকশাটা মাথায় না থাকলে একবার ভিতরে ঢুকে বেরিয়ে আসা প্রায় দুঃসাধ্য।

রাত গভীর। সিরাজের তৈরি এই ভুলভুলাইয়ার অন্দরে পথ দেখাচ্ছে মুনির খাঁ। তার পিছনে নবাব মিরজাফর খাঁ ও ওমর বেগ। এঁদের পিছনে হেঁটে চলেছেন কর্নেল ক্লাইভ। তাঁর দুপাশে কোম্পানিরই অতি বিশ্বস্ত দুই দেশি কর্মচারী–মুনশি নবকৃষ্ণ ও দেওয়ান রামচাঁদ।

আলোআঁধারিতে মোড়া সর্পিল পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে কেমন যেন গা ছমছম করছে ক্লাইভের। অচানক কোনও বিপদ এসে হাজির হবে না তো? তিনি কি বড্ড বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেললেন না? ভুলভুলাইয়ার অন্দরে লুকিয়ে থাকা ঘাতকবাহিনী যদি অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে? না না। এতটা দুঃসাহস মিরজাফরের হবে না। মনকে প্রবোধ দেন কর্নেল। মানুষ চিনতে তাঁর ভুল হয় না। তবুও সাবধানের মার নেই। সতর্ক থাকাই ভালো। কোমরে ঝোলানো চামড়ার খাপ থেকে পিস্তলটা হাতে নিলেন ক্লাইভ।

পথ এমন ভাবে এঁকেবেঁকে ঘুরছে যে ক্লাইভের মনে হচ্ছে তিনি যেন একই জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছেন। বেশ কিছুক্ষণ পর সরু একটা পথের উপরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মুনির খাঁ।

২০

চৌকো চৌকো হলদে পাথরের খণ্ড পরপর গেঁথে তৈরি নিরেট দেওয়াল। দুই প্রস্তরখণ্ডের মাঝের বিভাজন রেখা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। দেওয়ালের একটা অংশের উপর নিবদ্ধ মুনির খাঁর দৃষ্টি। তার ডান হাতে ধরা দণ্ডের মাথায় জ্বলছে মশাল। সেই আলো গুপ্তধনের সন্ধানে আসা মানুষগুলোর অতিকায় ছায়া ফেলেছে দেওয়ালে। কাঁপছে আগুনের লালচে শিখা। দেওয়ালের গায়ে কাঁপছে ছায়ার মানুষ। যেন দোজখের একদল প্রেতাত্মা পৈশাচিক লালসা নিয়ে হাজির হয়েছে সিরাজের দৌলতের সন্ধানে।

মুনির খাঁ সামান্য এগিয়ে গিয়ে দেওয়ালের উপর ঝুঁকে পড়ে। মনে হয়, কিছু একটা খুঁজছে সে। যদিও এ জায়গা তার কাছে খুবই পরিচিত, তবুও সে ধন্দে পড়ে। দেওয়ালের গায়ে গাঁথা হাজার হাজার পাথরের খণ্ডের মধ্যে থেকে সুনির্দিষ্ট প্রস্তরখণ্ডটিকে কেবল চোখের নজরে চিনে নেওয়া সহজ নয়। চোখের পর্দায় ধরা পড়া ছবি ধোঁকা দেয় মনকে। ইনসানকে বেওকুফ বানানোর জন্য হরেক কিসিমের আনজাম রয়েছে এই ভুলভুলাইয়ার অন্দরে।

দেওয়ালের গায়ে আঙুল ছোঁয়ায় মুনির খাঁ। ক্লাইভের শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি দ্রুততর হয়। গুমোট ভ্যাবসা গরমে তিনি ঘেমে-নেয়ে একসা। লাল শাটিনের লং কোট ঘামে ভিজে স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে। কপাল থেকে টপ টপ করে ঘাম ঝরছে। ঘাম ঝরছে ঘাড় অবধি বিস্তৃত লম্বা চুল থেকেও। তবে শরীরের সব অস্বস্তি ক্লাইভের কাছে এখন তুচ্ছ।

নিজামতের কোষাগার ছেঁচে হতাশ হয়েছিলেন কর্নেল। এত বড় যুদ্ধ জয় হল, কুরসি বদল হল, কিন্তু বাংলা লুঠের কড়ি জেবের ভিতরে ঢুকল কোথায়। লুঠ করবেনই বা কী? নবাব যে প্রায় দেউলিয়া হয়ে গিয়েছেন। তবুও একটা খটকা ছিল ক্লাইভের মনে। গোপনে গচ্ছিত খাজানা কি কোথাও নেই? ভাগ্যদেবী এক্ষেত্রেও তাঁকে বঞ্চিত করেননি। আছে আছে! খাজানা আছে! মুনির খাঁ এর হদিশ জানে। তার জবানে যার মূল্য করিব চার কোটি টাকা।

রবার্ট ক্লাইভের মনে নতুন জোশ এনেছে এই গুপ্তধন প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা। প্রবল উত্তেজনায় তিনি কাঁপছেন। তাঁর দু'চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে মুনির খাঁর উপরে। হাতের কোমল স্পর্শে সে জরিপ করছে দেওয়ালের গায়ে গাঁথা পাথরগুলোকে। কিন্তু কেন?

মিরজাফরের মেদবহুল শরীরটা আইঢাই করছে গরমে। চোখ জ্বলছে মশালের আগুনের ধোঁয়ায়। মুনির খাঁর কাণ্ডকারখানা দেখে তিনি রীতিমতো বিরক্ত। করছে কী মুনির খাঁ? গুপ্তধনের হদিশ দেওয়ার নামে দেওয়ালের গায়ে নাজুক ভঙ্গিতে হাত বুলিয়ে চলেছে? এসব সকলকে উল্লু বানানোর তরিকা না তো? মতলবটা কী তার?

ওমর বেগ অবাক চোখে দেখছেন মুনির খাঁর কীর্তিকলাপ। তাঁর চোখের পলক পড়ছে না।

নবকৃষ্ণ ও রামচাঁদের দু'জোড়া চোখ বিস্ফারিত। মনে মনে তাঁরা স্মরণ করছেন ইষ্ট দেবতাকে। জয় গোবিন্দ! জয় রাধামাধব। জয় গোপীনাথ! মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো ঠাকুর।

ধমকের সুরে মুনির খাঁর উদ্দেশে মিরজাফর বলে ওঠেন, 'কেয়া কর রহা হ্যায়?'

ঘুরে তাকিয়ে নবাবকে তসলিম জানিয়ে মুনির খাঁ বলে, 'পাত্থর তালাশ করছি হুজুর।'

'পাত্থর? মতলব?'

মুনির খাঁ বলে, 'একটা পাত্থর আশপাশ কে পাত্থরোঁ কি তুলনা মে থোড়া চিকনা হ্যায়। স্রেফ চোখের নজরে আন্দাজ পাওয়া মুশকিল। হাথ কি স্পর্শ সে সামঝা যাতা হ্যায়।'

'বখওয়াস মাত করো। বেতমিজ কাঁহিকা।' ধমকে ওঠেন মিরজাফর।

ক্লাইভ ফোঁস করে ওঠেন, 'ডোন্ট ডিসটার্ব হিম।' কর্নেলের গলায় বিরক্তির সুর। চুপসে যান মিরজাফর।

'খাজানা কাঁহা হ্যায়? হোয়্যার ইজ দ্য ট্রেজার?' মুনির খাঁর উদ্দেশে প্রশ্ন করেন ক্লাইভ।

'দিবার কি পিছে। এক গুপ্ত কামরে মে।' এই বলে ফের কাজে মগ্ন হয়ে পড়ে মুনির খাঁ। সকলকে সহসা চমকে দিয়ে হাতের চাপে বিশেষ কায়দায় একটা চৌকো প্রস্তরখণ্ড দেওয়াল থেকে সে খুলে নেয়। উত্তেজনায় ও বিস্ময়ে সকলেরই শ্বাস প্রায় রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম।

মশালের আলোয় দেখা যায় দেওয়ালের গায়ে চাবি ঢোকানোর একটা ছিদ্রপথ। উল্লসিত হয়ে ওঠেন নবকৃষ্ণ ও রামচাঁদ। নেশার ঘোরে এমনই বলেছিল মুনির খাঁ। তাঁর ওই জবান কোনও ধোঁকাবাজি নয়। নবকৃষ্ণ আপনমনেই গুনগুন করে ওঠেন, 'হে কৃষ্ণ, করুণাসিন্ধু, দীনবন্ধু...!'

এবারে দেওয়ালের গায়ে হাত দিয়ে জরিপ করতে করতে সামনের দিকে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ফের থমকে দাঁড়ায় মুনির খাঁ।

'মশালটা একটু ধরবেন বাবুজি?'

দ্রুত এগিয়ে গিয়ে মুনির খাঁর হাত থেকে মশালটা নিলেন নবকৃষ্ণ। কিছুক্ষণ কসরত করার পর দু'হাত দিয়ে ফের আরেকটা প্রস্তরখণ্ড দেওয়াল থেকে খুলে নিয়ে তার আড়াল থেকে মুনির খাঁ বের করে আনে

প্রায় একবিঘত লম্বা লোহার চাবি। কর্নেল ক্লাইভের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মুনির খাঁ বলল, 'আসুন এবারে আপনাকে গুপ্ত কামরায় নিয়ে যাই।'

দেওয়ালের গায়ে ছিদ্রপথে চাবিটা গলিয়ে জোরে একটা মোচড় দেয় মুনির খাঁ। ঘড়াং করে একটা শব্দ হয়। বন্ধ ঘরের হুড়কো খোলার পরিচিত আওয়াজ। এবারে মুনির খাঁ দেহের সর্বশক্তি দিয়ে ঠ্যালা দেয় দেওয়ালের গায়ে। পাথরের দরজাটা ঘড়-ঘড়, ঘড়-ঘড় শব্দে খুলে যায়। মনহুস আওয়াজ। বুক কেঁপে ওঠে মিরজাফরের। ভুলভুলাইয়ার দেওয়ালে দেওয়ালে সেই আওয়াজ প্রতিফলিত হয়ে যেন একটা গোঙানির সৃষ্টি করে। কেউ যেন কেঁদে উঠল জহমতে, যন্ত্রণায়।

কক্ষটা বেশ বড়সড়। ভিতরে জমাট অন্ধকার। মশাল হাতে ভিতরে প্রবেশ করে রামচাঁদ। তার পিছনে নবকৃষ্ণ। এদের পিছনে ক্লাইভ, মিরজাফর ও ওমর বেগ।

মশালের আলোয় বিস্ফারিত চোখে ক্লাইভ দেখলেন ঘরের তিন দিকে দেওয়ালের গায়ে তাকের উপরে ও মেঝেতে সাজানো রয়েছে অনেকগুলো বড় বড় রুপোর কলসি। সবগুলো প্রায় একই আকারের। প্রত্যেকটার মুখে রয়েছে রুপোর ঢাকনা। ছুটে গিয়ে রামচাঁদের হাত থেকে জ্বলন্ত মশালের দণ্ডটা কেড়ে নিয়ে একটা কলসির মুখের ঢাকনা সরিয়ে ক্লাইভ দেখলেন, কলসি একেবারে মোহরে ঠাসা। খুশি ঝলকায় ক্লাইভের মুখে। তাঁর চোখের ইশারায় কাজে লেগে পড়েন রামচাঁদ, নবকৃষ্ণ ও ওমর বেগ।

দেখা গেল, সব কলসিই মোহরে ভরা। হিসেব নিকেষের ঝঞ্ঝাট নেই। একটা কলসিতে কত টাকার মোহর রয়েছে তার সহি আন্দাজ পেলেই সরল পাটিগণিতের নিয়মে বের করে নেওয়া যাবে কত টাকার সম্পদ রয়েছে ঘরে। ক্লাইভের হুকুমে একটা মোহরের কলসি পাথরের মেঝের উপরে উপুড় করে দেয় মুনির খাঁ। ঝনঝনাৎ ঝনঝনাৎ শব্দে স্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে যায়। মশালের আলোয় ঝলমল করে ওঠে সোনার হলদে রং।

সকলকে চমকে দিয়ে হঠাৎই সশব্দে হেসে ওঠেন ক্লাইভ। সে হাসিতে লোভ-লালসা চরিতার্থ হওয়ার সুর বড় কুৎসিত ভাবে বাজে। হাসি থামিয়ে মুনির খাঁর পিঠ চাপড়ে দিয়ে ক্লাইভ বলে ওঠেন, 'সবাশ। ওয়েলডান।'

চটপট এক কলসি মোহরের গোনাগুনতি সেরে ফেলেন নবকৃষ্ণ ও রামচাঁদ। দেখা যায় এক এক মোহরের বাজার মূল্য করিব বিশ হাজার টাকা। মুনির খাঁ একটু বাড়িয়েই বলেছিল। এই ঘরে যে পরিমাণ মোহর রয়েছে তার টাকার অংকে তার মূল্য দেড় কোটির বেশি হবে না। তাই বা কম কী? কর্নেল বলেছেন, এই খাজানার একটা ভাগ তাঁদের দেবেন। টাকা, প্রতিপত্তি, অনাস্বাদিত সুখের কল্পনায় মাসে ষাট টাকা বেতন পাওয়া কোম্পানির দুই নেটিভ কর্মচারী, নবকৃষ্ণ ও রামচাঁদ আবেগে ও আনন্দে চোখে জল এসে যায়।

ক্লাইভ এগিয়ে এসে নবকৃষ্ণ ও রামচাঁদের পিঠে হাত রাখেন।

শশব্যস্ত হয়ে তাঁরা ক্লাইভের পায়ে লুটিয়ে পড়েন।

ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসির রেশ নিয়ে ক্লাইভ বলেন, 'ইয়েস। ইয়েস। ইউ উইল বি অ্যাডেকোয়েটলি রেমুনারেটেড।'

আবেগের চোখের জল মুছে নবকৃষ্ণ বলেন, 'আপনিই আমাদের গোবিন্দ। আপনিই রাধামাধব। অন্তরের দেবতা। প্রাণের ঠাকুর। আমরা আপনার দাসানুদাস।'

ক্লাইভ বললেন, 'চলো এবারে যাওয়া যাক। আমাদের শেয়ারটা নবাব সেক্রেটলি মোরাদবাগে পৌঁছে দেবেন।'

ভোর হয়ে এল। ফিকে হতে শুরু করেছে আকাশের কালি। ঘুমিয়ে আছে মুর্শিদাবাদ-হিরাঝিল-মোরাদবাগের প্যালেস। কেবল পথের ধারের ঝাঁকড়া গাছগুলোতে জেগে উঠেছে পাখিরা। মোরাদবাগ প্যালেসের পাশে কোম্পানির সেনা ছাউনি থেকে কোম্পানির ঘড়িয়াল ঘণ্টা পিটিয়ে জানাচ্ছে ভোর চারটে বাজল। গত রাতে কী সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেল হিরাঝিল প্যালেসের ভুলভুলাইয়ার অন্দরে, মাত্র কয়েকজন ছাড়া আর কেউ জানতেও পারল না।

এই কাকভোরে মোরাদবাগ প্যালেস অভিমুখে চলেছে এক পর্দা ঢাকা ডুলি। সওয়ারিকে দ্রুত তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ডুলিবাহকেরা ব্যস্ততার সঙ্গে ছুটছে। সওয়ারি কর্নেল ক্লাইভ। চুপিসারে হিরাঝিল প্যালেস থেকে মোরাদবাগ প্যালেসে তিনি ফিরে চলেছেন। ডুলির খানিকটা পিছনে দ্রুত গতিতে হাঁটছেন রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণ।

হিরাঝিল প্যালেসে লুক্কায়িত গোপন সম্পদের সন্ধান ক্লাইভকে বলে দিয়ে নবাব মিরজাফর খাঁকে রুষ্ট করেছে মুনির খাঁ। নবাবের চোখে সে দেখেছে তার প্রতি তীব্র নফরতি। বাগে পেলেই মিরজাফর তাকে কোতল করবেন—একথা বিলক্ষণ বুঝতে পারছে মুনির খাঁ। কর্নেল ক্লাইভই এখন তার একমাত্র ভরসার স্থল। কর্নেল বলেছেন ইনাম দেবেন। কলকাতায় বসবাসের বন্দোবস্ত করে দেবেন। সেই আশায় নবকৃষ্ণ ও রামচাঁদের পিছনে খানিকটা তফাতে সেও হেঁটে চলেছে মোরাদবাগ প্যালেস অভিমুখে। দিন কয়েকের মধ্যেই নাকি শ'দুয়েক নৌকা মুর্শিদাবাদের দৌলত নিয়ে পাড়ি দেবে কলকাতায়। কর্নেলের কৃপায় একখানা নৌকোয় চড়ে বসতে পারলেই হল। মুনির খাঁর কাছে মুর্শিদাবাদ আর নিরাপদ নয়।

নবকৃষ্ণর দু'চোখে এখনও যেন ঘোর লেগে রয়েছে। একই অবস্থা রামচাঁদেরও। প্রায় অন্ধকারে অন্যমনস্ক হয়ে পথ হাঁটতে হাঁটতে মাঝে মধ্যেই হোঁচট খাচ্ছেন দু'জনে। হিরাঝিল প্যালেস থেকে ডুলিতে ওঠার আগে ইনাম বাবদ যে টাকা দেওয়ার কথা ক্লাইভ বলেছেন সেটা চমকে ওঠার মতো। এতটা তাঁরা স্বপ্নেও আশা করেননি। মাথা পিছু দ-শ লা-খ টাকা! হাঁ হয়ে গিয়েছিলেন রামচাঁদ। বিষম খাওয়ার জোগাড় হয়েছিল নবকৃষ্ণর। বলছেন কী কর্নেল! তারা ঠিক শুনছেন তো কানে?

সেই থেকে একের পর এক সুখের তসবির নেচে চলেছে নবকৃষ্ণর চোখের পর্দায়। কলকাতায় গিয়ে বিরাট একটা কোঠাবাড়ি হাঁকাবেন তিনি। গোবিন্দপুরের গোলপাতায় ছাওয়া জীর্ণ কুটির ছেড়ে পরিবারসহ চলে আসবেন নতুন কোঠাবাড়িতে। সুতানুটিতে যেখানে শোভারাম বসাক বাজার স্থাপন করেছেন, তার পাশেই চমৎকার বেশ কয়েক বিঘা জায়গা নবকৃষ্ণ মনে মনে পছন্দ করে রেখেছেন। আশপাশটা বেশ জমজমাট। কোঠাবাড়ি হবে, নাটমন্দির হবে, দেবালয় গড়বেন। প্রাণের ঠাকুর গোবিন্দদেবকে স্থাপন করবেন দেবালয়ে। এমন জাঁক করে দুর্গোৎসব করবেন যে তামাম কলকাতা হাঁ হয়ে যাবে। ক্রমশ জলুস হারাচ্ছে মুর্শিদাবাদ। আগামী দিনে রাজধানী শহর হয়ে উঠবে কলকাতা। একথা দিব্যি বুঝতে পারছেন নবকৃষ্ণ। কড়ির জোরে তিনি সেই কলকাতায় হিন্দুসমাজের মাথা হয়ে উঠতে চান। সমাজ চলবে তার অঙ্গুলিহেলনে। হিন্দুসমাজের কর্তা হিসেবে যে জায়গাটা এখন দখল করে আছেন নদিয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র, সেই জায়গাটা দখল করবেন তিনি। হয়ে উঠবেন কলকাতার অলিখিত রাজা। কেউ কেউ হয়তো বলবে ডাকাতি করে বিত্তবান হয়েছেন নব মুনশি। বলুক। তাতে নবকৃষ্ণর কিছু এসে যায় না। সোজা পথে চলে এ দুনিয়ায় কেই বা কবে বিত্তবান হয়েছে।

হঠাৎই বুনো ঝোপ ভেদ করে ছুটে এসে পথ অতিক্রম করল বিরাটাকৃতির একটা দাঁতাল শুয়োর। শিউরে উঠলেন নবকৃষ্ণ ও রামচাঁদ। একেবারে সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত। ছুটে এসে ঢুঁ মারলে একেবারে এফোঁড়ওফোঁড় করে দিত। এই চমক কাটিয়ে ওঠার আগেই ফের শিহরন। নবকৃষ্ণ ও রামচাঁদের কানে ভেসে এল একটা গুলির শব্দ। খুবই পরিচিত আওয়াজ। গোরা পল্টনদের হাতিয়ার ফ্লিন্টলক রাইফেল থেকে গুলি ছোড়ার শব্দ। সেই সঙ্গে পিছন থেকে ভেসে এল মানব কণ্ঠের তীব্র আর্তনাদ। মুনির খাঁর গলার আওয়াজ। নবকৃষ্ণ

ও রামচাঁদ চমকে গিয়ে পিছন ঘুরে তাকিয়ে দেখেন পথের উপর লুটিয়ে পড়েছে মুনির খাঁ। ছুটে গিয়ে তার উপরে ঝুকে পড়লেন নবকৃষ্ণ ও রামচাঁদ। মাটি ভেসে যাচ্ছে উষ্ণ রক্তে। মুনির খাঁর চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বুলেট বিদ্ধ হয়েছে তার পিঠে।

মুনির খাঁ কোনও রকমে বলে, 'আমি গদ্দার বাবুজি। মনিবের দৌলত আমি তুলে দিলাম তার দুশমনদের হাতে। এই ইনামই আমার পাওয়ার কথা। আল্লা রহেম করুন আ–' কথা শেষ করতে পারল না মুনির খাঁ। দেহটা নিথর হয়ে গেল। নবকৃষ্ণ ও রামচাঁদের কানে সহসা ভেসে এল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। সে আওয়াজ নিমেষে মিলিয়ে গেল দূরে। নবকৃষ্ণ ও রামচাঁদ বুঝলেন কাজ সমাধা করে পালিয়ে গেল ঘাতক।

গুলির শব্দে শিহরিত চিড়িয়ার দল ডানা ঝাপটে পাক খাচ্ছে আকাশে। অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে কর্নেলের ডুলি। পথে পড়ে থাকল মুনির খাঁর নিষ্প্রাণ দেহ। মোরাদবাগ প্যালেসের সদর দেউড়ি খুব দূরে নয়। সেই অভিমুখে ছুটতে শুরু করেন নবকৃষ্ণ ও রামচাঁদ। দুজনের মনের মধ্যে তখন পাক খাচ্ছে একই ভাবনা —'যাক! আপদ বিদায় হল।'

গতাসু হয়েছেন ময়মনসিংহের জমিদার শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী। পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন হয়েছে, তা প্রায় পক্ষকাল হয়ে গেল। বিশাল জমিদারির উত্তরাধিকার বর্তেছে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণকিশোরের উপর। পঁয়ত্রিশ বছরের যুবক কৃষ্ণকিশোরের কাঁধে আচমকাই এসে পড়েছে বিশাল দায়িত্ব। একদিকে বিধবা মা, কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণগোপাল ও অজস্র জ্ঞাতি, আত্মীয়স্বজন নিয়ে বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের দায়ভার ও অন্য দিকে বিশাল এলাকা দেখভাল করা—এই দুই নিয়ে হঠাৎই ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কৃষ্ণকিশোর। প্রাতরাশ সেরে সেরেস্তায় বসে খাজনা আদায় বিষয়ে দেওয়ানের কাছ থেকে খোঁজখবর নিচ্ছিলেন তিনি। হিসেবের খাতায় চোখ বুলিয়ে দেখেন, ব্যায় দিনকে দিন বেড়েই চলেছে সেই তুলনায় আদায়পত্তর আশাপ্রদ নয়।

কৃষ্ণকিশোরের ভ্রু-যুগল কুঞ্চিত। কৈফিয়ৎ চেয়ে ডেকে পাঠিয়েছেন দেওয়ানকে।

কৃষ্ণগোপালের সামনে জোড়হাত হয়ে দাঁড়িয়ে দেওয়ান শিবনারায়ণ বললেন, 'হুজুর গত বছরখানেক ধরে দেশ অশান্ত, তার উপরে বড়কর্তামশায় ছিলেন সিরাজদ্দৌলা ও দেওয়ান মোহনলালের ঘনিষ্ঠ। হাওয়া ওই শিবিরের পক্ষে প্রতিকূল বুঝে কাজে ঢিল দিয়েছিল কর্মচারীরা। তাই খাজনা আদায়ে কিছুটা ফাঁকি পড়েছে। এখন সব ফয়সালা হয়ে গিয়েছে। মিরজাফর খাঁ মসনদে বসেছেন। আপনি নতুন নবাবের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে এসেছেন। এবারে দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।'

এই উত্তরে খুব একটা সন্তুষ্ট হলেন না কৃষ্ণকিশোর।

সহসা এই বৈষয়িক আলোচনায় ছেদ পড়ল। ভৃত্য এসে জানাল, 'রাজাবাবু এক সন্ন্যাসী আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। বলছেন, আপনার বাবামশায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল।'

'বাবামশায়ের পরিচিত?' কৃষ্ণকিশোরের ভ্রূযুগল ফের কুঞ্চিত হয়।

'তাই তো বললে।'

সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি কৃষ্ণগোপালের ভক্তি শ্রদ্ধা বরাবরই খুব বেশি। তার উপরে বিশেষ একটি সমস্যা ছায়া ফেলেছে গোটা পরিবারের উপরে। সময়টা ভালো যাচ্ছে না। কৃষ্ণকিশোরের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন চঞ্চল হয়ে উঠল। হঠাৎ এক সন্ন্যাসীর আগমনের হেতু কোনও দৈব অনুগ্রহ নয়তো? হিসেবের খাতা বন্ধ করে দেওয়ানকে বললেন, 'আপনি এখন আসুন। খাজনা আদায় বিষয়ে পরে আলোচনা করব আপনার সঙ্গে।'

'যে আজ্ঞে।' শিবনারায়ণ যেন হাফ ছেড়ে বাঁচল।

ভৃত্যের উদ্দেশে কৃষ্ণকিশোর বললেন, 'সন্ন্যাসীকে এখানেই নিয়ে এসো।'

খানিকবাদে কৃষ্ণকিশোরের সমুখে এসে দাঁড়ালেন সন্ন্যাসী। মাথায় জটা। মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। গৌরবর্ণ দেহ। সুন্দর দুই চোখে দিব্যভাব প্রকট। সন্ন্যাসীর এক হাতে ত্রিশূল, আরেক হাতে কমণ্ডলু। পরণে রক্তবর্ণের ধুতি। কাঁধের দুপাশ থেকে ঝুলছে লাল উত্তরীয়। লোমশ বুক। পেশিবহুল শক্তসমর্থ চেহারা। মানুষটি দীর্ঘদেহী। চেহারার মধ্যে রয়েছে প্রখর ব্যক্তিত্বের ছাপ।

আসন ছেড়ে উঠে এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করেন কৃষ্ণকিশোর।

তাঁকে আশীর্বাদ করে সন্ন্যাসী বলেন, 'দীর্ঘজীবী হও বাবা। চিরসুখী হও।'

'আপনি?'

'তুমি চিনবে না আমাকে। তোমার পিতৃদেবের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। এখানে এসে শুনলাম তিনি গত হয়েছেন।'

'হ্যাঁ। মাস দেড়েক হল সন্ন্যাস রোগে হঠাৎই তিনি—তা আপনি কোত্থেকে আসছেন?'

'কাশী আমার সাধনপীঠ। লোকে আমাকে মহানন্দ স্বামী বলে জানে। একটি বিশেষ প্রয়োজনে আমি তোমার কাছে এসেছি।'

'বেশ তো। পরে শুনব আপনার কথা। আগে স্নানাহার করুন। বিশ্রাম নিন।'

'না বাবা। হাতে সময় আমার কম। কাজের কথাটা সেরেই আমি চলে যাব।'

ফরাসের উপরে উপবিষ্ট হলেন সন্ন্যাসী। তাঁর মুখোমুখি বসলেন কৃষ্ণকিশোর।

ভৃত্য এসে পাথরের গেলাসে করে বেলের শরবত দিয়ে গেল। সঙ্গে পিতলের রেকাবিতে ফল ও মণ্ডা। সত্যিই ক্ষুধার্ত ছিলেন মহানন্দ স্বামী। নিমেষে ফলভর্তি রেকাবি শূন্য করে দিলেন। এক চুমুকে শরবত শেষ করে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমি বর্তমানে তোমারই জমিদারির অন্তর্ভুক্ত আমহাটি গ্রাম থেকে আসছি।'

'আমহাটি? সে তো অনেক দূর। এতটা পথ পায়ে হেঁটে এলেন?'

মুচকি হেসে মহানন্দ বললেন, 'পদব্রজেই তো সন্ন্যাসীকে ভ্রমণ করতে হয়।'

'বলুন আপনার কী সেবা করতে পারি?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'আমহাটি নিবাসী বিনোদ রায় আমার বিশেষ পরিচিত। পূজারি ব্রাহ্মণ। খুবই দরিদ্র মানুষ। অত্যন্ত সুলক্ষ্মণযুক্ত একটি শিশুপুত্রকে দেখলাম তার গৃহে। নাম শ্রীমন্ত। বিনোদের দ্বিতীয় পুত্র। রাজা হওয়ার যোগ আছে ছেলেটির হাতে।'

কৃষ্ণকিশোর গভীর মনোযোগের সঙ্গে চেয়ে আছেন মহানন্দ স্বামীর মুখপানে। কী বলতে চাইছেন সন্ন্যাসী, তার আন্দাজ পাওয়ার চেষ্টা করছেন।

সন্ন্যাসী বলে চললেন, 'বিনোদের অভাবের সংসার। বড় কষ্ট। শিশুপুত্রটির যত্নাত্তি করতে পারে না ঠিক মতো। কোথা থেকে কীই বা করবে সে? দু'বেলা যে তাদের ভালো করে আহারই জোটে না। কী যে সুদর্শন শিশুপুত্রটি, তুমি চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবে না। অবিকল যেন যশোদানন্দন। কোনও বিত্তবান মানুষ যদি শিশুপুত্রটিকে দত্তক নেয় তবে খুবই উপকৃত হবে বিনোদ। তোমার পিতৃদেবের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল জেনে আমার কাছে বিনোদ তার মনের বাসনা খুলে বলেছে। আমারও বড় মায়া পড়ে গিয়েছে শিশুটির উপরে। কোনও বড় বংশে লালিতপালিত হলে একদিন সে সেই বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তোমার পিতৃদেব বেঁচে থাকলে তার কাছেই আমি দরবার করতাম।'

সন্ন্যাসী এবারে কৃষ্ণকিশোরের হাত দুটি ধরে বলেন, 'যদি তুমি শিশুটিকে দত্তক নাও তো খুবই খুশি হব।'

কৃষ্ণকিশোর সন্ন্যাসীর চরণ স্পর্শ করে আবেগতাড়িত গলায় বলে ওঠেন, 'এ নির্ঘাৎ দৈব আশীর্বাদ। আপনি সাক্ষাৎ মহেশ্বরের দূত। না হলে যে বিষয়ে ভেবে ভেবে আমরা আকুল হয়ে পড়েছি, তার সমাধান সূত্র নিয়ে আপনি হঠাৎ এ ভাবে হাজির হবেন কেন?'

'সত্যিই শিশুপুত্রটিকে দত্তক নিতে চাও তুমি?' মহানন্দ স্বামীর কণ্ঠে উপচে পড়ে খুশি।

২১

মহানন্দ স্বামীর প্রশ্নের জবাবে কৃষ্ণকিশোর বললেন, 'আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণগোপালের দু-দু'বার বিবাহ হয়েছে। কিন্তু কী বলব, বলুন—অদৃষ্টের পরিহাস। কোনও পক্ষেই কৃষ্ণগোপালের কোনও সন্তানাদি হয়নি। আমার মাতৃদেবী খুবই দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। আমার ভ্রাতার মনেও কোনও সুখ নেই। আমার দুই কন্যা। কোনও পুত্রসন্তান নেই। বংশের উত্তরাধিকার কে অক্ষুণ্ণ রাখবে এই প্রশ্নে আমরা সকলে বর্তমানে খুবই বিচলিত।'

মহানন্দ বললেন, 'পরমেশ্বর করুণাময়। এ বোধ করি তাঁরই ইচ্ছা। তাই তোমাদের এই পারিবারিক সংকটের কালে সমাধানসূত্র নিয়ে আমার এখানে হাজির হওয়া। জয় শিবো শম্ভু।'

কৃষ্ণকিশোর উচ্ছ্বসিত গলায় বলে ওঠেন, 'নিশ্চিত তাই। আপনার যদি অমত না থাকে তো আমার ভ্রাতা কৃষ্ণগোপাল বালকটিকে দত্তক নিতে পারে।'

'বাঃ চমৎকার!'

'কত বয়স হবে বালকটির?' শুধোলেন কৃষ্ণকিশোর।

'বছর পাঁচেক।'

কৃষ্ণকিশোর প্রবল উৎসাহের সঙ্গে বলেন, 'আমার মাতৃদেবীকে বিষয়টি অবিলম্বে জানানো দরকার। তিনি খুবই খুশি হবেন।'

'তোমার ভ্রাতা কৃষ্ণগোপাল নারাজ হবেন না তো?'

'সে আমাকে পিতার ন্যায় মান্য করে। আমার সিদ্ধান্তে কখনোই সে অমত করবে না।'

মহানন্দ স্বামী খুশি হয়ে বললেন, 'আমাকে তুমি পরম আশ্বস্ত করলে বাবা। পরমেশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন। বিনোদের বড়ই উপকার হল। তেমন আতান্তরে না পড়লে নিজপুত্রকে দত্তক হিসেবে অন্যের হাতে কেউ তুলে দিতে চায়? বিনোদ বড় সৎ চরিত্রের মানুষ। সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ। ওর পরিবারটিকে তুমি দেখো।'

কৃষ্ণকিশোর করজোড়ে বলেন, 'আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। এখন থেকে বিনোদ রায় ও তাঁর পরিবারের দেখভালের দায় আমার। আমি কালই আমার ভ্রাতাকে সঙ্গে নিয়ে আমহাটির উদ্দেশে রওনা হব। সাড়ম্বরে বালকটিকে নিয়ে আসব রাজবাটিতে। আগামী ঝুলনযাত্রার দিন দত্তক গ্রহণের অনুষ্ঠান হতে পারে।'

'অতি উত্তম।'

'তাহলে আপনি আজ এখানেই নিশিযাপন করুন। কাল আমাদের সঙ্গেই না হয় আমহাটি যাবেন। বিনোদ রায়ের গৃহটি চিনিয়ে দেবেন। তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন।'

মহানন্দ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'না বাবা। তা সম্ভব নয়। আমি এখনই বিদায় নেব। আমার কার্য সমাপ্ত হয়েছে। আমার উপস্থিতি এখন নিষ্প্রয়োজন। আমার এক শিষ্য বসন্তলাল আগামীকাল প্রত্যুষে এখানে আসবে। সেও বিনোদের পরিচিত। সেই তোমাকে আমহাটিতে বিনোদ রায়ের গৃহে নিয়ে যাবে। তাঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবে।'

কৃষ্ণকিশোর তবু মরিয়া হয়ে বলেন, 'কোনওভাবেই কি একটি রাত এখানে কাটানো আপনার পক্ষে সম্ভব নয়? আপনার সেবা করার কোনও সুযোগই তো দিলেন না।'

'আমার প্রস্তাবে তুমি রাজি হয়েছ এতেই আমি পরম তুষ্ট। আসলে কোনও গৃহীর গৃহে নিশিযাপনের বিষয়ে আমার গুরুর নিষেধ আছে।' এই বলে সন্ন্যাসী উঠে দাঁড়ালেন।

কৃষ্ণকিশোরও শশব্যস্ত হয়ে গাত্রোত্থান করে বললেন, 'আপনি সাধক মানুষ। আপনাকে ধরে রাখার সাধ্য আমার নেই। নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে আপনার দর্শন পাব।'

'সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কথা দিতে পারি না।'

'সে কী? দত্তক-গ্রহণ অনুষ্ঠানের দিন আপনি আসবেন না?'

মৃদু হেসে নিরাসক্ত গলায় মহানন্দ স্বামী বললেন, 'পরমেশ্বর যদি ইচ্ছে করেন তো আসব।'

আবদারের সুরে কৃষ্ণকিশোর বললেন, 'সেদিন কিন্তু আসতেই হবে আপনাকে। কোনও ওজর-আপত্তি শুনব না। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আশীর্বাদ করে যাবেন।'

'বললাম তো, পরমেশ্বর যদি ইচ্ছে করেন তবে আসব। তবে একটা কথা জেনে রেখো, আমি আসি বা না আসি, বালক শ্রীমন্তের প্রতি আমার স্নেহাশীর্বাদ আজীবন থাকবে। গৃহত্যাগী সাধক মহানন্দ স্বামীকে যে বালক মায়ায় আচ্ছন্ন করতে পারে সে তো সামান্য কেউ নয়।'

এই বলে দৃঢ় পদক্ষেপে কৃষ্ণকিশোরের সেরেস্তা থেকে বেরিয়ে গেলেন মহানন্দ স্বামী। সেদিকে ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে অস্ফুট স্বরে কৃষ্ণকিশোর বলে উঠলেন, 'জয় শিবো শম্ভু।'

চারিদিকে বড় বড় গাছপালা মাথা তুলে আছে। জমিতে বুনো ঘাস, লতাগুল্ম ও কাঁটাঝোপের উচ্ছৃঙ্খল বিস্তার। সূর্যের আলো এখানে পাতার ফাঁকফোকর দিয়ে চুরি করে ঢোকে। ঘন সবুজের বুক চিরে সরু একফালি পাথুরে পথ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে গিয়েছে। তবে মাঝেমধ্যেই সে পথের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে অবরোধ তুলেছে কোমর সমান লম্বা ঘাস। ওই পথে চলাচল করা কষ্টসাধ্য। তার উপরে আছে বুনো জন্তুর ভয়। কৃষ্ণপুর সংলগ্ন এই গভীর অরণ্যে মানুষ সচরাচর প্রবেশ করে না।

এই অরণ্যের মধ্যে পাশাপাশি দু'টি অশ্বত্থ গাছের নীচে খানিকটা এলাকা জুড়ে ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করেছে কেউ। মাটিতে দৃশ্যমান আগুনের দাগ। একদিকে রয়েছে কিছু পোড়া কাঠ, পাথরের খণ্ড পাশাপাশি সাজিয়ে তৈরি করা একটি চুলা। চুলার পাশে পড়ে আছে স্তূপীকৃত সদ্য কেটে আনা গাছের ডালপালা। ভবিষ্যতে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এর খানিকটা দূরে রয়েছে শুকনো পাতায় ছাওয়া ছোট্ট একটি ঝুপড়ি। অশ্বত্থ গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে রাখা দু'টি ইরানি ঘোড়া নাগালের মধ্যে থাকা লতাগুল্ম সাবাড় করে চলেছে।

ঝুপড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে বাসুদেব। তার কোমর বন্ধনী থেকে ঝুলছে ছোরা। হাতে ধরা বল্লমটা অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় মাটিতে গেঁথে রেখে দ্রুত গাছের মাথায় উঠে পড়ে বাসুদেব। গাছের পাতার ফাঁক

দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দূরে। সবুজের আড়াল ঠেলে খুব বেশি দূর বাসুদেবের চোখে দৃশ্যমান হয় না। তবুও যতটা দেখা যায়, সেদিকে চেয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে বাসুদেব। দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে। এখনও মানুষটার দেখা নেই। কোনও বিপদে পড়লেন না তো?

হঠাৎ একটা শব্দ শুনে নীচের দিকে তাকিয়ে বাসুদেবের হাড় হিম হয়ে যায়। বিরাট একটা গোখরো সাপ শুকনো পাতার উপর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে ঘোড়া দুটোর দিকে। একেবারে সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত। শিউরে ওঠে বাসুদেব। বাঁধা রয়েছে ঘোড়া দুটি। এই ভয়ংকর সরীসৃপের নাগাল এড়িয়ে দ্রুত সরে যেতে পারবে না। এ সাপের এক ছোবলে মৃত্যু অবধারিত।

বাসুদেব ব্যস্ততার সঙ্গে দ্রুত গাছ থেকে নামতে থাকে।

ঘোড়া দুটি নিবিষ্ট মনে মাথা ঝুঁকিয়ে ঘাস খেয়ে চলেছে। সাপটা এগোচ্ছে শম্বুক গতিতে। সহসা চঞ্চল হয়ে ওঠে ঘোড়া দু'টি। বিপদের আঁচ পেয়ে চিঁ-হি-হি-হি করে ডেকে ওঠে তারা। একটি ঘোড়া সামনের পা দুটি তুলে দু'পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে পড়ে।

লাফ দিয়ে নীচে নেমে বাসুদেবের দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। ফণা তুলেছে সাপটি। পা তুলে দাঁড়িয়ে পড়া ঘোড়াটির পিছনের একটি পা ফণার প্রায় নাগালের মধ্যে। নিমেষে বল্লমটা তুলে নেয় বাসুদেব। ঠিক তখনই এই গহীন অরণ্যের নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে যায় পিস্তলের আওয়াজে।

গুড়ুম!

একেবারেই অপ্রত্যাশিত এই গুলির আওয়াজে ভয়ানক চমকে ওঠে বাসুদেব। হাত থেকে বল্লম খসে যায়। চমকিত হয়ে গাছের নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে ডানা ঝটপটিয়ে আকাশে উড়তে থাকে একগাদা পাখি। গুলির শব্দে ত্রস্ত ঘোড়া দুটি চেঁচিয়ে ফের ডেকে ওঠে– চিঁ-হি-হি-হি। বুনোফুলের সুবাসে ভরা বাতাস সহসা বারুদের গন্ধে ভারী হয়ে ওঠে।

বাসুদেব স্তম্ভিত। অব্যর্থ লক্ষভেদ। গুলিটা লেগেছে ঠিক সাপের মাথায়। নিষ্পন্দ হয়ে পড়ে রয়েছে সরীসৃপটি। গুড়িয়ে গিয়েছে মাথা। কে ছুড়ল গুলি? এদিকে ওদিকে অবাক চোখে তাকিয়ে মানুষটিকে খুঁজতে থাকে ত্রস্ত বাসুদেব।

সহসা বুনো ঝোপের আগল ঠেলে বেরিয়ে আসেন মহানন্দ স্বামী। হাতে পিস্তল।

পরম স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে বাসুদেব বলে, 'হুজুর আপনি! আমি ভাবলাম অন্য কেউ বোধ হয় এই আস্তানার হদিশ জেনে ফেলেছে।'

মহানন্দ স্বামী নামে সন্ন্যাসীর বেশধারী এই মানুষটি হলেন, সুবে বাংলার ভূতপূর্ব দেওয়ান মোহনলাল। সিরাজদ্দৌলার জিগরি দোস্ত। জিন্দা যাঁকে গ্রেফতার করতে পারলে স্বস্তি পাবেন রবার্ট ক্লাইভ। গ্রেফতারকারীকে মোটা ইনাম দেবেন মিরজাফর। মোহনলালের মাথার দাম এখন অনেক। বর্তমানে তার খোঁজে উত্তর থেকে দক্ষিণ, গোটা বাংলা তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে নিজামতের কাসিদরা।

পলাশির প্রান্তর থেকে পালিয়ে এসে নিজামতের গুপ্তচরদের চোখে ধুলো দিয়ে সুবে বাংলার বিভিন্ন জায়গা ঘুরতে ঘুরতে বোকাইনগরের কাছে কৃষ্ণপুরের এই জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছেন মোহনলাল ও তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর বাসুদেব।

মুর্শিদাবাদ থেকে পালিয়ে আসার সময় মোহনলাল তার বহেন হিরা ও সিরাজদ্দৌলার অবৈধ পুত্রসন্তান শ্রীমন্তলালকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। পুত্রকে কোলছাড়া করতে বুক ফেটে গিয়েছিল হিরার।

মাত্র কয়েকজন ছাড়া তামাম দুনিয়া অবশ্য মোহনলালের সন্তান হিসেবেই শ্রীমন্তলালকে জানে। শ্রীমন্তলালও তাই জানে। সে মোহনলালের পুত্র। হিরা, তার মা নয়, বুয়া। এছাড়া শ্রীমন্তলাল আরও শুনেছে,

তার জন্মের সময় মৃত্যু হয়েছে তার মায়ের। হিরাবুয়াই বুকভরা ভালোবাসা দিয়ে তাকে লালন করেছে।

পাঁচ বছরের একটি বালককে সঙ্গে নিয়ে বনেজঙ্গলে দীর্ঘকাল আত্মগোপন করে থাকা সম্ভব নয়। এই কঠিন জীবনযাপনের ধকল কী করে সইবে একটি শিশু! বোকাইনগরের পরিত্যক্ত দুর্গ থেকে শ্রীমন্তলালকে নিয়ে আমহাটি গ্রামে পালিয়ে যায় বাসুদেব। বাসুদেব ও মোহনলালের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রীমন্তলাল আশ্রয় পায় বাসুদেবের কাকা বিনোদ রায়ের গৃহে।

সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ বিনোদ রায় শুধিয়েছিলেন, 'কে এই বালক? কী তার পরিচয়?'

বাসুদেব অকম্পিত কণ্ঠে জবাব দেয়, 'ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান। অনাথ বালক। নদীর ঘাটে ভিক্ষা করছিল। মায়া লাগল। নিয়ে এলাম।'

কিছুটা দূরে বসতবাটি সংলগ্ন আমবাগানে একটি ছাগশিশুকে নিয়ে খেলায় ব্যস্ত শ্রীমন্তলালের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আবেগজড়িত গলায় বিনোদ রায় বলে ওঠেন, 'এই বালককের চোখদুটির দিকে তাকালে মায়া হওয়াই স্বাভাবিক। অবিকল যেন যশোদানন্দন। সেই মুখ। সেই চোখ।'

'যথার্থ বলেছেন। আপনার গৃহে কিছুদিন বালকটিকে আশ্রয় দিতে হবে খুড়োমশায়।'

বিনোদ রায় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন, 'বলছ ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান– আমার সঙ্গতি থাকলে বালকটিকে আমি দত্তক নিতাম। কিন্তু তুমি তো জান, আমার অভাবের সংসার। নিজেদেরই নিত্যদিন ভালোমতো আহার জোটে না। এই বালকের দায়ভার বহন করা আমার পক্ষে কি—।'

খুড়োমশায়কে বাধা দিয়ে মরিয়া গলায় বাসুদেব বলে, 'আপনি অনুগ্রহ করে কিছুকালের জন্য আশ্রয় দিন। কোনও সহৃদয় মানুষ যাতে ছেলেটিকে দত্তক নেয় আমি সেই প্রচেষ্টা করছি।'

'কিন্তু কের এর বাপ–মা? কোথায় এর নিবাস? এসব কিছুই কি তোমার জানা নেই?'

'না খুড়োমশায়। তা যদি জানা থাকত তো আপনার কাছে গোপন করব কেন? শুধু বালকটির গলায় পইতে দেখে বুঝেছি ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান।'

'বেশ। ওকে রেখে যাও এখানে। তুমি আমার সন্তানতুল্য। তোমার আবদার উপেক্ষা করি কী করে?'

'আর একটা কথা খুড়োমশায়। আর পাঁচজনের কাছে বালকটিকে আপনার সন্তান হিসেবেই পরিচয় দেবেন।'

একথা শুনে অবাক চোখে বাসুদেবের মুখপানে চাইলেন বিনোদ রায়।

মাথা ঝুঁকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বাসুদেব বলে, 'আমার অপরাধ মার্জনা করবেন খুড়োমশায়। উপযুক্ত বংশ-পরিচয় না থাকলে ছেলেটিকে কোনও বড় বংশের কেউ দত্তক নিতে চাইবে না। বালকটির ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে আমার এই অনুরোধটাও কিন্তু আপনাকে রাখতে হবে।'

'এ যে বড় কঠিন পরীক্ষার মধ্যে আমাকে ফেললে হে।'

জেবের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে গোটা পাঁচেক মোহর বের করে বিনোদ রায়ের হাতে দিয়ে বাসুদেব বলে, 'এগুলো রাখুন। আপনার অর্থের প্রয়োজন হবে।'

বিনোদ রায় মৃদু হেসে বলেন, 'ওসব তোমার কাছেই রেখে দাও। যাকে যশোদানন্দনের আসনে বসিয়েছি তার সেবায় তোমার এই দরিদ্র খুড়োমশায়ের কোনও ত্রুটি হবে না। রাজভোগ না পারি ছেলেটির জন্য দু'বেলা দু'মুঠো শাকান্নের সংস্থান নিশ্চই আমি করতে পারব।'

'আমার ঔদ্ধত্য মার্জনা করবেন।' লজ্জিত হয়ে খুড়োমশায়ের চরণধুলি নিয়ে মাথায় ঠেকিয়েছিল বাসুদেব।

শ্রীমন্তলালের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় বাসুদেবের দু'চোখে জল ছলছল করে উঠেছিল।

বাসুদেব বলে, 'আমি আসি শ্রীমন্ত। ভালো হয়ে থেকো।'

শ্রীমন্তলাল করুণ গলায় প্রশ্ন করে, 'বাবামশায় কোথায়? আসবেন না এখানে?'

বাসুদেবের বুকের মধ্যে একটা কষ্ট মোচড় দিয়ে ওঠে। শ্রীমন্তের সামনে ঝুঁকে পড়ে সে বলে, 'কিছুদিন এখানে থাকো। তারপরে বাবামশায় এসে তোমাকে নিয়ে যাবেন।'

'আমি হিরাবুয়ার কাছে যাব।'

শ্রীমন্তর মাথায় হাত বুলিয়ে বাসুদেব বলে, 'নিশ্চই যাবে।'

'বাবামশায় আমাকে এখানে রেখে যাচ্ছেন কেন?'

'সে তোমার ভালোর জন্য শ্রীমন্ত। তোমার তো অনেক বুদ্ধি। সব কিছু তো শুনেছ তুমি। তোমার বাবামশায় ও নবাব সিরাজদ্দৌলার দুশমন ইংরেজদের জিত হয়েছে পলাশিতে। তোমাকে নিয়ে তোমার বাবামশায়, আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি। পথে কত কষ্ট। তুমি ছোট ছেলে। এই ধকল কি তুমি সইতে পার?'

চুপ করে মাটির দিকে চেয়ে থাকে শ্রীমন্তলাল। তারপর বলে, 'আচ্ছা চাচা, দুশমনেরা হিরাবুয়াকে তকলিফ দেয়নি তো?'

'না না। তোমার হিরাবুয়া ভালো আছে।'

এরপর শ্রীমন্ত্র কানের কাছে মুখ এনে বাসুদেব বলেছিল, 'কাউকে কিন্তু বোলো না যে তোমার বাবামশাইয়ের নাম মোহনলাল। তাহলে কিন্তু তার খুব বিপদ হবে।'

'আচ্ছা। ঘাড় নাড়ে শ্রীমন্তলাল।' একটু ভেবে সে বলে, 'কেউ যদি জিগ্যেস করে কে তোমার বাবামশায়? কী বলব?'

এমন সময় বাটির ভিতর থেকে ভেসে আসে বিনোদ রায়ের কণ্ঠস্বর। 'শ্রীমন্ত! শ্রীমন্ত! কোথায় গেলে?'

শ্রীমন্তর চিবুক ছুঁয়ে আদর করে বাসুদেব বলে, 'যাও ঘরে যাও। বাবামশায় ডাকছেন।'

'বাবামশায়?'

'এখন উনিই তোমার বাবামশায়। বাইরের কেউ শুধোলে বলবে, আমার বাবামশায়ের নাম বিনোদ রায়। মনে থাকবে তো?'

ঘাড় নাড়ে শ্রীমন্তলাল। হঠাৎ প্রশ্ন করে, 'এটা একটা খেলা। না চাচা?'

'হ্যাঁ বাবা। যাও। তুমি ভিতরে যাও। ক'দিন পরে আমি এসে তোমাকে দেখে যাব।'

'সেদিন বাবামশায়কে সঙ্গে করে নিয়ে এসো বাসুদেবচাচা।'

'নিয়ে আসব। যাও ঘরে যাও।'

আর কথা না বাড়িয়ে লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসেছিল বাসুদেব। তিরবেগে কৃষ্ণপুরের অরণ্য অভিমুখে ছুটে চলে ঘোড়া। চোখের জলে বাসুদেবের দৃষ্টি সেদিন ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল।

পিস্তলটা কোমরে গুঁজে কাছে গিয়ে ঘোড়াদুটির গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন মোহনলাল। মনিবের হাতের স্পর্শ পেয়ে শান্ত হল ঘোড়াদুটো। পা দিয়ে ঠেলে মৃত সাপটিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে বাসুদেবের উদ্দেশে মোহনলাল শুধোলেন, 'ছিলে কোথায়? আর একটু হলে ছোবল মেরে দিত। কী সর্বনাশ হতো বল তো?'

অপরাধীর মতো মাথা ঝুঁকিয়ে বাসুদেব বলে, 'আপনার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে গাছে উঠে পথের দিকটা দেখছিলাম।'

'মিরজাফরের কাসিদরা চারিদিকে ঘুরছে। তাদের নজর এড়াতে ঘুর পথে এলাম।'

'কাজ হয়েছে হুজুর?'

'শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী গত হয়েছেন।'

হতাশ গলায় বাসুদেব শুধোয়, 'তাহলে উপায়?'

‘উপায় একটা করে এসেছি। শ্রীমন্তকে দত্তক নেবে শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণগোপাল। কৃষ্ণপুরের বর্তমান জমিদার চৌধুরী মশায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণকিশোরের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।’

‘যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।’

‘না বাসুদেব। এখনই নিশ্চিন্ত হওয়ার কিছু নেই। যতক্ষণ না শ্রীমন্তকে নিরাপদে চৌধুরী বাড়িতে পৌঁছে দিতে পারছি, ততক্ষণ খুবই সতর্ক থাকতে হবে। একটু জল দাও! বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।’

অশ্বত্থ গাছের গায়ে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসেন মোহনলাল। দুর্গম দীর্ঘ পথ হেটে আসার ধকলে তিনি ক্লান্ত। বাসুদেব দ্রুত ঝুপড়ির ভিতরে ছুটে গিয়ে একটা মাটির মালসায় জল নিয়ে আসে। জল পান করলেন মোহনলাল। অন্ধকার হয়ে আসছে। খানিকবাদেই শুরু হবে বুনো জন্তুদের অবাধ বিচরণ। শুকনো ডালপালা জড়ো করে আগুন জ্বালানোর আয়োজন করতে থাকে বাসুদেব।

মোহনলাল বলেন, ‘এবারে তোমাকে একটা গুরুদায়িত্ব নিতে হবে বাসুদেব।’

‘ফরমায়েস করুন হুজুর।’

‘কাল প্রত্যুষে তোমাকে কৃষ্ণকিশোরের গৃহে যেতে হবে। ভোর রাতের দিকে ঘোড়ায় চেপে এই আস্তানা ছেড়ে তুমি রওনা দেবে। কালই কৃষ্ণকিশোর শ্রীমন্তকে নিয়ে আসার জন্য আমহাটির উদ্দেশে রওনা দিতে চান। তুমিও যাবে ওঁর সঙ্গে। তোমার কাকা বিনোদ রায়ের সঙ্গে কৃষ্ণকিশোরের পরিচয় করিয়ে দেবে।’

‘যে আজ্ঞে।’

‘দত্তক গ্রহণের অনুষ্ঠান হবে ঝুলনযাত্রার দিন।’

‘তাহলে আর ভাবনা কীসের? সব ব্যবস্থাই তো আপনি চূড়ান্ত করে এসেছেন হুজুর।’

‘তবুও ভয় হয় বাসুদেব। কোনও ভাবে যদি প্রকাশ পায় শ্রীমন্তের আসল পরিচয়। সে ব্রাহ্মণ সন্তান নয়। সিরাজ ও হিরার অবৈধ সন্তান? তাহলে?

‘ও কেউ টের পাবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।’

আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে মোহনলালের মুখোমুখি এসে বসে বাসুদেব।

মোহনলাল বলেন, ‘বুঝলে বাসুদেব, আজ মনটা বড় ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। এতদিন ভেবেছি চৌধুরী বংশে দত্তক পুত্র হিসেবে শ্রীমন্ত যদি ঠাঁই পায়, তবে ওর বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। আজ সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাওয়ার পর মনে হচ্ছে শ্রীমন্তকে এ ভাবে দূরে ঠেলে না দিলেই ভালো হত।’

‘জানি শ্রীমন্ত আপনার কাছে প্রাণের চেয়ে প্রিয়। কিন্তু এসব ভাবছেন কেন আপনি? যা হল তা তো ভালোই হল। যা ঘটতে যাচ্ছে তা শ্রীমন্তের পক্ষে ভালোই হবে।’

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মোহলনলাল বলেন, ‘সে তো ঠিকই। অন্য পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকবে শ্রীমন্ত। বেঁচে থাকবে সিরাজ ও হিরার রক্তের উত্তরাধিকার। শ্রীমন্তর আসল পরিচয় প্রকাশ পেলে নিজামতের জহ্লাদরা যে এই নাবালককেও রেয়াত করবে না, সে আমি জানি। তবুও যে মন মানে না বাসুদেব।’

মোহনলালের চোখদুটো জলে ভরে ওঠে। চোখের জল গোপন করতে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

বাসুদেব মাথা ঝুঁকিয়ে চুপ করে বসে রয়েছে। বিষাদ ঘন পরিবেশ। অন্ধকারে বুনো ঝোপের মধ্যে নেচে বেড়াচ্ছে জোনাকি। কাছেই ডেকে উঠল একটা হুতোম প্যাঁচা।

নীরবতা ভেঙে বাসুদেব বলল, ‘কুটিরে চলুন হুজুর বিশ্রাম করবেন।’

‘বাসুদেব।’

‘হুজুর।’ বাসুদেব উঠে দাঁড়ায়।

‘কতদিন জিন্দা থাকব জানি না। আমার হয়ে একটা গুরুদায়িত্ব নিতে হবে তোমাকে।’

মোহনলালের কাছে গিয়ে বাসুদেব বলে, ‘ফরমায়েশ করুন হুজুর।’

কোমরবন্ধনী থেকে একটা গোটানো কাগজ বের করে বাসুদেবের হাতে দিয়ে মোহনলাল বলেন, ‘শ্রীমন্ত বড় হয়ে উঠলে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই কাগজটা তার হাতে দিও।’

‘কী এটা?’

‘শ্রীমন্তের উদ্দেশে লেখা আমার একটা চিঠি। এ থেকে শ্রীমন্ত তার জন্মকাহিনি ও আসল পরিচয় জানতে পারবে। এ তার জানা উচিত।’

কাগজটা হাতে নিয়ে মোহনলালের মুখপানে চাইল বাসুদেব। মোহনলাল অন্যমনস্ক। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন আগুনের শিখার দিকে। ছলছল করছে চোখদুটো।

বাসুদেব মৃদু গলায় ফের বলে, ‘কুটিরে চলুন হুজুর।’

‘জানো বাসুদেব, ফেরার পথে ক্ষণেক বিশ্রামের জন্য একটা চটিতে ঢুকেছিলাম। মুর্শিদাবাদ থেকে আগত এক মুসাফিরের মুখে কী শুনলাম জান? সিরাজ নেই। গ্রেফতারির পর জাফরাগঞ্জ প্যালেসে তাঁকে কোতল করেছে মিরন।

আবেগকে আর বশে রাখতে পারলেন না মোহনলাল। কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বুকের মধ্যে যে কষ্টটা এতক্ষণ তিনি চেপে রেখেছিলেন, তা অর্গলমুক্ত হল।

২২

সকাল থেকে মোরাদবাগ প্যালেসের নৌকোঘাটে দারুণ ব্যস্ততা। মাঝিমাল্লা মুটে-মজুরদের কোলাহলে চারিদিক মুখর। কোন নৌকোতে কী কী মাল উঠল, তা তালিকা ধরে মিলিয়ে নিতে হিমসিম খাচ্ছেন দেওয়ান রামচাঁদ ও কোম্পানির ছোকরা রাইটার লাশিংটন। কম তো নয়, ছোটবড় মিলিয়ে প্রায় আড়াইশো নৌকো।

চুক্তিমতো ইংরেজদের দাবির প্রথম কিস্তি মিটিয়ে দিয়েছেন মিরজাফর। চামড়ার খেরিয়ায় ঠাসা রুপোর টাকা, মোহর তো আছেই। সেই সঙ্গে আছে পারস্যের গালিচা, মেহগিনি কাঠ ও শ্বেতপাথরের আসবাবপত্র, বেলজিয়াম কাঁচের তৈরি অজস্র ঝাড়বাতি, গাঁট গাঁট আবরোয়ান, তরন্দাম, নয়নসুখ মসলিন। এছাড়াও আছে চিনামাটির বাসনপত্র, ঘর সাজানোর নানারকম শৌখিন দ্রব্য, বিরাট বিরাট আকারের বেলজিয়াম কাঁচের আরশি, সোনা, রুপো, হিরে, চুনি, পান্নার গয়না আর সেই সঙ্গে বস্তা বস্তা উৎকৃষ্ট সোরা—বারুদ তৈরির উপাদান। মুফতে পাওয়া। যার বাজারদর অনেক। এই সব জিনিসপত্রে বোঝাই হয়ে আছে নৌকোগুলো। পলাশির গনিমত, মসনদের কিস্মত, মুর্শিদাবাদের জলুস পাড়ি দিচ্ছে কলকাতায়।

মাঝ নদীতে নোঙর ফেলে আছে অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের জাহাজ কেন্ট। কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আছে আরেকটি জাহাজ টাইগার। কেন্ট জাহাজের পিছনে গিয়ে নৌকোগুলিকে পরপর দাঁড় করাচ্ছে মাঝিমাল্লারা। নদীর বুকে নৌকোর মিছিল। নদীর দুই তিরে অজস্র মানুষের ভিড়। লোকে বুঝছে এ এক প্রকার লুঠ। লুঠের মাল সাড়ম্বরে এভাবে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার আয়োজন দেখে অনেকেই বিস্মিত।

কলকাতাগামী এই নৌবহরের সমুখে পাইলট হিসেবে থাকবে টাইগার। তার পিছনে কেন্ট। তার পিছনে থাকবে মালপত্রে বোঝাই প্রায় আড়াইশো নৌকো। একেবারে পিছনে থাকবে বাকি তিনটি জাহাজ—কামবারল্যান্ড, সলিসবেরি ও ব্রিজওয়াটার। এমনই নির্দেশ দিয়েছেন কর্নেল ক্লাইভ। কড়া পাহারায় নৌকোগুলোকে নিয়ে যেতে হবে কলকাতায়। তাই প্রত্যেকটা জাহাজেই ফ্লিন্টলক রাইফেল হাতে প্রস্তুত হয়ে আছে গোরা পল্টন। জাহাজগুলিতে ঘুলঘুলি পথে বেরিয়ে আছে কামানের নল। প্রস্তুত গোলন্দাজ বাহিনীও। নিরাপত্তার বিষয়ে কর্নেল ক্লাইভ কোনও ঝুঁকি নিতে চান না।

কেন্ট জাহাজে চড়ে আজই ওয়াটসন রওনা দেবেন কলকাতায়। ক্লাইভ আরও কিছুদিন থাকবেন মুর্শিদাবাদে। নদীর বুকে মালবোঝাই নৌকোর মিছিল দেখে ক্লাইভ ও ওয়াটসন খুব খুশি। মাদ্রাজ থেকে বাংলায় আসার পথে বাংলা লুঠের যে পরিকল্পনা দু'জনে করেছিলেন, আজ তা পরিপূর্ণ হতে চলেছে। নৌকোঘাটে দাঁড়িয়ে লঘু চিত্তে এসবই আলোচনা করছিলেন দুই যুদ্ধবাজ।

এখনই বজরায় চেপে কেন্ট জাহাজের উদ্দেশে রওনা হলেন অ্যাডমিরাল ওয়াটসন। কর্নেলের সঙ্গে করমর্দন সেরে বললেন, 'নাউ আওয়ার মিশন ইজ কমপ্লিট।'

ক্লাইভ বললেন, 'গুড বাই ডিয়ার। উই উইল মিট সুন ইন ক্যালকাটা।'

ওয়াটসনও হাসি মুখে হাত নেড়ে বললেন, 'টেক কেয়ার অফ ইওর হেলথ।'

ক্লাইভ হেসে বললেন, 'সেম টু ইউ। বাই বাই।'

বজরায় উঠলেন ওয়াটসন। অ্যাডমিরাল সাহেব আজ যেন খুশিতে বড় বেশি রকমের উচ্ছল। বজরার গলুইয়ে দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে গাইতে লাগলেন রুল ব্রিটানিয়া।

প্রত্যেকটা নৌকো ও জাহাজের মাথায় উড়ছে ইউনিয়ন জ্যাক। এলোমেলো হাওয়ায় ঔদ্ধত্যের সঙ্গে উড়ছে কোম্পানির পতাকা। এ দৃশ্য দেখে গর্বে বুক ফুলে উঠছে ক্লাইভের। উড্ডীন নিশানগুলো যেন একযোগে ক্লাইভের কুদরতিকে কুর্নিশ জানাচ্ছে।

সত্যিই এ এক গৌরবময় প্রত্যাবর্তন। গত বছরের ডিসেম্বরে যেদিন ফলতায় এসে পৌঁছেছিলেন কর্নেল, সেই দিন ও আজকের এই দিন, মাঝে মাত্র সাড়ে ছ'মাসের ব্যবধান—কিন্তু কত তফাত দুটো দিনের মধ্যে। ফলতার উদ্বাস্তু শিবিরে বসে সেদিন মৃত্যুর প্রহর গুনছিল ইংরেজরা, সুবে বাংলা থেকে উৎখাত হয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। আর আজ? সেই ইংরেজরাই ফের প্রবল ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। নৌকো বোঝাই করে নবাবের দৌলত নিয়ে যাচ্ছে কলকাতায়। চোরের মতো চুপিসারে নয়, রীতিমতো সাড়ম্বরে। এমন দস্যুবৃত্তি অতীতে কেউ কি দেখেছে এই সুবে বাংলায়? এসব ভাবতে ভাবতে আপন মনে মুচকি হাসলেন ক্লাইভ। লং কোটের পকেটে হাত চালিয়ে পাইপটা বের করে ঠোঁটে গোঁজার পর খেয়াল হল, চকমকি পাথরের খণ্ডদুটো ফেলে এসেছেন ঘরে। ঠিক তখনই পাশ থেকে একজন এগিয়ে দিল চকমকি পাথর।

ক্লাইভ ঘুরে তাকিয়ে দেখলেন মুনশি নবকৃষ্ণ। তাঁর মুখে লেগে আছে মিটিমিটি হাসি।

'গুড মর্নিং মুনশি।'

'ভেরি গুড মর্নিং স্যার।'

পাইপ ধরিয়ে ক্লাইভ বললেন, 'আমার প্রয়োজনটা তোমার মতো কেউ বোঝে না।'

হাসলেন নবকৃষ্ণ।

'ইজ এভরিথিং রেডি?' ধোঁয়া ছেড়ে প্রশ্ন করলেন ক্লাইভ।

'বিলকুল হুজুর।' ক্লাইভের পাশে আর একটু সরে এসে গলা খাটো করে নবকৃষ্ণ বললেন, 'শুধু আপনার মদ্দা গর্ধভটি এসে পড়লেই হল।'

'আর ইউ টকিং অ্যাবাউট নবাব?' ক্লাইভের মুখে দুষ্টুমির হাসি।

'গুস্তাকি মাফ করবেন হুজুর। এ আমার কথা নয়, মুর্শিদাবাদ দরবারের ক্লাউন মির্জা শামসুদ্দিন কথাটা চাউর করেছে। তামাম চকবাজারও জানে।'

'এমন নবাব থাকলেই তো সওদা করে সুখ। কী বল?' ফের মুচকি হাসলেন ক্লাইভ।

'আপনাকে যত দেখছি তত তাজ্জব বনে যাচ্ছি হুজুর।'

ভুর কুঁচকে নবকৃষ্ণর দিকে তাকিয়ে ক্লাইভ বললেন, 'অ্যাম আই রং?'

নবকৃষ্ণ বললেন, 'না না। রং কোথায়? ভুল কি আপনার হতে পারে? কী মোক্ষম চালই না চাললেন। যাঁর দৌলত ছেঁচে নিয়ে যাচ্ছেন কলকাতায়, তিনিই এসে কিনা নিশান উড়িয়ে যাত্রা শুরুর হুকুমত দেবেন।'

ধোঁয়া উড়িয়ে হাসলেন ক্লাইভ। কর্নেলের মেজাজটা আজ একেবারে রঙিন হয়ে আছে।

'পোষ্যের জন্য আবার লাল গালিচার আনজামও করে রেখেছেন!' এই বলে ফিক করে ফিচেল হাসি হাসলেন নবকৃষ্ণ।

'বুঝলে মুনশি এ হল এক কৌশল।'

'সে তো বিলক্ষণ বুঝতে পারছি। এত সব কিমতি চিজ মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় যাচ্ছে। প্রজারা ভাবতে পারে ইংরেজরা লুঠেরা। নবাব এসে খুশি মনে নিশান ওড়ালে তেমনটা কারও আর মনে হবে না।'

ক্লাইভ মজা করে বললেন, 'তুমি একটি বিচ্ছু। অ্যা ডেঞ্জারাস ফেলো। বিটুইন দ্য লাইনস চট করে পড়ে ফেলো।'

নবকৃষ্ণ হাত কছলে বলেন, 'সবই তো আপনাকে দেখে শেখা হুজুর।'

নবকৃষ্ণের পিঠে হাত রেখে ক্লাইভ বললেন, 'শিখতে সবাই পারে না মুনশি। ইউ আর টু ইন্টেলিজেন্ট।'

নবকৃষ্ণ বিনয়ে গলে পড়ে জোড়হাত হয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বলে, 'আপনার তারিফি আমার সরতাজ হুজুর। গত কয়েকদিন থেকে একটা কথা বলব ভাবছি। যদি অনুমতি করেন তো বলি।'

ক্লাইভ নবকৃষ্ণর মুখপানে চেয়ে ভুরু কুঁচকে শুধোলেন, 'আর ইউ সেনসিং সামথিং রং?'

'ল-সাহেব তো শুনলাম পালিয়ে গিয়েছেন অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার এলাকায়।'

ক্লাইভ মাথা নেড়ে বললেন, 'ইটস অ্যা ম্যাটার অফ কনসার্ন। ল মে ইনস্টিগেট সুজাউদ্দৌলা টু অ্যাটাক বেঙ্গল।'

হাত কচলে নবকৃষ্ণ বললেন, 'বলছিলাম কী হুজুর– মেজর আয়ারকুটের ফৌজ নিয়ে পাটনায় বসে থাকার আর কোনও দরকার আছে কি?'

'হোয়াই আর ইউ সেইং সো?'

'শুনলাম নবাব মিরজাফর খাঁ চান পাটনার নায়েব রামনারায়ণকে বরবাদ করতে।'

'আই থিংক ইট ইজ অ্যা গুড ডিসিশন।'

'আপনি ভালো বলছেন?'

'ইয়েস। আই অলসো ওয়ান্ট টু রুইন দ্যাট ওল্ড ফক্স রামনারায়ণ। ল'কে পালিয়ে যেতে মদত দিয়েছে।'

'হয়তো খানিকটা না বুঝেই কাজটা করে ফেলেছেন।'

ক্লাইভ ভুরু কুঁচকে শুধোলেন, 'কী বলতে চাইছ মুনশি?'

'বলছিলাম, রামনারায়ণ অনেকদিন পাটনার নায়েবের পদে বহাল আছেন। তাগদই বলুন আর দৌলতই বলুন, কোনওটাই তার কম নয়। তার উপরে পাকা মাথার লোক। রামনারায়ণকে সরিয়ে নিজের ভাই মির কাজিমকে পাটনার কুরসিতে বসাতে চান মিরজাফর। নবাবের মতো তার ভাইও ষাঁড়ের গোবর, আই মিন ওয়ার্থলেস। তিনি পাটনার শাসক হলে কোম্পানিরই যে তকলিফ হবে হুজুর।'

নব মুনশির বিচারবুদ্ধির উপরে যথেষ্ট আস্থা আছে ক্লাইভের। এ কথা শুনে তিনি খানিকটা চিন্তিত হয়ে বললেন, 'কেন বলছ এ কথা?'

'সুজাউদ্দৌলা বাংলার দিকে ধেয়ে এলে পাটনায় তাকে রোখার কেউ থাকবে না। মির কাজিম বুজদিল, নালায়েক আদমি। অযোধ্যার ফৌজ এলে ল্যাজ তুলে পালাবে। বরং লড়তে পারবেন রামনারায়ণ। ওদিককার জমিদারেরা সবাই ওর বশ। আপনি মানুষটাকে তাঁবে রাখতে পারলে কোম্পানিরই লাভ।'

ক্লাইভ মাটির দিকে চেয়ে আছেন। ঠোটে গোঁজা পাইপ। কপালে চিন্তার ভাঁজ। মন দিয়ে শুনছেন নব মুনশির কথা।

'আপনি যদি রামনারায়ণকে মদত দেন তো জিন্দেগিভর সে আপনার গোলাম হয়ে থাকবে।'

মুখ তুলে ক্লাইভ বললেন, 'ইউ আর রাইট মুনশি। আই ডিড নট থিংক ইন দিস ওয়ে। ইউ ওপেন মাই আইজ। আই উড রাইট টু আয়ারকুট। উড আস্ক হিম টু কাম ব্যাক।'

ঠিক এই সময় হিরাঝিলের দিক থেকে ভেসে এল তোপের আওয়াজ।

'এইবার আপনার গর্ধভটি আসছে।' মুচকি হেসে কথাটা বলে ক্লাইভের পাশ থেকে সরে গেলেন নবকৃষ্ণ।

পথের উপরে বিছানো রয়েছে লাল গালিচা। দুপাশে সঙিন হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে গোরা পল্টনেরা। এগিয়ে আসছেন নবাব। গোরা পল্টনেরা মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ জানাচ্ছে। কর্নেল ক্লাইভ এগিয়ে গিয়ে অভিবাদন জানালেন নবাবকে। পাশ থেকে ওমর বেগ নবাবের হাতে তুলে দিলেন নিজামতের নিশান। নিশান ওড়ালেন নবাব মিরজাফর।

ক্লাইভ, কিলপ্যাট্রিক-সহ ইংরেজ সেনাবাহিনীর অন্যান্য অফিসারেরা হাততালি দিয়ে উঠলেন।

দুম! দুম! দুম! গর্জন করল টাইগার জাহাজের তোপ। চলতে শুরু করল গোটা নৌবহর।

মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতা। জলুস-জাঁকজমকের স্থানবদলের সেই শুরুয়াত।

ভাগীরথীর বুকে চলমান সারিসারি নৌকো। সেগুলোর সামনে ও পিছনে ইংরেজদের জাহাজ। খানিকবাদে হারিয়ে যাবে চোখের নজর থেকে। হিরাঝিলের ছাতে দাঁড়িয়ে দূরবিন চোখে দৃশ্যটা দেখছিলেন মণি বেগম। চলমান বাতাস বেগম সাহেবার কানে পৌঁছে দিচ্ছে মিলিটারি ব্যান্ডে বাজতে থাকা রুল ব্রিটানিয়ার সুর। সেই সুর তামাম মুর্শিদাবাদকে যেন বিষাদে, জহমতে ডুবিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে দূরে।

ইংরেজ জাহাজের তোপধ্বনি শুনে থমকে গিয়েছিল হিরাঝিল প্রাসাদের নহবতের সানাই। ফিরে আসছেন নবাব। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন মণি বেগম। নবাবকে স্বাগত জানাতেই বোধ হয় ফের বেজে উঠল সানাই। মণি বেগমের মনে হল, তামাম মুর্শিদাবাদ যেন কেঁদে উঠল।

দূরবিন থেকে চোখ সরিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বেগম সাহেবা।

মণি বেগম ভাবতে থাকেন, নসিবের কী আজিব খেয়াল। নবাবের চোখের সামনেই ইংরেজরা একরকম লুঠ করে নিয়ে গেল তাঁর দৌলত। শুধু তাই নয়, কর্নেল ক্লাইভের খায়েশে নবাবকেই নিশান উড়িয়ে লুঠের মালে বোঝাই নৌকোগুলোকে কলকাতার উদ্দেশে রওনা করাতে হল।

মণি বেগম শুধিয়েছিলেন, 'আপনারই দৌলত লুঠ করে কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছে ইংরেজরা। আপনাকে কেন খেয়াঘাটে গিয়ে নিশান ওড়াতে হবে?'

'লুঠ বলছ কেন মণি?'

'লুঠ নয়?'

'চুক্তির কড়ি। মসনদের কিস্মত। আমিই যে দস্তখত করে কড়ার করেছি। চোকাতে হবেই।'

'তা না হয় মানলাম। কিন্তু আপনাকে খেয়াঘাটে গিয়ে নিশান ওড়াতে হবে কেন?'

মিরজাফর হেসে বলেছিলেন, 'কর্নেলের আবদার। কী করে ইনকার করি বলো? আর যাই হোক ওই মানুষটার জন্যেই তো মসনদ আজ আমার। আমি সুবে বাংলার নবাব।'

'আমি সুবে বাংলার নবাব'—কথাটা শুনে কেঁপে উঠেছিলেন মণি বেগম। হতাশা ও বিষাদের সুর প্রচ্ছন্ন ছিল নবাবের গলায়। সিরাজদ্দৌলার মুসিবতের পর মিরজাফর খাঁর দেহভঙ্গিতে যে খুনজোশি প্রত্যক্ষ করেছিলেন বেগমসাহেবা, পক্ষকাল কাটতে না কাটতেই তা যেন অনেকটা জুড়িয়ে গিয়েছে।

নবাববেগম হয়ে মণি বেগমেরও তো মনে হয়েছিল বেহেস্তের কওসরে যেন ডুব দিয়ে উঠলেন। আজ তিনি নিজেও কি স্বস্তিতে আছেন? আসমানের চাঁদ হাতে পেয়ে হিরাঝিল প্যালেসের নয়া মালকিন প্রথম

প্রথম খুশিতে যেন আজাদ চিড়িয়ার মতো ডানা মেলে উড়ছিলেন। সেই খুশির রং খুব দ্রুত কেন বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে?

সিরাজদ্দৌলার শাদিতে মুজরো করতে এসে অচানকই মিরজাফরের নজরে পড়া, তারপরেই শাদি এবং বাঁদি থেকে মণির বেগম হয়ে ওঠা। মণি বাইকে নয়, প্রৌঢ় মিরজাফর চেয়েছিলেন তাঁর শরীরটাকে। নিজের দেহটাকে মিরজাফরের হাতে সঁপে দিয়ে মণি বাই চেয়েছিল জীবনে তাগদ, রওশন, সুখ খরিদ করতে। এই রিস্তেদারির শুরুয়াতে মেদবহুল থলথলে চেহারার প্রৌঢ় মানুষটার বেলাগাম কুৎসিত রতিসম্ভোগের চাহিদা অসহ্য লাগত মণির। তবুও সব মেনে নিয়ে কলের পুতুলের মতো বিছানায় মিরজাফর খাঁকে সুখ দিয়ে গিয়েছে মণি, শুধু নিজের সুখ খরিদের নেশায়। কিন্তু মানুষটাকে সে ভাবে কখনোই ভালোবাসতে পারেননি মণি বেগম।

কিন্তু আজ? আজ যেন বৃদ্ধ, বেওকুফ মানুষটাকে বড় ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে মণির। সত্যিই মানুষটা বড় অসহায়। ধূর্ত ইংরেজদের হাত থেকে কী করে নিজেকে বাঁচাবেন নবাব, কী করে কায়েম রাখবেন মসনদের উপরে তার অধিকার, মণি বেগম এখন সেই চিন্তায় বিভোর হয়ে আছেন। মনের মধ্যে জমাট বেঁধেছে শঙ্কার মেঘ। ভাবীকালের গর্ভে কী আছে কেউ জানে না। নসিব কখন যে কী ভাবে ঘর বদলাবে তা কেউ বলতে পারে না। মণি বেগম এখন দু'হাত দিয়ে আগলে রাখতে চান তার খসম, বৃদ্ধ নবাবকে। যতদিন এই মানুষটা মসনদে আসীন থাকবেন, ততদিন মণি বেগমের জীবনে থাকবে তাগদের জোশ, সুখের ফোয়ারা, জলুসের ঝিকিমিকি। যা পাওয়ার ছিল না, তাই জীবনে অর্জন করেছেন মণি। যা পেয়েছেন তা হারাতে চান না চট করে। কিন্তু এই রঙিন জীবনের শুরুয়াতেই বরবাদির অশুভ ছায়া যেন চোখে পড়ছে মণি বেগমের। সেই ছায়ার নাম ইংরেজ বণিক।

মিরজাফরের ঔরসে মণি বেগম জন্ম দিয়েছেন দুই পুত্রের। নজম ও সইফ। ফুলের মতো সুন্দর দুটি শিশু। এদের ভবিষ্যৎত-ভাবনা মণি বেগমকে আজ অস্থির করে তুলেছে।

গোটা হিরাঝিল প্যালেস জুড়ে ছুটোছুটি করে খেলা করছিল দুই ভাই—নজম ও সইফ। সহসা ছাতে এসে উপস্থিত হল তারা।

'আম্মিজান! আম্মিজান! ছুটে এল দুজনে।

দুই ছেলেকে দুই বাহু দিয়ে বুকে টেনে নিয়ে তাদের মাথায়, কপালে ঘন ঘন চুমু খেতে লাগলেন মণি বেগম। তাঁর দুই গাল বেয়ে নেমে এল জলের ধারা। খুশি, শঙ্কা, অপত্য স্নেহ সব কিছুই মণি বেগমের চোখের জলে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল।

ফরাসি গোলন্দাজ সিনফ্রে পালিয়ে গিয়েছেন দক্ষিণ ভারতে। যোগ দিয়েছেন জেনারেল ব্যুসির সঙ্গে। একথা শুনে হতাশ হয়েছিলেন ক্লাইভ। প্রায় একই সময় খবর পেলেন জাঁ লকে গ্রেফতার করা যায়নি। রাজমহলের ফৌজদার মির দাউদের প্রায় নাকের ডগা দিয়ে ফৌজসহ ফরাসি সেনাপতি পালিয়ে গিয়েছেন পাটনার দিকে। এই সংবাদ শুনে বিরক্ত হয়ে মেজর আয়ারকুটকে পাটনা অভিযানে পাঠালেন ক্লাইভ।

মেজর আয়ারকুটের সঙ্গে পাটনায় গেলেন মিরজাফরের ভাই মির কাজিম ও মহম্মদ আমিন। মির কাজিমের নামে পাটনার ডেপুটি সুবাদার পদের পরোয়ানা জারি করেছেন নবাব মিরজাফর খাঁ। বহুদিনযাবত ও পদের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন সিরাজদ্দৌলার অনুগত রামনারায়ণ। তাঁর উদ্দেশে মিরজাফর হুকুমত জারি করলেন, '...পাটনার দায়িত্ব মির কাজেমকে বুঝিয়ে দিয়ে তুরন্ত মুর্শিদাবাদে চলে আসুন।...' বহুদিন পাটনার ডেপুটি সুবাদার পদে বহাল থেকে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেছেন রামনারায়ণ। নবাব মিরজাফরের উদ্দেশ্য সেসব দখল করা।

পাটনায় এসে জাঁ ল-এর নাগাল পেলেন না আয়ারকুট। পালিয়ে গিয়েছেন ল। তাঁর পিছনে ধাওয়া করে এসে কর্মনাশা নদীর তীরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল আয়ারকুটকে। কর্মনাশা সুবে বাংলার সীমারেখা। এপারে সুবে বাংলা, ওপারে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার এলাকা। আয়ারকুট শুনলেন, জাঁ ল নদী পেরিয়ে বারাণসীর সামন্তপ্রভু বলবন্ত সিং-এর কাছে আশ্রয় নিয়েছেন।

ক্লাইভকে চিঠি লিখে এ কথা জানালেন আয়ারকুট। উত্তর এল, '...ডোন্ট ক্রস দ্যাট রিভার। নবাব সুজাউদ্দৌলা ইজ টু পাওয়ারফুল। প্লিজ কাম ব্যাক টু পাটনা অ্যান্ড রুইন দ্য ওল্ড ফক্স রামনারায়ণ।...' সিরাজদ্দৌলার অনুগত এবং ফরাসি সেনাপতি জাঁ ল'কে সুজাউদ্দৌলার রাজত্বে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন—এই কারণে ক্লাইভ তখন রামনারায়ণের উপরে খুবই রুষ্ট।

ফৌজ নিয়ে পাটনায় ফিরে এলেন আয়ারকুট। সঙ্গে আড়াইশো গোরা পল্টন তিনশো দেশি সেপাই ও দুটো কামান। রামনারায়ণের শক্তির তুলনায় এই ফৌজ নগণ্য। তবু সংঘাতের পথে গেলেন না রামনারায়ণ। তিনি পাটনা দুর্গের সব দরজা বন্ধ করে দিয়ে পরিস্থিতির উপরে নজর রাখতে লাগলেন।

'...ইট ইজ নট পসিবল টু রুইন রামনারায়ণ উইথ দ্য কনটিনজেন্ট আই হ্যাভ। প্লিজ সেন্ড মোর ট্রুপস।...' ক্লাইভকে একথা চিঠি লিখে জানিয়ে পাটনা দুর্গের অদূরে ছাউনি ফেলে অপেক্ষা করতে লাগলেন আয়ারকুট। বিলাসে গা ভাসালেন মেজর সাহেব। মদ ও মেয়েমানুষ দুটোতেই তাঁর প্রবল আসক্তি।

এদিকে ভালো ফ্যাসাদে পড়লেন মিরকাজিম। হাতে পাটনার ডেপুটি সুবেদারির পরোয়ানা। ওদিকে কেল্লায় ঢুকতে পারছেন না। নবাবের পরোয়ানা-হুকুমত এসবকে কোনও গুরুত্বই দিচ্ছেন না রামনারায়ণ। এখন ভরসা মেজর আয়ারকুট ও ইংরেজবাহিনী। কিন্তু মুশকিল হল দুর্গের উপরে হামলা করার বিষয়ে মেজর সাহেবের কোনও গা নেই। অপেক্ষা করতে করতে মিরকাজিম অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। সম্প্রতি কসিদের মুখে একটা খবর শুনে ঘুম উড়েছে তাঁর। মেয়েমানুষ জুগিয়ে রামনারায়ণ নাকি মেজর সাহেবকে প্রায় বশ করে ফেলেছেন।

কসিদের আনা খবরটা সত্যি কি না তার আঁচ পেতে সন্ধের মুখে একদিন ইংরেজদের ছাউনিতে এসে হাজির হলেন দুই ভাই– মিরকাজিম ও মহম্মদ আমিন।

দু'জনের পথ আটকাল সেনাছাউনির দেউড়িতে পাহারারত দেশি সেপাইরা।

'পথ ছাড়ো। মেজর সাহেবের সঙ্গে দেখা করব।'

'মেজর সাহেব আরাম করছেন। এখন দেখা করার হুকুম নেই।' একজন সেপাই উত্তর দেয়।

মির কাজিম ঝাঁঝের সঙ্গে বলে ওঠেন, 'আরে উজবুকের দল, আমি পাটনার ডেপুটি সুবাদার। মেজর সাহেবকে গিয়ে বলো, আমি দেখা করতে এসেছি। জরুরি দরকার।'

সেপাই ফের বললে, 'মাফ করবেন হুজুর। এখন তাঁকে বিরক্ত করলে গর্দান যাবে।'

উত্তেজিত মির কাজিম ঠাস করে সেপাইকে একটা চড় কষিয়ে বললেন, 'চুপ রহো বেতমিজ।'

গোলমাল শুনে গোরা পল্টনেরা বন্দুক হাতে ছুটে এল। সঙিন উঁচিয়ে একজন বললে, 'সরি। ইট ইজ নট দ্য টাইম টু মিট মেজর স্যার।'

বেয়নেটের সম্মুখে আর কথা বাড়ানোর সাহস করলেন না মির কাজিম।

ঠিক তখনই একটা পর্দা ঢাকা ডুলি সেনা ছাউনির প্রবেশ দ্বারে এসে হাজির হল। ডুলির সামনে পিছনে রয়েছে রাজপুত লেঠেল। আরও একজন আছেন এই দলের সঙ্গে। রামনারায়ণের অতি বিশ্বস্ত কর্মচারী বচন সিং। পূর্বে কিছুদিন পাটনায় থাকার সুবাদে মিরকাজিম একে চেনেন।

বিস্মিত চোখে মিরকাজিম দেখলেন গোরা পল্টনেরা বহুত খাতির করে বচন সিং-কে অন্দরে নিয়ে গেল। ডুলিবাহকেরা ডুলিটা নিয়ে ঢুকে পড়ল সেনাছাউনির চৌহদ্দিতে। শুধু রাজপুত লেঠেলরা দাঁড়িয়ে রইল বাইরে।

রাগে, অপমানে গা জ্বলে গেল মিরকাজিম ও মহম্মদ আমিনের। ভিতরে ভিতরে কী খেলা চলছে তা আর বুঝতে বাকি রইল না তাদের।

২৩

'ও বিদ্যা দ্যাখ কাকে নিয়ে এসেছি?'

রতু সরকারের হাঁকডাক শুনে অন্দর থেকে বাইরে এসে বিদ্যা অবাক চোখে দেখে চৌকাঠে পা রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে বছর দশেকের একটি মেয়ে। তার পিছনে হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে রতুবাবু।

ভারি সুন্দর মুখশ্রী মেয়েটির। মাজা মাজা গায়ের রং। সরল দুই টানাটানা চোখে জড়িয়ে আছে ভয়। কাজল ছিল চোখে। ধেবড়ে গিয়েছে। বিদ্যার দিকে একবার চোখ তুলে চেয়ে ফের চোখ নামিয়ে নেয় মেয়েটি।

অবাক হয়ে বিদ্যা শুধোয়, 'এ কে গো?'

'আহা অত খতেনে তোর দরকার কী? কত ধকল করে এলাম। আগে দু'দণ্ড জিরোতে দে বাপু।' রতু সরকার জবাব দেয়।

মেয়েটির চিবুক ছুঁয়ে আদর করে বিদ্যা শুধোয়, 'নাম কী রে তোর মেয়ে?'

'বৃন্দা।'

'বা বা! বেশ নাম। আয় আয়। ঘরে আয়।'

চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরে ঢোকে বৃন্দা। টালুসমালুস চোখে চারিদিক চেয়ে দেখতে থাকে। বাড়ির বৈভব দেখে ভয় ও বিস্ময়ে খানিকটা জড়সড়। দামি আসবাবপত্রে মোড়া, সাজানোগোছানো বিশাল দোতলা কোঠাবাড়ি। বৃন্দার গরিব বাপের ভিটের মতো ভাঙাচোরা কুটির নয়। জানলা থেকে ঝোলা বাঁশের চিকের আবরু গোটানো রয়েছে। বাতাসে থিরিথিরি কাপছে জানলার সামনে ঝুঁকে পড়া নিমের পাতা। দূরে দেখা যাচ্ছে গঙ্গা। বৃন্দার বাপের ভিটেও ছিল গঙ্গার পাড়ে। বাড়ির কথা মনে পড়তেই সে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

ব্যস্ত হয়ে রতু সরকার বলে ওঠে, 'ওই দ্যাখো। ফের কাঁদিস কেন? ভারি ছিঁচকাঁদুনে মেয়ে তো তুই।'

বিদ্যা কাছে গিয়ে বৃন্দাকে বুকে টেনে নিয়ে বলে, 'ভয় নেই রে মেয়ে। আমার কাছে থাকবি। আমাকে মাসি বলে ডাকিস।'

'আমাকে বাড়িতে দিয়ে এসো মাসি।' কান্না জড়ানো গলায় বলে বৃন্দা।

বিদ্যা শুধোয়, 'এই বাড়ি বুঝি তোর পছন্দ নয়?'

'আমি বাবার কাছে যাব।'

রতু সরকার বলে, 'সে হবে খন। আগে তোর বাপকে তো খুঁজে বের করি। বলিহারি আক্কেল তোর বাপের। ওই বাঘা ভিড়ের মধ্যে এক রত্তি মেয়েকে কেউ নিয়ে যায়? ভাগ্যিস আমার নজরে পড়লি তাই বেঁচে গেলি।'

কৌতূহলী চোখে রতু সরকারের মুখের দিকে তাকায় বিদ্যা।

রতু সরকার বলে, বুঝলি বিদ্যা, 'আমি দেখি এ মেয়ে ভিড়ের মাঝে এক গাছতলায় বসে অঝোরে কাঁদছে। ভাগ্যিস চোখে পড়ল। না হলে কে যে এ মেয়েকে ফুঁসলে নিয়ে যেত তার ঠিক আছে। শান্তিপুরের রাসের মেলা বলে কথা। চারিদিকে একেবারে থিকথিকে ভিড়। ও ভালো কথা, তোর জন্য একটা লক্ষ্মীর পট এনেছি রে বিদ্যা।'

বিদ্যাকে জড়িয়ে ধরে ফের কেঁদে ওঠে বৃন্দা। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় বিদ্যা। তার দুই চোখও জলে ভরে ওঠে।

বাপের কাছে শান্তিপুরে রাসের মেলা দেখাতে নিয়ে যাওয়ার বায়না করেছিল বৃন্দা। কোনওদিনই মা মরা মেয়ের কোনও শখ আহ্লাদ মেটাতে পারেননি গরিব পুজারি বামুন বলরাম ভট্টাচার্য। এবারে অনেক কষ্টে পথের কড়ি জোগাড় করে রাসের মেলা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন মেয়েকে। প্রবল ভিড়ের চাপে বাপের হাত ছুটে হারিয়ে গেল মেয়ে।

জহুরির চোখ রতু সরকারের। বৃন্দাকে একঝলক দেখেই তার চোখ আটকে গিয়েছিল। শিকারির মতো তক্কে তক্কে ছিল সে। ভিড়ের ধাক্কায় বাপ মেয়ের ছাড়াছাড়ি হতেই রতু সরকার পরিত্রাতার ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করে।

'ও মেয়ে কাদিস কেন তুই? হারিয়ে গিয়েছিস বুঝি? কেঁদে আর কী করবি? চল দেখি তোর বাপকে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। ভয় নেই রে। তোর বাপকে আমি চিনি।'

রতু সরকারের মুখের দিকে তাকিয়ে লোকটাকে চেনা ঠেকে বৃন্দার। বাঁশবেড়িয়া থেকে নৌকোয় করে আসার সময় তার বাপের সঙ্গে কথা কইছিল। চোখের জল মুছে সরল মনে উঠে দাঁড়ায় বৃন্দা।

'আয় আমার সঙ্গে। হাতটা শক্ত করে ধরে রাখিস। নয়তো ফের হারিয়ে যাবি।'

রতু সরকারের হাত ধরে হাঁটতে থাকে বৃন্দা।

বিদ্যা হাঁক দেয়, 'বিশুর মা! ও বিশুর মা! এদিকে এসো তো একবার।'

'এই যে যাই।'

আঁচলে হাত মুছতে মুছতে অন্দর থেকে বিশুর মা ছুটে আসে। বিদ্যার পরিচারিকা।

বিদ্যা বলে, 'একে নিয়ে যাও ভিতরে। নতুন কাপড় বের করে দিও। যা মা ভিতরে যা। ভালো করে নেয়ে নিয়ে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম কর।'

'এসো দিদি। আমার সঙ্গে এসো।'

যন্ত্রচালিতের মতো বিশুর মার সঙ্গে বিদ্যা ভিতরে চলে যায়।

বৃন্দা ভিতরে যেতেই শাড়ির আঁচলে চোখের জল মুছে বিদ্যা বলে, 'তুমি কেমন মানুষ গো?'

বিদ্যার কোমর জড়িয়ে ধরে রতন সরকার বলে, 'কেন রে? মানুষটা কি আমি খারাপ?'

'আহা রে! ফুলের মতো মেয়েটাকে তুমি এ পথে নিয়ে এলে?'

'ওর বাপের বড় উপকার করলাম রে। মেয়েটার একটা গতি করে দিলাম।'

বিদ্যা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে নিঃশব্দে কাঁদে।

কোমর থেকে হাত সরিয়ে বিদ্যার চিবুক ছুঁয়ে রতু সরকার বলে, 'আহা তুই আবার কান্নাকাটি করিস কেন?'

'তোমার পায়ে পড়ি। মেয়েটাকে পাপের পথে টেনে এনো না। ওর বাপের কাছে দিয়ে এসো।'

'তোর যত উটকো বুদ্ধি। মেয়েটার মুখখানার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখেছিস?'

'তাই তো বলছি। সাক্ষাৎ যেন লক্ষ্মী পিতিমা।'

রতু সরকার পানের ছোপ ধরা দাঁত বের করে হেসে বলে, 'অত রূপ নিয়ে গরিবের ঘরে জন্ম হল অভিশাপ। বাঁশবেড়িয়ার ঘাট থেকে একই নৌকোয় চড়ে ওদের সঙ্গেই শান্তিপুরে গিয়েছিলাম কিনা। ওর বাপের সব খতেন আমি জেনে নিয়েছি। বাপের নাম বলরাম ভটচাজ। পুজো-আচ্চা করে কোনওরকমে সংসারটা চালায়। কোন রাজপুত্তুর বে করবে ওর মেয়েকে? বাপ তো দু'দিন পরে কোনও হা-ঘরের গলায়

মেয়েটাকে ঝুলিয়ে দিয়ে দায় ঝেড়ে ফেলত। তারপর? আড়কাঠিদের নজরে পড়ে ও মেয়ে উঠত গিয়ে হারেমে। ও জীবন যে নরক যন্ত্রণার সমান, তা বুঝিস? তার চেয়ে এই কলকেতার বাজারে নগদে গতর বেচা ঢের ভালো রে। খুশি মতো কারবার, কারও কাছে বাঁধা থাকা নয়, ফ্যালো কড়ি, মাখো তেল। একবার সাহেবদের নজরে পড়লে ও মেয়েকে ফিরে তাকাতে হবে না। পয়সা পায়ে এসে লুটোবে। সেই সঙ্গে আমারও এট্টু-আধটু—হে হে হে...'

বিদ্যার গালে আঙুল দিয়ে একটা ঠোনা মারে রতু সরকার। বলে, 'সবই তো তুই বুঝিস।'

বুকের উপরে আঁচল টেনে বিদ্যা বলে, 'তুমি একটা নরপিশাচ। একটুও কি দয়ামায়া নেই তোমার?'

রতন সরকার হেসে বলে, 'বেশি দয়ামায়া থাকলে, দেউলে হয়ে আজ ভিক্ষে করে বেড়াতাম। পয়সা ওড়ে কলকাতার বুকে। তা ধরতে জানতে হয় রে বিদ্যা। লোকে বলে মাগির দালাল রতু সরকার। সে বলুক, কিন্তু লোকের কি ভালো করিনি আমি? এই যেমন তুই। তোকে দিয়ে এ কারবারে আমার হাতে খড়ি। আজ রাজরানির চেয়ে মন্দ কি আছিস তুই? কোনও বাবুর মরজির বাঁদি নোস। কেল্লার লালমুখো সাহেবগুলো তোর পায়ে এসে পোষা কুত্তার মতো লুটোয়। বিদ্যা মেমসাহেবের নাম শুনলে ব্যাটাদের নোলা একেবারে লকলক করে। এ কি চাট্টিখানি কথা?'

'টাকা-কড়ি, সোনাদানা এসব তো আমি চাইনি রতুবাবু। শুধু একটা ঘর চেয়েছিলাম।' এই বলে ঝরঝর করে কেঁদে ওঠে বিদ্যা।

রতু সরকার ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, 'অ্যাঁ? ঘ-অ-র? সতীপনার উটকো পেতনি থেকে থেকে ভর করে তোর মাথায়। বাপ তো ঝুলিয়ে দিয়েছিল এক ঘাটের মড়ার গলায়। তারপর?'

সহসা বিদ্যার চোখে ভেসে ওঠে সেই ভয়ংকর ছবিটা। বিয়ের পর মাস ঘুরতে না ঘুরতেই মরল বুড়ো বর। আত্মীয়-কুটুম্বরা সতী হওয়ার নিদান দিল। কিশোরী বিদ্যাকে টানতে টানতে সবাই নিয়ে চলল ঘাটে। ঢাক-ঢোল, কাসর-ঘণ্টার সে কী বীভৎস আওয়াজ। বিদ্যা তখন অঝোরে কাঁদছে আর বলছে, 'তোমাদের পায়ে পড়ি গো। ছেড়ে দাও আমাকে। আমি জ্যান্ত পুড়ে মরতে পারব না।'

কে শুনবে সেই আর্তি? গোবিন্দ চক্কোত্তির বিধবা বউটা সতী হবে, সেই খুশিতে গোটা গাঁ তখন উত্তাল। লোকজন সব উপচে পড়েছে নদীর ঘাটে। এয়োতী মেয়েরা এসেছে দলে দলে। সতীস্থলের মাটি সিঁথিতে ছুঁইয়ে অক্ষয় করবে স্বামীর আয়ু।

দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল চিতা। বিদ্যার আর্তনাদকে চাপা দিতে ভয়ানক জোরদার হল ঢাক-ঢোল, কাসর-ঘণ্টার আওয়াজ। বাঁচার প্রবল তাগিদে হঠাৎই যেন হাজার হাতির বলসঞ্চার হল বিদ্যার দেহে। যে লোকটি তার হাত ধরে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল, সর্বশক্তি দিয়ে বিদ্যা কামড় বসাল তার হাতে। বিদ্যার হাত ছেড়ে দিয়ে নিজের হাত চেপে ধরে আর্তনাদ করে উঠল লোকটা। বিদ্যারই দুঃসম্পর্কের এক দেওর। চকিতে চিতা থেকে একখানা জ্বলন্ত কাঠ হাতে নিয়ে রণংদেহী মেজাজে রুখে দাড়াল বিদ্যা।

পিছন থেকে কেউ এক জন চেঁচিয়ে উঠল, 'হাঁ করে দেখছিস কী সব? লাঠি চালা। বজ্জাত মাগির মাথাটা দুফাঁক করে দে।' লাঠি হাতে রে রে করে ছুটে এল কয়েকজন। জ্বলন্ত কাঠটা তাদের দিকে ছুড়ে দিয়ে বিদ্যা ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। গঙ্গায় তখন বান আসছে। গাঁয়ের লোকেদের হতচকিত ভাবটা কাটবার আগেই প্রবল জলের তোড়ে তাদের চোখের নজর থেকে হারিয়ে গেল বিদ্যা।

ত্রিবেণী থেকে নৌকোয় ফিরছিল রতু সরকার। বিদ্যাকে সে কুড়িয়ে পেয়েছিল হুগলির অদূরে। নদীর এক নির্জন চরে। অর্ধনগ্ন, সংজ্ঞাহীন অবস্থায়। স্তনযুগল অনাবৃত।

বরানগরে গঙ্গার পাশে নিরিবিলিতে একখানা বাড়ি ভাড়া করে বিদ্যাকে সেখানে নিয়ে তুলল রতু সরকার। মাসখানেক বেশ ভালোই কাটল বিদ্যার। রতু সরকার দু'বেলা এসে তার খবর নিয়ে যেত। মানুষটাকে যেন একটু একটু করে ভালো লাগতে শুরু করল সদ্য ঘর, কুল সব হারানো বিদ্যার। বাঁচতে হবে। পিছু টান

ভুলে নতুন স্বপ্নের আনাগোনা শুরু হল বিদ্যার চোখে। এমন সময় হঠাৎই একদিন রাতে টোকা পড়ল তার ঘরে।

'কে?'

'আমি রতুদাদা। ঘুমিয়ে পড়লি নাকি? দরজাটা একবার খোল দেখি।'

'এত রাতে কী দরকার তোমার?'

'আছে আছে। দরকার আছে।'

'কাল এসো।'

'ওরে খোল দেখি। অত ভয়টা কিসের? আমি কি বাঘ নাকি যে তোকে খেয়ে ফেলব?'

বাধ্য হয়েই উঠে এসে দরজার আগল খোলে বিদ্যা।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে রতন সরকার। সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ামের হোমরা চোমরা এক সাহেব।

ঘরের ভিতরে জ্বলতে থাকা কুপির আলোয় বিদ্যাকে এক ঝলক দেখেই সাহেব বলে ওঠে, বিউটিফুল। বেহায়ার মতো সাহেবের সামনে হাত পাতে রতু সরকার। জেবের ভিতর হাত চালিয়ে কয়েকটা রুপোর টাকা বের করে তার হাতের তালুর উপর ফেলে সাহেব।

অজস্র বিষধর সাপ একযোগে যেন বিদ্যার গোটা শরীরকে দংশন করে। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে রতু সরকার বলে, 'আজ রাতটা সাহেব থাকবে তোর ঘরে। ভালো করে একটু যত্নাত্তি করিস। সতীপনা দেখাতে গিয়ে পাগলামি করিস নে যেন। সাহেবকে খুশি করতে পারলে তোর কপাল খুলে যাবে। আমি এখন আসি। কাল আসব।'

কানে যেন শেল বেধে বিদ্যার। বাইরে থেকে দরজার আগল তুলে দেয় রতু সরকার।

আশা ভঙ্গের বেদনায় বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায় কান্না।

মদের নেশায় বেসামাল, কামতাড়িত ইংরেজ সাহেব টলমল পায়ে বিদ্যার সমুখে এসে তার চিবুক ছুঁয়ে বলে, 'ইউ আর টু প্রিটি মাই সুইট হার্ট।'

ভয়ে চোখ বুজে ফেলে বিদ্যা।

সহসা সবেগে তাকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে সাহেব। বিদ্যার নরম শরীরটা দুই পেশিবহুল হাতের চাপে যেন গুঁড়িয়ে যেতে থাকে। চিৎকার করে ওঠার বিফল চেষ্টা করে সে। তার নরম ঠোঁটদুটো অবরুদ্ধ হয়ে যায়। বিদ্যাকে নিয়ে সাহেব আছড়ে পড়ে ফরাসের উপরে।

সেই শুরু। সব কিছুই ধীরে ধীরে মেনে নিল বিদ্যা। কিছুদিনের মধ্যেই ফোর্ট উইলিয়ামের সাহেব মহলে ছড়িয়ে পড়ল তার নাম। বিদ্যার কল্যাণে দালাল রতু সরকারেরও বেশ দু'পয়সা রোজগার হতে লাগল। তবে রতু সরকার কিন্তু বিদ্যাকে কখনও প্রতারিত করেনি। তার প্রাপ্য কড়ি বরাবরই কড়ায়গণ্ডায় মিটিয়ে দিয়েছে।

মনের মতো শয্যাসঙ্গিনী পেলে সাহেবরা খুশিতে একেবারে প্রায় পাগল হয়ে যায়। হাত উপুড় করে পয়সা দেয়। এই বৃত্তিতে লাভের বহর দেখে মাথা ঘুরে গেল রতু সরকারের। আড়কাঠিদের মাধ্যমে গাঁ-গঞ্জ থেকে নতুন নতুন মেয়ে ফুঁসলে এনে ফোর্ট উইলিয়ামের সাহেবদের মনোরঞ্জনের ফলাও কারবার ফেঁদে বসল সে। কয়েকবছরের মধ্যেই অঢেল টাকার মালিক হয়ে গেল রতু সরকার। লোকে বলে, মাগির দালালি করে রতু সরকার আজ রইস আদমি। রতু সরকার হাসে। ভাবে, এই কলকাতা শহরের কেউকেটা যারা, তাদের মধ্যে কেই বা সোজা পথে টাকা করেছে। মাগির দালালি এমন কী খারাপ কাজ!

বেলা গড়িয়ে গিয়েছে অনেকটা। স্নানাহার সেরে ভিতরের ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে ক্লান্ত বৃন্দা। বাইরের ঘরে ফরাসের উপরে বসে রতু সরকারের সঙ্গে কথা বলে চলেছে বিদ্যা। সে বলে, 'এমনিতেই তো পাপে ডুবে রয়েছি। ও মেয়েকে এখানে তুলে দিয়ে আমার পাপ বাড়াচ্ছ কেন?'

পান চিবোতে চিবোতে রতু সরকার বলে, 'অবুঝের মতো কথা বলিস না। তোর কাছে ছাড়া নিরাপদে কোথায় রাখব মেয়েটাকে?'

শাড়ির আঁচলে ফের চোখের জল মোছে বিদ্যা।

'এই কাঁদুনেপনা ছাড় দেখি। মেয়েটাকে ঘষেমেজে ভালো করে তৈরি করে দে। সাহেবদের পছন্দ-অপছন্দ তো তুই ভালোই জানিস। তবে একটা কথা মিলিয়ে নিস বিদ্যা, ফের বলছি আমি, রতু সরকার ভুল করে না। দেহে যৌবনের লক্ষণগুলো সব ফুটে উঠলে, পয়সাও মেয়ের পায়ে এসে লুটোবে।'

রতু সরকারের অনুমান মিথ্যে হয়নি। কয়েকবছরের মধ্যেই কলকাতার সাহেবমহলে ঈশ্বরীর নাম ছড়িয়ে পড়ল। বৃন্দার ওই নাম রেখেছিল বিদ্যা। বলরাম ভট্টাচার্যের আদুরে মেয়ে বৃন্দা হারিয়ে গেল কলকাতা শহরে। বেঁচে রইল গণিকা ঈশ্বরী। তার টানে বরানগরে রতু সরকারের বাগানবাড়িতে সাহেবদের নিত্য আনাগোনা।

আলিবর্দির কাল গেল। মসনদে বসলেন সিরাজদ্দৌলা। ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই বাঁধল নবাবের। সদ্য গড়ে উঠতে থাকা শহরটাকে সিরাজ চুরমার করে দিয়ে গেলেন। ইংরেজরা পালিয়ে গেল ফলতায়। ইংরেজদের ব্যাবসা বন্ধ হল। শুকিয়ে গেল কলকাতার শাঁস, রং, রস। রতু সরকারের কারবারেও টান পড়ল।

তারপর একদিন গঙ্গা তোলপাড় করে নৌবহর নিয়ে বাংলায় এসে হাজির হলেন রবার্ট ক্লাইভ ও চার্লস ওয়াটসন। কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতায় ফিরে এল ইংরেজরা। মাদ্রাজ থেকে আসা ক্লাইভ ও ওয়াটসনের বাহিনীর অফিসারদের দেহসুখ চরিতার্থ করতে ফের জোয়ার এল রতু সরকারের কারবারে।

একদিন মেজর আয়ারকুটকে খাতির করে ডেকে আনল রতু সরকার। এক রাত ঈশ্বরীর সঙ্গে কাটিয়ে আয়ারকুট প্রেমরসে মজলেন। গোটা একটা মোহরের খেরিয়া রতু সরকারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'বাবু আই ওয়ান্ট দিস গার্ল।'

প্রমাদ গুনলেন রতু সরকার। ওদিকে ঈশ্বরীও কেমন যেন বদলে গেল। অন্য সাহেবদের সে ফিরিয়ে দিতে লাগল। শুধু মেজর আয়ারকুট ঘনঘন আসতে লাগলেন বরানগরের বাড়িতে। আয়ারকুট এলে খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠত ঈশ্বরী।

রতু সরকারের চক্ষু চড়কগাছ। 'ও রে বিদ্যা—এ মেয়ে যে কারবার ভুলে দেখি ভালোবাসায় হাবুডুবু খাচ্ছে।'

বিদ্যা মুখ টিপে হেসে বলে, 'খেলেই বা। তুমি তাতে নজর দাও কেন?'

'আমার কারবারের যে সব্বনাশ হয়ে যাবে।'

ফের যুদ্ধের দামামা বাজল। বেঁচে গেল রতু সরকার। ঈশ্বরীকে ভুলে মেজর আয়ারকুট ছুটলেন, হুগলি-চন্দননগর-পলাশি-পাটনা।

বিপর্যয় হল সিরাজদ্দৌলার। মসনদে বসলেন মিরজাফর। কয়েকদিন পর রাজমহলে ধরা পড়লেন সিরাজ। তারপর জাফরাগঞ্জ প্রাসাদের কয়েদখানায় খুন হলেন তিনি।

লোকে একটু একটু করে বুঝতে শুরু করল মিরজাফর নামেই নবাব, আসলে তিনি ইংরেজদের হাতের পুতুল। রতু সরকার বুঝলেন, সুবে বাংলায় দোর্দণ্ডপ্রতাপ শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে ইংরেজরা। মুর্শিদাবাদের সব জলুস শুষে নিয়ে আগামী দিনে সব রং, রোশনি, জলুসের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে চলেছে কলকাতা। ফের টাকা উড়ছে কলকাতায়।

রতু সরকার বলল, 'সুদিন আসছে রে বিদ্যা, চল তার আগে কাশী থেকে তীর্থ করে আসি।'

'বেশ চলো। ঈশ্বরীকেও সঙ্গে নিয়ে যাই। সারাদিন মনমরা হয়ে থাকে মেয়েটা। তীর্থে গেলে হয়তো মন ভালো হয়ে যাবে।'

রতু সরকার হেসে বলে, 'ওর এখন শ্রীরাধিকার দশা। বলিহারি বটে মেয়ের বুদ্ধির। গতর বেচার কারবারে নেমে কেউ মন বাঁধা দেয়? যৌবন গেলে বুঝবে লোকসানের বহরটা।'

কিছুদিন পরে ভাড়া করা কয়েকজন লেঠেল ও চাকরবাকরসহ বিদ্যা ও ঈশ্বরীকে নিয়ে রতু সরকার রওনা হল কাশীর পথে। সুতীর কাছে নোঙর ফেলেছিল বজরা। খুবসুরত দুই জেনানা রয়েছে বজরায়—আড়কাঠিদের মুখে এই খবর পেয়ে হামলা করল লুঠেরার দল। এরা মিরনের অনুগত। নবাবজাদার অস্বাভাবিক রতিসুখতৃষ্ণা মেটাতে তাদের তখন জেরবার অবস্থা। গাঁ-গঞ্জ ছেঁচে নিত্যদিন তারা খুবসুরতিদের জোর করে তুলে নিয়ে আসে। হররোজ নতুন শয্যাসঙ্গিনী না পেলে নবাবজাদার যৌন উন্মাদনা শান্ত হয় না। জাফরাগঞ্জের পাথরের দেওয়ালের গায়ে কান পাতলে শোনা যায় বহু গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, বউদের অসহায় কান্না।

রাত গভীর। লেঠেলদের চোখেও ঘুম। কখন যে লুঠেরাদের নৌকোটা বজরার গায়ে এসে ভিড়েছে টের পায়নি তারা। একটা শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে যায় ঈশ্বরীর। তারপরেই সে শুনতে পায়, রতু সরকারের তীব্র আর্তনাদ, ডাকাত! ডাকাত!

ভয়ে কেঁপে ওঠে ঈশ্বরী। সহসা তার কক্ষের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে আসে এক ছায়ামূর্তি।

ঈশ্বরী চিৎকার করে উঠতেই লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়ে লোহার মতো শক্ত হাতের থাবায় চেপে ধরে তার মুখ। তারপর এক ঝটকায় তাকে কাঁধের উপর ফেলে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।

ঈশ্বরীকে নিয়ে লোকটা কাঠের পাটাতন বেয়ে দ্রুত পাশের নৌকোয় উঠতে যাবে, এমন সময় পিছন থেকে তার মাথায় এসে পড়ে একটা লাঠির বাড়ি। লোকটা হুমড়ি খেয়ে জলের মধ্যে গিয়ে পড়ে। ঈশ্বরীও ছিটকে পড়ে জলে।

লাঠিটা চালিয়েছিল রতু সরকার। লুঠেরাদের দলের আরেকজন রতু সরকারের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বুকে গেঁথে দেয় খঞ্জর।

ভোরের আলো সবে ফুটেছে। ছইয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে নৌকোর গলুইয়ের উপরে দাঁড়াল বচন সিং। পাটনার নায়েব রামনারায়ণের অতি বিশ্বস্ত কর্মচারী। দেওয়ান রায়দুর্লভকে উদ্দেশ্য করে লেখা তার মনিবের একটা চিঠি সরাসরি দেওয়ান সাহেবের হাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সে এসেছিল মুর্শিদাবাদে। কাজ শেষ করে পাটনায় ফিরছিল বচন সিং।

গলুইয়ে দাঁড়িয়ে ভোরের দৃশ্য উপভোগ করতে করতে সহসা বচন সিং-এর চোখে পড়ল, অদূরে একটা কাঠের গুড়িকে আঁকড়ে ধরে ভেসে চলেছে এক যুবতী। হাতের ইশারায় সে সাহায্য চাইছে। বচন সিং-এর হুকুমে সঙ্গে সঙ্গে দুজন ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। সেই যুবতীকে উদ্ধার করে নৌকোয় নিয়ে তুলল। বর্ষায় দুকুল ছাপিয়ে যাওয়া তরঙ্গবিক্ষুব্ধ উত্তাল নদীর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ লড়াই করতে করতে সেই যুবতী তখন ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। অসাড় হয়ে আসছে তার গোটা দেহ।

বচন সিং শুধোল, 'কে তুমি? কী নাম তোমার?'

চেতনা হারানোর আগে অস্ফুট স্বরে যুবতী শুধু বলল, 'ঈ-শ্ব-রী।'

জাতিতে কায়স্থ, পদবী শ্রীবাস্তব, রামনারায়ণের বাবা রঙ্গলাল ছিলেন আলিবর্দির আমলে পাটনা দরবারের এক সামান্য কর্মচারী। বাবার সুপারিশেই নিজামতের চাকরিতে প্রবেশ ফারসিতে সুপণ্ডিত রামনারায়ণের। মাইনে ছিল মাসে পাঁচ টাকা। সিরাজদ্দৌলার পিতা জৈনুদ্দিন আহমেদ আফগানদের হাতে নিহত হওয়ার পর পাটনার নায়েবের পদে নিযুক্ত হন জানকীরাম। কিছুদিনের মধ্যেই রামনারায়ণ হয়ে ওঠেন তাঁর পেশকার এবং অতি বিশ্বস্ত একজন কর্মচারী। রামনারায়ণের দক্ষতার উপর জানকীরাম এতটাই ভরসা করতেন যে, তাঁর মৃত্যুর আগে নবাব আলিবর্দিকে এক চিঠিতে তিনি লিখে যান, পাটনার কুরসিতে যেন রামনারায়ণকে বসানো হয়। তাঁর নিজের পুত্র রায়দুর্লভের চেয়ে রামনারায়ণ ওই পদের জন্য অনেক যোগ্যতম ব্যক্তি। কথা রেখেছিলেন আলিবর্দি খাঁ। ১৭৫৩ সালে জানকীরামের মৃত্যুর পর পাটনার নায়েবের পদে নিযুক্ত হন রামনারায়ণ। এখনও তিনি সেই পদে বহাল।

সিরাজদ্দৌলাকে মদত দেওয়ার জন্য পাটনা থেকে তেলিয়াগড়ি পর্যন্ত এগিয়েও বিফল মনোরথে ফিরে এসেছিলেন জাঁ ল। তাঁর কাছ থেকেই রামনারায়ণ জেনেছিলেন, পলাশিতে সিরাজদ্দৌলার মুসিবত হয়েছে। সুবে বাংলার মসনদে বসেছেন মিরজাফর খাঁ। মুসাফিরের জালসাজিসে মুর্শিদাবাদ থেকে পালিয়ে পাটনার দিকে আসছিলেন পরাজিত নবাব। পথে গ্রেফতার হয়েছেন রাজমহলের কাছে।

এই খবর শুনে ভাঁজ পড়েছিল রামনারায়ণের কপালে। কারণ তিনি ছিলেন সিরাজদ্দৌলার প্রিয়পাত্র। নয়া জমানায় তাঁর অবস্থা যে টালমাটাল হবে সেটাই স্বাভাবিক।

সিরাজদ্দৌলা মসনদে বসার পর থেকেই রামনারায়ণ শুনে আসছিলেন, ঘসেটি বেগম, জগৎশেঠ, মিরজাফর, রায়দুর্লভ এরা নাকি সিরাজকে বরবাদ করার জন্য সাজিসিতে মেতেছেন। এসবে বড় একটা আমল দেননি তিনি। কারণ তিনি মনে করতেন আলিবর্দির নাতিকে মুর্শিদাবাদের কুরসি থেকে হটানো কোনও মামুলি বাত নয়। পরে রামনারায়ণ যখন শুনলেন, নবাবের সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানির লড়াইটা অনিবার্য হয়ে পড়েছে, ফৌজ নিয়ে ক্লাইভ মুর্শিদাবাদের দিকে আসছেন, তখনও তাঁর ধারণা হয়েছিল এই লড়াইতে গালেব হবেন সিরাজদ্দৌলা। একদল বিদেশি বেনিয়া কিছুতেই নবাবের বিরাট ফৌজের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না।

রামনারায়ণ মনে প্রাণে চেয়েছিলেন সিরাজের কামেয়াবি। এই শুভকামনা কতকটা তার নিজের স্বার্থেও। কারণ সিরাজ মসনদে থাকলে অটুট থাকবে তাঁর কুরসি, তাগদ, দৌলত।

পাটনা দুর্গের খাস দরবারে ফরাসের উপরে বসে সিরাজের মুসিবতের কাহিনি রামনারায়ণকে শোনাচ্ছিলেন জাঁ ল। তাঁর দেহের অভিব্যক্তিতে ফুটে উঠছিল স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। কৃপাপ্রার্থী হয়ে ল-সাহেব সেদিন এসেছিলেন পাটনা দুর্গে। ইংরেজদের উপরে পালটা আঘাত হানতে হলে নায়েবজির মদত চাই। কিন্তু ল-এর মনে সংশয়। এই পরিস্থিতিতে তিনি কি ফরাসিদের পাশে দাঁড়াবেন?

ইংরেজদের চক্রান্তে ও কূটনৈতিক চাপে পলাশির যুদ্ধের ঠিক আগে আগে ল-সাহেব ও তাঁর বাহিনীকে কাশিমবাজার থেকে বিতাড়িত করে পাটনায় পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলেন সিরাজদ্দৌলা। পাটনায় ল-সাহেব ও তাঁর ফৌজের খোশ-আমদেদ, খাতির-যত্নের আনজামে যেন কোনও গলতি না হয় সেটা নবাব চিঠি লিখে নায়েবজিকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিলেন। মনিবের সেই নির্দেশ এতদিন অক্ষরে অক্ষরে পালন করে এসেছেন রামনারায়ণ। কিন্তু আজ পরিস্থিতি ভিন্ন। ফরাসিরা ইংরেজদের দুশমন। কাজেই নয়া নবাবেরও দুশমন। ফরাসিদের গ্রেফতার করে মুর্শিদাবাদে চালান করে দিয়ে নিজের গদিকে মজবুত করা যায়। মিরজাফরের প্রতি ও ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য দেখানো যায়। কিন্তু আখেরে তাতে খুব কিছু লাভ হবে কি? ফরসির নল মুখে দিয়ে মনে মনে রাজনীতির ঘুঁটিগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে ভাবীকালের ছবিটা চোখের সামনে ভাসানোর কোশিশ করছিলেন কুশলী রামনারায়ণ।

অধীর হয়ে ল-সাহেব বলে উঠেছিলেন, ‘ফৌজদারের তাড়া খেয়ে রাজমহল থেকে কোনওরকমে আমরা ওয়াপস আসতে পেরেছি হুজুর। আমি জানি, ইংরেজরা সহজে আমাদের ছেড়ে দেবে না। আমাদের গ্রেফতারির জন্য ইংরেজ ফৌজও পাটনা পর্যন্ত ধাওয়া করে আসবে। এই ওয়াক্তে আপনিই ভরসা।’

‘কী মদত চান আপনারা?’ নীরবতা ভাঙলেন রামনারায়ণ।

‘আপনিই পারেন আমাদের বাঁচাতে।’

‘আমি তো আপনাদের হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারব না।’

ল-সাহেব ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠেন, ‘না না। আমি তা বলছি না। আপাতত কর্মনাশা নদী পেরিয়ে বারাণসীতে রাজা বলবন্ত সিং-এর কাছে আমরা আশ্রয় নিতে চাই। আমি দূত পাঠিয়ে এ বিষয়ে তার কাছে ইবাদত করেছিলাম। বলবন্ত সিং তা মঞ্জুর করেছেন। লেকিন ফৌজ নিয়ে বারাণসী পর্যন্ত যাওয়ার মতো রসদ আমার নেই।’

‘বুঝলাম।’ এই বলে ফরসির নল ছুড়ে দিয়ে উঠে বসে ঘন্টির ডোরিতে টান দিলেন নায়েবজি। ডেকে পাঠালেন দেওয়ান সাহেবকে। তখনই মঞ্জুর করে দিলেন ফরাসিদের বারাণসী যাত্রার রাহাখরচ। রামনারায়ণকে সেলাম জানিয়ে বিদায় নিলেন জাঁ ল।

দেওয়ান বলেছিলেন, ‘এ কী করছেন হুজুর? ফরাসিদের গ্রেফতার করে মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দিলেই তো আপনার মঙ্গল হত।’

এ কথার জবাব না দিয়ে রুপোর খাসদান থেকে একটা পান তুলে নিয়ে মুখে ফেলে চোখ বুজে চিবোতে চিবোতে মুচকি হেসেছিলেন রামনারায়ণ। এই অস্থির সময়ে দেশের হালহকিকত কখন কী ভাবে বদলাবে কেউ বলতে পারে না। নায়েবজির মাথায় তখন ঘুরছিল অন্য এক রাজনৈতিক কৌশল। আর এই কৌশল রূপায়িত করতে জাঁ ল তাঁর বাজি।

পাটনার অদূরে কর্মনাশা নদী পেরোলেই অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার রাজত্ব। হিন্দুস্থানের রাজনীতিতে সুজাউদ্দৌলা এখন খুবই শক্তিশালী। পাটনা থেকে বারানসি খুব দূরে নয়। সুজাউদ্দৌলার অধীনস্থ সামন্তপ্রভু বারাণসীর রাজা বলবন্ত সিং-ও যথেষ্ট তাগদবাজ। জাঁ ল-এর মাধ্যমে এঁদের সঙ্গে যদি একটা সুসম্পর্ক গড়ে তোলা যায় তো মন্দ কী? এই রিসতেদারি ভাবীকালে কাজে আসতে পারে। নিজামতের শাসন ব্যবস্থায় একেবারে নিচুতলা থেকে ধাপে ধাপে উপরে উঠেছেন রামনারায়ণ। তিনি আজ অঢেল সম্পত্তির মালিক। আপাতত অর্জিত সম্পদ রক্ষা করাই আশু কর্তব্য বলে স্থির করলেন রামনারায়ণ। তিনি নিশ্চিত তাঁকে বেদৌলত করার কোশিশ করবেন মিরজাফর খাঁ। নবাবকে চাপে রাখতে হলে সুজাউদ্দৌলার শিবিরের সঙ্গে রিশতেদারি গড়ে তোলাটা জরুরি।

ফরাসিরা পাটনা থেকে বিদায় নিতেই ফৌজ নিয়ে ধেয়ে এলেন মেজর আয়ারকুট।

পাটনার দিকে কোম্পানির ফৌজের আসার সংবাদ শুনেই মুঙ্গেরের কেল্লাদারকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন রামনারায়ণ। প্রবল ঝড়জলে ফৌজ নিয়ে বিপাকে পড়ে মুঙ্গের দুর্গে সাময়িক আশ্রয় চেয়েছিলেন আয়ারকুট। শত অনুরোধ সত্ত্বেও কেল্লাদার দুর্গের দরজা খুলল না। অগত্যা কেল্লার বাইরে তাঁবু খাটাতে বাধ্য হলেন আয়ারকুট। তাঁর সব রাগ গিয়ে পড়ল রামনারায়ণের উপর। ক্লাইভকে লেখা চিঠিতে রামনারায়ণের বিরুদ্ধে মনের সব আক্রোশ উগরে দিলেন মেজর সাহেব।

ক্লাইভের উত্তর এল, ‘ফার্স্ট অ্যারেস্ট জাঁ ল অ্যান্ড দেন রুইন দ্য ওল্ড ফক্স রামনারায়ণ।’

পাটনায় এসে আয়ারকুট শুনলেন জাঁ ল পালিয়ে গিয়েছেন ছাপরার দিকে। এদিকে মেজর আয়ারকুটের সঙ্গে নিজের ভাই মিরকাজিম ও মহম্মদ আমিনকে পাটনায় পাঠিয়েছেন নবাব মিরজাফর খাঁ। মির কাজিমের

নামে জারি হয়েছে পাটনার নায়েবগিরির পরোয়ানা। রামনারায়ণের উপর হুকুম হয়েছে অবিলম্বে মির কাজিমকে পাটনার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে মুর্শিদাবাদে যেতে হবে।

মিরকাজিমের আর তর সইছিল না। তিনি চাইছিলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, পাটনার কুরসিতে বসে পড়তে। কিন্তু পাটনা দুর্গে ঢুকতে গিয়েই ধাক্কা খেলেন। কেল্লার দরওয়াজা খুলল না প্রহরীরা।

রামনারায়ণ অত সহজে গদি ছেড়ে দেওয়ার বান্দা নন। কেল্লার সব দরজা বন্ধ করে দিয়ে তিনি পরিস্থিতির উপরে কড়া নজর রাখতে লাগলেন।

মুঙ্গের দুর্গে আশ্রয় না পেয়ে রামনারায়ণের উপরে বেশ চটেছিলেন আয়ারকুট, তার উপরে পাটনায় পৌছনোর পর তাঁকে ওয়েলকাম জানানোর জন্য কোনও প্রতিনিধিকে পাঠাননি রামনারায়ণ। এই সব নিয়ে আয়ারকুটের মেজাজ তখন ভয়ানক গরম। তাঁকে আরও একটু উত্তেজিত করে তোলার জন্য মিরকাজিম বললেন, ‘বেতমিজ নায়েবের তাকাব্বুরি দেখুন সাহেব। নিজে তো এলই না, আপনার খোশ আমদেদের জন্য কাউকে পাঠালও না। কেল্লার উপরে এখনই হামলা করুন।’

‘এই মামলার ফয়সালা পরে হবে। ফার্স্ট উই হ্যাভ টু অ্যারেস্ট জাঁ ল।’

‘ও চিড়িয়া তো উড়ে গেছে।’

‘উই মাস্ট চেজ হিম।’

মিরকাজিমের উত্তেজনা নিমেষে স্তিমিত হয়ে পড়ল। মুর্শিদাবাদ থেকে পাটনা আসার ধকলেই তাঁর হাঁফ ধরেছে। ফের ছুটোছুটি করতে হবে শুনে তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল।

দু’দিন পরে, পাটনা দুর্গের সামনে দিয়ে খুব বাড়াবাড়ি রকমের শব্দে ব্যান্ড বাজিয়ে কোম্পানির বিরাট বিরাট নিশান উড়িয়ে ছাপরার দিকে এগিয়ে চললেন আয়ারকুট। যেন রামনারায়ণকে বার্তা দিয়ে বলতে চাইলেন, অপেক্ষা করুন নায়েবজি, ফিরে এসে আপনার সঙ্গে বোঝাপড়াটা সারছি।

পাটনা দুর্গের কঙ্গুরায় দাঁড়িয়ে রামনারায়ণ সবই দেখলেন কিন্তু মুখে টুঁ শব্দটি করলেন না।

জাঁ-ল এর নাগাল পেলেন না আয়ারকুট। কর্মনাশা নদীর তীরে এসে তাঁকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। নদী পেরিয়ে আগেই সুজাউদ্দৌলার রাজত্বে ঢুকে পড়েছেন ল সাহেব।

মিরকাজিম বিরক্তির সঙ্গে বললেন, ‘ফালতু ছুটোছুটি সার হল। ওই বুড্ডা বেতমিজ রামনারায়ণের জন্যেই পরেশানি। উনিই তো রাহাখরচ জুগিয়ে ফরাসিদের মদত দিয়েছেন।’

ফের পাটনায় ফিরে এলেন আয়ারকুট। কেল্লার সমুখে এসে দেখলেন দরজা বন্ধ। আয়ারকুটের তর্জন গর্জন সত্ত্বেও প্রহরীরা দরওয়াজা খুলল না।

মিরকাজিম বললেন, ‘তোপ দাগুন সাহেব। তোপ দাগুন।’

ছাপরায় বসে কিছুদিন সোরার ব্যাবসা করে বেশ দু’পয়সা কামিয়ে আয়ারকুটের আগেকার গরম মেজাজটা তখন অনেক ঠান্ডা হয়েছে। যুদ্ধে অভিজ্ঞ মেজর সাহেব বুঝলেন, মাত্র দু’খানা তোপের ভরসায় আড়েবহরে বিশাল পাটনা দুর্গকে কবজা করা সম্ভব নয়। শুধু শুধু বেইজ্জত হতে হবে। রামনারায়ণকে সবক শেখাতে হলে আরও ফৌজের প্রয়োজন। চিঠিতে ক্লাইভকে এসব কথা জানিয়ে তাঁর পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় পাটনা দুর্গের অদূরে ছাউনি ফেললেন আয়ারকুট।

এবারে আর উপেক্ষা করা নয়, মেজর সাহেবের ভজনায় মন দিলেন চতুর রামনারায়ণ। কসিদের হাত দিয়ে পাঠালেন একটা চিঠি। ‘...হুজুর আমি আপনার গোলাম। আপনি পাটনায় এসেছেন শুনে আমি খুবই খুশি হয়েছি। আপনার খোশ আমদেদের জন্য কখন কী প্রয়োজন, জানাবেন। আপনার সেবা করতে পারলে এই বান্দা খুশি হবে...’ এই চিঠি পেয়ে আয়ারকুট খানিকটা নরম হলেন।

ইংরেজ ছাউনিতে গোপনে ভেট পাঠাতে শুরু করলেন নায়েবজি। কামিনী-কাঞ্চন দুইই।

ওদিকে রাজধানীর হালহকিকত সরেজমিনে সমঝবুঝ করে আসার জন্য রামনারায়ণ তাঁর বিশ্বস্ত কর্মচারী বচন সিংকে পাঠিয়ে দিলেন মুর্শিদাবাদে। তাঁর হাত দিয়ে দেওয়ান রায়দুর্লভের কাছে পাঠালেন একটা চিঠি। '...হুজুর আমি আপনার পিতার একান্ত অনুগত ছিলাম। তাঁরই খুশকামনায় আমি আজও পাটনার নায়েব। আমাকে বরখাস্ত করে মির কাজিমের নামে পাটনার নায়েবগিরির পরোয়ানা জারি করেছেন নবাব। এই হুকুমত আমি ইনকার করেছি। নবাবের নয়, বান্দা আপনার অনুগত। আপনি যা হুকুম করবেন, বান্দা তাই মেনে চলবে। এখন আপনিই জানান পাটনার কুরসিতে কে থাকবে?...'

কিছুদিন পরে মুর্শিদাবাদ থেকে ফিরে এল বচন সিং।

রামনারায়ণ ব্যস্ত হয়ে শুধোলেন, 'খবর কী?'

'পয়গাম শুভ। কুরসি ছাড়তে আপনাকে নিষেধ করেছেন দেওয়ানজি।'

রামনারায়ণের চোখদুটো চকচক করে উঠল। বললেন, 'বহুত আচ্ছা। এমনই আন্দাজ করেছিলাম আমি। রাজধানীর খাসখবর আর কী আছে?'

'দেওয়ানজি দহসতে রয়েছেন। অচানক নবাবজাদার হাতে খুন না হয়ে যান।'

'নবাব মিরজাফর খাঁ কেমন আছেন?'

'সহি সালামত, খুশ তবিয়ত আছেন, তবে নাম কিনেছেন কর্নেল ক্লাইভের মদ্দা গর্ধভ। বাকিটা আপনি সমঝে নিন।'

সজোরে হেসে উঠলেন রামনারায়ণ।

বচন সিং বলল, 'ক্লাইভ সাহেব সহায় হলে কোনও মুসিবত হবে না আপনার...লেকিন—'

বচন সিং-এর চিন্তিত মুখ দেখে রামনারায়ণ ব্যস্ত হয়ে শুধোলেন, 'লেকিন?'

'ক্লাইভ সাহেব চাইছেন আপনার বরবাদি।'

রামনারায়ণের কপালে ফের চিন্তার ভাঁজ পড়ল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বচন সিং বলল, 'আপনার ইজাজত ছাড়াই এক কাম আমি করে এসেছি। মুনশি নবকৃষ্ণকে বুঝিয়ে এসেছি, কেন আপনার পাটনায় থাকা দরকার। নজরানা ভি গুঁজে দিয়েছি মুনশিজির হাতে। কর্নেলকে সমঝানোর কোশিশ উনি করবেন।'

উচ্ছ্বসিত হয়ে রামনারায়ণ বলে উঠলেন, 'সাবাস বচন সিং।'

মুনশিজি বললেন, 'আয়ারকুট সাহেবকে খুশ রাখতে হবে।'

রামনারায়ণ মুচকি হেসে বললেন, 'এর শুরুয়াত হয়েছে। খেরিয়া ও জেনানা দুই পাঠাচ্ছি ইংরেজ ছাউনিতে। সাহেব রঙ্গিলা আদমি।'

'রামজিকি কৃপা। আয়ারকুট সাহেবের জন্য নিয়ে এসেছি বহুত কিমতি এক তোফা।'

অবাক হয়ে বচন সিং-এর মুখের দিকে তাকালেন রামনারায়ণ।

বচন সিং মুচকি হেসে বলল, 'গুলবদন এক জেনানা।'

পাহারারত দেশি সেপাই ও গোরা পল্টনদের বেষ্টনী টপকে পর্দা ঢাকা ডুলি নিয়ে বচন সিং ঢুকে পড়ে সেনাছাউনির মধ্যে। চারিদিকে সারি সারি অজস্র তাঁবু। তার মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে সরু পথ।

ডুলিবাহকরা এগিয়ে চলে। এ পথ তাদের খুবই চেনা। হররোজই রামনারায়ণের হুকুমে কোনও না কোনও জেনানাকে তাদের পৌঁছে দিতে হয় আয়ারকুটের তাঁবুতে।

ডুলির মধ্যে বসে ঈশ্বরী ভাবছিল তার নিজের কথা। ঝড়ে ঝরে পড়া গাছের পাতার মতো তার জীবনটা। ঝরে পড়া পাতা, কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় ঠাঁই পায় না। খেয়ালি হাওয়ায় শুধু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় উড়িয়ে নিয়ে যায়। তেমনই বাঁশবেড়িয়ার বৃন্দা সমাজচ্যুত হয়ে উড়েই চলেছে। বাঁশবেড়িয়া থেকে বরানগর। সেখান থেকে পাটনা। কোনও কিছু আঁকড়ে ধরে থিতু হওয়া তার নসিবে নেই।

শান্তিপুরের রাসের মেলায় হারিয়ে গিয়ে দালাল রতু সরকারের খপ্পরে পড়ে ঠাঁই মিলল বরানগরের বাড়িতে। কিছুদিন পরে একটা ঘরের মধ্যে তাকে জোর করে ঠেলে ঢুকিয়ে দরজার আগল টেনে দিয়েছিল বিদ্যামাসি। কুপির আলোয় সেই ঘরের মধ্যে কুরসিতে লালমুখো এক সাহেবকে বসে থাকতে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিল ঈশ্বরী।

সহসা কুরসি থেকে উঠে এসে দৈত্যাকার চেহারার সেই লালমুখো সাহেব এক ঝটকায় তাকে পাঁজা কোলে করে তুলে নেয়। ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিল ঈশ্বরী।

সেই শুরু। তারপর নিত্য সাহেবদের আনাগোনা শুরু হল তার ঘরে। তাদের মন ভরানোর রংঢং ঈশ্বরী সবই শিখল। রোজ রাতে, চেকনাই বসনে, প্রসাধনে নিজেকে মোহিনী করে তুলে ভালোবাসার অভিনয় করা, রাত পোহালে গভীর ক্লান্তি, অবসাদে ডুবে যাওয়া। এভাবেই চলছিল। হঠাৎই একদিন মনে রং ধরিয়ে গেল এক সাহেব। তার নাম ছিল আয়ারকুট।

রতু সরকার বলেছিল, ‘আমার মান রাখিস রে ঈশ্বরী। আজ তোর নাগর হল কোম্পানির ফৌজের এক বড় সাহেব। কী সৌভাগ্যি!’

কী জাদু ছিল সেই সাহেবের মধ্যে ঈশ্বরী জানে না। সে মজল ভালোবাসায়।

বিদ্যামাসি বলেছিল, ‘ওরে সব্বনাশী মেয়ে, এ কারবারে নেমে কাউকে মন বাঁধা দিতে নেই। তাতে তোরই লোকসান।’

কিন্তু রাধিকার মন কবে কার অনুশাসন মেনেছে। কেষ্ট ঠাকুরটি হয়ে আয়ারকুটও কিছুদিন মেতে রইলেন ঈশ্বরীকে নিয়ে। তারপর একদিন বন্ধ হল বরানগরের বাড়িতে আয়ারকুটের অভিসার। রতু সরকার বলল, ‘সাহেবে-নবাবে লড়াই বাঁধতে চলেছে। এখন কি তোকে নিয়ে আদিখ্যেতা করার সময় আছে তার?’

ঈশ্বরী বন্ধ করল কারবার। সারাদিন মন খারাপ করে শুয়ে থাকত ঘরে।

একদিন বিদ্যা বলল, ‘চল রে ঈশ্বরী, কাশী ঘুরে আসি।’

ফের ঝড়ের হাওয়ায় উড়ল ঈশ্বরী। কাশী যাওয়ার পথে বজরায় হামলা করল লুঠেরার দল। রতু সরকার ও বিদ্যামাসির কী হল তা সে জানে না। বর্ষার উত্তাল গঙ্গায় ছিটকে পড়ে বাঁচার কথা ছিল না, তবুও বাঁচল ঈশ্বরী। জল থেকে তাকে উদ্ধার করল বচন সিং। পাটনায় এক হাভেলিতে ঠাঁই হল ঈশ্বরীর।

বিরাট উঁচু পাচিল ঘেরা বিলাসবহুল এক হাভেলি। দিনের বেলাতেও সেখানে আঁধার। দিবারাত্র ঘরে জ্বলে দেওয়ালগিরির আলো। বন্দিনী ঈশ্বরীর দেখভাল করে কয়েকজন বাঁদি। এই হাভেলির বাইরে পা রাখার হুকুম নেই, উপায়ও নেই। সদর দরওয়াজার মুখে দিনরাত পাহারা দিচ্ছে ভোজপুরী সেপাই। কয়েকদিনেই এই বন্দি জীবন অসহ্য হয়ে উঠল ঈশ্বরীর কাছে। দিনরাত বিছানায় চুপ করে শুয়ে সে ভাবত কী করে পালানো যায় এই কয়েদখানা থেকে।

একদিন ঈশ্বরী শুনল কোনও এক মেহমানকে খুশি করার জন্য ভেট হিসেবে পাঠানো হবে তাকে। যথা সময়ে পর্দা ঢাকা ডুলি এল। সঙ্গে পাহারাদার ভোজপুরী সেপাই ও বচন সিং। বিনা বাক্য ব্যায়ে ডুলিতে চেপে বসল ঈশ্বরী। তার মনের মধ্যে তখন উঁকি মারছে এক চিলতে আশা। হাভেলি থেকে বেরোনোর সুযোগ পাওয়া গেল। নিয়তি কি ফের ঝড়ের হাওয়ায় তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে অন্য কোথাও?

ফরাসের উপর শাহি মেজাজে কাত হয়ে শুয়েছিলেন মেজর আয়ারকুট। সামনে সাজানো রয়েছে পানীয়ের বোতল। তার সমুখে এসে সেলাম জানাল বচন সিং।

বচন সিং-কে দেখেই পানপাত্র হাতে রঙিন মেজাজে আয়ারকুট বললেন, 'আইয়ে বাবু।'

বচন সিং এগিয়ে এসে মিনা করা মেহগিনি কাঠের একটা বাক্স তুলে দিল আয়ারকুটের হাতে।

বাক্স খুলতেই চোখ ঝলসে গেল আয়ারকুটের। হিরে-মুক্তো-চুনি-পান্নার বহুমূল্যবান অলংকার ঠাসা রয়েছে বাক্সে।

খোশামুদে হাসি হেসে বচন সিং বলল, 'রামনারায়ণজি পাঠিয়েছেন। আপনার নজর।'

বাক্সটা বন্ধ করে খোশমেজাজে মেজরসাহেব বললেন, 'বহুত আচ্ছা। নায়েবজিকে আমার সেলাম জানাবেন।'

'আউর এক তোফা আছে হুজুর। খুবসুরত এক লেড়কি।'

'ভেরি গুড।'

'ডুলি ভিতরে নিয়ে আসতে বলি?'

'জরুর।'

বচন সিং চলে যায়।

ডুলিবাহকেরা ডুলি নিয়ে প্রবেশ করে আয়ারকুটের তাঁবুর অন্দরে। পর্দা ঢাকা ডুলিটা মাটিতে নামিয়ে রেখে তারা চলে যায় নিঃশব্দে।

পর্দার আগল ঠেলে বেরিয়ে এসে মেজর আয়ারকুটকে দেখে ভয়ানক চমকে ওঠে ঈশ্বরী।

আয়ারকুট স্তম্ভিত। ফরাস থেকে উঠে ছুটে এলেন, 'এ কী? ডার্লিং তুমি?'

বিস্ময়ে, আবেগে, তীব্র উত্তেজনায় ঈশ্বরীর মাথার মধ্যে কেমন যেন চক্কর দিয়ে উঠল। বেসামাল হয়ে মাটিতে টলে পড়ে যাচ্ছিল সে। আয়ারকুট ধরে ফেললেন তাঁকে।

আয়ারকুটের বাহুবন্ধনে সংজ্ঞা হারাল ঈশ্বরী।

২৫

আলোয় আলোয় ছয়লাপ হালসিবাগানে গোবিন্দরাম মিত্তিরের বাগানবাড়ি। আলোর জলুসে হার মেনেছে রাতের অন্ধকার। সদর দেউড়িতে নহবতখানায় বাজছে সানাই। রংমহল থেকে ভেসে আসছে ঘুঙুরের ঠুংঠাং শব্দ, তবলার আওয়াজ। কৃষ্ণনগর থেকে এসেছে খ্যামটার দল। তারা মহড়ায় ব্যস্ত। খানাপিনার পর সারারাত ধরে নাচগান হবে।

বাগানবাড়ির চৌহদ্দিতে রয়েছে বিরাট এক দিঘি। পাথর দিয়ে বাঁধানো তার চারদিক। দিঘির মাঝে রয়েছে অপূর্ব নকশায় তৈরি এক জলটুঙি। সরু সরু লাল ইট, পোর্সেলিন ও শ্বেত পাথরের তৈরি আটকোণা ইমারত। ইটালিয়ান মার্বেলে মোড়া মেঝের উপরে পাতা হয়েছে নকশাদার গালিচা। মাথার উপরে জ্বলছে বেলজিয়ান ঝাড়বাতি। ঘাট থেকে জলের উপর দিয়ে সেতুর মতো পাথর বাধানো পথ জলটুঙি পর্যন্ত চলে গিয়েছে। জলটুঙিতে চলছে গুলতানি আর আড্ডা। পলাশির প্রান্তরে কোম্পানির জয়ের খুশিতে গোবিন্দরামের বাগানবাড়িতে ফূর্তিতে মেতেছেন কলকাতার গণ্যমান্য মানুষেরা। লক্ষ্মী ধর, শোভারাম বসাক, নীলমণি মিত্র,

শুকদেব মল্লিক, নয়নচাঁদ মল্লিক ও সুতানুটি-কলকাতা-গোবিন্দপুরের আরও অনেক গণ্যমান্য লোকেরা এসেছেন। খুশি নাচছে তাঁদের সকলের চোখেমুখে। কোম্পানির জয় যেন তাদেরই জয়।

আতরের গন্ধে ভুরভুর করছে চারিদিক। ফরাসের মাঝখানে সাজানো রয়েছে বিলিতি মদের বোতল আর বেলজিয়ান কাটগ্লাসের পানপাত্র। পানদানিতে থরে থরে সাজানো রয়েছে রুপোর তবকে মোড়া পানের খিলি। প্রত্যেকের বসার আসনের পাশে রাখা রয়েছে গড়গড়া। ফরসির নলটা টেনে নিয়ে ভুর ভুর করে খানিকটা অম্বুরি তামাকের ধোঁয়া ছেড়ে লক্ষ্মী ধর বললেন, ‘তা কী বুঝছ হে ভায়া গোবিন্দ?’

‘আমোদে আমার তো দিনরাত নেত্য করতে ইচ্ছে করছে ধরমশায়।’

‘বেড়ে বলেছ। কায়কারবার নিয়ে একরকম নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।’

‘যাই বলুন, কোম্পানি যে গালেব হবে, তা কিন্তু আমি ভাবতেই পারিনি। পলাশিতে মাত্র কয়েক প্রহরের মধ্যে সব হেস্তনেস্ত হয়ে গেল? আলিবর্দির নাতি উটের পিঠে চেপে ধাঁ?’ নয়নচাঁদ মল্লিকের ভাঁড়সুলভ কথার ভঙ্গিমায় মজা পেয়ে হেসে উঠলেন সকলে।

‘না হে! কর্নেল ক্লাইভ সত্যিই বাহাদুর আদমি।’

‘এতদিনে এ কথা বুঝলে হে নয়নচাঁদ?’

‘যাই বলুন ধরমশায়, এত সহজে যে মুশকিল আসান হবে তা কিন্তু আমি ভাবতেই পারিনি।’

‘বল কী হে নয়নচাঁদ? হালসিবাগানের কীত্তির পরেও ক্লাইভ সাহেবের উপরে ভরসা ছিল না তোমার? আক্কেল তোমার আর হবে কবে?’ রুপোর তবকে মোড়া পান মুখে ফেললেন লক্ষ্মী ধর।

নীলমণি মিত্র যোগ করলেন, ‘হক কথা বলেছেন মশায়। কাকভোরে কয়েকশো মাত্র ফৌজি নিয়ে নবাবের পিলে চমকে দিলেন ক্লাইভ। সেদিনই বুঝেছি এ লোক বাহাদুর বটে।’

‘বাহাদুর বলে বাহাদুর! একেবারে ডাকাতের মতো বুকের পাটা।’

নয়নচাঁদ বললেন, ‘এই খুনজোশি কোত্থেকে আসে বলুন দিকি? এরা খায় কী?’

বিলিতি মদের পানপাত্র হাতে তুলে দেখিয়ে লক্ষ্মী বললেন, ‘এইটে।’

ফের হেসে উঠল সকলে।

‘ধরমশায় আমাদের রসিক চূড়োমণি।’ এই বলে মদের গেলাসে চুমুক দিলেন গোবিন্দরাম।

লক্ষ্মী ধর বলে উঠলেন, ‘ও হে গোবিন্দ তোমাকে তো কায়েত কুলের সাত্ত্বিক পো বলে জানতাম। এখন দেখছি তুমিও এ রসে মজেছ? ভালো ভালো। বুঝতে পারছি দিনকাল বদলাচ্ছে।’

‘অতঃপর এ শহরে কেতায় বাঁচতে হলে এ ছাড়া আর গতি কী ধরমশায়? গঙ্গাজলে তো আর সাহেবভজনা চলবে না। কী বলেন অ্যাঁ?’ গোবিন্দরাম সজোরে হেসে ওঠেন।

‘হ্যাঁ। এই হল গে হক কথা।’ ফরসির নলটা টেনে নিয়ে নকু ধর ফের বললেন, ‘কোম্পানিই যে কলকেতার ভবিতব্য, তা অবিশ্যি আমি আগেই বুঝেছিলাম।’

নীলমণি মিত্র বললেন, ‘আপনি ক্ষণজন্মা পুরুষ।’

‘ইংরেজরা নবাবের তাড়া খেয়ে ফলতায় গিয়ে উঠল, আর তোমরা হায়-হায়, গেল-গেল করে ঘরের দোর আটকে মাথা চাপড়াতে লাগলে।’

শোভারাম বসাক বেজার মুখ করে বলে উঠলেন, ‘এ ছাড়া আর উপায় কী ছিল ধরমশায়? আমার তিন-তিনখানা গুদাম, কাপড়ে ঠাসা। আগুনে পুড়ে একেবারে—তার উপরে এদ্দিন ধরে কারবার বন্ধ। উঁ-হু-হু-হু! লোকসান! লোকসান আর লোকসান!’

অম্বুরি তামাকের ধোঁয়া ছেড়ে লক্ষ্মী ধর বিরক্তির সঙ্গে বলে ওঠেন, ‘নাকে কেঁদো না তো হে শোভারাম। সমুখ পানে তাকাও।’

শুকদেব মল্লিক বললেন, ‘হ্যাঁ। হ্যাঁ। ঠিক কথা। লোকসান কার হয়নি শুনি? এবারে সব উশুল করে নেবেন। সুতানুটির ঘাটে কোম্পানির শয় শয় জাহাজ একেবারে হামলে পড়বে।’

নীলমণি মিত্র শুধোলেন, ‘তা আপনি কী করে এত নিশ্চিত ছিলেন ধরমশায় যে ইংরেজরা ফের কলকাতায় ফিরে আসবে?’

‘বাপু হে, আমি ভাবীকালের নাড়ির গতি টের পাই। আন্দাজ করেছিলাম, নবাবের সঙ্গে ঝামেলাটা সাময়িক। কোম্পানি আপোসে, উৎকোচে মিটিয়ে নেবে। কাঞ্চনবটিকা যে বিষহরি তা কে না জানে? তাছাড়া ইংরেজদের কারবার বন্ধ থাকলে নিজামতেরও তো শুল্ক খাতে মেলা লোকসান। ভাবলাম, সাহেবরা আতান্তরে পড়েছে, নবাবের সঙ্গে মিটমাট না হওয়া পর্যন্ত এদের বাঁচিয়ে রাখা দরকার। নবকেষ্টর হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে বললাম—চুপিচুপি ফলতায় রসদ পৌঁছে দিতে পার? সাহেবগুলো যে বেঘোরে মরতে বসেছে।’

‘বলিহারি সাহস আপনার!’

‘তোমরা তো সব ঘরের দোরে খিল দিয়েই খালাস।’

‘নবাবের রোষে পড়লে যে গর্দান যেত। নাকের ডগায় ঘুরঘুর করছে মানিকচাঁদের কাসিদরা। ভয় করেনি আপনার?’ শুধোলেন শোভারাম।

‘আরে রাখো তোমার মানিকচাঁদ। অমন কত চাঁদকে দেখলাম। কাঞ্চনবটিকায় সব মাতব্বর ঢিট। নবকেষ্ট আমাদের ডাকাবুকো ছেলে। এককথায় ফলতায় রসদ পৌঁছে দিতে রাজি হয়ে গেল। তরে গেল সাহেবরা। তারপর ক্লাইভ সাহেব এলেন। বাকি সবই তো তোমরা জান।’

গোবিন্দরাম বললেন, ‘পলাশিতে চূড়ান্ত হেস্তনেস্ত হয়ে ভালোই হয়েছে।’

লক্ষ্মী ধর বললেন, ‘তা একপ্রকার ঠিক। আপাতত আপোসে-উৎকোচে কাজিয়া মিটলেও পরে নবাবের সঙ্গে ফের খিটিমিটি বাধত কোম্পানির। তার চেয়ে আপদ একেবারে বিদেয় হল। এবারে টাকা উড়বে কলকেতায়।’

নয়নচাঁদ মল্লিক বললেন, ‘শুনতে পাই ক্লাইভ সাহেবের মস্ত মুরুব্বি হয়েছে নবকেষ্ট।’

লক্ষ্মী ধর বলেন, ‘হবেই তো। ছোকরা তুখোড় বুদ্ধি ধরে। সে এবারে আসমানে উড়বে।’

গোবিন্দরাম মিত্তির বললেন, ‘ক্লাইভ সাহেবের হাত মাথায় থাকলে পাখা মেলতে আর অসুবিধা কোথায়?’

লক্ষ্মী ধর বললেন, 'নবকেষ্ট দিশি সমাজের মাতব্বর হল বলে।'

শোভারাম বসাক বললেন, 'নবকেষ্টকে দিয়ে তড়িঘড়ি আমাদের ক্ষতিপূরণের দাবিটা ক্লাইভ সাহেবের কানে তুললে হয় না?'

গোবিন্দরাম বলে ওঠেন, 'হবে হবে। সব হবে। অত তাড়াহুড়ো কীসের? আগে তো সাহেবকে কলকেতায় ফিরতে দিন।'

নয়নচাঁদ মল্লিক প্রশ্ন করেন, 'সাহেব ফিরছেন কবে? কিছু জানেন?'

'দেরি আছে। এখন উনি ওনার পোষা মদ্দা গর্ধভটাকে জুত করে চানা খাওয়াচ্ছেন।'

নীলমণি মিত্র অবাক হয়ে শুধোলেন, 'সাঁটে এ আবার কী বলছেন ধরমশায়?

'ক্লাইভ সাহেব একখানা মদ্দা গর্ধভ পুষেছেন।' এই বলে লক্ষ্মী ধরের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে ফিক করে ফিচেল হাসি হাসলেন গোবিন্দরাম।'

'গৌরচন্দ্রিকা ছেড়ে আসল কথাটা বলুন দিকি।'

'ও হে গোবিন্দ তুমিই বল।'

'কর্নেল ক্লাইভের মদ্দা গর্ধভ—নয়া নবাবকে এই খেতাব দিয়েছেন দরবারের ভাঁড় মির্জা শামসুদ্দিন। ক্লাইভ সাহেবের হুকুম ছাড়া মিরজাফর খাঁ সাহেব নড়াচড়া করেন না। বড় বাধ্য পোষ্য। ধরমশায়কে এসব চিঠিতে লিখেছে নবকেষ্ট।' বললেন গোবিন্দরাম।

'ক্লাইভ সাহেব এখন তাঁকে খাইয়েদাইয়ে পুরুষ্টু করছেন। পরে সময় মতো জুত করে জবাই করবেন।' এই বলে হ্যা হ্যা করে হেসে উঠলেন লক্ষ্মী ধর।

বাকি সকলে তার সঙ্গে যোগ দিল হাসিতে।

কাশিমবাজার, কাটোয়া, অগ্রদ্বীপ, কালনা, হুগলি পার হয়ে এগিয়ে চলেছে কোম্পানির নৌবহর। সামনে পিছনে যুদ্ধজাহাজ। মাঝে দুশো নৌকো। লুঠের মালে বোঝাই। পলাশির গনিমত। নদীর দুপাড়েই অজস্র কৌতূহলী মানুষের ভিড়।

নবাবকে এ যাবৎকাল সর্বশক্তিমান বলে জেনে এসেছে সাধারণ মানুষ। এতকাল সুবে বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দৌলত পাড়ি দিয়েছে কেবল মুর্শিদাবাদের দিকে। আজ উলট-পুরাণ ঘটছে। অবশ্য বর্গিরা যে বাংলার দৌলত লুঠে নিয়ে যায়নি, তা নয়। তারা আসত ঘোড়ার পিঠে চেপে নবাবের সৈন্যদের তাড়া খেয়ে তস্করের মতো পালিয়ে যেত। কিন্তু আজ যে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছে ভাগীরথীর দু'পাশের অগণিত মানুষ তা এককথায় অদৃশ্যপূর্ব। নবাবের দৌলত নিয়ে যুদ্ধ জাহাজের পহারায় রীতিমতো ব্যান্ড বাজিয়ে, নিশান উড়িয়ে কলকাতায় ফিরছে ইংরেজরা। তস্করের মতো লুকিয়েচুরিয়ে নয়, চারিদিকে রীতিমতো শোরগোল ফেলে চলেছে তারা।

তাজ্জব চুঁচুড়ার ডাচেরা। ফোর্ট গুস্তাভাসের আনাচকানাচ থেকে, চুঁচুড়ার ঘাটের আশপাশে অবস্থিত বাড়িগুলোর অলিন্দে, ছাতে, জানলায় উঁকি মারছে অজস্র কৌতূহলী মুখ। কতকটা ইচ্ছাকৃত ভাবেই শূন্যে পরপর তিনবার তোপধ্বনি করল ওয়াটসনের জাহাজ কেন্ট। যেন ডাচদের উদ্দেশে বলতে চাইল, ওহে দু'চোখ ভরে দেখে নাও, ইংরেজদের কুদরতি।

সূর্য পশ্চিমে ঢলছে। বিছানা থেকে উঠে এসে ডেকের উপরে আরামকেদারায় বসলেন অ্যাডমিরাল ওয়াটসন। শরীরটা বিশেষ ভালো নেই। খানিকবাদে অর্ডারলি এসে আরামকেদারার পাশে চৌপাইয়ের উপরে রেখে গেল বিয়ারের মগ। পেরিন পয়েন্ট অতিক্রম করছে নৌবহর। ওয়াটসনের কানে ভেসে এল জনতার হর্ষধ্বনি। বিয়ারের মগটা হাতে নিয়ে আরামকেদারা ছেড়ে উঠে এসে ডেকের রেলিং-এর পাশে দাঁড়ালেন

ওয়াটসন। অবাক চোখে দেখতে লাগলেন নদীর পাড়ে জমায়েত হওয়া মানুষের প্রতিক্রিয়া। উত্তেজনায় সবাই যেন লাফাচ্ছে। দিশি লোকেদের মধ্যে কেউ কেউ ওড়াচ্ছে ইউনিয়ন জ্যাক। সেই একই দৃশ্য, যে দৃশ্য তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন বজবজ কেল্লা দখল করার পর নৌবহর নিয়ে কলকাতায় আসার পথে।

সেদিন চমকে উঠেছিলেন ওয়াটসন। এদেশের নবাবের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছেন বজবজের কেল্লা, চলেছেন ফোর্ট উইলিয়াম পুনর্দখল করতে, তবু এদেশি মানুষদের এত উচ্ছ্বাস কেন? এরা তো সব নবাবের প্রজা। কলকাতায় কিছুকাল কাটিয়ে ওয়াটসন বুঝেছিলেন আজব এই শহরের মানুষগুলোর ভালোবাসার ঢেউ ইংরেজদের অনুকূলে বাড়াবাড়ি রকমের বেশি।

সে সময় রাজা-প্রজা, সাহেব-নেটিভ বিভাজনটা তত প্রকট হয়ে ওঠেনি ইংরেজ ও এদেশি লোকেদের মধ্যে। ভাবীকালের গর্ভে কী লেখা রয়েছে তা কেউ জানত না। ইংরেজরাও জানত না যে আগামী প্রায় দুশো বছর তারা শাসন করবে এই দেশকে। দিশি লোকেদের কাছে তখনও ইংরেজরা নিছকই একদল বণিক। যাদের কারবারের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দিশি মানুষদের রুজি-রোজগারের ওতপ্রোত সম্পর্ক।

কেল্লাঘাটের দিকে যত এগোতে লাগল জাহাজ তত যেন উচ্ছ্বাস বাড়তে লাগল নদীর পাড়ে জমায়েত লোকেদের। শুধু অগণিত কালো কালো মাথা।

সূর্য তখন অস্ত গিয়েছে। পশ্চিমাকাশে নানা রঙের খেলা। দিনের আলো ফুরোতে অবশ্য এখনও বেশ কিছুটা দেরি আছে। কেল্লার ঘাটে এসে ভিড়ল ওয়াটসনের জাহাজ। তার পিছনে তখন একে একে পাড়ে ভিড়ছে লুঠের মালে বোঝাই নৌকোগুলো। ভাগীরথীর ধারা বেয়ে সুতানুটির ঘাটে এসে ভিড়ছে মুর্শিদাবাদের দৌলত। এ যেন এক অলীক স্বপ্ন। এও কী সম্ভব? এই অত্যাশ্চর্য দৃশ্য চাক্ষুস করার জন্য মেলা হুড়োহুড়ি ঠেলাঠেলি ঘাটে। হাজির সুতানুটি-গোবিন্দপুর-কলকাতার বিত্তবান মানুষেরাও। ভিড় ঠেলে ঘাটের কাছে পৌঁছতে খাবি খাচ্ছেন গোবিন্দরাম মিত্তির, লক্ষ্মী ধর, শোভারাম বসাক, নয়নচাঁদ মল্লিক, শুকদেব মল্লিক, নীলমণি মিত্র ও আরও অনেকে।

হঠাৎ ওয়াটসনের মাথাটা কেমন যেন চক্কর দিয়ে উঠল। চোখে অন্ধকার দেখলেন। হাত থেকে ডেকের কাঠের পাটাতনের উপরে ছিটকে পড়ল বিয়ারের মগ। মাটিতে টলে পড়ে যাচ্ছিলেন অ্যাডমিরাল। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ক্যাপটেন ওয়েলার জাপটে ধরে ফেললেন তাঁকে।

ওয়েলার দেখলেন অ্যাডমিরাল গায়ে ধুম জ্বর। তিনি বেহুঁশ হয়ে গিয়েছেন।

২৬

মসনদে বসেই নবাব মিরজাফর খাঁ যে টাকা ইংরেজদের দিয়েছিলেন তাতে ক্লাইভের ভাগে পড়েছিল একুশ লাখ। যদিও তখন মিরজাফরের মনে হয়েছিল ক্লাইভের কুদরতি বা প্রতিভার অনুপাতে এই টাকা পরিমাণে খুবই কম। রবার্ট ক্লাইভের নাম মাহাত্ম্যে মিরজাফর খাঁ তখন সম্মোহিত। ক্লাইভ সাহেবকে খুশি করার জন্য তিনি অস্থির হয়ে পড়েছেন। কৃতজ্ঞতায়, ভক্তিতে, দুর্দান্ত আবেগে, জল ছলছল চোখে কেবলই ভাবছেন, কর্নেল ক্লাইভ তাঁর জন্যে যা করলেন, কোনও কিছুর বিনিময়েই তার কিম্মত মেটানো যায় না।

মসনদে বসার পর মিরজাফরের মনে হয়েছিল, তিনি যেন বেহেস্তের সুখদরিয়ায় ভেসে চলেছেন। জিন্দেগি তার কাছে আগে কখনও এমন রংদার, খুশবুদার, সুনহারি একখণ্ড খোয়াব হয়ে ওঠেনি। যা ছিল অলীক স্বপ্ন, তা সত্যি হয়েছে ক্লাইভের কুদরতিতে।

না না না! মাত্র একুশ লাখ টাকা কিছুতেই ক্লাইভের হেকমতির কিম্মত হতে পারে না। তার প্রাপ্য আরও বেশি। দেওয়ান রায়দুর্লভের সঙ্গে আলোচনা করে কর্নেল ক্লাইভকে আরও দেড়লাখ টাকা বখশিস

দিয়েছিলেন মিরজাফর খাঁ। সেই সঙ্গে দিয়েছিলেন রত্নখচিত উষ্ণীষ, রাজপোশাক, তরবারি, একটা হাতি, দুটো সফেদ ইরানি ঘোড়া। সেই সঙ্গে সালাবৎজঙ্গ উপাধি।

ক্লাইভের চোখেমুখে উপচে পড়ল খুশি।

এত দিয়েও মিরজাফরের আশ মেটেনি। কলকাতা সংলগ্ন চব্বিশ পরগনার জমিদারি ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির নামে লিখে দিলেন মিরজাফর খাঁ। তাঁর কাছে ক্লাইভ মানেই কোম্পানি আর কোম্পানি মানেই ক্লাইভ।

নবাবকে তসলিম জানিয়ে ধূর্ত রবার্ট ক্লাইভ বলেছিলেন, 'বহুত বহুত সুক্রিয়া জনাব। আমাদের রিশতেদারি জিন্দেগিভর অটুট থাকুক।'

মিরজাফর বলেছিলেন, 'আপনি খুশ তবিয়ত, সহি সালামত থাকুন।'

এই অবধি সব ঠিকই ছিল। কিন্তু তারপর থেকে ধীরে ধীরে ক্লাইভ ও ইংরেজদের কদর্য, কুৎসিত, লোভী চেহারাটা মিরজাফরের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। খোয়াবের দুনিয়া থেকে বাস্তবের মাটিতে আছড়ে পড়লেন মিরজাফর খাঁ। মোহভঙ্গ হল অচিরেই।

সেই রাতের স্মৃতি মিরজাফরের কাছে এক দুঃস্বপ্নের মতো।

মুনশি নবকৃষ্ণ ও দেওয়ান রামচাঁদকে সঙ্গে নিয়ে গোপনে হিরাঝিল প্রাসাদে এসে সিরাজের দৌলত লুঠ করে নিয়ে গেলেন রবার্ট ক্লাইভ। সেদিন কর্নেলের চোখেমুখের লোভ ও লালসার ভয়ানক আপসানি দেখে শিউরে উঠেছিলেন মিরজাফর। যাঁকে তিনি অন্তরে প্রায় পয়গম্বরের আসনে বসিয়েছিলেন, তাঁর বেসরম ডাকাইতি দেখে মিরজাফরের সুখস্বপ্ন ভেঙে খানখান হয়ে গিয়েছিল। সেদিন কর্নেল ক্লাইভকে দেখে মনে হয়েছিল দোজখের এক অশুভ প্রেতাত্মা দৌলতের লালচে হাজির হয়েছে হিরাঝিল প্রাসাদের চোরাকুঠরিতে।

ক্লাইভের ওই আচরণ মন থেকে মেনে নিতে না পারলেও তাঁর মুখের উপরে বলতে পারেননি—'আপনি এ কাজ করতে পারেন না জনাব। আমি সুবে বাংলার নবাব মিরজাফর খাঁ। আর যাই হোক না কেন, নিজের জবানের ওজন বুঝি। ইকরারনামায় যে টাকা আপনাদের দেব বলে কবুল করেছিলাম, তা আমি কড়ায়গণ্ডায় মিটিয়ে দেব। এর বরখেলাপ হবে না। প্রথম কিস্তি আপনারা পেয়েছেন, আর দুই কিস্তিও সময়মতো পাবেন। ভেবে দেখবেন, চুক্তির বাইরেও আরও অনেক কিছু আপনাকে আমি দিয়েছি। খুশি হয়েই দিয়েছি। দিয়েছি বাড়তি দেড় লাখ টাকা। এছাড়াও চব্বিশ পরগনার জমিদারি দিয়েছি কোম্পানিকে। আর কত চাই আপনার? আপনি ইমানদার আদমি। আমার মেহমান। আপনাকে প্রায় পয়গম্বরের আসনে বসিয়েছিলাম। নবাবের অন্দরমহলে ঢুকে আপনি ডাকাইতি করতে পারেন না।'

এসব কথা কেন সেদিন বলতে পারেননি নবাব? কারণটা হল ভয়- দহসত। ভয়টা মসনদ হারানোর। কর্নেল ক্লাইভ হাত ধরে তাঁকে মসনদে বসিয়েছেন। তিনি পাশ থেকে সরে গেলে মসনদও টলমল করে উঠবে—এই আন্দেশা থেকেই ভীতি। তাই ক্লাইভের সব আবদার মুখ বুজে মেনে নেওয়াটাই দস্তুর করে তুলেছেন নবাব। ক্লাইভ সাহেবের খায়েশের গোলাম হয়ে উঠেছেন তিনি।

'হা-হা-হা-হা!' কেউ যেন অট্টহাস্য করে উঠল মহাশূন্য থেকে।

'কে?' চমকে উঠে প্রশ্ন করেন মিরজাফর।

'আমি আলিবর্দি খাঁ। সিরাজের সঙ্গে গদ্দারি করে তুমি কতটা সুখ খরিদ করেছ?'

'আমাকে মাফ করুন জাঁহাপনা।'

'মসনদের মালিক এখন তুমি। পারবে তো এর ইজ্জত রাখতে? একটা কথা ইয়াদ রেখো, কারও তাঁবে থেকে মসনদের মালিক হওয়া যায় না। মসনদ চায় তাগদ। যার তাগদ নেই, মসনদ তাকে ছুড়ে ফেলে দেয়।'

মিলিয়ে যায় নবাব আলিবর্দি খাঁ'র কণ্ঠস্বর। বিস্মিত, বিহ্বল দৃষ্টিতে শূন্য পানে চেয়ে থাকেন নবাব। তাঁর চোখের পর্দায় কাঁপছে হিরাঝিল প্যালেসের সেতুন, খিলান, চকমিলানো মেঝে। কাঁপছে ছাতের গুলবাগিচা।

সহসা ফের চমকে ওঠেন নবাব। তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে এক ছায়ামূর্তি। যদিও অস্পষ্ট অবয়ব, তবু তাঁর চলনের ভঙ্গিমা খুবই পরিচিত। সামনে এসে দাঁড়ায় এক যুবক।

নবাব শিউরে ওঠেন।

খুন ঝরছে সেই যুবকের বুক থেকে। রক্তে ভেজা তাঁর গায়ের সদরিয়া। চোখদুটো কোটরাগত। মুখে অযত্নে বেড়ে ওঠা দাড়ি। তাঁর মাথায় উষ্ণীষ। তার গায়ে সুতো দিয়ে গাঁথা বহুমূল্যবান একখানা হিরকখণ্ড জ্বলজ্বল করছে।

'চিনতে পারছেন জনাব?'

'সি-রা-জ?' ভয়ে কাঁপতে থাকেন মিরজাফর।

'কেমন আছেন নবাব?' সিরাজের মুখে লেগে আছে হাসির রেশ।

কাঁপা গলায় মিরজাফর খাঁ শুধোলেন, 'কী চান হুজুর আপনি?'

'কিছু না জনাব। স্রেফ একবার দেখতে এলাম আপনাকে।'

ভয়ার্ত দৃষ্টিতে সিরাজের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন মিরজাফর।

'দেখছেন কী অমন করে?' শুধোলেন সিরাজ।

'খুন ঝরছে আপনার কলিজা থেকে।'

'খুন নয় জনাব। তাজা গুলাব। মহম্মদীর পেয়ার।'

'খুব কষ্ট হয়েছিল না আপনার?'

'ইয়াদ নেই। আখিরাতে আমি ডুব দিয়েছি বেহেস্তের কওসরে।'

'আমাকে মাফ করুন হুজুর।'

'আপনি নিমিত্তমাত্র। আমি বদ কিসমতির শিকার। থাক ওসব কথা। কেমন আছেন আপনি?'

ডুকরে কেঁদে উঠে মিরজাফর বলেন, 'আমি ভালো নেই হুজুর।'

'চোখের পানি নবাবের জন্য নয়। নিজেকে বেইজ্জত করবেন না।'

'বেইজ্জত হওয়ার জন্যই যে আমি মসনদে বসেছি হুজুর। আপনি ছিলেন আজাদ। আমি আজাদ নই। আমি ইংরেজদের হাতের পুতুল।'

'ইংরেজ কাঁটা আপনি উপড়ে ফেলুন তুরন্ত।'

'আমি পারব না। আমি বেওকুফ, বুজদিল আদমি।'

'এখনও সময় আছে। নিজেকে শক্ত করুন।'

সিরাজের ছায়ামূর্তি মিরজাফরের চোখের সামনে আবছা হয়ে আসতে থাকে।

নবাব চেঁচিয়ে ওঠেন, 'আপনার সঙ্গে গদ্দারি করে আমি গুনাহের কাজ করেছি। আমাকে রহেম করুন হুজুর। রহেম করুন। আস্তাগফেরুল্লাহ।'

নিজের চিৎকার শুনে নিজেই চমকে ওঠেন মিরজাফর খাঁ। গিরদায় হেলান দেওয়া অবস্থা থেকে ধড়ফড় করে উঠে বসেন। নবাবের গলার আওয়াজ শুনে ছুটে আসে কয়েকজন গোলাম-বাঁদি। হাতের ইশারায় প্রবল বিরক্তির সঙ্গে তাদের চলে যেতে ইঙ্গিত করেন নবাব।

সন্ধে নামছে। হিরাঝিলকে ঘিরে ধরা গাছগাছালি থেকে ভেসে আসছে পাখির কলকাকলি। নহবতখানা থেকে ভেসে আসছে সানাইয়ের সুর। জোর একপশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে ক্ষণিক আগে। হিরাঝিলের উপর দিয়ে ভেসে আসছে শীতল বাতাস। ছাতের বাগানে, পোর্সেলিনের টবে বেড়ে ওঠা জুঁই, বেলফুল সুবাসে আমোদিত করছে চারিদিক।

দরদর করে ঘামছেন মিরজাফর খাঁ। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। শরাবের ঘোরে এতক্ষণ জেগে জেগে কি খোয়াব দেখছিলেন? নবাব আলিবর্দি খাঁ, সিরাজদ্দৌলা কেমন করে ফিরে আসবেন এই দুনিয়ায়? তাহলে

তিনি কি কথা কইছিলেন নিজের সঙ্গে? তাঁর অবচেতন মন কি কথা কইছিল রক্তমাংসের মানুষটার সঙ্গে?

শূন্য পানপাত্র কাত হয়ে পড়ে আছে ফরাসের উপরে। সেদিকে চোখ গেল নবাবের। ঘন্টির ডোরিতে টান দিয়ে চেচিয়ে উঠলেন, 'শরাব! শরাব! শরাব দিয়ে যা বেতমিজ।'

ত্রস্ত হয়ে সাকি ছুটে আসে। শূন্য পাত্র পূর্ণ করে দিয়ে চলে গেল দ্রুত।

পাত্রটা হাতে তুলে নিয়ে এক চুমুকে পাত্রের সবটুকু শরাব খতম করে দিলেন নবাব। অবশ হয়ে আসতে থাকে তাঁর চেতনা। শরাব সব জহমত, তকলিফের একমাত্র ইলাজ।

'সরতাজ?'

'কে?' চমকে উঠে ঘুরে তাকিয়ে জড়ানো গলায় প্রশ্ন করেন নবাব। বেগমকে দেখে মুখে এক চিলতে হাসি এনে মিরজাফর বলেন, 'ও তুমি! এসো বেগম।'

নবাবের পাশে এসে বসেন মণি বেগম। আজ বড় সুন্দর করে সেজেছেন বেগম। পরনে জামদানি কুর্তা ও শাদা পেশোয়াজ। জরির ফিতে দিয়ে চুড়ো করে বাঁধা মাথার চুল। চোখে কাজল, সুরমা। আনারদানার রঙের নরম গাল দুটোতে চিকচিক করছে আঁফসাচূর্ণ। কপালে বিন্দিয়া। ঠোঁট তাম্বুলরাঙা। গলায় জড়োয়ার নেকলেস। অনামিকায় ঝলকাচ্ছে হিরের আংটি।

মণি বেগম হাসলেন। সে হাসিতে যেন মুক্তো ঝরে পড়ল। অন্তরের সব জ্বালাযন্ত্রণা ভুলে ক্ষণেকের জন্য বেগমসাহেবার মুখপানে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন মিরজাফর খাঁ। মণি বেগম কাছে এলে তাঁর মনে হয়, এই বুঝি আসমান থেকে যেন চাঁদ নেমে এল মাটির দুনিয়ায়।

'তোমাকে অপূর্ব দেখাচ্ছে মণি।'

'আজকের দিনটা মনে পড়ে নবাব?'

'আজকের দিন?' নবাব প্রশ্ন করেন।

মণি বেগম কপট অভিমানের সঙ্গে বলেন, 'ইয়াদ নেই আপনার?'

নবাব মৃদু হেসে বলেন, 'বয়স হয়েছে তো বেগম। সব কিছু মনে থাকে না।'

'মসনদে বসে হল কী আপনার? ক'দিন পরে আমাকেও ভুলে যাবেন।'

'ও কথা বলো না বেগম। আর সব কিছু ভুলে গেলেও আসমানের চাঁদকে কি ভোলা যায়?'

মণি বেগম হেসে বলেন, 'এই দিনে আমাদের পহেলা মোলাকাত হয়েছিল।'

'কতকালের কথা। তুমি সেই একই রকম আছ বেগম। আমি বোধ হয় অনেক বুড্ডা হয়েছি।'

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন নবাব। চেয়ে থাকেন আঁধারের কালিতে মোড়া আসমানের পানে। গভীর চিন্তায় মগ্ন। মেঘে ছাওয়া আকাশে আজ নক্ষত্রের দেখা নেই।

'কী হয়েছে? আপনাকে বড় চিন্তিত মনে হচ্ছে?' মণি বেগম প্রশ্ন করেন।

'শরীরে বড় ক্লান্তি বেগম। আমি ঠকে গিয়েছি।'

'চলুন আমরা হিরাঝিলের ঘাটে গিয়ে বসি। ঠান্ডা বাতাসে শরীর জুড়িয়ে যাবে।'

নবাব হঠাৎ ব্যাকুল কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'আমি বোধহয় সুবে বাংলার মসনদে বসার মতো কামিল-ই-ইনসান নই বেগম।'

'কেন বলছেন এ কথা?'

'মুর্শিদকুলি, সুজাউদ্দীন, আলিবর্দি, সিরাজদ্দৌলা এঁরা আজাদ ছিলেন, আর আমি? কোম্পানির হাতের পুতুল।'

প্রায় আসমান সমান ঠেলে ওঠা এক অসহায়তা যেন হাহাকার করে উঠল।

নবাবের চোখে জল। মণি বেগম শুধোলেন, 'এসব কী ভাবছেন আপনি?'

'একদল ভিনদেশি কারবারি কখনও নবাবের দোস্ত হতে পারে না। একথা মুর্শিদকুলি বুঝেছিলেন, আলিবর্দি বুঝেছিলেন, সিরাজও বুঝেছিল। আমি বেওকুফ। তাদের দোস্ত হতে গিয়ে গোলাম হয়েছি।'

একটা রাতচরা পাখি ডেকে উঠল। বড় মনহুস আওয়াজ। মণি বেগম কেঁপে উঠলেন।

মিরজাফর জড়ানো গলায় বলে চললেন, 'আমি নামেই নবাব। নিজামতের রাশ ধীরে ধীরে হাতে নিচ্ছে ইংরেজ। আমি বোধ হয় ভুল করেছি বেগম। নিমকহারামি, গদ্দারির শর্তে মসনদ দখল এক বদিয়তি। যে গুণাহগারির কাজ আমি করেছি তার কিস্মত চোকাতে হবে আমাকে। একটু একটু করে দেখতে হবে নিজামতের বরবাদি।'

'না-আ-আ।' প্রবল আতঙ্কে কথাটা যেন ছিটকে বেরিয়ে আসে বেগম সাহেবার গলা থেকে। কোনও প্রতিক্রিয়া জানালেন না নবাব। মদের ঘোরে তিনি প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়লেন।

না-না-না। অস্থির হয়ে ওঠেন মণি বেগম। বরবাদ হয়ে যাওয়ার কথা তিনি ভাবতেই পারেন না। চোখের সামনে দেখেছেন, লুৎফুন্নেসা, শরফ উন্নেসা, আমিনা বেগম, ঘসেটি বেগমের পরিণতি। তাগদ হারানোর জহমত, যন্ত্রণা যে কী ভয়ানক, কী মর্মান্তিক, মণি বেগম এঁদের দেখে বুঝেছেন। দুই পুত্র নজম ও সইফের মুখটা তাঁর মনে পড়ে যায়। মণির চোখের তারায় কত স্বপ্নের আনাগোনা এই দুই পুত্রকে ঘিরে। সব কি শেষ হয়ে যাবে অচানকই?

ফরাসের উপরে গিরদা আকড়ে প্রায় নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছেন মিরজাফর খাঁ। শরাবের নেশায় এখনও বেহুঁশ। আজকাল সুবহশাম নেশাগ্রস্ত হয়ে ঝিম মেরে পড়ে থাকেন নবাব। মাদকদ্রব্যের মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগ দিনে দিনে নবাবের স্নায়ুকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে তুলছে। অবসাদ তাঁকে নিমজ্জিত করছে অতলে।

মণি বেগমের সব আক্রোশ গিয়ে পড়ে সুরাপাত্রের উপর। বেলজিয়াম কাট গ্লাসের শূন্য পাত্রটা কাত হয়ে পড়ে আছে ফরাসের উপরে। সেটা হাতে তুলে নিয়ে প্রবল বেগে মেঝেতে আছড়ে ফেলেন বেগমসাহেবা। ঝনঝন শব্দে কাঁচ ভাঙে।

মণি বেগম ভেঙে পড়েন কান্নায়।

২৭

চাঁদ ঢাকা পড়েছে মেঘের আস্তরণে। সন্ধে পেরিয়ে গড়াচ্ছে রাত।

মোরাদবাগ প্যালেস অভিমুখে তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে কয়েকজন ঘোড়সওয়ার। এই দলের একেবারে মাঝের দুই সওয়ারি হলেন নিজামতের বর্তমান দেওয়ান রায়দুর্লভ এবং একদা ঘসেটি বেগমের দেওয়ান, বৈদ্যকুলপতি রাজবল্লভ সেন। এদের সামনে, পিছনে ও দুপাশে টগবগিয়ে ছুটছে দেহরক্ষীর দল।

সিরাজের আমলে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজবল্লভ। ঘসেটি বেগমের সঙ্গে তিনিও বন্দি হয়েছিলেন চেহেল সেতুনে। নতুন জমানায় মুক্তি পেলেও তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনও পদ তাঁর কপালে জোটেনি। তার উপরে তাঁর চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে নবাবজাদা মিরন। দেওয়ান রায়দুর্লভও মিরনকে নিয়ে চিন্তিত।

নিজামতের রাশ এখন মিরনের হাতে। ক্ষমতার আস্বাদ পেয়ে দিনে দিনে সে বেপরোয়া, বেলাগাম হয়ে উঠছে। তার যথেচ্ছাচারের কহানি চকবাজারে কান পাতলেই শোনা যায়। নবাবের কাছে এ নিয়ে অভিযোগ জানিয়েও কোনও ফল হচ্ছে না। অরাজকতায় ও বিশৃঙ্খলার ঘূর্ণাবর্তে ডুবছে মুর্শিদাবাদ। মিরনের বিষ নজরে পড়েছেন দেওয়ান রায়দুর্লভ। ঘাতকবাহিনীর হাতে অচানক তিনি খুন না হয়ে যান, এই ভয়ে ইদানীং কাঁটা হয়ে রয়েছেন দেওয়ানজি। আলিবর্দি ও সিরাজদ্দৌলার জমানায় নিজামতের শাসন কাঠামোয় উপরের দিকে

যাদের অবস্থান ছিল, তাদের হটিয়ে নিজের মোসাহেব, ইয়ারদোস্তদের বিভিন্ন পদে বসাতে চায় মিরন। সে চায়, সুবে বাংলার রাজনীতিতে নিজের একচ্ছত্র আধিপত্য। বুক ফুলিয়ে তার ইয়ারদোস্তদের কাছে হামেশাই সে কবুল করে—'সব বুডডা শুয়ারগুলোকে কোতল করে ছাড়ব। জবরদস্ত রগড় হবে।'

মোরাদবাগ প্যালেসের সামনে এসে শ্লথ হয় ঘোড়সওয়ারদের গতি।

সদর দরওয়াজার কপাট খুলে দেয় পাহারারত সেপাইরা।

প্যালেসের চৌহদ্দিতে প্রবেশ করলেন রায়দুর্লভ ও রাজবল্লভ।

এগিয়ে এসে তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন নবকৃষ্ণ।

উচ্চতায় মাঝারি। গায়ের রং শ্যামলা। কপালে চন্দনের প্রলেপ। কামানো মাথার পিছনে শিখায় বাধা রয়েছে ফুল। পরনের শান্তিপুরী ধুতি গোড়ালি ছাড়িয়ে খানিকটা উপরে উঠে গিয়েছে। উদলা গা। গলায় জড়ানো ঘিয়ে রঙের রেশমের উত্তরীয়। মুখচোখের গড়ন খুবই সাধারণ। গড়পরতা গেঁয়ো লোকেদের মতো। তবুও এই নাকি এখন প্রবল প্রতাপশালী। ক্লাইভ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ চেয়ে সুবে বাংলার দেওয়ানকেও দরবার করতে হয় এঁর কাছে। অবাক চোখে নবকৃষ্ণকে দেখছিলেন রাজবল্লভ। তাঁর সঙ্গে নব মুনশির এই প্রথম মোলাকাত।

নবকৃষ্ণ বললেন, 'অন্দরে আসুন হুজুর।'

'আপনিই নবকৃষ্ণ?' শুধোলেন রাজবল্লভ।

বিনয়ে গলে পড়ে নবকৃষ্ণ বললেন, 'জি হুজুর। আসুন।'

দুই অতিথিকে নিয়ে প্যালেসের অন্দরে প্রবেশ করলেন নবকৃষ্ণ।

দেওয়ালগিরির আলো দেওয়ালে গাঁথা ছোট ছোট আরশি থেকে প্রতিফলিত হয়ে বেশ বড়সড় ঘরখানাকে ঔজ্জ্বল্যে ভরিয়ে তুলেছে। মাটিতে বিছানো রয়েছে নকশাদার কোমল গালিচা। ঘরের ঠিক মাঝখানে মাথার উপরে সিলিং থেকে ঝুলছে মস্ত ঝাড়বাতি। তার ঠিক নীচে রয়েছে মেহগিনি কাঠের বৃত্তাকার একটা টেবিল। তাকে ঘিরে বৃত্তাকারে সাজানো রয়েছে গদিআঁটা কয়েকটা কুরসি।

বসলেন রাজবল্লভ ও রায়দুর্লভ।

তাঁদের সমুখে বিনয়ের অবতারস্বরূপ জোড়হস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নবকৃষ্ণ।

রায়দুর্লভ খোশামুদে গলায় শুধোলেন, 'কেমন আছেন মুনশিজি?'

'আপনাদের রহেমে সহি সালামত, খুশ তবিয়ত আছি।'

রায়দুর্লভ বললেন, 'এই অনওয়াক্তে ক্লাইভ সাহেবের দর্শন চেয়ে আপনাকে বোধহয় খুব তকলিফের মধ্যে ফেলেছিলাম।'

নবকৃষ্ণ ফের বিনয়ে গলে পড়ে বললেন, 'আমার আবার তকলিফ কী? আপনার আর্জিটা শুধু পেশ করেছিলাম সাহেবের কানে। তিনি হলেন জগদীশ্বরের অবতারস্বরূপ। ভক্তিযোগে ডাকলেই সাড়া দেন। হে-হে।'

রায়দুর্লভ হেসে বললেন, 'আপনি নিজেই বা কম কী? লোকে আতান্তরে পড়লে তো কৃষ্ণেরই স্মরণ নেয়। এই নয়া জমানায় আপনি হলেন কেষ্টঠাকুর।'

লম্বা জিভ কেটে নবকৃষ্ণ বললেন, 'এ কী বলছেন হুজুর? আমি অতি নগন্য মানুষ।'

রায়দুর্লভ রসিকতার সুরে বললেন, 'তা বললে মানব কেন? আপনার বিচারবুদ্ধির উপর ভরসা রাখেন ক্লাইভ সাহেব। এ কী কম কথা?'

রাজবল্লভের মুখ গম্ভীর। সাধারণ গেঁয়ো প্রজার মতো চেহারার মানুষটার সঙ্গে যেমন খোশামুদে ঢঙে কথা কইছেন সুবে বাংলার দেওয়ান, এটা তাঁর ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। মহারাজ রাজবল্লভের আভিজাত্যে কোথায় যেন বাঁধছে। ষাট টাকা মাইনের কোম্পানির চাকুরে। ছোঃ! কিন্তু এঁকে উপেক্ষা করারও উপায় নেই। কথা

কইছেন না বটে কিন্তু গভীর মনোযোগের সঙ্গে নবকৃষ্ণকে লক্ষ্য করে চলেছেন রাজবল্লভ। ক্লাইভের মুনশির কথা ইদানীং নিজামতের অন্দরে খুবই চর্চিত। মহারাজ রাজবল্লভ সেসব শুনেছেন। নবকৃষ্ণকে নিয়ে তাঁর কৌতূহলের শেষ নেই।

অনেকে বলে, কোনও ব্যাপারে কর্নেলের 'না' কে 'হ্যাঁ' করানোর ক্ষমতা রাখেন একমাত্র তাঁর মুনশি। এর প্রমাণ রাজবল্লভ ইতিমধ্যেই পেয়েছেন। মিরনের নজর এড়াতে রাতের দিকে কর্নেলের সাক্ষাৎ চেয়েছিলেন রায়দুর্লভ। ক্লাইভ প্রথমে সম্মতি দেননি। পরে রাজি হয়েছেন নব মুনশির অনুরোধে। এই সামান্য লোকটা এত ক্ষমতাধর, এটা যেন রাজবল্লভের ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না।

নবকৃষ্ণ বললেন, 'আপনাদের কিয়ৎকাল অপেক্ষা করতে হবে। সাহেব ব্যস্ত রয়েছেন। স্ক্র্যাফটন ও হেস্টিংস সাহেবের সঙ্গে জরুরি মিটিং চলছে। তা আপনাদের শরাব চলবে তো?'

রায়দুর্লভ বললেন, 'না এখন বরং—'

ফরসির নলটা টেনে নিয়ে রাজবল্লভ গম্ভীর গলায় বললেন, 'থাক'।

নবকৃষ্ণ মুচকি হেসে বললেন, 'ও রসে না মজলে এ সময়ে সাহেবের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা কঠিন। এ সময়ে রসিক মানুষদের সঙ্গেই কথা কইতে ভালোবাসেন সাহেব। আপনাদের হাতে শরাবের পাত্র না দেখলে তিনি কুপিত হতে পারেন। শেষে আপনাদের আলোচনাই না অসম্পূর্ণ থেকে যায়।'

'তাহলে বরং—' একটু যেন শঙ্কিত হয়ে রাজবল্লভের মুখের দিকে তাকালেন রায়দুর্লভ।

রাজবল্লভ বললেন, 'বেশ তো এক পাত্র না হয়—'

ডোরিতে টান দিলেন নবকৃষ্ণ। ছুটে এল একজন গোলাম।

নবকৃষ্ণ বললেন, 'শরাব লে আও।'

খানিকবাদে একজন সাকি এসে দিয়ে গেল শরাবপূর্ণ বেলজিয়ান গ্লাসের পানপাত্র।

নবকৃষ্ণ বললেন, 'ক্ল্যারেট। কর্নেলের খুব পছন্দের চিজ।'

'কতক্ষণ বসতে হবে মুনশিজি?' পানীয়ের পাত্র হাতে নিয়ে প্রশ্ন করলেন রায়দুর্লভ।

'তা অনেকক্ষণ হল মিটিং চলছে। আপনারা আয়েশ করুন। আমি দেখছি।' এই বলে ব্যস্তসমস্ত হয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন নবকৃষ্ণ।

কালান্তরের রেখাটা আজ যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন রাজবল্লভ। নবাব তো দূরের কথা, কিছুকাল আগেও মুর্শিদাবাদ দরবারের ছোটখাটো একজন ওমরাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কালঘাম ছুটে যেত ইংরেজ বণিকদের। অনেক উৎকোচ, উপঢৌকন দেওয়ার পর দেখা করার অনুমতি মিলত। সিরাজদ্দৌলার মুসিবত এই চিত্রটাকে বদলে দিয়েছে। স্থান পরিবর্তন করেছে ক্ষমতার উৎসবিন্দু। আজ ক্লাইভের সঙ্গে সাক্ষাৎ চেয়ে মুনশি নবকৃষ্ণর কাছে জোড়হস্ত হতে হচ্ছে সুবে বাংলার দেওয়ানকে। নসিব বড় নিষ্ঠুর। শঙ্কায় বুক কেঁপে ওঠে রাজবল্লভের। পুরোনো মর্যাদা, গৌরব ফের কি আর ফিরে পাওয়া সম্ভব?

'ওয়েলকাম টু দিস প্যারাডাইস।'

ক্লাইভকে ঘরে ঢুকতে দেখেই শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম জানালেন রায়দুর্লভ ও রাজবল্লভ। ক্লাইভের পিছন পিছন ঘরে ঢুকলেন হেস্টিংস, স্ক্র্যাফটন ও নবকৃষ্ণ।

'প্লিজ সিট।' এই বলে বসলেন ক্লাইভ।

কুরসিতে বসে রায়দুর্লভ বললেন, 'এই অনওয়াক্তে আপনাকে তকলিফ দেওয়ার জন্য দুঃখিত।'

'তকলিফের কিছু নেই। এটাই আমার কাজের সময়।' পায়ের উপরে পা তুলে দিলেন ক্লাইভ। তাঁর পিছনে কয়েকটা কুরসি দখল করে বসলেন স্ক্র্যাফটন, হেস্টিংস ও নবকৃষ্ণ।

'বলুন। আপনাদের তকলিফ কী আছে?'

'হে হে সহি আন্দাজ করেছেন। তকলিফই বটে।' হাত কচলে বললেন রায়দুর্লভ।

চেয়ারে দেহটাকে আর একটু এলিয়ে দিয়ে ক্লাইভ বললেন, 'হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ?'
রায়দুর্লভ বললেন, 'শুনলাম আপনি কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতা ওয়াপস যাবেন।'
'ইয়েস। আই অ্যাম ওয়েটিং ফর মেজর আয়ারকুট টু কাম ব্যাক ফ্রম পাটনা।'
'আপনি ফিরে গেলে মুর্শিদাবাদের হাল যে ভয়ানক হয়ে উঠবে।' গুজারেশ করলেন রাজবল্লভ।
ক্লাইভ বললেন, 'কোম্পানি সওদা করতে এসেছে। আইন-কানুন সামলানো তো আমাদের কাজ নয়। নিজামত চলে নবাবের খায়েশে। আমি কী করতে পারি?'
রায়দুর্লভ বললেন, 'গোলমাল যে একেবারে গোড়ায়।'
একদৃষ্টে রায়দুর্লভের মুখপানে চেয়ে রইলেন ক্লাইভ। কী বলতে চাইছেন দেওয়ানজি, তার আন্দাজ পাওয়ার কোশিশ করছেন।
রায়দুর্লভ বললেন, 'নবাব নালায়েক। নবাবজাদা মিরন কাউকে মানে না।'
স্ক্র্যাফটন বলে উঠলেন, 'হি ইজ অ্যা রাসকেল।'
সম্মতি জানালেন হেস্টিংস। 'এক খতরনক ইনসান।'
স্ক্র্যাফটনের কথায় সম্মতি জানিয়ে রায়দুর্লভ বললেন, 'সহি বাত বলেছেন সাহেব।'
'নবাবজাদা তকলিফের কারণ হয়ে দাঁড়ালে রেসিডেন্টকে জানাবেন।' এই বলে পানীয়ের পাত্র হাতে তুলে নিলেন ক্লাইভ।
'নিজে অক্ষত থাকলে তো রেসিডেন্ট সাহেবকে জানানোর ফুরসত পাব হুজুর।'
রাজবল্লভ বললেন, 'আপনার ভয়ে আপাতত সমঝে চলছে মিরন।'
রায়দুর্লভ যোগ করলেন, 'আপনি চলে গেলে যে সে হাতে মাথা কাটবে সকলের।'
'ডোন্ট ওয়ারি। আমি নবাবকে হুশিয়ার করে দিয়ে যাব।'
'নবাব নিজেই তো ভয়ে কাবু। ছেলে বাপকে মানে না।' বললেন রাজবল্লভ।
রায়দুর্লভ গুজারেশ করলেন, 'ছোকরা নিজের বাপকেই না কোতল করে বসে।'
ক্লাইভ শুধোলেন, 'তা কী চান আপনারা?'
'মিরজাফর খাঁকে মসনদ থেকে সরিয়ে দিতে চাই। বাপ হটে গেলে ছোকরার আপসানি বন্ধ হবে। এতে তামাম মুর্শিদাবাদের ভালাই হবে।'
গোটা ঘর নিশ্চুপ। ঠোঁটে পাইপ গুঁজলেন ক্লাইভ। তার চোখের দৃষ্টি রায়দুর্লভ ও রাজবল্লভের মুখের উপরে স্থির হয়ে আছে। একজন দাখিলা এসে চকমকি পাথর ঠুকে পাইপটা ধরিয়ে দিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে উড়তে লাগল পাইপের ধোঁয়া। মনে মনে মুচকি হাসছেন ক্লাইভ। বাইরে অবশ্য তার কোনও প্রকাশ নেই। ভাবলেশহীন মুখ। সে মুখের ভাষা পড়ে তাঁর অন্তরের চিন্তাস্রোতের তল পাওয়া দ্বিতীয় কারও পক্ষে দুষ্কর। ক্লাইভ ভাবছেন, চমৎকার! এমনই তো আমি চেয়েছিলাম। আপনারা যত কলহ করবেন, তত দুর্বল হবেন নবাব। এতে তাঁকে তাঁবে রাখতে সুবিধা হবে কোম্পানির।
ঠোঁট থেকে পাইপটা হাতে নিয়ে ক্লাইভ শুধোলেন, 'কাকে বসাতে চান মসনদে?'
'মির্জা মেহেদিকে।'
একটু যেন চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল ক্লাইভের মুখে। গদিমোড়া কুরসির গায়ে হেলানো দেহটাকে সোজা করে প্রশ্ন করলেন, 'মির্জা মেহেদি– ইউ মিন ব্রাদার অফ সিরাজদ্দৌলা?'
'জি হুজুর।'
ভুরু কুচকে ক্লাইভ বললেন, 'হি ইজ টু ইয়ং—'
রাজবল্লভ বললেন, 'তাতেই তো সুবিধে।'
'কীসের সুবিধে?'

‘তাগদের রশি থাকবে আমাদের হাতে।’ বললেন রায়দুর্লভ।

‘আমরা বলতে? হোয়াট ডু ইউ মিন?’ প্রশ্ন করলেন ক্লাইভ।

রায়দুর্লভ জবাবে বললেন, ‘আমি, জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ, মহারাজ রাজবল্লভ।’

‘আই সি।’

রাজবল্লভ বললেন, ‘এছাড়াও আছেন পাটনার নায়েব রামনারায়ণ, মেদিনীপুরের ফৌজদার রাজারাম। আপনি এই পরিকল্পনায় মদত দিলে হিন্দু জমিদারেরাও আমাদের পিছনে দাঁড়াবে।’

‘নবাবকে মসনদচ্যুত করার কী কারণ দেখাতে চান আপনারা?’

রায়দুর্লভ বললেন, ‘নিজামতের শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। নবাব ডুবে থাকছেন ভাঙ, শরাব, জেনানার নেশায়। নবাবজাদা চলছে তার খুশখেয়ালে। নিজের তাঁবের যত, ওছা, নালায়েক আদমিকে বিভিন্ন পদে বসাচ্ছে। ফের একবার ইনকিলাব হলে মুর্শিদাবাদের আমআদমি খুশ হবে।’

ভাবলেশহীন চোখমুখে রায়দুর্লভের মুখপানে চেয়ে রইলেন ক্লাইভ।

দেওয়ানজি বলে চললেন, ‘পলাশির কৃতিত্ব মিরজাফরের একার নয়।’

‘দ্যাটস ট্রু।’ এই বলে গম্ভীর মুখে পানীয়ের পাত্রে চুমুক দিলেন ক্লাইভ।

রাজবল্লভ বললেন, ‘সিরাজকে মসনদ থেকে সরিয়ে দেওয়ায় মানুষের মনে যে ক্ষোভ জমেছে, মির্জা মেহেদিকে মসনদে বসালে তা অনেকটাই দূর হয়ে যাবে। এতে খুশনাম হবে কোম্পানিরই।’

বাঃ! আপনারা দেখছি নিজেদের মধ্যে গোলমালটা ভালোই পাকিয়ে তুলেছেন। এক মাস যেতে না যেতেই দাঁত, নখ বের করে সবাই মিলে ঠোকরাতে শুরু করেছেন নবাবকে। এমনটাই তো চাই। দরবারে অন্তর্কলহ জোরদার হলে নিজেদের শর্তে কারবার চালাতে সুবিধে হবে আমাদেরই। কোম্পানির দিকে নজর দেওয়ার ফুরসতই পাবেন না নবাব। মনে মনে এসব ভাবলেও ক্লাইভ মুখে বললেন, ‘ঠিক আছে। আমি ভেবে দেখব।’

রায়দুর্লভ খোশামুদে হাসি হেসে বললেন, ‘আপনি ভেবে দেখবেন, এটাই বড় কথা। আপনিই বল-ভরসা আমাদের। আপনাকে সব কিছু খুলে বলতে পেরে অনেকটা নিশ্চিন্ত লাগছে। আরেকটা কথা সাহেব, মেদিনীপুরের ফৌজদার রাজারামকে বরবাদ করতে চাইছেন নবাব।’

‘হু ইজ রাজারাম?’ প্রশ্ন করলেন ক্লাইভ।

নবকৃষ্ণ পিছন থেকে চাপা গলায় বলে উঠলেন, ‘নারান সিং এর বড়ে ভাই।’

রায়দুর্লভ বললেন, ‘রাজারামের উপর হুকুম হয়েছে মুর্শিদাবাদে এসে হিসেব বোঝানোর। এটা একটা অছিলা। মুর্শিদাবাদে পা দিলেই রাজারামকে কয়েদ করা হবে। তাঁর ধনদৌলত দখল করতে চান নবাব। আপনি রাজারামকে বাঁচান।’

ক্লাইভ গম্ভীর। পাইপের ধোঁয়া উড়িয়ে চলেছেন।

রায়দুর্লভ বলে চললেন, ‘চিঠি লিখে রাজধানীতে আসতে তাঁকে নিষেধ করেছি আমি। আপনি কলকাতায় ফিরলে রাজারাম একবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়। মেদিনীপুরের ফৌজদারের পদে রাজারাম বহাল থাকলে আপনাদেরই সুবিধে হবে। রাজারাম তাগদবাজ আদমি। বর্গিরা হানা দিলে সে রুখতে পারবে তাদের। অন্যথায় বর্গিহাঙ্গামার তকলিফ পোহাতে হবে কোম্পানিকেই।

ঘাড় ঘুরিয়ে নবকৃষ্ণর দিকে একবার তাকালেন ক্লাইভ।

চোখের ইশারায় নবকৃষ্ণ বুঝিয়ে দিলেন রায়দুর্লভ যা বলছেন তা ঠিকই।

ক্লাইভ বললেন, ‘বেশ। রাজারামকে বলবেন কলকাতায় এসে দেখা করতে।’

রায়দুর্লভ খুশি ঝরা গলায় বললেন, ‘যাক। অনেকটা ভরসা পেলাম।’

কুরসি ছেড়ে উঠে পড়লেন ক্লাইভ। উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন রায়দুর্লভ ও রাজবল্লভ।

ক্লাইভ মুচকি হেসে বললেন, 'প্লিজ ফিনিশ ইওর ড্রিঙ্ক।'

জুতোর শব্দ তুলে ভিতরের ঘরে চলে গেলেন কর্নেল।

থতমত খেয়ে ধপ করে ফের কুরসিতে বসে পড়ে পানীয়ের পাত্র হাতে তুলে নিলেন রায়দুর্লভ ও রাজবল্লভ। এই দৃশ্য দেখে হাসি চাপতে অন্যদিকে মুখ ঘোরালেন নবকৃষ্ণ।

জ্ঞান ফিরতে ঈশ্বরী দেখে সে বিলাসবহুল এক পালঙ্কে শুয়ে আছে। তার মুখের উপরে ঝুঁকে রয়েছেন মেজর আয়ারকুট। খুশিতে ঈশ্বরী চোখের জলে আসে। ঠোঁট ফাঁক করে কিছু বলতে যায়। মেজর সাহেবের মাথাটা দ্রুত নেমে আসে আরো নীচে। প্রগাঢ় চুম্বনে ও আলিঙ্গনে ধরা দেয় ঈশ্বরী। হারিয়ে যায় তার কথা। ঈশ্বরী সুখদরিয়ায় ডুবে যায়।

পরেরদিন আয়ারকুটের চিঠি নিয়ে দূত ছোটে পাটনা দুর্গে।

'...বহুত বহুত সুক্রিয়া। যে জেনানাকে আপনি গতকাল পাঠিয়েছিলেন, তাকে আমার চাই। আমি ওকে নিয়ে যেতে চাই কলকাতায়। আশা করি আমার এই আরমান আপনি মঞ্জুর করবেন। আর একটা খুশির খবর জানাই আপনাকে। গতকালই কর্নেল ক্লাইভের হুকুমত এসেছে। আমি ফিরে যাচ্ছি ফৌজ নিয়ে। কর্নেল লিখেছেন, পাটনার কুরসি আপনারই থাকছে। কর্নেল লিখেছেন মির কাজিমের নামে জারি হওয়া পাটনার নায়েবগিরির বাতিল করতে চলেছেন নবাব। সেই হুকুমত হয়তো আপনি কয়েকদিনের মধ্যেই পেয়ে যাবেন। আপনি খুশ তবিয়ত, সহি সালামত থাকুন...'

এই চিঠি পড়ে খুশিতে চেঁচিয়ে উঠলেন রামনারায়ণ। 'জয় সিয়ারাম! কিস্তি মাৎ।'

রামনারায়ণের উত্তর নিয়ে ঘোড়া দাবড়ে ইংরেজ ছাউনি অভিমুখে ছুটল বচন সিং।

'সেলাম সাহেব। হুজুর আপনার আরমান মঞ্জুর করেছেন। পিয়ারীকে নিয়ে যান।'

আয়ারকুট বললেন, 'বহুত বহুত সুক্রিয়া। রামনারায়ণজিকে আমার সেলাম জানাবেন।'

আয়ারকুটের সঙ্গে মুর্শিদাবাদের পথে ভেসে চলল ঈশ্বরী। নসিবের কী বিচিত্র খেয়াল। বন্দিনী হওয়ার কথা ছিল জাফরাগঞ্জের হারেমে। ভাগ্য তাকে টেনে নিয়ে গেল পাটনায়। রামনারায়ণের হারেমে। সেখান থেকে ঝরা পাতার মতো ফের বাতাসে উড়ল ঈশ্বরী। এবারে খুশিতে।

আকাশে আজ একটুও মেঘ নেই। জোছনায় ভেসে যাচ্ছে নিস্তব্ধ চরাচর। কেবল কুলকুল শব্দে বয়ে চলেছে যৌবনাবতী গঙ্গা। রাজমহলের অদূরে নোঙর ফেলেছে মেজর আয়ারকুটের নৌবহর।

বজরার ছাতে ফরাসের উপরে শাহি মেজাজে খালি গায়ে শুয়ে আছেন মেজর আয়ারকুট। তার পেশীবহুল বাহুতে মাথা রেখে তার গায়ের সঙ্গে লেপটে রয়েছে ঈশ্বরী। সুখের পরশে শিহরিত। তবু ভারাক্রান্ত তার মন। সে জানে মেজর আয়ারকুটের সঙ্গে তার এই সম্পর্ক খুবই সাময়িক। এই সুখানুভূতি ক্ষণিকের। কিছুদিন পরেই সাহেব হয়তো চলে যাবেন দূরে কোথাও। ঈশ্বরীর চোখের কোণায় চিকচিক করে জল। সুখের সব রস সে আজ নিংড়ে নিতে চায়।

ঈশ্বরীর কাচুলির বাঁধন আলগা করেন আয়ারকুট। আলতো চুম্বন করেন স্তনবৃন্তে। কেঁপে উঠে চোখ বোজে ঈশ্বরী। আকড়ে ধরে আয়ারকুটকে। প্রশস্ত গঙ্গার বুকে ভরা জোছনায় মাখামাখি হয়ে রতিক্রিয়ার আদিম ছন্দে মেতে ওঠে দুই নর-নারী।

সব মিলিয়ে কুড়ি পঁচিশটা বজরা, নৌকো ও সুলুপ। ভাগীরথীর জল ভেঙে এগিয়ে চলা নৌবহরের ঠিক মাঝের বিলাসবহুল বজরার আরোহী রবার্ট ক্লাইভ। ফিরে চলেছেন কলকাতায়।

বজরার ছাতে খাটানো চাঁদোয়ার নীচে আরামকেদারায় গা এলিয়ে প্রসন্ন চিত্তে নিজের কামালিয়তের কথা ভাবছিলেন ক্লাইভ। একজন আবদার এসে পাশে রেখে গেল আলবোলা।

খানিকবাদে নবকৃষ্ণ এসে ক্লাইভের অদূরে একটা নীচু চৌপাইয়ের উপরে বসল।

একদৃষ্টে নদীর পাড়ের দিকে চেয়ে রয়েছেন ক্লাইভ। আকাশ আজ মেঘমুক্ত ও ঝকঝকে। চন্দননগর পার হচ্ছে নৌবহর। নদীর পশ্চিম তীর ঘেষে চলেছে ক্লাইভের বজরা। ফোর্ট অঁরলিও দুর্গটা তাঁর চোখে পড়ল। দুর্গের সর্বাঙ্গে ভয়ানক ক্ষতচিহ্ন। চেহারা কঙ্কালসার। নিস্তব্ধ, নিশ্চুপ, পরিত্যক্ত ফরাসিদের কেল্লা যেন প্রেতাত্মার মতো দাঁড়িয়ে আছে।

গত মার্চে ফরাসিদের বাণিজ্য বিস্তারের স্বপ্ন চুরমার করে দিয়েছেন ক্লাইভ। চন্দননগর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে ফরাসি বণিকেরা। গোলার আঘাতে ভেঙে পড়া কেল্লার এক বুরুজের দিকে চেয়ে নিজের অজান্তেই নিষ্ঠুর আনন্দের এক হাসি খেলে গেল ক্লাইভের মুখে। পাশে চৌপাইয়ের উপরে রাখা দূরবীনটা দ্রুত টেনে নিলেন তিনি। তাতে চোখ লাগিয়ে ফরাসিদের দুর্গের দিকে চেয়ে সজোরে হেসে উঠলেন। তারপর দূরবীনটা নবকৃষ্ণর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'দ্যাখো মুনশি দ্যাখো।'

নবকৃষ্ণ দূরবীনে চোখ রাখলেন।

ক্লাইভ তর্জনী উঠিয়ে বললেন, 'ওই ভাঙা বুরুজটার দিকে তাকাও।'

ক্লাইভের অঙ্গুলিসংকেত লক্ষ করে তাকালেন নবকৃষ্ণ।

'দেখেছ?'

নবকৃষ্ণ হেসে বলে, 'চমৎকার। ভাঙা বুরুজের মাথায় বসে আছে একপাল শকুন।'

'রাইট। ভালচারস।' এই বলে ফের সজোরে হেসে উঠলেন ক্লাইভ।

চোখ থেকে দূরবীন নামিয়ে নবকৃষ্ণ বললেন, 'আপনার কামালিয়তের নিশান।'

ক্লাইভ বললেন, 'ওই বুরুজের মাথায় ফরাসিদের মস্ত নিশানটা উড়ত।'

'এখন শকুনে নেত্য করছে।'

ফোর্ট অঁরলিও পার হয়ে এগিয়ে চলল নৌবহর।

ফরসির নলটা টেনে নিয়ে ক্লাইভ বললেন, 'যে কাজে এসেছিলাম, তা ফুরিয়ে গেল মুনশি।'

নবকৃষ্ণ বলেন, 'মনে পড়ে হুজুর, পলাশিতে রওনা হওয়ার আগে এই চন্দননগরের ঘাটে দাঁড়িয়েই বলেছিলাম, আপনার কুদরতি তুজুক হয়ে যাবে। হল কিনা?'

'এবারে কী করা যায় বল তো?'

'কাজ তো আছেই। আপনার পোষ্য ইয়ে নবাবের দেখভাল।'

মুচকি হাসলেন ক্লাইভ। 'সে জন্য স্ক্র্যাফটন আছে। ওয়ারেন আছে। আমি কী করি?'

'আপনি কাজের মানুষ। কাজ ঠিক জুটে যাবে। আপাতত কিছুদিন আয়েশ করুন।'

'ও আমার নসিবে নেই। মাদ্রাজে ফেরার জন্য ঘন ঘন রিমাইন্ডার আসছে বুঝলে?'

'ফিরে যাবেন?' বিমর্ষ মুখে প্রশ্ন করে নবকৃষ্ণ।

'সাউথে নাকি ফরাসিদের সঙ্গে জোর লড়াই বাধতে পারে।'

'আপনি চলে গেলে বাংলায় যে ফের গোলমাল পেকে উঠবে। নবাবের কী হাল হয়েছে সে তো নিজের চোখেই দেখে আসলেন। রায়দুর্লভ ঘুটি সাজাচ্ছে। হানা দিতে পারেন সুজাউদ্দৌলা, হামলে পড়তে পারে বর্গিরা। এতসব ঝক্কি পোহাবে কে?'

মৃদু হাসি মুখে এনে ক্লাইভ বলেন, 'না মুনশি। এখনই ফিরে যাচ্ছি না আমি। অ্যাডমিরাল ওয়াটসন ফিরে যাবেন জাহাজগুলো নিয়ে। তার সঙ্গে মেজর আয়ারকুটকে পাঠিয়ে দেব। উইথ অ্যা বিগ কনটিনজেন্ট।'

'যাক। বড় নিশ্চিন্ত হলাম হুজুর।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ক্লাইভ বললেন, 'একটা কথা কয়েকদিন ধরেই ভাবছি মুনশি। আই নিড ইওর হেল্প।'

'বলুন হুজুর। আপনার হুকুম তামিল করতে বান্দা হাজির।'

ক্লাইভ বললেন, 'উই ওয়ান দ্য ব্যাটেল অফ প্ল্যাসি। লেকিন সেলিব্রেশন কোথায়?'

'কী বলতে চাইছেন, একটু খোলসা করে বলুন হুজুর।'

'তোমরা প্ল্যাসির ভিকট্রিটা সেলিব্রেট করতে পার না?'

নবকৃষ্ণ একগাল হেসে বললেন, 'সে তো হচ্ছেই হুজুর। কলকাতায় ফিরে দেখবেন, মহল্লায় মহল্লায় ফূর্তির বান ডেকেছে। কোম্পানির কামালিয়তের কথা জেনে লোকে একেবারে ডগমগ। সুতানুটিতে নাকি কোম্পানির নিশান উড়িয়ে নেত্য করছে লোকে। লিটেরালি ড্যান্সিং।'

গম্ভীর মুখে ফরসির নলে টান দিয়ে ক্লাইভ বললেন, 'বাট রেস্ট অফ দ্য বেঙ্গল? আই ওয়ান্ট সেলিব্রেশন অল ওভার বেঙ্গল উইথ পম্প অ্যান্ড শো।'

কথাটা শুনে থমকে গেলেন নবকৃষ্ণ।

ক্লাইভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন তীরের দিকে। ভেসে আসছে ঢাকঢোলের শব্দ, উলুধ্বনি। গাঁয়ের মেয়েবউয়েরা জড়ো হয়েছে এক বটবৃক্ষের নীচে। দূরবিনে ফের চোখ রেখে ক্লাইভ বললেন, 'অ্যা রিলিজিয়াস ফেস্টিভাল।'

নবকৃষ্ণ বললেন, 'আজ মনসাদেবীর পুজো। তারই ভিড়।'

ক্লাইভ কৌতূহলী চোখে মুনশির দিকে তাকালেন।

'স্নেক গডেস।' বললেন নবকৃষ্ণ।

'কত রকমের গড আর গডেস তোমাদের! ভাবলেই মাথা ঘোরে।'

নবকৃষ্ণ বলেন, 'গাঁ-গঞ্জে সাপের বড় উপদ্রব। সর্প-দংশন থেকে বাঁচার কামনায় এই পুজো।'

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন ক্লাইভ। নব মুনশির কথাটা ঠিক শুনলেন না। তটভূমির পানে চেয়ে কতকটা স্বগতোক্তির ঢঙে বললেন, 'গডেস! দ্যাট উইল বি আ গুড আইডিয়া।'

নবকৃষ্ণ হাঁ মুখ করে ক্লাইভের দিকে চেয়ে রইলেন। সাহেবের চিন্তাস্রোতের তল পাচ্ছেন না।

ক্লাইভ বললেন, 'পলাশির কামালিয়ত তামাম বাংলা জুড়ে সেলিব্রেট করার জন্য তোমরা একটা রিলিজিয়াস ফেস্টিভ্যালের আনজাম করতে পার না?'

এ কঠিন কাজ। কোনও সন্দেহ নেই। নবকৃষ্ণ ডুব দেন গভীর চিন্তায়।

ক্লাইভ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। 'কোম্পানির সাকসেসের জন্য সেলিব্রেশন অল ওভার বেঙ্গল—অ্যা গ্র্যান্ড ফিস্ট অফ দ্য জেন্টুস—অ্যারেঞ্জ করা যায় না?'

'সেই উপায়ই তো হাতড়াচ্ছি হুজুর।' গালে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন নবকৃষ্ণ।

ফরসির নল মুখে দিয়ে আনত চোখে ভাবতে থাকেন ক্লাইভও। হঠাৎ বলে ওঠেন, 'তোমরা তো কথায় কথায় কালীঘাটে যাও। উইশ ফুলফিলমেন্টের জন্য পুজো কর। তা পলাশিতে কোম্পানির কুদরতির জন্য একটা পুজোর আয়োজন করা যায় না? সেই পারপাসে সারা বাংলা জুড়ে ফূর্তি হবে, আমোদ হবে বেশ কয়েকদিন ধরে।'

নবকৃষ্ণ চোখ গোল্লা করে চেয়ে থাকেন ক্লাইভের মুখপানে। তাঁর মনসুবা এবারে খুব স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় নবকৃষ্ণর চোখে। কী তুখোড় কৌশল! পুজোর নামে, উৎসবের নামে সারা বাংলা জুড়ে হিন্দুসমাজকে মাতিয়ে

দিয়ে তাদের কাছে টানতে চাইছেন তিনি।

ভিন দেশে বাণিজ্য করতে এসে সে দেশের নবাবকে উৎখাতের দায় যে কোম্পানির ঘাড়ে এসে পড়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কী উদ্দেশ্য এদের? এই ভেবে প্রজাদের একটা অংশ বাঁকা চোখে তাকাচ্ছে কোম্পানির দিকে। ক্লাইভ নিজেও বুঝতে পারছেন সে কথা। নীতির তুলাদণ্ডে বিচার করলে এ কাজ অবশ্যই অনৈতিক। পলাশি জয়ের নামে সারা দেশকে উৎসবে মাতিয়ে কার্যত সকলের নজর ঘুরিয়ে দিতে চাইছেন ক্লাইভ। উৎসবে লোককে মাতিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন, না, কোম্পানি কোনও অনৈতিক কাজ করেনি। স্বৈরাচারী নবাবকে মসনদ থেকে সরিয়ে এদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। তাই আমোদ, তাই ফূর্তি, তাই উৎসব, তাই আশরত। যা জোরদার প্রচার করা যায়, মানুষ তাই বিশ্বাস করে। বেড়ে বুদ্ধি।

কিন্তু সাহেবের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে হলে কী করা যায়। ভেবে কুল পান না নবকৃষ্ণ।

'এই ভাবে ভাব—নবাব সিরাজদ্দৌলা ওয়াজ অ্যান ইভিল পাওয়ার। তাকে ডেস্ট্রয় করেছে কোম্পানি। যেভাবে তোমাদের গডেস কালী ইভিল পাওয়ারকে ডেস্ট্রয় করে। বেসিক্যালি ইট উইল বি অ্যা সেলিব্রেশন ফর দ্য সাকসেস অফ অ্যা বেনেভোলেন্ট পাওয়ার। সারা বাংলা জুড়ে একটা কালীপুজোর আয়োজন করা যায় না?' ধূর্ত ক্লাইভের দুচোখ চকচক করে ওঠে।

স্বগতোক্তির ঢঙে নবকৃষ্ণ বলেন, 'কালীপুজো?'

ক্লাইভ বলেন, 'কান্ট ইউ মেক ইট অ্যা বিগ ফেস্টিভ্যাল? উপায় বাতলাও মুনশি।'

নবকৃষ্ণ খানিকটা বিরস মুখে বলেন, 'হুজুর কালীপুজো তো একদিনের। তাতে আর আমোদ-আহ্লাদ কতটা হবে? তাছাড়াও ও পুজো হয় গভীর রাতে। কালীপুজোর হুজুগে গোটা দেশকে মাতিয়ে তোলা কঠিন।'

ক্লাইভ বললেন, 'তোমাদের তো অনেক রকমের গডেস আছে, তাহলে অন্য কোনও পুজো।'

হঠাৎই প্রবল উৎসাহের সঙ্গে নবকৃষ্ণ বলে ওঠেন, 'উপায় আছে হুজুর। দুর্গাপুজো।'

'বেশ তারই আয়োজন কর।' খুশি গলায় বললেন ক্লাইভ।

'সুবে বাংলার বেশির ভাগ হিন্দু জমিদার বাড়িতে ওই পুজো হয় বসন্তকালে।'

'বসন্তকাল? মতলব?'

'স্প্রিং হুজুর স্প্রিং। মার্চের দিকে।'

চোখ প্রায় কপালে তুলে ক্লাইভ বললেন, 'মার্চ! দ্যাট উইল বি টু লেট।'

বিরস মুখে নবকৃষ্ণ বললেন, 'তা অবিশ্যি ঠিক।'

ক্লাইভ বললেন, 'সাকসেসের পর সেলিব্রেশন কুইকলি না হলে তার ইমপ্যাক্ট থাকে না।'

প্রবল উত্তেজনায় সহসা চেঁচিয়ে উঠলেন নবকৃষ্ণ, 'উপায় আছে হুজুর। অকালবোধন।'

উৎসাহের সঙ্গে নবকৃষ্ণের মুখপানে চাইলেন ক্লাইভ।

নবকৃষ্ণ বললেন, 'রাবণ বধের আগে মা দুর্গার আরাধনা রামচন্দ্র করেছিলেন শরৎকালে।'

রাবণ, মা দুর্গা, রামচন্দ্র, শরৎকাল একসঙ্গে এতগুলো দুরূহ শব্দের ধাক্কায় তালগোল পেকে গেল ক্লাইভের মাথার মধ্যে। ভুরু কুঁচকে তাকালেন মুনশির মুখপানে।

'শরৎ মিন্স অটাম হুজুর অটাম। খুব দূরে নয়। বেশ কয়েকদিন ধরে জাঁকজমক হইহুল্লোড় হতে পারে। ভাদ্রকৃষ্ণ নবমীতে দেবীর বোধন। তদবধি আশ্বিন শুক্ল নবমী। টানা ষোলো দিনের পুজো। সিক্সটিন ডেজ।' এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন নবকৃষ্ণ।

'দ্যাটস নাইস।'

নবকৃষ্ণ বলেন, 'সিংহবাহিনী মা দুর্গা, অসুর নিধনে রত। মায়ের মূর্তিটাই বড় জাঁকের।'

'অসুর কী?' প্রশ্ন করেন ক্লাইভ।

চোখ গোল্লা করে নবকৃষ্ণ বলেন, 'ডেমন।'

'আই সি। দ্যাট মিনস ইভিল পাওয়ার।'

'সহি আন্দাজ করেছেন হুজুর। স্ট্যান্ডিং অন দ্য ব্যাক অফ লায়ন, মাদার গডেস কিলিং অসুর।'

'ভেরি গুড। পারবে তো ওই সময়ে সারা বাংলা জুড়ে এই ফেস্টিভ্যাল অ্যারেঞ্জ করতে?'

নবকৃষ্ণ জোশের সঙ্গে বলেন, 'ভাববেন না হুজুর, আপনার খায়েশ পূরণ করবে এই বান্দা। শুধু নদিয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে ডেকে আপনি একটু কড়কে দিয়ে বলবেন বসন্তে নয়, এই শরতে সারা বাংলার সব জমিদার বাড়িতে দুর্গাপুজো করা চাই। সে যেমন তেমন পুজো নয়, খুব জাঁকের পুজো হতে হবে। কৃষ্ণচন্দ্রই হালে হিন্দুসমাজের মাথা কি না। উনি হুকুম করলে সবাই শুনবে।'

ক্লাইভ হেসে বললেন, 'বেশ বলে দেব। পুজোয় আম-আদমিদের ঘটা করে খাওয়াতে হবে। আই ওয়ান্ট অ্যা গ্র্যান্ড ফিস্ট। আদার ওয়াইজ ইউ কান্ট ইনভলভ কমন পিপল।'

'তাও হবে। সুতানুটিতে ও দায়িত্ব আমার। কিন্তু হুজুর যেমনটা আপনি চাইছেন, ওই গ্র্যান্ড ফিস্টের কথা শুনলে অনেক জমিদারের মুখ গোমড়া হতে পারে।'

'তাঁরা নারাজ হবে বলছ?'

'নারাজ ঠিক নয়। আপনার মুখের উপর কি না বলার হিম্মত হবে কারও?'

'তাহলে?'

'আসলে হুজুর বিশাল খরচের ধাক্কা সকলের ঘাড়ে পড়বে তো? জমিদার হলে কী হবে, দরাজ দিল আর ক'জনের?'

'নবাবকে বলে না হয় কিছুটা খাজনা মকুবের ব্যাবস্থা করে দেব। সেই টাকাতে উইথ গ্র্যান্ডিওর ফেস্টিভ্যাল অ্যারেঞ্জ করুক সকলে।'

নবকৃষ্ণ মাথা ঝুঁকিয়ে বলেন, 'হুজুর আপনি সত্যিই অবতার। মোক্ষম পথ বাতলেছেন।'

দুর্গাপুজোর আয়োজনের কল্পনায় বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন নবকৃষ্ণ। মানসচক্ষে যেন নিজের গৃহে আয়োজিত পুজোর জলুসটা দেখতে পাচ্ছেন তিনি। দৃষ্টি শূন্যে ভাসিয়ে তিনি বলে চলেন, 'দেখবেন হুজুর সুতানুটি-কলকাতা-গোবিন্দপুর জুড়ে কী কাণ্ড ঘটিয়ে বসি। আমার গৃহেই পুজোর এলাহি আয়োজন করব। ষোলো দিন ধরে নাচা-গানা, খানা-পিনা হবে। কবিগান হবে, কেষ্টযাত্রা হবে, পুতুলনাচ হবে, বাই-নাচ হবে। বিশাল এলাকা জুড়ে শয় শয় তাবু পড়বে। ভিয়েন বসবে। ঝাড়বাতির আলোয় ঝলমল করবে ঠাকুরদালান। হাজার হাজার লোকলস্কর জড়ো করে এমন কাণ্ড ঘটাব না হুজুর, তামাম বাংলা জুলজুল চোখে চেয়ে দেখবে।'

ক্লাইভ হাততালি দিয়ে বলে উঠলেন, 'বিউটিফুল। এমনই তো আমি চাইছিলাম।'

নবকৃষ্ণ বললেন, 'পুজোর দিনে আমার গৃহে কিন্তু আসতেই হবে আপনাকে। আগাম দাওয়াত দিয়ে রাখলাম। আমি জানি কৃষ্ণচন্দ্র আপনাকে নদিয়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ঝুলোঝুলি করবেন।'

ক্লাইভ হেসে বললেন, 'নদিয়া নয়, তোমার হাভেলিতেই আমি যাব।'

উৎসাহে, আনন্দে ঝকঝক করছে নবকৃষ্ণর চোখমুখ। তিনি বললেন, 'আর একটা কথা হুজুর। আমার জন্য একটা তোপ বরাদ্দ করবেন। পলাশির তোপ। স্মারক হিসেবে মাথায় করে রেখে দেব। সেই তোপের গর্জন দিয়ে শুরু হবে মায়ের সন্ধিপুজো।'

গুড়ুম! সহসা ভেসে এল তোপধ্বনির আওয়াজ। বজরার আনাচেকানাচে বসে থাকা জলচর পাখির দল চমকে গিয়ে উড়ল আকাশে। ক্লাইভ ও নবকৃষ্ণ দু'জনেই কেঁপে উঠলেন। কথায় কথায় অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। ক্লাইভের বজরা তখন পেরিন পয়েন্ট অতিক্রম করছে। অদূরে সুতানুটি। ফের গর্জন করে কামান।

নবকৃষ্ণ হেসে বললেন, আপনাকে ওয়েলকাম জানানোর জন্য তোপ দাগছে পেরিন পয়েন্ট।

কুরসি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ক্লাইভ।

কেল্লাঘাটে ভিড়ল ক্লাইভের বজরা।

বজরা থেকে নেমে দেখলেন গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছেন গভর্নর ড্রেক, হলওয়েল ও কাউন্সিলের অন্যান্য মেম্বাররা। এত বড় একটা লড়াই জিতে, কোম্পানির ভবিষ্যৎকে মজবুত জমির উপরে দাঁড় করিয়ে ফিরলেন, অথচ তাঁর কলিগদের মধ্যে কোনও আনন্দ উচ্ছ্বাস নেই! বেশ হতাশ হলেন কর্নেল ক্লাইভ।

হলওয়েল এগিয়ে এসে বললেন, 'ওয়েলকাম কর্নেল। উই আর হেয়ার টু রিসিভ ইউ উইথ অ্যা ভেরি স্যাড নিউজ। অ্যাডমিরাল ওয়াটসন ইজ নো মোর।'

'হোয়াট?'

'হি এক্সপায়ার্ড অ্যা ফিউ ডেজ এগো।'

ক্লাইভ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপরে শুধোলেন, 'কী হয়েছিল?'

ড্রেক বললেন, 'দ্যাট ডেডলি ফিভার অফ বেঙ্গল।'

চার্লস ওয়াটসন। হিন্দুস্তানে কোম্পানির বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার জন্য ইংল্যান্ডের রাজার পাঠানো নৌবহরের প্রধান। এককথায় রাজার প্রতিনিধি। ওদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী কর্নেল ক্লাইভ। দুজনের মধ্যে কে বড়? কার হুকুমে চলবে কোম্পানির ফৌজ? এই নিয়ে দুজনের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত বাধত প্রায়ই। আবার ইংরেজদের স্বার্থের কথা ভেবে সেসব মিটেও যেত দ্রুত। কখনও কম্প্রোমাইজ করতেন ক্লাইভ, কখনও ওয়াটসন। কিন্তু লড়াইয়ের ময়দানে ওয়াটসনের সঙ্গে ক্লাইভের তালমিল ছিল অনবদ্য। হিন্দুস্তানের দক্ষিণ উপকূল, পশ্চিম উপকূল তারপরে সুবে বাংলা। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এদেশে লড়াই করেছেন দু'জনে। ফলতা থেকে বজবজ, থানা, কলকাতা, হুগলি, চন্দননগর হয়ে পলাশি। কত স্মৃতি! কত কাহিনি!

চুপচাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন উপরে।

তার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ড্রেক বললেন, 'ফ্রেঞ্চ আর অ্যাট ওয়ার উইথ আস ইন ম্যাড্রাস। সিচুয়েশন ইজ নট ভেরি গুড ইন আওয়ার ফেভার। কাউন্ট লালি বিইংগ অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ ফ্রেঞ্চ গভর্নর জেনারেল অ্যাপ্রোচিং পণ্ডিচেরি উইথ অ্যা বিগ ফোর্স। মিস্টার পিগট ওয়ান্টস ইওর প্রেসেন্স ইন ম্যাড্রাস অ্যাট দ্য আরলিয়েস্ট।'

ক্লাইভ কোনও জবাব দিলেন না। নীরবে সিঁড়ি ভাঙতে লাগলেন।

২৯

সকাল থেকেই আকাশের মুখ থমথমে। সূর্য মুখ লুকিয়েছে মেঘের আড়ালে। ভোর রাত থেকে বৃষ্টি নেমেছিল। বেশ কয়েকঘণ্টার অবিরাম ধারাবর্ষণ থেমেছে খানিক আগে। কলকাতার পথঘাট জলকাদায় মাখামাখি। বর্ষা গিয়েছে। এসেছে শরৎ। তবুও বর্ষার বিরাম নেই।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল ক্লাইভের। চটপট ফ্রেশ হয়ে নিলেন। বৃষ্টি একটু ধরতেই কেল্লা থেকে বেরিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে গঙ্গার ধার বরাবর পাথর বাঁধানো পথ ধরে দক্ষিণমুখে ছুটে চললেন। সঙ্গী হলওয়েল, রজার ড্রেক, ওয়ালশ, কোম্পানির সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ব্রোহিয়ার, মুনশি নবকৃষ্ণ ও ব্যক্তিগত দেহরক্ষী স্ট্রন।

পথে যেতে যেতে শহরটাকে মন দিয়ে জরিপ করছিলেন ক্লাইভ। সেই মার্চে এই শহর ছেড়ে চন্দননগরের পথে রওনা হয়েছিলেন, পলাশি জয় করে ফিরলেন চার মাস পরে। বর্ষাস্নাত কলকাতার সঙ্গে ক্লাইভের এই প্রথম সাক্ষাৎ।

বর্ষার জল পেয়ে চারিদিকে উচ্ছৃঙ্খল ভাবে বেড়ে উঠেছে গাছপালা। বড় বেশি ঘন হয়ে উঠেছে ঝোপ-জঙ্গল। ক্লাইভ দেখলেন, হুগলি নদীর কুল ছাপিয়ে নিচু জায়গাগুলো জলে প্লাবিত হয়েছে। তিনি ভাবতে লাগলেন, এই শহরটাকে ইংরেজদের বসবাসের পক্ষে আদর্শ করে তুলতে হলে ঢেলে সাজাতে হবে। বহু টাকার প্রয়োজন। হুগলি নদীকে বশে আনতে হলে শক্তপোক্ত একটা বাঁধ দেওয়ার প্রয়োজন। তিনি শুনেছেন বর্ষায় নদী উপচে ভেসে যায় গুদামগুলো। হর সাল বহুত লোকসান হয়। পাকা রাস্তার সংখ্যা শহরে খুবই কম। রাস্তাঘাট পাকা করা দরকার। না হলে চলাচলে বড্ড অসুবিধা। গড়তে হবে নিকাশি ব্যবস্থাও। এসব না হয় ধীরে ধীরে করা যাবে, কিন্তু সবার আগে প্রয়োজন শক্তপোক্ত একটা কেল্লা।

ফোর্ট উইলিয়ামের হতশ্রী দশা। গেল বছরে কলকাতা আক্রমণ করে কেল্লাটাকে মারাত্মক ভাবে জখম করে দিয়ে গিয়েছিলেন সিরাজদ্দৌলা। হতশ্রী, কঙ্কালসার চেহারা নিয়ে কোনওরকমে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফোর্ট উইলিয়াম। এ কেল্লাকে মেরামত করে ফের পোক্ত করে তোলা আর সম্ভব নয়। অবিলম্বে কলকাতায় একটা মজবুত কেল্লা গড়ে তুলতে চান ক্লাইভ।

সিরাজদ্দৌলা অতীত হয়ে গেলেও ইংরেজদের বিপদ যে পুরোপুরি কেটে গিয়েছে তা বলা যায় না। হানা দিতে পারেন অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা, ফের হাঙ্গামা বাধাতে পারে মারাঠারা। ফরাসি জেনারেল কাউন্ট লালি বিরাট ফৌজ নিয়ে দক্ষিণ ভারতে আসছেন। চন্দননগর পুনরুদ্ধারের কোশিশ করতে তিনি যে বাংলায় হানা দেবে না, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়। অতএব ইংরেজদের সুরক্ষার জন্য দ্রুত একটা কেল্লা গড়ে তোলা দরকার।

কিন্তু কোথায় গড়ে তোলা হবে নতুন কেল্লা? এ নিয়ে গতকাল আলোচনায় বসেছিলেন ক্লাইভ। কোম্পানির সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ব্রোহিয়ার বললেন, 'একটা প্লেস আমি আইডেন্টিফাই করেছি। ড্রাফটেড অ্যা প্রোপোসাল। মি হলওয়েল ও মি ড্রেক এনডোরস করেছেন। আমরা ওখানে নতুন একটা কেল্লা গড়তে পারি।'

পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে ক্লাইভ শুধোলেন, 'জায়গাটা কোথায়?'

টেবিলের উপরে বিছানো ম্যাপের উপর আঙুল রেখে ব্রোহিয়ার বললেন, 'এই যে। এখান থেকে সামান্য দক্ষিণে।'

ম্যাপের উপরে চোখ রেখে ভুরু কোঁচকালেন ক্লাইভ।

হলওয়েল ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'বিসাইড দ্য ওল্ড ডক।'

'আই সি।' আর কোনও মন্তব্য না করে চোখ বুজে পাইপ টানতে লাগলেন ক্লাইভ। দেহের অভিব্যক্তিতে খুব স্পষ্ট যে ব্রোহিয়ারের প্রস্তাবটা তাঁর বড় একটা পছন্দ হয়নি।

'অ্যাকর্ডিং টু মাই প্ল্যান, উই মে এক্সিকিউট দ্য ওয়ার্ক ইন টু ফেজেস।' এই বলে ক্লাইভের প্রতিক্রিয়ার জন্য তাঁর মুখের দিকে তাকালেন ব্রোহিয়ার।

'প্লিজ প্রসিড।' চোখ বুজেই বললেন ক্লাইভ।

'ইন দ্য ফার্স্ট ফেজ রিভার ব্যঙ্ক সাইড অ্যান্ড গোডাউনস উইল বি প্রোটেক্টেড।'

'দেন?' এবারে চোখ খুলে প্রশ্ন করলেন ক্লাইভ।

'আই ওয়ান্ট টু ফর্টিফাই দ্য হোয়াইট টাউন উইথ গ্ল্যাসিস অ্যান্ড ডিচেস।'

ক্লাইভ চমকে উঠে বললেন, 'ও মাই গুডনেস।'

'ডু ইউ নট এগ্রি উইথ দিস প্রোপোসাল স্যার?'

ক্লাইভ দ্বিধাহীন কণ্ঠে বললেন, 'নো। গ্ল্যাসিস অ্যান্ড ডিচেস উইল স্পয়েল দ্য সিটি।'
ব্রোহিয়ার বললেন, 'বাট হাউ ক্যান উই প্রোটেক্ট দ্য হোয়াইট টাউন স্যার?'
ক্লাইভ একটু বিরক্তির সুরে বললেন, 'শহরের মাঝখানে এভাবে দেওয়াল তুললে আর খাত খুঁড়লে এই সুন্দর শহরটাই যে নষ্ট হয়ে যাবে। তাছাড়া যে এলাকার কথা আপনারা বলছেন, তার কাছে-পিঠে রয়েছে অনেক বাড়িঘর। উই নিড ফ্রি স্পেস ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ফোর্ট। আমার মনে হয় আপনারা যে জায়গাটা আইডেন্টিফাই করেছেন, দ্যাট ইজ নট আইডিয়াল ফর ফোর্ট উইলিয়াম।'
মুখ গোমড়া হল হলওয়েল ও ড্রেকের।
ব্রোহিয়ার অসহিষ্ণু গলায় বললেন, 'মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট ও একই সঙ্গে সিভিলিয়ানদের প্রোটেকশন, আই মিন প্রোটেকশন অফ দ্য হোয়াইট টাউন এই দুটোকে মেলানোর মতো আর তো অন্য কোনও জায়গা দেখছি না।'
'ফরগেট দ্য অ্যাবসার্ড আইডিয়া টু স্যারাউন্ড দ্য এনটায়ার হোয়াইট টাউন উইথ গ্ল্যাসিস অ্যান্ড ডিচেস। অনলি থিংক অ্যাবাউট নিড অফ অ্যা মিলিটারি ফোর্স।'
রজার ড্রেক আঁতকে উঠে বললেন, 'বলছেন কী মশায়? গত বছরের মতো ফের যদি ক্যালকাটা অ্যাটাক্‌ড হয়, তখন কী হবে? হোয়াইট টাউন প্রোটেক্টেড থাকলে অনেকে বেঁচে যাবে।'
ক্লাইভ উদ্ধত ভঙ্গিতে পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'ইন ফিউচার এই শহরে ইংরেজদের সংখ্যা অনেক বাড়বে। বাড়িঘরের সংখ্যাও বাড়বে। শুধু হোয়াইট টাউন বলে কিছু থাকবে না। ইংরেজরা ছড়িয়ে পড়বে থ্রু আউট দ্য সিটি। কত জায়গায় খাত খুড়বেন আর পাঁচিল দেবেন?'
হলওয়েল গম্ভীর মুখে বললেন, 'ইউ হ্যাভ নট ফেসড দ্য গ্রিম সিচুয়েশন লাস্ট ইয়ার।'
রজার ড্রেক শুধোলেন, 'ডু ইউ হ্যাভ এনি অলটারনেটিভ প্ল্যান ইন ইওর মাইন্ড?'
ক্লাইভ বললেন, 'আই অ্যাম প্রোপোজিং টু বিল্ড নিউ ফোর্ট উইলিয়াম অ্যাট গোবিন্দপুর।'
চোখ কপালে তুলে হলওয়েল বললেন, 'দ্যাট উড বি অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য মেইন টাউন।'
ক্লাইভ ঘাড় নেড়ে বললেন, 'ইয়েস। বাট উই গেট দ্য ক্লিয়ার স্পেস।'
ড্রেক অসহিষ্ণু গলায় বললেন, 'ইফ উই হ্যাভ টু ফেস দ্য গ্রেভ সিচুয়েশন এগেইন? দেন?'
ক্লাইভ বললেন, 'দ্য ইংলিশ মেন ক্যান টেক টেম্পোরারি শেল্টার ইন দ্য ফোর্ট। আই ওয়ান্ট মোর স্পেস দ্যান ইউ প্রোপোসড।'
ব্রোহিয়ার শুধোলেন, 'আপনি যতটা জায়গার কথা ভাবছেন, গোবিন্দপুরে তা কোথায় পাবেন?'
ক্লাইভ মুচকি হেসে বললেন, 'আছে। আপনারা ভালো করে খুঁজে দেখেননি, তাই পাননি।'
মুখ গোমড়া হল ব্রোহিয়ার, ড্রেক ও হলওয়েলের।
ক্লাইভ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'টুমোরো আই উইল শো ইউ দ্য স্পট।'
সকলকে নিয়ে আজ সেই স্পট দেখাতেই চলেছেন ক্লাইভ। পথে অবশ্য অন্য একটা কাজের জন্য থামতে হবে তাঁকে।
পাশ থেকে নব মুনশি বলে উঠলেন, 'হুজুর ওই যে গোরস্থান।'
ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলেন ক্লাইভ।
সামান্য উঁচু, ঢিবির মতো জমি। বর্ষায় জলে ডোবে না। এ তল্লাটে সবুজ খুব ঘন। গোটা এলাকা জুড়ে রয়েছে বড়বড় গাছপালা। সবুজ পাতা ও ডালপালার আগ্রাসী বিস্তার আকাশকে প্রায় ছেয়ে ফেলেছে। স্যাঁতসেঁতে মাটি বুনো ঘাস, লতাগুল্মে আচ্ছাদিত। এটাই শহর কলকাতার বুকে ইংরেজদের গোরস্থান। এর পুব দিকে আছে কোম্পানির বারুদঘর—পাউডার ম্যাগাজিন ইয়ার্ড। তার ওপাশে কোম্পানির হাসপাতাল।

নামেই অবশ্য হাসপাতাল। না আছে ডাক্তার, না আছে ওষুধপত্র। সাহেবরাই ঠাট্টা করে বলে, কোনও পরিকাঠামো নেই বলেই হাসপাতাল থেকে গোরস্থানের দূরত্ব বড় কম।

ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল সকলে।

গোরস্থানে প্রবেশের মুখে কাঠের তোরণদ্বারের উপরে খোদাই করে লেখা রয়েছে 'ক্যালকাটা সেমেটারি'। ভিতরে এঁকেবেঁকে গিয়েছে পায়ে চলা সুঁড়ি পথ। মূল প্রবেশ পথের দু'পাশের কিছুটা এলাকা শাল গাছের খুঁটি পুতে, গাছের ডালপালা দিয়ে ঘিরে রাখা রয়েছে। এছাড়া গোটা এলাকাটা আগলহীন। বুনো জন্তু জানোয়ারের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। যে কোনও সময় হানা দিতে পারে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বা দাঁতাল বুনো শুয়োর। মাঝে মাঝে কবরের উপরের মাটি বর্ষার জলে ধুয়ে গিয়ে বেরিয়ে পড়ে গলিত শবদেহ। তার প্রতীক্ষায় বড় বড় গাছের মাথায় ওত পেতে বসে থাকে শকুন, হাড়গিলের দল। ঝোপের আড়াল থেকে উঁকি দেয় হায়না,

শেয়াল। বিষধর সাপের আনাগোনা এ তল্লাটে কম নয়। সব মিলিয়ে এ স্থান বেশ বিপজ্জনক।

ভিতরে চলাচলের পথের দু'দিকে সার দিয়ে পরপর রয়েছে সমাধিগুলো। কোনও কোনও সমাধি স্রেফ মাটি চাপা দেওয়া, কোনও সমাধির উপরে সরু ইট বিছিয়ে পাকা করা হয়েছে। কোনও সমাধিকে ঘিরে গড়া হয়েছে ছোট্ট সমাধিমন্দির। যার যেমন সামর্থ। সমাধিক্ষেত্রের গড়ন দেখে বোঝা যায় একের সঙ্গে অন্যের বিত্তের তফাত। ফলকে খোদাই করা সাল-তারিখের খতেন বলে, যারা শায়িত রয়েছেন, তাদের বেশিরভাগেরই জীবনমুকুল অকালে ঝরে গিয়েছে। কারণ কলেরা বা বাংলার কুখ্যাত অজানা জ্বর।

মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় ফেরার পথে জাহাজেই জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন অ্যাডমিরাল ওয়াটসন। পক্ষকালের মধ্যেই হানা দিল যমদূত। কিছুদিন আগে এই গোরস্থানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে।

অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের সমাধির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন ক্লাইভ। তেকোনা টুপিটা হাতে নিয়ে নত মস্তকে ওয়াটসনের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন। ফুলের ঝুড়ি এগিয়ে দিলেন নবকৃষ্ণ। রাশি রাশি নানা রঙের ফুল গ্রেভের উপরে ছড়িয়ে দিলেন ক্লাইভ। ফুলে ঢেকে গেল কর্দমাক্ত মাটি।

ওয়াটসনের কবরের পাশে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে আছেন ড্রেক, হলওয়েল, ওয়ালশ ও ব্রোহিয়ার।

ক্লাইভ স্বগতোক্তির ঢঙে বললেন, 'ভেরি আনহ্যাপি ফেট।'

'ইয়েস। আনটাইমলি কাট অফ ইন দ্য মিডস্ট অফ হিজ সাকসেস।'

ক্লাইভ বললেন, 'হি মাস্ট বি ক্রাউন্ড উইথ গ্লোরি অ্যান্ড রেপুটেশন। কোম্পানির সার্ভিসে ওঁর ডেডিকেশন অ্যান্ড সাকসেস উইল মেক হিজ মেমোরি পারটিকুলারলি ইন ইন্ডিয়া সারভাইভ টু লেটেস্ট এজেস। উই মাস্ট কনস্ট্রাক্ট অ্যা ডিসেন্ট টুম্ব হিয়ার।'

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন সকলে।

মি ব্রোহিয়ারের উদ্দেশে ক্লাইভ বললেন, 'প্লিজ প্লেস অ্যা প্ল্যান ড্রয়িং অ্যাট দ্য আরলিয়েস্ট।'

'ইয়েস স্যার।'

'স্যার!' হঠাৎই তীব্র চিৎকার করে উঠে ঝাঁপিয়ে ক্লাইভকে মাটিতে শুইয়ে দিল স্ট্রন।

হতচকিত হয়ে গেল সকলে।

চকিতে কোমরবন্ধনী থেকে পিস্তল বের করে স্ট্রন ফের চেঁচিয়ে উঠল, 'সি দ্য স্নেক।'

উপরের দিকে তাকিয়ে হাড় হিম হয়ে গেল সকলের। গাছ থেকে ঝুলছে এক বিষধর গোখরো সাপ। তার চকচকে অচঞ্চল দেহটাই এক বীভৎস ভয়ের প্রতিচ্ছবি। আর একটু হলেই ছোবল মারত ক্লাইভের মাথায়। এখনও ফনা তুলে আছে সেই বিষাক্ত, ভয়ংকর সরীসৃপ।

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ক্লাইভ।

ট্রিগার টিপল স্ট্রন। গুড়ুম।

অব্যর্থ নিশানা। গাছ থেকে ছিটকে পড়ল সাপটা। মাথাটা একেবারে গুঁড়িয়ে গিয়েছে।

গোরস্থান থেকে দ্রুত বেরিয়ে এল গোটা দলটা। ফের ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল সকলে। ঘোড়সওয়ার বাহিনী এবারে ছুটে চলল গোবিন্দপুরের উদ্দেশে।

পথের দু'পাশে ধানক্ষেত জলে ডুবে একেবারে দিগন্ত বিস্তৃত লেকের চেহারা নিয়েছে। মাঝে মাঝে রয়েছে ডোবা, জলা, বুনো ঝোপ, বড় বড় গাছ। ফাঁকেফোকরে উঁকি দিচ্ছে গোলপাতায় ছাওয়া দরিদ্র মানুষের কুটির। পথে এতটাই কাদা যে খুব জোরে ছুটতে পারছে না ঘোড়া। ঢিমে তালে চলেছে। কিছুটা এগিয়ে পশ্চিমদিকে বাঁক নিল ঘোড়সওয়ার বাহিনী।

ধানক্ষেত ফুরিয়ে গিয়ে এবারে জঙ্গল ক্রমশ বাড়ছে। সরু পথ ধরে নদীর প্রায় কিনারায় এসে পৌঁছলেন ক্লাইভ। ঘাসে ঢাকা সামান্য উঁচু ঢিবির মতো এক খণ্ড জমির উপরে উঠে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলেন। অদূরে দেখা যাচ্ছে হুগলি নদী। হলওয়েল, ড্রেক ও ব্রোহিয়ার হাঁ হয়ে গেলেন। কেউই বুঝে উঠতে পারছেন না, এখানে কোথায় কেল্লা গড়ার কথা ভাবছেন কর্নেল ক্লাইভ। চারিদিকে হেঁতাল, গোলপাতা, ম্যানগ্রোভের ঘন জঙ্গল। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের আদর্শ বাসভূমি।

হলওয়েল অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এখানে কেল্লা?'

ক্লাইভ বললেন, 'ইয়েস। হোয়াই নট?'

ড্রেক পরম বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, 'উইদিন দিস টাইগার উড?'

ক্লাইভ জবাব দিলেন, ‘জঙ্গল কেটে সাফ করতে হবে।’

ব্রোহিয়ার বেজার মুখে বললেন, ‘লো ল্যান্ড এরিয়া।’

‘মাটি ফেলে উঁচু করে দিলেই হল।’

ব্রোহিয়ার ফের বললেন, ‘ইভেন অ্যা হাই টাইড উড ইনানডেট দ্যাট ল্যান্ড।’

ক্লাইভ বললেন, ‘আগে গঙ্গার তীর বরাবর পাথর গেঁথে বাঁধ দিতে হবে। জঙ্গল কেটে সাফ করে দিলে চমৎকার একটা জায়গা বেরিয়ে আসবে। এবারে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখুন পিছনে কত খানি ক্লিয়ার স্পেস রয়েছে। বাড়িঘরের আড়ালে লুকিয়ে সাডেনলি দুর্গের কাছে আসতে পারবে না এনিমি। আপনারা কেল্লার কথা ভাবছিলেন ক্রাউডেড এলাকায়। পুরোনো ফোর্ট উইলিয়ামও ছিল ক্রাউডেড এরিয়ায়। সেই কারণে গত বছরে নবাবের ফৌজ খুব বেশিমাত্রায় জখম করতে পেরেছিল কেল্লাকে। গোলা ছুড়ে নবাবের ফৌজকে আটকাতে পারেননি আপনারা। গোলা গিয়ে ধাক্কা খেয়েছিল আমাদেরই ঘরবাড়ির গায়ে। চন্দননগরে ফরাসিদের ফোর্টও ছিল কনজেস্টেড এরিয়ায়। তাই ফরাসিদের ফোর্ট অ্যাটাক করার কাজটা আমাদের কাছে খুব সহজ হয়ে গিয়েছিল।’

অবশেষে ব্রোহিয়ার, ড্রেক, হলওয়েল মানতে বাধ্য হলেন যে ক্লাইভ যে জায়গাটা বেছেছেন, সেটা সত্যিই দুর্গ গড়ে তোলার জন্য আদর্শ স্থান। নতুন প্ল্যান তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ব্রোহিয়ার। দিন সাতেকের মধ্যেই ক্লাইভের উপস্থিতিতে কয়েকশো মজুর, কাঠুরিয়া কুঠার, কোদাল, বেলচা নিয়ে লেগে পড়ল জঙ্গল সাফ করার কাজে। কলকাতার বুকে নতুন ফোর্ট উইলিয়াম গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়ে গেল।

৩০

ভাগীরথীর বুকে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে কেন্ট, টাইগার, সলিসবেরি, ব্রিজওয়াটার ও কামবারল্যান্ড। প্রত্যেকটা জাহাজের মাথায় উড়ছে ইউনিয়ন জ্যাক। শালতি চেপে দলে দলে গোরাপল্টনেরা জাহাজগুলোতে গিয়ে উঠছে। খানিকবাদে কোম্পানির নৌবহর মেজর আয়ারকুটের নেতৃত্বে রওনা হবে মাদ্রাজের উদ্দেশে। দক্ষিণে ফরাসিদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধতে চলেছে। মেজর আয়ারকুটে সঙ্গে অ্যাডমিরাল পোককও মাদ্রাজে পাড়ি দেবেন।

মাদ্রাজ কাউন্সিলের গভর্নর মি পিগট ফিরে আসার জন্য বারবার তাগাদা দিচ্ছিলেন ক্লাইভকে। কিন্তু এই মুহূর্তে বাংলা ছেড়ে নড়ার ইচ্ছে ক্লাইভের নেই। পিগট সাহেবের উদ্দেশে তিনি লিখলেন, ‘...রেসপেক্টেড স্যার, বাংলায় আমাদের জয়লাভ হয়েছে। নবাব সিরাজদ্দৌলাকে মসনদ থেকে হটিয়ে আমরা একজন পুতুল নবাবকে মসনদে বসিয়েছি ঠিকই তবে বাংলার পলিটিক্যাল সিচুয়েশন এখনও স্টেবল নয়। নিজেদের শর্তে বাংলায় আমরা ফের কারবার চালু করতে পেরেছি, তবে ব্যাবসার ক্ষেত্রে এদেশে একচেটিয়া অধিকার কায়েম করতে হলে মুর্শিদাবাদের দরবার রাজনীতির উপরে আমাদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। আশঙ্কার কথা হল এই যে বাংলায় ফের হানা দিতে পারে বর্গিরা, মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করতে পারেন অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা। বর্তমান নবাব মিরজাফর খাঁ খুবই দুর্বল। নিজামতের অন্দরে দেখা দিয়েছে অন্তর্কলহ। দেওয়ান রায়দুর্লভ নবাবকে মসনদ থেকে হটিয়ে দিতে চান। এই ইচ্ছের কথা আমার কাছে তিনি কবুলও করেছেন। এই পরিস্থিতিতে বাইরের শত্রু আক্রমণ করলে নবাবের পক্ষে মসনদ টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়ে উঠবে না।

সব মিলিয়ে সিচুয়েশন ইজ ভেরি কমপ্লেক্স। আপাতত নবাব মিরজাফর খাঁকে সহি সালামত রাখা দরকার। পলাশির ইকরারনামা মোতাবেক সবে মাত্র প্রথম কিস্তির টাকা আমরা পেয়েছি। এখনও বিপুল পরিমাণ টাকা

বকেয়া রয়েছে। এ অবস্থায় অচানক নবাব বদল হলে, পরবর্তী নবাব হয়তো সেই চুক্তির দায় নিতে চাইবেন না। তাছাড়া অন্য কোনও শক্তি বাংলা দখল করে নিলে ফের বেকায়দায় পড়তে হবে আমাদের। তাই বাংলায় বসে আপাতত পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখতে চাই আমি। কাজেই বুঝতেই পারছেন এখনই আমার পক্ষে বাংলা ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

আপনাকে এবারে একটা খারাপ খবর জানাই। অ্যাডমিরাল ওয়াটসন ইজ নো মোর। মুর্শিদাবাদ থেকে ফিরে আসার পরে অজানা জ্বরে আক্রান্ত হয়ে দেহ রেখেছেন। তবে আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। অ্যাডমিরাল পোককের সঙ্গে যুদ্ধজাহাজগুলোকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি মাদ্রাজে। সেই সঙ্গে পাঠাচ্ছি মেজর আয়ারকুট ও পাঁচশো ফৌজিকে। মেজর আয়ারকুট অত্যন্ত দক্ষ অফিসার। আমার ধারণা দক্ষিণে সে ইংরেজবাহিনীকে যথার্থ নেতৃত্ব দিতে পারবে।'

উইথ রিগার্ডস। ইওরস সিনসিয়ারলি, রবার্ট ক্লাইভ।

টাইগার জাহাজের অদূরে জোয়ারের ঢেউয়ে দুলছে ছোট একটা দেশি নৌকো। ছইয়ের নীচে শুয়ে বাইরের দিকে মুখ বাড়িয়ে বাঘের মুখ আঁকা জাহাজটাকে খুঁজছিল ঈশ্বরী। গায়ে ধুম জ্বর। শরীর খুবই দুর্বল। সঙ্গে সে নিয়ে এসেছে বিশুর মাকে। বরানগরে বিদ্যার বাড়ির পরিচারিকা ছিল বিশুর মা। স্বামী-পুত্রহারা প্রৌঢ়া। কাশী যাওয়ার পথে বিদ্যা হারিয়ে গিয়েছে, একথা শুনে খুব কেঁদেছিল বিশুর মা।

চোখের জল চেপে ঈশ্বরী বলেছিল, 'কাঁদছ কেন মাসি? আমি তো রয়েছি।' বরানগরে নিজের বাড়িতে বিশুর মাকে আশ্রয় দিয়েছে ঈশ্বরী। এখন বিশুর মা'ই ঈশ্বরীর দেখভাল করে।

মুর্শিদাবাদ থেকে ঈশ্বরীর কলকাতায় ফেরার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন মেজর আয়ারকুট। ভাড়া করা একটা বজরায় চেপে ইংরেজ নৌবহরের পিছুপিছু কলকাতায় ফিরে আসে ঈশ্বরী। তার সঙ্গে আয়ারকুটের আশনাইয়ের কথা ক্লাইভের কানে পৌঁছেছে। মুচকি হেসে আয়ারকুটকে তিনি শুধিয়েছিলেন, 'আই হ্যাভ হার্ড দ্যাট ইউ গট অ্যা কনসর্ট। অ্যা কান্ট্রি গার্ল। ইজ দ্যাট ট্রু?'

'ইয়েস স্যার।'

'এনজয় ইওর টাইম ফর অ্যা ফিউ ডেজ অ্যান্ড স্টোর এনার্জি টু ফাইট এগেইন্সট দ্য ফ্রেঞ্চ।'

আয়ারকুট অবাক হন। 'হোয়াট?'

'ইউ হ্যাভ টু গো টু ম্যাড্রাস। মি. পিগট নিডস হেল্প। ফ্রেঞ্চ জেনারেল কাউন্ট লালি ইজ অ্যাপ্রোচিং পুণ্ডিচেরি।'

এভাবেই মাদ্রাজে পাড়ি দেওয়ার কথাটা আয়ারকুটকে বলেছিলেন ক্লাইভ।

মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল আয়ারকুটের। ঈশ্বরীকে সঙ্গে করে মাদ্রাজে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তিনি চলেছেন গুরুত্বপূর্ণ এক লড়াই লড়তে। থাকতে হবে সেনা ছাউনিতে। ওদিকে মন চাইছে না পিয়ারিকে কলকাতায় রেখে যেতে। সে এক বিষম সঙ্কট।

দিন কয়েক আগের কথা। আকাশে ভাসছিল আধখানা চাঁদ। নদীর বুকে ভাসমান বজরার ছাতে ফরাসের উপরে ডান হাঁটুতে থুতনি রেখে বসেছিল ঈশ্বরী। মনে বিষাদের মেঘ। নাগর চলে যাবে দূরে। ঈশ্বরীর চোখে টলটল করছিল জল।

'রাগ কোরো না ডার্লিং। আমাকে যেতেই হবে। ফরাসিদের সঙ্গে লড়াই বেধেছে।'

ঈশ্বরী জবাব দেয় না। চুপ করে বসে থাকে।

আয়ারকুট বজরার ছাতের রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হেঁটে এসে ঈশ্বরীর মুখোমুখি হাঁটু মুড়ে বসলেন। 'কাঁদছ ডার্লিং?'

ঈশ্বরী এবারে ভেঙে পড়ে সশব্দ কান্নায়।

আয়ারকুট বলেন, 'আমি ওয়ারফিল্ডে যাচ্ছি ডার্লিং। ওখানে তোমাকে নিয়ে যাওয়া যায় না।'

কান্না থামিয়ে মুখ তুলে চোখের জল মুছে ঈশ্বরী বলে, ‘আমাকে বুঝ দিও না সাহেব।’

‘মাদ্রাজের লড়াই মিটে গেলেই আমি আবার ফিরে আসব কলকাতায়।’

‘আর বোধহয় তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।’

আয়ারকুট মুখ তুলে আকাশের দিকে চাইলেন। তাঁর বুকের কাছে পাক খাচ্ছে একটা কষ্ট।

সবাই জানে বড় শক্ত মনের মানুষ মেজর আয়ারকুট। সূক্ষ্ম আবেগ, অনুভূতির কোনও দাম নেই তাঁর কাছে। লড়াইয়ের ময়দানে ভয়ংকর আগ্রাসী মনোভাবের জন্য তিনি বিখ্যাত। যুদ্ধক্ষেত্রে চরম বিপদের মধ্যেও এতটুকু বিচলিত হন না, এতটুকু টোল খায় না তাঁর আত্মবিশ্বাস। অনমনীয় মনোভাবের সঙ্গে লড়াই করে শত্রুকে মেরে, কেটে নিকেষ করে দিতে তার জুড়ি মেলা ভার। শত্রুপক্ষ বলে মেজর আয়ারকুট জল্লাদ, নির্মম, নিষ্ঠুর। এমন একজন মানুষকে কী করে এমন মায়ার বন্ধনে জড়াল এই মেয়েটি? আয়ারকুট নিজেই অবাক হয়ে যান।

মেজর সাহেব বললেন, ‘পরশু আমি চলে যাব ডার্লিং।’

ঈশ্বরী নির্বাক।

‘জাহাজে ওঠার সময় তোমাকে দেখতে চাই একবার। অবশ্যই এসো।’

ঈশ্বরী অবাক হয়ে মুখ তুলে শুধোয়, ‘ওখানে কীভাবে যাব আমি?’

‘নৌকো করে এসো। জাহাজে ওঠার সময় দেখতে পাবে আমাকে।’

ঈশ্বরী শুধোয়, ‘কোন জাহাজ?’

‘টাইগার। দেখবে জাহাজের গায়ে বাঘের মস্ত বড় একটা মুখ আঁকা আছে। যখন জাহাজ থেকে ব্যান্ডে গানের সুর ভেসে আসবে, বুঝবে ঘাট থেকে শালতিতে চেপে জাহাজে চড়ার জন্য আমি রওনা হয়েছি।’

ঈশ্বরী শুধোয়, ‘কী গান?’

আয়ারকুট বলেন, ‘রুল ব্রিটানিয়া।’

মেজরসাহেব শিস দিয়ে গেয়ে শোনান রুল ব্রিটানিয়ার সুর।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে আয়ারকুটের মুখের দিকে চেয়ে থাকে ঈশ্বরী।

‘মনে থাকবে ডার্লিং?’

ঈশ্বরী ঘাড় নাড়ে।

আয়ারকুট অপলক চোখে চেয়ে থাকেন ঈশ্বরীর মুখপানে।

‘অমন করে কী দেখছ সাহেব?’

‘তোমাকে। ইউ আর টু প্রিটি। বহুত সুন্দর।’

হাসতে গিয়ে কান্নায় ফের ভেঙে পড়েছিল ঈশ্বরী।

গতকাল রাত থেকে ধুম জ্বর এসেছে ঈশ্বরীর। এখনও জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গা। তবুও সাহেবকে একবার দেখার জন্য সে ভোর রাতে বরানগর থেকে নৌকো করে নদীতে ভেসে পড়ে।

জ্বালা করছে চোখদুটো। বাঘের মুখ আঁকা জাহাজটাকে দেখতে পায় ঈশ্বরী। অদূরে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঈশ্বরীর গলার কাছে আটকে রয়েছে কান্না।

কেল্লাঘাটে দাঁড়িয়ে অ্যাডমিরাল পোকক ও মেজর আয়ারকুটকে সি অফ করলেন কর্নেল ক্লাইভ। তিনিও যাত্রার জন্য প্রস্তুত। অপেক্ষা করছে তাঁর বজরা। ক্লাইভ যাবেন চন্দননগরে। কলকাতার জলহাওয়া সহ্য হচ্ছে না। আপাতত চন্দননগরের ফ্রেঞ্চ গার্ডেনে কিছুদিন থাকবেন। নৌবহরকে মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করিয়ে তারপর কর্নেল ক্লাইভ রওনা হবেন চন্দননগরের উদ্দেশে। তাঁর বাহিনীর বড় একটা অংশ সেখানে রয়েছে।

দুটো আলাদা আলাদা শালতিতে উঠলেন, আয়ারকুট ও পোকক। মিলিটারি ব্যান্ডে বেজে উঠল রুল ব্রিটানিয়া। আয়ারকুটের শালতি এগিয়ে চলল টাইগার জাহাজের দিকে।

কোমরে হাত দিয়ে গলুইয়ের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন আয়ারকুট। মোচার খোলার মতো অসংখ্য শালতি ভাসছে জলে। আয়ারকুটের ব্যগ্র দুই চোখ খুঁজছে তাঁর পিয়ারিকে।

পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রুজি-রোজগারের তাগিদে অনিশ্চয়তার জোয়ারে ভেসেছেন আয়ারকুট। একজন সেনানীর জীবন বড় রুক্ষ, কর্কশ। এ জীবনে দুদণ্ড শান্তি মেলে না। প্রতিমুহূর্তে জীবন বাজি রেখে চলা। ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষা। থেকে থেকে মনে হয়, এই বুঝি ফুরিয়ে এল জীবনের মেয়াদ। সামান্য অবসর বা ফুরসত যখন মেলে, সে সময়ে পার্থিব সুখরসের আকণ্ঠ আস্বাদ পেতে তাই অধীর হয়ে ওঠে মন। দেহ চায় রতিসুখ। এদেশে সুলভে রঙ্গিনী মেলে। কিন্তু মাধুর্যে, ভালোবাসা দিয়ে মনকে ভরিয়ে দিতে পারে ক'জনে?

দেহসুখ চরিতার্থ করতেই তো রতু সরকারের হাতে মোটা টাকা গুঁজে দিয়ে ঈশ্বরীর রাতের নাগর হয়েছিলেন আয়ারকুট। ভালোবাসার বন্ধনে জড়িয়ে পড়ার কোনও কথা তো ছিল না। তাহলে? মেয়েটা কি জাদু জানে? শালতি প্রায় এসে পড়ল জাহাজের কাছে। কিন্তু কোথায় সে? কোথায় ডার্লিং ঈশ্বরী?

রুল ব্রিটানিয়ার সুর কানে ভেসে আসতেই গায়ের চাদর সরিয়ে দ্রুত উঠে বসে ঈশ্বরী। শরীরের দুর্বলতাকে উপেক্ষা করে ছইয়ের নীচ থেকে বের হয়ে গলুইয়ের উপরে এসে দাঁড়ায়। প্রবল উত্তেজনায় সে খুঁজতে থাকে তার সাহেবকে। শ্বাসপ্রশ্বাসের বেগ দ্রুততর হয়।

পরপর এগিয়ে চলেছে কয়েকটা শালতি। সহসা আয়ারকুটকে দেখতে পায় ঈশ্বরী। গলুইয়ের উপরে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য রক্তবর্ণের মসলিনের দোপাট্টা শূন্যে দোলাতে থাকে ঈশ্বরী।

আয়ারকুটের নজরে এল উড্ডীন দোপাট্টা। হাত নাড়লেন দূর থেকে।

ঈশ্বরীর নরম দুই গাল বেয়ে জলের ধারা নামে।

খানিকবাদে তার নজরের আড়ালে চলে গেলেন মেজর আয়ারকুট।

ঈশ্বরী অস্ফুট স্বরে বলল, 'ভালো থেকো সাহেব।'

জাহাজের ঘণ্টি বাজল। চলতে শুরু করল কোম্পানির নৌবহর।

সারা গায়ে ব্যথা। ব্যথার তাড়সে ঈশ্বরীর গোটা দেহ যেন অবশ হয়ে আসছে।

বিশুর মা বলে, 'এবারে দাঁড় বাইতে বলি দিদিমণি? চলো ফেরা যাক। অনেক দেরি হয়ে গেল। জোলো বাতাসে শরীর আরও খারাপ করবে।'

জাহাজগুলো চলে যাচ্ছে দূরে। ঈশ্বরী বলে, 'একটু দাঁড়াও মাসি।'

ধীরে ধীরে নৌকোর পাটাতনের উপরে বসে পড়ে ঈশ্বরী। সারা গায়ে তীব্র ব্যথা। যেন অজস্র বিষফোঁড়া ত্বক ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে। পরনের ঘাগরা খানিকটা উপরে উঠে গিয়েছে। সেটা নামাতে গিয়ে চমকে ওঠে ঈশ্বরী। ডান পায়ে হাঁটুর নীচে ফুটে বেরিয়েছে একটি গুটিকা। ঠিক ফোসকার মতো। তলপেটে ব্যথা। ঈশ্বরী দেখে তার নাভির ঠিক নীচে বেরিয়েছে অবিকল ওইরকম দুটি গুটি। অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে ঈশ্বরীর। এ এক ভয়ানক মারণ রোগের বহিঃপ্রকাশ। কপালে হাত দিয়ে সে অনুভব করে জ্বরটা আরও বেড়েছে।

অস্থির হয়ে পড়েছেন মহারাজ রাজবল্লভ। তাগদ, ক্ষমতা, জোশ খুব দ্রুত তিনি ফিরে পেতে চান। বয়স বাড়ছে। পাক ধরেছে মাথার চুলে। পেরিয়ে যাচ্ছে সময়। পরমায়ু কতদিনের জানা নেই। বৈদ্য কুলপতির

অন্তরে এখনও দাউ দাউ করে জ্বলছে ক্ষমতালিপ্সার আগুন। ক্ষমতা বয়ে আনে ভোগসুখের আনন্দ। ভোগ যে এখনও অনেক বাকি।

মিরজাফরকে হটিয়ে মির্জা মেহেদিকে মসনদে বসানোর পর সিপাহসালারের পদটা রাজবল্লভকে পাইয়ে দেবেন। কথা দিয়েছেন রায়দুর্লভ। কিন্তু রাজনীতিতে অভিজ্ঞ রাজবল্লভ বুঝতে পারছেন, এই ইনকিলাব জলদি হবে না। ইংরেজদের মদত ছাড়া নবাবের সঙ্গে পাঞ্জা কষার হিম্মত রায়দুর্লভের নেই। ক্লাইভের মতিগতি দেখে রাজবল্লভের ধারণা হয়েছে, এই মুহূর্তে মসনদ নিয়ে ফের একটা কাজিয়ায় জড়িয়ে পড়তে চান না তিনি। তাহলে উপায়?

নিজের নসিব ফেরাতে মিরনের সঙ্গেই হাত মেলানোর পরিকল্পনা করলেন রাজবল্লভ। তিনি জানেন দেওয়ান রায়দুর্লভের ঘনিষ্ঠ বৃত্তের আদমি বলে পরিচিতি থাকায় নবাবজাদা মিরন তাঁকে একেবারেই পছন্দ করেন না। মিরনের আস্থা অর্জন সহজ নয়। কৌশল হাতড়াতে লাগলেন বৈদ্যকুলপতি। কী ভাবে কাজটা হাসিল করা যায়। কূটবুদ্ধি তার মাথায় খেলে ভালো। চটজলদি একটা উপায়ও বের করে ফেললেন।

'...বিহারমুলুকের জমিদারেরা সব আপনার অনুগত। আপনি ফৌজ নিয়ে এগিয়ে আসলেই কাম হাসিল হয়ে যাবে। নবাব মিরজাফর খাঁকে হটিয়ে মির্জা মেহেদিকে মসনদে বসাতে চাই। এতে আমার আপনার সকলেরই লাভ। কারণটা আশা করি বুঝিয়ে বলতে হবে না। আপনি অভিজ্ঞ লোক। পাটনার নায়েব সুবাদারের পদে বহুদিন বহাল আছেন। সুবে বাংলার রাজনীতির অন্ধিসন্ধি আপনার নখদর্পণে। নিশ্চয়ই বোঝেন যে, বাপ মসনদ থেকে হটে গেলে ওর অপগণ্ড ছেলেটাও সিধে হয়ে যাবে।...'

'খামোশ।'

চিঠিটা পড়ে শোনাচ্ছিলেন রাজবল্লভ। মিরনের চিৎকার শুনে থতমত খেয়ে থেমে গেলেন।

রাগে কাঁপছে মিরন। নবাবজাদার কুরসির পাশেই রুপোর দাঁড়ে বসে থাকা নবাবের প্রিয় বাজপাখিটা ডানা ঝাপটাতে লাগল। মনিবের গরম মেজাজের আঁচ পেয়ে সে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মনিবের মন বোঝে পাখি।

রাজবল্লভ জোড়হস্ত হয়ে বললেন, 'আমি আপনার ভালাই চাই হুজুর।'

'ইয়ে খত দেওয়ানজি লিখেছেন? সাবুত কাঁহা? দস্তখত কোথায়?'

'দেওয়ানজি চতুর আদমি। দস্তখত করেননি। লেকিন—'

'লেকিন?' শ্যেনদৃষ্টিতে রাজবল্লভের মুখপানে চেয়ে অস্থির গলায় প্রশ্ন করল মিরন।

'দেওয়ানজির উপরে কড়া নজর রেখেছিলাম আমি। তাঁর এক কাসিদ এই খত নিয়ে গোপনে পাটনার দিকে যাচ্ছিল। আমার তাঁবের কয়েকজন সেপাই তাকে ঘায়েল করে কাগজটা কেড়ে নেয়। আপনি নিজেই বুঝে দেখুন হুজুর এ চিঠি দেওয়ানজি ছাড়া আর কার লেখা হতে পারে?'

পিরানের জেবের ভিতরে চিঠিটা চালান করে দিয়ে হঠাৎ সজোরে হেসে উঠল মিরন। তারপর রাজবল্লভের দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'দেওয়ানজি ঘুঁটি সাজানোর কোশিশ করছেন। ফির ইনকিলাব চান। এমনই আন্দাজ ছিল আমার। এবারে সাবুত মিলল। বহুত আচ্ছা কাম করেছেন আপনি। ইনাম মিলবে।'

খুশিতে গদগদ হয়ে রাজবল্লভ বললেন, 'আপনার বহুত মেহেরবানি হুজুর।'

মিরন বলল, 'আমি আপনার মতো একজন চৌখশ ইনসানের তালাশ করছিলাম।'

ব্যগ্র গলায় রাজবল্লভ শুধোলেন, 'কাম কী আছে হুজুর?'

শ্বেতপাথরের চৌপাইয়ের উপরে রেকাবিতে রাখা রুপোর তবকে মোড়া একটা পান তুলে নিয়ে মুখে ফেলে মিরন বলে, 'দেওয়ানগিরি। নবাবজাদা মিরনের দেওয়ান।'

খুশিতে রাজবল্লভের চোখদুটো চকচক করে উঠল। যাক শেষপর্যন্ত একখানা জাল চিঠি নবাবজাদার হাতে তুলে দিয়ে কার্যসিদ্ধি হল। বড্ড ঝুঁকি নিয়েছিলেন তিনি। ধরা পড়লে নির্ঘাত গর্দান যেত। রায়দুর্লভের হাতের

লেখা নকল করে এ চিঠি মুসাবিদা করেছেন তিনি নিজেই। রাজবল্লভ কোনও নীতির ধার ধারেন না। তিনি কেবল তাগদ ফিরে পেতে চান। সে যে উপায়েই হোক।

মদের নেশায় ইদানীং দিনরাত বেসামাল হয়ে থাকেন নবাব মিরজাফর খাঁ। নিজামত চলছে মিরনের খায়েশে। কাজেই নবাবজাদার দেওয়ানের পদে বহাল হওয়া মানে প্রচুর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অর্জন। এমনটাই তো চেয়েছিলেন রাজবল্লভ। এসব ভেবে খুশিতে ভাসছিলেন তিনি। তাঁকে চুপ করে থাকতে দেখে মিরন শুধোল, 'এ কাম আপনার পসন্দ নয় বুঝি?'

'বলছেন কী হুজুর? এ তো আমার খুশনসিব। বান্দা আপনার জন্য জান কবুল করবে।'

এই বলে মাথা ঝুঁকিয়ে নবাবজাদাকে বারবার সেলাম জানাতে লাগলেন রাজবল্লভ।

৩১

সেদিন ছিল রাখিপূর্ণিমা।

এই দিনে ভাইয়ের মঙ্গলকামনায় বোন রাখি বাঁধে ভাইয়ের হাতে। মোহনলালের মনে পড়ছিল বহেন হিরার কথা। এই বোধ হয় প্রথম, এই বিশেষ দিনটিতে হিরার সঙ্গে তার দেখা হবে না।

হিরা নানারকম রঙিন ফুল দিয়ে রাখি তৈরি করত নিজে। দাদার হাতে রাখি বাঁধতে বাঁধতে বলত, 'এই যে বড়ে ভাইয়া আমি রাখি পরিয়ে দিলাম তোমার হাতে, সব লড়াইয়ে তুমি গালেব হবে। কোনও খতরা তোমাকে ছুতে পারবে না।'

মোহনলাল বলতেন, 'তাই যেন হয় বহেন। এই খুশকামনা জানিয়ে হর সাল এই দিনটিতে তুমি রাখি বেঁধে দিও আমার হাতে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলেন মোহনলাল। নসিব সব তছনছ করে দিয়েছে। হারিয়ে গিয়েছে হিরা।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চুপ করে আকাশের দিকে চেয়ে থাকেন মোহনলাল। ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে শম্বুক গতিতে এগিয়ে চলেছে গো-গাড়ি। বেশ কয়েকজন আম-আদমির সঙ্গে সেই গাড়িতেই জনৈক সওয়ারি মোহনলাল —নবাব সিরাজদ্দৌলার সুহৃদ, সুবে বাংলার ভূতপূর্ব দেওয়ান। চলেছেন ময়মনসিংহের জমিদারবাড়ির উদ্দেশে।

ভিক্ষুকের জালসাজিস নিয়েছেন মোহনলাল। কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি। হাতে বাঁশের লাঠি। পরনে ময়লা তাপ্পি মারা জোব্বা। মাথায় রুক্ষ চুল। মুখে ঘন দাড়ি প্রায় বুক পর্যন্ত নেমে এসেছে। এই বেশ দেখে কারও পক্ষেই আসল লোকটিকে চেনা সম্ভব নয়। মাস দেড়েকের উপর বনেজঙ্গলে পালিয়ে বেড়ানোর ধকল সইতে সইতে চেহারাটা অনেক ভেঙেছে। ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন মোহনলাল। তাঁর খোঁজে এখনও প্রতিনিয়ত গোটা সুবে বাংলা চষে বেড়াচ্ছে নিজামতের কাসিদরা।

খানাখন্দে ভরা অসমতল রাস্তা। বর্ষার মরশুমে এ পথে চলাচল খুবই কষ্টকর ব্যাপার। একে চরাই-উতরাইয়ে ভরা উঁচুনিচু পথ, তার উপরে নরম মাটিতে বসে যাচ্ছে গাড়ির চাকা। সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও আলিসান বলদ দুটো টেনে তুলতে পারছে না মাটিতে গেঁথে যাওয়া চাকা।

গাড়োয়ান পরেশান। থেকে থেকে গাড়ি থেকে অবতরণ করে সওয়ারিদেরই গাড়ির চাকা টেনে তোলার কাজে হাত লাগাতে হচ্ছে। এ কাজে হাত লাগাচ্ছেন মোহনলালও। এই মানুষটার অমানুষিক শক্তি ও কর্মক্ষমতা দেখে সহযাত্রীরা অনেকেই বিস্মিত।

জনৈক সহযাত্রী বললেন, 'মালুম হচ্ছে আপনি পালোয়ান আদমি।'

কোনও জবাব না দিয়ে মুচকি হাসলেন মোহনলাল।

তাঁর সঙ্গে এই দলটির আলাপ একটি চটিতে। ক্লান্ত মোহনলাল দু'দণ্ড বিশ্রামের জন্য থেমেছিলেন সেখানে। চটির আঙিনায় বসে কয়েকজন আম-আতরাফ মানুষ নাস্তা সারছিল। আহার্য বলতে সামান্য কয়েকমুঠো ভিজে নরম চিঁড়ে আর খানিকটা আখের গুড়।

এদের কথাবার্তা শুনে মোহনলাল শুধোলেন, 'আপনারা ময়মনসিংহের রাজবাড়ি যাচ্ছেন বুঝি?'

দলপতি বললেন, 'হ্যাঁ। ওখানে আজ মহাভোজ। জমিদার কৃষ্ণকিশোরের ভ্রাতা দত্তক নেবেন এক ব্রাহ্মণ সন্তানকে। এই খুশিতেই ভোজের আয়োজন। জমিদারমশায় ঢোল-শোহরৎ করে সব প্রজাকে দাওয়াত দিয়েছেন। আপনি শোনেননি?'

মৃদু হেসে মোহনলাল বলেন, 'শুনেছি।'

'আপনিও কি ওদিকেই যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। রাজবাড়ির ভোজ বলে কথা!'

'পায়ে হেঁটে যাবেন এতটা পথ?'

'উপায় কী? ভিক্ষুক মানুষ। গো-গাড়ির ভাড়া চোকানোর মুরোদ নেই।'

'বেশ তো চলুন না আমাদের সঙ্গে।'

'আপনাদের অসুবিধা হবে।'

'না না অসুবিধা হবে কেন? ঢের জায়গা আছে গাড়িতে।'

অগত্যা ওই মানুষগুলোর সঙ্গে গো-গাড়িতে চেপে বসলেন মোহনলাল। পলাশির যুদ্ধের পর মুর্শিদাবাদে ফিরে এসে শ্রীমন্তলালকে নিয়ে তিনি পালিয়ে যান। বাঁচার তাগিদে মোরাদবাগ প্যালেস ছেড়ে নিখোঁজ হয়ে যায় হিরাও। কোথায় সে আত্মগোপন করেছে, সুস্থ আছে কি না, ভালো আছে কি না, বেঁচে আছে কি না এসব কিছুই মোহনলালের জানা নেই।

বোনের কথা মনে পড়তেই সুবে বাংলার ভূতপূর্ব দেওয়ানজির চোখদুটো জ্বালা করে ওঠে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। আত্মগোপন করতে গিয়ে কত কষ্টই না সহ্য করতে হচ্ছে হিরাকে! মনকে শক্ত করেন মোহনলাল। ময়লা দছমালে চোখ মোছেন। আজ কিছুতেই তিনি চোখের জল ফেলবেন না। এতে শ্রীমন্তের যে অকল্যাণ হবে।

নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছে শ্রীমন্তলাল। নতুন পরিচয়ে আজ তার অভিষিক্ত হওয়ার দিন। রাজকীয় পরিবেশে সুখ, বিত্ত, বৈভবের মধ্যে বড় হয়ে উঠবে সে। যেমনটা হওয়ার ছিল, তাই হবে। এই দুঃসময়ে এই তো অনেক পাওয়া। পরমেশ্বরের অশেষ করুণা।

পলাশিতে পরাজয়ের পরেও বেশ কিছুদিন একটা স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন মোহনলাল। সিরাজ পলাতক। শুনেছিলেন পরাজিত নবাব পাটনার দিকে গিয়েছেন নায়েব রামনারায়ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। মোহনলাল ভেবেছিলেন, শ্রীমন্তলালকে কোনও নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে তিনিও পাটনায় গিয়ে যোগ দেবেন সিরাজের সঙ্গে। তার পরে ফের ফৌজ গড়ে তুলে হামলে পড়বেন মুর্শিদাবাদে। পুনরুদ্ধার করবেন সিরাজের মসনদ। ইংরেজদের বিতাড়িত করবেন বাংলা থেকে। কিন্তু সেই স্বপ্ন চুরমার হয়ে গিয়েছে। সিরাজের মৃত্যু সংবাদ শুনে ভেঙে পড়েছেন মোহনলাল। নির্মূল হয়ে গিয়েছে সব আশা। প্রত্যাঘাতের খোয়াব তিনি আর দেখেন না।

পরপর অনেকগুলো গো-গাড়ি পিছন পিছন আসছে। সবাই চলেছে জমিদারবাড়ির উদ্দেশে। গোটা পথটাই অর্থহীন দৃষ্টিতে পিছনে আগত শকটগুলির দিকে চেয়ে রইলেন মোহনলাল। গায়ে পড়ে খোশগল্প করতে চাইছিল সহযাত্রীদের দলপতি। আলাপ-আলোচনা যথাসম্ভব এড়িয়ে যাচ্ছেন মোহনলাল। ভালো লাগছে না কিছু। শ্রীমন্তলালকে দেখার জন্য তাঁর মনটা অস্থির হয়ে উঠেছে।

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরে রাজবাড়ির সমুখে এসে পৌঁছল গো-গাড়ি।

ভিড় ঠেলে রাজবাড়ির সদর দেউড়ির দিকে এগোতে লাগলেন মোহনলাল।

মাসখানেক আগে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে এই বাড়িতে তিনি এসেছিলেন শ্রীমন্তলালকে দত্তক গ্রহণের প্রস্তাব নিয়ে। জমিদার কৃষ্ণকিশোর সম্মতি জানিয়ে বলেছিলেন—তিনি নন, দত্তক নেবেন তার ভাই কৃষ্ণগোপাল। পরের দিনই কৃষ্ণগোপালকে সঙ্গে নিয়ে আমহাটি ছুটে গিয়েছিলেন কৃষ্ণকিশোর। অনিন্দ্যসুন্দরকান্তি শ্রীমন্তলালকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন দুই ভাই।

সেদিনই তারা রাজবাড়িতে নিয়ে আসেন শ্রীমন্তকে। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুসজল চোখে রাজমাতা বলেছিলেন, 'যশোদাদুলাল এল আমার ঘরে। গোবিন্দের অশেষ কৃপা।'

দত্তক গ্রহণের অনুষ্ঠানকে ঘিরে জমিদারবাড়ি সংলগ্ন মাঠে বিরাট ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে। ভিয়েন বসেছে। চারিদিকে ব্যস্ততা। লোকে লোকারণ্য। ম্যারাপের নীচে কাঙালি ভোজনের আয়োজন। আহারে বসেছে সারি সারি লোক। বাসন্তী পোলাওয়ের গন্ধে ম-ম করছে চারিদিক। পরিবেশনকারীরা পাতের উপর উপুড় করে দিয়ে যাচ্ছে লুচি-মন্ডা-মিঠাইয়ের ঝুড়ি। বিরাট দলবল নিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাঙালি ভোজনের তদারক করছেন নায়েবমশায়। কৃষ্ণকিশোরের কড়া নির্দেশ আজকের এই শুভ দিনে কেউ যেন অভুক্ত অবস্থায় এ বাড়ি থেকে ফিরে না যায়। বিশিষ্টজনদের আপ্যায়ন অবশ্য অন্দরমহলে।

নহবতখানা থেকে ভেসে আসছে খুশির সানাই। আম্রপল্লব, দেওদার পাতায় সেজে উঠেছে জমিদারবাড়ি। নাটমন্দির প্রাঙ্গণে হচ্ছে দত্তক গ্রহণের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। ঘিয়ে রঙের মসলিনের কুর্তা ও শাদা পায়জামায় বড় অপূর্ব মানিয়েছে শ্রীমন্তকে। চারিদিকে উপচে পড়ছে ভিড়। সেপাই-পেয়াদারা সেই ভিড় সামলাতে হিমসিম। আজ গৃহের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন কৃষ্ণকিশোর। আসুক, সকলে আসুক। দেখে যাক রায়চৌধুরী বংশের উত্তরাধিকারীকে। প্রজারা চাক্ষুষ করে যাক ভাবীকালের রাজাবাবুকে।

শ্রীমন্তলাল আসনপিঁড়ি হয়ে বসে আছে মৃগচর্মের আসনে। তার মুখোমুখি বসে আছেন কৃষ্ণগোপাল। একপাশে বসে আছেন কুলপুরোহিত, তাঁর মুখোমুখি বসেছেন কৃষ্ণকিশোর। কৃষ্ণগোপালের দুই পত্নী, কৃষ্ণকিশোরের দুই পত্নী ও রাজমাতা একতলার অন্দরমহলে বসে চিকের আড়াল থেকে প্রত্যক্ষ করছেন মাঙ্গলিক ক্রিয়াকর্ম।

যজ্ঞকুণ্ডের উপরে স্তূপীকৃত বেলকাঠের উপরে বড় এক কলসি ঘি উপুড় করে দিলেন কুলপুরোহিত। প্রজ্বলিত শলাকা ছোঁয়ালেন যজ্ঞকুণ্ডে। দাউদাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। উদাত্ত কণ্ঠে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন পুরোহিত।

অতিকষ্টে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে সামনে এক চিলতে বসার জায়গা পেয়েছেন মোহনলাল। প্রত্যক্ষ করছেন শ্রীমন্তলালের নবজন্ম। হোমের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে শ্রীমন্তের অতীত সত্তা। হারিয়ে যাচ্ছে পুরোনো পরিচয়। মুছে যাচ্ছে সিরাজ ও হিরার রক্তের দাবি। আলিবর্দির খানদানের সঙ্গে মোহলালের খানদানের রিস্তেদারির সাবুত। এ সব ভেবে মুচড়ে উঠছে মোহনলালের বুকের ভিতরটা। তবুও শান্তি, তবুও আনন্দ। অন্তর বিদীর্ণ হয়ে গেলেও খুশি ঝলকাচ্ছে মোহনলালের চোখেমুখে। আসল পরিচয় প্রকাশ পেলে নয়া জমানা এই বালককেও রেয়াত করত না। ফুলের মতো এই শিশুর কলিজাও ছিঁড়ে নিত দুশমনেরা। বালাই ষাট। অন্য পরিচয়েই না হয় বেঁচে থাক শ্রীমন্তলাল। সুখে থাক। ভালো থাক।

হিরার দেওয়া 'শ্রীমন্তলাল' নামটা মুছে গেল একেবারে। নাটমন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে জমিদার কৃষ্ণকিশোর রায়চৌধুরী ঘোষণা করলেন, আমি এই বালকের নতুন নামকরণ করলাম, যুগলকিশোর রায়চৌধুরী—আজ থেকে সে হল কৃষ্ণগোপাল রায়চৌধুরীর পিণ্ডাধিকারী ও উত্তরাধিকারী।

হর্ষধ্বনি করে উঠল সমবেত জনতা। 'জয়! রাজকুমার যুগলকিশোরের জয়!'

দোতলার অন্তঃপুরে চিকের আড়াল থেকে এই দৃশ্য দেখে শাড়ির আঁচলে আনন্দাশ্রু মুছলেন রাজমাতাসহ অন্যান্য অন্তঃপুরবাসিনীরা।

নিঃশব্দে কাঁদছেন মোহনলালও। এ কান্না খুশির। মনে মনে বলছেন, বহেন হিরা কোথায় তুমি? শুনতে পাচ্ছ না এই কলরব—জয়! রাজকুমার যুগলকিশোরের জয়! তোমার পুত্রই তো এই যুগলকিশোর। আশীর্বাদ করো তোমার পুত্রকে। কথা দিয়েছিলাম বহেন, একদিন তোমার পুত্রকে আমি বাংলার মসনদে বসাব। সে কথা রাখতে পারিনি আমি। তবে তোমার পুত্রকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে গেলাম। রাজকীয় মর্যাদায় তাকে প্রতিষ্ঠিত করে গেলাম। জানি না তোমার সঙ্গে আর কোনওদিনও আমার দেখা হবে কি না। যদি দেখা হয়, এই সুখের মুহূর্তের কথা বিস্তারিত বলব তোমাকে। রাজপুত্রের মতোই লালিত হবে তোমার সন্তান। তার কথা ভেবে আর চোখের জল ফেলো না যেন বহেন।

যুগলকিশোরের উদ্দেশে কুলপুরোহিত বললেন, 'এবারে প্রণাম করো তোমার পিতাকে।'

কৃষ্ণগোপালের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল যুগলকিশোর।

'দীর্ঘজীবী হও বাবা।' হাঁটু মুড়ে বসে পোষ্যপুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন কৃষ্ণগোপাল।

যুগলকিশোরকে একবার ছোঁয়ার জন্য প্রবল আবেগে সামনে এগিয়ে গেলেন মোহনলাল। চারিদিকে হইহই করে উঠল লোকজন। আরে? কী অনাসৃষ্টি কাণ্ড! এক ভিক্ষুক সবক ভুলে রাজকুমারের গায়ের উপরে প্রায় হামলে পড়েছে! তেড়ে এল লেঠেলরা। একটা লাঠি এসে পড়ল মোহনলালের পিঠে। যন্ত্রণায় কাতরে উঠলেন তিনি।

ধমকে উঠলেন কৃষ্ণকিশোর। 'থামো তোমরা।'

প্রখর ব্যক্তিত্বপূর্ণ গলার আওয়াজে নিমেষে স্তব্ধতা নেমে গোটা নাটমন্দির প্রাঙ্গণে।

লাঠির বাড়ি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন মোহনলাল। তাঁকে মাটি থেকে তুলে জোড়হস্ত হয়ে কৃষ্ণকিশোর বললেন, 'অপরাধ মার্জনা করবেন। এ গৃহে আপনি আজ অতিথি। তবুও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হল আপনাকে।'

মোহনলাল বললেন, 'ওদের কসুর কোথায়? কসুর তো আমারই।'

খটকা লাগল কৃষ্ণকিশোরের মনে। ভিক্ষুকের গলার আওয়াজ খুবই যেন পরিচিত।

কৃষ্ণকিশোর শুধোলেন, 'কে আপনি?'

'দরিদ্র এক প্রজা। আমার মতো মানুষের কি আর পৃথক পরিচয় থাকে বাবা? এই বালককে দেখে মনে হল, ঠিক যেন বাসুদেবনন্দন। স্বর্গের দেবশিশু যেন মাটিতে নেমে এসেছে। তাই ওকে একবার ছোঁয়ার জন্য সবক ভুলে এগিয়ে এসেছিলাম।'

কৃষ্ণকিশোর মৃদু হেসে বললেন, 'বেশ তো, আপনি ওকে আশীর্বাদ করুন।'

সামান্য ইতস্তত করে মোহনলাল বলেন, 'যদি কিছু মনে না করেন তো, রাজকুমারকে সামান্য নজরানা দিতে চাই আমি।'

'বেশ তো দিন। আপনার যা অভিপ্রায়।'

ঝুলির থেকে একটা মোহর বের করলেন মোহনলাল।

আশেপাশে দণ্ডায়মান অনেকে চমকে উঠল। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন কৃষ্ণকিশোরও। সামান্য এক ভিক্ষুকের ঝুলিতে মোহর?

অকুস্থলে দাঁড়িয়ে ছিল বাসুদেব। তাকে কথা দিয়েছিলেন মোহনলাল—দত্তক গ্রহণের অনুষ্ঠানের দিন যে ভাবেই হোক, তিনি হাজির হবেন ময়মনসিংহের জমিদার বাড়িতে। শ্রীমন্তলালকে আশীর্বাদ করে যাবেন। ভিক্ষুককে এভাবে সামনে এগিয়ে আসতে দেখে বাসুদেবের সন্দেহ হয়েছিল ইনিই মোহনলাল। সেই সন্দেহ পুরোপুরি দূর হল মোহর দেখে। বাসুদেবের মুখপানে চেয়ে মোহনলালও একঝলকের অর্থপূর্ণ চকিত দৃষ্টিতে বুঝিয়ে দিলেন তার আসল পরিচয়। তারপর দৃষ্টি ঘুরিয়ে আশেপাশের স্তম্ভিত মুখচোখগুলির দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'আমাকে ভুল বুঝবেন না আপনারা। আমি তস্কর নই। এককালে প্রচুর বিত্তের অধিকারী

ছিলাম। নসিবের ফেরে সব হারিয়েছি। সামান্য এই মোহরখানাই সঙ্গে আছে। ভিক্ষুকের কাছে মোহর বড় বিপজ্জনক বস্তু। প্রাণ সংশয় হতে পারে। তাই এটা রাজকুমারকে নজরানা দিয়ে ভারমুক্ত হতে চাই।'

কৃষ্ণকিশোর বললেন, 'বেশ। আপনার যখন ইচ্ছে—'

ডান হাতের তালুতে মোহর। হাতটা বাড়িয়ে দিলেন মোহনলাল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তার মুখপানে চেয়ে রইল যুগলকিশোর।

কৃষ্ণগোপাল বলেন, 'উনি দিচ্ছেন, নাও।'

হাত বাড়িয়ে মোহরটা নিল যুগলকিশোর।

'প্রণাম করো।' আদেশ করলেন কৃষ্ণকিশোর।

দ্রুত ঝুঁকে পড়ে পায়ে হাত দিয়ে মোহনলালকে প্রণাম করে যুগলকিশোর।

'দীর্ঘজীবী হও বাবা। সুখে থেকো চিরকাল।' মোহনলালের দুচোখ জলে ভরে ওঠে। অতিকষ্টে আবেগ দমন করে বললেন, 'বেশ—আমি এখন আসি।'

ব্যস্ত হয়ে কৃষ্ণকিশোর বলে উঠলেন, 'সে কী? আহার না করেই চলে যাবেন?'

বাসুদেব বলে উঠল, 'আপনি ব্যস্ত হবেন না রাজাবাবু। আমি ওঁর আহারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আসুন আমার সঙ্গে।'

জমিদারবাড়ির পিছনের দিকে আস্তাবল এলাকায় মোহনলালকে নিয়ে এল বাসুদেব। এ তল্লাট বেশ নির্জন। দূর থেকে ভেসে আসছে কোলাহল।

বাসুদেব বলে, 'আপনি ইশারা করার আগেই কিন্তু আপনাকে চিনতে পেরেছি আমি।'

'সে আমি বিলক্ষণ বুঝেছি।'

বাসুদেব গলা খাটো করে বলে, 'এখানে বেশিক্ষণ থাকা আপনার পক্ষে নিরাপদ নয়। নিজামতের একদল গুপ্তচর গত ক'দিন থেকে এ এলাকায় ঘোরাফেরা করছে। ও দলের পাণ্ডা রায়দুর্লভের ফৌজের এক রিসালদার- লগন সিং। আপনি চেনেন।'

আস্তাবলে ঢুকে একটা ঘোড়া বের করে নিয়ে এসে বাসুদেব বলে, 'জবরদস্ত তুর্কি ঘোড়া। এটা আমারই। আপনি দ্রুত চলে যান এখান থেকে। বিভিন্ন এলাকা থেকে অগণিত মানুষ আসছে রাজবাড়িতে। কসিদেরা ভিড়ে মিশে আছে।'

দ্রুত ঘোড়ায় চড়ে বসেন মোহনলাল।

একটা কাপড়ের পুঁটুলি এগিয়ে দিয়ে বাসুদেব বলে, 'রেখে দিন। খাবারদাবার।'

পুঁটুলিটা ঘোড়ার পিঠে বেঁধে নিলেন মোহনলাল। তারপর খিড়কি পথ দিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। আঁকাবাঁকা অসমতল পথ ধরে ছুটে চললেন। তিনি আজ অনেকটাই ভারমুক্ত, নিশ্চিন্ত। আপাতত তাঁর গন্তব্য বোকাইনগরের পোড়ো দুর্গ। শরীর বড় ক্লান্ত। কয়েকটা দিন বিশ্রাম প্রয়োজন।

হঠাৎই মোহনলালের কানে ভেসে এল অনেকগুলো ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। বেশ কিছুটা তফাতে ঘোড়া হাঁকিয়ে কারা যেন আসছে। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকালেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কান ঘেষে বেরিয়ে গেল একটা তির। সঠিক সময়ে মাথা নুইয়ে নিজেকে বাঁচালেন মোহনলাল। লক্ষ্যভ্রষ্ট তির গিয়ে বিদ্ধ হল একটা গাছের গায়ে। বিপদ বুঝে প্রাণপণে দু'পায়ের গোড়ালি দিয়ে লাথি কষালেন ঘোড়ার পেটে। দুরন্ত গতিতে বন্ধুর পথ ধরে ছুটে চলল মোহনলালের ঘোড়া।

পিছন থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসছে তির। সামনে ঝুঁকে পড়ে ঘোড়ার পিঠের সঙ্গে প্রায় মিশে গেলেন মোহনলাল। বিপদ বুঝল ঘোড়াও। ছোটার গতি আরও বাড়িয়ে দিল। তিরের নিশানা থেকে বাঁচতে ক্রমাগত ডাইনে-বায়ে ঘোড়াকে চালনা করছেন মোহনলাল। এঁকেবেঁকে চলেছে ঘোড়া। ছুটছে প্রাণপণে। নিজের সাধ্যকে যেন অতিক্রম করে যেতে চাইছে চারপেয়ে অবলা জীবটি।

এদিকে মোহনলালের পিছনে ধাবমান ঘোড়সওয়াররা এগিয়ে আসছে ঝড়ের গতিতে। ক্রমশ জোরালো হচ্ছে ঘোড়ার খুরের শব্দ। বোকাইনগরের পোড়ো দুর্গ সংলগ্ন জঙ্গল খুব দূরে নয়। মোহনলাল সমানে চাপড় মারতে লাগলেন ঘোড়ার গায়ে। দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে। একবার জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করতে পারলে আত্মরক্ষার কোনও একটা উপায় মিলবে। গহীন বনের অন্দরে কালচে সবুজের মধ্যে গা-ঢাকা দেওয়া সহজ হবে।

চলাচলের সুগম সড়ক ছেড়ে দ্রুত অরণ্যে প্রবেশের জন্য দুর্গম পাথুরে পথ ধরলেন মোহনলাল। খাড়াই বিপজ্জনক পথ। কিছুক্ষণের মধ্যেই মোহনলালকে নিয়ে জঙ্গলের প্রায় কিনারায় এসে পড়ল বাহাদুর তুর্কি ঘোড়া। আর সামান্য পথ।

'জোরে ছোট বেটা। আরও জোরে।'

উত্তেজিত মোহনলাল সমানে ঘোড়ার পেটে চাপড় মেরে চলেছেন। কিন্তু শেষরক্ষা হল না।

একটা তির এসে বিঁধল ঘোড়ার দাবনায়। চিঁ-হি-হি-হি! চি-হি-হি-হি! ঘোড়ার পরিত্রাহী চিৎকারে কেঁপে উঠল শান্ত, স্তব্ধ বনভূমি। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল তিরবিদ্ধ ঘোড়া।

মোহনলাল ছিটকে পড়লেন পাথুরে জমির উপরে। তীব্র আঘাত লেগেছে কোমরে, কপাল কেটে গিয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে, তবুও বাঁচার তাগিদে চকিতে উঠে দাঁড়ালেন মোহললাল। তখনই আরেকটা তীর এসে বিঁধল তাঁর ডান উরুর ঠিক উপরে।

'আঃ!' আর্তনাদ করে উঠে মোহনলাল। সংজ্ঞা হারালেন। ঘাসের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন

নিমেষের মধ্যে পাঁচজন ঘোড়সওয়ার এসে হাজির হল অকুস্থলে। রায়দুর্লভের কাসিদ বাহিনী। এদের দলপতি রাজপুত আহেদি লগন সিং। ঘোড়া থেকে সবাই লাফিয়ে নামল।

সামনে ঝুঁকে পড়ে মোহনলালকে দেখে লগন সিং বলল, 'জিন্দা হ্যায়। লেকিন বেহোশ। আমার আন্দাজ ইনিই মোহনলাল। মিশকিনের জালসাজিস নিয়েছেন।'

মাটিতে পড়ে থাকা মানুষটাকে ভালো করে নজর করতে থাকে লগন সিং। জোব্বার লম্বা হাতা সরিয়ে ডান হাতের বাজুতে বাঁধা কবচটা দেখে সে হেসে উঠে বলে, 'সহি আন্দাজ। এমন কবচের কথাই বলেছিলেন রায়দুর্লভজি। লেখা আছে শিবো শম্ভু। সেই সঙ্গে খোদাই করা আছে নিজামতের নিশান। আর কোনও সন্দেহ নেই। ইনিই মোহনলাল। জয় শিবো শম্ভু! আঃ...'

অস্ফূট আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল লগন সিং। নিমেষে নিথর হয়ে গেল তার দেহ। চোখ দুটো খোলা। যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বাঁশের কঞ্চির মাথায় লাগানো লোহার সূচলো ফলা বিদ্ধ হয়েছে বুকে।

শিউরে উঠল লগন সিং- এর সঙ্গী চার সেপাই। নির্ঘাত বিষ মাখানো তির। জঙ্গলবাসী জনজাতির লোকেরা এ ধরনের তির ব্যবহার করে। ত্রস্ত চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে আততায়ীর সন্ধান করতে লাগল সেপাইরা।

'আঃ!' লুটিয়ে পড়ল আরেকজন। আরেকটি বিষাক্ত তির এসে বিঁধেছে তার ঘাড়ে।

বাঁচার তাগিদে বাকি তিনজন ঘোড়াগুলো ফেলে রেখে টিলার ঢাল বেয়ে ঝোপজঙ্গল ভেদ করে চোখের নিমেষে গড়িয়ে গেল নীচের দিকে।

চিঁ-হি-হি-হি! চিঁ-হি-হি-হি! যন্ত্রণায় কাতর মোহনলালের ঘোড়াটা সমানে চিৎকার করে চলেছে। কাসিদদের ফেলে যাওয়া ঘোড়াগুলো এগিয়ে এসে ঘিরে ধরল জখম ঘোড়াটিকে। ব্যথায় কাতর তাদের

স্বজাতিরই তো একজন!

সহসা জঙ্গল ভেদ করে বেরিয়ে এল চার-পাঁচজন মেচ জনজাতির মানুষ। উদলা গা। নিম্নাঙ্গে জড়ানো শুধু গাছের বাকল। কাঁধে ধনুক। পিঠে আড়াআড়ি করে বাঁধা বাঁশের বাখারির তূণীর বোঝাই হয়ে আছে তিরে। প্রতিটি ফলার মাথায় মাখানো আছে ভয়ানক বিষ। এ বিষ রক্তে মিশলে চোখের নিমেষে মৃত্যু অবধারিত।

মোহনলালের কপাল, পা থেকে খুন ঝরছে। ক্ষতস্থানে ভেষজের প্রলেপ লাগিয়ে গাছের বাকল দিয়ে বেঁধে দিল একজন। দু'জন লেগে পড়ল ঘোড়ার পরিচর্যায়। দাবনা থেকে তিরটি টেনে বের করে, ক্ষতস্থান পট্টি বেঁধে দিয়ে ফের তারা দাঁড় করাল ঘোড়াটিকে। তারপর নিজেদের মাতৃভাষায় পরস্পরের মধ্যে কিছু আলোচনা সেরে নিয়ে সংজ্ঞাহীন মোহনলালকে কাঁধে তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল একজন। বাকিরা লাগাম ধরে ঘোড়াগুলিকে টেনে নিয়ে চলল তার পিছু পিছু।

ফোর্ট উইলিয়াম থেকে চিৎপুর রোড ধরে সুতানুটির দিকে চলেছে বিরাট এক শোভাযাত্রা। এ শোভাযাত্রার মধ্যমণি রবার্ট ক্লাইভ। বসে আছেন হাতির পিঠে গাদেলায়। নবাব বাদশাদের মতোই তাঁর মাথার উপরে রয়েছে ছাতা। ক্লাইভের পিছনে ঘোড়ার পিঠে চড়ে দুলকি চালে চলেছেন ওয়ালশ, ওয়াটস ও ফোর্ট উইলিয়ামের আরও কয়েকজন হোমরা-চোমরা সাহেব।

ক্লাইভের সামনে এবং ওয়ালশ ও ওয়াটসের পিছনে কোম্পানির নিশান উচিয়ে বন্দুক কাঁধে চলেছে সব মিলিয়ে জনা পঞ্চাশ গোরা পল্টন। একেবারে পিছনে রয়েছে ফৌজি ব্যান্ড। তারা রুল ব্রিটানিয়ার সুর বাজাতে বাজাতে চলেছে। না এ কোনও যুদ্ধযাত্রা নয় বা কোনও যুদ্ধে জয়লাভ নিমিত্ত বিজয়ীর আনন্দের সাড়ম্বর বহিঃপ্রকাশও নয়। আজ শারদ দুর্গোৎসবের মহাষ্টমী। সুতানুটিতে মুনশি নবকৃষ্ণের গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষায় ক্লাইভ চলেছেন সপারিষদে।

কয়েকদিন আগে আগে ফোর্ট উইলিয়ামে নিমন্ত্রণ করতে এসে নবকৃষ্ণ পুজোর যে সাড়ম্বর আয়োজনের কথা জানিয়ে গিয়েছিলেন, তা শুনে বেশ অবাক হয়েছিলেন ক্লাইভ। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে এত আয়োজন-আনজাম যে বাস্তবে সম্ভব তা ছিল তাঁর কল্পনারও অতীত।

চিৎপুর রোড দিয়ে যেতে যেতে ক্লাইভ দেখলেন, গোটা পথ জুড়ে মানুষের ঢল নেমেছে। কালীঘাট, কলকাতা, গোবিন্দপুরের দিশি পাড়া থেকে দলে দলে মানুষ চলেছে নব মুনশির পুজো দেখতে। ভিড়ে ঠাসা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলা শোভাযাত্রার পথ করে দিতে হিমসিম খাচ্ছে সেপাই-বরকন্দাজ-কোতোয়াল।

দেশি লোকেরাও তাজ্জব বনে গিয়েছে। দুর্গাপুজো কলকাতায় নতুন নয়। গোবিন্দপুরের অদূরে বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরীদের বাড়িতে বহুকাল যাবৎ এ পুজো হয়ে আসছে। সুতানুটির ধনকুবের লক্ষ্মী ধরের বাড়ির পুজোও বেশ পুরোনো। কিন্তু সেসব পুজোয় আমজনতার প্রবেশাধিকার ছিল না। তবে দূর থেকে দেখলেও, সাবর্ণ চৌধুরী বা নকু ধরের বাড়ির পুজোকে কেন্দ্র করে এমন ঘটার কথা কেউ শোনেনি।

বাইনাচ, আখড়াই গান, কবিগান, বিদ্যাসুন্দর যাত্রা, কেষ্ট যাত্রা, ভাঁড় নাচ, পুতুলনাচ, আতশবাজির রোশনাই আর ঢালাও খাওয়া-দাওয়ার আনজাম—নবকৃষ্ণ সত্যিই বিরাট শোরগোল ফেলে দিয়েছেন। বিত্তবান থেকে হতদরিদ্র মানুষ—নবকৃষ্ণের বাড়িতে নিমন্ত্রণ সকলেরই। রীতিমতো ঢোল-শোহরৎ করে জানানো হয়েছে সে কথা। নবকেষ্টর কেরামতি দেখে হাঁ হয়ে গিয়েছেন লক্ষ্মী ধর, গোবিন্দরাম মিত্তির, শোভারাম বসাক-সহ সুতানুটি-কলকাতার তাবড় তাবড় কেষ্ট-বিষ্টুরা।

এগিয়ে চলেছে শোভাযাত্রা। রবার্ট ক্লাইভকে একঝলক দেখার জন্য ঠেলাঠেলি পড়ে গিয়েছে লোকজনের মধ্যে। এ যেন রাজদর্শনের উল্লাস, থেকে থেকে ক্লাইভের কানে ভেসে আসছে মানুষের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর —'ওই যে ক্লাইভ! ক্লাইভ! রবার্ট ক্লাইভ। ওই যে হাতির পিঠে বসে আছেন।'

কেউ কেউ চেঁচিয়ে উঠছে তারস্বরে 'জয় কোম্পানির জয়! জয় ক্লাইভ বাহাদুরের জয়! জয় রাজা নবকৃষ্ণ দেবের জয়।'

নবকৃষ্ণ তৃপ্ত, তুষ্ট। এমনই তো তিনি চেয়েছিলেন—একদিন অঢেল বিত্তের অধিকারী হয়ে উঠবেন, সাধারণ মানুষের চোখে হয়ে উঠবেন কলকাতার অলিখিত রাজা।

বার্তাবাহক আগাম খবর নিয়ে এসেছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বেন ক্লাইভ। নবকৃষ্ণর চোখেমুখে ঝলকাচ্ছে খুশি। পায়ে খড়ম, কপালে চন্দনের প্রলেপ, পরনে উৎকৃষ্ট মসলিনের ধুতি। গলায় জড়ানো মিহি সুতোয় বোনা সুতীর উত্তরীয় দু'পাশ দিয়ে লোমশ বুকের উপর এসে পড়েছে। চাকর কান্ত ছাতা ধরে আছে মাথার উপরে। নাটমন্দির প্রাঙ্গণের দেউড়িতে দাঁড়িয়ে কর্নেল ক্লাইভের শুভাগমনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন নবকৃষ্ণ। তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পারিষদবর্গের মধ্যে রয়েছেন গোবিন্দরাম মিত্তির, শোভারাম বসাক, নীলমণি মিত্র, নয়নচাঁদ মল্লিক, শুকদেব মল্লিক প্রমুখ বিত্তবানেরাও। তাঁরা সকলেই যেন আজ নিষ্প্রভ নব মুনশির ব্যক্তিত্ব ও দাপটের কাছে।

আবদার করে কর্নেল ক্লাইভের কাছ থেকে পলাশির যুদ্ধে ব্যবহৃত একটি ফিল্ড পিস কামান চেয়ে নিয়েছেন নবকৃষ্ণ। নাটমন্দিরের সদর দেউড়ির পাশেই গাড়িসমেত তোপটি স্থাপন করা হয়েছে। যে কামান গর্জন করেছিল পলাশির আমবাগানে, সেই কামান দেগেই নবকৃষ্ণ আজ নিজ গৃহে স্বাগত জানাতে চান রবার্ট ক্লাইভকে।

ক্লাইভ লক্ষ করলেন, যত তিনি এগোচ্ছেন ভিড় তত বাড়ছে। হুগলি নদীর বুকে অজস্র নৌকো। সবগুলোই লোকে বোঝাই। নৌকোগুলোর অভিমুখ সুতানুটির ঘাটের দিকে। সেখানে থিকথিকে ভিড়। মেঠো পথ ধরে পিলপিল করে অজস্র মানুষ হেঁটে চলেছে নবকৃষ্ণর বাসগৃহের দিকে।

চিৎপুর রোড ছেড়ে বাঁ দিকে বাঁক নিয়েই চমকে গেলেন ক্লাইভ। বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে গেল চোখ। এ কাকে দেখছেন চোখের সামনে? মুখের অবয়ব যে অনেকটা তাঁরই মতো। পথের পাশে বিরাট এক মৃৎমূর্তি। ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন এক ইংরেজ সেনানী। বিজয় গর্বে মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত ছুড়ছেন শূন্যে। বাঁ-হাতে ধরা রয়েছে লাগাম। চেহারার মধ্যে রয়েছে দুরন্ত ঔদ্ধত্য। উদ্ধত ঘোড়ার ভঙ্গিমাও। কর্নেলকে দেখেননি কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পী। নবকৃষ্ণের মুখে ক্লাইভের চেহারার বর্ণনা শুনে মূর্তি গড়েছেন তিনি। কাউকে বলে বোঝানোর প্রয়োজন নেই যে এ মূর্তি ক্লাইভেরই। তিনি নিজেই চিনতে পারছেন নিজেকে। নবকৃষ্ণের এই ছেলেমানুষি খেয়ালে খুশি হয়ে হাতির পিঠে গাদেলায় বসে আপনমনেই হেসে উঠলেন ক্লাইভ।

দুম! সহসা গর্জন করে উঠল নাটমন্দিরের তোপ। মহাষ্টমীর সকালে চমকে উঠল গোটা সুতানুটি। ওই তো দেখা যাচ্ছে শোভাযাত্রা। এসে পড়েছেন ক্লাইভ। চারিদিকে একেবারে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। হাতি এসে থামল নাটমন্দিরের দেউড়িতে। হাতির পিঠ থেকে নেমে এলেন ক্লাইভ।

নবকৃষ্ণ এগিয়ে এসে জোড় হস্ত হয়ে তার সামনে প্রায় নুয়ে পড়ে বললেন, 'এ আমার পরম সৌভাগ্যি হুজুর। আপনার লেগ ডাস্ট পড়ল এই গোলামের গৃহে।'

ক্লাইভ হাসি মুখে বললেন, 'আমি বহুত খুশি হয়েছি নবকিসেন। স্প্লেনডিড অ্যারেঞ্জমেন্ট।'

জোড়হস্তে নবকৃষ্ণ বলেন, 'সবই আপনার ব্লেসিংস হুজুর।'

'আই হার্ড মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অলসো অ্যারেঞ্জড অ্যা গ্র্যান্ড কার্নিভ্যাল।'

গোবিন্দরাম মিত্তির পাশ থেকে গদগদ মুখে ফস করে বলে উঠলেন, 'ও তো শিবহীন যগ্যি। যে পুজোয় আপনি হাজির নেই সে পুজোয় যতই জাঁক হক না কেন, এ পুজোর কাছে তার সব জলুস ফিকে হতে বাধ্য। আমাদের নবকেষ্টর কাছে হেরে ভূত নদিয়ার কেষ্টচন্দ্র।'

এই বলে নিজের কথায় নিজেই হেসে উঠলেন গোবিন্দরাম। সে হাসিতে যোগ দিল না কেউ। কথাটা গোবিন্দরাম বলেছিলেন ক্লাইভকে খুশি করার জন্য কিন্তু সে কথায় কোনও প্রতিক্রিয়া জানালেন না ক্লাইভ।

রীতিমতো অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন গোবিন্দরাম। সুতানুটি-কলকাতার যে সব কেউকেটা লোকেরা ক্লাইভের সঙ্গে অন্তত একবার চাক্ষুষ দৃষ্টি বিনিময়ের জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন, তাঁদের ভালো করে নজর করে দেখলেনই না ক্লাইভ। নবকৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাঁটতে লাগলেন লাল গালিচার উপর দিয়ে।

অপ্রস্তুত গোবিন্দরাম মিত্তির, শোভারাম বসাক প্রমুখেরা এদিক ওদিক তাকিয়ে আগত সাহেবদের মধ্যে পরিচিত রজার ড্রেক ও হলওয়েলকে খোঁজার চেষ্টা করলেন। এই দুই সাহেব আসেননি। ক্লাইভের অনুরোধে তারা নদিয়ায় গিয়েছেন কৃষ্ণচন্দ্রের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

শোভারাম বসাক, গোবিন্দরাম মিত্র, নীলমণি মিত্র, নয়নচাঁদ মল্লিক, শুকদেব মল্লিক—এদের যে ক্লাইভ একেবারেই চেনেন না তা নয়, কতকটা ইচ্ছে করেই এদের উপেক্ষা করে ক্লাইভ বুঝিয়ে দিলেন, আগামী দিনে সুতানুটি-কলকাতা-গোবিন্দপুরের হিন্দুসমাজের প্রধান মুরুব্বি হিসেবে তিনি নবকৃষ্ণকেই দেখতে চান।

নাটমন্দির প্রাঙ্গণে দুর্গামূর্তির সামনে এসে দাঁড়ালেন কর্নেল। দুর্গার রূপ দেখে ক্লাইভ বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত। একচালা মূর্তি। ঘোড়ামুখো সিংহের পিঠে দাঁড়িয়ে দেবী দুর্গা অসুর নিধনে রত। দু'পাশে রয়েছে তাঁর ছেলেমেয়েরা গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী ও সরস্বতী। ফলতার এক মন্দিরে কালীমূর্তি দেখেছিলেন ক্লাইভ। সেই দেবীমূর্তি এমন জাঁকের নয়।

নবকৃষ্ণ বললেন, 'মা দুর্গার দশ হাত হুজুর। দশ হাতে দশটি অস্ত্র। ওই দেখুন এক হাতে একটা টিনের তৈরি নকলি রাইফেলও ধারণ করে আছেন। অনেকটা কোম্পানির ফ্লিন্টলক রাইফেলের মতো দেখতে। এ ভাবনা আমার।'

তারিফির দৃষ্টিতে নবকৃষ্ণর মুখপানে চেয়ে ক্লাইভ বললেন, 'ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া মুনশি।'

ঘোড়ামুখো সিংহ দেখে ক্লাইভ শুধোলেন, 'হোয়াই ইজ দ্য লায়ন হর্সফেসড?'

নবকৃষ্ণ বললেন, 'কারণ জানি না। আমরা বৈষ্ণব। বৈষ্ণববাড়ির এইরকম রীতি বলে শুনেছি।'

ক্লাইভ বললেন, 'তোমাদের রিলিজিয়ন ভেরি কমপ্লেক্স। কিছুই বুঝতে পারি না।'

নবকৃষ্ণ হেসে বলেন, 'হেস্টিংস সাহেবের আবার এসব বিষয়ে খুব আগ্রহ। ফারসি তো দিব্যি শিখেছেন। এখন সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করার কোশিশ করছেন।'

ক্লাইভ মনে মনে বললেন, 'ওয়ারেন ইজ টু ইনটেলিজেন্ট। এদেশের শাসক হয়ে উঠতে হলে সব কিছুই খুব ভালো করে জানা দরকার। পুরোপুরি শাসক হয়ে উঠতে এখনও অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে কোম্পানিকে। ততদিন পর্যন্ত আমি থাকব না এদেশে। ওয়ারেন থাকতে পারে। ভাবীকাল হয়তো সে দেখতে পাচ্ছে, তাই হয়তো আগে থেকেই সে সেরে রাখছে প্রস্তুতি ।

ক্লাইভকে অন্যমনস্ক দেখে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন নবকৃষ্ণ। তার আগেই ক্লাইভ বলে উঠলেন, 'আমি পুজো দিতে চাই। তোমার গডেস কি আমার পুজো নেবে?'

নবকৃষ্ণ ব্যস্ত হয়ে বলেন, 'কেন নেবে না হুজুর? আপনি বাম হস্তে একটি ফুল ছুড়ে দিলেও মা আশীর্বাদ করবেন আপনাকে। হুজুর আপনিই তো আমার গোবিন্দ। আপনার জন্যেই তো আজ এই সব কিছু। এত রওশন, এত খুশি, জগজ্জননী মায়ের অধিষ্ঠান আমার গৃহে।'

আবেগে জল এসে যায় নবকৃষ্ণর চোখে। উত্তরীয় দিয়ে চোখের জল মোছেন তিনি।

ক্লাইভের ইশারায় এগিয়ে আসেন বেশ কয়েকজন ব্রাহ্মণ। এরা ক্লাইভের সঙ্গেই এসেছেন। ঘাড়ে করে বয়ে এনেছেন ধামা ধামা ফলমূল।

নবকৃষ্ণ নিজেই ছুটে গিয়ে নিয়ে এলেন একধামা উৎকৃষ্ট চাল। ক্লাইভের সামনে ধামাটি ধরে বললেন, 'পুজো দেওয়ার সময় রুপোর টাকায় নজরানা দেওয়ার রেওয়াজ আছে হুজুর।'

কোটের জেবের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে একটা কাপড়ের খেরিয়া বের করলেন কর্নেল। সেটা উপুড় করে দিলেন ধামার উপরে। চালের উপরে ছড়িয়ে পড়ল একশো একটি রুপোর সিক্কা টাকা।

ধামাটি কপালে ঠেকিয়ে নবকৃষ্ণ বললেন, 'আমার দুর্গাপুজোর আয়োজন সার্থক।'

'মে গড ব্লেস ইউ।'

নাটমন্দিরে উঠে দেবী দুর্গার চরণে চালের ধামাটি নামিয়ে পুরোহিতের উদ্দেশে নবকৃষ্ণ বললেন, 'এবারে এই ডালাটিকে দেবীর চরণে নিবেদন করুন তর্কসিদ্ধান্তমশায়।'

দুর্গামূর্তির সামনে জোড়হস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ক্লাইভ।

স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে ঢাকিরা। জুলজুলে চোখে তারা দেখছে সাহেবের দেবীভজনা।

ঢাকিদের উদ্দেশে হেঁকে উঠলেন নবকৃষ্ণ, 'ওরে? থামলি কেন সব? বাজা বাজা বাজা।'

ডুম-ডুমাডুম-ডুম-ডুম-ডুম...! বেজে উঠল পঁচিশজোড়া জয়ঢাক।

চকিতে দুহাতে দুটো ধুনচি তুলে নিয়ে প্রবল আবেগে নাচতে লাগলেন নবকৃষ্ণ।

৩৩

দুর্গাপুজোর পর ক্লাইভ চন্দননগরে ফিরতেই মেদিনীপুরের ফৌজদার রাজারাম এসে লুটিয়ে পড়লেন তাঁর পায়ে।

'হুজুর আমি আপনার গোলাম। মুনশিজির কাছ থেকে সবই তো শুনেছেন। মুর্শিদাবাদে তলব করেছেন নবাব। ওখানে গেলেই আমার গর্দান যাবে। আমার জান বাঁচান হুজুর।'

ভয়ে বলির পাঠার মতো কাঁপতে থাকেন রাজারাম।

পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন নবকৃষ্ণ। তিনি বলেন, 'এত ভয়ের কী আছে ফৌজদারমশায়?'

'নবাবের তলবে আমার রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে হুজুর।'

ক্লাইভকে নিশ্চুপ দেখে রাজারাম বলেন, 'ফরাসিদের একটা দলকে আমি মাদ্রাজে পালিয়ে যেতে মদত দিয়েছি। ইয়ে ইলজাম সচ হ্যায়। আমি কবুল করছি। আমার কসুর মাফ করুন হুজুর।'

রাজারামের ত্রস্ত মুখচোখ দেখে হাসি পেয়ে গেল ক্লাইভের। সজোরে হেসেও উঠলেন।

এই হাসিতে বেজায় ঘাবড়ে গিয়ে নবকৃষ্ণর পানে করুণ ভাবে চাইলেন রাজারাম।

নবকৃষ্ণ বললেন, 'আপনি দেখছি আজব লোক। হুজুরকে এখনও চিনে উঠতে পারলেন না? তার চরণে এসে ঠাই নিয়েছেন। আর ভাবনা কী?'

রাজারামের পিঠে হাত রেখে ক্লাইভ বললেন, 'ডরো মাত। মুর্শিদাবাদে যেতে হবে না।'

তবুও ভয় রাজারামের চোখেমুখে। বললেন, 'সে না হয় গেলাম না। কিন্তু তাও কি স্বস্তি আছে হুজুর? আমার উপরে নজর রাখছে নবাবজাদার কাসিদরা। অচানক খুন হয়ে যেতে পারি।'

ক্লইভ একটু ভেবে বললেন, 'আপাতত তাহলে আমার ক্যাম্পেই থাকুন।'

এবারে হাসি ফুটল রাজারামের মুখে। 'হুজুরের অশেষ কৃপা।'

'বাট ইউ হ্যাভ টু পে অনার টু নবাবস অর্ডার।' বললেন ক্লাইভ।

নবকৃষ্ণ বুঝিয়ে দিলেন কথাটার অর্থ। ফের ত্রস্ত হয়ে পড়লেন রাজারাম।

'সেন্ড ইওর টু রিপ্রেসেন্টেটিভস টু মুর্শিদাবাদ।'

'এ একেবারে মোক্ষম দাওয়াই। সাপ মরল, ওদিকে লাঠিটি রইল অক্ষত।' বললেন নবকৃষ্ণ।

ক্লাইভ বললেন, 'নবাবকে একটা চিঠি লিখে দিন। তবিয়ত আচ্ছা নেই। সো আই অ্যাম আনেবল টু প্রেসেন্ট মাইসেলফ বিফোর ইউ। সেন্ডিং মাই রিপ্রেসেন্টেটিভস।'

মাথা নুইয়ে আবেগতাড়িত গলায় রাজারাম বলে উঠলেন, 'হুজুর, জিন্দেগিভর এই বান্দা আপনার গোলাম হয়ে থাকবে। আপনার রহেমে আমার জান বাঁচল।'

রাজারামের এক অনুচর বড় বড় দুটো পেটিকা এনে ক্লাইভের পায়ের কাছে রাখল।

ক্লাইভ শুধোলেন, 'হোয়াট ইজ ইট?'

'হুজুরের নজরানা।' এই বলে পেটিকাদুটির ডালা খুললেন রাজারাম।

দুটো পেটিকাই মোহরে ঠাসা। ক্লাইভের চোখ ঝলসে গেল। এইরকম দুটো পেটিকায় মোট কত মোহর থাকতে পারে ভেবে মনে মনে তিনি পুলকিত হয়ে উঠলেন। মনের উচ্ছ্বাস দমন করে গম্ভীর গলায় বললেন, 'ইউ কেম ফ্রম ফার অ্যাওয়ে। নাউ টেক রেস্ট।'

রাজারামের প্রতিনিধি হয়ে তাঁর ভাই নারান সিং ও ছেলে মথুর সিং গেল মুর্শিদাবাদে। হিরাঝিল প্যালেসের দরবারে মিরজাফরের সম্মুখে হাজির হয়ে নারান সিং বলল, 'বড়ে ভাইয়ার তবিয়ত আচ্ছা নেই। তাই দরবারে হাজির হতে পারলেন না। আমাদের পাঠিয়েছেন।'

মিরজাফর গর্জন করে উঠলেন, 'বেতমিজ কাঁহিকা। নবাব বেওকুফ নয়।'

নারান সিং মরিয়া হয়ে বোঝানোর কোশিশ করে, 'আপনার ফরমায়েশ মতো দেওয়ানখানার জাবেদা খাতা আমি নিয়ে এসেছি হুজুর।'

'খামোশ!'

নারান সিং ও মথুর সিং-কে কারাগারে কয়েদ করলেন মিরজাফর।

কয়েকদিন পরেই ক্লাইভের চিঠি পেলেন নবাব।

'...হুজুর আশা করি সহি সালামত, খুশ তবিয়ত আছেন। শুনলাম নারান সিং ও মথুর সিং-কে আপনি কয়েদ করেছেন। তারা যেন জিন্দা থাকে। ডিউরিং উইণ্টার আই উইল ভিসিট মুর্শিদাবাদ। অ্যাট দ্যাট টাইম আই উইল প্রেসেন্ট রাজারাম বিফোর ইউ। শুনলাম, ইউ স্যাকড রাজারাম। আমি মনে করি ইট ইজ অ্যা রঙ ডিসিশন। রাজারাম কাবিল-ই-ইনসান। আমি চাই উনিই মেদিনীপুরের ফৌজদারের পদে বহাল থাকুন। এতে আপনারই ভালো হবে বলে আমার ধারনা। অবশ্য আপনি সুবে বাংলার নবাব। যা ভালো বোঝেন, তাই করবেন।...'

থমকে গেলেন মিরজাফর। ভেবেছিলেন রাজারামকে সবক শেখাতে মথুর সিং ও নারান সিং-কে কোতল করবেন। ক্লাইভের ভয়ে সেই পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে হল।

ওদিকে অন্য এক সমস্যা। পুত্র মিরনের খায়েশে তার এক দোস্ত খোজা হাদীকে তিনি ইতিমধ্যেই মেদিনীপুরের ফৌজদারের পদে বহাল করে হুকুমনামা জারি করেছেন। হাদীর উপরে কড়া নির্দেশ ফৌজদারের দায়িত্ব নিয়েই রাজারামের সঞ্চিত ধনদৌলত লুঠে নিয়ে মুর্শিদাবাদে পাঠাতে হবে। কয়েদ করতে হবে তাকে। যদি রাজারাম পালানোর বা বাধা দেওয়ার কোশিশ করেন তো তাকে খতম করতে হবে। এই পরোয়ানা নিয়ে ইতিমধ্যেই মুর্শিদাবাদের পথে রওনা হয়ে গিয়েছেন হাদী। এখন উপায়?

চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লেন মিরজাফর। কী করবেন এখন? অবশেষে ক্লাইভের ইরাদাই মেনে নিলেন তিনি। মেদিনীপুরের ফৌজদারের পদে হাদীর নিযুক্তি বাতিল করে ফের একটা পরোয়ানা জারি করলেন নবাব। তা নিয়ে কাসিদ ছুটল মেদিনীপুরের পথে।

এই সংবাদ পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল মিরন। এ যে তার ঘোর বেইজ্জতি। সে কথা দিয়েছিল দোস্ত হাদীকে - মেদিনীপুরের ফৌজদারের পদ পাইয়ে দেবে। তড়িঘড়ি হাদীর নামে জারি হওয়া পরোয়ানা কেন বাতিল করলেন নবাব, তা বুঝে উঠতে পারছে না মিরন।

পুত্রের কাছে ক্লাইভের চিঠির কথা গোপন করে গিয়েছেন মিরজাফর খাঁ। এমনিতেই নিজামতের বিভিন্ন কাজে ইংরেজ রেসিডেন্টের খবরদারিতে মিরন ভয়ানক ক্ষুব্ধ। ক্লাইভের চিঠির কথা শুনলে হঠকারিতা করে সে হয়তো এমন কিছু করে বসবে যাতে কর্নেল সাহেবের বিরক্তি আরও বাড়বে। এই ভেবে হাদীর নামে পরোয়ানা বাতিলের আসল কারণটা পুত্রের কাছে চেপে গিয়েছেন নবাব। মিরন ভাবছে, এ নবাবের খুশখেয়াল।

রোজই একবার জাফরাগঞ্জ থেকে হিরাঝিল প্যালেসে গিয়ে নবাবকে সেলাম জানিয়ে আসে মিরন। রাগে, ক্ষোভে গত দুই দিন ধরে সে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়নি। পুত্রের মান ভাঙাতে জাফরাগঞ্জে ছুটলেন বিচলিত নবাব। মিরন যে তাঁর মস্ত বলভরসা।

পালকির অন্দরে গিরদায় ঠেস দিয়ে ঝিমোচ্ছিলেন নবাব। দুলুনিতে টলে টলে পড়ছিল মাথা। হঠাৎই মাথাটা গিয়ে ধাক্কা খেল কাঠের দেওয়ালে। উষ্ণীষ খসে গেল মাথা থেকে। ধড়ফড় করে সোজা হয়ে বসলেন। উষ্ণীষটা তুলে নিয়ে ফের মাথায় চাপালেন। মনের মধ্যে ফের চক্কর কাটতে লাগল একাধিক পরস্পর বিরোধী চিন্তা।

সত্যিই যদি বর্গিরা হানা দেয় তো কী হবে? আলিবর্দির জমানায় বর্গিদের যে রূপ তিনি দেখেছেন তা ভয়ংকর। হাদী নালায়েক। তার চেয়ে রাজারাম অনেক যোগ্য ব্যক্তি। মিরজাফর ভাবতে থাকেন, মেদিনীপুরের ফৌজদারের পদে তাকে পুনর্বহাল করে ভালোই হয়েছে। একদিক থেকে ক্লাইভ তাঁর উপকারই করেছেন। পরক্ষণেই আবার তাঁর মনের অন্দরে উঁকি দেয় আফশোশ। রাজারামের ধনদৌলত দখলের মনসুবা বানচাল হয়ে গেল। টাকা! অনেক টাকা চাই তার। না হলে নবাবি করে সুখ কোথায়? ভেবেছিলেন মসনদে বসে দুহাতে টাকা লুঠবেন। কিন্তু কোথায় টাকা? কোম্পানির দাবি মেটাতেই তোশাখানা শূন্য হয়ে যাচ্ছে। তেমন সুখ ভোগ হচ্ছে কোথায়? তিনি সুবে বাংলার নবাব। কেন তাঁকে তাকিয়ে থাকতে হবে ক্লাইভের মুখের দিকে? চলতে হবে তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে তাল মিলিয়ে? মিরজাফর একবার ভাবলেন এখন থেকে তিনি উপেক্ষা করবেন ইংরেজ কোম্পানিকে। তাতে যা হয় হবে। এ ভাবে অন্যের খায়েশের গোলাম হয়ে মসনদে বসে থাকা অর্থহীন। তখনই মনে পড়ে গেল অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার কথা। কানাঘুষোয় যা শোনা যাচ্ছে, তা যদি সত্যি হয়, সুজাউদ্দৌলা যদি হানা দেন বাংলায় তখন কে বাঁচাবে তার মসনদ? সেক্ষেত্রে কোম্পানির ফৌজই যে ভরসা।

নবাবের তাঞ্জাম এসে থামল জাফরাগঞ্জ প্যালেসের দেউড়িতে।

আব্বাহুজুর এসেছেন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সব মানঅভিমান ভুলে ছুটে এল মিরন। খোশ-আমদেদ করে নবাবকে সে নিয়ে গেল অন্দরে।

মিরন ও তার নতুন দেওয়ান রাজবল্লভের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন নবাব। শামাদানে পুড়ছে অভ্রের পাত। মাথার উপরে জ্বলছে ঝাড়বাতি। উজ্জ্বল হলদে আলোয় ঘর আলোকিত।

'বাগি হয়েছেন পূর্ণিয়ার দেওয়ান অচল সিং। খাজনা দিতে ইনকার করেছেন। শুনেছেন নিশ্চয়ই।' রাজবল্লভের উদ্দেশে কথাটা বললেন মিরজাফর খাঁ।

'জি হুজুর।'

'আপনি আকলমন্দ আদমি। এখন কী করা যায়, একটা মতলব বের করুন।'

'ফওরান পূর্ণিয়ায় ফৌজ না পাঠালে নবাবের ইজ্জত বলে কিছু আর থাকবে না হুজুর।'

মিরন বলে উঠল, 'সহি বাত। এই বেতমিজি বরদাস্ত করলে অন্যেরাও বাগি হবে।'

চিন্তিত গলায় মিরজাফর বললেন, 'লেকিন ফৌজ যে পাঠাব তার কড়ি কোথায়? সেপাইদের মাহিনা বাকি পড়ে আছে। বকেয়া না মেটালে তারা ফির লড়াইয়ে যেতে নারাজ। কোথায় টাকা?'

মিরনের চোখদুটো টকটকে লাল। সে নেশাগ্রস্ত। কৈফিয়ৎ চাওয়ার ঢঙে বলল, 'রাজারামকে গ্রেফতার করলেই তো পূর্ণিয়ায় ফৌজ পাঠানোর কড়ি হাতে চলে আসত। হাদীর নামে মেদিনীপুরের ফৌজদারির পরোয়ানা আপনি বাতিল করলেন কেন?'

উত্তরের প্রতীক্ষায় নবাবের মুখপানে চেয়ে রইলেন মিরন।

'গুসসা মাত করো বেটা। এক বাত তোমাকে বলিনি। ক্লাইভ সাহেব চান রাজারামই মেদিনীপুরের ফৌজদারের পদে বহাল থাকুন। তাই—'

চিৎকার করে ওঠে মিরন, 'সুবে বাংলার নবাব আপনি না ক্লাইভ সাহেব?'

পিতাপুত্রের এই কলহের মাঝে পড়ে রাজবল্লভ বিচলিত।

'শান্ত হও বেটা। ক্লাইভ সাহেবের গুসসার কারণ হতে চাই না আমি।'

রাগে কুরসি ছেড়ে ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পায়চারি করতে লাগল মিরন।

পরনের সদরিয়ার জেবে হাত ঢুকিয়ে একটা কাগজ বের করে হতাশ গলায় নবাব বললেন, 'এটা পড়ে দ্যাখো। কর্নেলের চিঠঠি।'

চিঠিটা মিরজাফরের হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে তাতে দ্রুত চোখ বোলায় মিরন।

'আগেও একটা চিঠঠি লিখেছিলেন কর্নেল। ইয়ে দুসরা খত। গতকাল পেয়েছি।'

ক্লাইভ লিখেছেন, '...রাজারামকে এবারে মুর্শিদাবাদে ডেকে পাঠিয়ে বিষয়টা আপোসে মিটিয়ে নিন। আপনাকে সুপরামর্শ দেওয়া আমার কর্তব্য বলে আমি মনে করি, তাই বলছি এ কথা। অবশ্য একটা বিষয় জেনে আমি খুশি হয়েছি যে ইতিমধ্যেই আপনি রাজারামকে মেদিনীপুরের ফৌজদারের পদে পুনর্বহাল করে হুকুমত জারি করেছেন। আপনি ও আমি, দুজনে গভীর রিস্তেদারির বাঁধনে বাধা পড়েছি। আমার একিন ছিল এই যে আমার ইরাদা আপনি মঞ্জুর করবেন। নারান সিং ও মথুর সিং যেন জিন্দা থাকে। কিছুদিন পরে আমি মুর্শিদাবাদে আসব। তখন এদের বিষয়ে ফয়সালা করা যাবে। সহি সালামত, খুশ তবিয়ত থাকবেন।...'

চিঠিটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে মিরন বলে উঠল, 'রাজারামের দৌলত দখল করতে চান ক্লাইভ। তাই এই নখরা। বেতমিজ, কর্নেল ক্লাইভ খন্নাস। ইবলিশের আওলাদ।'

শিউরে উঠে মিরজাফর বলেন, 'জবানে লাগাম লাগাও বেটা। দিবারেরও কান আছে।'

'তো? আমি বুজদিল আদমি নই। সব হারামি ইংরেজকে আমি সবক শিখিয়ে ছাড়ব। লাথ মেরে ভাগাব সুবে বাংলা থেকে। একদল কারবারি যা চাইবে, তাই মেনে নিতে হবে নবাবকে?'

মিরজাফর সোজা হয়ে বসে ব্যস্ত গলায় বলেন, 'শান্ত হও বেটা। ধেয়ান সে শোচো। আমার টাকা নেই। সেপাইদের বেতন বাকি পড়ে আছে। এই আওকাতে আগর বর্গিরা হানা দেয়, আগর সুজাউদ্দৌলার নজর পড়ে মুর্শিদাবাদের উপর তাহলে মসনদ বাঁচাবে কে?

মিরন কিছু বলতে গিয়ে থমকে যায়। ফের এসে বসে কুরসিতে। সুজাউদ্দৌলা ও বর্গির কথা উঠতেই চুপসে গিয়েছে সে। তার মনেও ভয় ধরেছে।

নবাব বলে চলেন, 'আমাকে যে ভরসা রাখতেই হবে কোম্পানির ফৌজের উপরে। ক্লাইভ সাহেবের সঙ্গে আমি কাজিয়া বাঁধাই কী করে? মসনদকে সালামত রাখার মতো বাহাদুর আদমি আর কে আছে?'

রাজবল্লভ বলে উঠলেন, 'পূর্ণিয়ায় ফৌজ পাঠানোর কী হবে হুজুর? অচল সিং-কে যে ফওরান সবক শেখানো জরুরি। নয়তো নবাবের ইজ্জত মাটিতে মিশে যাবে।'

'সেপাইদের চাবকে লড়াই করতে পাঠাব আমি।' ফের ফোঁস করে উঠল মিরন।

রাজবল্লভ বললেন, 'গোস্তাকি মাফ করবেন হুজুর। জবরানে সেপাইদের জঙ্গবাজির ময়দানে টেনে নিয়ে যেতে পারেন আপনি, কিন্তু তাদের নিয়ে কাম হাসিল করতে পারবেন কি? টাকার টোপ দিয়ে দলে টেনে নিতে পারে অচল সিং।'

মিরজাফর বলে উঠলেন, 'সহি বাত।'

নবাবের সঙ্গে রায়দুর্লভের সম্পর্কে চিড় ধরেছে। দেওয়ানকে হত্যা করার ছুতো খুঁজে বেড়াচ্ছেন মিরন। একদা রায়দুর্লভের ঘনিষ্ঠ ছিলেন রাজবল্লভ। নিজের উন্নতির কথা ভেবে রায়দুর্লভকে ছেড়ে সম্প্রতি তিনি আঁকড়ে ধরেছেন নবাবজাদাকে। তাই নবাবজাদার প্রতি নিজের আনুগত্য বোঝাতে, নিজেকে বেশি করে রায়দুর্লভবিরোধী বলে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে রাজবল্লভ বলে উঠলেন, 'সেপাইদের মাহিনা দেওয়ার দায় দেওয়ানজির। তিনি সেই দায় পালন করছেন না কেন? সেপাইদের মাহিনার টাকা দেওয়ানখানায় নেই বলে আমি বিশ্বাস করি না।'

মিরন উত্তেজিত হয়ে বলল, 'সহি বাত বলছেন আপনি।'

'গোস্তাকি মাফ করবেন হুজুর। দেওয়ানকে টিট করতে কেন কদম ওঠাচ্ছেন না?' মিরজাফর খাঁর উদ্দেশে গুজারেশ করলেন ধূর্ত রাজবল্লভ। দেওয়ানের সঙ্গে নবাবের সম্পর্কটাকে আরও বিষিয়ে দিতে চান তিনি।

ভাঙের মৌতাতে ঝিমোচ্ছেন নবাব। রাজবল্লভের প্রশ্নের কোনও জবাব দিলেন না।

মিরনের চোখে নিমেষে যেন ভয়ংকর হিংসার আগুন জ্বলে উঠল। 'বুড্ঢা দেওয়ান! সব শারারতি, সাজিশির মুরুব্বি। মদত দিচ্ছে রামনারায়ণকে। উও খরিশের বাচ্চা নির্ঘাত উসকেছে অচল সিং-কে। ওই বুড্ঢাকে কোতল করব আমি। দোজখে পাঠাব হারামির আওলাদকে। রায়দুর্লভজির কোঠি লুঠ করে ফৌজ পাঠাব পূর্ণিয়ায়।'

মিরনের জবান শুনে ভাঙের মৌতাত ছুটে গেল নবাবের। শিউরে উঠলেন তিনি।

৩৪

চিড় ধরেছে নবাব ও দেওয়ানের সম্পর্কে। নবাব মিরজাফর খাঁর বিরুদ্ধে ঘুঁটি সাজাচ্ছেন দেওয়ান রায়দুর্লভ—এই নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই কানাকানি-ফিসফাস চলছে দরবারের অলিন্দে। সেই খবর উড়তে উড়তে চকবাজারের অলিগলিতেও ছড়িয়ে পড়েছে।

পলাশির ইনকিলাব যারা মেনে নিতে পারেননি, তারা এখন আড়ালে মুখ টিপে হাসছেন। চকবাজারে গুলতানি চলছে, 'দ্যাখো কাণ্ড! সিরাজকে মসনদ থেকে হটানোর জন্য যারা জিগরি দোস্ত বনেছিলেন, কয়েকমাস যেতে না যেতেই পেয়ার-মহব্বত ভুলে দুই হুজুরে কাজিয়া বাঁধিয়েছেন।'

'সে তো হবেই। পলাশির সাজিশিতে লাভ হয়েছে নবাবের। রায়দুর্লভ যে কিছুই পেলেন না।'

এ সবই এতদিন ছিল হাওয়ায় ওড়া খবরের ভিত্তিতে গরমাগরম গুলতানি। সাবুত কিছু ছিল না। এবারে সব কিছু প্রকাশ্যে এল। সাতসকালে ঘুম থেকে উঠে চোখ কচলে তাজ্জব বনে গেল সকলে। ফৌজিদের কাড়ানাকাড়ার শব্দে, ঘোড়ার খুরের আওয়াজে ফের কেঁপে উঠল মুর্শিদাবাদ। হাতিয়ার হাতে নবাবের সেপাই-পেয়াদারা এত ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে চলেছে কোথায়? বর্গিরা ফের এসে পড়ল নাকি? মুসিবতের আন্দেশায় হুড়ুম-দুড়ুম করে দোকানের ঝাঁপ ফেলল চকবাজারের সওদাগরেরা। ঘরের দরজায় আগল দিল সাধারণ মানুষ। তবে তাদের ভুল ভাঙল অচিরেই। এ তো বর্গিদের মোকাবিলার জন্য বিরাট বড়সড় আনজাম নয়। হাতি-ঘোড়া-কামানসহ মাত্র শ'পাচেক সেপাই-আহেদি নিয়ে দেওয়ান রায়দুর্লভের প্যালেসের অভিমুখে চলেছে মিরন। সঙ্গে তার দেওয়ান রাজবল্লভ। এমন অভিযান অভূতপূর্ব। নবাবে-দেওয়ানে প্রকাশ্য সংঘাত কখনও দেখেনি মুর্শিদাবাদ।

প্যালেসের অতি উচ্চ এক বুরুজে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখে রায়দুর্লভ নিজেও চমকে উঠলেন। ফৌজ নিয়ে তাঁর হাভেলির দিকে ধেয়ে আসছে মিরন। তার সঙ্গে ঘোড়সওয়ার, পদাতিক, বন্দুকচি, ধানুকি, হাতি, কামান

সবই আছে। রায়দুর্লভ চোখে অন্ধকার দেখলেন। হাতে সময় খুব অল্প। এই সময়ের মধ্যে এই হামলা রোখার জন্য নিজের রিসালাকে প্রস্তুত করে তোলা যাবে না।

ভয়ে কাঁপতে লাগলেন রায়দুর্লভ। গোটা প্যালেস জুড়ে হুলুস্থুল পড়ে গেল। ক্রন্দনরোল উঠল জেনানামহলে। তড়িঘড়ি প্যালেসের সমস্ত জানালা দরওয়াজা বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন দেওয়ানজি। সদর দরজায় মোতায়েন করলেন সশস্ত্র রক্ষীদের। সেই সঙ্গে খিড়কি দরজা দিয়ে অতি গোপনে দূত পাঠালেন কাশিমবাজারের ইংরেজ ছাউনিতে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেওয়ানের প্যালেস ঘিরে ফেলল মিরনের বাহিনী। প্যালেসের রক্ষীরা মিরনের বাহিনীর তুলনায় সংখ্যায় নিতান্তই কম। নিমেষেই আত্মসমর্পণ করে বন্দি হল তারা। প্যালেসের অন্দরে বসে মিরনের বাহিনীর সেপাইদের আপসানি ও অস্ত্রের ঝনঝনানি শুনে ইষ্টনাম জপ করতে লাগলেন রায়দুর্লভ।

বেলা হয়ে গিয়েছে অনেকটাই। ঘুম ভাঙল মিরজাফরের।

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন মণি বেগম। জবাবদিহি চাওয়ার ঢঙে বেগম সাহেবা প্রশ্ন করলেন, 'আপনার জমানায় এসব কী হচ্ছে সরতাজ?'

মণি বেগমের মেজাজের আঁচে চমকে গিয়ে দ্রুত বিস্তরখানা থেকে নেমে এলেন নবাব। ত্রস্ত গলায় শুধোলেন, 'কী হয়েছে বেগম?'

'নবাবজাদা ফৌজ নিয়ে ঘেরাও করেছে দেওয়ানসাহেবের হাভেলি।'

'কী বলছ?' হতচকিত হয়ে গেলেন নবাব।

রায়দুর্লভের সঙ্গে সম্পর্ক যতই খারাপ হোক না কেন, এমনটা মোটেই চাননি মিরজাফর খাঁ। প্রকাশ্যে নবাবের সঙ্গে দেওয়ানের কাজিয়া ক্লাইভের বিরক্তি উদ্রেক করবে ভেবে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন নবাব। এই ঘটনা তো ইংরেজদেরই একপ্রকার বেইজ্জতি। সিরাজকে হঠাতে মিরজাফর-রায়দুর্লভের সঙ্গে তারা হাত মিলিয়েছিল। নয়া জমানায় সুশাসন মিলবে। নবাব ও দেওয়ান এক জবরদস্ত জোড়ি। দরবারে দাঁড়িয়ে ওয়াদা করেছিলেন ক্লাইভ। সত্যিই যদি রায়দুর্লভকে কোতল করে বসে মিরন, তারপরে কী হবে তা ভাবতে গিয়ে ঘেমে উঠলেন নবাব। এমন কোনও কদম যেন না ওঠায়, এ জন্য সেদিন বারবার তিনি নিষেধ করেছিলেন মিরনকে। কিন্তু সে অবাধ্য। নিজের খুশখেয়ালে চলে। শোনে না কোনও কথা। কী করবেন নবাব?

মণি বেগম ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'এখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি?'

'আমি কী করব মণি?'

বিস্মিত গলায় মণি বেগম বলেন, 'আজিব বাত। আপনি তো নবাব। কেউ গলত কাজ করলে তাকে শাসন করতে পারবেন না? বাধা দিতে পারবেন না?'

'মিরন মানবে না আমার হুকুমত।' ভয়ানক এক অসহায়তা ফুটে ওঠে মিরজাফরের গলায়।

'বাঃ চমৎকার! দেওয়ানজি খুন হলে আপনি যে মুসিবতের মধ্যে পড়বেন। কর্নেল ক্লাইভ আপনার উপরে খুনের ইলজাম আনবেন। বুঝতে পারছেন না আপনি? এখনই বেরিয়ে পড়ুন ফৌজ নিয়ে। থামান মিরনকে।'

স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন নবাব। ডুবছেন হতাশায়, অবসাদে।

'তবে শরাবের নেশায় বুঁদ হয়ে বসে থাকুন আপনি। আমিই ফৌজ নিয়ে যাচ্ছি।'

'মণি শোনো। শুনে যাও।'

আর দাঁড়ালেন না মণি বেগম। দ্রুত বেরিয়ে গেলেন কক্ষ থেকে।

রায়দুর্লভের প্যালেসের সদর দরজায় সমানে ঘন ঘন করাঘাত করে চলেছে সেপাইরা।

প্যালেসের অন্দরমহল অদ্ভুতরকম নিশ্চুপ। ভিতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ নেই।

প্রতিরোধের কোনও আনজাম-আয়োজনও নেই।

যাই হোক না কেন, রায়দুর্লভ সুবে বাংলার দেওয়ান, তার প্যালেসের সদর দেউড়ি ভেঙে ফেলে অন্দরে প্রবেশ করতে ইতস্তত করছে সেনারা। কাজটা ভয়ানক। সেটা বুঝছে সবাই। এ নিয়ে নবাবের তো কোনও পরোয়ানা নেই। শুধুমাত্র হঠকারী নবাবজাদার মৌখিক নির্দেশে এমন চূড়ান্ত পদক্ষেপ কি নেওয়া যায়? দেওয়ানের হাভেলিতে হামলা কোঁড়ার জন্য মিরনকে উত্তেজিত করেছিলেন রাজবল্লভ। এখন তিনিও ফ্যাসাদে পড়েছেন।

এদিকে ক্রমশ ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে মিরনের। সে ভেবেছিল, তার আগমন সংবাদ শুনেই ছুটে আসবেন রায়দুর্লভ। জোড়হস্ত হয়ে প্রাণভিক্ষা চাইবেন। এসব তো ঘটলই না, উলটে দেউড়িতে নবাবজাদার উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে দরজায় খিল তুলে বসে আছেন দেওয়ান।

অস্থির হয়ে পড়ে মিরন হুকুম করল, ‘দরওয়াজা তোড়ো। তোপ দাগো দরওয়াজার উপরে।’

এই হুকুম শুনে শিউরে উঠলেন রাজবল্লভ। আর যাই হোক, তিনি বেওকুফ নন। ভেবেছিলেন, সৈন্যসামন্ত নিয়ে গিয়ে তম্বি-তারাজ মারফত দেওয়ানের কাছ থেকে কিছু নগদ টাকা আদায় করে ফিরে আসবেন নবাবজাদা। কিন্তু ঘটনা যে দিকে গড়াচ্ছে, তার চূড়ান্ত পরিণতি ভয়ানক হতে পারে। কাশিমবাজার থেকে গোরাপল্টনেরা যদি ছুটে আসে তখন কী হবে?

রাজবল্লভ বললেন ‘এখনই তোপ দাগার মতো কড়া কদম ওঠানো সহি হবে না হুজুর। বাইরে এসে আপনার সঙ্গে মোলাকাত করার জন্য দেওয়ান সাহেবকে চিঠি পাঠান। আমার ধারণা উনি আপনার হুকুমতের ইজ্জত রাখবেন।’

ক্ষণিক ভেবে এই পরামর্শ মেনে নিল মিরন।

আপাতত হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন রাজবল্লভ।

দুরন্ত গতিতে ঘোড়া হাঁকিয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে ছুটে চলেছেন স্ক্র্যাফটন ও হেস্টিংস। সঙ্গে শতখানেক গোরা পল্টন।

হেস্টিংসের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ। চিন্তা অবশ্য মুর্শিদাবাদের হাল-হকিকত নিয়ে নয়। পারিবারিক একটি বিষয় নিয়ে তিনি খুবই উৎকণ্ঠায় রয়েছেন।

ফলতার উদ্বাস্তু শিবিরে ক্যাপটেন জন বুকাননের বিধবা পত্নী মেরি বুকাননের সঙ্গে ভালোবাসার বন্ধনে বাঁধা পড়েছিলেন কোম্পানির সুদর্শন ছোকরা কেরানি ওয়ারেন হেস্টিংস। ভালোবাসা থেকে বিয়ে। কলকাতা পুনরুদ্ধারের পর কেল্লার পাশেই ওয়াটস সাহেবের বাংলোতে ঘটা করে রিসেপশন হয়েছিল। পলাশির যুদ্ধের পর থেকে হেস্টিংস দম্পতি কাশিমবাজারের বাসিন্দা।

কাশিমবাজার কুঠির চৌহদ্দির ভিতরেই চমৎকার এক বাংলোতে নবদম্পতির নতুন সংসার। মেরির পছন্দ ছিল বাগানওয়ালা ছিমছাম একটা বাংলো। ঠিক অমনই একটা বাংলো বরাদ্দ হয়েছে মিস্টার ও মিসেস হেস্টিংসের জন্য। একসময় এই বাংলোতে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন উইলিয়াম ওয়াটস। কতকটা নিজের হাতে, কতকটা আবদার, দাখিলাদের নির্দেশ দিয়ে বাংলোটাকে একেবারে মনের মতো করে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েছেন মেরি।

পত্নীর বর্তমান শারীরিক অবস্থা নিয়েই হেস্টিংসের ঘোর দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা। মেরি সন্তানসম্ভবা। প্রসবকাল আসন্ন। গত কয়েকদিন যাবৎ নিজেকে গৃহবন্দি করে হেস্টিংস বাংলোতেই মেরির সঙ্গে দিন কাটাচ্ছিলেন।

আজও বেরোনোর ইচ্ছে ছিল না মোটেই। নসিবের ফের। সাতসকালে স্ক্র্যাফটন সাহেবের খাস আর্দালি একটা চিরকুট নিয়ে হাজির হল। চিরকুটে চোখ বুলিয়ে চমকে উঠলেন হেস্টিংস।

স্ক্র্যাফটন লিখেছেন, '...উই হ্যাভ টু মুভ টুয়ার্ডস মুর্শিদাবাদ ইমিডিয়েটলি। উইথ অ্যা বিগ কনটিনজেন্ট। সিচুয়েশন ইজ গ্রেভ। নবাবজাদা অ্যাটাকড দেওয়ানস হাভেলি।...'

অগত্যা বাংলো ছেড়ে বেরোতেই হল হেস্টিংসকে।

ঝড়ের গতিতে ছুটে চলেছে একপাল শাদা ওয়েলার ঘোড়া।

স্ক্র্যাফটন খুবই বিচলিত। এই গোলমালের খবর ক্লাইভের কানে গেলে খুবই বিরক্ত হবেন তিনি। মুর্শিদাবাদ ছেড়ে যাওয়ার আগে বারবার তিনি মিরনের মতিগতি নিয়ে সতর্ক করে গিয়েছিলেন তাঁকে। কিন্তু আহাম্মক ছোকরা যে এমন একটা কান্ড করে বসবে তা কল্পনাই করতে পারেননি স্ক্র্যাফটন। মুর্শিদাবাদ থেকে আসা দূতের মুখ থেকে খবরটা শুনে তিনি চমকে উঠেছিলেন। তারপর এক মুহূর্তও দেরি না করে ফৌজ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন।

ইদানীং রায়দুর্লভের সঙ্গে স্ক্র্যাফটনের অত্যন্ত মধুর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। মুর্শিদাবাদের অদূরেই বিরাট এলাকার জমি স্ক্র্যাফটনকে উপহার দিয়েছেন সুবে বাংলার দেওয়ান। আয়তনে সে এলাকা প্রায় ছোটখাটো একটা তালুকদারির সমান। নবাব এ বিষয়ে কিছুই জানেন না। সেই জমি বেনামে নথিভুক্ত করে স্থানীয় জমিদারদের কাছে বিক্রি করে রাতারাতি প্রচুর টাকা উপায় করেছেন স্ক্র্যাফটন। এমন উপকারী বন্ধুকে বাঁচানোর জন্য মরিয়া হয়ে ছুটে চলেছেন রেসিডেন্ট সাহেব।

চিঠির উত্তর এল না প্যালেসের অন্দর থেকে। ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে দেওয়ান রাজবল্লভকে ফের ডেকে পাঠালেন মিরন। নবাবজাদার আগুনে মেজাজের আঁচ পেয়ে রাজবল্লভ ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। সামনে এসে কুর্নিশ জানিয়ে বললেন, 'ফরমাইয়ে হুজুর।'

মিরন চিৎকার করে উঠল, 'তোপ দাগুন। দরওয়াজা ভাঙুন। বুডঢা খরিশের ইতনা হিম্মত যে আমার হুকুমত ইনকার করে?'

সন্ত্রস্ত হয়ে রাজবল্লভ বললেন, 'আর কয়েক পল ইন্তেজার করি হুজুর।'

'নেহি।' মিরনের চিৎকারে কেঁপে উঠলেন রাজবল্লভ।

মিরন গর্জন করে বলল, 'তোপ দাগুন। জলদি।'

হঠাৎ দূর থেকে ভেসে আসল কাড়ানাকাড়ার শব্দ।

চমকে ঘুরে তাকালেন মিরন ও রাজবল্লভ দু'জনেই। দূরে দেখা যাচ্ছে ধুলোর ঝড়।

রায়দুর্লভের প্যালেসের পাশ দিয়ে গঙ্গার ধার বরাবর চলে গিয়েছে লম্বা একটা পথ। সেই পথ ধরে এগিয়ে আসছে বিরাট এক কাফেলা। নবাব মিরজাফর খাঁ রয়েছেন এই কাফেলার কেন্দ্রে। গাদেলার উপরে রুপোলি চাঁদোয়ার আচ্ছাদন সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছে।

উত্তুরে হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে নিজামতের নিশান।

৩৫

ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছলেন নবাব। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে দ্রুত হাতির পিঠ থেকে নেমে এল মিরন। নবাবও ব্যস্তসমস্ত হয়ে গাদেলা থেকে নেমে এলেন নীচে। ত্রস্ত গলায় শুধোলেন, 'ইয়ে কেয়া হো রাহা

হ্যায়? লড়াইয়ের এই আনজাম কেন বেটা?'

মেজাজ হারিয়ে চিৎকার করে উঠে মিরন বলল, 'বুড্ঢা দেওয়ানকে আজ কোতল করব।'

মিরজাফর শিউরে উঠে বললেন, 'জবানে লাগাম লাগাও বেটা। অ্যায়সা মাত শোচো।'

মিরন ফুঁসে উঠে বলল, 'আমি সাদেক আলি। ডরপোক, বুজদিল নই। এই বুড্ঢা শয়তান মদত দিচ্ছে, পূর্ণিয়ার বাগি অচল সিংকে। মদত দিচ্ছে বুড্ঢা খরিশ রামনারায়ণজিকে। সাজিশির কারবার চালাচ্ছে ইংরেজদের সঙ্গেও। দেওয়ানজি আপনার হুকুমত ছাড়াই রেসিডেন্ট সাহেবকে সওগাত দিয়েছেন কাশিমবাজারের নজদিকে গোটা একটা তালুকদারি। পতা হ্যায় আপকো?'

মিরজাফর বিস্মিত হলেন। 'বলছ কী?'

'আপনি সিদাসাধা লোক, তাই বরদাস্ত করে চলেছেন দেওয়ানের বেয়াদপি। পহেলে দেওয়ানের কোঠি লুঠ করব। তারপর বুড্ঢা শয়তানকে কোতল করে ঘর ওয়াপস যাব।'

'শান্ত হও বেটা, শান্ত হও।'

ফের তড়পে ওঠে মিরন, 'বেতমিজ দেওয়ানজির তাকাব্বুরি দেখুন আব্বাহুজুর, দেউড়িতে খাড়া নবাবজাদা সাদেক আলি, ফির দরওয়াজা বন্ধ রেখেছেন? আমি চিঠি ভেজলাম অন্দরে, এত্তেলা দিলাম, তবু নবাবজাদার খোশ-আমদেদের কোনও আনজাম করলেন না?'

'দিমাগ ঠান্ডা রাখ বেটা। গুসসা মাত করো।'

মিরন বিষ উগরেই চলে—'দেওয়ানখানার সব তনখা ছুপিয়ে রেখেছেন দেওয়ান। আপনাকে মুসিবতের মধ্যে ফেলার জন্যই সেপাইদের পাওনা মেটাননি। দেওয়ানজিকে কোতল করে লাশ ঝুলিয়ে দেব ত্রিপোলিয়া দরওয়াজায়। জানুক আমলোগ—সাদেক আলি বেতমিজি বরদাস্ত করে না।'

হঠাৎ হইহই করে উঠল রায়দুর্লভের হাভেলির সদর দেউড়িতে মজুত হওয়া সেনারা।

হাভেলির অন্দর থেকে বেরিয়ে এলেন রায়দুর্লভ। শশব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে নবাবকে তসলিম জানিয়ে বললেন, 'অচানক এই হামলা কেন হুজুর? কী তকসীর আমার?'

মিরন উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আপনি গদ্দার। নবাবের বরবাদি চান।'

রায়দুর্লভ বললেন, 'ইয়ে তহমত ঝুটা।'

'ঝুট নয় সচ। অচল সিংকে বাগি হতে মদত দিচ্ছেন আপনি।'

'ইয়ে ঝুটা ইলজাম।'

'খামোশ।'

'ইয়ে সচ বাত। এতকাল নবাবের নিমক খেয়েছি। আমি বেইমানি করতে পারি না।'

'নবাবের হুকুমত কী করে ইনকার করে রাজারাম? আপনার ওফাদার রামনারায়ণজি। এদের গুমরাহী হতে মদত দিচ্ছেন আপনি।' মিরন গর্জন করে ওঠে।

নবাবের উদ্দেশে গুজারেশ করেন রায়দুর্লভ, 'আমার কসুর কোথায় হুজুর? রামনারায়ণজি যদি আপনার হুকুমত ইনকার করে তার জন্য কি আমার নামে ইলজাম ওঠানো যায়?'

'আপনি স্রেফ বেওকুফ বানাচ্ছেন নবাবকে।'

'সেপাইদের মাহিনা বাকি কেন?' শুধোলেন নবাব।

'এতে আমার গলতি কোথায় হুজুর?'

'গলতি নয়? সেপাইদের বেতন তো বরাবর দেওয়ানই মিটিয়ে এসেছেন।'

'ইয়ে সহি বাত। এই জিম্মেদারি আমি গরকবুল করছি না। লেকিন–'

'লেকিন?' প্রশ্ন করেন মিরজাফর।

'টাকা কোথায় পাব? তোশাখানায় যা ছিল, তার সবই তো কোম্পানিকে দিতে হয়েছে।'

মিরন ফের গর্জন করে ওঠে, 'ইয়ে ঝুট বাত। তোশাখানার দৌলত তছরুপ করছেন আপনি।'

গুড়ুম! গুড়ুম! গুড়ুম! সহসা দূর থেকে ভেসে এল গুলির শব্দ।

চমকে উঠল সকলে। ছেদ পড়ল বাক-বিতণ্ডায়।

মিরজাফর খাঁ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, দূরের আকাশে ধুলোর ঝড়। বর্গি এল নাকি?

এই আশঙ্কা আরও গুরুতর করে তুলল একদল সেপাই। চেঁচিয়ে উঠল, 'বর্গি আসছে, বর্গি'।

মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। অস্ত্রসস্ত্র ফেলে রেখে দৌড়তে শুরু করল সেপাইরা। মেদবহুল শরীরটা নিয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে হাতির পিঠে চেপে বসলেন নবাব।

নবাবজাদাও আফসানি, তড়পানি ছেড়ে ছুটলেন নিজের হাতির দিকে।

'পালাও পালাও! বর্গি আসছে।' সেপাই-পেয়াদারা ছুটছে। চারিদিকে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা।

ঘটনার আকস্মিকতায় থতমত খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন রায়দুর্লভ। ওদিকে ক্রমশ এগিয়ে আসছে ঘোড়ার খুরের শব্দ। বর্গির ভয় বড় ভয়ানক চিজ। প্রাণ ভয়ে সবাই ছুটে পালাচ্ছে আর তিনি বেওকুফের মতো দাঁড়িয়ে আছেন কেন? সম্বিৎ ফিরল দেওয়ানজির। পড়িমরি করে নিজের হাভেলির উদ্দেশে ছুটলেন রায়দুর্লভ। অতীতে মারাঠাদের হাতে একবার তিনি নাকাল হয়েছিলেন। বর্গিরা তাকে বন্দি করে নাগপুরে নিয়ে গিয়েছিল। অবশেষে তাঁর পিতা, পাটনার নায়েব জানকীরাম বহু টাকা নজরানা দিয়ে পুত্রকে মুক্ত করেন। সে এক দুঃস্বপ্নের স্মৃতি।

ধাবমান ঘোড়সওয়ারেরা অনেকটা এগিয়ে এসেছে। ধুলোর আস্তরণ ভেদ করে এবারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আকাশে উড্ডীন কোম্পানির নিশান। বর্গি নয়, কোম্পানির ফৌজ!

একদল সেপাই চেঁচিয়ে উঠল, 'গোরা পল্টন! গোরা পল্টন!'

হাভেলির দেউড়িতে পৌঁছে এই চিৎকার শুনে ঘুরে তাকালেন রায়দুর্লভ। বলছে কী এরা? গোরা পল্টন? হ্যাঁ সত্যিই তো। সওয়ারিদের পরনে লাল কুর্তা। আকাশে উড়ছে ইউনিয়ন জ্যাক।

আতঙ্কের প্রহর শেষে স্বস্তির হাসি ফুটল রায়দুর্লভের মুখে।

এগিয়ে আসছে ইংরেজ বাহিনী।

পরমানন্দে উদ্বাহু হয়ে সেদিকে ছুটে গেলেন রায়দুর্লভ। জয় গোবিন্দ। রাখে হরি, মারে কে?

অকুস্থলে হাজির হয়েছেন স্ক্র্যাফটন সাহেব। এসেছেন তাঁর ডেপুটি ওয়ারেন হেস্টিংসও। হাতির পিঠ থেকে দ্রুত নেমে এলেন মিরজাফর।

রায়দুর্লভ চাপমুক্ত, হাসি ফুটেছে মুখে। ওদিকে ভয়ানক অস্বস্তিতে পড়লেন নবাব।

ঘোড়া থেকে নেমেই মিরনকে দেখে স্ক্র্যাফটন চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এসব কী করছেন আপনি? এগেইন ট্রায়িং টু ডিসটার্ব দ্য পিস অফ দ্য টাউন?'

রেসিডেন্ট সাহেবের আগুনে মেজাজের সামনে পড়ে মিরন বেসামাল। মুখে কথা জোগাচ্ছে না।

রায়দুর্লভ এগিয়ে এসে রেসিডেন্ট সাহেবকে সেলাম ঠুকে বললেন, 'বহুত বহুত সুক্রিয়া।'

ছুটোছুটির ধকলে একদিকে হেলে যাওয়া মাথার উষ্ণীষ ঠিকঠাক করতে করতে হন্তদন্ত হয়ে স্ক্র্যাফটনের সামনে হাজির হলেন নবাব।

হেস্টিংস প্রশ্ন করলেন, 'হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?

রায়দুর্লভ গুজারেশ করলেন, 'এ ভাবে পথে দাঁড়িয়ে বাতচিত করা নবাবের পক্ষে বেসহবত কাণ্ড। সকলে হাভেলির অন্দরে চলুন। ওখানেই কথা হবে।'

রায়দুর্লভের প্যালেসের দরবার ঘরে আলোচনায় বসলেন, স্ক্র্যাফটন, হেস্টিংস, নবাব মিরজাফর খাঁ, মিরন ও রায়দুর্লভ। মিরজাফরের সঙ্গে রয়েছেন খাদিম হোসেন খাঁ। একে একেবারেই পছন্দ করে না মিরন।

মিরজাফর খাঁর এক ভগিনীপতির রক্ষিতার গর্ভে খাদিম হোসেনের জন্ম। সেই সূত্রে মিরজাফরকে তিনি মামু বলে ডাকেন। খাদিম হোসেন বয়সে মিরজাফরের থেকে সামান্য ছোট। নবাবের ছেলেবেলার সঙ্গী। মিরজাফর মসনদে বসার পর থেকে দু'জনের সম্পর্ক গাঢ়তর হয়েছে।

স্ক্র্যাফটন বললেন, 'হোয়াই আর ইউ ফাইটিং অ্যামাঙ্গ ইওরসেলভস? হোয়াট দ্য জেনারেল পিপল উইল থিংক অ্যাবাউট ইউ?'

মিরজাফর বললেন, 'পূর্ণিয়ায় বাগি হয়েছেন অচল সিং। তাঁকে শায়েস্তা করা দরকার।'

হেস্টিংস অবাক গলায় প্রশ্ন করলেন, 'হাউ দিস ইন্সিডেন্ট ইজ রিলেটেড উইথ দ্যাট?'

মিরজাফর খাঁ নিশ্চুপ।

মিরন ক্ষুব্ধ গলায় বলে ওঠে, 'সিপাহীদের মাহিনা মেটাননি দেওয়ান। তারা পূর্ণিয়ায় লড়াই করতে যেতে রাজি নয়। দেওয়ানজি গদ্দারি করছেন।'

রায়দুর্লভ ব্যস্ত গলায় বলে ওঠেন, 'ইয়ে ঝুটা ইলজাম। তোশাখানায় টাকা নেই।'

স্ক্র্যাফটন বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠলেন, 'দেওয়ানকে কোতল করলে কি টাকা মিলবে?'

মিরন নিরুত্তর।

ক্ষোভের সঙ্গে স্ক্র্যাফটন বললেন, 'ইউ ক্যাননট গো অ্যাজ ইউ প্লিজ।'

মিরজাফর বলে উঠলেন, 'দেওয়ানের উপর হামলা করার কোনও মনসুবা আমার ছিল না। এ কাজ করে গোস্তাকি করেছে নবাবজাদা। আমি তার হয়ে মাফ চাইছি।'

মিরনের উদ্দেশে কড়া গলায় স্ক্র্যাফটন বললেন, 'ইউ মাস্ট অ্যাপোলোজাইস টু দেওয়ান।'

এই হুকুম তামিল করল মিরন। বলল, 'গোস্তাকি মাফ করবেন দেওয়ানজি।'

রায়দুর্লভ হেসে বললেন, 'নিজামত এক বিরাট বড় খানদান। আমরা সবাই সেই খানদানে বড় হয়ে ওঠা মানুষ। আমাদের রিসতেদারির মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হতেই পারে। নবাবজাদার বয়স কম। নয়া যুবক। একটা গলত কাম না হয় তিনি করেই ফেলেছেন। এ নিয়ে আমার আর কোনও খেদ নেই। আমি এই কাজিয়াটা মিটিয়ে নিতে চাই।'

'আমারও দেওয়ান সাহেবের উপর কোনও আখেজ নেই।' এই বলে কুরসি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মিরজাফর। উঠে দাঁড়ালেন রায়দুর্লভও। কোলাকুলি সেরে নিলেন দু'জনে।

হাততালি দিয়ে উঠলেন স্ক্র্যাফটন ও হেস্টিংস।

স্ক্র্যাফটন বললেন, 'আপনাদের উপরে ভরসা আছে কর্নেলের। ফরগেটিং অল রাইভালরি, ইউ মাস্ট ওয়ার্ক টুগেদার। ডোন্ট গিভ ট্রাবল টু আস। ফর নাথিং আমাদের পরেশান করবেন না।'

এতক্ষণ পান চিবোতে চিবোতে সব আলোচনা শুনছিলেন খাদিম হোসেন। ভাঙের নেশায় চোখদুটো আধবোজা। হঠাৎই তিনি বলে উঠলেন, 'পূর্ণিয়ার মামলার তো কোনও ফয়সালা হল না।'

মিরন বলল, 'ইয়ে সহি বাত। অচল সিং-এর বেয়াদপি বরদাস্ত করলে সারা দেশে বাগিপনাহ বেড়ে যাবে। আশা করি এই লড়াইয়ের টাকা মঞ্জুর করবেন দেওয়ান সাহেব।'

রায়দুর্লভ অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'আমি তো আগেই বলেছি টাকা নেই তোশাখানায়।'

মিরজাফরের মুখপানে চেয়ে খাদিম হোসেন বললেন, 'পূর্ণিয়ায় গিয়ে লড়াই করার জন্য নিজামতের টাকার প্রয়োজন হবে না মামু।'

একথা শুনে সকলে অবাক চোখে খাদিম হোসেনের দিকে তাকাল।

খাদেম হোসেনের ঠোঁটের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে পানের রস। এ নিয়ে তার কোনও হেলদোল নেই। পান চিবিয়েই চলেছেন। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কথা বেশ জড়ানো। মৌতাত জমাট। দু'পা তুলে বেহুদা আনপঢ় আদমির মতো বসে আছেন কুরসিতে। দছমালে ঠোঁটের দুই কোণ মুছে নড়ে চড়ে বসলেন খাদেম হোসেন। হাতের ইশারায় এক দাখিলাকে ডাকলেন। পিচিক করে পানের রস ফেললেন পিকদানে।

উটকো এই লোকটাকে দেখে গা-পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে স্ক্র্যাফটনের। 'হু আর ইউ?'

রেসিডেন্ট সাহেবের প্রশ্নের জবাবে মিরজাফর খাঁ বললেন, 'আমার রিশতেদার।'

খাদেম হোসেন বললেন, 'অচল সিং-কে আমি টিট করে ছাড়ব মামু। আপনি ইজাজত দিলে রিসালা নিয়ে আমি পূর্ণিয়া যেতে রাজি আছি। খরচ আমার।'

হাঁ হয়ে গেলেন স্ক্র্যাফটন ও হেস্টিংস। এই লোকটাকে দেখে তো মোটেই যুদ্ধবাজ বলে মনে হয় না। শিথিল, মেদবহুল দেহের গড়ন। এ লোক লড়াইয়ের ঝক্কি পোহাবে কী করে?

ফের পিচিক করে পানের পিক ফেলে খাদিম হোসেন বললেন, 'আপনি চিন্তা করবেন না মামু, অচল সিংকে জিন্দা ধরে আনব। এই লড়াই-হাঙ্গামার কড়ি মেটাব আমি। লেকিন এক বাত। পূর্ণিয়ার ফৌজদারের নোকরিটা আমার চাই।'

মিরনের মুখের ভঙ্গিমা দেখে মনে হল, সে খুব বিরক্ত। এই প্রস্তাবে তার মোটেই সায় নেই।

রায়দুর্লভ বললেন, 'এ তো ভালো কথা। খাদেমজি দিলওয়ার আদমি।'

নবাব খুশি ঝরা গলায় বললেন, 'আমার একিন অচল সিং-সহ পূর্ণিয়ার বাগি জমিদারদের টিট করতে পারবে খাদেম। আভি আমি তার নামে পূর্ণিয়ার ফৌজদারির পরোয়ানা লিখে দিচ্ছি।'

লাফিয়ে উঠে কুরসির উপরে দাঁড়িয়ে খাদিম হোসেন বলে উঠলেন, 'মামু বহুত মেহেরবান।'

৩৬

অধীর উৎকণ্ঠা নিয়ে একখানা ছিপনৌকোর গলুইয়ের উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ওয়ারেন হেস্টিংস। দ্রুতগামী ছিপনৌকো ভাগীরথী বেয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে কাশিমবাজারের উদ্দেশে ভেসে চলেছে। স্থলপথে গোটা গোরাপল্টন বাহিনীর কাশিমবাজারে ফিরতে অনেকটা সময় লাগবে। মেরির শারীরিক অবস্থা নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন ওয়ারেন হেস্টিংস। জলপথে মুর্শিদাবাদ থেকে কাশিমবাজার অনেক কম সময়ে যাওয়া যায়। তাই বাহিনী ছেড়ে একাকী তাঁর এই নৌ-যাত্রা।

অধীর উত্তেজনায় সামনের দিকে চেয়ে আছেন হেস্টিংস। পথ যেন আর ফুরোতে চায় না। ঘন ঘন মাঝিমাল্লাদের কাছে তিনি শুধোচ্ছেন, 'আর কতক্ষণ সময় লাগবে বলতো কাশিমবাজার পৌঁছতে?'

মাঝি বলে, 'এই যে সাহেব এসে পড়লাম প্রায়।'

দিনের আলো কমে আসছে। ডানা ঝাপটে নদীর উপর দিয়ে উড়ে গেল একদল শঙ্খচিল। হেমন্তকালের এই সময়টায় সন্ধের মুখে নদীর বুকে কুয়াশার আস্তরণ নেমে আসে। সব রং কালচে ধূসর হয়ে যায়। দৃষ্টি

বেশি দূরে যায় না। তবুও হেস্টিংসের ব্যগ্র দুই চোখ সমানে খুঁজতে থাকে—দূরে কোম্পানির কুঠির আবছা অবয়ব দেখা যাচ্ছে কী?

সকালে কুঠির ডাক্তার বলেছেন, যে কোনও সময় মেরির প্রসববেদনা উঠতে পারে। উৎকণ্ঠা আর সইতে পারছেন না হেস্টিংস। ঘনঘন টান দিয়ে চলেছেন চুরুটে।

মাঝি হঠাৎ বলে, 'ওই যে সাহেব কুঠির ঘাট দেখা যাচ্ছে।'

কাশিমবাজারের কুঠিঘাটে ভিড়ল হেস্টিংসের ছিপনৌকো। নৌকো থেকে প্রায় লাফিয়ে পড়ে ঘাটের উপরে উঠে এলেন হেস্টিংস। ঘাট থেকে উপরে উঠে গিয়েছে দোতলা ইমারতের সমান উঁচু থাক থাক সিঁড়ি। খুব দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে তিনি উপরে উঠতে লাগলেন।

হঠাৎই তাঁর চোখে পড়ল উপর থেকে অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে নেমে আসছেন কৃষ্ণকান্ত। পিছনে এক মশালচি। আঁধার নেমেছে। কী সংবাদ বয়ে আনছেন কান্ত?

হেস্টিংসের দম যেন বন্ধ হয়ে আসতে থাকে। দ্রুত একথাক সিঁড়ি ভেঙে প্রশস্ত এক চাতালের উপরে উঠে এসে কৃষ্ণকান্তর মুখোমুখি হলেন হেস্টিংস।

'কী পয়গাম কান্ত?'

কৃষ্ণকান্তর মুখে হাসি ঝলকায়। বলেন, 'খুশখবর আছে সাহেব। আপনার মেয়ে হয়েছে। মেরি ম্যাডাম ও ড'টার দুজনেই ভালো আছে।'

নিমেষে দুশ্চিন্তার পাষাণভার নেমে গেল হেস্টিংসের বুক থেকে। খুশিতে ডানা মেলে উড়তে ইচ্ছে হল তাঁর। আকাশের দিকে মুখ তুলে প্রভু যিশুকে অজস্র ধন্যবাদ জানালেন।

কৃষ্ণকান্ত বলেন, 'ইনাম চাই সাহেব। গুড নিউজ আমিই প্রথম আপনাকে দিলাম।'

'জরুর।' অনামিকা থেকে হিরে বসানো মূল্যবান একটা আংটি খুলে নিয়ে সেটা কৃষ্ণকান্তকে উপহার দিলেন হেস্টিংস। তারপর ছুটলেন বাংলো অভিমুখে।

আঁতুড় ঘরের দরজার মুখে এসে দাঁড়ালেন হেস্টিংস। গায়ে একখানা কাঁথা চাপা দিয়ে শুয়ে আছে মেরি। তার বুকের কাছে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে একরত্তি মেয়েটা। ফুলের মতো সুন্দর।

'মেরি ডার্লিং!' আনন্দে জল আসে হেস্টিংসের চোখে।

চোখ খুলে তাকালেন মেরি। হেস্টিংসকে দেখে মুচকি হাসলেন।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে মেরির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন হেস্টিংস।

হাসলে মেরির দুগালে টোল পড়ে। খুব সুন্দর দেখায়।

সৈন্যসামন্ত নিয়ে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে পূর্ণিয়ার পথে রওনা হলেন খাদিম হোসেন। হাতি-ঘোড়া-উট-বন্দুকচি, পদাতিক, ধানুকি, মুটে মজুর-গোলাম-বাঁদি নিয়ে বিরাট এক বাহিনী। সেই সঙ্গে জেনানা পালকিতে চলেছে বেশ কয়েকজন কসবী, বাইজি। সব মিলিয়ে বিরাট এক লটবহর। এ অভিযানের কড়ি নিজের ট্যাঁক থেকেই খসাচ্ছেন খাদিম হোসেন। মনের মধ্যে কষে রেখেছেন সহজ এক অংক। ফৌজদারের পদে বসে জমিদারদের চাপ দিয়ে খরচের কয়েকগুণ তিনি উশুল করে নেবেন।

মিরনের ঘোর অপছন্দের লোক খাদিম হোসেন। নবাবজাদার অমতে ফৌজদারের পদপ্রাপ্তি তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না। এই অভিযানে নিজামতের খরচ নেই। শুধু এই ভেবে খাদেম হোসেনের পদোন্নতি মেনে নিলেন মিরন। কিন্তু খাদেম হোসেনের পিছনে লেলিয়ে দিলেন কয়েকজন কাসিদ কে। খাদিম হোসেন দুর্জন ব্যক্তি। অসৎ, লম্পট ও দুশ্চরিত্র। সকলেই জানে। অনেকদিন ধরেই লুকিয়েচুরিয়ে নানা বেআইনি কারবার

করে তিনি অঢেল বিত্তের অধিকারী। হালে নবাব মিরজাফরের মদতে খাদিম হোসেনের মাদকের কারবার খুল্লমখুল্লা চলছে। চকবাজারে কোতোয়ালির দারোগার নাকের ডগাতেই দেদার বিকোচ্ছে নিষিদ্ধ মাদক।

এমন দুর্জন লোককে উৎকোচে বশীভূত করা কঠিন কিছু নয়। নবাব ও নবাবজাদা দু'জনেরই ভয় রামনারায়ণকে। টাকা ছড়িয়ে গোটা ফৌজসহ খাদিম হোসেনকে নিজের তাঁবে না নিয়ে নেন রামনারায়ণ। পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে খাদেম হোসেন নিজেই যদি গুমরাহী হন তো বিপক্ষ শিবিরের শক্তি আরও বাড়বে। খাদেম হোসেনের গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখার জন্য কাসিদ বাহিনীকে হুঁশিয়ার করে দিল মিরন। খাদেম হোসেনও বুঝলেন তিনি নজরবন্দি। বাগিপনাহের ভূত দেখছেন নবাব ও নবাবজাদা। তবে এ নিয়ে তাঁর অবশ্য কোনও হেলদোল নেই। ফৌজদারের ক্ষমতার অপব্যবহার করে অঢেল টাকা উপায়ের খোয়াবে তিনি বিভোর হয়ে আছেন।

পূর্ণিয়ায় গিয়ে বেশ রগড় হবে। লুঠতরাজ করে বেশ দুপয়সা কামিয়ে নেওয়া যাবে। এই খুশিতে হইহল্লা করতে করতে চলেছে খাদেম হোসেনের উচ্ছৃঙ্খল বাহিনী। এরা কেউই সেই অর্থে সৈন্য নয়। বেশিরভাগই দুষ্কৃতী। খাদিম হোসেনের অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে তরবারি বা বন্দুক ধরার অতীত অভিজ্ঞতা অনেকেরই নেই। মদে চূর হয়ে টলমল পায়ে এরা চলেছে। পথের ধারের গ্রামগুলোতে হামলা করে নিরীহ মানুষের ধনদৌলত কেড়ে নিচ্ছে। উচ্ছৃঙ্খল সেপাইদের দাপটে আতঙ্কের প্রহর গুনছে সাধারণ মানুষ। এ নিয়ে খাদেম হোসেন নির্বিকার। যা ঘটছে তা তাঁর মদতেই ঘটছে। তিনি ভাঙের নেশায় চুর হয়ে ঝিম মেরে গাদেলার উপরে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে কাত হয়ে বসে পান চিবিয়ে চলেছেন। কেবল দিনের শেষে সেপাইদের কাছ থেকে বুঝে নিচ্ছেন নিজের বখরা। এর নাম যুদ্ধযাত্রা?

হাঁ হয়ে গিয়েছেন রাজধানীর প্রবীণেরা। এঁরা যৌবনকালে মুর্শিদকুলির রাজত্ব দেখেছেন, দেখেছেন সুজাউদ্দীনের শাসনকাল। প্রবল প্রতাপশালী বর্গিদের সঙ্গে সমানে টক্কর দিতে দেখেছেন আলিবর্দিকে। নিজামতের শাসনযন্ত্রের সার্বিক অবক্ষয়টা ভয়ানক বেআবরু হয়ে ধরা পড়ছে এঁদের চোখে। সকলে বুঝতে পারছেন মুর্শিদাবাদের গৌরব, ঐতিহ্য সব কিছু ক্রমশ ডুবছে অন্তহীন আঁধারে। এই সংকট থেকে উত্তরণ কার্যত অসম্ভব।

ক্লাইভ চেয়েছিলেন রামনারায়ণ, রাজারাম, অচল সিং এরা মিরজাফরকে চাপে রাখুক, তাতে নবাবকে তাঁবে রাখতে সুবিধা কোম্পানির। তবে বাগিপনাহ তিনি চাননি। বিচক্ষণ ক্লাইভ বোঝেন এ ছোঁয়াচে রোগ। এতে গোটা বাংলাজুড়ে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা, কোম্পানির কারবারের ক্ষতি। দূর থেকে ভীতি প্রদর্শন করে বুজদিল মানুষকে তাঁবে রাখা যায়। সুতোর টানে খুশিমতো নাচানো যায়। এ একটা খেলা। কিন্তু ভয়ের বাতাবরণ অসহ্য হয়ে উঠলে ডরপোক মানুষও প্রবল পরাক্রমে ঘুরে দাঁড়ানোর কোশিশ করে। ভীতির কারণকে নির্মূল করতে চায়। সেক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের সুতো ছিঁড়ে গোটা খেলাটাই বরবাদ হয়ে যেতে পারে।

স্ক্র্যাফটনের চিঠি পড়তে পড়তে চিন্তায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন ক্লাইভ। ফের মনঃসংযোগ করলেন পরের অংশে চোখ বুলিয়ে আঁতকে উঠলেন রীতিমতো।

স্ক্র্যাফটন লিখেছেন, '...নবাব ডেভেলপড অ্যা বিটার রিলেশনশিপ উইথ দেওয়ান। ইট ইজ এক্সপোজড টু দ্য নবাব দ্যাট দেওয়ান ইজ ইনভলভড ইন অ্যা কনস্পিরেসি। দেওয়ানকে খুন করার ফন্দি আঁটছে মিরন। রিসেন্টলি হি অ্যাটাকড দেওয়ানঅস রেসিডেন্স...'

চিঠিটা ভাঁজ করে টেবিলের উপর রাখলেন ক্লাইভ। কুরসি ছেড়ে উঠে পাইপ ঠোঁটে গুঁজে পায়চারি করতে লাগলেন।

মিরন ছোকরা বেওকুফ। থেকে থেকে নানারকম উটকো সমস্যা ডেকে আনছে। তাকে আরও স্পয়েল করছেন রাজবল্লভ, দ্য ওল্ড ফক্স। স্ক্র্যাফটন লিখেছেন, রাজবল্লভের উস্কানিতেই নবাবজাদা ফৌজ নিয়ে রায়দুর্লভের হাভেলিতে হামলা করতে গিয়েছিল।

হাঁটা থামিয়ে নিজের কাজের জায়গায় এসে বসলেন ক্লাইভ। কাগজ টেনে নিয়ে নবাবের উদ্দেশে একটা একটা চিঠির মুসাবিদা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

'...শুনলাম আপনার পুত্র মিরন ফৌজ নিয়ে হামলা করতে গিয়েছিল দেওয়ানের হাভেলিতে। এসব কী ঘটছে আপনার জমানায়? আমি নবাবজাদার দুঃসাহস দেখে তাজ্জব বনে যাচ্ছি। আপনি সামলান তাকে, নয়তো তার বেওকুফির কারণে তকলিফ বাড়বে আপনার। শক্ত হাতে নিজামতের রাশ ধরুন। কিছুদিনের মধ্যে আমি মুর্শিদাবাদে আসছি।...'

চিঠিটা শেষ করে মুনশিকে ডেকে ক্লাইভ বললেন, 'চিঠিটা দ্রুত তর্জমা করে দাও।'

'জি হুজুর। নবাবের একখানা চিঠি এসেছে।' গুজারেশ করেন নবকৃষ্ণ।

'কী লিখেছেন?'

'তুরন্ত একবার মুর্শিদাবাদে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন আপনাকে। বিহার মুলুক নিয়ে তিনি পরেশানিতে পড়েছেন। ওদিকে আবার নিজামতের অন্দরেও কাজিয়া বেঁধেছে।'

ক্লাইভ বললেন, 'জানি। স্ক্র্যাফটন লিখেছে। কী করা যায় বল তো মুনশি?'

'ফওরান মুর্শিদাবাদে আপনার একবার যাওয়া দরকার।'

'আমিও তাই ভাবছি মুনশি। মাই মাইন্ড ইজ রেস্টলেস। কিন্তু এদিককার অবস্থা তো দেখছ। মেনি সোলজারস আর সিক।'

'যে কয়জন চাঙ্গা আছে তাদের নিয়েই বেরিয়ে পড়ুন হুজুর। বাকিরা না হয় পরে যাবে। আমার মনের মধ্যে কেমন যেন কু গাইছে। বড় কোনও অঘটন ঘটতে পারে।'

'কী রকম?'

চকিতে মুখ তুলে নবকৃষ্ণর মুখপানে চাইলেন ক্লাইভ।

খাদেম হোসেনকে পূর্ণিয়ায় পাঠিয়ে স্বস্তিতে নেই মিরজাফর। মনের মধ্যে শঙ্কা, খাদেম কি পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ সামাল দিতে পারবে? না কি অচল সিং-এর সঙ্গে দোস্তি গড়ে তুলে রামনারায়ণের সঙ্গে যোগ দিয়ে পরিস্থিতিকে আরও ঘোরালো করে তুলবে? মিরজাফরের মন চাইছে এখনই সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে পড়ে খাদিম হোসেনের পিছু ধাওয়া করেন। এই পরিকল্পনার আড়ালে রয়েছে অন্য আরেক ফন্দি। খাদেমের উপরে নজরদারি সেরে অতর্কিতে পাটনায় হানা দেওয়া। ক্লাইভের নিষেধে আপাতত পিছিয়ে এলেও নবাব ভুলতে পারছেন না রামনারায়ণকে। তাঁর ধনদৌলত কেড়ে না নিতে পারলে মিরজাফরের শান্তি নেই। কিন্তু ফৌজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ার মতো টাকা কোথায়?

নিজের ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে খানিকটা টাকা বেঁটে দিয়ে পূর্ণিয়া অভিযানের জন্য কিছু সংখ্যক সৈন্যকে রাজি করালেন মিরজাফর খাঁ। কিন্তু পাটনায় গিয়ে রামনারায়ণের মোকাবিলা করতে হলে আরও সৈন্যের প্রয়োজন।

ক্লাইভ সাহেব তার ফৌজ নিয়ে এখনই এসে পড়লে হয়তো সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। অচল সিংয়ের বাগিপনাহের কথা বলে কর্নেল ও তাঁর বাহিনীকে পূর্ণিয়ায় টেনে নিয়ে গিয়ে পরে কিছু একটা যুতসই অজুহাত খাড়া করে তাঁকে পাটনা আক্রমণে হয়তো রাজি করানো যেত। কিন্তু ক্লাইভ সাহেব কবে আসবেন,

ঠিক নেই। নবাবের চিঠির জবাবে তিনি লিখেছেন জলদি একবার মুর্শিদাবাদে আসবেন। কিন্তু এখনও তাঁর কলকাতা থেকে রওনা হওয়ার কোনও পয়গাম নেই।

উপায় হাতড়াতে লাগলেন মিরজাফর। মনে পড়ল দামাদ মিরকাশিমের কথা।

পলাশির যুদ্ধের পর রংপুরের ফৌজদারের পদে বহাল হয়েছেন মিরকাশিম। নিজামতের শাসন কাঠামোয় ওই পদ তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। মিরনের খায়েশে তাঁকে যেতে হয়েছে রাজধানী থেকে দূরে। জিজাজি রাজধানীর ধারেকাছে থাকুন– চাননি মিরন। তাঁর ভয়, জিজাজি মসনদের দাবিদার হয়ে উঠতে পারেন। সিরাজদ্দৌলাকে গ্রেফতার করেও তাই নিজামতের চাকরিতে তেমন উন্নতি হল না মিরকাশিমের। তিনি রইলেন সুযোগের অপেক্ষায়। কী করে নবাবকে খুশি করা যায়। অচল সিং– এর বাগিপনাহ তাঁর সামনে এক সুযোগ এনে দিল।

'পূর্ণিয়ার কহানি শুনেছ নিশ্চয়ই।' জামাতার উদ্দেশে বললেন নবাব।

'জি আব্বাহুজুর। দেওয়ানজির গদ্দারির কহানিও শুনেছি।'

নবাবের জরুরি তলব পেয়ে গতকালই রংপুর থেকে মুর্শিদাবাদে এসে পৌঁছেছেন মিরকাশিম।

'খাদেম হোসেনকে পূর্ণিয়ায় পাঠিয়েছি ঠিকই, তবে তার উপরে সম্পূর্ণ ভরসা নেই আমার।'

কী বলতে চাইছেন নবাব, তার আন্দাজ পাওয়ার কোশিশ করতে থাকেন মিরকাশিম।

'নিজামতের তোশাখানায় টাকা নেই। তোমার মদত চাই।'

অবাক হন মিরকাশিম। প্রশ্ন করেন, 'মদত মতলব?'

'ফৌজ নিয়ে আমি পূর্ণিয়া যেতে চাই। কিন্তু ফৌজিদের বেতন মেটানোর মুরোদ নেই আমার।'

মিরকাশিম শুধোলেন, 'আপনি অর্থ সাহায্য চাইছেন আব্বাহুজুর?'

আনত চোখে মিরজাফর বললেন, 'হ্যাঁ। আমি বেদৌলত। পারবে টাকা জোগাড় করতে?'

'পারব।'

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মিরজাফরের মুখ। 'সচ বলছ বেটা?'

পৈতৃক সূত্রে অঢেল বিত্তের অধিকারী হয়েছিলেন মিরকাশিম। শ্বশুরের হাতে তুলে দিলেন নিজের সঞ্চিত অর্থের একটা অংশ। সেই টাকা বেঁটে দিয়ে সেপাইদের পূর্ণিয়া অভিযানে রাজি করালেন মিরজাফর। পূর্ণিয়ার পথে রওনা হওয়ার আগে ক্লাইভের উদ্দেশে পাঠালেন একটা চিঠি।

'...জনাব আশা করি সহি সালামত, খুশ তবিয়ত আছেন। পূর্ণিয়ার হালত ভালো নয়। আমি ফৌজ নিয়ে রওনা হলাম। গিরিয়ায় ছাউনি গেড়ে আপনার জন্য অপেক্ষা করব। আপনি ফৌজ নিয়ে তুরন্ত চলে আসুন।...' সেই সঙ্গে খাদিম হোসেনকেও একটা চিঠি পাঠালেন নবাব। '...রাজমহলে অপেক্ষা কর। আমি ফৌজ নিয়ে আসছি।...'

মিরজাফরের পরিকল্পনা রাজমহলে পৌঁছে খাদিম হোসেনের মতিগতি ভালো করে যাচাই করে নেবেন, সব ঠিক থাকলে খাদিম হোসেনকে হুকুম করবেন গঙ্গা পেরিয়ে পূর্ণিয়ায় হামলা করতে। আর ক্লাইভকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ছুটবেন পাটনায়। এক যোগে অচল সিং ও রামনারায়ণকে আক্রমণ করলে দুজনের কেউ কাউকে মদত দিতে পারবে না। বিরাট কাফেলা নিয়ে খোশ মেজাজে পূর্ণিয়ার পথে বেরিয়ে পড়লেন নবাব। ক্লাইভ তখন হুগলি পেরিয়ে দ্রুত গতিতে মুর্শিদাবাদের দিকে এগোচ্ছেন। সে খবর নবাবের কানে পৌঁছয়নি।

দুপুরের পর থেকে জাফরাগঞ্জ প্যালেসে বাতিকরদের দম ফেলার ফুরসত থাকে না। মিরনের হুকুম—প্যালেসের অন্দরে কোথাও যেন আঁধারের এতটুকু কালি নজরে না আসে। এই হুকুম অক্ষরে অক্ষরে তামিল করতে দিনের আলো ফুরিয়ে আসার অনেক আগে থেকেই বাতিকরদের তৎপর হতে হয়। সামান্য গলতি হলে রেহাই নেই। গর্দান যাবে। বাতিকরের দল হুঁশিয়ার হয়ে থাকে। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে প্যালেসের ঘরগুলো তো বটেই এমনকি সিঁড়ি, অলিন্দ, চলাচলের সরু পথ সর্বত্রই ঝলমল করে ওঠে শয়ে শয়ে দেওয়ালগিরি, ঝাড়বাতি, চিরাগ, নানা নকশার আধারে অভ্রের পাতজ্বলা উজ্জ্বল আলোয়। অন্ধকারকে ভয় পায় মিরন। তাই এত আনজাম। মিরনের ভয় হরেককিসিমের। ভয় গুপ্তঘাতকের, ভূত-প্রেত, অশুভ আত্মার।

পুড়ছে অভ্রের পাত। কাঁপছে আগুনের শিখা। তার উপরে উড়ে এসে পড়ছে পতঙ্গ। নিমেষে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। দরজার পাশে রাখা বাতিদানের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে মিরন। নবাব রাজধানীতে নেই। পূর্ণিয়া অভিযানে বেরিয়ে গিরিয়ায় তাঁবু ফেলেছেন।

মিরনের মন তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে নানারকম দুশ্চিন্তায়। এর সূত্রপাত কয়েকদিন আগে পাওয়া একটা উড়ো চিঠি থেকে। তাতে লেখা ছিল, '...সব জুলমাতের হিসেব চোকানোর জন্য তৈয়ার হও। দুনিয়াদার তোমার মওতের দিনক্ষণ চূড়ান্ত করেছেন। বেহেস্ত নয়, তোমার ঠাঁই হবে দোজখে।...'

কে পাঠাল এই চিঠি, তার কোনও আন্দাজ পায়নি মিরন। প্রথমে বিষয়টাকে হালকা চালে নিলেও নবাবজাদার মনে ভয় ঢুকেছে। হঠাৎ কার যেন ছায়া পড়ল ঘরে। চমকে গিয়ে ঘুরে তাকিয়ে কোমর থেকে ঝোলানো খঞ্জর খাপ থেকে দ্রুত উন্মোচিত করল মিরন।

অদূরে দাঁড়িয়ে আছে অতি বিশ্বস্ত গোলাম কাদির শেখ। তার হাতে রুপোর রেকাবিতে সাজানো রয়েছে শরাবের বোতল, বেলজিয়ান কাট গ্লাসের পানপাত্র।

খঞ্জর হাতে আক্রমণোদ্যত মনিবকে দেখে কাদিরের ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। কাঁপছে তার হাত। কাঁপছে হাতে ধরা রেকাবি। খঞ্জরের ধারালো ফলা অভ্রের আলোয় ঝকঝক করছে।

'কোনও গুস্তাকি হয়ে থাকলে মাফ করবেন হুজুর।'

মিরন অস্ত্রটা খাপের মধ্যে ফের ঢুকিয়ে রাখে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কাদির।

'ভয় পেয়েছিলি বুঝি?' হেসে পরিস্থিতি সহজ করার কোশিশ করে মিরন।

'জি হুজুর।' রুপোর রেকাবিটা চৌপাইয়ের উপর নামিয়ে রেখে দ্রুত পায়ে কাদির চলে যায়।

গুপ্তঘাতকের ভয়ে মিরন ইদানীং ত্রস্ত হয়ে থাকে। রাত নামলে এই ভয়টা বড় বেশি জাঁকিয়ে বসে মনের মধ্যে। নিজামতের অন্দরে তার দুশমন কম নয়। রায়দুর্লভ, মণি বেগম, মিরকাশিম এরা তো আছেনই। সেই সঙ্গে রয়েছে ধূর্ত ইংরেজ বণিক।

সিরাজদ্দৌলার ভাই মির্জা মেহেদিকে মসনদে বসিয়ে নিজামতের রাশ নিজের হাতে রাখতে চান রায়দুর্লভ। মণি বেগম বুঝে নিতে চান মসনদের উপর তার দুই পুত্র সইফউদ্দৌলা ও নজমুদ্দৌলার অধিকার। তিনি সুবহসাম মিরনের বিরুদ্ধে নবাবের কানে বিষ ঢেলে চলেছেন। এর পাশাপাশি চিঠি লিখে তার কার্যকলাপ নিয়ে শিকায়ত জানাচ্ছেন ক্লাইভের কাছে।

পশ্চিম দেশ থেকে আসা আজনবি এক নাচনেওয়ালি রূপের ছলাকলায় আব্বাহুজুরকে ভেড়া বানিয়ে বেগম হয়েছেন। তিনি ছড়ি ঘোরাবেন তার উপরে? মণি বেগমকে খতম করতে চায় মিরন। কিন্তু তিনি যে ভাবে সুবহসাম দেহরক্ষী পরিবৃত হয়ে থাকেন, তাতে মিরনের ঘাতকবাহিনীর পক্ষে তাঁর নাগাল পাওয়া দুষ্কর। ওদিকে আবার মণি বেগমের নামে কোনও নালিশই শুনতে চান না নবাব। হেসে উড়িয়ে দেন বেগমসাহেবার নামে মিরনের আনা যাবতীয় ইলজাম।

শুধু মণি বেগম নন, আরও অনেককেই মিরন এই দুনিয়া থেকে চিরতরে সরিয়ে দিতে চায়। নামগুলো লেখা আছে ছোট্ট একটা খাতায়। মিরন বলে কাতিলনামা। রায়দুর্লভ, মণি বেগম, মিরকাশিম, এমনকি মিরজাফরের ঔরসজাত মণি বেগমের দুইপুত্র নজমউদ্দৌলা ও সইফউদ্দৌলাসহ সিরাজের ওফাদার বলে পরিচিত বহু মানুষের নাম নথিভুক্ত হয়ে আছে খতমের তালিকায়।

মিরনের নয়া অশান্তির কারণ মিরকাশিম। তাঁর নজর যে মসনদের উপরে রয়েছে, মিরন তা বুঝতে না পারার মতো বেওকুফ নয়। নিজের দামাদকে ভয় পান নবাব মিরজাফর খাঁও। দামাদ তাঁর পড়ালিখা করা বুজুর্গ আদমি। সিরাজদ্দৌলাকে গ্রেফতার করার পর থেকে ইংরেজদের সঙ্গে তার দোস্তি, দহরমমহরম জোরদার হয়েছে। কাশিমবাজার ও কলকাতার প্রভাব থেকে দূরে রাখতে মিরকাশিমকে রংপুরের ফৌজদারের পদে নিযুক্ত করেছিলেন মিরজাফর। এখন আবার বিপদে পড়ে টাকা চেয়ে দামাদেরই হাত পাকড়ে ধরেছেন নবাব। এই মওকায় দরবার রাজনীতিতে নিজের অবস্থান মজবুত করতে চাইবেন তার জিজাজি। মিরন বোঝে। তাই ভবিষ্যতের কথা ভেবে জিজাজিকেও সে দুনিয়া থেকে চিরতরে সরিয়ে দিতে চায়।

পলাশির যুদ্ধের পর সিরাজদ্দৌলা-সহ বহু মানুষের মওত হয়েছে মিরনের ইশারায়। নবাবজাদার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন বিশ্বাস করে, অপঘাতে মরা মানুষ প্রেত হয়ে এই দুনিয়াতেই থেকে যায়। ঘাতকের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, বদলা নিতে চায়। রাতের বেলায় দেওয়ালে নিজের ছায়া দেখেও মাঝে মাঝে প্রেত ভেবে চমকে ওঠে মিরন। ভূত-প্রেত, অশুভ আত্মার ভয় দূর করতে এক ফকিরের পরামর্শে সে একটি তাবিজ ধারণ করেছে। সেই সঙ্গে ফকির সাহেব দিয়েছেন একটা মন্ত্রপূত লৌহদণ্ড। ফকির সাহেবের বিধান —এই লৌহদণ্ডটি সঙ্গে থাকলে অশুভ আত্মা ক্ষতি করতে পারবে না। এই লৌহদণ্ডটি কোমর থেকে ঝোলানো একটি চামড়ার খাপে পুরে সঙ্গে রাখে মিরন। রাতে ঘুমোনোর সময় লৌহদণ্ডটি রেখে দেয় বালিশের নীচে।

‘কে? কে ওখানে?’

মিরন দেখে অদূরে দাঁড়িয়ে এক রাজপুরুষ তার দিকে স্থির চোখে চেয়ে রয়েছে। ভয়ে নবাবজাদার রোমকূপ খাড়া হয়ে ওঠে। কে ওই রাজপুরুষ? পরনের পোশাক নবাব-বাদশার মতো। মাথায় উষ্ণীষ। তবে কি সি-রা-জের বিদেহী আত্মা–

‘সি-রা-জ!’

শরাবের নেশায় মিরন প্রায় বেসামাল। সামনের দিকে কয়েক পা এগোতে গিয়ে সে দেখে সেই রাজপুরুষও এগিয়ে আসছে তার দিকে। মিরন প্রাণ ভয়ে কোমরবন্ধনী থেকে মন্ত্রপূত লৌহদণ্ডটি বের করে ছুড়ে মারে ওই রাজপুরুষের দিকে। ঝনঝন শব্দে কাঁচ ভাঙে। নেশার ঘোরে আরশিতে নিজের প্রতিবিম্বকেই সিরাজ ভেবে ভয় পেয়েছে মিরন।

কাদির এসে তসলিম জানিয়ে বলে, ‘কাসিদ খবর এনেছে হুজুর।’

‘কী খবর? গোরা পল্টনেরা এখন কোথায়?’ উৎকণ্ঠার সঙ্গে প্রশ্ন করে মিরন।

‘দাউদপুরে ছাউনি ফেলেছে।’

মিরন বলে, ‘চুনিলাল-মুন্নিলালকে খবর দাও। তুরন্ত।’

‘জি হুজুর।’ কাদির চলে যায়।

উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় দমবন্ধ হয়ে আসছে মিরনের। নবাবজাদার অপরিণত মস্তিষ্ক অনেক সময় রাজনৈতিক বাতাবরণের সহি আন্দাজ পায় না। তার বেতাব দিল উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ খুব বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারে না। বুদ্ধি ঘুলিয়ে যায়। এই সময় শয়তান ভর করে তার মাথায়।

দাউদপুরে ছাউনি ফেলেছেন ক্লাইভ। মুর্শিদাবাদ মাত্র একদিনের পথ। হাতে সময় বড় কম। অস্থির হয়ে পদচারণা করতে থাকে মিরন। তার সন্দিগ্ধ মনে উঁকি দিচ্ছে নানারকমের শঙ্কার মেঘ। দেওয়ান রায়দুর্লভ তার হাভেলিতে সেই হামলার পর থেকে নিজেকে ঘরবন্দি করে রেখেছেন। এই মুহূর্তে আব্বাহুজুর রাজধানীতে নেই। তাহলে কি দেওয়ানসাহেব এই মওকার ইন্তেজারে ছিলেন? তিনিই কর্নেল ক্লাইভকে ডেকে নিয়ে আসছেন মুর্শিদাবাদে?

মিরন জানে না ক্লাইভ আসছেন নবাবের চিঠি পেয়ে। এই চিঠির কথা পুত্রের কাছে গোপন রেখেছিলেন নবাব। কারণ ইংরেজদের প্রতি মিরনের নফরতি। ইংরেজ বণিকেরা কেন চোখ রাঙাবে? কেন সে নবাবজাদা হয়েও চলতে পারবে না নিজের খুশখেয়ালে, মর্জিতে? তার ইয়ারদোস্তরা, ঘরবাড়ি লুঠতরাজ করুক, আগুন জ্বালাক কোনও রইস আদমির ঘরের আওরাতকে তুলে নিয়ে এসে ফূর্তি মানাক বা সিরাজের ওফাদারদের খতম করুক, তাতে ইংরেজদের শিরদর্দ কেন? ভাবীকালে মসনদের হকদার সে। কোন অধিকারে তাকে ধমক দেয় আয়ারকুট, স্ক্র্যাফটন, হেস্টিংস? এই কথাগুলো অনেকবার ক্লাইভ সাহেবকে শুনিয়ে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হয়েছে মিরনের কিন্তু সে বলে উঠতে পারেনি। তার আব্বাহুজুরের মতোই ক্লাইভের মুখোমুখি হলে সেও ভয়ে কাঁপতে থাকে। কর্নেলের চোখের দিকে তাকালে মুখের ভাষা হারিয়ে যায়। কেন এই দহসত? মিরন উত্তর হাতড়ে বেড়ায়। হতাশা দমন করতে না পেরে ইয়ারবকশিদের নিয়ে মজলিশে বসে কর্নেল ক্লাইভের নামে সে নোংরা গালিগালাজ করে। গোলাম, দাখিলারা মিরজাফরের কাছে পৌঁছে দেয় এসব কথা। নবাব শিউরে ওঠেন।

দুশ্চিন্তায় স্থির হয়ে এক জায়গায় দাঁড়াতে পারছে না মিরন। ক্লাইভ তো একা আসছেন না সঙ্গে আছে কামান ও বেশ বড়সড় ফৌজ। ফের কি ইনকিলাব ঘটতে চলেছে মুর্শিদাবাদে? ইংরেজদের সাহায্য নিয়ে সিরাজদ্দৌলার ভাই মির্জা মেহেদিকে মসনদে বসাতে চান রায়দুর্লভ? মুসিবত হতে চলেছে তার আব্বাহুজুরের? সিরাজদ্দৌলার মতোই বরবাদ হয়ে যাবেন তিনি? বেসাহারা, বেদলৌত হবেন নবাব মিরজাফর খাঁ? বন্দি হবেন হাবুজখানায়? মিরনের রংদার জিন্দেগি শুরুয়াতেই বেরং হয়ে যাবে?

ডোরিতে টান দিয়ে ঘন্টি বাজায় মিরন। কাদির অন্দরে এসে তসলিম জানায়।

'কালি আউর কলম।'

ছুটে গিয়ে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে কালি ও কলম নিয়ে আসে কাদির।

ঘরের এক কোণায় তেকোণা টেবিলের সামনে কুরসিতে এসে বসে মিরন। তার কাতিলনামা খুলে পাতা ওলটাতে থাকে। এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ায় মিরন। গোটা পাতায় লেখা রয়েছে একটাই নাম। মির্জা মেহেদি। কলম কালিতে ডুবিয়ে মির্জা মেহেদির নামের পাশে ঢ্যাঁড়া দেয় মিরন।

ঠিক তখনই পিছন থেকে শোনা যায় একজোড়া গলার আওয়াজ, 'হুজুর?'

চমকে গিয়ে ঘুরে তাকায় মিরন। হাতের অসতর্ক ধাক্কায় খাতার উপরে উলটে যায় কালির আধার। গোটা পাতাটাই কালো হয়ে যায়। টেবিলের উপর দিয়ে কালি গড়িয়ে গিয়ে টপ টপ করে পড়তে থাকে গালিচার উপরে।

দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে চুনিলাল ও মুন্নিলাল।

চেহেল সেতুনের ঘড়িয়াল ঘণ্টা পিটিয়ে জানান দেয় রাতের মেয়াদ আর কতখানি। রাতে বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করেন শরফ উন্নেসা। ঘুম আসে না। সিরাজের নানি বেগম অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ান অতীতের আলোয় ভরা দিনগুলো।

মিরনের খায়েশে আর পাঁচজন সাধারণ কয়েদির মতো প্রায়ান্ধকার এক কারাকক্ষে প্রথমে কয়েদ হয়েছিলেন। পরে ক্লাইভের হুকুমে সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে ঠাই পেয়েছেন চেহেল সেতুনেরই অন্দরে মস্ত এক হাভেলিতে। আলিবর্দির খানদানের বাকি সদস্যেরাও এখানে গৃহবন্দি হয়ে আছেন।

সিরাজকে হারিয়ে মির্জা মেহেদিকে বুকে আঁকড়ে ধরেছেন নানি বেগম। তেরো বছরের বালক মির্জা রাতে তার দিদিমার কাছেই ঘুমোয়। পাশের ঘরে থাকেন তার আম্মিজান আমিনা বেগম। অবসাদে দিনরাত তিনি আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকেন।

অঘোরে ঘুমোচ্ছে মির্জা। বড় সুন্দর নিষ্পাপ মুখখানা। জাফরির ফাঁক দিয়ে নকশাকাটা চাঁদের আলো এসে পড়েছে মির্জার মুখে উপরে। মুগ্ধচোখে দৌহিত্রের মুখপানে চেয়ে থাকেন নানি বেগম। চোখের কোণায় চিকচিক করে পানি। মির্জার গায়ে তিনি হাত বুলিয়ে দেন পরম মমতায়। আলিবর্দির খানদানের খুন বইছে এই বালকের দেহে। কে বলতে পারে নসিবের চাকা কোনওদিন ঘুরবে না। হঠাৎই কিছুদিন দেওয়ান রায়দুর্লভের চিঠি এসে পৌঁছোয় নানি বেগমের হাতে। সেই চিঠি উসকে দিয়েছে তাঁর আশাকে। ফির ইনকিলাব হতে পারে মুর্শিদাবাদে। বদলাতে পারে কিসমত।

দেওয়ানজি লিখেছিলেন, '...হুজুরাইন, পলাশিতে সিরাজের মুসিবতের অন্যতম প্রধান কারণ ছিলাম আমি। বহুকাল আলিবর্দি খাঁর নিমক খেয়ে যে গুনাহের কাজ আমি করেছি, তার জন্য মাফ চাইছি আপনার কাছে। আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। মিরজাফরের জমানায় আমলোগ বড় তকলিফের মধ্যে আছে। তার প্রধান কারণ মিরন। তার মদতে জুলুম চলছে নিরীহ প্রজাদের উপর। মিরন ভয়ংকর। সে আমাদের সকলকেই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চায়। ইংরেজ কোম্পানিও মিরনের উপরে বিরক্ত। আমি মির্জা মেহেদিকে মসনদে বসানোর জন্য ঘুঁটি সাজাচ্ছি। মিরজাফর খাঁর জমানার অবসান ঘটাতে চাই। আশা করি আমার এই প্রস্তাব আপনি মঞ্জুর করবেন।...'

আশায় দুলে উঠেছিল শরফ উন্নেসার মন। সেই সঙ্গে বুক কেঁপে উঠেছিল শঙ্কায়। চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলেছিলেন নানি বেগম। এ চিঠি মির্জার প্রাণ সংশয়ের কারণ হতে পারে।

ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরে শুয়ে নানি বেগমকে জড়িয়ে ধরে মির্জা মেহেদি। তাঁর কপালে চুমু খেলেন শরফ উন্নেসা। ঠিক তখনই বাইরে থেকে ভেসে আসে দরজার উপরে প্রবল করাঘাতের আওয়াজ। ঘরের বাইরে একগাদা লোকের গলার আওয়াজ। কান খাড়া করে থাকেন শরফ উন্নেসা। কথার ভঙ্গিতে বোঝা যায়, লোকগুলো মদ্যপ ও উত্তেজিত। মিরনের অতি জঘন্য দুই শাগরেদ চুনিলাল ও মুন্নিলালের গলার আওয়াজ চিনতে পারলেন নানি বেগম। তাঁর বুক কেঁপে উঠল। এত রাতে মিরনের অনুচরদের এখানে হানা দেওয়ার কী উদ্দেশ্য?

শয়তানেরা দরজা ভাঙার উপক্রম করছে। এখনও ঘুমে অচেতন মির্জা মেহেদি।

শরফ উন্নেসা বুকের মধ্যে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন দৌহিত্রকে।

৩৮

চুনিলাল ও মুন্নিলাল শাগরেদরা মোটা শালের খুঁটি দিয়ে ক্রমাগত ধাক্কা মেরে চলেছে দরওয়াজার উপরে। শব্দের তাণ্ডবে গোটা কক্ষটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। কাঁপছে পোক্ত পাল্লাদুটোও।

মির্জা মেহেদির ঘুম ভেঙে যায়। কী ঘটছে এত রাতে? কোনও দুঃস্বপ্ন না সত্যি ঘটনা? কারা হামলা করতে এসেছে, কারা? নানি বেগম, আম্মিজান ও খালার সঙ্গে সে তো ঘরবন্দি হয়ে আছে চেহেল সেতুনের

অন্দরে এই হাভেলিতে। তবুও হামলা কেন? বিস্ফারিত চোখে চেয়ে এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজে বালক মির্জা। অন্ধকারে হাতের স্পর্শে নানি বেগমকে খোঁজে।

শরফ উন্নেসা উঠে বসেছেন বিছানায়। ভীত, সন্ত্রস্ত। মির্জা ধড়ফড় করে উঠে বসে। ত্রস্ত চোখে দিদিমার মুখপানে চেয়ে শুধোয়, 'কী হয়েছে নানি বেগম? ওরা কারা?'

বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছে বেশ কিছু মানুষের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। আলিবর্দির খানদানের উদ্দেশে বর্ষিত হচ্ছে অশ্রাব্য গালিগালাজ। নাতিকে শক্ত করে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে ভয়ার্ত গলায় শরফ উন্নেসা জবাব দেন, 'জানি না বেটা।'

'ওরা কি কোতল করবে আমাদের?'

'জানি না বেটা। জানি না।'

সহসা দরওয়াজার একটা পাল্লা ভয়ানক যান্ত্রিক শব্দে আছড়ে পড়ে মাটিতে।

ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে নাতি ও দিদিমা দু'জনেই।

কক্ষের অন্দরে প্রবেশ করে চুনিলাল ও মুন্নিলাল। পিছনে তাদের কয়েকজন শাগরেদ। চুনিলালের হাতে লকলক করছে একটা কাঁটাওয়ালা চাবুক।

বিছানা থেকে নেমে এলেন নানি বেগম। মির্জা ভয়ে জড়সড় হয়ে দিদিমার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। অতীতের শাহি মেজাজের ঝাঁঝ ফিরে আসে শরফ উন্নেসার গলায়। ধমকের সুরে শুধোলেন, 'কে তোমরা? কার হুকুমে এখানে জবরজুলুম করতে এসেছ?'

চুনিলাল হেসে উঠে বলে, 'তার কৈফিয়ৎ কি তোমাকে দিতে হবে বুড়ি? হাবুজখানার হাওয়া খেয়েও দেখছি ঠাঁট-ঠমক, রওয়াব যায়নি।'

'খামোশ। বেতমিজ বেয়াদপ কাঁহিকা। কথা বলার তরিবৎ জানো না? পুরোনো জমানা হলে–'

কথা হারিয়ে ফেললেন নানি বেগম। বুকের মধ্যে পাক দিয়ে উঠল বেদনা। 'পুরোনো জমানা হলে'— কথাটা তার নিজের কানেই অর্থহীন প্রলাপের মতো শোনালো।

চুনিলাল ও মুন্নিলাল হেসে উঠল। মুন্নিলাল বলল, 'জানি বুড়ি। পুরোনো জমানা হলে নানি বেগমের হুকুমতে গর্দান যেত আমাদের। তাই তো? লেকিন জমানা বদলে গেছে। তোমার নসিব মন্দ। তড়পাও মাত।'

চাবুক চালিয়ে শূন্যে বাতাস কেটে চুনিলাল বলল, 'বুঝলে বুড়ি, এখন আমরা চাইলে তুর্কি ঘোড়ার সঙ্গে তোমাকে বেঁধে শাহি সড়ক দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিতে পারি। লেকিন নবাবজাদা মিরন আশরফ আদমি। ইতনা সঙ্গদিল নয়।'

'মি-র-ন? মিরন পাঠিয়েছে তোমাদের?' গলা কেঁপে গেল শরফ উন্নেসার। মিরন নিষ্ঠুর, নির্দয়। তারই আরজুতে মওত হয়েছে সিরাজ। ফের কী চায় সে?

শরফ উন্নেসার প্রশ্নের জবাবে মুন্নিলাল বলে, 'জি নানি বেগম। আমরা নবাবজাদার বান্দা।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শরফ উন্নেসা শুধোলেন, 'নবাবজাদার আরমান কী?'

চুনিলাল বলে, 'তাঁর হয়ে তোমাকে রুকসত জানাতে এসেছি বুড়ি।'

বুক কেঁপে উঠল শরফ উন্নেসার। শুধোলেন, 'রুকসত মতলব?'

মুন্নিলাল বলল, 'তোমার দুই বেটি–আমিনা ও ঘসেটির সঙ্গে তোমাকেও ঢাকায় যেতে হবে।'

'নবাবজাদার হুকুম। বুড়িগঙ্গার তীরে জিঞ্জিরা প্রাসাদে কয়েদ হয়ে থাকবে বুড়ি। আখিরাতের ইন্তেজার করবে।' এই বলে পানের ছোপ ধরা দাঁত বের করে বিশ্রি হেসে ওঠে চুনিলাল।

'নবাবজাদার পরোয়ানা কোথায়?' শুধোলেন শরফ উন্নেসা।

চুনিলাল ধমকে ওঠে, 'খামোশ। বেতমিজি মাত করো। নবাবজাদার বাতই কাফি।'

শরফ উন্নেসা রুক্ষ গলায় বললেন, 'তোমাদের জবানে একিন নেই আমার। পরোয়ানা দেখাও।'

'বেয়াদপি মাত করো।' এই বলে চাবুক চালাল চুনিলাল।

যন্ত্রণায় কাতরে উঠলেন নানি বেগম।

নানি বেগমকে জড়িয়ে ধরে মির্জা মেহেদি বলে, 'মারছ কেন? নানি বেগমের গায়ে হাত ওঠাচ্ছ তোমরা? নবাবের কাছে আমি শিকায়ত জানাব।'

মুন্নিলালের দিকে চেয়ে চুনিলাল রসিকতার ছলে বলে উঠল, 'ছোকরা তো নাজুক নয়। বিলকুল তাগদবাজ। শাহি তেজ। ইনসান-ই-কামিল।'

মুন্নিলাল হেসে উঠে মির্জা মেহেদির গাল টিপে দিয়ে বলে, 'শিকায়ত জানালে আমরা যে মুসিবতের মধ্যে পড়ব ছোটে নবাব।'

মির্জা মেহেদি এক ঝটকায় মুন্নিলালের হাতটা সরিয়ে দেয়।

চুনিলাল কয়েক পা এগিয়ে এসে মির্জার মুখোমুখি দাঁড়ায়।

নাতির হাতটা শক্ত করে চেপে ধরেন শরফ উন্নেসা।

'চলো ছোটে নবাব। বেহেস্ত ঘুরে আসি।' মির্জার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে চুনিলাল।

'না-আ-আ। কোথায় নিয়ে যাবে মির্জাকে?' শরফ উন্নেসা আর্তনাদ করে ওঠেন।

চুনিলাল খল হাসি হেসে বলে, 'বেহেস্ত ঘুরে এসে খোকাবাবু নবাব হবে।'

শরফ উন্নেসার বুকটা ছাৎ করে ওঠে। রায়দুর্লভের গোপন পরিকল্পনার কথা এরা কি জেনে ফেলেছে? এরা কি মির্জাকে...আর ভাবতে পারেন না শরফ উন্নেসা। গা-হাত-পা অবশ হয়ে আসতে থাকে তবুও সর্বশক্তি দিয়ে মির্জাকে তিনি জড়িয়ে ধরেন।

চুনিলালের চাবুক ফের এসে পড়ল শরফ উন্নেসার মুখের উপরে। কাঁটার আঘাতে রক্তক্ষরণ হল। তীব্র যন্ত্রণায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন শরফ উন্নেসা।

শয়তান মুন্নিলাল চোখের নিমেষে পাঁজাকোলা করে মির্জা মেহেদিকে তুলে নেয়। মুন্নিলালের শক্ত দুই হাতের বাঁধনের মধ্যে বলির পাঁঠার মতো ছটফট করতে থাকে মির্জা মেহেদি।

উঠে এসে ফের চুনিলাল ও মুন্নিলালকে বাধা দিতে উদ্যত হন শরফ উন্নেসা। এই সময় কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে একদল সেপাই। তারা নানি বেগমের পথ আটকায়।

'মির্জা আমার মির্জা! রহেম করো। তোমরা আমার মির্জাকে রহেম করো। ওকে বাঁচতে দাও।'

কান্নায় ভেঙে পড়েন নানি বেগম। হুকুমের দাস সেপাইরা নিমেষের মধ্যে পিছমোড়া করে বেধে ফেলে তাঁর দুই হাত। তারপর তাঁকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যায় কেল্লাঘাটের দিকে।

ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে নৌবহর। শরফ উন্নেসাকে বলপূর্বক একটা বজরায় নিয়ে তোলে সেপাইরা। পিছনের দুটি বজরায় আগেই তোলা হয়েছে আলিবর্দির দুই মেয়ে আমিনা বেগম ও ঘসেটি বেগমকে। দুজনেই ভাঙ-আফিমের নেশায় অচেতন।

ভাগীরথীর জল কেটে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হল নৌবহর। মাঝনদীতে এসে শরফ উন্নেসার হাতের বাঁধন খুলে দিল পাহারায় নিযুক্ত দুই সেপাই। এরা আলিবর্দির আমল থেকে নিজামতের নোকরিতে আছে। আলিবর্দির নিমক খেয়েছে। একদা দোর্দণ্ডপ্রতাপ বেগমসাহেবার বেইজ্জতি দেখে দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছিল এদের। কিন্তু এদের তো কিছু করার নেই। এরা মাস মাইনের চাকর। হুকুমের দাস। শুধু মসনদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশই এদের একমাত্র কাজ। তবুও বিবেকের দায় থাকে কারও কারও। দৈহিক, মানসিক যন্ত্রণায় চুরচুর হয়ে যাওয়া সিরাজের নানি বেগম খেয়াল করতে পারলেন না, এই দুই সেপাইয়ের চোখের কোণায় চিকচিক করছিল জল।

একজন মাথা নুইয়ে অস্ফুট স্বরে বলল, 'বেয়াদপি-গোস্তাকি মাফ করবেন হুজুরাইন।'

শরফ উন্নেসা জানালা দিয়ে চেয়ে রয়েছেন বাইরের উন্মুক্ত আকাশের দিকে। জনৈক সেপাইয়ের এই গুজারেশ তাঁর কানে গেল না। দুই সেপাই ধীর পায়ে কক্ষের বাইরে গিয়ে বাইরে থেকে হুড়কো এঁটে দিল দরজায়।

দ্রুত দাঁড় বাইছে মাঝিরা। নবাবজাদার হুকুম ভোর হওয়ার আগেই মুর্শিদাবাদ থেকে অনেকটা দূরে চলে যেতে হবে। আকাশে ঝকঝক করছে হিরের কুচির মতো উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি। শরফ উন্নেসা চেয়ে রয়েছেন বাইরের দিকে। অনেক দূরে চোখে পড়ছে চেহেল সেতুনের বুরুজে, মিনারে জ্বলতে থাকা অজস্র চিরাগের বিন্দু বিন্দু আলো। আঁধারে সব মিলিয়ে যাবে একটু পরেই।

'মির্জা! আমার মির্জা!' চিৎকার করে উঠে ফের কান্নায় ভেঙে পড়লেন নানি বেগম।

ফুরিয়ে আসছে রাত। নবাবজাদার হুকুম—কাজটা সারতে হবে রাত শেষ হওয়ার আগে।

ভয়ে মির্জা মেহেদির গলা শুকিয়ে কাঠ। চোখদুটো বিস্ফারিত। নরম গালদুটো ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে। মুখে টুঁ-শব্দটি করার উপায় নেই। ঘাতকেরা তার মুখটা বেঁধে দিয়েছে শক্ত করে। বালক মির্জা বুঝতে পারছে তার জীবনের অন্তিমক্ষণ উপস্থিত।

চেহেল সেতুনের অভ্যন্তরে খোলা আকাশের নীচে পাথরের চাতালের উপরে একটা চওড়া তক্তার উপরে মির্জাকে শুইয়ে দিল মুন্নিলাল। তক্তার চার কোণায় চারটে কাঠের দণ্ডের সঙ্গে বেঁধে দিল মির্জার দুটো হাত ও দুটো পা। তীব্র যন্ত্রণায় বিকৃত হল মির্জার সুকুমার মুখটা। তার চোখের ভাষায় ধরা পড়ল বাঁচার আকুতি। কিন্তু জল্লাদেরা নির্মম।

কাড়ানাকাড়ার শব্দে কান পাতা দায়। বাজনা বাজিয়ে হুল্লোড়ে মেতেছে ঘাতকবাহিনী। নিরীহ মানুষকে খুন করা এদের কাছে একরকমের রগড়। হঠাৎ থেমে গেল বাজনদারেরা। সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সকলে। নবাবজাদা মিরন এসে হাজির হয়েছে অকুস্থলে।

মির্জার বুকের উপরে এক পা তুলে সামনে ঝুঁকে পড়ে বিশ্রি রকমের হেসে উঠল মিরন। নিস্তেজ হয়ে পড়েছে মির্জা। তার মুখের উপরে একদলা থুতু ফেলে মিরন বলে উঠল, 'শালা খরিশের বাচ্চা! নবাব বনেগা?'

ভয়ার্ত চোখে মিরনের মুখপানে চেয়ে রইল মির্জা মেহেদি।

'তক্তা লে আও।' মির্জার বুকের উপর থেকে পা সরিয়ে নিয়ে চুনিলালকে হুকুম করল মিরন।

চুনিলালের চোখের ইশারায় বেশ মজবুত একটা তক্তা মির্জার বুকের উপরে চাপিয়ে দিল তাগড়াই চেহারার কয়েকজন যুবক। এরা সব দুষ্কৃতী। চুনিলাল ও মুন্নিলালের কুকর্মের দোসর। বালক মির্জার গোটা শরীর ঢেকে যায় ওই তক্তায়। শুধু মুখমণ্ডল উন্মুক্ত। জেগে আছে শুধু ভয়ার্ত চোখদুটো। চোখ ও মুখের অভিব্যক্তিতে কলিজা বিদীর্ণ হওয়া মানুষের মরণযন্ত্রণা চাক্ষুষ না করলে এই জল্লাদদের খুনজোশি স্তিমিত হবে না। যেন এক পরম কৌতূকের আস্বাদ নিতে মাটিতে শায়িত মির্জাকে ঘিরে দাঁড়াল সকলে।

'সরফরাজ কাহা হ্যাঁয়।' হাঁক ছাড়ে মিরন।

'সফরাজ হাজির হুজুর। উহা খাড়া হ্যায়।'

মুন্নিলালের অঙ্গুলিনির্দেশ লক্ষ্য করে তাকিয়ে মিরন দেখল চাতালের এক কোণায় দাঁড়িয়ে শুঁড় দোলাচ্ছে সরফরাজ। পাহাড়ের মতো চেহারার মদ্দা হাতি। গায়ের রং অন্ধকারে প্রায় মিশে গিয়েছে। ঝকঝক করছে দুটো শাদা দাঁত। জ্বলজ্বল করছে দুই চোখ।

চুনিলাল বলে, 'ভাতের সঙ্গে সিরাজি মিশিয়ে দিয়েছিলাম হুজুর। হাতি মস্ত হয়েছে।'

মিরন খুশি হয়ে বলে, 'বহুত আচ্ছা। জবরদস্ত রগড় হবে।'

চুনিলালের নির্দেশে ফের বেজে উঠল কাড়ানাকাড়া। মাহুত হাতিটাকে নিয়ে এল চাতালের মাঝখানে। বাজনার তালে তালে মাথা দোলাচ্ছে শরাবের নেশায় মত্ত হাতি। মির্জা মেহেদির চোখদুটো ভয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মাহুতের নির্দেশে মাতাল মদ্দা পাহাড়ের আকৃতির হাতিটা উঠে পড়ল মির্জার বুকে চাপানো তক্তার উপরে।

পৈশাচিক আনন্দে নাচতে শুরু করল চুনিলাল, মুন্নিলাল ও তাদের শাগরেদরা।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে স্থির হয়ে গেল মির্জার চোখদুটো। চোখের কোণ দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল রক্ত। মুখের বাঁধন ভিজে উঠল রক্তে। কাঠের পাটাতনের নীচ থেকে বেরিয়ে এসে কালো পাথরে মোড়া চাতালের উপর ছড়িয়ে পড়তে লাগল উষ্ণ রক্তস্রোত।

আলিবর্দির শেষ উত্তরাধিকারীর রক্তে ভিজল চেহেল সেতুনের বোবা পাথর।

'খেল খতম।' এই বলে হাততালি দিয়ে সজোরে হেসে উঠল মিরন।

নবাবজাদাকে খুশি করার জন্য বাজনদারেরা আরও তীব্র করল বাজনার আওয়াজ। কোমর দুলিয়ে অশ্লীল ভঙ্গিতে নাচছে চুনিলাল, মুন্নিলাল ও তাদের শাগরেদরা। তখন ভোর হয়ে আসছে। ধীরে ধীরে ফিকে হচ্ছে আকাশের কালি।

রবার্ট ক্লাইভ ফৌজ নিয়ে এলেও ইনকিলাব হবে না। মির্জা মেহেদিকে হত্যা করে রায়দুর্লভের চাল সে ভেস্তে দিয়েছে। লাওয়ারিশ আলিবর্দির খানদান। মিরন খুশি। কিন্তু অন্য এক ভাবনা এখন তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। নবাব মুর্শিদাবাদে নেই। ক্লাইভ রাজধানীতে এসে পৌঁছলেন বলে। মির্জা মেহেদির হত্যার খবর শুনে কী প্রতিক্রিয়া হবে সাধারণ মানুষের মনে, কী বলবেন কর্নেল ক্লাইভ?

তবে ক্লাইভের রক্তচক্ষু দর্শনের চেয়েও এই মুহূর্তে নবাবজাদার মনের মধ্যে বেশি করে চেপে বসেছে গণরোষের ভয়। সিরাজদ্দৌলার মওতের পরেও ক্ষিপ্ত হয়েছিল আমলোগ। তবে সে সময় হাজির ছিল গোরা পল্টন। আগুনে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছিল তারাই।

ক্লাইভ আসছেন ফৌজ নিয়ে। গোলমাল কিছু হলে এবারেও সামলে দেবে গোরা পল্টন। কড়া ভাবে ইংরেজ সাহেবরা হয়তো কিছু কথা শোনাবে তাকে। তাতে এমন ক্ষতি কী? ইনকিলাবের আনজাম তো বানচাল করে দেওয়া গেল। এই ভেবে দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে চাইল মিরন। দেহরক্ষী পরিবৃত হয়ে খোশমেজাজে ঘোড়া হাঁকিয়ে সে ছুটে চলল জাফরাগঞ্জ প্যালেসের দিকে। পুবাকাশ লাল। সূর্যের রং ডিমের কুসুমের মতো।

ভোরের আলো আর একটু জোরালো হতেই জেগে উঠল চকবাজার। রোজ যেরকম জেগে ওঠে। মির্জা মেহেদির হত্যা-কাহিনি চেহেল সেতুনের বান্দা-দাখিলা-গোলাম-বাঁদিদের মুখ থেকে দ্রুত চাউর হল বাইরে। এই নৃশংস হত্যার কাহিনি শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল তামাম চকবাজার।

বাতাসে খবর যখন ওড়ে, তখন নানা রঙের ছোপ লাগে তার গায়ে। এখানেও সে নিয়মের ব্যত্যয় হল না। খবরটা লোকের মুখে ছড়াতে ছড়াতে এইরকম আকার নিল, '...মিরনের হাতে খুন হয়েছে বালক মির্জা মেহেদি। বুকের উপর হাতি চড়িয়ে পিষে মারা হয়েছে তাকে। শুধু মির্জা মেহেদি নয়, আমিনা বেগম, ঘসেটি বেগম ও আলিবর্দির বেগম শরফ উন্নেসাকেও খুন করেছে মিরন। খতম আলিবর্দির খানদানের সকলে। লাশগুলো গোপনে গোর দেওয়ার আনজাম চলছে চেহেল সেতুনেরই অন্দরে। এই কাজে মিরনের দোসর ছিল তার ইয়ারদোস্ত জঘন্য দুই শয়তান চুনিলাল ও মুন্নিলাল।...'

ক্ষিপ্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল সাধারণ প্রজারা। মুখগুলো গম্ভীর। থমথমে। জোড়াজোড়া অজস্র চোখে জ্বলছে আগুন। রাগে ফুঁসছে সকলে। দলে দলে তারা চলেছে চেহেল সেতুনের দিকে। তারা

এই জঘন্য হত্যা কান্ডের বিচার চায়। তাদের মুখ থেকে ছিটকে আসা উত্তপ্ত বাক্য থেকে গণবিস্ফোরণের আঁচ পাচ্ছে চকবাজার। ফের অশান্ত হতে চলেছে রাজধানী। তড়িঘড়ি ঝাপ ফেলতে লাগল চকবাজারের দোকানপাট। সবে চবুতরার নীচে ফুল সাজিয়ে বসেছিল গুলাব-গুলদস্তার কারবারিরা। পসরা নিয়ে দ্রুত সরে পড়ল তারা। আমজনতার আগুনে মেজাজ দেখে সরে পড়ল চৌরাহায় মোতায়েন কোতোয়ালির সেপাইরাও।

মিরনের হুকুম অনুযায়ী চেহেল সেতুনের অন্দরেই মির্জা মেহেদির দেহকে সমাহিত করার আনজাম করছিল চুনিলাল-মুন্নিলাল ও তাদের শাগরেদরা। সহসা তাদের কানে ভেসে এল তুমুল গোলমালের আওয়াজ। কেল্লার এক বুরুজে উঠে দৃশ্যটা দেখে হাড় হিম হয়ে গেল চুনিলালের। চেহেল সেতুনকে ঘিরে ধরেছে কাতারে কাতারে মানুষ। তারা বিক্ষুব্ধ, উত্তেজিত।

সহসা একটা পাথরের টুকরো ভিড়ের মধ্যে থেকে চেহেল সেতুনের দরওয়াজার উপরে এসে পড়ল। তারপরে শুরু হল মুহুর্মুহু পাথর বৃষ্টি। কয়েকটা পাথর চেহেল সেতুনের দিবার টপকে অন্দরে এসে পড়ল। সেই সঙ্গে ভেসে আসতে লাগল মানুষের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। মির্জা মেহেদির হত্যার বিচার চাইছে এরা। শাস্তি চাইছে ঘাতকদের।

ভয়ে ধরল চুনিলাল ও মুন্নিলালের মনে। কী করে চেহেল সেতুনের বাইরে বেরোবে তারা!

নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করে মির্জা মেহেদির শবদেহকে ফেলে রেখে দ্রুত কেল্লার পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল শয়তানের দল। গলার উড়নি দিয়ে ঘোমটার মতো করে মাথা ঢাকা সকলের। জাফরাগঞ্জ প্যালেসের উদ্দেশে তারা ছুটে চলল।

৩৯

শেষরক্ষা হল না। একদল মানুষ চিনে ফেলল চুনিলাল ও মুন্নিলালকে। তাদের তাড়া করল উন্মত্ত জনতা। শয়তানেরা প্রাণভয়ে ছুটতে লাগল। গত কয়েকমাস ধরে এদের জুলুমাতে পরেশান হয়েছে অজস্র মানুষ। এরা লুঠপাট করেছে, কারও ঘর পুড়িয়েছে আগুনে, কারও বহেন বা আওরতকে ঘর থেকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়েছে, ধর্ষণ করেছে, যারা সামান্য প্রতিবাদ করেছে তাদের খুন করে লাশ ভাসিয়ে দিয়েছে ভাগীরথীর জলে। এদের প্রশ্রয়ে শহরের সর্বত্র ফিলহাল দাপিয়ে বেড়ায় দুষ্কৃতীরা। চকবাজারের অলিগলিতে প্রকাশ্যে বিকোয় নিষিদ্ধ মাদক।

এক কথায় মিরনের মদতে মুর্শিদাবাদ নগরীকে দোজখ করে তুলেছিল চুনিলাল ও মুন্নিলাল। আজ ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে মানুষের। নিরীহ বালক মির্জা মেহেদির রক্ত যেন আগুন জ্বেলে দিয়েছে আম-আদমির শিরায় শিরায়। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার আদিম নেশায় চুনিলাল ও মুন্নিলালের পিছনে ধেয়ে আসছে তারা। এই দলে চকবাজারের কাপড়ের কারবারি মধ্যবয়সী আফতাব যেমন আছে, তেমনি আছে ফৌজ থেকে বহিষ্কৃত সিরাজদ্দৌলার অনুগত রাজপুত আহেদি কেশবলাল।

আফতাবের দোকান লুঠ করে, আগুনে পুড়িয়ে তার রমরমা কারবারকে ছারখার করেছে চুনিলালের পোষা গুণ্ডারা। আর কেশবলালকে খুঁটিতে বেধে রেখে তার চোখের সামনেই তার বিবির ইজ্জত লুটেছিল মুন্নিলাল। আত্মঘাতী হয়েছে কেশবলালের বিবি। আফতাবের হাতে বাঁশের লাঠি। কেশবলালের হাতে বল্লম। রাজশক্তি যখন দিনের পর দিন অরাজকতাকে মদত দিয়ে চলে, তখন এভাবেই হঠাৎ জেগে ওঠে জবরজুলুম, জুলমাতের শিকার জনতা। এর পরিণতি ভয়ানক।

ছুটছে চুনিলাল। ছুটছে মুন্নিলালও। সেই সঙ্গে ছুটছে তাদের তিন শাগরেদ। নিজামত কেল্লা থেকে ভাগীরথীর তীর বরাবর বাঁধের উপরে সড়ক দিয়ে জাফরাগঞ্জ প্যালেসের দিকে পাগলের মতো ছুটছে

শয়তানেরা। পিছনে উন্মত্ত কয়েকশো মানুষ। শয়তানদের উদ্দেশে কামানের গোলার মতো উড়ে আসছে একের পর এক পাথরের টুকরো।

একটা পাথর এসে লাগল চুনিলালের মাথায়। পথের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে। রক্ত বেরোচ্ছে গলগল করে। পাথরের ঘায়ে মুন্নিলাল ও বাকিরাও কমবেশি আহত।

চুনিলাল পড়ে রইল পথে। ছুটতে লাগল মুন্নিলাল ও বাকিরা। খুব কাছে এসে পড়েছে পিছনে ধেয়ে আসা জনতা। এদের হাতে পড়লে নিমেষে থেঁতলে মারবে। মুন্নিলাল ও তার তিন সঙ্গী ভাগীরথীতে ঝাঁপ দিয়ে ডুবসাঁতারে পালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সড়ক ছেড়ে বাঁধের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে যেতে লাগল নীচের দিকে।

পিছন থেকে ছুটে আসা কয়েকশো মানুষের পায়ের চাপে থেঁতলে গেল চুনিলাল।

ঢাল বেয়ে নীচে নেমে নদীর চরের উপর দিয়ে ছুটছে মুন্নিলাল ও তার সঙ্গীরা। গায়ের সর্বশক্তি দিয়ে বল্লমটা ছুড়ে মারল কেশবলাল। রাজপুত আহেদির নিখুঁত নিশানা। ভারী বল্লমটা গিয়ে বিঁধল মুন্নিলালের পিঠে। বালির চরের উপরে মুখ থুবড়ে পড়ল মুন্নিলাল। বল্লমটা তাকে এফোড়-ওফোড় করে দিয়েছে। ভাগীরথীর শুকনো বালুচর ভিজে উঠল চাপচাপ রক্তে। বাকিরা ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ভাগীরথীর জলে। ডুবসাঁতারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মাটির উপরে পড়ে আছে চুনিলালের রক্তাক্ত দেহটা। প্রাণ আছে এখনও। কাতরাচ্ছে যন্ত্রণায়। প্রায় অর্ধচেতন অবস্থা। তবুও উন্মত্ত ক্রোধে বড় একটা পাথরের চাঁই দিয়ে তাকে আঘাত করতে উদ্যত হল একজন। তাকে থামাল আফতাব। চুনিলালের অন্তিমক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে। অনেক কষ্টে উপুড় হয়ে থাকা অবস্থা থেকে চিৎ হল সে। চোখদুটো বিস্ফারিত। গোটা মুখমণ্ডল মাথার চুল, রক্তে ভাসাভাসি। থরথর করে কাঁপছে দেহ। মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে হাতদুটো জড়ো করে অনেক কষ্টে চুনিলাল বলে উঠল, 'আ-স্তা-গ-ফে-রু-ল্লা-হ।'

তারপর তার মাথাটা হেলে গেল একদিকে। নিথর, নিঃসাড় হয়ে গেল দেহটা। অদূরে ভাগীরথীর চরে পড়ে রয়েছে মুন্নিলাল। মৃত, নিস্পন্দ।

স্তিমিত হয়েছে খুনজোশি। শান্ত হয়েছে জনতা। কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে তারা। একদিকে উল্লাস, অন্যদিকে ফৌজদারি কিসসায় জড়িয়ে পড়ার ভয়। সহসা দূর থেকে ভেসে এল ঘোড়ার খুরের শব্দ। লোকজন চমকে তাকিয়ে দেখল তির বেগে ধেয়ে আসছে একদল ঘোড়সওয়ার। আকাশে উড়ছে কোম্পানির নিশান। গুঞ্জন উঠল, 'গোরা পল্টন। গোরা পল্টন।'

নিমেষে ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুটে পালাল জনতা।

ক্লাইভ পৌঁছে গিয়েছেন কাশিমবাজারে। আসবেন মুর্শিদাবাদে। তিনি পৌঁছনোর আগে রাজধানীর হালহকিকত পর্যবেক্ষণ করতে আগাম কোনও খবর না দিয়েই মুর্শিদাবাদে এসে হাজির হলেন স্ক্র্যাফটন। সঙ্গে তার ডেপুটি ওয়ারেন হেস্টিংস ও একশো ঘোড়সওয়ার গোরা পল্টন।

গতরাতে যে কী ভয়ানক কাণ্ড ঘটে গিয়েছে, সে বিষয়ে কিছুই জানতেন না স্ক্র্যাফটন ও হেস্টিংস। চেহেল সেতুন লাগোয়া চকবাজারে পা দিয়ে উত্তাপের আঁচ পেলেন তাঁরা। ফাঁকা পথঘাট। বন্ধ দোকানপাট। শুধু জায়গায় জায়গায় জটলা লোকজনের। সকলের চোখমুখ থমথমে।

খটকা লাগল স্ক্র্যাফটনের মনে। মুর্শিদাবাদ নগরীর সঙ্গে তার পরিচয় অনেকদিনের। চকবাজারের মেজাজ বোঝেন। এই সময় প্রতিদিনই জমজমাট থাকে চকবাজার। পালকি, উটের গাড়ি, হাতি, ঘোড়ার চলাচলে, মানুষের কোলাহলে ব্যস্ত থাকে গোটা এলাকাটা। রকমারি পসরায় ঝলমল করে স্থায়ী দোকানপাটগুলো। চবুতরার নীচে পসরা সাজিয়ে বসে পড়ে অস্থায়ী দোকানদারেরা। রাস্তার পাশে মজুত থাকে সারি সারি

ভাড়ার পালকি। খদ্দের ধরতে হাঁকডাক করে ছাতাবরদারেরা। নানা ধান্দায় ছুটতে থাকে ব্যস্তসমস্ত মানুষ। আজ সেই চেনা ছবিটা উধাও কেন?

গত রাতে মিরনের হাতে কোতল হয়েছে মির্জা মেহেদি। খুন হয়েছেন শরফ উন্নেসা, আমিনা বেগম, ঘসেটি বেগম– চকবাজারের পথে জটলারত মানুষের মুখ থেকে কথাটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন স্ক্র্যাফটন ও হেস্টিংস।

মাস দুয়েক আগে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে যাওয়ার আগে কর্নেল ক্লাইভ সতর্ক করে গিয়েছিলেন নবাবকে— আলিবর্দির রিশতেদারেরা সকলে যেন সুরক্ষিত থাকে। তাদের উপরে কোনও জুলমাত যেন না হয়। সাধারণ কয়েদির মতো অন্ধকার কারাকক্ষে না রেখে আলিবর্দির খানদানের সকলকে চেহেল সেতুনের অন্দরে কোনও একটা হাভেলিতে সম্মানের সঙ্গে গৃহবন্দি করে রাখলে মানুষের ক্ষোভ প্রশমিত হবে। এতে নবাব ও ইংরেজ দু'পক্ষেরই লাভ। ক্লাইভ বুঝেছিলেন, আলিবর্দির প্রতি এদেশের প্রজাদের বড় একটা অংশের অসীম শ্রদ্ধা ও আনুগত্য রয়েছে। আলিবর্দির দৌহিত্রকে মসনদ থেকে সরানোর সাজিসে অংশ নিয়ে বহু মানুষের বিরাগভাজন হয়েছে ইংরেজরা। তবে সিরাজকে হত্যার কোনও পরিকল্পনা তাদের ছিল না। সিরাজকে সম্মানের সঙ্গে গৃহবন্দি করে রাখার কথা বলেছিলেন ক্লাইভ। কিন্তু মিরনের আহাম্মকিতে মওত হল সিরাজদ্দৌলার। এতে কালি লাগল ইংরেজদের গায়েও। অনেকের ধারণা হয়েছিল সিরাজকে হত্যার পিছনে ইংরেজদের মদত রয়েছে। এই কালি অনেক কোশিশ করেও মুছতে পারছে না ইংরেজরা।

এই সময়ে এই উটকো ঝামেলা। মিরনের এই আহাম্মকিতে কর্নেল ক্লাইভ যে ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন, তা আন্দাজ করতে পারছেন স্ক্র্যাফটন। রেসিডেন্ট হিসেবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না রাখতে পারার জন্য তিরস্কৃত হবেন তিনিও।

রাগে ফুঁসতে লাগলেন স্ক্র্যাফটন। হেস্টিংসও ভয়ানক বিরক্ত। বেওকুফ নবাবজাদার জন্য বার বার বেকায়দায় পড়তে হচ্ছে ইংরেজদের। গোটা বাহিনীকে চেহেল সেতুন অভিমুখে মার্চ করার হুকুম দিলেন স্ক্র্যাফটন। কী ঘটেছে তা তিনি নিজের চোখে দেখতে চান।

গণরোষে চুনিলাল ও মুন্নিলালের মৃত্যুর খবরটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হালকা হতে শুরু করেছিল চেহেল সেতুনের সামনে জড়ো হওয়া মানুষেরা। তবু এখনও জমায়েত আকারে বেশ বড়। এরা মির্জা মেহেদি, আলিবর্দির বেগম, আমিনা বেগম, ঘসেটি বেগমকে শেষ দেখা দেখতে চায়।

গোরা ঘোড়সওয়ারদের চেহেল সেতুনের দিকে আসতে দেখে জনতা পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল। যে উত্তেজিত লোকজন আস্ফালন করছিল, তারা শান্ত হয়ে গেল। অদ্ভুতরকম নিশ্চুপ হয়ে গেল কোলাহলমুখর মানুষ। চেহেল সেতুন থেকে বেশ কিছুটা তফাতে গিয়ে দাঁড়াল তারা। এর কারণ ভয়—দহসত। পলাশির যুদ্ধের পর থেকে ইংরেজদের সম্বন্ধে এদেশের নবাব-মনসবদার-জমিদারদের মতো সাধারণ প্রজাদের মনে প্রবল ভীতির সঞ্চার হয়েছে। মিরজাফর খাঁ গদ্দারি করে যতই ফৌজ নিয়ে নিষ্ক্রিয় থাকুন না কেন, মিরমদন, মোহনলাল ও সিরাজের বাহিনীর সম্মিলিত শক্তি তো কম ছিল না। তা সত্ত্বেও মাত্র আড়াই হাজার ফৌজ নিয়ে পলাশিতে জয় হাসিল করে নিল ইংরেজরা? এটা যেন তামাম মুর্শিদাবাদের মানুষ এখনও ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না।

কাশিমবাজার থেকে ইংরেজবাহিনী এসে পৌঁছেছে। এসেছেন স্ক্র্যাফটন সাহেব। এই পরিস্থিতিতে নিজেকে পুরোপুরি নিরাপদ মনে করে হাভেলি থেকে বেরিয়ে এলেন দেওয়ান রায়দুর্লভ। তিনিই স্ক্র্যাফটন ও হেস্টিংসকে নিয়ে গেলেন চেহেল সেতুনের অন্দরে।

সেই অভিশপ্ত চাতালের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন স্ক্র্যাফটন হেস্টিংস ও রায়দুর্লভ।

'ও মাই গড!' শিউরে উঠলেন স্ক্র্যাফটন। বীভৎস দৃশ্যটা সহ্য করতে না পেরে চোখ বুজলেন হেস্টিংস। চাতালের এক কোণায় পড়ে আছে মির্জা মেহেদির শবদেহ। হাতির পায়ের চাপে দুরমুশ হয়ে গিয়েছে ছোট্ট দেহটা। একদলা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছে। শুধু মুখমণ্ডল অক্ষত আছে। চোখ দুটো খোলা। যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। নাক ও মুখে শুকিয়ে আছে রক্ত। রায়দুর্লভের হুকুমে এক দাখিলা এসে শবদেহের উপরে একটা শাদা চাদর বিছিয়ে দিল।

স্ক্র্যাফটন ও হেস্টিংস গোটা চেহেল সেতুন ঘুরেও আলিবর্দির বেগম ও দুই বেটির হদিশ পেলেন না। যে হাভেলিতে তাঁরা বন্দি হয়েছিলেন সেই হাভেলি তছনছ হয়ে আছে। রায়দুর্লভও স্তম্ভিত। এ সব ঘটনার বিষয়ে কোনও জানকারি তাঁর নেই। গোলাম-বাঁদি-হাজিরা-দাখিলাদের প্রশ্ন করে কোনও সদুত্তর পাওয়া গেল না। কেউ বললে জানা নেই, কেউ বললে আলিবর্দির রিশতেদারদের হত্যা করে ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন স্ক্র্যাফটন ও হেস্টিংস।

'নবাবজাদা কোথায়?'

স্ক্র্যাফটনের প্রশ্নের জবাবে রায়দুর্লভ বললেন, 'জাফরাগঞ্জে।'

'স্কাউন্ড্রেল। স্টুপিড। উই মাস্ট টিচ হিম অ্যা লেসন।'

চেহেল সেতুনের এক বুরুজের উপরে এসে দাঁড়ালেন হেস্টিংস, স্ক্র্যাফটন ও রায়দুর্লভ। অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে মানুষের সারি সারি মাথা। এখনও জমায়েত হয়ে আছে বহু লোক।

হেস্টিংস শুধোলেন, 'আর দ্য মব অ্যাংরি উইথ আস?'

রায়দুর্লভ বললেন, 'না জনাব। এই ঘটনার জন্য কোম্পানি বা নবাব কাউকেই দুষছে না এরা। দুষছে কেবল নবাবজাদাকে। শুনলাম, আর একটা আরজু আছে এদের। এরা চায় মির্জা মেহেদিকে খোশবাগে দাফন করা হোক।'

হেস্টিংস বললেন, 'বেশ তো। আপনি জানেজার আনজাম করুন।

স্ক্র্যাফটন বললেন, 'ওয়ারেন—লেটস গো টু জাফরাগঞ্জ।'

মির্জা মেহেদিকে হত্যার পরিকল্পনার কথা জানতেন না রাজবল্লভ। ভোরে ঘুম থেকে উঠে সব শুনে হাড় হিম হয়ে যায় তাঁর। ততক্ষণে উত্তেজিত মানুষের ভিড় জমতে শুরু করেছে রাজপথে। নিজের হাভেলিতে বসেই বিক্ষোভের আঁচ পেলেন রাজবল্লভ। বিপদ আন্দাজ করে তড়িঘড়ি তিনি ছুটে এলেন জাফরাগঞ্জে। প্যালেসের সব দরওয়াজা বন্ধ করে দেওয়ার হুকুম দিলেন রাজবল্লভ। গণরোষের ভয়ে তিনি ভীত।

রাজধানী যে এতটা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, এসবের কিছুই এখনও জানেন না নবাবজাদা মিরন। ভোর রাতে চেহেল সেতুন থেকে ফিরে তিনি ঘুমিয়ে আছেন নিশ্চিন্তে। অবিলম্বে তাকে সব জানানো দরকার। কিন্তু তার ঘুম ভাঙানোর হুকুমত নেই। মিরনের কক্ষের বাইরে অস্থির চিত্তে পায়চারি করতে লাগলেন রাজবল্লভ।

এক কাসিদ এসে জানাল, চেহেল সেতুন থেকে পালাতে গিয়ে উন্মত্ত জনতার হাতে খুন হয়েছে চুনিলাল ও মুন্নিলাল। তাদের তিন শাগরেদের কোনও খবর নেই। জনরোষ থেকে বাঁচতে তারা ঝাঁপ দিয়েছিল ভাগীরথীতে। ভাঁজ পড়ল রাজবল্লভের কপালে। পরিস্থিতি যে ভয়ানক তা স্পষ্টই তিনি বুঝতে পারছেন। কিন্তু তিনি কী করবেন এখন?

'হুজুর!'

কাদিরের গলা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে ঘুরে তাকালেন রাজবল্লভ।

'নবাবজাদার নিন্দ টুটেছে। আপনাকে ইয়াদ করেছেন। অন্দরে চলুন।'

রাজবল্লভ যা বললেন, তা যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না মিরন। বিস্ফারিত চোখে সে শুধোল, ‘আপনি যা বলছেন সব সত্যি?’

রাজবল্লভ সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে বললেন, ‘জি হুজুর। আপনাকে গলত বাত বলব কেন?’

তবুও যেন একিন হয় না মিরনের। ফের শুধোয়, ‘চুনিলাল ও মুন্নিলালের মওত হয়েছে?

সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে রাজবল্লভ বললেন, ‘জি হুজুর। কাসিদ খবর এনেছে।’

কক্ষে প্রবেশ করে কাদির। মুখে ভয়ের ছাপ। ‘হুজুর!’

‘হুয়া কেয়া?’ কাদিরকে ইয়াদদস্ত করে বিরক্তির সঙ্গে শুধোয় মিরন।

‘চুনিলাল ও মুন্নিলালের লাশ নিয়ে এসেছে কোতোয়ালির সেপাইরা।’

কাদিরের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে হাতের ইশারায় তাকে চলে যেতে বলে মিরন। তার দেহভঙ্গিতে হতোদ্যম ভাবটা প্রকট হয়ে উঠেছে। ঝুলে পড়েছে কাঁধ। ঝুলে পড়েছে নীচের ঠোঁট। গায়েব স্বভাবসুলভ খুনজোশি। সত্যিই সে বিস্মিত। স্তম্ভিত। মির্জা মেহেদির মওতকে ঘিরে কয়েক ঘড়ি সময়ের মধ্যে রাজধানীর হাওয়া যে এমন গরম হয়ে উঠবে, তা সে কল্পনাও করতে পারেনি।

খতম হয়েছে দুশমন। বরবাদ হয়ে গিয়েছে দেওয়ান রায়দুর্লভের মনসুবা। মির্জা মেহেদি জিন্দা নেই। কর্নেল ক্লাইভ ফৌজ নিয়ে এলেও ইনকিলাব হবে না। এই ভেবে ভোর রাতে চেহেল সেতুন থেকে ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছিল মিরন। এমন আরামের ঘুম সে অনেকদিন ঘুমোয়নি।

কিন্তু এর মধ্যে ঘটে গেল এত কাণ্ড! বেহুদা, একদল আনপঢ় আম-আদমি-নিজামতের চাবুক হজম করার জন্য যারা পয়দা হয়, জিন্দেগিভর জুলমাতের শিকার হয়েও ইনসাফ না চেয়ে যারা চিরকাল নিজের বদ-কিসমতিকে জিগরপস্তানির জন্য দোষারোপ করে, তারা কিনা নবাবজাদার দুই ইয়ারদোস্তের গায়ে হাত ওঠাল? খুন করল? নবাবের গুমানির ইয়াদগার চেহেল সেতুনের উপর এরা পাথর ছুড়ে মারছে? নবাবজাদার উপরে নফরতি? কেরাহিয়াত?

প্রবল আক্রোশে ফুঁসতে লাগল মিরন। তার হতচকিত চোখদুটো ধীরে ধীরে ভয়ানক হিংস্র হয়ে উঠল। সহসা তার সব রাগ গিয়ে পড়ল দেওয়ান রাজবল্লভের উপরে। গর্জন করে উঠল মিরন, ‘কী করছিলেন আপনি? আমাকে বেইজ্জত করার জন্যই কি দেওয়ান হয়েছেন?’

ভয়ে কেঁপে উঠে রাজবল্লভ বলেন, ‘হুজুর আমার কসুর কী? খবরটা শুনেই তো আমি ছুটে এসেছি। আপনার প্যালেসের চারিদিকে ফৌজ মোতায়েন করেছি। মির্জা মেহেদিকে খতম করার মনসুবা তো আমার জানা ছিল না। জানলে আগে থেকে হুঁশিয়ার হতাম।’

‘খামোশ। ফৌজ, তোপ হাতি, ঘোড়া, বন্দুকচি, ধানুকি–স্রেফ কিছু বেহুদা ইনসানের মোকাবিলা করার জন্য? নবাবজাদা নালায়েক? বুজদিল?’

‘এছাড়া আর কী করার ছিল হুজুর? আপনাকে সালামত রাখার জন্য জাফরাগঞ্জকে ঘিরে ফৌজ মোতায়েন করা ছাড়া তখন কী আর করতে পারতাম আমি?’

কিছু একটা বলতে গিয়ে থমকে গেল মিরন। উত্তেজনায় পায়চারি করতে লাগল।

রাজবল্লভ বললেন, ‘মির্জা মেহেদির লাশ চেহেল সেতুনের অন্দরে এখনও পড়ে আছে।’

থমকে দাঁড়িয়ে মিরন শুধোল, ‘সে কী? কেল্লার অন্দরেই তো দাফনের হুকুম ছিল।’

‘আমআদমি কেল্লা ঘিরে ধরেছিল। লাশ ফেলে পালায় চুনিলাল ও মুন্নিলাল।’

'গ্রেফতার হয়েছে?'

'কার কথা বলছেন?' প্রশ্ন করেন রাজবল্লভ।

'চুনিলাল ও মুন্নিলালের খুনিয়ারালোগ গ্রেফতার হয়নি?'

রাজবল্লভ জবাব দেন, 'কে গ্রেফতার করবে? পালিয়ে গিয়েছে কোতোয়ালির সেপাইরা।'

'সব শালা ডরপোক—বুজদিল কাঁহিকা।'

এই বলে পায়চারি করতে করতে প্রবল উত্তেজনায় ফের চেঁচিয়ে ওঠে মিরন। 'বেইজ্জতি! ঘোর বেইজ্জতি! কভি বরদাস্ত করব না আমি।'

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকেন রাজবল্লভ।

মিরন ফের গর্জন করে, 'আমলোগের ইতনা হিম্মত হয় কী করে? এদের মদতদার কে?'

রাজবল্লভ বলে, 'কেউ নয় হুজুর। নিজেদের খুশখেয়ালেই তারা—'

রাজবল্লভকে বাধা দিয়ে মিরন বলে উঠল, 'সব শালা কুত্তাকে জাহান্নামে পাঠাব আমি। আভি মওত নাচবে। চুনিলাল ও মুন্নিলালকে যারা খতম করেছে, তাদের ঘরে আগ লাগিয়ে দিন। সেই আগুনে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারুন বেতমিজদের।'

শিউরে উঠলেন রাজবল্লভ। কী বলছে এই নির্বোধ ছোকরা? এতে রাজধানী যে আরও গরম হয়ে উঠবে। দেওয়ানকে স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ধমকের সুরে মিরন বলে উঠল, 'এখানে খাড়া হয়ে আছেন কেন? হুকুম তামিল করুন জলদি।'

রাজবল্লভ বললেন, 'লেকিন হুজুর–'

কড়া চোখে রাজবল্লভের দিকে তাকায় মিরন।

সহসা ভেসে এল গোলমালের আওয়াজ। ব্যস্ত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করল কাদির।

বিরক্তির সঙ্গে মিরন শুধোয়, 'ফির কেয়া হুয়া?'

কাদির বলে, 'হুজুর, প্যালেসের দুয়ারে হাজির রেসিডেন্ট সাহেব। সঙ্গে গোরা পল্টন।'

মিরনের তড়পানি, হম্বিতম্বি, খুনজোশি নিমেষে স্তিমিত হয়ে গেল। 'ইতনা জলদি?' এই বলে জানলার কাছে ছুটে গিয়ে মিরন দেখল, প্যালেসে ঢুকতে স্ক্র্যাফটন ও হেস্টিংসকে বাধা দিচ্ছে নিজামতের সেপাইরা। আগুনে মেজাজে ভয়ানক তম্বি করছেন স্ক্র্যাফটন। সঙিন উঁচিয়ে ধরেছে গোরা পল্টনেরা। হাতাহাতি বাধবার উপক্রম।

সহসা শূন্যে গুলি ছুড়ে বসল কয়েকজন গোরা পল্টন।

রাজবল্লভ বললেন, 'রেসিডেন্ট সাহেবের সঙ্গে কাজিয়া বাধালে ভয়ানক কাণ্ড হয়ে যাবে হুজুর। নবাবের সঙ্গে কোম্পানির রিশতেদারি টুটে যাবে। নবাব দায়ী করবেন আপনাকেই।'

কেমন যেন অসহায় বোধ করল মিরন।

'আমি খাতির করে রেসিডেন্টসাহেবকে এখানে নিয়ে আসছি।' এই বলে মিরনের অনুমতির অপেক্ষা না করে কক্ষ থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন রাজবল্লভ।

রাগে ফুঁসছেন স্ক্র্যাফটন। সাহেবের লাল মুখটা আরও লাল হয়ে উঠেছে। নবাবজাদার স্পর্ধা দেখে তিনি তাজ্জব। বেওকুফ ছোকরা দেউড়িতে দাঁড় করিয়ে রেখেছে ইংরেজ রেসিডেন্টকে? আগুন জ্বলছে স্ক্র্যাফটনের মাথায়। হাতের কাছে গোটা কয়েক কামান পেলে তখনই হয়তো উড়িয়ে দিতেন গোটা প্যালেসটাকেই।

সহসা সদর দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন রাজবল্লভ।

তাঁকে দেখেই ক্ষিপ্ত হয়ে গর্জন করে উঠলেন স্ক্র্যাফটন, 'কোথায় নবাবজাদা?'

রাজবল্লভ হাত কচলে বিনীত ভাবে বললেন, 'হুজুর প্যালেসের অন্দরেই আছেন।'

'হাউ ডেয়ার ইউ আর? ইংরেজ রেসিডেন্টকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন?'

‘গোস্তাকি মাফ করবেন সাহেব। অন্দরে আসুন।’

আর কথা না বাড়িয়ে হেস্টিংসকে নিয়ে গটমটিয়ে প্যালেসের অন্দরে ঢুকে পড়লেন স্ক্র্যাফটন। ঝড়ের গতিতে দরবার ঘরে এসে হাজির হলেন। আর বেওকুফি নয়। ইংরেজদের ভয়ে ধাতে এসেছে মিরন। ইংরেজ রেসিডেন্ট সাহেবকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আগে থেকেই দরবার ঘরে এসে অপেক্ষা করছিল সে।

যেন কিছুই ঘটেনি—এমন একটা ভাব করে হাসি মুখে স্ক্র্যাফটন ও হেস্টিংসকে ওয়েলকাম জানাতে গিয়ে স্ক্র্যাফটনের আগুনে মেজাজ দেখে দমে গেল মিরন। মিলিয়ে গেল মুখের হাসি।

কোনও ভূমিকা না করেই মিরনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রবল ঔদ্ধত্যের সঙ্গে স্ক্র্যাফটন শুধোলেন, ‘ইউ এগেইন মেড দ্য সিচুয়েশন গ্রেভ। ক্রিয়েটেড ট্রাবল ফর আস। ডিস্টার্বড পিস অফ দ্য ক্যাপিটাল টাউন। হু এমপাওয়ারড ইউ টু ডু সো?’

আগুন ঝরছে স্ক্র্যাফটনের মুখচোখ থেকে। ভয়ে কাঁপছেন রাজবল্লভ।

‘হু অর্ডারড ইউ টু কিল মির্জা মেহেদি?’ ফের গর্জন করলেন স্ক্র্যাফটন।

মিরন নিশ্চুপ। স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে আছে অপরাধীর মতো।

‘হোয়াই হ্যাভ ইউ কমিটেড সাচ অ্যা নুইসেন্স?’

হেস্টিংস বললেন, ‘কর্নেল ক্লাইভ আজ বিকেলে মুর্শিদাবাদে এসে পৌঁছবেন।’

মিরন বলল, ‘ম্যায়নে সোচা থা কী ফির ইনকিলাব হোগি।’

চোখ বিস্ফারিত করে স্ক্র্যাফটন শুধোলেন, ‘ইনকিলাব? রেভোলিউশন? মতলব?’

ইতস্তত করে মিরন বলল, ‘কর্নেল ক্লাইভ ফৌজ নিয়ে আসছেন। আমার মনে হয়েছিল, দেওয়ান রায়দুর্লভ মির্জা মেদিকে মসনদে বসাতে চান। সোচা থা ইনকিলাব হোগি। তাই আব্বাহুজুরের কুরসিকে সালামত রাখতে মির্জা মেহেদিকে আমি—’

স্ক্র্যাফটন ও হেস্টিংস স্তম্ভিত।

স্ক্র্যাফটন বলে উঠলেন, ‘হ্যাভ ইউ গন ম্যাড?’

হেস্টিংস শুধোল, ‘কোথা থেকে আপনি শুনলেন ইনকিলাবের কথা?’

‘শুনিনি। আন্দাজ করেছিলাম।’

আঁতকে উঠে হেস্টিংস বললেন, ‘ও মাই গড। নিজের মর্জিমাফিক এক কহানি গড়ে নিয়ে আপনি মির্জা মেহেদিকে খতম করলেন?’

স্ক্র্যাফটন ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন, ‘নট ফর এনি রেভোলিউশন। কর্নেল ইজ কামিং টু অ্যাসিস্ট নবাব ফর হিজ পূর্ণিয়া এক্সপিডিশন। এটা আপনি জানতেন না?’

দু’দিকে মাথা নেড়ে মিরন বলল, ‘না। আব্বাহুজুর কিছু বলেননি আমাকে।’

মিরনের যুক্তিতে একিন হল না হেস্টিংসের। শুধোলেন, ‘স্রেফ এক আন্দেশায় আপনি এই কাজ করে বসলেন? ইওর অ্যাকশনস হ্যাভ ডিসগ্রেসড কর্নেল ক্লাইভ। টারনিশিং দ্য ইমেজ অফ ইংলিশ মেন। এসব বোঝেন? নাউ টেল আস—নানি বেগম, আমিনা বেগম ও ঘসেটি বেগমকে খতম করলেন কেন?’

মিরন মুখ তুলে বলল, ‘ইয়ে ইলজাম ঝুটা।’

‘দেন হোয়্যার আর দে?’ চেঁচিয়ে উঠলেন হেস্টিংস।

‘আমি তাদের ঢাকায় পাঠিয়ে দিয়েছি।’

‘ঢাকায়?’ স্ক্র্যাফটন বিস্মিত।

‘জিঞ্জিরা প্যালেসে।‘

‘হোয়াই?’

মিরন নিরুত্তর।

'আই ফিয়ার ফর ইওর ফিউচার। সব শুনে কর্নেল ক্লাইভ কী বলবেন আমি জানি না।'

এই বলে মিরনের সামনে থেকে সরে গিয়ে খোলা জানলার পাশে এসে দাঁড়ালেন স্ক্র্যাফটন।

মিরন কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, 'গোস্তাকি মাফ করবেন সাহেব।'

'একটা কাজ করতে হবে আপনাকে।' বাইরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন স্ক্র্যাফটন। তারপর জানলার পাশে থেকে সরে এসে তিনি ফের মিরনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, 'মির্জা মেহেদিকে দাফন করার জন্য জমকালো জানেজার আনজাম করতে হবে। শাহি কেতায় সারতে হবে সব রিচুয়াল। আপনাকে হাজির থাকতে হবে।'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ। আপনাকে। খুদ হাজির থেকে মির্জা মেহেদিকে আপনি দাফন করবেন খোশবাগে।'

'লেকিন সাহেব আমলোগ—' আতঙ্ক ফুটে ওঠে মিরনের গলায়।

হেস্টিংস তচ্ছিল্যের মুচকি হাসি হেসে শুধোলেন, 'আমলোগের নফরতিকে ভয়?'

'জি সাহেব।' সত্যি কথাই বলল মিরন।

'এটা মির্জা মেহেদিকে খতম করার আগে ভাবা উচিত ছিল।'

হুকুমের সুরে স্ক্র্যাফটন বললেন, 'আওয়ার সোলজার্স উইল এসকর্ট ইউ টু খোশবাগ।'

কথাটা মিরনের ঠিক মনঃপুত হল না। অসহায় ভাবে সে দাঁড়িয়ে রইল।

স্ক্র্যাফটন ফের বললেন, 'ওয়ান মোর থিং। ইস্যু অ্যা মেমো টু ডেপুটি অফ নবাব অ্যাট ঢাকা।'

'চিঠঠি?'

'ইয়েস।'

'নানি বেগম, আমিনা বেগম, ঘসেটি বেগমকে ঢাকায় যেন সহি সালামাত রাখা হয়। ইউ হ্যাভ টু ইস্যু দ্য লেটার রাইট নাউ।' বললেন স্ক্র্যাফটন।

অগত্যা মুনশিকে ডেকে পাঠাল মিরন। চিঠির মুসাবিদা করতে বলল তুরন্ত।

খানিকবাদে নবাবজাদার সিলমোহর দেওয়া চিঠির একটা কপি নিয়ে জাফরাগঞ্জ প্যালেস থেকে বেরিয়ে এলেন স্ক্র্যাফটন ও হেস্টিংস।

দুই সাহেব চলে যেতেই ক্ষোভে ফেটে পড়ল মিরন।

নবাবজাদার আগুনে মেজাজের আঁচ পেয়ে তার সামনে থেকে সরে গেলেন রাজবল্লভ।

নফরতি। নফরতি। ইংরেজ সওদাগরদের উপর তার তীব্র নফরতি। তবুও তাকে বারবার বেইজ্জত হতে হচ্ছে ইংরেজদের কাছে। যখন-তখন তাকে ধমকাচ্ছেন রেসিডেন্ট সাহেব। কৈফিয়ৎ চাইছেন। কেন? কেন এমন হবে? সে নবাবজাদা। ভবিষ্যতে সুবে বাংলার মসনদের দাবিদার। যে কাজই করে থাকুক না কেন সে, তার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হবে একদল সওদাগরকে? তার প্যালেসে ঢুকে তারা তাকে চোখ রাঙিয়ে যাবে কেন?

মিরনের মনে হল, ইংরেজদের বিরোধিতা করে সঠিক কাজ করেছিলেন সিরাজ। মনে মনে ইংরেজদের সবক শেখানোর খোয়াব দেখতে লাগল সে। তার মাথায় চক্কর কাটতে লাগল এক আজগুবি ভাবনা। ফৌজ নিয়ে কলকাতার উপর সে ঝাঁপিয়ে পড়বে। চুরমার করে দেবে ইংরেজ বণিকের দেমাক। গুঁড়িয়ে দেবে কলকাতার কেল্লা। যেমন গুঁড়িয়ে দিয়ে এসেছিলেন সিরাজ। সুবে বাংলা থেকে সে ইংরেজদের তাড়িয়েই ছাড়বে।

নবাবজাদার হুঁশ নেই যে গত একবছরে বদলে গিয়েছে জমানা। বদলে গিয়েছে রাজনৈতিক সমীকরণ। পলাশি বদলে দিয়েছে সব কিছু। খরচ কমাতে অর্ধেকের বেশি ফৌজিদের ছেঁটে ফেলেছেন নবাব মিরজাফর

খাঁ। নবাব নিজেই এখন গোরা পল্টনদের উপর নির্ভরশীল। নবাবসহ নিজামতের সব আমীর ওমরাহ্‌রা ক্লাইভের নাম শুনলেই ভয়ে কাঁপে। কাদের নিয়ে ইংরেজদের টিট করতে যাবে সে?

আর মিরন নিজে? স্ক্র্যাফটন, হেস্টিংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলতে গেলেই তার বুক শুকিয়ে যায়। ক্লাইভের সামনে গেলে ভয়ে হাঁটু কাঁপে। লড়াই করার কোনও অভিজ্ঞতা তার নেই। তম্বি-তড়পানি সবই ঘরের অন্দরে। সে যাবে ক্লাইভের বিরুদ্ধে লড়াই করতে?

দিমাগ খানিকটা ঠান্ডা হতে মিরন অনুভব করে তার নিজের অবচেতনই সায় দিচ্ছে না এই অলীক পরিকল্পনায়।

নাস্তা নিয়ে হাজির হল দাখিলা। পোর্সেলিনের বাটিতে দুধে ভেজানো খুরমা।

প্রবল হতাশা ও নিষ্ফল আক্রোশে দুধের পাত্র উলটে দেয় মিরন। পোর্সেলিনের সুদৃশ্য আধার মাটিতে পড়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। উন্মাদের মতো লোহার একটা দণ্ড হাতে নিয়ে ঘরের জিনিসপত্র ভাঙচুর করতে থাকে মিরন। ভয় পেয়ে ছুটে পালায় গোলাম-দাখিলারা। বেশ কিছুক্ষণ তাণ্ডব চালিয়ে ক্ষান্ত হল মিরন। কুরসিতে বসে হাঁপাতে লাগল।

দরওয়াজায় এসে দাঁড়ালেন রাজবল্লভ। 'হুজুর।'

মুখ তুলে রাজবল্লভের দিকে তাকাল মিরন।

রাজবল্লভ বললেন, 'বজরা প্রস্তুত আছে হুজুর। গোরা পল্টনেরা দুয়ারে সঙিন হাতে খাড়া হয়ে আছে। খোশবাগের উদ্দেশে রওনা হওয়ার জন্য তাগাদা দিচ্ছে বারবার। কী বলব?'

হতাশায় দুহাতে মুখ ঢাকল মিরন।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে শহরের বিভিন্ন জায়গায় গোরা পল্টনদের মোতায়েন করলেন স্ক্র্যাফটন। তারপর হেস্টিংসকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে চললেন রায়দুর্লভের হাভেলির উদ্দেশে। মির্জা মেহেদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মুর্শিদাবাদের আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। গোলমাল পাকিয়ে ফায়দা লোটার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল গুণ্ডা লুঠেরাদের দল। কড়া হাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলেন স্ক্র্যাফটন।

গোলমাল আঁচ করে কোতোয়ালির যে সেপাইরা কাজ ছেড়ে গা ঢাকা দিয়েছিল, ফের ফিরে এসে কাজে যোগ দিল তারা। স্ক্র্যাফটনের নির্দেশে রায়দুর্লভ আগেই পথে মোতায়েন করেছেন তার ফৌজের ঘোড়সওয়ারদের। তারা এখন টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। জনতার ক্ষোভের আঁচ খানিকটা কমেছে। পথের দু'পাশে এখন সুশৃঙ্খল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে অগণিত মানুষ। এরা মির্জা মেহেদির জানেজায় অংশ নিতে চায়।

রায়দুর্লভের হাভেলিতে এসে ঢুকলেন স্ক্র্যাফটন ও হেস্টিংস।

স্ক্র্যাফটনের নির্দেশে ফের একবার ঢোল শোহরতের আয়োজন করলেন দেওয়ান সাহেব। রাস্তায় জমায়েত আম-আদমিকে জানিয়ে দেওয়া হল– আলিবর্দির বেগম, আমিনা বেগম ও ঘসেটি বেগম জিন্দা আছেন, খুশ তবিয়ত আছেন। হাওয়াবদলের জন্য তাদের পাঠানো হয়েছে ঢাকার জিঞ্জিরা প্যালেসে। এই ঘোষণা মানুষের ক্ষোভকে আরও এক দফা প্রশমিত করল।

রায়দুর্লভের হাভেলির বুরুজে এসে দাঁড়ালেন স্ক্র্যাফটন ও হেস্টিংস। অনেক নীচে মির্জা মেহেদির দেহ নিয়ে তখন চলেছে শবযাত্রা। হাতির পিঠে পালঙ্কে শায়িত বালকের দেহ ফুলে ফুলে ঢাকা। পথ হাঁটছে শোকাহত অগণিত মানুষ। মানুষের মধ্যে কোনও উত্তেজনা নেই। লোকজন নিশ্চুপ। কোনও কোলাহল নেই। লোকে পথ হাঁটছে সুশৃঙ্খল ভাবে। শহর ঘুরে মির্জা মেহেদির দেহ নিয়ে যাওয়া হবে চেহেল সেতুনের নৌকোঘাটে। সেখান থেকে ভাগীরথী পেরিয়ে খোশবাগ।

গিরিয়ার ময়দানে তাঁবু ফেলেছেন নবাব মিরজাফর খাঁ। কর্নেলের শুভাগমনের অপেক্ষা করছেন। কিন্তু ক্লাইভের দেখা নেই। আদৌ চন্দননগর থেকে রওনা হয়েছেন কি না, কবে এসে পৌঁছবেন– এ নিয়ে কোনও খবরপত্তরও নেই। ওদিকে খাদিম হোসেন পূর্ণিয়ার দিকে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। ধন্দে পড়েছেন নবাব। এখনই এগোবেন? না ক্লাইভের অপেক্ষায় থাকবেন?

চোখের আড়ালে গিয়ে খাদেম হোসেন গদ্দারি না করে বসে, রাজমহল অবধি এগিয়ে গেলে তার গতিবিধির উপরে নজর রাখা যায়—একদিকে এ ভাবনা যেমন রয়েছে, তেমনই নবাব আবার ভাবছেন রাজমহল অভিমুখে রওনা হলে ক্লাইভ রুষ্ট হবেন না তো?

মিরজাফরের মূল লক্ষ্য পাটনা। নায়েব রামনারায়ণের ক্ষমতা খর্ব করে তাঁর ধনদৌলত দখল করার মনসুবা নিয়ে তিনি বেরিয়েছেন। কাজটা যে বড় একটা সহজ নয়, মিরজাফর তা জানেন। রামনারায়ণ তাগদবাজ আদমি। এদিকে নবাবের সঙ্গে রয়েছে আনাড়ি, আনপঢ় সব ফৌজি। এদের অনেকেই হাতিয়ার ধরতে দড় নয়। লড়াইয়ের পূর্ব অভিজ্ঞতাও নেই। সেপাইদের মধ্যে অনেকে অভাবের তাড়নায় এই প্রথম নাম লিখিয়েছে ফৌজে। যুদ্ধের কলাকৌশল জানে না। এই ফৌজ জঙ্গবাজির ময়দানে কতটা কার্যকরি হবে, তা নিয়ে নবাবের নিজেরই সংশয় রয়েছে।

প্রায় হপ্তাখানেক হতে চলল, গিরিয়ার আলিশান ময়দানে ছাউনি গেড়ে অলস সময় অতিবাহিত করছে নবাবের বাহিনী। এদের আশরত, ফূর্তি আর হুল্লোড়ের বহর দেখে বোঝা দায় এরা যুদ্ধে চলেছে না স্রেফ মজা লুঠতে বেরিয়েছে। উচ্ছৃঙ্খল সেপাইদের দৌরাত্ম্যে ও জুলুমবাজিতে জেরবার আশেপাশের গ্রামের মানুষ। এদের সামলে রাখার মতো দক্ষ সেনাপতি কেউ নেই। নবাব উদাসীন। দিনরাত শরাব ও ভাঙের নেশায় বুঁদ হয়ে রয়েছেন। সঙ্গে রয়েছে একগাদা কসবি, বাইজি। মেহফিল বসছে রোজ। চলছে গুলতানি, গুলজার, ফূর্তি আর ঢালাও খানাপিনা। সকলে দিব্যি আছে। লড়াই নিয়ে কারোরই কোনও শিরদর্দ নেই। এ এক আজিব কাফেলা।

রাত গভীর হচ্ছে। কড়া আতর ও শরাবের গন্ধে ম'ম করছে চারিদিক। বাজনায় ঝড় তুলছে তবলচি ও বীণকার। নবাবের তাঁবুতে হররোজের মতো আসর বসেছে আজও। বাইজির নাচের ঘূর্ণিতে উড়ছে ঘাঘরা। কামগন্ধে মাতোয়ারা মোসাহেবের দল। জোড়া জোড়া লোভী চোখের দৃষ্টি ঘোরাফেরা করছে বাইজির উরুযুগল, সুঠাম পায়ের গোছ, উন্মুক্ত নাভি দেশ ও নিতম্বের উপরে।

নেশায় ঢুলছেন নবাব মিরজাফর খাঁ। থেকে থেকে 'কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ!' বলে আওয়াজ তুলছেন। চুমুক দিচ্ছেন শরাবের পাত্রে। ফের ঝিমিয়ে পড়ে ডুব দিচ্ছেন গভীর চিন্তায়। রামনারায়ণের তাগদ, খাদেম হোসেনের গতিবিধি, ক্লাইভের আগমন, বর্গির হাঙ্গামা,—অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার হানাদারি—চিন্তা হরেক কিসিমের।

নবাবের পাশে বিমর্ষ মুখে বসে আছেন তাঁর ভাই মিরকাজিম। বাইজির নাচগানে তাঁর কোনও আগ্রহ নেই। ভাবছেন কতকাল আর এ ভাবে সময় নষ্ট হবে। একবার ক্লাইভের আপত্তিতে তাঁর নামে জারি হওয়া পাটনার নায়েব-সুবাদারগিরির পরোয়ানা নবাব বাতিল করেছিলেন। পাটনার কুরসি তাঁর নাগালের মধ্যে এসেও ফসকে গিয়েছিল। সাময়িক ভাবে চূড়ান্ত হতাশ হলেও হাল ছাড়েননি মিরকাজিম। ক্রমাগত তদবির-তকরার করে ফের তাঁর নামে পাটনার নায়েব সুবাদারির পরোয়ানা জারি করানোর জন্য রাজি করিয়েছেন নবাবকে। মিরকাজিমের ধারণা, নবাব পাটনায় গিয়ে হাজির হলেই তাঁর সম্মানে গদি ছেড়ে দেবেন রামনারায়ণ। লড়াই ঝামেলা কিছুই হবে না। বিনা মেহনতে মিরকাজিম বসে পড়তে পারবেন পাটনার

কুরসিতে। নবাব অহেতুক কেন যে ক্লাইভের জন্য অপেক্ষা করছেন, তা বুঝতে পারছেন না মিরকাজিম। উলটে তাঁকে অস্থির করে তুলেছে অন্য চিন্তা। ক্লাইভ এসে পড়লে ফের না সব ভেস্তে যায়।

কসিদেরা খাদেম হোসেনের বিষয়ে তেমন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠার মতো কোনও খবর আনতে পারেনি। তাই আপাতত ক্লাইভের ইন্তেজারে বসে থাকাকেই শ্রেয় মনে করছেন মিরজাফর খাঁ। এই নড়বড়ে ফৌজ নিয়ে রামনারায়ণের মুখোমুখি হওয়ার সাহস তাঁর নেই।

মেহফিল যখন ভাঙল, রাত তখন গভীর। নবাবের তাঁবু থেকে বেরিয়ে বিমর্ষ মুখে মিরকাজিম হেঁটে চললেন তার নিজের তাঁবুর দিকে। সঙ্গে দরবারের ভাঁড় মির্জা শামসুদ্দিন।

মিরকাজিম বললেন, 'এ তো আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল দেখছি।'

শামসুদ্দিন বললেন, 'কেন? ঝামেলা কোথায়? দিব্যি তো আমোদ-আশরত চলছে।'

শামসুদ্দিনের কথার ভাঁজে শ্লেষের সুরটা ধরতে পারলেন না স্থূলমস্তিষ্কের মিরকাজিম। চিন্তিত মুখে বললেন, 'এ মজাক-রগড়ের বিষয় নয় শামসুদ্দিনজি। আমার নসিবের সওয়াল।'

'পাটনার নায়েব-সুবাদারগিরির পরোয়ানা তো আপনার মুঠঠিতে। সেই খুশিতে একটু মজা লুটে নিন। দিব্যি তো চলছে। হররোজ ফূর্তি। নবাব রঙ্গিলা মতলব দুনিয়া রঙ্গিলা। আর কী চাই?'

'ক্লাইভ সাহেবের ইন্তেজারে এখানে বসে থাকার মানে হয় কি?'

'শামসুদ্দিন মুচকি হেসে বললেন, 'পাটনার কুরসি তো আর ছিনতাই হয়ে যাচ্ছে না।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'তাহলে খামোখা বেচ্যায়েন হচ্ছেন কেন হুজুর?'

আড়চোখে মিরকাজিমকে একবার দেখে নিয়ে মনে মনে শামসুদ্দিন বললেন, বেওকুফ কাঁহিকা। নবাবও বেওকুফ, তাই রামনারায়ণকে হটিয়ে তোমার মতো এক নালায়েক-বুজদিল আদমিকে পাটনার গদিতে বসাতে রাজি হয়েছেন। হাতিয়ার ওঠানোর মুরোদ নেই, ওদিকে পাটনার নায়েব-সুবাদার হওয়ার খোয়াব দেখছ। বর্গি এলে বুঝবে বুঝবে কত ধানে কত চাল। জিন্দেগি স্রেফ এক সুনহারি খোয়াব নয়।

মিরকাজিম একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'নবাব যদি ফির নারাজ হন?'

মনে মনে শামসুদ্দিন বললেন, 'তা হলে তো তাকে আকলমন্দ বলতে হয়।'

'ক্লাইভ সাহেব যদি চান রামনারায়ণই পাটনার কুরসিতে বহাল থাকুন?'

মিরকাজিমের আন্দেশাকে উসকে দিয়ে শামসুদ্দিন বলেন, 'তেমন ইরাদা তার হতেই পারে।'

মির কাজিম মরিয়া হয়ে বলে ওঠেন, 'দ্রুত পাটনার দিকে এগোনোর জন্য নবাবকে বোঝাতে তো পারেন আপনি। ক্লাইভ সাহেব পৌঁছনোর আগেই যাতে কাজটা হাসিল হয়ে যায়।'

'আমি মজাক, রগড় করে নবাবকে খুশি রাখি। এই লড়াই-হাঙ্গামার বিষয়ে আমার নাক গলানো বে-এক্তিয়ারের কাজ হয়ে যাবে না হুজুর? আপনি নিজেই তো বলতে পারেন নবাবকে।'

'সে কোশিশ কি আর করিনি? নবাব যে কোনও কথাই কানে নিচ্ছেন না। কেবল একই বাত—ক্লাইভ আগে আসুন তার পরে সামনে এগোব।'

গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে শামসুদ্দিন বললেন, 'ইয়ে বাত নবাব শোচ-সমঝ করেই বলেছেন।'

হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মিরকাজিম বললেন, 'আপনি বলছেন ইয়ে সহি তরিকা?'

শামসুদ্দিন হেসে বললেন, 'আপনি কামিল-ই-ইনসান। পাটনার সুবাদারির পদে রামনারায়ণের চেয়েও বেহেতর বাজি। এ নিয়ে কোনও এতেরাজ চলে না।'

এই স্তাবকতায় খুশি হয়ে মূর্খ মিরকাজিম জোশের সঙ্গে বললেন, 'তবে? আরে ভাইয়া, আমার সঙ্গেই তো বিশ হাজার ফৌজি রয়েছে। নবাবের হুকুমত মিললে আমি একাই রামনারায়ণকে টিট করে দিতে পারি। রামনারায়ণ নিজেই তার ধনদৌলত নিয়ে ছুটে এসে নবাবের পায়ে পড়বেন।'

শামসুদ্দিন মাথা নেড়ে বললেন, 'তা আপনি পারেন। বেশক পারেন। জরুর পারেন।'

'তাহলে আপনিই বলুন ক্লাইভ সাহেবের ইন্তেজারে এখানে পড়ে থেকে দিন গুজারের কোনও মানে হয় কি? আপনি এই কথাটা নবাবের কানে একটু তুলুন না?'

হেসে উঠলেন শামসুদ্দিন।

'হাসছেন যে—'

'নয়া শাদি হওয়া মিঞা-বিবির রিশতেদারি বোঝেন?'

মিরকাজিম হাঁ হয়ে গিয়ে মির্জা শামসুদ্দিনের মুখপানে চেয়ে থাকেন।

শামসুদ্দিন বলেন, 'নবাব আর কর্নেল ক্লাইভের রিশতেদারি এখন সেইরকম। এর মধ্যে আমার আপনার না ঢোকাই ভালো।'

এবারে হাসলেন মিরকাজিম।

হঠাৎই একটা গোলমালের আওয়াজ দুজনের কানে এল। দ্রুত হেঁটে গিয়ে সামনে বাঁক নিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মিরকাজিম ও শামসুদ্দিন।

শামসুদ্দিন বললেন, 'ওই দেখুন আপনার ফৌজের দুই আহেদি।'

ইসমাইল ও ফয়জল। মদ্যপ দুই আহেদির কাজিয়া বেঁধেছে এক গণিকার দখল নিয়ে। তরোয়াল হাতে নিয়ে তারা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। দুই মরদের কাণ্ড দেখে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা যুবতী ভয়ে ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। দেহাতের আওরতদের ঢঙে যুবতীর গায়ে নিম্নাঙ্গে জড়ানো রয়েছে একখানা কাপড়। আঁচল লুটোচ্ছে মাটিতে। স্তনযুগল বেআবরু।

মিরকাজিম ধমকে উঠলেন, 'খামোশ। কেয়া হো রহা হ্যায়?'

'ইনসাফ চাই হুজুর। ফয়জল আমার পিয়ারিকে দখল করতে চাইছে।' এই বলে মিরকাজিমের পায়ে লুটিয়ে পড়ে ইসমাইল।

জড়ানো গলায় ফয়জল বলে, 'ঝুটবাত হুজুর। এই রেন্ডির কিস্মত আমি চুকিয়েছি।'

মিরকাজিম ফের চেঁচিয়ে ওঠেন, 'খামোশ। নোটঙ্কি মাত করো।'

শামসুদ্দিন বলে ওঠেন, 'তরোয়াল খাপে ঢুকিয়ে রাখো ভাই। হুজুর এসে পড়েছেন। এই লেড়কিকে কে ভোগ করবে তা উনিই ঠিক করে দেবেন।'

বাতিস্তম্ভের আলোয় শামসুদ্দিন দেখেন, সুঠাম দেহের গড়নওয়ালা শ্যামলা বর্ণের মেয়েটির উপরে আঁঠার মতো আটকে গিয়েছে মিরকাজিমের দৃষ্টি।

স্বগতোক্তির ঢঙে মিরকাজিম বলে ওঠেন, 'লেড়কি খুবসুরত।'

মির কাজিমের একটু কাছে ঘেষে এসে শামসুদ্দিন ফিসফিস করে বলেন, 'এ বসরাই গুলাব আপনিই নিয়ে যান। সৌগন্ধ, মজা নিজেই লুটে নিন। বেয়াদপ দুটো আচ্ছা টিট হবে।'

'সহি বাত বলেছেন শামসুদ্দিনজি। লেড়কি বিলকুল তাজা গুলাব।'

এগিয়ে গিয়ে যুবতীর কোমর জড়িয়ে ধরে মিরকাজিম বলেন, 'এসো বিবিজান আমার সঙ্গে।'

শামসুদ্দিন বলে ওঠেন, 'তোমার বরাত ভালো গো মেয়ে, হুজুরের মনে রং ধরাতে পেরেছ। নসিব যদি সাথ দেয় তো রাত পোহালে পাটনার খাস-বেগমও বনে যেতে পার।'

মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে নিজের তাঁবুর পথে পা বাড়ালেন মিরকাজিম।

ইসমাইল ও ফয়জল অসহায় ভাবে চেয়ে রইল। যুবতীকে নিয়ে মিরকাজিম চোখের আড়াল হতেই দু'জনে গলা জড়াজড়ি করে কান্না জুড়ে দিল।

শামসুদ্দিন বললেন, 'কেঁদে আর কী করবে ভায়া? রাত অনেক হয়েছে, তাঁবুতে গিয়ে বসরাই গুলাবের খোয়াব দেখো। তবে ভায়া তোমাদের একটু সাবধান করে রাখি।'

ফয়জল ও ইসমাইল চোখ গোল্লা করে শামসুদ্দিনের দিকে তাকায়।
শামসুদ্দিন গলা অনেকটা খাটো করে বললেন, 'বর্গি আসছে।'
'অ্যাঁ? এই ব্বাপ!' নিমেষে নেশা ছুটে গেল দু'জনের। তাঁবুর উদ্দেশে ছুটতে লাগল তারা।
হেসে উঠলেন শামসুদ্দিন।
পিছন থেকে সেই হাসিতে যোগ দিয়ে একজন বলে ওঠেন, 'কেমন বুঝছেন শামসুদ্দিনজি?'
'কে?' শামসুদ্দিন ঘুরে তাকালেন।
লোকটি এগিয়ে এসে বাতিস্তম্ভের পাশে দাঁড়ায়।
'ও জাসুসজি! তা আপনি কেমন বুঝছেন হালচাল?'
গোবিন্দমল্ল বললেন, 'আপনি পারেনও বটে। বর্গি আমদানি করলেন কোত্থেকে?'
'তারা সচমুচ এলে কী হবে ভাবছি। দুই হুজুরে কেমন ছুটল দেখলেন? নিজামতের আর যে কত বেইজ্জতি দেখব?' শামসুদ্দিন দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।
গোবিন্দমল্ল বললেন, 'সহি বাত বলেছেন। এমন নালায়েক ফৌজ আগে কখনও দেখিনি।'
শামসুদ্দিন বললেন, 'এখানে বসে এই নোটঙ্কি দেখতে আর ভালো লাগছে না।'
গোবিন্দমল্ল বললেন, 'রাগে ফুঁসছে আম-আদমি। ফৌজিরা বরাবরই পথে প্রজাদের উপরে একটু আধটু জবরজুলুম করে রাহাখরচ তোলে। এবারের জবরজুলুম ভয়ানক। অতীতের সব নবজিরকে ছাপিয়ে গিয়েছে। খামোখা বদনামের ভাগীদার হচ্ছে নিজামত।'
শামসুদ্দিন বললেন, 'আপনার মাথায় তো হরেক ফন্দি খেলে। এখান থেকে তাঁবু ওঠানোর কোনও উপায় করতে পারেন?'
একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গোবিন্দমল্ল বললেন, 'দেখি কী করা যায়।'
পরেরদিনই সকালেই গিরিয়ার মাঠ থেকে তাঁবু গোটানোর তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল।
কাসিদেরা না কি খবর এনেছে খাদেম হোসেন পূর্ণিয়া জয় করে নিয়েছেন। তাঁর মতিগতি সুবিধের নয়। রামনারায়ণের সঙ্গে দোস্তি গড়ে তোলার কোশিশ করছেন। গোবিন্দমল্লের মুখ থেকে এসব শুনে দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লেন মিরজাফর খাঁ। তাঁবু গুটিয়ে সামনে এগোনোর হুকুম জারি করলেন। শামসুদ্দিন বুঝলেন সবটাই গোবিন্দমল্লের কেরামতি।

ক্লাইভের বজরা এসে ভিড়ল মোরাদবাগ প্যালেসের ঘাটে।
রাগে ফুঁসছেন ক্লাইভ। কাশিমবাজারে এসে শুনেছেন মিরনের হঠকারিতার কাহিনি। মির্জা মেহেদির হত্যাকে কেন্দ্র করে রাজধানীর উত্তাল হয়ে ওঠার ঘটনা।
ক্লাইভকে স্বাগত জানানোর জন্য ঘাটে অপেক্ষা করছিল মিরন। তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গম্ভীর মুখে মোরাদবাগ প্যালেসের সদর দেউড়ির অভিমুখে হাঁটতে লাগলেন ক্লাইভ। তাঁর সঙ্গে এসেছেন সিরাজদ্দৌলার আমলের চরাধিপতি রাজারাম। পুত্র মথুর সিং ও ভাই নারান সিংকে নৌকোঘাটে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ছুটে গিয়ে তাদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন রাজারাম।
ক্লাইভকে খুশি করার উদ্দেশে মিরন বলল, 'মথুর সিং ও নারান সিংকে নবাব কয়েদ করেছিলেন। আমি আজাদ করে দিয়েছি।'
নবাবজাদাকে উপেক্ষা করে হেঁটে চললেন ক্লাইভ।
মিরনের মুখের উপরে সপাং করে যেন একটা চাবুক এসে পড়ল। নৌকোঘাটে একগাদা লোকের মাঝে এ ভাবে বেইজ্জত হয়ে একেবারে চুপসে গেল মিরন। ক্লাইভের সঙ্গ ছেড়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল পথে।

মোরাদবাগ প্যালেসে প্রবেশ করলেন ক্লাইভ। সেখানে আগে থেকেই মজুত ছিল কাশিমবাজার থেকে আসা গোরা পল্টনেরা। ক্লাইভকে ওয়েলকাম জানাতে বেজে উঠল ফৌজি ব্যান্ড।

৪২

কাটোয়ায় শিবির ফেলেছেন ওড়িশার মারাঠা সর্দার শিবভট্ট। সঙ্গে শতখানেক অনুচর। তাতেই ত্রাসে কাঁপছে কাটোয়া ও তার আশেপাশের এলাকা। ফের বর্গির হাঙ্গামা শুরু হবে ভেবে গাঁ ছেড়ে পালাচ্ছে লোকজন।

শিবভট্ট ভাবছেন, নবাব যেমন দুর্বল হয়ে পড়েছেন তাতে সুবে বাংলা দখল করে নেওয়া এমন কিছু শক্ত নয়। কাঁটা কেবল কাশিমবাজার ও মুর্শিদাবাদে মজুত গোরা পল্টন ও তাদের কামান।

বর্গিদের শান্তিচুক্তির শর্ত হিসেবে ওড়িশা প্রদেশ মারাঠাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন নবাব আলিবর্দি খাঁ। শুধু মেদিনীপুরকে ওড়িশা থেকে কেটে নিয়ে বাংলার সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছিলেন। সেই থেকে ওড়িশা প্রদেশ শাসন করছে মারাঠারা।

পৌষের এক কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে কাটোয়া থেকে ভাগীরথী পার হয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে ধেয়ে চললেন শিবভট্ট ও তার বিশ জন অনুচর।

আকাশে উড্ডীন গৈরিক পতাকা। সহসা জয় শিবো শম্ভু! জয় শিবো শম্ভু—ধ্বনিতে কেঁপে উঠল চারিদিক। পথের দুপাশের গায়ের মানুষজন ভয়ে আগল তুলল দরজায়। লুঠতরাজের ভয়ে কেউ কেউ সঞ্চিত ধনসম্পদ মাটিতে গর্ত খুঁড়ে লুকিয়ে ফেলল দ্রুত। না! এবারে লুঠতরাজ নয়, হাঙ্গামা নয়, শিবভট্ট এসেছেন নবাবের সঙ্গে একটা জরুরি বিষয়ে আলোচনা করতে।

ঘোড়ার খুরে ধুলোর ঝড়। চকবাজার ছাড়িয়ে চেহেল সেতুনের দিকে ছুটে চললেন শিবভট্ট। নবাব রাজধানীতে নেই শুনে তিনি ও তাঁর অনুচরেরা দেওয়ান রায়দুর্লভের প্যালেসের দেউড়িতে এসে হাজির হলেন। ওড়িশার বর্গি সর্দার এসেছেন কোনও একটি বিষয়ে আলোচনা করতে।

নবাবের অবর্তমানে মারাঠাদের সঙ্গে কোনও আলোচনার মধ্যে যেতে চান না রায়দুর্লভ। তাছাড়া বর্গিদের সম্বন্ধে তাঁর প্রচণ্ড ভীতি রয়েছে। শিবভট্টের আগমন সংবাদ শুনেই আতঙ্কে হাভেলির সব দরওয়াজা বন্ধ করে দিতে বললেন রায়দুর্লভ। যদিও শিবভট্ট বার্তা পাঠিয়েছেন, ভয়ের কিছু নেই, একটা জরুরি বিষয়ে তিনি দেওয়ানের সঙ্গে আলোচনা করতে চান। কিন্তু বর্গিদের তামান্না কী তা কে জানে। মিরনের গুপ্ত ঘাতকদের হাতে কোতল হয়ে যাওয়ার ভয়ে এমনিতেই রায়দুর্লভ আধমরা হয়ে রয়েছেন। তার মনের মধ্যে দেখা দিল সন্দেহ। বর্গিদের সঙ্গে সাজিশি করে তাকে কোনও বিপদের মধ্যে ঠেলে দিতে চাইছেন না তো মিরন। নিজের মহলের চারিদিকে কড়া পাহারা বসিয়ে দেওয়ানজি শয্যাশায়ী হলেন।

রায়দুর্লভের এহেন আচরণ দেখে মারাঠা সর্দার স্তম্ভিত।

দেওয়ানের অন্দরমহলে ছুটে এলেন তাঁর নায়েব নন্দকুমার। শিবভট্টের লেখা চিরকুট রায়দুর্লভকে দেখিয়ে বললেন, ‘নবাব রাজধানীতে নেই। মারাঠা সর্দারকে অন্দরে ডেকে নিয়ে আপনার কথা বলা উচিত।’

রায়দুর্লভ ত্রস্ত। বললেন, ‘ওদের মতলব কী কে জানে? খবরদার দরজা খুলবেন না।’

‘শিবভট্ট মনে করবেন দেওয়ান বুজদিল।’

‘সেপাইদের বলুন ওদের হটিয়ে দিক।’

‘এতে যে অহেতুক হাঙ্গামা বাধবে হুজুর।’

রায়দুর্লভ ক্ষণেক চিন্তা করে বললেন, 'বেশ। কথা বলতে হয় আপনিই বলুন। মারাঠা সর্দারের মুখোমুখি হতে আমি চাই না। ওরা কী বলতে চায় শুনে নিন। আমার কথা শুধোলে বলবেন, দেওয়ানজির কঠিন বিমার। বিছানা থেকে ওঠার ক্ষমতা নেই।'

দুয়ারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে করতে এবারে বেশ বিরক্ত বোধ করছেন শিবভট্ট। তাঁর অনুচরেরা সমানে আওয়াজ তুলে চলেছে 'হর হর মহাদেব! হর হর মহাদেব!'

সহসা সদর দেউড়ি খুলে বেরিয়ে এসে শিবভট্টকে স্বাগত জানালেন নন্দকুমার। খাতির করে প্যালেসের অন্দরে নিয়ে গেলেন।

পলাশির যুদ্ধের আগে হুগলির ফৌজদারের দেওয়ান ছিলেন নন্দকুমার। ফৌজদারের পদটি খালি থাকায় তিনি তখন সেই পদেরও দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী নন্দকুমার ভেবেছিলেন নবাব সিরাজদ্দৌলা তাঁকে ফৌজদারের পদে নিযুক্ত করবেন। কিন্তু কিছুতেই সেটি হয়ে উঠছিল না। চন্দননগর আক্রমণের প্রাক্কালে উমিচাঁদের মারফত নন্দকুমারকে সমঝোতার প্রস্তাব দেন ক্লাইভ। তিনি বলে পাঠান দরবারে তদ্বির করে হুগলির ফৌজদারের পদটি তাঁকে পাইয়ে দেবেন। এই টোপ গিলেছিলেন নন্দকুমার। সিরাজের নুন খেয়েও তার সঙ্গে গদ্দারি করেছিলেন তিনি। ইংরেজদের চন্দনগর আক্রমণের সময় ফরাসিদের সাহায্যে পাঠানো নবাবের ফৌজকে তিনি হুগলিতে দাঁড় করিয়ে রেখে দেন। বিনা বাধায় চন্দননগর গুঁড়িয়ে দেন ক্লাইভ। কাজ হাসিলের পর নন্দকুমারের দায় ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলে ইংরেজরা।

পলাশির যুদ্ধের পরেও নন্দকুমারের নসিব বদলায়নি। ওমর বেগকে হুগলির ফৌজদারের পদে বসিয়ে দিলেন মিরজাফর। নিজামতের শাসন কাঠামোর শীর্ষে ওঠার নাছোড় নেশায় দেওয়ান রায়দুর্লভকে বশীভূত করে তার নায়েবের পদে নিযুক্ত হন নন্দকুমার। তাঁর নজর এখন সুবে বাংলার দেওয়ানের পদের উপরে।

কপালে তিলক। কোমরবন্ধনী থেকে ঝুলছে তরবারি। শিবভট্ট বললেন, 'জয় শিবো শম্ভু।'

নন্দকুমার খোশামুদে ঢঙে বলেন, 'সুস্বাগতম সর্দারজি।'

'শুনলাম নবাব রাজধানীতে নেই।'

নন্দকুমার বলেন, 'হ্যাঁ। পূর্ণিয়া গিয়েছেন।'

'দেওয়ানজির সঙ্গে কথা বলতে চাই।' বললেন শিবভট্ট।

'দেওয়ানজি শয্যাশায়ী। কঠিন বিমার। আমি তাঁর নায়েব। সব কথা আমাকে বলতে পারেন।'

থমকে গেলেন শিবভট্ট। কপালে ভাঁজ পড়ল। নন্দকুমারকে ভালো করে একবার ইয়াদদস্ত করলেন। শিবভট্টের মনে উঁকি দিচ্ছে সন্দেহ। নন্দকুমার সত্যি কথা বলছেন, না বিমারের আছিলায় মারাঠাদের এড়িয়ে যেতে চাইছেন রায়দুর্লভ? মনের ভাব গোপন করে দরবার ঘরে এসে বসলেন শিবভট্ট। মুখোমুখি নন্দকুমার।

শিবভট্ট বললেন, 'বেশ আমার যা বলার তা আপনাকেই বলে যাই। আমার কথা নবাব ও দেওয়ানের কানে পৌঁছে দেবেন।'

নন্দকুমার বললেন, 'জরুর।'

'আপনি বেশক জানেন যে ওড়িশা প্রদেশের মধ্যে ছিল মেদিনীপুর।'

নন্দকুমার বিনীত ভাবে বললেন, 'জানি। আপনাদের সঙ্গে সন্ধির সুলেনামা দস্তখত করার আগে মেদিনীপুরকে বাংলার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন নবাব আলিবর্দি খাঁ।'

'সহি বাত। আগে ওড়িশা প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত ছিল মেদিনীপুর। সুবে বাংলা থেকে চৌথ হিসেবে ওড়িশার রাজস্ব আমরা পাচ্ছি ঠিকই লেকিন মেদিনীপুর থেকেও আমাদের চৌথ আদায় করার কথা। এই বাত আপনি নিশ্চয়ই মানবেন। মেদিনীপুরের মালগুজারি অনেক। আলিবর্দি ধোঁকা দিয়েছেন মারাঠাদের।'

চুপ করে রইলেন নন্দকুমার। তাঁর চোখে চোখ রেখে শিবভট্ট ফের বললেন, 'মেদিনীপুরের মালগুজারির টাকা আমাদের চাই। নবাব যদি এই দাবি মেনে নেন তো ভালো নইলে...'

ক্ষণিকের জন্য থামলেন শিবভট্ট।

নন্দকুমারের বুক কেঁপে উঠল। মারাঠা সর্দারের কথার ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট।

ধারাল দৃষ্টিতে নন্দকুমারের মুখপানে চেয়ে শিবভট্ট বললেন, '...নইলে বাংলায় ফের আগুন জ্বলবে। ধোঁকাবাজি মারাঠারা বরদাস্ত করবে না।'

নন্দকুমার বললেন, 'বেশ আপনার কথা আমি দেওয়ানকে জানাব। নবাব ফিরে এলে তাঁর কানেও তুলব কথাটা। অনেকটা পথ অতিক্রম করে এসেছেন। আপাতত একটু বিশ্রাম করুন। জলগ্রহণ করুন।'

'না। আমার হাতে সময় খুব কম।'

'আপনি অতিথি। দুয়ার থেকে ফিরে গেলে গৃহস্থের অকল্যাণ হবে যে।'

কুরসি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে শিবভট্ট বললেন, 'বাংলায় ফের আগুন জ্বালানোর ইচ্ছে নেই আমাদের। আশা করি আমার কথা নবাবকে বুঝিয়ে বলতে পারবেন আপনি।'

'নিশ্চয়ই বলব।'

'মেদিনীপুরের মালগুজারি আমাদের চাইই।' এই বলে আর দাঁড়ালেন না শিবভট্ট। রায়দুর্লভের হাভেলি থেকে বেরিয়ে এসে লাফ দিয়ে চড়ে বসলেন ঘোড়ায়। তার অনুচরেরা অপেক্ষা করছিল বাইরে। যেমন ঝড়ের গতিতে এসেছিল, তেমনই ফিরে চলল মারাঠা ঘোড়সওয়ারেরা। ধুলোর ঝড় তুলে হারিয়ে গেল নন্দকুমারের দৃষ্টিপথ থেকে।

চিন্তিত হয়ে পড়লেন নন্দকুমার। ফের কি অশান্তি বাধবে? একদিকে বর্গি আরেকদিকে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার হানাদারির ভয়। হাঙ্গামা বাঁধলে ভরসা বলতে তো সেই ইংরেজরা। সেও তো অন্য এক বিপদ। দিনে দিনে নবাব যে ভাবে ইংরেজদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন, আর ইংরেজদের দাপট যে ভাবে বাড়ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে বাংলার মসনদটাই না ইংরেজরা দখল করে নেয়। কী আছে ভবিষ্যতের গর্ভে, কীই বা লেখা আছে তাঁর নসিবে? নানা চিন্তায় বিব্রত নন্দকুমার ঘরমুখো হলেন।

অনেকে মনে করছে পূর্ণিয়া অভিযানে নবাবকে মদত দেওয়ার জন্যই কর্নেল ক্লাইভ বিরাট ফৌজ নিয়ে ছুটে এসেছেন। ইংরেজরা দোস্তির কিম্মত চোকাতে জানে। কিন্তু ক্লাইভের আসল উদ্দেশ্য অন্য। পলাশির ইকরারনামা মোতাবেক দ্বিতীয় কিস্তির তেইশ লক্ষ টাকা দেওয়ার সময়সীমা নভেম্বরে পার হয়ে গিয়েছে। নবাবের দিক থেকে কিস্তির টাকা মেটানোর কোনও উদ্যোগ নেই। সেই বকেয়া টাকা আদায়ের ইরাদা নিয়েই ক্লাইভ এসেছেন মুর্শিদাবাদে।

শীতের সকালে ঝলমলে রোদ এসে পড়েছে মোরাদবাগ প্যালেসের দোতলার অলিন্দে। রুপোলি ফিতের মতো ভাগীরথী বয়ে চলেছে অদূরে। আরামকেদারায় গা এলিয়ে বসে আছেন ক্লাইভ। কপালে চিন্তার ভাঁজ। সে চিন্তা অবশ্য বকেয়া টাকা আদায় নিয়ে নয়। কর্নেল জানেন কী করে চাপ দিয়ে টাকা আদায় করতে হয়। আসলে এই মুহূর্তে অন্য এক চিন্তা ক্লাইভের মনকে তোলপাড় করে দিচ্ছে। চিন্তার কারণ চিরকালের দুশমন ফরাসিরা। গতকাল আয়ারকুটের চিঠি পেয়েছেন ক্লাইভ। দক্ষিণে কাউন্ট লালির হাতে চূড়ান্ত নাকাল হচ্ছে ইংরেজবাহিনী।

সত্যিই যদি দক্ষিণে ফরাসিদের হাতে ইংরেজদের চূড়ান্ত বিপর্যয় হয়, তার প্রভাব বাংলার রাজনীতিতে এসে পড়বে। ইংরেজ-শক্তি সম্বন্ধে নবাবের ভয় অনেকটা কেটে যাবে। এই মুহূর্তে নবাবের গলায় ফাঁস জড়িয়ে দড়িটা যেমন শক্ত মুঠোয় ধরে রেখেছেন ক্লাইভ, সেই মুঠো আলগা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে। ফরাসিদের মদত চেয়ে হয়তো গলার ফাঁস আলগা করতে চাইবেন নবাব। সবচেয়ে বড় কথা হল, পলাশির যুদ্ধ থেকে পাওয়া সুবিধা যেন না হাতছাড়া হয়ে যায়।

মুনশি নবকৃষ্ণ এসে বললেন, 'নবাবজাদা মিরন ফের আপনার সাক্ষাৎ চাইছে।'

ফরসির নলটা ঠোট থেকে সরিয়ে হাতে নিয়ে ক্লাইভ শুধোলেন, 'এখানে এসেছে?'

নবকৃষ্ণ বললেন, 'জি হুজুর। ছোকরা নাছোড়বান্দা। আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে।'

ফরসির নল ঠোঁটে গুজে ফের গম্ভীর মুখে তামাক টানতে লাগলেন ক্লাইভ।

'আপনি যে চটে আছেন দিব্যি বুঝেছে। শুধোচ্ছিল, আপনার মেজাজ শরিফ আছে কি না।'

'কী করা যায় বলো তো?'

'গোস্তাকি মাফ করবেন হুজুর। কথায় বলে লেবু বেশি কচলালে তিতে হয়ে যায়।'

কৌতূহলী চোখে মুনশির মুখপানে চাইলেন ক্লাইভ।

নবকৃষ্ণ জোড়হস্ত হয়ে বললেন, 'যাই হোক না কেন নবাবজাদা বলে কথা। আপনি বারবার হাঁকিয়ে দিচ্ছেন। ওদিকে নিজামতের অন্দরে তার মান নিয়ে টানাটানি পড়ছে। ছোকরা আপনার ভয়ে একেবারে আধমরা হয়ে আছে। এইবারে রশি একটু আলগা না করলে ভয়টা ভেঙে যেতে পারে। কাঁচা বয়স, তাজা রক্ত—বুঝতেই তো পারছেন হুজুর!'

ক্লাইভ মাথা নেড়ে বললেন, 'ওয়েল সেইড মুনশি। ছোকরাকে গুড হিউমারে রাখা দরকার।'

নবকৃষ্ণ বললেন, 'সেই ভালো। কী বলতে চায় শুনে নিন।'

'এখানেই আসতে বলো।'

অর্ডারলি এসে একটা কুরসি ও চৌপাই রেখে যায়।

খানিকবাদে ক্লাইভের সম্মুখে এসে হাজির হয় মিরন।

'প্লিজ সিট।'

কুরসিতে বসে মিরন বলল, 'দেওয়ানের নামে আপনার কাছে শিকায়ত আছে।'

কৌতূহলী চোখে মিরনের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন ক্লাইভ।

'মারাঠাদের সঙ্গে বাতচিত চালাচ্ছেন দেওয়ান। ফির ইনকিলাব ঘটানোর মতলব করছেন।'

মুচকি হেসে বেশ অবাক হওয়ার ঢঙে ক্লাইভ শুধোলেন, 'ইনকিলাব?'

তার কথা খুব হালকা ভাবে নিচ্ছেন দেখে মরিয়া হয়ে মিরন বলল, 'আমি সচ বলছি সাহেব। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন। দেওয়ানের সঙ্গে মোলাকাত করতে এসেছিলেন শিবভট্ট। দু'দিন আগে।'

ক্লাইভ মুচকি হেসে বললেন, 'জানি। এও জানি দেওয়ানের সঙ্গে তার মোলাকাত হয়নি।'

ক্লাইভের এই প্রতিক্রিয়ায় একেবারে মিইয়ে গেল মিরন। সে ভেবেছিল রায়দুর্লভের নামে শিকায়ত জানিয়ে তার বিরুদ্ধে কর্নেলকে উত্তেজিত করে তোলা যাবে।

মিরন তবু বলল, 'এ তরিকা স্রেফ এক ধোঁকাবাজি।'

ক্লাইভ প্রশ্ন করলেন, 'দেওয়ানের উপর আপনার এত গুসসা কেন?'

'দেওয়ান গদ্দারি করছেন।'

'তার সাবুত কোথায়?'

'আমি সচ বলছি সাহেব। বাংলায় ফের হাঙ্গামা বাঁধিয়ে দেওয়ানজি মসনদ দখল করতে চাইছেন। এই ওয়াক্তে হাঙ্গামা বাঁধলে তো আপনাদেরই তকলিফ বাড়বে।'

'তকলিফ বাড়াচ্ছেন তো আপনি।'

মিরনের মুখের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে হাসির রেশ রেখে কথাটা বললেন ক্লাইভ।

ক্লাইভের এই প্রতিক্রিয়ায় বেশ ঘাবড়ে গেল মিরন।

ক্লাইভ ফের বললেন, 'বাড়াচ্ছেন না তকলিফ? কাশিমবাজার থেকে ফৌজ পাঠাতে হচ্ছে।'

শুকনো মুখ করে মিরন বলল, 'ভেবেছিলাম মিরজা মেহেদিকে মসনদে বসাতে চান দেওয়ান।'

'স্রেফ আন্দাজের বশে এমন একটা ভয়ানক কাণ্ড আপনি ঘটিয়ে ফেললেন?'

মিরন নিশ্চুপ।

এবারে গম্ভীর মুখে ক্লাইভ বললেন, 'আপনাকে আমি আবার রিকোয়েস্ট করছি। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে চলবেন। মিরজাফর খাঁ, জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ, রায়দুর্লভ ইনকিলাব চেয়েছিলেন। তাই তাদের মদত দিয়েছিলাম আমরা। এখন আপনারা নিজেদের মধ্যে কাজিয়া বাঁধিয়ে কোম্পানির বেইজ্জত করছেন। দেওয়ানের সঙ্গে কথা বলব আমি। তবে আমার আরমান হল এই যে দেওয়ানের উপরে কোনও আঁখেজ রাখবেন না আপনি। আমার উপর ভরসা রাখুন। ফের কোনও ইনকিলাব হবে না বাংলায়। মসনদে মিরজাফর খাঁ-ই থাকবেন।'

ক্লাইভের কথা শুনে খুব একটা খুশি হল না মিরন। কুরসি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে 'আপনার এই বাত আমি ইয়াদ রাখব সাহেব। দেওয়ানজির সঙ্গে রিস্তেদারি মজবুত রাখার কোশিশ করব।'

'দ্যাটস গুড।'

৪৩

গিরিয়ায় এসে ক্লাইভের মুখ গম্ভীর হল। পড়ে আছে ধু-ধু শূন্য প্রান্তর। অপরিষ্কার হয়ে আছে গোটা ময়দান। জায়গায় জায়গায় গর্তের মধ্যে পড়ে আছে পোড়া ছাই। তার চারপাশের ঘাস পুড়ে ঝামাকালো হয়ে আছে। বোঝাই যাচ্ছে এগুলো চুলা জ্বালানোর সাবুৎ। জায়গায় জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে হাতি-ঘোড়ার মল, আবর্জনা। বাতাসে উড়ছে এঁটো শালপাতা।

ক্লাইভ বুঝলেন, কিছুদিন আগে এখানে নবাবের ছাউনি পড়েছিল। নিশ্চয়ই তিনি তাঁবু গুটিয়ে আরও সামনে এগিয়ে গিয়েছেন। স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নবকৃষ্ণ শুনলেন, নবাব রাজমহলের দিকে গিয়েছেন।

ক্লাইভ গম্ভীর মুখে বললেন, 'লেট আস মুভ অ্যাহেড।'

কয়েকদিন পরে ফৌজ নিয়ে রাজমহলে এসে পৌছলেন ক্লাইভ। গিরিয়ায় অপেক্ষা করার কথা লিখেও, নবাব এগিয়ে রাজমহল অবধি চলে আসায় তিনি যে বেশ বিরক্ত হয়েছেন সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য নবাবের ছাউনি থেকে মাইল খানেক দূরে ছাউনি ফেলার হুকুম দিলেন।

ক্রমশ মরে আসছে দিনের আলো। টকটকে লাল রঙের সূর্যটা খানিকবাদে হারিয়ে যাবে পাহাড়ের আড়ালে। টিলার উপরে নিজের তাঁবুর সামনে একাকী দাঁড়িয়ে রয়েছেন ক্লাইভ। ঠোঁটে গোঁজা রয়েছে পাইপ। দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন দূরে। যতদূর চোখ যায় গাছপালা আর বুনো ঝোপে ঢাকা ধু-ধু প্রান্তর! কালচে রং ধরেছে সবুজের গায়ে। কুয়াশা নামছে। দূরের সবুজ কুয়াশায় ইতিমধ্যেই ঝাপসা হয়ে এসেছে। অনেকটা দূরে দেখা যাচ্ছে শাদা ফিতের মতো ছাইরঙা গঙ্গা।

নদীর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ক্লাইভের মনে পড়ে গেল অতীতের কথা। দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেল এই বাংলায়। এই তো সেদিন—গত বছর ঠিক এই সময়ে তিনি ফৌজ নিয়ে পৌঁছেছিলেন ফলতায়। তারপরে কত কাণ্ড ঘটে গেল গত কয়েক মাসে। সামনের কয়েকটা বছর বাংলার রাজনীতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আরও অনেক কিছু ঘটবে। তার ফায়দা তোলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে ইংরেজদের।

ভবিষ্যতের ঘটনাপ্রবাহের অবয়ব যেন ক্লাইভের চোখে ক্রমশ যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। গোটা হিন্দুস্তানকে ইংরেজ অধিকারে নিয়ে আসা খুব কঠিন কাজ নয়। ইদানীং এরকম একটা দুঃসাহসিক ভাবনা উঁকি দিচ্ছে

তাঁর মনে। ইংরেজদের মুঠোর মধ্যে গোটা একটা দেশ। ঐশ্বর্যে ভরপুর হিন্দুস্তান। ক্লাইভের চোখদুটো লোভে চকচক করে ওঠে।

এখন শুধু প্রয়োজন সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ। আরও সৈন্য চাই। সঙ্গে যে পরিমাণ সৈন্য রয়েছে তা দিয়ে হিন্দুস্তান কবজা করা যাবে না। এ কথাটা বোঝাতে হবে লন্ডনের বড় সাহেবদের। একদল দক্ষ সৈন্য ও কয়েকজন সাহসী উদ্যোগী অফিসারকে পাঠালে এ দেশে ইংরেজ অধিকার কায়েম করা খুব একটা কঠিন কাজ হবে না। তারপর খুশিমতো দৌলত লুঠে নেওয়া যাবে। এই প্রস্তাব নিয়ে বড় সাহেবদের কাছে দরবার করার জন্য একবার লন্ডনে যেতে চান ক্লাইভ। তবে সে সময় এখনও আসেনি। আপাতত ঘটনাপ্রবাহের উপরে তিনি কড়া নজর রাখতে চান।

জানালার চিলমন পর্দার ফাঁক দিয়ে ভোরের প্রথম আলো এসে পড়েছে তাঁবুর অন্দরে। সবে ঘুম ভেঙেছে নবাবের। সহসা চমকে উঠলেন তিনি।

গুড়ুম! গুড়ুম! গুড়ুম!

দূর থেকে ভেসে আসছে কামানের গর্জন। ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসলেন মিরজাফর খাঁ। নিমেষে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল তার চোখেমুখে। বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখদুটো। এই সাতসকালে তোপ দাগছে কারা? নবাবের মনে পড়ে গেল এ বছরের গোড়ার দিকের এক ভয়ানক স্মৃতি।

৫ ফেব্রুয়ারি, ১৭৫৭। সেদিন কলকাতায় ঘন কুয়াশার চাদরে মোড়া ভোরে এভাবেই কামানের শব্দে ঘুম ভেঙেছিল মিরজাফরের। হালসিবাগানে উমিচাঁদের বাগানবাড়ি প্রাঙ্গণে নবাব সিরাজদ্দৌলার ছাউনিতে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়েছিলেন রবার্ট ক্লাইভ। সিপাহসালার মিরজাফর খাঁর তাঁবু ফুড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল কামানের একটা গোলা। প্রবল ত্রাসে প্রায় অর্ধনগ্ন অবস্থায় তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে এসে দিগভ্রান্ত হয়ে ছুটেছিলেন মিরজাফর। কুয়াশার আড়ালের ওপার থেকে ভেসে আসছিল ইংরেজদের চিৎকার। ‘অ্যাটাক! অ্যাটাক! ডেস্ট্রয় দ্য এনিমি।’

আজ নিজের তাঁবুটা অক্ষত দেখে সাময়িক স্বস্তি পেলেন মিরজাফর। মানুষের চিৎকার চেঁচামেচি, কোলাহল অবশ্য শোনা যাচ্ছে না। পোশাকাশাক সামলে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এসে নবাব নিশ্চিন্ত হলেন। না, কেউ তাঁর ছাউনির উপরে হামলা করেনি। কামানের শব্দ ভেসে আসছে দূর থেকে। শীতের বাতাস দূরের শব্দকে অনেক কাছে টেনে আনছে। তাই মনে হচ্ছে যেন দুশমন একেবারে দুয়ারে এসে হাজির হয়েছে।

সমানে গর্জন করছে তোপ। গুড়ুম! গুড়ুম! গুড়ুম!

রাজমহলের এই আইরান প্রান্তরে তোপ দাগছে কারা?

আতঙ্ক ছড়িয়েছে নবাবের গোটা শিবিরে। অনেকেই তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে এসে তোপগর্জনের উৎস খোঁজার চেষ্টা করছে। ছোট একটা টিলার উপরে দাঁড়িয়ে মিরজাফর দেখলেন দূর থেকে তিরবেগে ছুটে আসছে একজন ঘোড়সওয়ার। দূরবিনে চোখ রেখে দেখলেন, গোবিন্দমল্ল। তাঁরই কাসিদ বাহিনীর দলপতি।

টিলার ঢাল বেয়ে উঠে এসে নবাবের তাঁবুর সামনে ঘোড়া থেকে নামলেন গোবিন্দমল্ল। তাঁর মুখে অবশ্য শঙ্কার ছাপ নেই। ঠোঁটের কোণে লেগে আছে মৃদু হাসি।

ব্যস্ত হয়ে নবাব প্রশ্ন করলেন, ‘কী পয়গাম? তোপ দাগছে কারা?’

গোবিন্দমল্ল বলে, ‘চিন্তার কিছু নেই হুজুর। তোপ দাগছে গোরা পল্টন।’

প্রবল বিস্ময়ের সঙ্গে মিরজাফর প্রশ্ন করেন, ‘গোরা পল্টন?’

‘জি হুজুর। কর্নেল ক্লাইভ ফৌজ নিয়ে এসে পড়েছেন।’

‘কর্নেল ক্লাইভ!’ বিস্ময়ে স্বগতোক্তির মতো কথাটা আওড়ালেন মিরজাফর।

গোবিন্দমল্ল বলে, 'জি হুজুর। ক্লাইভ সাহেব তাঁবু গেড়েছেন এখান থেকে মাইল খানেক দূরে।'

রাজমহলে পৌঁছেও নবাবের সঙ্গে মোলাকাত না করে খানিক দূরে তাঁবু ফেলার অর্থ হাতড়াতে থাকেন মিরজাফর খাঁ। মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে আরও অনেক প্রশ্ন। ক্লাইভ পৌঁছে গেলেন রাজমহলে। কোনও আগাম খবর পাঠালেন না কেন? এখানে এসে প্রথমেই নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎই বা করলেন না কেন? কী তাঁর মনসুবা?

নবাবের চিন্তিত মুখের দিকে চেয়ে গোবিন্দমল্ল বললেন, 'ভাবনার কিছু নেই হুজুর। গোরা পল্টনেরা মহড়া দিচ্ছে মাঠে। তোপের পাল্লা পরখ করছে।'

শশব্যস্ত হয়ে তাঁবুর অন্দরে প্রবেশ করেন মিরজাফর।

নবাবের হাতিকে তাঁবুর সামনে এনে দাঁড় করাল মাহুত।

খানিকবাদে দরবারি পোশাকাশাকে সজ্জিত হয়ে অন্দর থেকে বেরিয়ে এলেন মিরজাফর খাঁ। দ্রুত চড়ে বসলেন হাতির পিঠে। ক্লাইভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তিনি ব্যস্ত। নবাবের সঙ্গী গোবিন্দমল্ল, মিরকাজিম ও পঁচিশজন দেহরক্ষী।

ইংরেজদের ছাউনির কাছে এসে চমকে গেলেন নবাব। খোলা বিস্তীর্ণ মাঠে দুপক্ষে ভাগ হয়ে যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছে ক্লাইভের ফৌজ। দূরে একটা টিলার গায়ে তোপ দাগছে গোলন্দাজরা। তোপের পাল্লা পরীক্ষার এই ধকল সইতে গিয়ে পাহাড়ের সবুজ উপড়ে গিয়ে মাটি বেরিয়ে পড়েছে।

মাঠের আরেকদিকে কামানের সঙ্গে সমানে গজরাচ্ছে ফ্লিন্টলক রাইফেল। চাঁদমারি করছে অন্য একদল সৈন্য। গোরা পল্টনদের মহড়া দেখে মিরজাফরের হাড়হিম হয়ে গেল। সাধারণত কোনও বড় লড়াইয়ের আগে এমন কঠোর অনুশীলন করে নিজেদের প্রস্তুত করে ফৌজিরা। মিরজাফর দেখলেন, মাঠের একেবারে মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন ক্লাইভ। গভীর মনোযোগের সঙ্গে মহড়া পর্যবেক্ষণ করছেন।

দূর থেকে নবাবকে দেখতে পেলেন ক্লাইভ, তবে তাঁর উপস্থিতিকে আলাদা করে কোনও গুরুত্ব দিলেন না কর্নেল। রাইফেল হাতে নিজের নিশানা পরখের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

হাতির পিঠ থেকে নেমে এলেন নবাব।

নবকৃষ্ণ তসলিম জানিয়ে বললেন, 'সেলাম হুজুর। সহি সালামত। খুশ তবিয়ত থাকুন।'

নবাব প্রশ্ন করলেন, 'কখন পৌঁছলেন কর্নেল?'

'গতকাল অপরাহ্নে।'

সামান্য ইতস্তত করে মিরজাফর বললেন, 'পূর্ণিয়ায় জবরদস্ত লড়াইয়ের খবর পেয়ে গিরিয়া ছেড়ে আমি এগিয়ে এসেছিলাম। কর্নেলের গুসসা হয়নি তো?'

নবাবের ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া ভীত মুখটা দেখে মজা পেলেন নবকৃষ্ণ। মুখে বললেন, 'কর্নেল সাহেব আপনার জিগরিদোস্ত। তিনি কি আপনার উপর গোঁসা করতে পারেন?'

গোলামেরা কয়েকখানা কুরসি নিয়ে এল।

নবকৃষ্ণ বললেন, 'আপনারা বসুন। আপনার আগমন সংবাদ সাহেবকে জানিয়ে আসি।'

গোরা পল্টনদের কুচকাওয়াজ দেখে ত্রাসে বাক্যিহারা হয়ে গিয়েছেন মিরকাজিম।

গোবিন্দমল্ল কিছুটা স্বাভাবিক।

নবকৃষ্ণকে ডেকে মিরজাফর বললেন, 'এক বাত মুনশিজি!'

মাঠের দিকে যাওয়ার জন্য উদ্যত নবকৃষ্ণ ঘুরে তাকালেন। 'মুনশিজি'—কথাটা বড় মধুর শোনাল নবকৃষ্ণের কানে। নবাব তো দূরের কথা কোম্পানির সামান্য চাকুরে বলে এতকাল মুর্শিদাবাদ দরবারের

সামান্য ওমরাহরাও তাঁকে উপেক্ষা করেছে, তাচ্ছিল্য করেছে। আর আজ? স্বয়ং সুবে বাংলার নবাব খাতির করে মুনশিজি বলে সম্বোধন করছেন তাঁকে! এসবই সম্ভব হয়েছে ক্লাইভ সাহেবের জন্য। তাঁর দাপটে তটস্থ নবাব। তাই এই অপ্রত্যাশিত সম্ভাষণ। ক্লাইভের উপরে নবকৃষ্ণর প্রভাব যে কতখানি, তা অনেকেই জানে।

নবাব খোশামোদের সুরে বললেন, 'বড়িয়া কুচকাওয়াজ। বড়িয়া কসরত।'

'যা বলেছেন হুজুর।'

'কর্নেল সাহেবের ফৌজকে আমি দশ হাজার রুপেয়া ইনাম দেব।'

'বহুত খুব। কর্নেল খুশি হবেন।' এই বলে মাঠের অন্দরে প্রবেশ করলেন নবকৃষ্ণ। 'ক্লাইভের কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনার মদ্দা গর্ধভটা এসে পড়েছে হুজুর।'

বন্দুকের ট্রিগার টিপতে গিয়ে নজর ঘুরিয়ে চকিতে নবকৃষ্ণের মুখের দিকে চাইলেন ক্লাইভ। ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি।

নবকৃষ্ণ চাপা গলায় বললেন, 'ফৌজিদের মহড়া দেখে বেজায় ঘাবড়ে গিয়েছেন। বোধহয় ভাবছেন মসনদ এই রাজমহলেই বেহাত হয়ে গেল।'

ট্রিগার টিপলেন ক্লাইভ। ঝিং শব্দে বুলেট গিয়ে ধাক্কা খেল দূরে চাঁদমারির জন্য খাড়া করে রাখা লোহার দণ্ডে। নিখুঁত নিশানা।

'আপনাকে খুশি করার জন্য দশ হাজার টাকা ফৌজিদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে চাইছেন।'

'ভেরি গুড।'

'এখন আপনি সাক্ষাৎ করবেন কি?'

'ঘণ্টাখানেক বসিয়ে রাখি। দহসত আরও জবরদস্ত হবে। কী বল?'

'যেমন আপনার খায়েশ।' এই বলে ক্লাইভের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নবাবের সম্মুখে এসে নবকৃষ্ণ বললেন, 'একটু অপেক্ষা করুন। কর্নেল কাজ সেরে আসছেন।'

অগত্যা মাঠের ধারে অপেক্ষা করতে বাধ্য হলেন মিরজাফর খাঁ। ভেবেছিলেন কর্নেলের হাতেই সিক্কা টাকায় ভরা চামড়ার খেরিয়াগুলো তুলে দেবেন। মত বদলে নবকৃষ্ণর হাতে টাকার খেরিয়াগুলো তুলে দিয়ে হাসি হাসি মুখ করে বললেন, 'ইনাম। দশ হাজার রুপেয়া।'

মাথা ঝুঁকিয়ে নবাবকে ফের তসলিম জানালেন নবকৃষ্ণ।

৪৪

প্রকৃত অর্থেই ঘণ্টাখানেক নবাবকে অপেক্ষা করানোর পর কুচকাওয়াজের ময়দান ছেড়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এগিয়ে এলেন ক্লাইভ।

'ওয়েলকাম হুজুর। ওয়েলকাম টু মাই ক্যাম্প।' হাসি মুখে সম্ভাষণ করলেন কর্নেল।

ক্লাইভের মনসুবা কী? তা নিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে গত এক ঘণ্টা সময় বড় উৎকণ্ঠায় কাটিয়েছেন মিরজাফর। কর্নেলের মুখে হাসি দেখে খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন তিনি। কুরসি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নবাব বললেন, 'সেলাম সাহেব। সহি সালামত, খুশ তবিয়ত থাকুন।'

'প্লিজ সিট। প্লিজ সিট।' এই বলে নবাবের উলটোদিকে কুরসিতে বসলেন ক্লাইভ। মাথা থেকে তেকোনা টুপিটা খুলে পাশে চৌপাইয়ের উপরে রাখলেন। মহড়ার ধকলে দরদর করে ঘামছেন। ঘাড় অবধি লম্বা চুল বেয়ে জল ঝরছে টপটপ করে।

ক্লাইভ বললেন, 'আপনার চিঠি আমি ঠিক সময়েই পেয়েছিলাম। আই ওয়াজ অ্যা লিট্‌ল লেট টু লিভ আফটার ফিনিশিং সাম ওয়ার্ক। গিরিয়া ছেড়ে এগিয়ে এসে আপনি ভালোই করেছেন।'

মিরজাফরের বুক থেকে যেন পাষাণভার নেমে গেল। হাঁফ ছেড়ে তিনি বাঁচলেন। অপেক্ষা না করে ফৌজ নিয়ে রাজমহল চলে আসায় কর্নেল মোটেই তার উপরে বিরক্ত হননি। এই অবধি সাহেব নিজেই যখন চলে এসেছেন তখন নিশ্চয়ই পাটনা যেতে আপত্তি করবেন না—এই ভেবে ভিতরে ভিতরে বেশ পুলকিত হয়ে উঠলেন নবাব।

রুপোর পিরিচে করে কফি নিয়ে এল অর্ডারলি।

ক্লাইভ বললেন, 'এদিকে ঠান্ডা বড় জবরদস্ত। কফি ওয়ার্মস দ্য বডি।'

'সহি বাত।' এই বলে রেকাবি থেকে কফির পিরিচ তুলে নিলেন নবাব।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে ক্লাইভ শুধোলেন, 'পূর্ণিয়ার পয়গাম কী আছে?'

কফির কাপে চুমুক দিয়ে হাসি মুখে নবাব বললেন, 'আমি আপনাকে খুশখবর শোনাতে পারি। বাগিদের টিট করেছে খাদিম হোসেন। পূর্ণিয়া নিয়ে আর কোনও তকলিফ নেই। খাদিমকে আমি পূর্ণিয়ার ফৌজদার পদে বহাল করেছি।'

ক্লাইভ বললেন, 'দ্যাটস গুড। আই অ্যাম রিলিভড। আফটার স্পেন্ডিং হলিডেজ হিয়ার ফর অ্যা উইক আই উইল গো ব্যাক টু ক্যালকাটা।'

মিরজাফর একটু দমে গিয়ে বললেন, 'ওয়াপস যেতে চান?'

'ইয়েস। দেয়ার ইজ নাথিং এলস টু ডু হিয়ার।'

'পূর্ণিয়ার অচল সিং তো মামুলি এক ইনসান। রামনারায়ণজি খতরনক।'

'ডু ইউ ওয়ান্ট টু ডিক্লেয়ার ওয়ার এগেইনস্ট হিম?'

'জি সাহেব। তিনি গদি ছাড়তে নারাজ হন তো আমাকে লড়াই করতেই হবে। আপনি ফৌজ নিয়ে আমার সঙ্গে পাটনায় চলুন।'

কিছুই যেন জানেন না, এমন ভাব করে ক্লাইভ শুধোলেন, 'রামনারায়ণজির কসুর কী আছে?'

'আমাকে মুসিবতের মধ্যে ফেলতে চান তিনি। অচল সিং-এর মতো বাগিদের মদত দিয়ে বেচ্যায়েন করছেন বাংলাকে। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাকে মদত দিয়ে তাঁর হাতে বাংলার মসনদ তুলে দিতে চান। বুড্ঢা গদ্দারকে সবক শেখানো দরকার।'

কফি শেষ করে চৌপাইয়ের উপরে পিরিচ নামিয়ে রাখলেন ক্লাইভ। তারপর কোটের পকেট থেকে পাইপটা বের করে ঠোঁটে গুঁজলেন। একজন অর্ডারলি এসে চকমকি পাথর ঠুকে পাইপে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেল। কুরসির গায়ে দেহটাকে এলিয়ে দিলেন ক্লাইভ।

রুদ্ধশ্বাস উৎকণ্ঠায় ক্লাইভের প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন মিরজাফর। কেবল নিজের উচ্ছৃঙ্খল বাহিনীর ভরসায় রামনারায়ণের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে যাওয়ার সাহস তার নেই। ক্লাইভ যদি পাটনা যেতে রাজি না হন তো তাঁকে রাজমহল থেকে ফিরে যেতে হবে। সে এক ঘোর বেইজ্জতি।

ধোঁয়ার কুণ্ডলী উড়িয়ে সোজা হয়ে বসলেন ক্লাইভ। গম্ভীর মুখে বললেন, 'আই অ্যাম সরি। ইট ইজ নট পসিবল ফর মি টু গো টু পাটনা।'

নিমেষে চুপসে গেলেন নবাব। গায়েব হয়ে গেল তার খুনজোশি। মুখে জমাট বাঁধল আঁধার। ক্ষণেক ইতস্তত করে শুধোলেন, 'আপনি নারাজ কেন?'

নবাবের প্রশ্নটা প্রত্যাশিত। এর উত্তরে কী বলবেন সেটা আগে থেকেই ভাবা ছিল ক্লাইভের। বললেন, 'কোম্পানি উইল নট অ্যালাউ মি টু মুভ অ্যাহেড ফারদার।'

মিরজাফর একেবারে বিস্মিত হয়ে গেলেন। তিনি জানতেন বাংলায় ক্লাইভ মানে কোম্পানি আর কোম্পানি মানে ক্লাইভ। কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অন্য কারও মুখপানে তাকিয়ে থাকতে হয় না তাঁকে। তাঁর ইচ্ছাই কোম্পানির ইচ্ছা। এখন যে শুনছেন অন্য কথা।

মিরজাফরের ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখের উপরে ছুরির ফলার মতো ধারাল দৃষ্টি হেনে ক্লাইভ বললেন, 'এক বাত আপনার বোধহয় ইয়াদ নেই।'

ক্লাইভের এই প্রশ্ন শুনে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন মিরজাফর।

'পলাশির ইকরারনামা মোতাবেক এই নভেম্বরে দ্বিতীয় কিস্তির তেইশ লাখ রুপেয়া মেটানোর কথা ছিল আপনার। সে কথা আপনি রাখেননি। কোম্পানি ওয়ান্ট দ্যাট অ্যামাউন্ট ইমিডিয়েটলি। এই টাকা না পেলে ফৌজ নিয়ে পাটনা যাওয়ার হুকুমত কিছুতেই কোম্পানি আমাকে দেবে না।' গলায় ক্ষোভের সুর মিশিয়ে কথাগুলো বললেন ক্লাইভ।

চোখে অন্ধকার দেখলেন মিরজাফর খাঁ। নবাবিয়ানা ও নিজামত চালানোর খরচ বাঁচিয়ে রেখে এই মুহূর্তে ইংরেজদের দেওয়ার মতো অত টাকা কোষাগারে নেই বলেই তাঁর ধারণা। এই অর্থ-সংকট থেকে পরিত্রাণ পেতে রামনারায়ণের দৌলত দখলের মনসুবা নিয়ে তিনি পাটনায় যেতে চাইছেন, ওদিকে এখনই ক্লাইভ চাইছেন টাকা।

কাতর মিনতির সুরে নবাব বললেন, 'কয়েক মাহিনা ইন্তেজার করা যায় না সাহেব?'

'ইন্তেজার করতে পারে কোম্পানি। লেকিন আপনি এখনই বকেয়া না মেটালে এখান থেকে ফৌজ নিয়ে আমাকে ক্যালকাটায় ফিরে যেতে হবে। কোম্পানি উইল নট অ্যালাউ মি টু মুভ অ্যাহেড ফারদার উইথ মাই কনটিনজেন্ট।'

একেবারে গভীর গাড্ডায় পড়লেন মিরজাফর খাঁ। সত্যিই কি তবে বেইজ্জত হতে হবে? তামাম বাংলার মানুষ জানবে নবাব বুজদিল। একার হিম্মতে রামনারায়ণকে শায়েস্তা করতে পাটনা যাওয়ার মুরোদ তাঁর নেই। ক্লাইভ পাটনা যেতে নারাজ বলে রাজমহল অবধি এগিয়েও ফিরে এলেন নবাব। মিরজাফর খাঁ নালায়েক। ডরপোক। এই আলোচনা চলবে রাজধানীর অলিগলিতে।

নবাবের চিন্তিত মুখটা ভালো করে ইয়াদদস্ত করে ক্লাইভ বললেন, ' হোয়াই আর ইউ থিংকিং সো মাচ? আপনি ইমানদার আদমি। প্রমিজ করেছিলেন সহি ওয়াক্তে কিস্তির টাকা আপনি মিটিয়ে দেবেন। এখনও যদি মিটিয়ে দেন তো আই হ্যাভ নো প্রবলেম গোইং টু পাটনা ইফ কোম্পানিজ ডিম্যান্ড ইজ সেটলড।'

হতাশ গলায় মিরজাফর বললেন, 'আভি আপনাদের দাবি মেটানোর মতো রুপেয়া তোশাখানায় আছে কি না আমার জানা নেই। দেওয়ান সাহেব বলতে পারবেন।'

'বেশ তো, দেওয়ান সাহেবকে তলব করুন এখানে।'

'তলব করতেই পারি, তবে দেওয়ান সাহেব সেই হুকুমত ইনকার করতে পারেন।'

দেওয়ানের সঙ্গে নবাবের সম্পর্কে যে চিড় ধরেছে সে কথা ভালো করেই জানেন ক্লাইভ। তবুও, কিছুই না জানার ভান করে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'নবাবের হুকুম দেওয়ান তামিল করবেন না? হোয়াট আর ইউ সেয়িং? নিজামত চলছে কি করে?'

'দেওয়ানকে বরখাস্ত করতে চাই আমি।' গম্ভীর গলায় বললেন নবাব।

প্রমাদ গুণলেন ক্লাইভ। পলাশির সুলেনামার বিষয়ে বিস্তারিত জানেন রায়দুর্লভ। তাছাড়া ইংরেজদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ইদানীং খুবই মধুর। এখন নবাব যদি দেওয়ানকে বরখাস্ত করার মতলব আঁটেন তো খুবই বিপদের কথা। রায়দুর্লভ দেওয়ানের পদ থেকে সরে গেলে যিনি দেওয়ান হবেন তাঁর কাছ থেকে হকের টাকা বুঝে নিতে তকলিফ হতে পারে কোম্পানির।

কোনও রাখঢাক না করে ক্লাইভের সমুখে বিষ উগরে দিয়ে মিরজাফর ফের বললেন, 'দেওয়ান বেইমানি করছেন আমার সঙ্গে। ইদানীং আমার কোনও কথাই মানছেন না। সময়মতো ফৌজিদের মাহিনা চোকাচ্ছেন না। আমাকে তকলিফের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। দেওয়ান দরবারে আসেন না। টাকাকড়ির হিসেব দাখিল করেন না। তার উপরে অচল সিং, রামনারায়ণকে মদত দিচ্ছেন।'

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে থামলেন নবাব।

ক্লাইভ বুঝলেন দু'জনের মধ্যে গোলমাল বেশ ভালোই পেকে উঠেছে। একদিক থেকে মনে মনে খুশিই হলেন তিনি। নিজামতের মাতব্বরেরা যত কোন্দল করবেন নিজেদের মধ্যে তত দুর্বল হবেন নবাব। তাতে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে সুবিধা কোম্পানিরই।

আপাতত সুকৌশলে কিস্তির বকেয়া টাকাটা আদায় করতে চান ক্লাইভ। তিনি শুধোলেন, 'ডু ইউ হ্যাভ এনি এভিডেন্স টু সাপোর্ট হোয়াট ইউ আর সেয়িং?'

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে মিরজাফর বললেন, 'সাবুৎ? আমি সহি বাত বলছি।'

ক্লাইভ নরম গলায় বললেন, 'জানি, আপনি ইমানদার আদমি। লেকিন কোনও সাবুৎ ছাড়া তো দেওয়ানের উপরে এমন গহেরা ইলজাম আনা সহি কাম হবে না।'

মুখ গম্ভীর হল মিরজাফরের।

ক্লাইভ বললেন, 'আপনি, দেওয়ান সাহেব, জগৎশেঠজি ইনকিলাব চেয়েছিলেন। তাই আমরা মদত দিয়েছি আপনাদের। সিরাজদ্দৌলাকে হটিয়ে আপনি মসনদে বসেছেন। এখন আপনারা যদি নিজেদের মধ্যে কাজিয়া বাঁধান, দেন হু উইল টেক কেয়ার অফ দ্য পিপল? হোয়্যার ডু উই গো? উই হ্যাভ কাম টু ডু ট্রেড উইথ ইওর ট্রাস্ট।'

ক্লাইভের কথার প্যাঁচে নাজেহাল অবস্থা নবাবের। হতাশ গলায় বললেন, 'সহি বাত। আপনাদের সকলকে সহি সালামত রাখার দায় আমার। লেকিন...'

'লেকিন কোম্পানি সহি সালামত থাকে কী করে? তেইশ লাখ রুপেয়া নিজামতের কাছ থেকে আমাদের পাওনা। কোনও জুলুমবাজি নয়। পলাশির সুলেনামায় লেখা আছে। আপনার ও দেওয়ানের দস্তখত আছে তাতে। আপনি কি দেওয়ানের সঙ্গে কাজিয়ার অজুহাত দিয়ে সব জিম্মেদারি কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন?'

ক্লাইভের গলার স্বর একটু বেশি রকমের রুক্ষ শোনাল মিরজাফরের কানে। ঘাবড়ে গিয়ে জোড়হস্ত হয়ে তিনি বললেন, 'আমার উপরে গলত ইলজাম আনবেন না সাহেব। আপনাদের হকের টাকা মেটাব না, এমন মনসুবা আমার নেই।'

ধূর্ত রবার্ট ক্লাইভ জানেন এই পরিস্থিতিতে মাথা গরম করলে চলে না। নরমে-গরমে, অনুনয়ে-ধমকে নবাবকে মুঠোর মধ্যে রেখে, সুতো দিয়ে খুশি মতো নাচিয়ে টাকা আদায়ই আসল কথা। কৌশলে তিনি তুখোড়। নিমেষে গলার স্বর কয়েক পর্দা নামিয়ে বললেন, 'গোস্তাকি মাফ করবেন হুজুর। আই অ্যাম সরি ইফ মাই ওয়ার্ডস হার্ট ইউ। আমার উপর কোম্পানির চাপ যে কতটা সেটা নিশ্চয়ই আন্দাজ পাচ্ছেন। লড়াই তো কোম্পানির অনেকেই চায়নি। আমার কথাতেই তো গোরা পল্টন পলাশির ময়দানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।'

আবেগতাড়িত হয়ে ক্লাইভের হাতদুটো ধরে মিরজাফর বললেন, 'আপনি আমার দোস্ত। আপনার কথায় কিছু মনে করিনি আমি।'

ক্লাইভ বললেন, 'ইউ মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইফ কোম্পানি ডাজ নট গেট দ্য মানি দেন দ্য রেসপনসিবিলিটি উইল ফল অন মি।'

'আল্লার নামে কসম খেয়ে বিলকুল সচ বলছি—তোশাখানার আখবরাত আমি জানি না।'

ক্লাইভ মোলায়েম গলায় বললেন, 'আপনি দেওয়ানকে এখানে তলব করুন। ইস্যু অ্যান অর্ডার টু প্রেসেন্ট দ্য অ্যাকাউন্ট বিফোর ইউ। দেন সেটল দ্য ম্যাটার।'

মিরজাফর খানিকটা নিমরাজি হয়ে বললেন, 'বেশ আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি।'

উঠে দাড়ালেন ক্লাইভ। কুরসি ছেড়ে উঠলেন মিরজাফরও।

দূরে দাঁড়িয়ে আছে হাতি। বিমর্ষ মুখে সেদিকে এগিয়ে চললেন নবাব। খানিক দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মিরকাজিম ও গোবিন্দমল্ল। নবাবের বিরস মুখটা দেখে মিরকাজিমের বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। সেবার তার পাটনার গদিতে বসার খোয়াব বরবাদ হয়েছিল আয়ারকুটের জন্য। এবারে কি কর্নেল ক্লাইভের জন্য ফির একবার তা বরবাদ হতে চলেছে? পাটনা অভিযানের পরিকল্পনা কর্নেল কি নাকচ করে দিলেন? মিরকাজিম জানেন ক্লাইভ আপত্তি করলে পাটনার পথে আর এক পা'ও এগোবেন না নবাব। মনোবাসনা পণ্ড হওয়ার আন্দেশায় নিজের সহোদরের উদ্দেশে মনে মনে বিষোদ্গার করতে লাগলেন মিরকাজিম—'আপনি বুজদিল! আহাম্মক! বেওকুফ! সাধে কি মির্জা শামসুদ্দিন আপনাকে বলে কর্নেল ক্লাইভের মন্দা গর্ধভ!'

নবাবের পাশে হাঁটতে হাঁটতে ক্লাইভ বললেন, 'এই ভালো হল হুজুর। আমি জানি, আপনার চিঠি পেলে এখানে ছুটে আসবেন দেওয়ান। আপনার হুকুমত ইনকার করার হিম্মত তাঁর হবে না।'

হাতির পাশে এসে দাঁড়ালেন মিরজাফর খাঁ। প্রস্তুত দেহরক্ষীরা। প্রস্তুত মাহুত।

তসলিম জানালেন ক্লাইভ। হাতির পিঠে চেপে বসলেন নবাব। কিছুক্ষণের মধ্যেই নবাবের ক্ষুদ্র বাহিনী পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নবাবের প্রস্থান পথের দিকে তাকিয়ে ক্লাইভ মুচকি হাসলেন। এগিয়ে এলেন নবকৃষ্ণ।

ক্লাইভ শুধোলেন, 'কী বুঝছ মুনশি?'

'নবাবের চিঠি পেয়ে দেওয়ান ছুটে আসবেন?' পালটা শুধোলেন নবকৃষ্ণ।

'আসবে না বলছ?'

'আসবে কি? শুনেছি দেওয়ান তার হাভেলিতে হামলার পর থেকে কনফাইন্ড হিমসেলফ ইন দ্য প্যালেস। গুপ্তঘাতকদের হাতে খুন হওয়ার ভয়ে কাঁটা হয়ে আছেন।'

'জানি। স্ক্র্যাফটন লিখেছিল।'

'তাহলে?'

'পরের চালটাও আমার ভাবা আছে মুনশি। ক্যাম্পে চলো। চিঠির মুসাবিদা করতে হবে।'

ক্লাইভে অভিসন্ধির আন্দাজ পেতে কামানো মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন নবকৃষ্ণ।

তাঁবুতে ফিরে এসে দ্রুত একটা চিঠি লিখে ফারসিতে তর্জমার জন্য নবকৃষ্ণের হাতে তুলে দিলেন ক্লাইভ। চিঠিটা রায়দুর্লভের উদ্দেশে লেখা। ক্লাইভ লিখলেন '...দেওয়ানজি আশা করি সহি সালামত, খুশ তবিয়ত আছেন। আমার চিঠি পাওয়ার পরপরই হয়তো নবাবের একটা চিঠি পাবেন আপনি। দেওয়ানখানার টাকাকড়ির হিসেব-খতেন নিয়ে তুরন্ত একবার রাজমহলে আসার জন্য আপনার উপরে হুকুম করবেন নবাব। ভয় নেই। এ পরামর্শ আমিই তাঁকে দিয়েছি। আমিও চাই আপনি দ্রুত একবার রাজমহলে আসুন। আমি স্ক্র্যাফটন সাহেবকে লিখে দিচ্ছি—পথে ফর দ্য সেক অফ ইওর সিকিউরিটি বেশ কিছু ফৌজিকে আপনার সঙ্গে সে পাঠিয়ে দেবে। আমাদের পাওনা তেইশ লাখ টাকা কী করে মেটানো যায় তার একটা ডেফিনিট প্ল্যান নিয়ে আসবেন। এ থেকে মুনাফা তো আপনারও হবে। ফাইভ পারসেন্ট কমিশন...'

ক্লাইভের চিঠি ও তেইশ লাখের ফাইভ পারসেন্ট কত হয়, হিসেব করে রায়দুর্লভের ভয়ডর ছুটে গেল। কয়েকদিনের মধ্যেই নবাবের চিঠি এসে পড়ল দেওয়ানের হাতে। যথাসময়ে জনা পঞ্চাশ গোরা পল্টন ও নিজের দেহরক্ষীদের কড়া পাহারায় নায়েব নন্দকুমারকে সঙ্গে নিয়ে তিনি রাজমহলে এসে পৌঁছলেন।

ইংরেজ শিবিরের পাশেই ছাউনি ফেললেন রায়দুর্লভ।

দেওয়ান এলেন কিন্তু নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন না। ওদিকে দেওয়ানকে ডেকে বাতচিত করার কোনও আগ্রহও দেখালেন না নবাব। দু'জনের সম্পর্কটা যে একেবারে বিষিয়ে গিয়েছে, তার প্রত্যক্ষ সাবুৎ পেলেন ক্লাইভ। এতদিন তিনি স্ক্র্যাফটনের মুখ থেকে এ বিষয়ে নানা কথা শুনে আসছিলেন। দুজনের সম্পর্কের যে এতটা অবনতি হয়েছে তা আন্দাজ করতে পারেননি। তিনি ভাবনায় পড়লেন। দুই মাথা এক না হলে ইংরেজদের বকেয়া আদায় করা কঠিন। হঠাৎই ধূর্ত ক্লাইভের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। ডিনারের দাওয়াত পাঠালেন নবাবকে।

৪৫

ক্লাইভের নিমন্ত্রণ রক্ষায় ইংরেজ শিবির অভিমুখে যেতে যেতে হাওদায় বসে মিরজাফর ভাবতে লাগলেন, আজ হয়তো কড়া দু'কথা শুনিয়ে দেবেন ক্লাইভ। এমনকি হয়তো কালই কলকাতায় ফিরে যাওয়ার কথা জানিয়ে দেবেন। ইংরেজদের বকেয়া মেটানোর বিষয়ে আলোচনার জন্যেই তো দেওয়ানকে ডেকে পাঠানো। দু'দিন হয়ে গেল দেওয়ান এসেছেন রাজমহলে, কিন্তু ইংরেজদের পাওনার বিষয়ে এখনও তাঁর তরফ থেকে দেওয়ানের সঙ্গে আলোচনায় বসার কোনও উদ্যোগ নেই। ক্লাইভ এবারে হয়তো সুলেনামার শর্ত ইনকার করার ইলজাম আনবেন তাঁর উপরে। কিন্তু তিনি কী করে ক্লাইভকে বোঝাবেন যে স্ক্র্যাফটনের সামনে দুজনে কোলাকুলি সারলেও দেওয়ানের হাভেলিতে মিরনের হামলার পর থেকে রায়দুর্লভের মুখোমুখি হওয়ার কথা ভাবলেই তিনি সংকুচিত হয়ে পড়ছেন।

দেওয়ানকে ডেকে পাঠানোর বুদ্ধি দিয়েছিলেন ক্লাইভ। মিরজাফর ভেবেছিলেন, তাঁর চিঠি পেলেও জান খতরা হওয়ার ভয়ে ঘর ছেড়ে বেরোবেন না দেওয়ান। আসবেন না রাজমহলে। বানচাল হয়ে যাবে ক্লাইভের কৌশল। তখন তিনি ক্লাইভ সাহেবকে বলতে পারবেন, দেওয়ান সাহেব তো এলেন না, কী আর করা যাবে। চলুন আপাতত পাটনা অভিযান সেরে আসি। তারপরে মুর্শিদাবাদে ফিরে আপনাদের বকেয়া আমি মিটিয়ে দেব। রামনারায়ণের দৌলত হাতে এলে আপনাদের কিস্তির টাকা মেটাতে আমার কোনও তকলিফ হবে না। কিন্তু রাজমহলে এসে রায়দুর্লভ হাজির হওয়ায় ভেস্তে গেল সেই পরিকল্পনা।

মিরজাফরের মেজাজ শরিফ নেই। এই ওয়াক্তে এখানে দেওয়ানের উপস্থিতি তিনি মোটেই চাইছিলেন না। নবাব জানেন, কূটবুদ্ধি খুব ভালো খেলে রায়দুর্লভের মাথায়। ইংরেজদের বকেয়া মেটানোর বিষয়ে একটা ফয়সালা হয়ে গেলেও দেওয়ান হয়তো কর্নেলকে কুপরামর্শ দিয়ে পাটনা অভিযান বরবাদ করে দেবেন। রামনারায়ণ যে এই মুহূর্তে দেওয়ানের তাঁবের আদমি, তা শুধু নবাব কেন, তামাম মুর্শিদাবাদ জানে।

ইংরেজ শিবিরে পৌঁছে একেবারে হকচকিয়ে গেলেন নবাব। চারিদিক আলোয় আলোয় ছয়লাপ। একেবারে উৎসবের মেজাজ। রঙিন কাপড়চোপড় ও ফুল দিয়ে চারিদিক সাজিয়ে তুলে জায়গাটাকে বেহেস্তের মতো সুন্দর করে তোলা হয়েছে। সবে সন্ধে নামছে। গাছগাছালি থেকে ভেসে আসছে ঘরে ফেরা পাখিদের কিচিরমিচির। হঠাৎই দুম করে একটা পটকা ফাটার শব্দে বেজায় চমকে গিয়ে উপরের দিকে তাকালেন নবাব। কালচে নীল আকাশের গায়ে বিচিত্র নকশা তৈরি করল আতশবাজি।

ইংরেজদের হঠাৎ এত আমোদ-আশরতের হেতু কী? ভেবে ঠাহর করে উঠতে পারলেন না নবাব। ওয়ারেন হেস্টিংস এগিয়ে এসে খাতির করে তাঁকে নিয়ে গেলেন ক্লাইভের তাঁবুর অন্দরে।

নবাবের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন ক্লাইভ। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে দু'দিকে হাত প্রসারিত করে মাথা ঝুঁকিয়ে স্বাগত জানালেন নবাবকে।

কুরসিতে বসলেন নবাব। বিদায় নিলেন হেস্টিংস। দোভাষীর কাজ চালানোর জন্য ক্লাইভের অদূরে একখানা চৌপাইয়ের উপরে বসলেন নবকৃষ্ণ।

ক্লাইভ বললেন, 'ইউ আর হিয়ার। আপনাকে বাদ দিয়ে কি আমরা খুশি মানাতে পারি? সো আই ইনভাইটেড ইউ ইন দ্য ডিনার পার্টি।'

'কীসের খুশি?' কৌতূহলী গলায় প্রশ্ন করলেন মিরজাফর।

'ওয়েট। আই উইল টেল ইউ এভরিথিং। আই উইল গিভ ইউ অ্যা সারপ্রাইজ।'

একজন অর্ডারলি গড়গড়া রেখে গেল। ফরসির নলটা টেনে নিলেন নবাব।

ক্লাইভ বললেন, 'আই অবসারভড দেওয়ান রেপেক্টস ইউ ভেরি মাচ। দিস ইজ হাউ ইট শুড বি ইন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। চিঠি পেয়েই তুরন্ত কেমন ছুটে এলেন এখানে। ইউ সেইড, হি উইল নট কাম। আই থিংক ইউ আর মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং ইওর দেওয়ান।'

গম্ভীর হলেন মিরজাফর। ক্লাইভের মনের আন্দাজ পাওয়ার কোশিশ করতে লাগলেন।

ক্ষণিকের নীরবতা ভেঙে ক্লাইভ শুধোলেন, 'ডু ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু ডিসমিস দেওয়ান?'

'জি সাহেব।'

'ডোন্ট ডু দ্যাট। ইট ইজ মাই রিকোয়েস্ট।'

'দেওয়ান আমার সঙ্গে গদ্দারি করতে চান। আপনাকে আগেই বলেছি।'

'ইয়ে গলত আন্দাজ। হি উইল নট হ্যাভ দ্যাট কারেজ। আই অ্যাম অ্যাসিওরিং ইউ।'

নিমরাজি মুখ করে মিরজাফর বললেন, 'বেশ, আপনি যখন চাইছেন তখন—না হয়—'

ক্লাইভ জোশের সঙ্গে বললেন, 'আমি চাইছি না, আপনি ভুল করতে যাচ্ছিলেন, আই অ্যাম কারেক্টিং ইওর মিসটেক। থিংক ওয়াইজলি। এই মুহূর্তে রায়দুর্লভজি ছাড়া নিজামতের দেওয়ানের দায়িত্ব সামলানোর মতো কামিল-ই-ইনসান কেউ নেই। একসঙ্গে কাজ করতে গেলে ভুল বোঝাবুঝি হতেই পারে হুজুর, বিকজ অফ দ্যাট হোয়াই ইউ ব্রেক দ্য রিলেশনশিপ? আপনি দেওয়ানের সঙ্গে কাজিয়া মিটিয়ে নিন। এতে নিজামতের ভালো হবে।'

ক্লাইভের এই নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় মিরজাফর খাঁ কেমন যেন সম্মোহিত হয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হল সত্যিই হয়তো তিনি ভুল করছিলেন। তাঁর কানে দেওয়ানের নামে সমানে বিষ ঢেলে গিয়েছে মিরন। সেই সব কথা বিশ্বাস করেছেন তিনি। মিরন নালায়েক। রাজনীতির কতটুকুই বা বোঝে? মিরনের কথায় প্ররোচিত হয়ে সত্যিই হয়তো তিনি গলত কদম ওঠাতে যাচ্ছিলেন।

'বেশ। দেওয়ানকে আপনি তলব করুন এখানে।' নিমরাজি গলায় বললেন নবাব।

'ওয়েল সেইড। আপনি সমঝদার ইনসান।' এই বলে ডোরিতে টান দিলেন ক্লাইভ।

ঘন্টি বাজল। একজন অর্ডারলি এসে ঢুকল ঘরে।

একটি চিরকুটে দ্রুত কয়েক লাইন লিখে রায়দুর্লভের কাছে পাঠিয়ে দিলেন ক্লাইভ।

পুরোটাই নাটক। মিরজাফর বুঝতে পারলেন না। আগে থেকেই এই পরিকল্পনার কথা রায়দুর্লভকে জানিয়ে রেখেছিলেন ক্লাইভ। দেওয়ান সাহেব তৈরিই ছিলেন। চিরকুট হাতে পেয়েই তিনি ঝড়ের গতিতে এসে হাজির হলেন। নাটুকেপনায় রায়দুর্লভও কম যান না। দেহের অভিব্যক্তিতে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিতে লাগলেন, নবাবের উপস্থিতিতে তিনি অস্বস্তি বোধ করছেন। এই ওয়াক্তে ক্লাইভ তাঁকে না ডেকে পাঠালেই ভালো করতেন।

'আসুন দেওয়ান সাহেব।' উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন ক্লাইভ।

রীতিমতো অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে কুরসিতে এসে বসলেন রায়দুর্লভ।

'শুনলাম নবাবের সঙ্গে আপনার বাতচিত নেই।' ভনিতা ছাড়াই কথাটা ছুড়ে দিলেন ক্লাইভ।

রায়দুর্লভ চুপ করে রইলেন।

সবটাই আগে থেকে ছকে রাখা। পরপর কী প্রশ্ন আসবে, কোন প্রশ্নের উত্তরে কী বলতে হবে, কখন চুপ করে থাকতে হবে তা দেওয়ানকে আগে থেকেই শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছেন ক্লাইভ।

ক্লাইভ ফের প্রশ্ন করলেন, 'আর ইউ প্ল্যানিং টু বিট্রে নবাব?'

রায়দুর্লভ মরিয়া গলায় বললেন, 'বিলকুল না হুজুর। মসনদের লালচ আমার নেই।'

'সে কী? আমি তো শুনেছি পাটনার নায়েব সুবাদারকে বাগি হতে মদত দিচ্ছেন আপনি।'

'ইয়ে ঝুটা ইলজাম। দেশ বেচ্যায়েন হলে মুসিবতের আঁচে নবাবের মতো দেওয়ানও তো জিন্দা পুড়ে মরবেন। আমি কেন নিজেকে খতরার মধ্যে ফেলতে চাইব?'

মিরজাফরের দিকে তাকালেন ক্লাইভ। এই নাটকে মিরজাফর এতটাই প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন, যে দেওয়ানের উপরে গদ্দারির ইলজাম ওঠানোর জন্য তিনি অপরাধবোধে ভুগতে লাগলেন। ক্লাইভের মুখপানে চাইতে তাঁর অস্বস্তি লাগছে। আনত চোখে তিনি ভূমির দিকে চেয়ে রইলেন।

মুচকি হেসে ক্লাইভ এবারে বললেন, 'নবাব রিগ্রটেড হিজ মিসটেক। আশা করি আপনিও নবাবের উপরে কোনও আখেজ রাখবেন না।'

'আমি নবাবের নিমক খাই। তাঁর প্রতি আখেজ, আদাওতি আমার নেই। নবাব বাহাদুর ভুল বুঝেছেন আমাকে। আমার হাভেলিতে হামলা হয়েছে। এই বেইজ্জতিতে আমি দুঃখ পেয়েছি।'

কুরসি ছেড়ে উঠে এসে রায়দুর্লভকে বুকে জড়িয়ে ধরে মিরজাফর আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'আমার গুস্তাকি মাফ করবেন দেওয়ান সাহেব।'

লজ্জিত হওয়ার ভান করে রায়দুর্লভ বললেন, 'আপনি সুবে বাংলার নবাব। আপনি কারও কাছে মাফি মাঙতে পারেন না। আমি তো মামুলি এক ইনসান। আপনার গোলাম।'

ক্লাইভ মজা পাচ্ছেন মনে মনে। দেওয়ান সাহেব একেবারে নিখুঁত অভিনয় করে চলেছেন।

কোলাকুলি সেরে নিয়ে অতীতের সব আদাওতি ভুলে যাওয়ার ওয়াদা করলেন দুজনেই।

হাততালি দিয়ে উঠে ক্লাইভ বললেন, 'উই মাস্ট সেলিব্রেট দিস রিইউনিয়ন।'

মিরজাফর বললেন, 'আপনাদের পাওনার বিষয়ে আলোচনাটা এখনই সেরে নিলে হত না?'

'উই উইল ডিসকাস দ্য ইস্যু ইন দ্য পার্টি উইথ শ্যাম্পেন। টু ডে ইজ ক্রিসমাস ইভ। টুয়েন্টি ফোর্থ ডিসেম্বর। দিস টাইম লাস্ট ইয়ার আই ওয়াজ বিজি ফাইটিং টু রিক্যাপচার ফোর্ট উইলিয়াম। সেলিব্রেশন হয়নি। সো, টু ডে উই অ্যারেঞ্জ অ্যা গ্র্যান্ড পার্টি।

নবাব ও দেওয়ানকে সঙ্গে নিয়ে তাঁবুর পিছন দিকে কানাতে ঘেরা বড় একটা লনে এসে পড়লেন ক্লাইভ। পার্টির এলাহি আনজাম-আয়োজন দেখে হাঁ হয়ে গেলেন নবাব ও দেওয়ান দু'জনেই। তাদের মনে হল, অচানকই খোয়াবের এক টুকরো দুনিয়ায় এসে পড়েছেন।

চারিদিক চিরাগ ও মোমবাতি জ্বেলে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। তা ছাড়াও লনের উপরে জায়গায় জায়গায় লোহার বাতিদানে পুড়ছে অভ্রের পাত। কড়া ঠান্ডায় শরীর গরম রাখার জন্য লকড়ি জড়ো করে আগুন জ্বালানো হয়েছে। লনের উপরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বাহারি সুজনিতে মোড়া টেবিল ও চেয়ার। এক জায়গায় লম্বা টেবিলের উপরে থরে থরে সাজানো রয়েছে রকমারি খাবারদাবার। আরেকদিকে একটা টেবিলের উপরে সাজানো রয়েছে রকমারি মদের বোতল। পোর্ট, ক্ল্যারেট, ওয়াইন, মদিরা, শ্যাম্পেন, বিয়ার। কালো আকাশের বুকে বিচিত্র নকশা তৈরি করছে আতশবাজি। লনের একপ্রান্তে একটা তোপও

রয়েছে। এই আশরতের আনজামের মধ্য আবার তোপ কেন সেটা বুঝতে পারলেন না নবাব ও দেওয়ান কেউই।

লনের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস, লাশিংটন, ওয়ালশ, ফোর্ড-সহ ইংরেজ সেনাবাহিনীর সব অফিসারেরা। এগিয়ে এসে তাঁরা নবাব ও দেওয়ানকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন।

ক্লাইভের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী ও বহু গুণের অধিকারী গ্রাহাম স্ট্রনের নেতৃত্বে একদল বাজনদার প্রস্তুত হয়ে আছে। স্ট্রনের হাতে ভায়োলিন। ঘাড় অবধি লম্বা চুল। খুবই সুপুরুষ চেহারা স্ট্রনের। বহু মানুষের ভিড়েও আলাদা করে সে নজর কেড়ে নেয়। এই ছেলেটিকে বিশেষ স্নেহ করেন ক্লাইভ। স্ট্রনের দিকে চেয়ে তিনি ইশারা করলেন। ব্যান্ডে বেজে উঠল ক্রিসমাস ক্যারোল।

মুগ্ধ চোখে ভায়োলিনের ছড় টানা দেখছিলেন নবাব। এই বাদ্যযন্ত্র আগে কখনও দেখেননি।

ক্লাইভ বললেন, 'হিজ নেম ইজ গ্রাহাম স্ট্রন। ভেরি ট্যালেন্টেড। গুড মিউজিশিয়ান। এক সময়ে সার্কাসে খেলা দেখাত। কাজ চলে যাওয়ায় ফৌজে নাম লিখিয়েছে। অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের ফৌজে ছিল। মাদ্রাজ থেকে ফলতা আসার পথে আমার নজরে পড়ে। আই ইনক্লুডেড হিম ইন মাই ফোর্স।

'বাজনাটার নাম কী?'

'ভায়োলিন। অ্যা ওয়েস্টার্ন ইনস্ট্রুমেন্ট।'

রায়দুর্লভ বললেন, 'অনেকটা আমাদের রবাবের মতো।'

ওয়ারেন হেস্টিংস বলে উঠলেন, 'রাইটলি সেইড। ভায়োলিন ইভলভড ফ্রম রবাব।'

'বড়িয়া। পশ্চিম দুনিয়া আউর হিন্দুস্থানের বহুত আচ্ছা তালমিল।'

নবাবের কথা শুনে ক্লাইভ বললেন, 'জাস্ট লাইক আওয়ার রিলেশনশিপ উইথ ইউ। আসুন এবারে আমাদের বকেয়ার ব্যাপারে আলোচনাটা সেরে ফেলা যাক।'

অদূরে লকড়ি জ্বালিয়ে ক্যাম্প ফায়ারের আয়োজন। মিরজাফর ও রায়দুর্লভকে নিয়ে একটা টেবিলে এসে বসলেন ক্লাইভ। অর্ডারলি এসে টেবিলে রেখে যায় শ্যাম্পেনের পাত্র, বেলেহাঁসের রোস্ট, ভেড়ার মাংসের কাবাব ও ফ্রুট স্যালাড।

শ্যাম্পেনের পাত্র তুলে নিয়ে ক্লাইভ বললেন, 'টুয়েন্টি থ্রি অ্যান্ড হাফ লাখ ডিউ ইন নভেম্বর।'

রায়দুর্লভ অসহায় গলায় বললেন, 'ইতনা রুপেয়া মেটানোর কড়ি তোশাখানায় নেই সাহেব।'

শ্যাম্পেনের পাত্রে একটা চুমুক দিয়ে পাত্রটা টেবিলের উপরে নামিয়ে রাখলেন ক্লাইভ।

মিরজাফর চিন্তিত। শ্যাম্পেন, বেলেহাঁসের মাংস, ভেড়ার মাংসের কাবাব সবই বিস্বাদ লাগছে তাঁর। টাকা দিতে না পারার অর্থ ক্লাইভ বেঁকে বসবেন। পাটনা অভিযান ভণ্ডুল হয়ে যাবে। রামনারায়ণের খাজানার নাগাল পাওয়া যাবে না।

'হাউ মাচ ক্যান ইউ পে নাউ?' মাংসের টুকরো কাঁটায় গেঁথে প্রশ্ন করলেন ক্লাইভ?

কোমরবন্ধনী থেকে গোটানো একটা কাগজ বের করে চোখের সামনে মেলে ধরে রায়দুর্লভ বললেন, 'করিব সাড়ে বারো লাখ।'

মিরজাফর মরিয়া গলায় বললেন, 'আপাতত এই টাকা মিটিয়ে দিচ্ছি। বাকি টাকা পাটনা থেকে ফিরে না হয়—'

মিরজাফরকে বাধা দিয়ে ক্লাইভ বলে উঠলেন, 'না। এখনই পুরো তেইশ লাখ টাকা চায় কোম্পানি। আদার ওয়াইজ আই উইল নট বি অ্যালাউড টু গো টু পাটনা উইথ মাই কনটিনজেন্ট।'

হিসেবের কাগজে ফের ডুব দিলেন রায়দুর্লভ। মিরজাফর বিমর্ষ।

খানিক বাদে হিসেবের কাগজ থেকে মুখ তুলে রায়দুর্লভ বললেন, 'আপনাদের টাকা মিটিয়ে দেওয়ার একটা তরিকা আছে। আপনি রাজি হবেন কি না জানি না।'

চকিতে রায়দুর্লভের দিকে তাকালেন নবাব।

রায়দুর্লভ বললেন, 'সাড়ে বারো লাখ টাকা নগদে মিটিয়ে দেওয়া হবে।'

ক্লাইভ বললেন, 'ওয়েল। বাট দ্য রেস্ট অফ দ্য মানি?'

মিরজাফরের চোখে কৌতূহল। তাকিয়ে আছেন রায়দুর্লভের মুখপানে।

রায়দুর্লভ বললেন, 'বর্ধমানরাজ তিলকচাঁদ, নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও হুগলির ফৌজদার ওমর বেগের নামে একটা পরোয়ানা নবাব যদি লিখে দেন—'

হাঁ হয়ে গেলেন নবাব।

ক্লাইভ শুধোলেন 'কীসের পরোয়ানা?'

রায়দুর্লভ বললেন, 'বর্ধমান, নদীয়া আর হুগলির পৌষ কিস্তির মালগুজারির টাকা মুর্শিদাবাদে না পাঠিয়ে কলকাতা কাউন্সিলের মালখানায় জমা করার হুকুমত। পৌষ কিস্তিতে ওই তিন জায়গা থেকে করিব সাড়ে দশ লাখ টাকা আদায় হওয়ার কথা।'

ক্লাইভ উল্লসিত হয়ে গলা তুলে বললেন, 'ব্রিলিয়ান্ট। ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া। জাস্ট লাইক পোস্ট ডেটেড চেক। আই থিংক কোম্পানি উইল অ্যাকসেপ্ট দিস প্ল্যান।'

হাসি ফুটল মিরজাফরের মুখে। শেষ পর্যন্ত পাটনা অভিযানের কাঁটা দূর হল।

নবাবের উদ্দেশে ক্লাইভ শুধোলেন, 'ডু ইউ এগ্রি উইথ দিস প্ল্যান?'

মিরজাফর খুশি গলায় বললেন, 'সহি উপায় বাতলেছেন দেওয়ানজি। আমি রাজি।'

কুরসি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ক্লাইভ বললেন, 'দ্য মিটিং ইজ ওভার। নাউ লেট আস সেলিব্রেট।'

স্বভাবতই দারুণ খুশি ক্লাইভ। মুর্শিদাবাদের কোষাগারের হালত যে খুব ভালো নয়, তা তিনি বিলক্ষণ জানতেন। এত সহজে যে বকেয়া আদায় হবে এ কথা মোটেই আন্দাজ করেননি তিনি। মনে মনে রায়দুর্লভের বুদ্ধির তারিফ করলেন ক্লাইভ। তুখোড় মাথা লোকটার। এঁকে প্রাপ্য টাকার উপরে পাঁচ পারসেন্ট কমিশন দেওয়াই যায়। ক্লাইভ তাঁর ডান হাতের পাঁচ আঙুল প্রসারিত করে দেখালেন রায়দুর্লভকে। ইঙ্গিতটার অর্থ ঠিকই বুঝলেন দেওয়ান সাহেব। মুচকি হাসলেন।

ভায়োলিনে একের পর এক ক্রিসমাস ক্যারোলের সুর বাজিয়ে চলেছে স্ট্রন। লঘু মেজাজে হাসি ঠাট্টায় মেতেছেন হেস্টিংস, লাশিংটন, ফোর্ড, ওয়ালশ। শ্যাম্পেনের পাত্র হাতে তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন ক্লাইভ। এবারে দুই আঙুল তুলে ভিকট্রি চিহ্ন দেখালেন সতীর্থদের। তাঁরা জানতেন যে নবাব ও দেওয়ানকে ডেকে নিয়ে ক্লাইভ তেইশ লাখ টাকার ফয়সালা করতে বসেছেন। এ কাজে তিনি সফল হয়েছেন বুঝে সবাই খুশি। সকলকে নিয়ে আমোদে মেতে উঠলেন ক্লাইভ। ক্যারোলের ছন্দের সঙ্গে নাচের তালে পা মেলাতে লাগলেন।

অদূরে কুরসিতে বসে আছেন মিরজাফর ও রায়দুর্লভ। জাহাঁবাজ ক্লাইভকে এমন লঘু মেজাজে কখনও দেখেননি তারা। জুলজুলে চোখে তারা চেয়ে দেখতে লাগলেন ক্লাইভের কাণ্ডকারখানা।

পাথরের গেলাসে ভাঙের শরবত নিয়ে এগিয়ে এল এক দাখিলা। সঙ্গে নবকৃষ্ণ।

নবকৃষ্ণ মাথা ঝুঁকিয়ে সেলাম ঠুকে বললেন, 'ভাঙের শরবত হুজুর।'

খুশি হয়ে গেলাস হাতে তুলে নিলেন নবাব। এক চুমুকে উড়িয়ে দিলেন শরবত। 'থোড়া আউর লে আও।' ছুটল দাখিলা। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নবাব ও দেওয়ানের আপ্যায়নের দেখভাল করতে লাগলেন নবকৃষ্ণ। বেশ কয়েক গেলাস ভাঙের শরবত পান করে বেশ নেশা চড়ে গেল নবাবের। চোখে সব কিছু রঙিন দেখতে লাগলেন। কুরসি ছেড়ে উঠে টলমলে পায়ে এগিয়ে গেলেন ক্লাইভের দিকে। জড়ানো গলায় বলতে লাগলেন, 'পা-ট-না! পা-ট-না। রা-ম-না-রা-য়-ণ বুড্ঢা বেতমিজ। কো-তল করব।'

'জরুর। নাউ লেট আস সেলিব্রেট দ্য সাকসেস ইন অ্যাডভান্স।' এই বলে নবাবের হাত ধরে বাজনার ছন্দে পা মেলাতে লাগলেন ক্লাইভ। ভাঙের প্রভাবে নবাবের মেজাজ এখন দারুণ ফুরফুরে। মনের পর্দায়

দেখছেন রামনারায়ণের রাশি রাশি দৌলত। টাকা-মোহর-সোনা-হিরে-জহরত। খেরিয়া বোঝাই হয়ে সেসব চলেছে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে।

ক্লাইভকে অনুকরণ করে বাজনার তালে পা মেলানোর কোশিশ করে চলেছেন নবাব। হঠাৎই গর্জন করে উঠল তোপ। রাত বারোটা। এসে পড়ল পঁচিশে ডিসেম্বর। প্রভু যিশুর শুভ জন্মদিন। তুমুল কোলাহলে ফেটে পড়ল ইংরেজরা।

সহসা তোপের আওয়াজ শব্দ ও উচ্চকিত হইহুল্লোড়ের শব্দ শুনে ঘাবড়ে গিয়ে বেসামাল হয়ে প্রায় মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছিলেন নবাব। ক্লাইভ তাঁকে ধরে ফেলে সামলে নিলেন।

৪৬

টিলার উপর থেকে তিরবেগে নেমে আসা জলধারা মাটির উপরে আছড়ে পড়ে নুড়ি পাথরের প্রতিরোধ ঠেলে নিজের খেয়ালে বয়ে চলেছে। এ যেন যৌবনের দুর্বার, দুর্মদ গতি। সমস্ত বাধা তার কাছে তুচ্ছ।

ঝরনার ধারে বড় একটা পাথরের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে রয়েছে গ্রাহাম স্ট্রন। কর্নেল ক্লাইভের দেহরক্ষী। বছর পঁচিশের যুবক। তার আজ ছুটি। আশপাশের জায়গাটা ঘুরে দেখার নেশায় ক্লাইভের অনুমতি নিয়ে সে ক্যাম্প থেকে বেরিয়েছে সকালে। এখন গড়িয়ে যাচ্ছে শীতের মিঠে দুপুর। অনেক ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত হয়ে দুদণ্ড জিরিয়ে নিচ্ছে স্ট্রন। সঙ্গে রয়েছে তার ভায়োলিনখানা। কাঁধ থেকে ঝোলানো। কোলের উপরে রাখা রয়েছে বন্দুক। আশেপাশে ঘন জঙ্গল। অদূরে বয়ে চলেছে গঙ্গা। ঘন গাছপালার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে জলের রুপোলি রেখা। পাতার ফাঁক দিয়ে তেরছা ভাবে রোদ এসে পড়েছে মুখে। মাথার টুপিটা একদিকে হেলিয়ে রোদ্দুরকে আড়াল করে স্ট্রন।

পাহাড়, ঝরনা, চড়াই-উতরাইয়ে ভরা জমি, ঘন সবুজের সমারোহ, পাশ দিয়ে বয়ে চলা গঙ্গা সব মিলিয়ে রাজমহল ও তার আশপাশের এলাকা খুবই সুন্দর। চন্দননগর ক্যাম্পের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি। তবে খুব বেশিদিন এখানে থাকার উপায় নেই। শিগগিরই নাকি তাঁবু গুটিয়ে পাটনার দিকে রওনা হতে হবে। চলে যাওয়ার আগে জায়গাটার যাবতীয় সৌন্দর্য, রূপরস প্রাণ ভরে আস্বাদ করে নিতে স্ট্রনের এই অ্যাডভেঞ্চার।

স্ট্রন দেখেছে, জায়গায় জায়গায় সবুজের বুক চিরে হঠাৎ হঠাৎই যেন ফুঁড়ে উঠেছে পাথর ও সরু লাল ইটের তৈরি ইমারত। সবই ভগ্নপ্রায় হাভেলি। বোঝাই যায় একসময়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা ছিল এই রাজমহল। অনেক দূর থেকে চোখে পড়ে সবুজের দিবার টপকে জেগে থাকা আকবরি মসজিদের চূড়া, জীর্ণ হয়ে পড়া মানসিংহের প্যালেসের প্রবেশদ্বার সিংহীদালান। এসব রাজমহলের অতীত জলুসের ইয়াদগার। আকবর বাদশার আমলে এখানে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন তাঁর সেনাপতি মানসিংহ। তারপরে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয় রাজধানী। সেখান থেকে ফের রাজমহলে রাজধানী সরিয়ে আনেন শাহজাহান বাদশার ছেলে শাহ সুজা। এখানে এসে তাঁর কাছ থেকে বাংলায় ব্যাবসার ফরমান আদায় করে নিয়ে গিয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। তারপরে পেরিয়ে গিয়েছে একশো বছরেরও বেশি সময়। বাদশা ঔরঙ্গজেবের আমলে শেষবারের মতো এখান থেকে ঢাকায় সরে যায় রাজধানী। পরে ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ। তুজুকের এসব কহানি নব মুনশির মুখ থেকে শুনেছে স্ট্রন। এদেশের নবাব-বাদশাদের কিসসা-কহানি খোয়াবের দুনিয়ার মতো রঙিন। শুনতে বেশ লাগে।

কানে ভেসে আসছে একটানা ঝরনার জল গড়িয়ে পড়া ও জল বয়ে যাওয়ার ঝরঝর, কুলকুল আওয়াজ। এই শব্দের সঙ্গে আশপাশ থেকে এসে মিশছে হরেক রকমের পাখির কলকাকলি। স্ট্রনের মনে হয় ঠিক যেন একটা কনসার্ট। কেমন যেন একটা খুশির আমেজ মিশে আছে এতে। কিন্তু জীবনের খুশিগুলো সব হারিয়ে

যায় কেন? সহসা মন কেমন করে ওঠে স্ট্রেনের। কালো মেঘের মতো একরাশ দুঃখ এসে ভিড় করে তার মনের আকাশে। চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দেয়। স্ট্রেনের মনে হয়, এ দুনিয়ায় খুশি, আশরত, পেয়ার মহব্বত—এসব বহুত কিমতি চিজ।

কোলের উপরে রাখা বন্দুকটা সরিয়ে রেখে ভায়োলিনের ছড় টানতে শুরু করে স্ট্রেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তার হাতের ছোঁয়ায় মূর্ত হয়ে ওঠে করুণ একটা সুর।

মায়ের মুখটা আবছা মনে পড়ে স্ট্রেনের। তখন সে খুবই ছোট। মা মারা যান। বাপ ছিলেন গরিব। জুতো সেলাই করে দিন গুজরান করতেন। মা চলে যাওয়ার পরেই ফের বিয়ে করেন তিনি। লেখাপড়া শেখা হয়নি স্ট্রেনের। নিজের রোজগারের টাকায় সংসারের জোয়াল টেনে বেড়াতে জেরবার তার বাবা। স্ট্রেনকে লাগিয়ে দেন এক রইস আদমির আস্তাবলে ঘোড়া দেখভালের কাজে। সেও বাড়ি থেকে অনেক দূরে। স্ট্রেনের মনে হয়েছিল বাপ যেন এভাবে ঝেড়ে ফেলে দিলেন তার প্রতি তাঁর সব দায়-দায়িত্ব। সেই থেকে স্ট্রেন ঘরছাড়া। বাপের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই তার। বাপ-মায়ের ভালোবাসা তার কাছে দূর আকাশের নক্ষত্রের মতো অজানা, ধরাছোঁয়ার বাইরে।

আস্তাবলের কাজে সামান্য ত্রুটি হলেই জুটত মালিকের চাবুক। পিঠে দাগ বসে রক্ত জমাট বেঁধে যেত। মালিকের অত্যাচার সইতে না পেরে একদিন কাজ ছেড়ে পালাল স্ট্রেন। তখন শৈশব আর কৈশোরের সন্ধিক্ষণে। কিছুদিন পরে কাজ জুটল এক সার্কাসের দলে। শিল্পীদের ফাইফরমায়েশ খাটার কাজ। তবে ডানপিটে স্ট্রেন কিছুদিনের মধ্যেই শিখে ফেলল বিপজ্জনক ট্রাপিজের খেলা। কদর বাড়ল সার্কাসের দলে। তারিফ পেল ম্যানেজারের। সেই যেন প্রথম সে বুঝল এই দুনিয়ায় খুশি কী? আনন্দ কী বস্তু?

অলস এই দুপুরে সবুজের মাঝে ঝরনার পাশে একাকী বসে থাকতে থাকতে অতীতের সব ছবি ভিড় জমাতে থাকে স্ট্রেনের মনে। সার্কাসের ব্যালে ট্রুপে নাচ করত বাপ-মা মরা ফুলের মতো এক কিশোরী। সোফিয়া ইভানস। সেও ছিল স্ট্রেনের আরেক খুশির কারণ। কিশোর স্ট্রেনের বাহাদুরি দেখে তারিফির ভাষা ফুটে উঠত সোফিয়ার মুখে। সার্কাসে থাকতে থাকতেই ভায়োলিন বাজাতে শিখেছিল স্ট্রেন। অবসর সময়ে সে যখন ভায়োলিনে সুর তুলত, তার পাশে মাঝে মাঝে এসে চুপ করে বসে থাকত সোফিয়া। বাজনা শুনত। স্ট্রেনের ভালো লাগত সোফিয়ার সান্নিধ্য। ধীরে ধীরে দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। হঠাৎই কয়েকদিনের জ্বরে মারা গেল সোফিয়া। স্ট্রেনের জীবন থেকে খুশির উজ্জ্বল রোশনি যেন দপ করে নিভে গেল এক লহমায়।

এর বছর দুয়েক পর হঠাৎই একদিন উঠে গেল সার্কাস। কাজ হারিয়ে টান পড়ল পেটে। শেষে রোজগারের তাগিদে অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের নৌবহরে নাম লিখিয়ে লন্ডন থেকে সে চলে এল মাদ্রাজে। মাদ্রাজ থেকে বাংলা। ঘটনাচক্রে কর্নেল ক্লাইভের নজরে পড়ে গেল সে। তিনিই অ্যাডমিরালকে বলে স্ট্রেনকে নিজের বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। ক্লাইভের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী দলের একজন সৈনিক হিসেবে স্ট্রেন কোম্পানির চাকরিতে বহাল হল।

গ্রাহাম স্ট্রেন যে ফৌজের আর পাঁচজন সৈন্যের থেকে আলাদা, বুদ্ধিমান, দুঃসাহসী, বহুগুণের অধিকারী, তা বোঝেন ক্লাইভ। তারিফও করেন প্রকাশ্যে। খানিকটা প্রশ্রয়ও দেন। গত বছর এই সময়ে বজবজ দুর্গ দখলের সময়ে সেনাবাহিনীর ডিসিপ্লিন ভেঙে সে যা কাণ্ড ঘটিয়েছিল তাতে তার সাজা হওয়ার কথা। নোকরি খতম হয়ে যেতে পারত, কিন্তু সে যাত্রায় তাকে রেয়াত করেন ক্লাইভ। ভিন দেশে এসে কাজ হারিয়ে অথৈ জলে পড়ত স্ট্রেন। রক্ষা করলেন ক্লাইভ। তাই কর্নেলের প্রতি স্ট্রেনের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। অবশ্য সেদিন নেশার ঘোরে যে কাণ্ড সে ঘটিয়েছিল, তাতে বজবজ দুর্গ দখলের কাজটা অত্যন্ত সহজ হয়ে গিয়েছিল।

মনের পর্দায় কেবলই আনাগোনা করছে তার অতি তুচ্ছ, ক্ষুদ্র জীবনের টুকরো টুকরো তসবির। তবে আজ কেন যেন সব কিছু ছাপিয়ে বার বার তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে সোফিয়ার একটা ছবি। ঘুমিয়ে

আছে সোফিয়া। চোদ্দ বছরের কিশোরী। ফুলে ফুলে ঢাকা। তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে স্ট্রন। অস্ফুট স্বরে বলছে 'গুড বাই সোফিয়া। রেস্ট ইন পিস।'

ভায়োলিন বাজিয়ে চলেছে স্ট্রন। দু'চোখ বন্ধ। দুই গাল বেয়ে নেমে আসছে জলের ধারা।

সহসা কানে ভেসে আসে নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকার। চমকে ওঠে স্ট্রন। ভাবনার স্রোত নিমেষে অন্তর্হিত হয়। থেমে যায় ভায়োলিনের ছড় টানা। উৎকর্ণ হয়ে সে শুনতে পায় নারীকণ্ঠের অস্পষ্ট গোঙানির আওয়াজ। খুব দূরে নয়। কাছেই কোথাও।

চকিতে উঠে দাঁড়ায় স্ট্রন। ভায়োলিনটা কাঁধে ফেলে বন্দুক হাতে ছুটে যায়।

ঝোপঝাড়ের আগল ঠেলে কিছুদূর এগিয়ে স্ট্রন দেখে, বুনো ঘাসে ঢাকা জমিতে এক যুবতীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নবাবের বাহিনীর জনৈক হাবশি সেপাই। উদগ্র লালসায় দৈত্যের মতো চেহারার লোকটা জবরদস্তি সেই যুবতীকে নগ্ন করার কোশিশ করছে। লোহার মতো শক্ত হাতে ফাঁসে বন্দি যুবতী নিজের ইজ্জত বাঁচাতে অসহায় ভাবে হাত-পা ছুড়ে চলেছে। এ যেন ব্যাধের জালে আটক কবুতরের অসহায় ডানা ঝটপটানি। কামতাড়নায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে হাবশি সেপাইটা, জোর করে নিজের মুখটা মেয়েটির মুখের উপরে নামিয়ে এনে চুম্বনে উদ্যত হয়।

সাময়িক ঘোর কাটিয়ে উঠে বন্দুকটা হাতে নিয়ে স্ট্রন গুলি চালাল শূন্যে। গুড়ুম!

এই শান্ত নিরিবিলি জায়গায় বন্দুকের আওয়াজ শুনে ঘাবড়ে গিয়ে যুবতীকে ছেড়ে দিয়ে চকিতে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। নিমেষে প্রবল আতঙ্কের ছাপ ছড়িয়ে পড়ল তার মুখে।

বন্দুক তাক করে দাঁড়িয়ে আছে স্ট্রন। আঙুল ট্রিগারে।

হাবশি সেপাই দুহাত তুলে খানিকটা পিছিয়ে যায়। তারপরে ঝোপ-জঙ্গল ভেদ করে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে থাকে। বন্দুক ফেলে স্ট্রন দ্রুত ছুটে এসে হাঁটু মুড়ে বসল যুবতীর সামনে।

শীত ও ত্রাসে কাঁপছে বিদ্যা। পরনের শাড়ি সম্পূর্ণ ভিজে। ভিজে মাথার চুল। সে গঙ্গাস্নানে গিয়েছিল। ফেরার পথে এই বিপত্তি। বিস্ময় ও ভয়জড়ানো চোখে স্ট্রনকে সে জরিপ করতে থাকে।

স্ট্রন বলল, 'ডরো মাত। আমি জানোয়ার নই। জেনানার ইজ্জতের কিম্মত বুঝি।'

সহসা মেয়েটির নজর গেল নিজের বেআবরু বুকের উপরে। লজ্জায় চোখ নামিয়ে দ্রুত বুকের উপরে আঁচল টানল সে। পরনের শাড়ি উরুর উপরে অনেকটা উঠে গিয়েছে। দ্রুত শাড়িটা টেনে নামাল সে। আঁচল টেনেটুনে কোনওরকমে ঢাকল উন্মুক্ত নাভিদেশ। ভেজা শাড়ি এঁটে বসেছে দেহের উপরে। অচেনা এই পুরুষের সামনে লজ্জায় যেন মাটিতে মিশে যেতে লাগল যুবতী।

স্ট্রন ফের বলল, 'ডরো মাত।'

বিদ্যা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। এখনও যেন দুঃস্বপ্নের ঘোর লেগে আছে তার চোখে।

স্ট্রন শুধোয়, 'কে তুমি?'

'বিদ্যা।'

'ঘর কোথায় তোমার?'

'কাছেই।' বিদ্যা জবাব দেয় সংক্ষেপে।

'এখানে তো কোনও লোকবসতি নেই।'

কোনও জবাব না দিয়ে আনত চোখে ভূমির দিকে চেয়ে থাকে বিদ্যা।

কেমন যেন খটকা লাগল স্ট্রনের। কথাবার্তায় ঢঙে একে দেখে ঠিক দেহাতের আনপড় জেনানা বলে মনে হয় না। খুবসুরত এই যুবতী এই নির্জন স্থানে একাকী এল কোথা থেকে।

'গঙ্গায় নাইতে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে ওই হাবশি দৈত্যটা হঠাৎ পিছন থেকে–' সহসা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে বিদ্যা।

‘কে আছে তোমার বাড়িতে?’ শুধোয় স্ট্রন।
‘কেউ না।’
স্ট্রন লক্ষ করে মেয়েটি শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে। নিজের গায়ের কোটটা খুলে নিয়ে স্ট্রন বলে, ‘এটা গায়ে দিয়ে নাও।’
ভিজে কাপড় গায়ের সঙ্গে লেপটে থাকায় বড় অস্বস্তি বোধ করছিল বিদ্যা। বেআবরু হয়ে পড়েছে ভরা যৌবনের সকল চিহ্ন। দ্বিধা না করে স্ট্রনের লম্বা কোটটা দ্রুত গায়ে জড়িয়ে নেয় বিদ্যা। অশালীন ভাবে ফুটে ওঠা দেহসম্পদকে আড়াল করতে পেরে অনেকটা স্বাভাবিক হয় সে।
স্ট্রন বলে, ‘চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।’
‘কোথায়?’
‘তোমার ঘরে।’
ঝোপ-জঙ্গল ভেদ করে হাঁটতে থাকে দু’জনে।
খানিকবাদে বুনো ঝোপের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে যাওয়া শুড়ি পথ ধরে স্ট্রনকে নিয়ে একটা জীর্ণ ইমারতের সামনে এসে দাঁড়ায় বিদ্যা।
অবাক হয়ে স্ট্রন শুধোয়, ‘এই তোমার ঘর?’
‘হ্যাঁ।’ করুণ একটা হাসি ফুটে ওঠে মুখে।
কথা না বাড়িয়ে বিদ্যার পিছন পিছন অন্দরে প্রবেশ করে স্ট্রন। স্যাঁতসেঁতে প্রায়ান্ধকার ঘর। দিনদুপুরেই যেন আঁধার নেমেছে। আশেপাশের মহীরুহ আড়াল করেছে সূর্যকে। রোদ্দুর এখানে বড় একটা আসে না। ঘরের অন্দরে শীত বড় তীব্র।
বিদ্যা বলে, ‘বোসো সাহেব। আমি কাপড় বদলে আসি।’
আড়ালে চলে যায় বিদ্যা। আড়াল থেকেই ছুড়ে দেয় চামড়ার কোটটা।
সেটা তুলে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে নেয় স্ট্রন।
ঘরের পশ্চিমদিকের দেওয়ালে জাফরির ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে এসে ঢুকেছে সামান্য আলো। একদিকের ছাত প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম। কয়েকটা দরজায় পাল্লা নেই। জানোয়ারেরা যে কোনও সময় ঢুকে পড়তে পারে ঘরে। এটা যে বিদ্যার স্থায়ী ঠিকানা, তা বিশ্বাস হয় না স্ট্রনের। নিশ্চয়ই বিপদে পড়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছে বিদ্যা। কী তার আসল পরিচয়?
‘কী ভাবছ সাহেব?’ কাপড় বদলে স্ট্রনের সামনে এসে দাঁড়ায় বিদ্যা।
স্ট্রন মুচকি হেসে সারল্যের সঙ্গে বলে। ‘তোমার কথা।’
আনত চোখে বিদ্যা বলে, ‘এ ঘরে এসো।’
বিদ্যার পিছু পিছু পাশের ঘরে প্রবেশ করে স্ট্রন।
বিদ্যা বলে, ‘বড় ঠান্ডা। দাঁড়াও আগুন জ্বালি।’
ঘরের কোণায় জড়ো করে রাখা কিছু লকড়ি টেনে এনে চকমকি পাথর ঠুকে আগুন জ্বালে বিদ্যা। মুগ্ধ চোখে বিদ্যাকে দেখছিল স্ট্রন। হঠাৎই চোখ তুলে তাকায় বিদ্যা। চোখাচোখি হতেই লজ্জিত হয়ে চোখ সরিয়ে নেয় স্ট্রন।
মুচকি হেসে বিদ্যা বলে, ‘হাঁ করে অমন দেখছ কী?’
স্ট্রন বলে, ‘তোমাকে। ইউ আর বিউটিফুল।’
আগুনটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। বেশ আরাম বোধ হয় স্ট্রনের।
বিদ্যা বলে, ‘বিউটিফুল মানে জানি সাহেব। তোমাদের ভাষার কিছু কিচ্ছু কথা বুঝি। এসো। হাত পা ছড়িয়ে বসো এখানে।’

বড় একটা ঘরের এক কোণায় মেঝেতে বিছানো খড়ের উপরে পাতা রয়েছে মলিন একটা সুজনি। তার উপরে বসে পড়ে স্ট্রন। বিদ্যা বসে অদূরে।

'সত্যি করে বলো তো কে তুমি?'

'বিদ্যা। বিদ্যাধরী।'

'এ তোমার ঘর নয়।'

চুপ করে থাকে বিদ্যা।

'কোনও মুসিবতে পড়ে তুমি এখানে এসে উঠেছ।'

হঠাৎই ঠোঁট কামড়ে ধরে নিঃশব্দে কেঁদে ওঠে বিদ্যা। নিজেকে সামলে নিয়ে আঁচলে চোখ মুছে বলে, 'ঠিকই আন্দাজ করেছ সাহেব। এখনও যে বেঁচে আছি, নিজেরই বিশ্বাস হতে চায় না।'

'ডরো মাত ডার্লিং। আমি মদত দেব তোমাকে।'

'সত্যি বলছ সাহেব?' আবেগে স্ট্রনের হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে বিদ্যা।

স্ট্রন জবাব দেয়, 'বিলকুল। বিলিভ মি।'

বিদ্যা বলে, 'জানি তোমরা কলকাতা থেকে এসেছ। ক'দিন পরে তো ফিরে যাবে। আমাকে তোমাদের সঙ্গে কলকাতায় নিয়ে যেতে পার সাহেব? সামান্য আলাপে বেহায়ার মতো ভিক্ষে চাইছি। কিছু মনে করো না।'

অবাক হয়ে স্ট্রন শুধোয়, 'কলকাতায় যেতে চাও? তোমার ঘর ওখানে?'

নীরবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় বিদ্যা।

'হাউ স্ট্রেঞ্জ! এখানে তুমি কার সঙ্গে এলে?'

এরপর বিদ্যা বলে যায় তার নিজের কথা। গ্রামের কথা, বুড়ো বরের সঙ্গে চিতায় পুড়ে মরার ত্রাসে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার কথা, সমাজচ্যুত হওয়া, তারপরে রতু সরকারের হাতে পড়ে গণিকাবৃত্তি আঁকড়ে ধরা। কোনওকিছুই সে বাদ দেয় না সে। অকপটে বলে যায় সব কথা।

বিদ্যার কাহিনি শুনে দুঃখে স্ট্রনের বুকের মধ্যে কেমন যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। সে শুধু একা নয়, অনেকের জীবন থেকেই যে খুশির সব রং বড় তাড়াতাড়ি হারিয়ে যায়।

হাঁটুতে মুখ গুজে কাঁদতে থাকে বিদ্যা।

স্ট্রন ফের শুধোয়, 'লেকিন এখানে কী করে এলে তুমি?'

বিদ্যা বলে যায়, রতু সরকারের সঙ্গে ঈশ্বরী ও তার কাশীযাত্রার কথা। পথে সুতীর কাছে বজরায় হামলা করে মিরনের অনুচরেরা। অন্ধকারের মধ্যে ঈশ্বরী ঝাঁপ দিয়ে পড়ে বর্ষায় উত্তাল নদীতে। আক্রান্ত হয় রতু সরকার। কী হল তাদের অন্তিম পরিণতি তা বিদ্যার জানা নেই। তাকে নিজেদের বজরায় তুলে নিয়ে নদীতে ভেসে চলে শয়তানেরা। সেই রাতে চার জনে বিদ্যার শরীরটাকে নিয়ে খেলায় মাতে। পাশবিক যৌন নির্যাতন সইতে না পেরে জ্ঞান হারায় বিদ্যা। শতানেরা বোধহয় ভেবেছিল প্রাণ নেই শরীরে। তাই অর্ধনগ্ন বিদ্যাকে তারা ফেলে যায় নদীর নির্জন চরে। জ্ঞান ফিরতে বিদ্যা দেখে পিতৃস্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন এক বৃদ্ধ ফকির। তিনি তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন এই আস্তানায়। বিদ্যা তাকে বাবা বলে ডাকত। দিন পনেরো আগে মারা যান সেই ফকির। তারপর থেকে সে একাকী দিন গুজরান করে চলেছে এই ভগ্ন হাভেলিতে।

নিজের কাহিনি শেষ করে আঁচল দিয়ে চোখের জল মোছে বিদ্যা।

স্ট্রনের দু'চোখে চিকচিক করছে জল।

বিদ্যা বলে, 'জানো সাহেব খুব বাঁচতে সাধ আমার। সে কারণেই ভগবান বোধ হয় আমাকে মরতে দিতে চান না। তাই তিনিই বোধহয় তোমাকে পাঠিয়েছেন এখানে।'

মুগ্ধ চোখে বিদ্যার দিকে চেয়ে থাকে স্ট্রন।

‘এত কিছুর পরেও আমি যে বেঁচে আছি, ভাবলে আমার নিজেরই অবাক লাগে। এ ক’দিন বড় তকলিফের মধ্যে কেটেছে। শুধু ভেবেছি কী করে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাব? তোমার উপরে ভরসা করতে পারি সাহেব। আমি রূপ বিকিয়েছি কলকাতায়। পুরুষের নজর চিনি। তুমি মানুষ মন্দ নও। ইচ্ছে করলেই তো তুমি জোর করে ভোগ করতে পারতে এই শরীরটা। কিন্তু তা তো করোনি। বলো সাহেব আমাকে কলকাতায় পৌঁছে দেওয়ার কোনও উপায় করতে পার?’

এই বলে প্রচণ্ড আবেগে ও উত্তেজনায় স্ট্রনকে আঁকড়ে ধরে বিদ্যা।

স্ট্রনের দেহের সঙ্গে প্রায় লেপটে গিয়েছে সে। স্ট্রনের সারা শরীর শিহরিত হয়ে ওঠে। ধমনীতে রক্ত ছুটতে থাকে দুরন্ত গতিতে। তীব্র আবেগে শক্তবাহুবন্ধনে বিদ্যাকে জড়িয়ে ধরে স্ট্রন।

‘জরুর ডার্লিং। তোমাকে আমি কলকাতায় নিয়ে যাব। জরুর।’

দ্রুত নিঃশ্বাস পড়তে থাকে স্ট্রনের। তার ঠোঁটদুটো চেপে বসে বিদ্যার নরম দুই ঠোঁটের উপরে। চুম্বনে ধরা দেয় বিদ্যা। জল গড়িয়ে পড়ে তার দু’গাল বেয়ে।

জল স্ট্রনের চোখেও। তার দেহের প্রতিটি কোষে, শিরায় শিরায় যেন ছড়িয়ে পড়ছে তীব্র আনন্দের এক অনুভূতি। এর নাম খুশি।

৪৭

দু’দিন পরেই বিদায় নেবে ঘটনাবহুল ১৭৫৭ সাল। শুভাগমনের অপেক্ষায় ১৭৫৮।

সন্ধে নেমেছে। আজ জাঁকিয়ে পড়েছে ঠান্ডা। কুয়াশা নেমে এসেছে মাটির বুকে। গাছের পাতা থেকে মাটিতে জল ঝরে পড়ার টুপটাপ শব্দে মুখর রাজমহলের এই নির্জন প্রান্তর। অনুচ্চ এক টিলার পাদদেশে ইংরেজ শিবিরের সারি সারি তাঁবুর মাঝে চলাচলের পথে বাতিস্তম্ভে জ্বলছে মশালের আলো। টিলার উপরে কর্নেল ক্লাইভের তাঁবু। কুয়াশায় আবছা। তাঁবুর সামনে লোহার দণ্ড থেকে ঝুলিয়ে রাখা বুলস আই লণ্ঠনের আলো কুয়াশায় ঘোলাটে।

নব মুনশির সন্ধানে টিলার ঢাল বেয়ে দ্রুত উপরে উঠছিল স্ট্রন। দেখা হয়ে গেল পথেই।

ক্লাইভের তাঁবু থেকে বেরিয়ে আলোয়ানে মাথা মুড়ে দ্রুত নেমে আসছিলেন নবকৃষ্ণ। পাটনার নায়েব রামনারায়ণের উদ্দেশে লেখা একটা চিঠির তর্জমা করতে হবে। কর্নেলের ফরমায়েশ। কাজটা জরুরি। আগামি কাল সকালেই চিঠিটা নিয়ে ক্লাইভের দূত রওনা হবে পাটনার পথে।

‘মুনশিজি।’ স্ট্রনের গলায় ঝরে পড়ে উদ্বেগ।

থমকে দাঁড়িয়ে নবকৃষ্ণ বলেন, ‘আরে বডি গার্ড সাহেব যে। সারাদিন ছিলে কোথায়? সকাল থেকে টিকিটির দেখা নেই। দুপুরে ভাবলাম একহাত শতরঞ্জ খেলব। কোথাও দেখা পেলাম না তোমার। তা এমন হন্তদন্ত হয়ে চলেছ কোথায়? উপরে? কর্নেল এখন খুবই ব্যস্ত। মিটিং চলছে।’

‘শুনলাম আপনি সাহেবের তাঁবুতে গিয়েছেন। আমি আপনার খোঁজে যাচ্ছিলাম মুনশিজি। একটা কথা—’ কিছু বলতে গিয়ে থমকে যায় স্ট্রন। উদ্‌ভ্রান্তের মতো তার চেহারা।

খটকা লাগে নবকৃষ্ণর মনে। তিনি শুধোলেন, ‘কী হয়েছে?’

একবার মরিয়া চোখে নবকৃষ্ণর মুখপানে একবার চেয়ে ফের চোখ নামিয়ে নেয় স্ট্রন।

‘গোল পাকিয়ে এসেছ কোথাও?’ প্রশ্ন করেন নবকৃষ্ণ।

‘আপনার থোড়া মদত চাই মুনশিজি।’

‘সে তো তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। তা কী হয়েছে সেটা বলবে তো?’

‘একবার আমার তাঁবুতে আসুন। জলদি।’

অবাক হন নবকৃষ্ণ। ‘তোমার তাঁবুতে? এখন?’

‘হুঁ। বহুত জরুরি বাত।’

‘এখানে দাঁড়িয়ে বলা যায় না? কর্নেল মেলা কাজ দিয়েছেন। বড্ড হুড়োতাড়ার মধ্যে আছি।’

কাতর মিনতি করে স্ট্রন, ‘প্লিজ একবার আসুন আমার টেন্টে।’

কী এমন জরুরী বিষয় যে এখানে দাঁড়িয়ে বলা যায় না, তাঁবুতে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য জোরাজোরি করছে স্ট্রন। ধন্দে পড়ে নবকৃষ্ণ বললেন, ‘বেশ। চলো।’

তাঁবুতে ঢুকে নবকৃষ্ণ বলেন, ‘বলো কী ব্যাপার?’

‘এদিকে আসুন।’

নবকৃষ্ণর কৌতূহল বাড়তে থাকে।

পাশাপাশি দুই কামরাওয়ালা তাঁবু। মাঝে মোটা অস্বচ্ছ কানাতের দেওয়াল।

পাশের ঘরের দরজার পর্দা সরিয়ে ভিতরে উঁকি দিয়ে নবকৃষ্ণ চমকে ওঠেন।

উলটো দিকে মুখ ফিরিয়ে চৌপাইয়ের উপরে বসে রয়েছে এক যুবতী। পরনে মলিন একখানা কাপড়। গায়ে জড়ানো একখানা চাদর। কোমরের কাছ পর্যন্ত নেমে এসেছে মাথা ঠাসা এলো চুল। দেহের গড়নে স্পষ্ট যৌবনের জলুস।

পলাশির যুদ্ধের পরে ইংরেজ বাহিনীর গোরা পল্টন ও দেশি সেপাইদের হাতে এসেছিল নগদ টাকা। তাতে সেনাবাহিনীর নিয়মকানুন একেবারে ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। মদ ও মেয়েমানুষের নেশায় উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে সেনারা। টাকার গন্ধে সেনা ছাউনির আশেপাশে মাছির মতো ভন ভন করতে শুরু করে দালালের দল। নিত্য দিশি গণিকাদের আনাগোনা শুরু হয় চন্দননগরের ইংরেজ ক্যাম্পে। সেই সঙ্গে অঢেল দিশি মদের জোগান। সে এক চূড়ান্ত বেলেল্লাপনা। রোজ রাতেই হইচই, চিৎকার, চেঁচামেচি এমনকি গণিকার দখল নিয়ে নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি মারামারি পর্যন্ত। ক্লাইভ বিরক্ত হয়ে হুকুম জারি করেন, ইংরেজ সেনা ছাউনিতে কোনও জেনানা যেন প্রবেশ না করে। এর পরে কেউ যদি সেনা ছাউনির অন্দরে মেয়েমানুষ নিয়ে ফূর্তির দায়ে অভিযুক্ত হয় তো তাকে কোর্ট মার্শালের মুখোমুখি হতে হবে। এই হুকুমের পর থেকে পরিস্থিতি অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আসে।

নবকৃষ্ণ জানেন, গ্রাহাম স্ট্রন অন্য ধাতের যুবক। খানিকটা ভাবুক প্রকৃতির। মদের প্রতি ঝোঁক থাকলেও সেই বজবজের ঘটনার পর থেকে মদের নেশায় কখনও মাত্রা ছাড়িয়ে বেলেল্লাপনা করেনি। নারীসঙ্গের আকুতি তার নেই। কিন্তু হঠাৎ তার হল কী? কর্নেলের আদেশ অমান্য করে ভর সন্ধেবেলা কোথা থেকে একটা সোমত্থ মেয়েমানুষকে নিয়ে এসে তুলল নিজের তাঁবুতে?

ঘরের পর্দা নামিয়ে দিয়ে অবাক হয়ে নবকৃষ্ণ শুধোলেন, ‘কী ব্যাপার বলোতো? কে এ?’

স্ট্রন বোকার মতো হাসি মুখ করে বলে, ‘অ্যা ইয়ং গার্ল।’

‘চোখের তো আর মাথা খাইনি হে বাপু। গার্ল তো দিব্যি বুঝতে পারছি। কিন্তু কে এ?’

‘হার নেম ইজ বিদ্যা।’

‘কোত্থেকে জোটালে?’

‘জঙ্গলে ঘুরতে গিয়ে দেখতে পাই।’

‘অ্যাঁ? জঙ্গলে?’ ভয়ানক অবাক হন নবকৃষ্ণ।

‘অচানকই দেখা পাই। বড় মুসিবতের মধ্যে পড়েছে ও।’

হতভম্ব হয়ে স্ট্রনের মুখপানে চেয়ে থাকেন নবকৃষ্ণ।

'পরে সব বলব আপনাকে।'

চিন্তিত মুখে নবকৃষ্ণ বলেন, 'সে না হয় বললে, আমি ভাবছি অন্য কথা। এক জেনানাকে নিজের তাঁবুতে এনে তুলেছ? কর্নেলের হুকুমত ভুলে মেরে দিয়েছ নাকি?'

'না। দ্যাটস হোয়াই আই অ্যাম সিকিং ফর ইওর হেল্প।'

'উরিব্বাপ। এ যে দেখছি আমার গর্দান নেওয়ার আনজাম করছ।'

স্ট্রন মরিয়া হয়ে বলে, 'স্রেফ মজা লোটার জন্য এই লেড়কিকে আমি ক্যাম্পে নিয়ে আসিনি মুনশিজি। হার স্টোরি উইল ব্রিং টিয়ারস টু ইওর আইজ।'

'সেরেছে। এ যে দেখছি গভীর জল।'

'মতলব?'

'ডিপ ওয়াটার। আশনাই-মহব্বতের ব্যাপার স্যাপার। তাই তো?'

লাজুক হাসি হেসে নবকৃষ্ণর ঘনিষ্ঠ হয়ে স্ট্রন চাপা গলায় বলে, 'সহি আন্দাজ করেছেন মুনশিজি। ফলেন ইন লাভ উইথ হার।'

নবকৃষ্ণ মনে মনে বললেন, এদেশি মেয়েমানুষ নিয়ে তোমাদের যে রঙিন আদিখ্যেতা বিগত এক বছর ধরে দেখলাম সাহেব, তাতে মা সরস্বতীর একটু কৃপা পেলে রায়গুণাকরের ঢঙে আর একখানা বিদ্যাসুন্দর কাব্যি লিখে নাম কিনতে পারতাম। মুখে বললেন, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ। জয় গোবিন্দ।'

স্ট্রন ফের শুধোল, 'মতলব?'

'ওই আমার ভগবানকে একটু স্মরণ করলাম। তোমার পাল্লায় পড়ে গর্দানখানা না যায়।'

শূন্যে দৃষ্টি ভাসিয়ে স্ট্রন বলে, 'প্রে টু গড মুনশিজি, লেট বিদ্যা রিচ ক্যালকাটা সেফলি।'

আঁতকে উঠলেন নবকৃষ্ণ, 'অ্যাঁ? কলকাতা?'

'শি লিভস দেয়ার। ওকে কলকাতা পাঠানোর একটা উপায় করে দিন মুনশিজি।'

'এ যে আমাকে ভয়ানক ঝকমারির মধ্যে ফেললে সাহেব।'

নবকৃষ্ণর হাতদুটো ধরে স্ট্রন বলে, 'আপনি ছাড়া গতি নেই।'

'সাহেব তুমি ভোলেভালা লোক। মহব্বতের দরিয়ায় নাও ভাসিয়েছ। ভালো-মন্দ বোধ এখন তোমার নেই। দাঁড়াও এ মেয়েকে একটু বাজিয়ে দেখি। এ ঘরে ডাকো একবার।'

দ্রুত পাশের ঘরে চলে যায় স্ট্রন। খানিকবাদে তার পিছু পিছু ঘরে এসে ঢোকে বিদ্যা। গায়ে জড়ানো চাদরখানা ঘোমটার মতো করে মাথার উপরে তোলা। বিদ্যা জড়োসড় হয়ে দাঁড়ায়।

বিদ্যাকে আপাদমস্তক জরিপ করে নবকৃষ্ণ শুধোলেন, 'তুমি কে গো মেয়ে?'

'বিদ্যা। বিদ্যাধরী দাসী।'

'নামটাতো সাহেবের মুখেই শুনেছি।'

'আর কী জানতে চান বলুন?'

'মুখের উপর অমন ঘোমটা টেনে রাখলে কি কথা কওয়া যায়?'

মাথার উপর থেকে আবরণ সরায় বিদ্যা। চমকে ওঠেন নবকৃষ্ণ। এ যুবতী যে দিমাগ বিগড়ে দেওয়ার মতো সুন্দরী। স্ট্রনের আর কসুর কী?

নবকৃষ্ণ শুধোলেন, 'ঘর কোথায় তোমার?'

'কলকাতার কাছেই। বরানগরে।'

'কোন বাড়ি?'

'বাবু রতন সরকারের হাভেলি। কলকাতায় রূপ বেচতাম বাবু। আপনারা যাকে বলেন কসবি।'

বিদ্যার কথার ভঙ্গিতে ফুটে ওঠে অন্তরে প্রচ্ছন্ন যন্ত্রণা। ছলছল করে ওঠে চোখদুটো।

'সাহেবকে বলেছ সব কথা?'

'হুঁ।' আনত চোখে কথাটা বলে বিদ্যা।

'তা তোমার রতনবাবু কোথায়?'

'জানি না।'

'জানো না মানে?'

'সে অনেক লম্বা কহানি বাবু। আপনি ব্যস্ত মানুষ। ক্লাইভ সাহেবের মুনশি। আমার কহানি শোনার ফুরসত কী হবে আপনার?'

নবকৃষ্ণ লক্ষ করলেন, মহাকবি কালিদাস বর্ণিত নায়িকাসুলভ গ্রীবা ভঙ্গিমা করে করুণ মুখে কথাটা ছুড়ে দিল বিদ্যা। সে মুখের দিকে চাইলে কোনও পাষাণ হৃদয়েও করুণার সঞ্চার হতে বাধ্য। বাতচিতে তুখোড় নবকৃষ্ণও কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। থতমত খাওয়া ভাবটা গোপন করে নবকৃষ্ণ বললেন, 'তা তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছ মেয়ে। অত সময় এখন আমার হাতে নেই।'

'আপনাকে সব খুলে বলব মুনশিজি।' মরিয়া হয়ে বলে স্ট্রেন।

'আতান্তরে পড়ে নব মুনশির স্মরণ যখন নিয়েছ, তখন গতি একটা হয়ে যাবে।'

'হয়ে যাবে? বলছেন?' স্ট্রেন উল্লসিত হয়ে ওঠে।

বিদ্যার মুখে জমাট বাঁধে আশার আলো।

নবকৃষ্ণ বলেন, 'কাল কাকভোরে কর্নেলের একখানা চিঠি নিয়ে কাশিমবাজারের উদ্দেশে রওনা হবে একখানা বজরা। তাতেই না হয় তুলে দিও তোমার পিয়ারিকে। কাশিমবাজারের কাজ সেরে বজরাখানা যাতে কলকাতা যায়, সে বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।'

আবেগে নবকৃষ্ণকে জড়িয়ে ধরে স্ট্রেন বলে, 'আই উইল বি ফর এভার ইনডেটেড টু ইউ।'

বিদ্যা এগিয়ে এসে ভূমিতে আনত হয়ে প্রণাম করে নবকৃষ্ণকে।

স্ট্রেন বলে, 'চলুন মুনশিজি, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।'

'এসো সাহেব। মাঝিমাল্লাদের সঙ্গে কথা বলে সব কিছু এখনই বুঝে নাও।'

পথ হাঁটতে হাঁটতে বিদ্যার কাহিনি নবকৃষ্ণকে সংক্ষেপে বলে স্ট্রেন।

সব শুনে নবকৃষ্ণ বলেন, 'সবই গোবিন্দের ইচ্ছে। বুঝলে সাহেব। না হলে এ মেয়ের সঙ্গে তোমার অচানক ওভাবে দেখা হওয়ার তো কথা নয়।'

স্ট্রেন লাজুক হাসি হাসে।

নবকৃষ্ণ হঠাৎ বললেন, 'কর্নেলের কানে একবার তুলতে হবে বিষয়টা।'

সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে স্ট্রেন। বলে, 'দেন আই উইল বি অ্যাকিউসড ফর ভায়োলেটিং হিজ অর্ডার।'

মুচকি হেসে নবকৃষ্ণ বলেন, 'ও নিয়ে তুমি ভেব না। কথা পাড়ার কায়দা আছে। কর্নেল অবুঝ নন। ঠিক মতো বুঝিয়ে বলতে পারলে তিনি বুঝবেন সবই।'

তবুও সন্দিহান চোখে নবকৃষ্ণর মুখ পানে চেয়ে থাকে স্ট্রেন।

'ভয় নেই রে বাপু, ভয় নেই। কর্নেলকে সব খুলে না বললে, পাহারা বাড়ানো যাবে না। আর পাহারা মজবুত না হলে তোমার কান্ট্রি গার্ল বেহাত হয়ে যেতে পারে। দিনকাল ভালো নয়। যে রমণীরত্ন তুমি জঙ্গল ছেঁচে ঘরে এনে তুলেছ, দিমাগ বিগড়ে দেওয়ার মতো রূপ তার। তোমার পাকা নজর সাহেব। নবাব বাদশারা এ মেয়ের সন্ধান পেলে নির্ঘাত হারেমে নিয়ে তুলত। তোমার বহেরা বনার কারণটা বুঝি। পরে কর্নেল ডেকে পাঠালে নিজের মুখেই সব খোলসা করে বোলো।'

এবারে প্রাণ খুলে হেসে ওঠে স্ট্রেন। সে হাসিতে খুশি, সংকট থেকে পরিত্রাণের আনন্দ সব কিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

পাটনা দুর্গের খাস দরবার ঘরে বসে চিঠিটায় চোখ বুলিয়ে ভয়ে রীতিমতো কাঁপতে থাকেন রামনারায়ণ। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন গোবিন্দমল্ল। নবাব মিরজাফরের দূত।

নবাব লিখেছেন '...টাকা-কড়ির হিসেব-নিকেশ সব তৈয়ার রাখুন। খুব শিগগিরই রাজমহল থেকে পাটনার উদ্দেশে আমি রওনা হব। বিরাট ফৌজ নিয়ে আমি আসছি। কর্নেল ক্লাইভও তার বাহিনী নিয়ে আসছেন আমার সঙ্গে। কোনও গোলমাল কাজিয়া আমি চাই না। আশা করি এবারে কুরসি ছেড়ে দেবেন আপনি। আমার ভাই মিরকাজিমের নামে ফের পাটনার নায়েবগিরির পরোয়ানা ফের জারি হয়েছে। পাটনার সুবাদারের পদে মিরনকে আমি নিয়োগ করেছি। আপাতত পাটনার দায়দায়িত্ব আপনি মিরকাজিমকে বুঝিয়ে দেবেন। নবাবের সঙ্গে গদ্দারি করার খেসারত দিতে হবে আপনাকে...'

বাঁশপাতার মতো কাঁপছে রামনারায়ণের হাতে ধরা চিঠিটা।

অসহায় গলায় রামনারায়ণ শুধোলেন, 'আমার কী কসুর হল জাসুসজি?'

'কী বলব বলুন, নবাবের খায়েশ।' গোবিন্দমল্লের মুখে মুচকি হাসির আভাস।

‘এ তো জুলুম। জবরদস্তি। এতো কাল নিজামতের সেবা করে শেষে এই ইনাম?’

‘গদ্দারির ইলজাম আছে আপনার নামে।’

‘একথা বিশ্বাস করেন আপনি? আপনি জাসুস। সব খবরই তো রাখেন।’

‘নবাব বিশ্বাস করেন এটাই বড় কথা।’

‘বেশ। এই জুলমাত মানব না আমি।’

‘কী করবেন?’

‘লড়াই। নবাবকে জানিয়ে দেবেন রামনারায়ণ জিন্দা থাকতে পাটনার কুরসি ছাড়বে না।’

‘বেশক জানাব।’ মুচকি হেসে জেবের ভিতর থেকে একটা কাগজ বের করেন গোবিন্দমল্ল।

উত্তেজিত রামনারায়ণ বলে চলেন, ‘রাজমহল থেকে পাটনায় আসার পথে যত সেতু আছে সব ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব আমি। দেখি নবাব কী করে ফৌজ নিয়ে পাটনায় ঢোকেন।’

‘শান্ত হোন হুজুর। এই চিঠিটা পড়ে দেখুন।’

গোবিন্দমল্লের কথা শুনে বিস্ফারিত চোখে রামনারায়ণ শুধোলেন, ‘আবার কোন চিঠি?’

‘কর্নেল ক্লাইভ আপনাকে লিখেছেন। মনে হয় খুশখবর। পড়ে দেখুন।’

দ্রুত গোবিন্দমল্লের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরলেন রামনারায়ণ। তাঁর মুখে ফুটে উঠল হাসি। সে হাসি ক্রমশ চওড়া হতে লাগল।

ক্লাইভ লিখেছেন, ‘...আমি নবাবের সঙ্গে পাটনায় আসছি। তবে ঘাবড়াবেন না। পাটনার কুরসিতে আপনিই বহাল থাকবেন। আমি তার জামিনদার থাকলাম। আয়ারকুটের মুখে আপনার সব কথা শুনেছি আমি। আমার উমিদ আপনি পাটনায় থাকলে সুবে বাংলা সালামত থাকবে। তবে একটা কৌশল করতে হবে আপনাকে। নবাব পাটনার কাছাকাছি পৌঁছে গেলে আপনি এগিয়ে এসে তাঁকে ওয়েলকাম জানাবেন। মাস্ট শো ইওর অ্যালেজিয়েন্স টু নবাব। ভয় পাবেন না। আপনাকে সালামত রাখার দায়িত্ব আমার। খুব শিগগিরই দেখা হবে।...’

পিরানের জেবের ভিতরে চিঠিটা চালান করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন রামনারায়ণ।

‘জয় সিয়ারাম। জয় বজরংবলী।’

গোবিন্দমল্ল বললেন, ‘মালুম হচ্ছে পয়গাম খুশির।’

‘বিলকুল। আমি ভেবেছিলাম কর্নেল আমার বরবাদি চান।’

‘প্রথমে তাই চাইতেন। তার ভুলটা ভাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছেন আয়ারকুট সাহেব।’

‘হ্যাঁ। ক্লাইভ সাহেব খুদ চিঠিতে লিখেছেন সে কথা।’

মাথা ঝুঁকিয়ে গোবিন্দমল্ল বলেন, ‘আমার ইনাম?’

‘জরুর মিলবে ইনাম।’ এই বলে ডোরিতে টান দিলেন রামনারায়ণ।

গুম মেরে আছেন মিরজাফর খাঁ। হতাশা ভুলতে শরাবের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। রাজমহল থেকে পাটনা আসার পথে ক্লাইভ তাকে বুঝিয়েছেন, পাটনার কুরসিতে রামনারায়ণকে রেখে দেওয়াই ভালো। এতে সুবে বাংলা সলামত থাকবে। ক্লাইভ স্পষ্টতই জানিয়ে দিয়েছেন এই ওয়াক্তে লড়াই ঝামেলা কিছুই তিনি চাইছেন না। কলকাতায় ফেরার তাড়া আছে তাঁর। তাঁকে একবার মাদ্রাজে যেতে হতে পারে।

মিরজাফর উত্তেজিত হয়ে বারবার বোঝানোর কোশিশ করেছিলেন, ‘রামনারায়ণ গদ্দার।’

‘সাবুত কোথায়? দেওয়ানজির নামেও তো একই ইলজাম ছিল।’

এ কথা শুনে রাগে ও অপমানে মিরজাফরের সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠেছিল। সাবুত! তিনি সুবে বাংলার নবাব, তাঁর কথার কোনও দাম নেই? সাবুত-সহ তাকে গুজারেশ করতে হবে সব কিছু? ক্লাইভের মুখের উপরে এ কথা ছুড়ে দিতে পারেননি নবাব।

ক্লাইভ হাসিমুখে ফের বলেছিলেন, 'আমি আপনার ভালাই চাই।'

ভালাই? খালি হাতে পাটনা থেকে ফিরে গেলে কী ভালো হবে তাঁর? টাকার অভাবে তিনি চোখে অন্ধকার দেখছেন। ভেবেছিলেন রামনারায়ণের দৌলত দখল করবেন। মিরজাফরের মনে হয়েছিল চিৎকার করে বলে ওঠেন, রামনারায়ণের টাকাকড়ি নিজের হেফাজতে নিতে পারলে তো ভালাই হতো আপনাদেরও। আপনাদের বকেয়া সহি ওয়াক্তে মিটিয়ে দিতে পারতাম।

না, একথাও ক্লাইভকে বলতে পারেননি মিরজাফর খাঁ। ক্লাইভের বলিষ্ঠ দুই হাত যেন গলায় চেপে বসে রুদ্ধ করে দিয়েছে কণ্ঠস্বর।

রায়দুর্লভ, রাজারাম, রামনারায়ণ সকলেই সহি সালামত রয়ে গেল। কারণ কর্নেল ক্লাইভ চান না এদের বরবাদি। ভিতরে ভিতরে রাগে ফুঁসতে থাকেন নবাব। তাঁকে গুম মেরে বসে থাকতে দেখে ক্লাইভ বলেন, 'আপনি চিঠি লিখুন রামনারায়ণকে। পাটনা শহরে ঢোকার আগেই তিনি যেন নিজে এসে আপনাকে তসলিম জানান। মসনদের প্রতি অ্যালেজিয়েন্স দেখিয়ে যান।'

মিরজাফর মসনদে বসার পর পার হয়ে গেল ছয় মাস, কিন্তু এখনও তাঁর প্রতি আনুগত্য জানাননি রামনারায়ণ। একাধিকবার নবাবের হুকুমত ইনকার করেছেন। পাঠাননি নজরানা। কোন ভরসায় তাঁকে ফের এমন চিঠি লিখবেন নবাব? ফের একবার বেইজ্জত হওয়ার জন্য?

মিরজাফর বলেছিলেন, 'রামনারায়ণ বেতমিজ। নবাবের হুকুম তিনি মানবেন না।'

ক্লাইভ বলেন, 'আমার মনে হয় এ আপনার ভুল ধারণা।'

অগত্যা ক্লাইভের প্রস্তাব মেনে নিয়ে গোবিন্দমল্লের হাত দিয়ে ফের একটা চিঠি পাঠিয়ে দিলেন নবাব। তার জবাব এখনও আসেনি।

মানসিক অশান্তিতে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে মিরজাফরের মন। ক্লাইভের খায়েশের কাছে বারবার পরাজয়ে আশমান সমান ঠেলে ওঠা নবাবের অহংবোধ গুঁড়িয়ে মিশে যাচ্ছে জমিনে। মিরজাফরের মনে হচ্ছে পরিণতি এমন হবে বুঝলে কখনোই তিনি নবাব হওয়ার প্রস্তাবে রাজি হতেন না।

মসনদে বসে মিরজাফর ভেবেছিলেন, তার খায়েশে চলবে দুনিয়া। কিন্তু আজ তিনি ক্লাইভের ইচ্ছের গোলাম। দুঃসহ এই পরিস্থিতি। কিন্তু ক্লাইভকে অগ্রাহ্য করে ঘুরে দাঁড়ানোর মুরোদ নেই তাঁর। কারণ ভয়। দহসত। একদিকে বর্গি, আরেকদিকে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা। আক্রান্ত হলে ক্লাইভ ও তার গোরা পল্টনই যে ভরসা। জ্বালা জ্বালা। অসহ্য জ্বালা। অন্তর্দাহে জ্বলছে গোটা শরীর। একদিকে ক্লাইভকে তাঁর প্রয়োজন, অন্য দিকে ক্লাইভের প্রখর ব্যক্তিত্ব ও কূটনীতির চাপে তাঁর আজাদ দিল পিঁজরায় বন্দি পোষা চিড়িয়ার মতো ছটফট করছে। সহসা অস্থির হয়ে ওঠেন মিরজাফর খাঁ। তাঁর সম্বন্ধে মির্জা শামসুদ্দিনের কথাটাকেই কী মনে রাখবে তুজুক?

অবসাদে ডুবছেন নবাব। শরাবই এখন মনের এই তকলিফ দূর করার একমাত্র ইলাজ।

গোবিন্দমল্ল এসে সেলাম ঠোকেন।

নেশায় ঢুলু ঢুলু চোখে শুধোলেন, 'কী পয়গাম?'

'হুজুরকে নজর পেশ করতে রামনারায়ণজি এখানে আসবেন।'

ওদিক থেকে কোনও প্রত্যুত্তর নেই। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন গোবিন্দমল্ল। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে কাত হয়ে শুয়ে আছেন নবাব। সামনে পড়ে রয়েছে শরাবের শূন্য পাত্র। নবাবের চোখদুটো বোজা। মাঝে মাঝে

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে মাথাটা। নবাবের মৃদু নাসিকা গর্জনের আওয়াজ ভেসে এল কানে। মুচকি হেসে গোবিন্দমল্ল ধীর পায়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

৪৮

পাটনা শহরে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল রাতারাতি। নবাব আসছেন। বর্তমানে তিনি ছাউনি ফেলেছেন শহর থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে। ফৌজ নিয়ে কর্নেল ক্লাইভও আসছেন তাঁর সঙ্গে। পাটনাবাসীর মনে অসীম কৌতূহল। তারা শুনেছে পলাশির ময়দানে ইনকিলাবের পর থেকে সুবে বাংলায় প্রবল শক্তিশালী হয়ে উঠেছে ইংরেজ কোম্পানি। নবাব মিরজাফর খাঁ কার্যত ক্লাইভ সাহেবের খায়েশের গোলাম হয়ে পড়েছেন। তবে একথায় অনেকেরই ঠিক যেন একিন হয় না।

মুর্শিদকুলির জমানা থেকে শুরু করে সিরাজদ্দৌলা পর্যন্ত নবাবের দাপট পাটনাবাসী দেখেছে। মুর্শিদকুলি, সুজাউদ্দীন, আলিবর্দির জমানায় ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকত ইংরেজ সওদাগরেরা। নবাব তো দূরের কথা, সোরার কারবারের জন্য পাটনার নায়েব সুবাদারের সামান্য অনুগ্রহ পেতে একসময় শির ঝুঁকিয়ে ঘন ঘন দরবার করেছে ইংরেজ কুঠিয়াল। এ সব তো পাটনাবাসীর চোখে দেখা।

সেই ইংরেজরা আজ এত শক্তিমান? নবাব তাদের ইচ্ছের দাস? হাতের পুতুল? মুর্শিদাবাদ থেকে বহু দূরে পাটনায় বসে অনেকেই যেন ঠিক মেনে নিতে পারছে না এ কথা। কেউ বলে ইয়ে ঝুটবাত। কেউ বলে গুজব। কেননা পাটনা এসে পৌঁছনোর পথে রাজধানীর অনেক খবরের গায়েই নানা রঙের প্রলেপ পড়ে যায়। হারিয়ে যায় সত্যির রং। কোন খবর সাচ্চা, আর কোন খবর ঝুটা তা সমঝবুঝ করে নিতে জেরবার হয়ে যায় আম-আদমি। গুলতানি, গুফতগু জোরদার হয়ে ওঠে পাটনার অলিগলিতে, মাণ্ডিতে, মাণ্ডিতে।

তবে বেওকুফ নয় পাটনাবাসী। তারা আন্দাজ করতে পারছে পাটনা অভিযানের আড়ালে নবাব মিরজাফর খাঁর মনসুবা কী! রামনারায়ণের বরবাদি চান তিনি। ওদিকে ইংরেজরা নাকি আবার রামনারায়ণের পক্ষে। তাহলে ফৌজ নিয়ে নবাবকে মদত দিতে পাটনায় কেন আসছেন ক্লাইভ? জবর শীতের এক সন্ধের পাটনা দুর্গের নজদিকে ব্যস্ত এক মাণ্ডিতে পথের ধারে দাঁড়িয়ে আলোয়ানে মাথা মুড়ে পান চিবোতে চিবোতে গুলতানিতে মেতে ওঠে একদল লোক। বাক-বিতণ্ডায় হাওয়া গরম হয়ে উঠতে থাকে।

'ক্লাইভ আসছেন নবাবের খায়েশে। নবাবকে মদত দিতে। রামনারায়ণ এবারে খতম হবে।'

'কভি নেহি। ইংরেজদের খায়েশের গোলাম বনেছেন নবাব। ক্লাইভের ওফাদার রামনারায়ণজি। তাঁকে খতম করবে কে?'

'তো বাতাও, ইংরেজলোগকা চাহাত কা গুলাম বন গয়া নবাব– ইয়ে ক্যায়সে সচ হ্যায়?'

তর্কে মত্ত পরস্পরবিরোধী মতামতে বিশ্বাসী দু'পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি বাধার উপক্রম হয়।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি বলে ওঠে, 'খামোশ। শান্ত হও ভাই। কয়েকদিনের মধ্যেই তো নবাব মিরজাফর খাঁ ও কর্নেল ক্লাইভ দু'জনেই আসবেন পাটনায়। সেই মওকায় চোখে দেখে বুঝে নিও, কে কার খায়েশের বশ।'

উৎকর্ণ হয়ে জনতার আলাপ-আলোচনা শুনতে ব্যস্ত চবুতরার নীচে বসে থাকা গুলদস্তার কারবারি বলে ওঠে, 'ইয়ে সহি বাত।'

রইস আদমি থেকে সামান্য গুলদস্তার কারবারি—নবাব ও ক্লাইভের পাটনায় আগমনকে কেন্দ্র করে উত্তেজিত সকলেই।

ওদিকে পাটনা দুর্গ নিঝুম। নবাবকে স্বাগত জানানোর কোনও আয়োজন-আনজাম নেই। গত কয়েকদিন যাবৎ নায়েব রামনারায়ণজি আমদরবারে গরহাজির। সহজে অংক মেলাচ্ছে আমজনতা। পাটনার গদিতে সহোদর মিরকাজিমকে বসাতে চান মিরজাফর খাঁ। পদ থেকে বরখাস্ত হওয়ার পরোয়ানা নিশ্চই চলে এসেছে রামনারায়ণজির হাতে। তাই পাটনা দুর্গ বেরং।

পাটনার বাসিন্দাদের বড় একটা অংশের মন ভালো নেই। এরা চান রামনারায়ণই পাটনার কুরসিতে বহাল থাকুন। মিরকাজিমের সম্বন্ধে কানাঘুষোয় যতটুকু তারা জেনেছেন, তাতে তাঁর উপরে ভরসা করতে পারছেন না প্রায় কেউই। সময়টা ভালো নয়। পাটনায় হানা দিতে পারেন সুজাউদ্দৌলা, হানা দিতে পারে বর্গিরা। মানুষ চিন্তিত নিজেদের সুরক্ষা নিয়ে। তাদের বেশির ভাগেরই ভরসা রয়েছে রামনারায়ণের উপরে। কিন্তু কী আর করা যাবে? কিসমত ইনসানের আরজুর বান্দা নয়।

কিন্তু দিনদুয়েকের মধ্যে চমকে উঠল শহরবাসী। শোরগোল পড়ে গেল চারিদিকে। হঠাৎই সাজো সাজো রব পাটনা দুর্গে। আলোর মালায় সেজে উঠল গোটা কেল্লা। নহবতখানায় বেজে উঠল সানাই। সে সুর উপচে পড়া খুশির। দুর্গের অন্দরে বইছে ফূর্তি-আশরতের হাওয়া। হঠাৎ কী হল? এত খুশি কীসের? তাহলে কী নবাবের সঙ্গে সমঝোতা হয়ে গেল রামনারায়ণের? আশা-নিরাশায় দুলতে থাকে আমজনতা।

একদিন সকালে দামামা, কাড়ানাকাড়ার শব্দে বেজায় ঘাবড়ে গিয়ে আমজনতা দেখল, বেশ ফৌজ নিয়ে, নিজামতের নিশান উড়িয়ে হাতির পিঠে চেপে পুবমুখো চলেছেন রামনারায়ণ।

এ কোনও লড়াইয়ের আনজাম নয়। পাটনা দুর্গসূত্রে ছড়িয়ে পড়ল খবরটা– নবাবকে খোশ-আমদেদ করে পাটনা দুর্গে নিয়ে আসার জন্য নবাবের ছাউনিতে চলেছেন নায়েব রামনারায়ণ। নাচতে নাচতে হেলেদুলে চলেছে বাজনদারেরা। সেই বাজনার তালে তালে মাথা দোলাচ্ছেন রামনারায়ণ। নায়েবজির খোশমেজাজ ও পাটনাদুর্গের খুশির আমেজ দেখে তাজ্জব বনে গেল পথের ধারে ভিড় করে দারিয়ে থাকা জনতা। তবে কী মত বদলালেন মিরজাফর খাঁ, পাটনার কুরসিতে রামনারায়ণই বহাল থাকছেন?

ক্লাইভ লিখেছিলেন নবাবের তাঁবুতে গিয়ে তাঁকে স্বাগত জানাতে। কিন্তু রামনারায়ণের সেই সাহস হল না। নবাবের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে তিনি ইংরেজদের ছাউনিতে এসে হাজির হলেন।

রামনারায়ণকে ওয়েলকাম জানিয়ে খাতির করে ক্লাইভের কাছে নিয়ে গেলেন উইলিয়াম ওয়াটস। সোরার কারবারের বিষয়ে কর্নেলের সঙ্গে বিশেষ আলোচনার জন্য কয়েকদিন আগে মুর্শিদাবাদ থেকে ওয়াটস সাহেব এখানে এসে পৌঁছেছেন।

ক্লাইভের পায়ে প্রায় লুটিয়ে পড়ে রামনারায়ণ বললেন, ‘হুজুর আপনি আমার মাদার, আপনিই ফাদার। আপনি ভরসা দিলে বাঁচব, নয়তো গর্দান নেবেন নবাব।’

পাশ থেকে নবকৃষ্ণ বলে উঠলেন, ‘হুজুর হলেন স্বয়ং গোবিন্দের অবতার। ঘোর কলিতে ধরায় এসেছেন। গোবিন্দের শ্রীচরণে ঠাঁই নিয়েছেন, আপনার আর ভাবনা কী?

রামনারায়ণের দুই চোখ বেয়ে নেমে আসছে জলের ধারা।

ক্লাইভের উদ্দেশে নবকৃষ্ণ বললেন, ‘টিয়ারস পরম ভক্তির লক্ষ্মণ হুজুর।’

রামনারায়ণের সঙ্গে করমর্দন করে ক্লাইভ বললেন, ‘ডরো মাত বাবু।’

‘ডর কি সহজে যায় হুজুর? নবাবের গুসসা। এক হুকুমে মুণ্ডু খসে যেতে পারে।’

নবকৃষ্ণ বলেন, ‘ছাড়ুন দেখি আপনার নবাবের কথা। সাহেবের চোখের দিকে চাইলে তাঁর পিলে অবধি কেঁপে ওঠে। সাহেবের ইচ্ছের বিরুদ্ধে চলার হিম্মত আছে আপনার নবাবের?’

‘সেই জন্যেই তো নবাবের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে হুজুরের কাছে ছুটে আসা।’

‘পাটনার কুরসিতে আপনিই থাকবেন। আই কনভিনসড নবাব।’
জোড়হাত হয়ে রামনারায়ণ বললেন, ‘হুজুর আমি আপনার দাসানুদাস।’
এবারে রামনারায়ণের দুই দাখিলা বেশ বড়সড় একটা কাঠের পেটিকা নিয়ে এগিয়ে এল।
রামনারায়ণ হাত কচলে তোশামুদে হাসি হেসে বলেন, ‘হুজুরের নজরানা।’
নিজের হাতেই পেটিকার ডালা খুলে ক্লাইভের চোখের সামনে মেলে ধরেন রামনারায়ণ।
ক্লাইভের চোখ ঝলসে যায়। সোনা, হিরে, চুনি, পান্নার বহুমূল্যবান অলংকারে পেটিকাটি ঠাসা।
মুচকি হেসে ক্লাইভ বললেন, ‘সুক্রিয়া। এবারে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাতটা সেরে আসুন।’
কাঁচুমাচু মুখ করে রামনারায়ণ বলেন, ‘একলা যেতে ভয় লাগছে হুজুর। যদি কয়েদ করে?’
ক্লাইভ হেসে উঠে বললেন, ‘ডরো মাত বাবু, ডরো মাত।’
বিরক্তির সঙ্গে নবকৃষ্ণ বলে ওঠেন, ‘আপনার আক্কেল কী বলুন তো মশায়? খোদ ক্লাইভ সাহেব ভরসা দিচ্ছেন, তাতেও আপনার প্রত্যয় হচ্ছে না?’
রামনারায়ণকে ইতস্তত ভাব দেখে ক্লাইভ বললেন, ‘আপনি ওয়াটসকে সঙ্গে নিয়ে যান।’
হাসি ফুটল রামনারায়ণের মুখে। ‘হে-হে। বহুত বহুত সুক্রিয়া হুজুর। বহুত বহুত সুক্রিয়া।’
ওয়াটসকে সঙ্গে নিয়ে খোশমেজাজে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চললেন রামনারায়ণ।
রামনারায়ণকে দেখেই গোবিন্দমল্ল এগিয়ে এসে চাপা স্বরে বললেন, ‘করেছেন কী হুজুর?’
রামনারায়ণের ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, ‘কেন? কসুর কী হল?’
‘আপনাকে বলেছিলাম না সরাসরি নবাবে ছাউনিতে আসতে।’
থতমত খেয়ে রামনারায়ণ বললেন, ‘পথে ইংরেজ ছাউনি পড়ল তাই–’
‘কথাটা নবাবের কানে গিয়েছে।’
‘হেই সিয়ারাম!’ রামনারায়ণ আঁতকে ওঠেন।
গোবিন্দমল্ল বলেন, ‘মিরকাজিমের গুপ্তচরেরা কথাটা তুলেছে নবাবের কানে। গুসসা হয়েছে নবাবের। এ নিয়ে পুছতাছ করলে বলবেন, আপনাকে ফৌজ নিয়ে আসতে দেখে পথে আটকেছিল গোরা পল্টনেরা। কার্যত আপনাকে গ্রেফতার করে তারা ক্লাইভ সাহেবের সামনে হাজির করেছিল। আমি এমনই বুঝিয়েছি।’
‘বহুত সুক্রিয়া।’
‘শুধু সুক্রিয়াতে কি কাজ হয় রামনারায়ণজি? ইনাম?’
‘বিলকুল।’ এই বলে নিজের গলা থেকে একছড়া মুক্তোরমালা খুলে নিয়ে গোবিন্দমল্লের হাতে গুঁজে দিলেন রামনারায়ণ।
গোবিন্দমল্ল খুশি গলায় বললেন, ‘অন্দরে যান। তবে একটু হিসেব কষে কথা কইবেন।’

ফরাসে কাত হয়ে শুয়ে ফরসির নল হাতে আয়েশ করছিলেন মিরজাফর খাঁ। রামনারায়ণ তাঁবুর অন্দরে প্রবেশ করতেই বিদ্রুপের ঢঙে মিরজাফর বলে উঠলেন, ‘আসুন নায়েবজি আসুন। আপনি তো এখন বহুত তাগদবাজ আদমি। খোদ ক্লাইভ সাহেবের মুরুব্বি। ইংরেজলোগের দোস্ত।’
রামনারায়ণ মনে মনে বললেন, মদ্দা গর্ধভ হওয়ার চেয়ে মুরুব্বি হওয়া ভালো। মনের ভাব গোপন করে তসলিম জানিয়ে বললেন, ‘ইয়ে ঝুটা ইলজাম হুজুর। ইংরেজলোগের সঙ্গে আমার কোনও দোস্তি নেই।’
‘সচ বলছেন?’
‘বিলকুল সচ বাত হুজুর।’
‘আমি শুনেছি, ক্লাইভ সাহেবের সঙ্গে মোলাকাত করতে গিয়েছিলেন আপনি।’

ভিতরে ভিতরে কেঁপে উঠলেন রামনারায়ণ। গোবিন্দমল্লের শেখানো বুলি তোতাপাখির মতো আউড়ে গেলেন। তবে একথায় নবাবের একিন হল কি না তা বুঝতে পারলেন না। নবাবের চোখ বোজা। ফরসির নলে টান দিয়ে চলেছেন।

নবাবকে ফের তসলিম জানালেন রামনারায়ণ। বিশাল ভুঁড়ি নিয়ে কোমরের উপরের অংশ সামনে ঝোঁকাতে আজকাল বড় কষ্ট হয় তাঁর। তবুও শরীরটাকে ঝোঁকালেন অনেকটা। বললেন, ‘এতকাল নিজামতের নিমক খেয়েছি। আমি স্রেফ আপনারই বান্দা হুজুর।’

‘ইয়ে খুশি কি বাত।’ একথা বিদ্রুপ না অন্তর থেকে বলা তার দিশা পেলেন না রামনারায়ণ। ভয়ে দুরু দুরু করছে তাঁর বুক। এখনই না নবাব কয়েদ করার হুকুম করেন তাঁকে।

মিরজাফর শুধোলেন, ‘পাটনার হালচাল কী?’

‘বড়িয়া। সব কুছ সহি সালামত আছে হুজুর। আপনি খুদ যাচ-ইমতেহানি করে নেবেন।’

কাঠের একটা পেটিকা নিয়ে আসে দুই দাখিলা।

‘হুজুরের নজরানা।’ ফের শির ঝোঁকালেন রামনারায়ণ।

ডালা খুলতেই ঝলমল করে ওঠে সোনাদানা, হিরে-জহরত। মিরজাফরের চোখদুটো চকচক করে ওঠে। একই সঙ্গে রামনারায়ণের প্রতি ক্রোধে তাঁর সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে। সম্মুখে জোড়হাত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা তাঁর তকলিফের কারণ। একে কয়েদ করার পরোয়ানা জারি করে তাঁর যাবতীয় সঞ্চয় দখল করে নেওয়া যায়। তাহলে কিছুটা হলেও নবাবের আর্থিক সঙ্কট মেটে। কিন্তু সে উপায় নেই। রামনারায়ণের বরবাদি চান না কর্নেল ক্লাইভ। মিরজাফর হঠাৎ মনস্থ করলেন ক্লাইভ যাই বলুন না কেন, তিনি এখনই গ্রেফতার করবেন রামনারায়ণকে।

এই সময়ে নবাবের খাস গোলাম এসে বলল, ‘হুজুর ওয়াটস সাহেব আপনার দর্শন চান।’

ভুরু কুঁচকে গেল মিরজাফরের। উইলিয়াম ওয়াটস। সেই ধূর্ত লোকটা! হঠাৎ কী মনসুবা নিয়ে হাজির এখানে? নিশ্চয়ই ক্লাইভের কাছ থেকে কোনও বার্তা নিয়ে এসেছেন। ক্লাইভের মুখটা মনে পড়তেই ভয়ে ফের গুটিয়ে গেলেন নবাব। রামনারায়ণকে কয়েদ করার আরজু গায়েব হয়ে গেল তার মগজ থেকে। কাত হওয়া অবস্থা থেকে তিনি সোজা হয়ে বসলেন। গোলামের উদ্দেশে হুকুম করলেন, ‘ওয়াটস সাহেবকে অন্দরে নিয়ে এসো।’

রামনারায়ণ জোড়হাত হয়ে বললেন, ‘পাটনা দুর্গে কখন পায়ের ধুলো দেবেন হুজুর?’

গম্ভীর গলায় মিরজাফর বললেন, ‘কাল রওনা দেব। আজ আমার ছাউনিতেই আপনি থাকুন। আমার সঙ্গেই পাটনায় যাবেন।’

‘জি হুজুর।’ এই বলে নবাবকে তসলিম জানিয়ে মনের মধ্যে একরাশ ভয় নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন রামনারায়ণ। নবাবের ছাউনিতে রাত্রিবাসের হুকুম। আজ রাতেই না কোতল হয়ে যান। গলায় জড়ানো তুলসীর মালা ছুঁয়ে মনে মনে বললেন, ‘হে গোবিন্দজি রক্ষা করো।’

রামনারায়ণ বেরিয়ে যেতেই তাঁবুর অন্দরে ঢুকলেন ওয়াটস।

হাসিমুখে নবাব শুধোলেন, ‘কেমন আছেন সাহেব?’

‘হুজুরের রহেমে সহি সালামত খুশ তবিয়ত আছি।’ জবাব দিলেন ওয়াটস।

দু’চারটে মামুলি কথাবার্তা চালানোর পর ওয়াটস সাহেব এলেন কাজের কথায়। বললেন, ‘কর্নেল ক্লাইভের মনসুবা পাটনার সোরার ইজারা তিনি নিতে চান।’

দুপুরের আহারের পর ফরসির নল মুখে দিয়ে সামান্য ঝিমুনির ভাব আসছিল মিরজাফরের। ওয়াটসের প্রস্তাব শুনে তা এক লহমায় দূর হয়ে গেল। আসলে সোরার ইজারা থেকে হর সন মোটা টাকা উপায় হয় নবাবের। হুগলির আরমানি কারবারি খোজা ওয়াজিদ প্রতিবছরই নবাবকে ঘুষ দিয়ে পাটনার সোরার ইজারা

নেন। কিন্তু ক্লাইভের হাতে সোরার ইজারা গেলে নবাব তো তার কাছ থেকে ঘুষ চাইতে পারবেন না। নবাবের রোজগারের উপরেই যে থাবা বসাতে চাইছেন ক্লাইভ।

এমনিতেই তো পলাশির যুদ্ধের পর থেকে খানিকটা গায়ের জোরে ছাপরার সব চেয়ে উৎকৃষ্ট সোরা উপযুক্ত মূল্য না দিয়েই নিয়ে যাচ্ছে ইংরেজরা। বর্তমান ইজারাদার খোজ ওয়াজিদ এ নিয়ে বারবার শিকায়ত জানিয়েছেন নবাবের কাছে। কিন্তু তিনি ক্লাইভের মুখ চেয়ে ইংরেজদের কিছু বলতে পারেননি। তবুও খোজা ওয়াজিদকে চাপ দিয়ে ঘুষ বাবদ মোটা টাকা উপায় করেন নবাব। এবার যে এই রোজগারের পথও বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

নবাবকে চুপ করে থাকতে দেখে ওয়াটস বললেন, 'কর্নেলের চিঠি আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি। বুঝতেই পারছেন হুজুর বিভিন্ন জায়গায় ঘাঁটি সামলাতে আমাদের প্রচুর বারুদের প্রয়োজন।'

'নবাব বললেন, 'সোরা তো আপনারা পাচ্ছেনই।'

'চড়া দামে খরিদ করতে হচ্ছে হুজুর। ইজারা পেলে আমাদের তকলিফ দূর হয়।' এই বলে ক্লাইভের চিঠি নবাবের হাতে ধরিয়ে দিলেন ওয়াটস। নবাব চোখ বোলাতে লাগলেন চিঠিতে।

ওয়াটস বললেন, 'মুফতে ইজারা চাইছেন না কর্নেল। চিঠিতে স্পষ্ট লিখেছেন। খোজা ওয়াজিদ ইজারা বাবদ যে টাকা তোশাখানায় জমা দেয়, তিনি সেই টাকাই জমা দেবেন।'

ধূর্ত কটা চোখে নবাবকে জরিপ করতে লাগলেন ওয়াটস। নবাবের চোখ আবদ্ধ ক্লাইভের চিঠিতে। ওয়াটস ফের বললেন, 'আমার উমিদ কর্নেলের আরজি আপনি মঞ্জুর করবেন।'

তীব্র বিরক্তির ছাপ মিরজাফরের চোখেমুখে। বললেন, 'ভেবে দেখি কী করা যায়।'

নবাবকে ফের একবার তসলিম বিদায় নিলেন ওয়াটস।

রাগে জ্বলছে মিরজাফর খাঁ'র সর্বাঙ্গ। ইংরেজলোগ তাঁর দোস্ত নয়। শিরদাঁড়ায় এক বিষফোঁড়া। এই ফোঁড়া কেটে দূর করতে না পারলে তার শরীরের ইলাজ হবে না, কমবে না জ্বলুনি।

প্রতি মুহূর্তে নানা ছুতোয় টাকা টাকা করে ইংরেজরা হাত পাতছে নবাবের কাছে। ইংরেজ বাহিনীর খরচ বহন করতে হচ্ছে নবাবকে। অবশ্য এজন্য কাকে দুষবেন নবাব? তিনি নিজেই তো এই মোতাবেক ইকরারনামায় দস্তখত করেছেন। রাজারাম, রায়দুর্লভ, রামনারায়ণ কাউকেই তিনি টিট করতে পারলেন না। এঁদের ধন-দৌলত দখল করতে পারলেন না। কারণ ক্লাইভ। এখন তিনি চাইছেন সোরার ইজারা। ঘুষ বাবদ নবাবের বাড়তি আয় বন্ধ হওয়ার উপক্রম। ধূর্ত রবার্ট ক্লাইভ তো তাঁকে ভিখিরি বানিয়ে ছাড়বেন!

সহসা অন্য আরেক দুশ্চিন্তা এসে থানা গাড়ল মিরজাফরের মনে। নাই বা হল রামনারায়ণের দৌলত দখল, নবাব ভেবেছিলেন, পাটনায় এসে নায়েব সুবাদার ও জমিদারদের থেকে মোটা টাকা নজরানা আদায় করে ফিরবেন। লোকে দহসত থেকে মোটা নজরানা দেয় তাগদবাজ আদমিকে। পাটনার পথে তাঁর থেকে কয়েকক্রোশ এগিয়ে তাঁবু ফেলেছেন ক্লাইভ। তার উপরে ইংরেজ ফৌজ চলাচল করে খুব দ্রুত। ক্লাইভ যদি সাড়ম্বরে তাঁর ফৌজ নিয়ে নবাবের আগেই পাটনায় ঢুকে পড়েন, তাহলে সকলের ধারণা হবে ক্লাইভই এখন সুবে বাংলায় সবচেয়ে তাগদবাজ আদমি। তাঁকে তুষ্ট রাখতে পারলেই সহি সালামত থাকবে সকলে। সেই হেতু হয়তো নবাবের প্রাপ্য নজরানার মোটা অংশটাই দখল করে নেবেন ক্লাইভ। নবাবের ভাগে জুটবে ছিটেফোঁটা। এই ভেবে অস্থির হয়ে পড়লেন নবাব। তখনই তলব করলেন তাঁর অতি বিশ্বস্ত সেনাপতি খোজা হাজিকে।

খোজা হাজি এসে তসলিম জানাতেই নবাব বললেন, 'এখনই পাটনার উদ্দেশে রওনা হয়ে যাও। ইয়াদ রেখো, আমি পাটনায় পৌঁছনোর আগে কোনওমতেই কর্নেল ক্লাইভ যেন পাটনা শহরে ঢুকতে না পারেন।'

নবাবের কথা শুনে বুক কেঁপে উঠল হাজির। কী দুরূহ কাজের ভার তাঁর কাঁধে চাপালেন নবাব। আটকাতে হবে কর্নেল ক্লাইভকে, যাঁর ভয়ে নবাব নিজেই সবসময় ত্রস্ত হয়ে থাকেন।

মনের ভাব গোপন করে ফের মাথা ঝুঁকিয়ে হাজি বললেন, ‘জি হুজুর।’

৪৯

পাটনার উদ্দেশে মার্চ শুরু করলেন ক্লাইভ। পথের দু’ধারে উপচে পড়ছে ভিড়। জোড়া জোড়া কৌতূহলী চোখ শাহিসড়ক দিয়ে হেঁটে চলা ইংরেজদের মধ্যে থেকে কর্নেল ক্লাইভকে চিনে নেওয়ার কোশিশ করছে। কোন মানুষটা রবার্ট ক্লাইভ-সাবিৎ জঙ্গ? কোথায়? জনতা এ ওর ঘাড়ের উপরে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। শীতে জুবুথুবু এলাকা অচানকই গরম হয়ে উঠেছে উত্তেজনায়।

ক্লাইভের ফৌজ বলতে গোরা পল্টন ও দিশি সেপাই মিলিয়ে শ’পাঁচেক পদাতিক সেনা, শতখানেক বেয়নেটধারী গোরা ঘোড়সওয়ার, গো-গাড়ির উপরে চাপানো গোটা ছয়েক ফিল্ড পিস কামান। এছাড়া রয়েছে ফৌজি ব্যান্ডের বাজনদারেরা, বারুদ, রসদের গাড়ি ও মুটেমজুর, কুলি-কামিনের দল। প্রথমেই চলেছে কামানের গাড়িগুলো। পশ্চিমাকাশ পানে উঁচু হয়ে রয়েছে তোপের নল। দেহাতি আনপঢ় লোকজন শুনেছে পলাশির লড়াইয়ে এই তোপগুলোর বড় ভূমিকা ছিল। এগুলোর শক্তি নাকি ভয়নাক। নিমেষে বিপক্ষকে গুঁড়িয়ে দেয়। পথের ধারে জমায়েত লোকজন অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কামানের গাড়িগুলোর দিকে। তোপের গাড়ির পিছনে পতাকার দণ্ড হাতে চলেছে জনৈক গোরা পল্টন। উত্তুরে হাওয়ায় দাপটের সঙ্গে উড়ছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরাটাকার পতাকা। ইংরেজদের শক্তি, অহংকার ঔদ্ধত্যের প্রতীক। পতাকাধারীর পিছনে চলেছে ফৌজি ব্যান্ডের বাজনদারেরা। ব্যান্ডে বাজছে রুল ব্রিটানিয়ার সুর। বাজনদারদের পিছনে ঘোড়ার পিঠে চেপে চলেছেন কর্নেল ক্লাইভ। তার ঠিক পিছনে কিছুটা তফাতে চলেছে তাঁর দেহরক্ষীরা। তাদের পিছনে বাকি অফিসারেরা। হেস্টিংস, ওয়ালশ, ওয়াটস, ফোর্ড ও আরও অনেকে। তারপরে বেয়নেটধারী গোরা পল্টন, একেবারে শেষে চলেছে দিশি সেপাইরা।

অবাক হয় জনতা। পাটনা শহরের প্রবেশদ্বার এসে পড়ল প্রায়। কিন্তু ইংরেজ বাহিনী যে একেলাই চলেছে। কোথায় নবাব? কোথায় তার বাহিনী? নবাবের সঙ্গেই তো আসার কথা ছিল ইংরেজদের। মানুষের স্বভাবিক পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা নীরবে বলে দেয় অনেক উহ্য কথা। আমআদমি বোঝে এই অভিযানের মূল নায়ক ইংরেজরা। নবাবের হুকুম বা ফরমাশ তামিলের বান্দা নন ক্লাইভ। তা যদি হত, তবে নবাবের ফৌজই আগে প্রবেশ করত পাটনা শহরে। তাদের পিছনে আসত ইংরেজবাহিনী।

পাটনা শহরের প্রবেশদ্বার আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন হাজি আলি। নবাবের হুকুম—শহরে প্রবেশ করার আগে রুখতে হবে ইংরেজবাহিনীকে। নবাবের ইরাদা, আগে তিনি প্রবেশ করবেন পাটনা শহরে, তার পিছু পিছু ঢুকবে ইংরেজবাহিনী। রামনারায়ণের উপরে হুকুম হয়েছে, তাঁর বাহিনী যেন হাজিকে মদত দেয়। মুর্শিদাবাদে যাই ঘটুক না কেন, নবাব হওয়ার পর এই প্রথম পাটনায় আসা—পাটনাবাসীকে মিরজাফর খাঁ দেখিয়ে দিতে চান তিনি মোটেই পুতুল নবাব নন।

নবাবের হুকুম তামিল করার জন্য দ্রুত পাটনায় ফিরতে চেয়েছিলেন রামনারায়ণ। আসলে এই ছুতোয় নবাবের হেফাজত থেকে তিনি পালিয়ে যেতে চাইছিলেন। কিন্তু রামনারায়ণের পাটনায় ফেরার আরজি নামঞ্জুর করলেন নবাব। অগত্যা নবাবের আদেশে হাজি আলির হাত দিয়ে নিজের সেনাপতির কাছে বার্তা পাঠালেন রামনারায়ণ– পাটনা শহরে প্রবেশের আগে রুখতে হবে কর্নেল ক্লাইভকে। মদত দিতে হবে হাজি আলিকে।

রবার্ট ক্লাইভের পথরোধ করতে হবে। কথাটা ভেবেই রক্তচাপ বেড়ে যাচ্ছে হাজি আলির। তাঁর মনে ক্ষীণ আশা ছিল, নবাব যদি সদলবলে একটু পা চালিয়ে এসে ক্লাইভের আগেই পাটনা শহরে ঢুকে পড়েন,

তাহলে তাঁকে আর এই ঝকমারির মধ্যে পড়তে হবে না। কিন্তু গতকাল যে খবর হাজি আলি পেয়েছেন তা খুবই হতাশাজনক। পাটনা এসে পৌঁছতে নবাবের এখনও দিন দুয়েক সময় লাগবে। ওদিকে কর্নেল ক্লাইভ পাটনায় পৌঁছলেন বলে। অগত্যা শহরের প্রবেশদ্বারের মুখে সেনা সমাবেশ করতে বাধ্য হলেন হাজি আলি।

হঠাৎই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ইংরেজ ফৌজ। ভুরু কোঁচকাল ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা ক্লাইভের। দূরে দেখা যাচ্ছে পাটনা শহরের প্রবেশদ্বার। কিন্তু ব্যাপার কী? পথ আটকে দাঁড়িয়ে রয়েছে একদল সেপাই। হাতিয়ারবন্ধ। এরা কি লড়াই করতে চায়? তাজ্জব হয়ে গেলেন ক্লাইভ।

হেস্টিংস ও নবকৃষ্ণ ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে গেলেন সামনে।

হাজি আলি বিনীত ভাবে জানালেন, 'আপাতত এখানেই ছাউনি ফেলতে হবে আপনাদের।'

নবকৃষ্ণ ঝাঁঝের সঙ্গে শুধোলেন, 'মজাক করছ নাকি? পাটনা দুর্গের দোরগোড়ায় এসে ক্লাইভ সাহেব এখানে ছাউনি ফেলবেন কেন?'

'শহরের অন্দরে যাওয়ার পরোয়ানা নেই।'

'পরোয়ানা নেই মানে? কার পরোয়ানা?' পরম বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন নবকৃষ্ণ।

'হুজুরের।'

হাঁ হয়ে গেলেন নবকৃষ্ণ ও হেস্টিংস দু'জনেই।

হেস্টিংস শুধোলেন, 'কে তোমার হুজুর?'

'নবাব মিরজাফর খাঁ। তিনি এখানে এসে না পৌঁছনো পর্যন্ত এখানেই আপনাদের ছাউনি ফেলে অপেক্ষা করতে হবে। আগে হুজুর শহরে ঢুকবেন। তারপরে আপনারা।'

হতচকিত ভঙ্গিতে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন হেস্টিংস ও নবকৃষ্ণ।

নবকৃষ্ণ বিরক্তির সঙ্গে শুধোলেন, 'এই পরোয়ানা কেন?'

হাজি বিনীত ভাবেই বললেন, 'মালুম নেই।'

নবকৃষ্ণ চোখ পাকিয়ে বললেন, 'ভালো চাও তো পথ ছেড়ে দাও। ক্লাইভ সাহেব কি নবাবের হুকুমের গোলাম? কার পথ আটকাচ্ছ সে খেয়াল আছে? নবাব তিনবেলা সেলাম ঠোকেন তাঁকে। ক্লাইভ সাহেবকে নবাবের পরোয়ানা দেখাচ্ছ? এখনই পথ যদি না ছাড়ো তো অনর্থ ঘটে যাবে। তখন সবদিক সামাল দিতে পারবে তো?'

রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে হাজি আলি বললেন, 'গোস্তাকি মাফ করবেন। আমি নবাবের বান্দা। শ্রেফ হুকুম তামিল করছি। পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াতে পারব না।'

চোয়াল শক্ত করে হেস্টিংস শুধোলেন, 'ইজ দিস ইওর লাস্ট ওয়ার্ড?'

'জি সাহেব। আমি নবাবের নিমক খাই। বেইমানি তো করতে পারি না।'

'নাউ বি প্রিপেয়ার্ড টু ফেস দ্য ক্যানন শটস।' আঙুল উঁচিয়ে হুমকির সুরে বললেন হেস্টিংস।

ইংরেজি কথাটা তর্জমা করে হাজিকে বুঝিয়ে দিলেন নবকৃষ্ণ।

ভয়ে বুক কেঁপে উঠল হাজি আলির। ত্রাস ছড়িয়ে পড়ল তার সঙ্গে থাকা সেপাইদের মধ্যেও।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে এলেন হেস্টিংস ও নবকৃষ্ণ।

সব শুনে রাগে ও অপমানে ভয়ানক হয়ে উঠল ক্লাইভের মুখটা। এ ভাবে তাঁর পথ আটকানোর মানে? কী চান নবাব? ইংরেজদের হেয় করতে চান? বুঝিয়ে দিতে চান তিনি সুবে বাংলার সর্বশক্তিমান নবাববাহাদুর। ইংরেজরা তার হুকুমের দাস?

চোয়াল শক্ত করে ক্লাইভ বললেন, 'মার্চ ফরোয়ার্ড। কুইক।'

দূর থেকে হাজি আলি দেখলেন তড়িৎ গতিতে ধেয়ে আসছেন ক্লাইভ। তার গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে ইংরেজবাহিনী। হেস্টিংস ও নবকৃষ্ণকে না হয় নবাবের হুকুমতের কথা শুনিয়েছেন।

কিন্তু কী বলবেন ক্লাইভকে?

হাজি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা সেপাই-পেয়াদারা সংখ্যায় কমতে শুরু করেছে। বিপদ আন্দাজ করে গুটি-গুটি সরে পড়ছে। রামনারায়ণের বাহিনীর যে সমস্ত সেপাইরা তাঁকে মদত দিতে এসেছিল, তারা পালিয়েছে আগেই। মনে সাহস জুগিয়েও হাজি আলি নিজের সেপাইদের আর ধরে রাখতে পারলেন না। ক্লাইভকে তিরবেগে এগিয়ে আসতে দেখে তারা ক্রমশ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়তে লাগল। প্রবেশদ্বারের সমুখে কার্যত প্রায় একাকী দাঁড়িয়ে আছেন বিব্রত ও বিধ্বস্ত হাজি আলি। সঙ্গে সামান্য কয়েকজন অনুগত সেপাই।

ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলেন ক্লাইভ। নেমে এলেন ঘোড়ার পিঠ থেকে।

হাজি এগিয়ে এসে ক্লাইভকে কুর্নিশ জানিয়ে বললেন, 'পাটনা শহরে আপনাকে স্বাগত। আসুন হুজুর। আসুন। আপনার রহেমে এই বান্দা যেন খুশ তবিয়ত থাকে।'

কোম্পানির নিশান উড়িয়ে রাজকীয় ভঙ্গিমায় পাটনা শহরে প্রবেশ করলেন ক্লাইভ।

আকাশে উড্ডীন কোম্পানির বিরাটাকার পতাকা, ফিল্ড পিস কামানের উদ্ধত নল, এবং নবাবকে ছাড়াই প্রবল ঔদ্ধত্যের সঙ্গে ইংরেজদের পাটনা শহরে প্রবেশ দেখে পাটনাবাসীর অনেক কৌতূহলেরই নিরসন হয়ে গেল। রাস্তার দুপাশে জমায়েত হওয়া অসংখ্য মানুষ বুঝল, সত্যিই সুবে বাংলায় ইংরেজরা এখন দুর্ধর্ষ শক্তি। হুকুম, পরোয়ানায় এদের বশে রাখার সাধ্য নবাবের নেই।

আম-লোগ বরাবরই তাগদবাজের বশ। নিমেষে ইংরেজ ভজনা শুরু হয়ে গেল পাটনা শহরে। ক্লাইভের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগল পথের ধারে ভিড় জমানো মানুষজন।

ক্লাইভকে স্বাগত জানিয়ে কেল্লার অভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য ছুটে এল কেল্লাদার।

পাটনায় ঢোকার পথে সাময়িক বাধা পেয়ে ক্লাইভের মেজাজ তখনও গরম হয়ে রয়েছে। কেল্লাদারের খাতিরদারিকে উপেক্ষা করে শহরের বাইরে এসে ছাউনি ফেললেন গঙ্গার উন্মুক্ত চরে।

লোকলস্কর, সেপাই-পেয়াদা, বন্দুকচি, ধানুকি, মুটেমজুর, হাতি-ঘোড়া-উট, তোপের গাড়ি, বাইজি-কসবীসহ বিরাট লটবহর নিয়ে দুদিন পরে ধীরে সুস্থে পাটনা শহরে ঢুকে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল মিরজাফরের। এ তাঁর নিজের রাজত্ব না ইংরেজ-অধিকৃত কোনও শহর। জায়গায় জায়গায়, গাছের ডাল থেকে ঝুলছে ইংরেজ কোম্পানির পতাকা। সাহেবদের খাতিরদারির জন্য এ কাণ্ড যে আমআদমিই ঘটিয়েছে তা দিব্যি বুঝলেন নবাব। ক্লাইভের অবস্থান যে তাঁর উপরে সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে পাটনাবাসীর কাছে। ফের তীব্র হতাশা গ্রাস করল নবাবকে। মাথায় চাপানো উষ্ণীষটা বড় ভারী বলে মনে হল। বিষণ্ণ মেজাজে পাটনা দুর্গে প্রবেশ করলেন তিনি।

ইংরেজরা ছাউনি ফেলেছে শহরের বাইরে। গঙ্গার চরে। একথা শুনে একই সঙ্গে শঙ্কা ও স্বস্তির অনুভূতি হল নবাবের। ক্লাইভ কি রুষ্ট হয়েছেন? শঙ্কা তাই নিয়ে। আর স্বস্তি? আপাতত কর্নেলের মুখটা সর্বক্ষণ দেখতে হবে না।

আজকাল নিজের মনের গতির আন্দাজ পান না নবাব। মনের গহীন এলাকাটা ক্রমশ দুরূহ হয়ে পড়ছে তাঁর কাছে। ঠিক কী যে তিনি চান, তা বুঝে উঠতে পারেন না। মাঝে মাঝে মেজাজটা ভীষণ গরম হয়ে ওঠে। এ সময়ে তার সব রাগ গিয়ে পড়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল মানুষের উপরে, যারা তার হুকুমের বান্দা।

হাজি আলিকে তলব করলেন মিরজাফর। বান্দা হুকুম তামিল করেনি। পাটনা শহরে প্রবেশের মুখে বাধা দেয়নি ইংরেজদের। বেইজ্জত করেছে নবাবকে।

ত্রস্ত হাজি আলি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাজির হলেন নবাবের সমুখে।

কোনও ভূমিকা ছাড়াই নবাব গর্জন করে উঠলেন, 'হুকুম তামিল হল না কেন?'
নিজের গর্দান বাঁচাতে হাজি আলি সব দায় চাপিয়ে দিলেন রামনারায়ণের ঘাড়ে। বললেন, 'আমি কোশিশ করেছিলাম। লেকিন বেইমানি করল রামনারায়ণজির ফৌজ। কর্নেলকে আসতে দেখেই ভেগে পড়ল তারা। আমার ফৌজ তো গুনতিতে কমই ছিল হুজুর। রামনারায়ণজির সেপাইদের দেখে তারাও ভাগতে লাগল। এর পরেও কি ক্লাইভ সাহেবকে শহরের বাইরে রুখে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল? এই বান্দাকে রহেম করবেন হুজুর।'
ধন্দে পড়ে গেলেন নবাব।
গলা খাটো করে হাজি আলি ফের বললেন, 'এ রামনারায়ণজিরই কারসাজি। তিনি গোপনে বার্তা দিয়েছিলেন তার সেপাইদের। ক্লাইভ সাহেবকে যেন বাধা না দেওয়া হয়।'
রাগে, অপমানে ফুঁসছেন মিরজাফর খাঁ। রামনারায়ণকে ডেকে পাঠালেন।
রামনারায়ণ ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে সেলাম জানালেন নবাবকে।
পাটনার নায়েব সুবাদারের নামে যে শিকায়ত জানিয়ে গেল হাজি আলি, তার অবশ্য কোনও সাবুত নেই। নবাব ও পথে গেলেন না। বললেন, 'পিছনের পাঁচ সালের খাজনা আদায় উশুলের হিসেবের খতেন আমি দেখতে চাই। জাবেদা খাতা তৈয়ার রাখুন। দু'দিন পরে দেখব।'
'জি হুজুর।' মুখে একথা বললেও আতঙ্কের চোরাস্রোত বয়ে গেল রামনারায়ণের মনের অন্দরে। তবে কি নবাব তাকে উপড়ে ফেলার জন্য জুতসই সাবুতের তালাশ করছেন? হিসেব দাখিল করতে গেলেই তো তিনি ফাঁপরে পড়বেন। পাটনায় প্রভূত শক্তিশালী হয়ে উঠে নিজামতের প্রাপ্য অনেক টাকাই এ কয়েক বছরে তিনি নিজের জেবের মধ্যে পুরেছেন। তাহলে উপায়?

রাত গভীর। পাটনা দুর্গ নিঝুম। কড়া শীতে একেবারে জুবুথুবু। ঘুমিয়ে কাদা প্রায় সকলে। শুধু বরফের মতো ঠান্ডা পাথরের চাতালের উপরে লাঠি ঠুকে ঠুকে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে রাতপাহারায় নিযুক্ত সেপাইরা। শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচতে মোটা পশমের আলোয়ানে এদের মাথা থেকে হাঁটু পর্যন্ত জড়ানো। তবুও হুল ফোটাচ্ছে ঠান্ডা হাওয়া। পাহারার ফাঁকে অনেকে এক জায়গায় জড়ো হয়ে আগুনে হাত-পা সেঁকে শরীরটাকে গরম করে নিচ্ছে।
কুয়াশা পড়েছে জব্বর। বাতিস্তম্ভের আলো ঘোলাটে। খানিক দূরের জিনিসও ঝাপসা দেখাচ্ছে। চোরের মতো চুপিসাড়ে, আলোয়ানে আপাদমস্তক মুড়ে সন্দেহজনক ভাবে এগিয়ে চলেছে এক ছায়ামূর্তি। হঠাৎই রঘুরাম সিং-এর নজরে পড়ে যায় লোকটা। রামনারায়ণের একজন অতি বিশ্বস্ত গুপ্তচর রঘুরাম। রাতে দুর্গের অন্দরে বিশেষ নজর রাখার জন্য তাঁর উপরে হুকুম করেছেন রামনারায়ণ। রঘুরামের চোখদুটো ভয়ানক। অনেক কিছুই তার নজরে পড়ে যায়, যা আর পাঁচজনে দেখতে পায় না। নিঃশব্দে ছায়ামূর্তির পিছু নিল রঘুরাম।

ঘুম নেই মিরকাজিমের চোখে। ঘর গরম রাখার জন্য একনাগাড়ে জ্বলছে আগুন। সেই আগুনের আলোয় স্পষ্ট নবাব মিরজাফর খাঁর সহোদরের কপালে ফুটে ওঠা দুশ্চিন্তার রেখা। ঘটনার গতিপ্রকৃতি দেখে তাঁর মালুম হচ্ছে পাটনার নায়েব সুবাদারি তাঁর নসিবে নেই। তিনি ভেবেছিলেন পাটনা দুর্গে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েদ হবেন রামনারায়ণ। সেরকম কিছুই ঘটল না। গত পাঁচ সালের খাজনার হিসেব দাখিল করার জন্য রামনারায়ণকে হুকুম করেছেন নবাব। সে যাই হোক, নবাবের উপরে আর ভরসা রাখতে পারছেন না

মিরকাজিম। অনেকদিন ধরেই পাটনার পরবর্তী নায়েব সুবাদার হিসেবে মিরকাজিমের নামটা আলোচিত হয়ে চলেছে নিজামতের অলিন্দে। কিন্তু কার্যসিদ্ধি হচ্ছে না কিছুতেই। অনেক ওমরাহ আড়ালে বিদ্রুপ করছেন। মিরকাজিম ভেবেছিলেন তাঁকে পরবর্তী মনিব ভেবে বিশেষ খাতির দেখাবে পাটনা দুর্গের কর্মচারীরা। না! তেমনও কিছু ঘটল না। ঘোর বেইজ্জতি। এ জন্য দায়ী তাঁর সহোদর। বুজদিল, ডরপোক নবাব। ইংরেজদের ভয়ে কেবল সিঁটিয়ে রয়েছেন। মিরজাফরের প্রতি তীব্র নফরতিতে ভরে উঠেছে মিরকাজিমের মন। আর নবাবের মুখের দিকে চেয়ে থাকা নয়। এবারে যা করার তা তার নিজেকেই করতে হবে।

নির্দিষ্ট ছন্দে পরপর তিনবার মৃদু টোকা পড়ল দরজায়। সচকিত হয়ে উঠলেন মিরকাজিম। রাত জেগে এই আগন্তুকেরই ইন্তেজার করছিলেন তিনি। দ্রুত ছুটে এসে দরজা খুললেন সন্তর্পণে।

ছায়ামূর্তি ঢুকে পড়ল অন্দরে। ভেজিয়ে দিল দরজাটা।

শুনসান আঁধারে মোড়া অলিন্দে একটা থামের আড়াল থেকে দৃশ্যটা দেখল রঘুরাম। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ হতেই নিঃশব্দে এগিয়ে এসে দরজার গায়ে কান পাতল সে।

কক্ষের অন্দরে কথাবার্তা চাপাস্বরে হলেও, কথাগুলো স্পষ্ট ভেসে আসছে রঘুরামের কানে। গলার আওয়াজেই আগন্তুককে চিনে নিতে কোনও অসুবিধা হল না রঘুরামের। মিরকাজিমের পরিকল্পনার কথা শুনে সে শিউরে উঠল। হঠাৎই তাঁর চোখে পড়ল দরজার গায়ে একটা ছিদ্র। সেই ছিদ্র পথে চোখ রাখল রঘুরাম।

একটা চামড়ার খেরিয়া ছায়ামূর্তির হাতে তুলে দিয়ে মিরকাজিম চাপা গলায় বললেন, 'হাজার মোহর আছে এই খেরিয়ায়। কাজ হাসিল হলে আরও দেব। লেকিন যেমন বললাম কালই কাজটা হাসিল করা চাই।'

'জি হুজুর।'

'পারবে তো?'

'এই বান্দার উপর আপনি ভরসা রাখতে পারেন।'

'বেশ এসো এখন। সাবধান। কেউ যেন টের না পায়।'

কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসছে ছায়ামূর্তি।

রঘুরাম দ্রুত সরে যায় থামের আড়ালে।

ছায়ামূর্তি অন্ধকার অলিন্দ পথে দ্রুত মিলিয়ে যেতেই আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে রামনারায়ণের সেনাপতি বচন সিং-এর হাভেলিতে গিয়ে হাজির হয় রঘুরাম। করাঘাত করে দরজায়। ঘুম জড়ানো চোখে বিছানা ছেড়ে উঠে এসে রঘুরামকে দেখে চমকে ওঠে বচন সিং। চিন্তিত মুখে শুধোলেন, 'কী হয়েছে রঘুরাম?'

মাথা ঝুঁকিয়ে সেলাম জানিয়ে রঘুরাম বলে, 'হুজুর, বাত বহুত জরুরি।'

৫০

গত পাঁচ সালের আদায়-উশুলের হিসেব-খতেন পেশ করতে বলেছেন নবাব মিরজাফর খাঁ। পাটনার দেওয়ানখানাজুড়ে জোর হুড়োহুড়ি ও ব্যস্ততা। আমিন-কানুনগোসহ দেওয়ানখানার অন্য সব কর্মচারীদের নাওয়াখাওয়ার সময় নেই। জাবেদা খাতার পাতায় পাতায় হিসেবের গরমিলে গোঁজামিল দিতে গিয়ে তারা জেরবার। রামনারায়ণের অনুগত দেওয়ানখানার এই কর্মচারীরাও মনিবের মদতে এতকাল বেআইনি রোজগারে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। নবাবের কাছে সব যে ফাঁস হয়ে যাওয়ার উপক্রম! ত্রস্ত কর্মচারীরা নিজেদের ত্রুটি আড়াল করতে মরিয়া।

এতকাল নামে-বেনামে পাটনার দেওয়ানখানা থেকে প্রচুর টাকা সরিয়েছেন রামনারায়ণ। তিনি অবশ্য একে কোনও অপরাধ বলে মনে করেন না। যে টাকা নিজামতের প্রাপ্য ছিল, সে টাকার একটা অংশ ঢুকেছে তাঁর জেবের ভিতরে। তাঁর পূর্বসূরীরাও এই একই তরিকায় প্রচুর দৌলতের মালিক হয়েছিল। কিন্তু রামনারায়ণের সমস্যা হল তিনি এখন নবাবের চোখের বালি। তাঁর সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতিকেই এখন পর্বতপ্রমাণ অপরাধ বলে দেখবেন নবাব। তাঁর সুনজরে থাকলে সাতখুন মাপ। নিজামত এই কায়দাতেই চলে।

কয়েকমাস আগে নবাব যখন টাকাকড়ির হিসেবপত্র চেয়ে তাঁকে মুর্শিদাবাদে তলব করেছিলেন, তখন 'তবিয়ত আচ্ছা নেই' বলে নবাবের হুকুমত এড়িয়েছিলেন রামনারায়ণ। একদা সিরাজদ্দৌলার অনুগত রামনারায়ণের আন্দেশা ছিল, নয়া জমানায় নবাব বা ক্লাইভ কেউই তাঁকে রেয়াত করবেন না। মুর্শিদাবাদে পা দিলেই তিনি গ্রেফতার হবেন। তারপর হয় জিন্দানখানায় পচে মরতে হবে, নয়তো সিরাজদ্দৌলার মতোই কোনও ঘাতকের হাতে অচানকই দেহান্ত হবে তাঁর।

রামনারায়ণের উমিদ ছিল নসিবের চাকা ঘুরবে। মিরজাফর খাঁ মসনদে বসতে না বসতে অন্তর্কলহ শুরু হয়েছে নিজামতের অন্দরে। দেওয়ান ও নবাবের সম্পর্কে চিড় ধরেছে। মুর্শিদাবাদ থেকে ভেসে আসছে এসব কথা। রাজনীতির হাওয়া কখন কোন দিকে কী ভাবে ঘুরবে কেউ জানে না। কিছুদিন পরে অচানকই তিনি যেন আলোর রেখা দেখতে পেলেন। ক্লাইভের সঙ্গে মন কষাকষি শুরু হয়েছে নবাবের। নিজামতের উপরে নিজের নিয়ন্ত্রণ জোরদার করতে তাগদবাজ হিন্দুদের কাছে টানছেন ক্লাইভ। এই কূটনীতির আঁচ পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন রামনারায়ণ। মাথার উপরে ক্লাইভের হাত থাকায় নবাবের রোষ থেকে রক্ষা পেলেন মেদিনীপুরের ফৌজদার রাজারাম, বাঁচলেন রায়দুর্লভ। অতএব তাঁরও আশা আছে। ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্কটা মজবুত করতে পারলেই হল।

জাঁ ল-য়ের খোঁজে পাটনায় এলেন আয়ারকুট। চতুর রামনারায়ণ সেই ওয়াক্তে উপহার ও পেশকাশে আয়ারকুটকে বশ করে ফেললেন। আয়ারকুট নিজেও অনুধাবন করলেন বাস্তবচিত্র। অহেতুক রামনারায়ণকে তং করলে কোম্পানিরই ক্ষতি। ফিরে গিয়ে একথা তিনি বোঝালেন ক্লাইভকে। মুনশি নবকৃষ্ণও ওই একই কথা বললেন। আয়ারকুট ও নবকৃষ্ণের প্রভাবে রামনারায়ণ সম্বন্ধে ক্লাইভের ধারণা বদলে গেল। কর্নেল ক্লাইভ তার পক্ষে—গোবিন্দমল্ল মারফত এ কথা জেনে খুশিতে ভেসেছিলেন রামনারায়ণ। নসিবের চাকা ঘুরছে। রাখে হরি মারে কে।

এ পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। হাওয়া বইছিল রামনারায়ণের অনুকূলেই। কিন্তু পাটনা দুর্গে এসে খাজনার খতেন চেয়ে বসে সহসা সবকিছু ওলটপালট করে দিলেন মিরজাফর খাঁ। হিসেব দাখিল করতে গেলেই সাবুত মিলবে—রামনারায়ণ দুর্বৃত্ত। নিজামতের টাকা তছরুপ করেছেন। তারপর? ক্লাইভ যদি মুখ ফিরিয়ে নেন, তাহলে?

আতঙ্কে তাই ঘুম উড়েছে রামনারায়ণের। আপাতত কী করে নবাবের কাছে হিসেব দাখিল করা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়, তার একটা উপায় খুঁজে বের করতে তিনি মরিয়া।

'বলছেন কী? হিসেব পেশ করার হুকুম করেছেন নবাব?' প্রশ্ন করলেন রায়দুর্লভ।

'জি হুজুর। আপনি সুবে বাংলার দেওয়ান। সমঝদার আদমি। বুঝতে পারছেন সবই। নবাব চোরির ইলজাম আনতে চাইছেন আমার উপরে।' বিরস মুখে গুজারেশ করলেন রামনারায়ণ।

অবাক হয়ে খানিকটা স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে অস্ফুট স্বরে রায়দুর্লভ বলে উঠলেন, 'আজিব বাত।'

কথাটা ঠিক মতো শুনতে পেলেন না রামনারায়ণ। 'জি হুজুর?'

'আপনার বিষয়ে নবাবের সঙ্গে কর্নেলের বাতচিতের সময় আমি হাজির ছিলাম। এমন তো কোনও কথা হয়নি। ক্লাইভ সাহেব তো সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন পাটনার কুরসিতে আপনিই বহাল থাকবেন। কোনও কিসিমে আপনাকে তং করা চলবে না।'

‘ইয়ে তো বহুত খুশনসিব কি বাত। লেকিন নবাব তা মানছেন কোথায়?’

রায়দুর্লভ বললেন, ‘আমি ভাবছি নবাবের ইতনা হিম্মত কী করে হল?’

‘আমিও তো ভেবে কুল পাচ্ছি না হুজুর।’

নবাবের রিস্তেদার ও খানদানের লোকজন, বাইজি, কসবি এরা গোটা পাটনার দুর্গটা প্রায় দখল করে নিয়েছেন। এই হট্টগোল থেকে দূরে থাকতে দুর্গ থেকে কিছুটা দূরে গঙ্গার তীরে এক হাভেলিতে উঠেছেন সুবে বাংলার দেওয়ান রায়দুর্লভ। ঘরের মধ্যে আগেনাগারে পুড়ছে অভ্রের পাত। দেওয়ালগিরিতে পুড়ছে মোমবাতি। রায়দুর্লভের কপালে ভাঁজ। তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন। তাঁর সামনে হাতজোড় করে বসে প্রায় বলির পাঁঠার মতো কাঁপছেন রামনারায়ণ—পাটনার দোর্দণ্ডপ্রতাপ নায়েব সুবাদার।

সহসা মুখ তুলে রায়দুর্লভ বললেন, ‘উপায় একটাই আছে। নবাব আপনাকে ছোবল মারতে চাইছেন, বাঁচতে হলে ওঝাকেই ইয়াদ করতে হবে।’

রায়দুর্লভের কথার ইঙ্গিতটা ধরতে না পেরে হাঁ করে চেয়ে রইলেন রামনারায়ণ।

‘ক্লাইভ সাহেবকে তুরন্ত জানাতে হবে সব কথা। তিনিই ভরসা।’

‘জানি হুজুর। তবুও যে বল পাচ্ছি না মনে। আগর ক্লাইভ সাহেবের বাত নবাব না মানেন তো?’ চিন্তিত গলায় বললেন রামনারায়ণ।

মুচকি হেসে রায়দুর্লভ বললেন, ‘বুড়ঢা গর্ধভ মনিবের অবাধ্য হবে বলছেন?’

‘তাই তো দেখছি হুজুর। মির্জা শামসুদ্দিনের জবান ঝুটা বলে সাবুত করতে চাইছেন নবাব।’

‘ক্লাইভ সাহেবের সঙ্গে গোপনে একবার দেখা করতে পারবেন আপনি?’

‘ইয়ে বড়ি মুশকিল কি বাত। নবাবের কাসিদরা আমার উপরে কড়া নজর রেখেছে। অনেক কসরত করে তাদের নজর এড়িয়ে আপনার হাভেলিতে এসেছি।’

‘বেশ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমিই সব কিছু জানাচ্ছি কর্নেলকে।’

‘বহুত বহুত সুক্রিয়া হুজুর। আপনার সঙ্গে বাতচিত করে অনেকটা ভরসা পেলাম।’

রাত গভীর। চারিদিক নিস্তব্ধ। জবরদস্ত ঠান্ডায় কালো আলোয়ানে মাথা মুড়ে যেন ঘুমিয়ে রয়েছে চরাচর। রায়দুর্লভের হাভেলি থেকে বেরিয়ে এলেন রামনারায়ণ। মাথা থেকে হাঁটু পর্যন্ত আলোয়ানে মোড়া। অন্ধকারে প্রায় মিশে গিয়েছেন। হঠাৎই তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কাছেই ঝোপের মধ্যে নড়াচড়ার শব্দ। পিছু নিল কি কেউ? অচানকই ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তার সামনে দিয়ে ছুটে গেল বনবেড়াল জাতীয় কোনও জন্তু। নিশ্চিন্ত হলেন রামনারায়ণ। না কোনও গুপ্তঘাতক নয়। পা চালিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি দুর্গের হাতায় এসে পড়লেন।

গঙ্গার তীরভূমি বরাবর মেঠো পথ। পথের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে বুনো ঝোপ। মাঝে মাঝেই পথের পাশে মাথা উঁচু করে রয়েছে বড় বড় ঝাঁকড়া গাছপালা। পাটনা দুর্গের পিছন দিকে জঙ্গলাকীর্ণ এই অংশে লোকজন বড় একটা আসে না। এই এলাকাটা দিনের বেলাতেও ছায়াবৃত থাকে। রামনারায়ণের হাভেলি থেকে বেরিয়ে এই পথ ধরে বেশ কিছু দূর গিয়ে দুর্গের প্রাকারের একটা ভাঙা অংশের মধ্যে দিয়ে গলে দুর্গ থেকে বেরিয়ে সরাসরি গঙ্গার তীরে গিয়ে পড়া যায়। এই পথেই ভোজপুরী পাহারাদারের জালসাজিশে রায়দুর্লভের হাভেলিতে গিয়েছিলেন রামনারায়ণ। জংলা পথে জানোয়ারের ভয় আছে। রামনারায়ণের হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা রয়েছে বাঁশের একটা মজবুত লাঠি। তিনি হেঁটে চলেন সন্তর্পণে। আশেপাশের কোনও গাছ থেকে ডেকে উঠল একটা রাতচরা পাখি। বড় মনহুশ আওয়াজ। চমকে উঠলেন রামনারায়ণ। ঠিক তখনই বুনো ঝোপ ভেদ করে অতর্কিতে তাঁর উপরে ঝাপিয়ে পড়ল এক আততায়ী।

আচমকা এই হামলায় বেসামাল হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন রামনারায়ণ। হাতের লাঠিটা ছিটকে গেল। লোকটা দারুণ বলশালী। লোকটা নিমেষে রামনারায়ণের বুকের উপরে চড়ে বসে লোহার মতো শক্ত দু'হাতে তাঁর গলা টিপে ধরল। দম আটকে আসছে রামনারায়ণের। নিজের দু'হাত দিয়ে প্রাণপণে গলার ফাঁস আলগা করার কোশিস করতে লাগলেন।

তারপরেই দ্বিগুণ চমক। হঠাৎই রামনারায়ণের গলার ফাঁস আলগা হয়ে গেল। অস্ফুট আর্তনাদ করে সেই বলশালী লোকটা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। খুবই দ্রুততার সঙ্গে ঘটে গেল সব কিছু। একেবারে চোখের নিমেষে। উঠে বসে হাঁপাতে লাগলেন রামনারায়ণ।

তড়িৎগতিতে মশাল হাতে ছুটে এল দুটো লোক। বচন সিং ও রঘুরাম।

এখনও আতঙ্কমুক্ত হতে পারেননি রামনারায়ণ। ত্রস্ত গলায় শুধোলেন 'ক- কে?'

'আমি বচন সিং।'

বিস্ফারিত চোখে নিজের বিশ্বস্ত দুই কর্মচারীকে ইয়াদদস্ত করলেন রামনারায়ণ।

বচন সিং শুধোল, 'আপনি সালামত আছেন তো হুজুর।'

'তোমরা? এখানে?'

'আপনাকে খতম করতে এসেছিল এই আদমি।'

'কে?' বচন সিং-এর মুখপানে চেয়ে শুধোলেন রামনারায়ণ।

'এক গদ্দার। আপনার খুবই পরিচিত। ভালো করে চেয়ে দেখুন।'

রঘুরামের হাত ধরে কোনওরকমে উঠে দাঁড়ালেন রামনারায়ণ। আতঙ্কে এখনও হাত-পা কাঁপছে। অদূরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে আততায়ী। নিথর, নিস্পন্দ। তার পিঠে গেঁথে আছে একটা বর্শা। মুখটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। মাটি ভিজে উঠেছে রক্তে। সে রক্তের দাগ রামনারায়ণের পরনের কাপড়েও লেগেছে।

রামনারায়ণ ফের শুধোলেন, 'কে এ? কৌন হ্যায়?'

তীব্র নফরতির সঙ্গে লাশটাকে পা দিয়ে চিৎ করে দিল বচন সিং।

আঁতকে উঠলেন রামনারায়ণ, 'ল-ছ-ম-ন!'

'জি হুজুর। আপনার খাস গোলাম।' বলল বচন সিং।

রঘুরাম বলল, 'মিরকাজিমের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল বেইমান লছমন।'

'বলছ কী? বেসাহারা এই ছোকরাকে ভালোবেসে গোলামের নোকরি দিয়েছিলাম!'

বচন সিং বলে, 'নিমকহারাম। খরিশের বাচ্চা। মিরকাজিম ও লছমনের গোপন আঁতাতের কথা জেনে ফেলেছিল রঘুরাম। আমাকে এসে জানায়। সেই থেকে আপনার উপরে কড়া নজর রেখেছিলাম আমরা। পাহারাদারের জালসাজিশে আপনাকে দুর্গ থেকে বেরোতে দেখে আপনার পিছু নিই। আপনি রায়দুর্লভজির হাভেলিতে গিয়েছিলেন, সব জানি।'

বচন সিং ও রঘুরামকে বুকে জড়িয়ে ধরে রামনারায়ণ বললেন, 'কী ইনাম চাও বলো।'

'ইনাম চাই না হুজুর। আপনাকে সালামত রাখতে পেরেছি। এতেই খুশি।' বলল বচন সিং।

নিজের দুই কর্মচারীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় তার চোখদুটো জলে ভরে উঠল।

বচন সিং বলল, 'এখন এই লাশটা নিয়ে কী করা যায়?'

রামনারায়ণ হুকুম করলেন, 'গঙ্গায় ছুড়ে ফেলে দাও।'

হুকুম তামিল করল বচন সিং ও রঘুরাম। তারপর দুজনকে সঙ্গে নিয়ে নিজের হাভেলিতে এসে ঢুকলেন রামনারায়ণ। যদিও সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতকে প্রত্যক্ষ করেছেন ক্ষণেক পূর্বে, তবুও তার মনে হতে লাগল লছমন একটা মস্ত উপকার করে গিয়েছে। রামনারায়ণের ধূর্ত মস্তিষ্কে ঝিলিক দিচ্ছে দারুণ একটা মতলব। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে বচন সিং ও রঘুরাম। রামনারায়ণ গম্ভীর গলায় বললেন, 'শোনো, নায়েব সুবাদারকে খতম

করতে চেয়েছিল কেউ—কাল এই খবর চাউর করে দিতে হবে গোটা দুর্গে। লেকিন লছমনের বিষয়ে কেউ যেন কিছু জানতে না পারে।'

বচন সিং ও রঘুরাম অবাক চোখে তাকায় রামনারায়ণের দিকে।

রামনারায়ণ বলেন, 'লছমন তার মনিবকে খতম করতে চেয়েছিল শুনলে লোকে বলবে এটা পাটনা দুর্গের অন্দরের কাজিয়া। মূল সাজিশি যে মিরকাজিমের তা মনে হবে না কারও। কেননা কোনও সাবুত নেই। লছমন মৃত। তার জবান থেকেও কিছু আর জানার উপায় নেই।'

বচন সিং মাথা নেড়ে বলে, 'ইয়ে সহি বাত।'

'খবরটা ছড়িয়ে দিতে হবে এই তরিকায়– কোনও এক আততায়ী নায়েব সুবাদারের কক্ষে ঢুকে ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁকে খতম করার কোশিশ করেছিল। গোলমালের আওয়াজ পেয়ে গোলাম-বাঁদিরা ছুটে আসে। আততায়ী পালিয়ে যায়। অন্ধকারে কোথাও লুকিয়ে পড়ে। তাকে চিনতে পারেনি কেউই। এই সংবাদ চাউর হলে সকলের সন্দেহ গিয়ে পড়বে নবাবের শিবিরের উপরে। এতে লাভ হবে আমার। আর হ্যাঁ। আরেকটা কথাও সকলকে জানিয়ে দেওয়া চাই, নায়েব সুবাদার জখম হয়েছেন, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছেন না।'

বচন সিং অবাক হয়ে বলে, 'লেকিন হুজুর আপনি তো—'

মুচকি হেসে রামনারায়ণ বললেন, 'বিলকুল চাঙ্গা আছি। যা বললাম, তাই করো।'

নায়েব সুবাদারকে সেলাম জানিয়ে বিদায় নিল বচন সিং ও রঘুরাম।

হাভেলির গোলাম-বাঁদিদের ডেকে তাদের হাতে রুপেয়া গুঁজে দিয়ে তাঁর বিষয়ে কী বলতে হবে তা বলে দিলেন রামনারায়ণ।

এরপর গৃহবৈদ্যকে ডেকে নিজের বুক ও কাঁধ অঞ্চলে সুচারুভাবে কাপড়ের পট্টি জড়িয়ে নিলেন। যাতে মনে হয় তিনি ছুরিকাঘাতে জখম হয়েছেন। এই অজুহাতে আপাতত হিসেব দাখিলের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে।

পরের দিন রামনারায়ণের পরিকল্পনামাফিক ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। হুলুস্থুল পড়ে গেল গোটা দুর্গে। তাজ্জব বনে গেলেন মিরজাফর খাঁ। এ খবর সত্যি না মিথ্যে তার যাচইমতেহানি করতে গিয়ে ধন্দে পড়ে গেলেন নবাব। রামনারায়ণ অতিশয় ধূর্ত লোক। হিসেব দাখিলের কাজটা এড়াতে এ কোনও কৌশল নয় তো? এ কথাও যেমন ভাবছেন নবাব, তেমনই অন্যদিকে ভাবছেন খবরটা যদি সত্যি হয় তাহলে তাঁর অজ্ঞাতে কে করল এই কাজ? এর জিম্মেদারি এই ওয়াক্তে তাঁর ঘাড়েই এসে পড়বে। তাঁর সঙ্গে রামনারায়ণের আদাওতির কথা সকলেই জানে। ক্লাইভের এসব শুনলে কী ভাববেন?

দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লেন নবাব। ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য গোবিন্দমল্লকে পাঠালেন রামনারায়ণের হাভেলিতে।

রামনারায়ণের সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করলেন গোবিন্দমল্ল। তাঁকে খুলে বললেন সব কথা। সেই সঙ্গে পেশকাশ হিসেবে তাঁর হাতে ধরিয়ে দিলেন মোহরের খেরিয়া। গায়ে জড়ানো মোটা আলোয়ানের আড়ালে নিমেষে তা চালান করে দিলেন গোবিন্দমল্ল।

রামনারায়ণ বললেন, 'যেমন বললাম, কথাটা সে ভাবেই নবাবের কানে তুলবেন।'

'ভাববেন না হুজুর। বান্দা পেশকাশের ইজ্জত রাখতে জানে।'

কিছুক্ষণ পর নবাবের কক্ষে এসে সেলাম জানালেন গোবিন্দমল্ল।

নবাব উৎকণ্ঠার সঙ্গে শুধোলেন, 'কী বুঝলে? ঘটনাটা সত্যি না রামনারায়ণের কৌশল?'

'রামনারায়ণজির উপরে হামলা হয়েছিল। উনি সচমুচ ঘায়েল হয়েছেন।'

তবুও মিরজাফরের মনের সংশয় দূর হয় না। 'ভালো করে পুছতাছ করে দেখেছ?'

'জি হুজুর। এই বান্দা আপনাকে কখনও ঝুট বলেনি।'

বিস্মিত গলায় মিরজাফর শুধোলেন, 'কে করলে এই কাজ?'

ক্ষণেকের জন্য মাথা নিচু করে নীরব থাকেন গোবিন্দমল্ল। তারপর মুখ তুলে বললেন, 'বান্দার গোস্তাকি মাফ করবেন হুজুর। আমার মনে হয়, জনাব মিরকাজিমকে ডেকে পুছতাছ করলেই আপনার প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবেন।'

'সাবুত আছে?'

'না হুজুর। আমার আন্দাজ।' এই বলে বিদায় নিলেন গোবিন্দমল্ল।

ফরসির নলে ঘনঘন টান দিতে লাগলেন মিরজাফর। তাঁরও মনে হয়েছিল এই ঘটনা যদি সত্যি হয়, তাহলে এ কাজ মিরকাজিম ছাড়া আর কারও হতে পারে না। হঠাৎই তার সহোদরের প্রতি প্রবল আক্রোশে ফুঁসতে লাগলেন মিরজাফর। কেবলই তাঁর মনে হতে লাগল, তাঁর রক্তের সম্পর্কের রিস্তেদারেরা সকলেই এক একটি আহাম্মক। এঁরা তাঁর কোনও উপকার করতে পারেন না কেবল তাকে মুসিবতের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে পারেন। পাটনার দেওয়ানখানায় টাকা তছরুপের কথা তিনি জানেন। হিসেব দাখিল করতে বলে রামনারায়ণকে বেকায়দায় ফেলেছিলেন। সাবুত মিলত। ক্লাইভকে বোঝাতে পারতেন রামনারায়ণ ডাকাইত, বেইমান। এই সুযোগ হাতছাড়া হতে বসেছে মিরকাজিমের বেওকুফিতে। সহসা যেন নবাব অনুভব করলেন, পাটনার নায়েব সুবেদারি তো দূরের কথা, সামান্য ফৌজদারের দায়িত্ব সামলানোর মতো আক্কেল জ্ঞান নেই তার সহোদরের। মিরকাজিম নাদান, নালায়েক।

ক্ষিপ্ত হয়ে তখনই মিরকাজিমকে তলব করলেন নবাব। কড়া যাচ ইমতেহানির মুখে পড়ে মিরকাজিম কবুল করলেন যে রামনারায়ণকে খতম করার পরিকল্পনা তাঁরই ছিল।

'বেওকুফ কাঁহিকা।' চাপা গলায় গর্জন করে উঠলেন নবাব।

শির ঝুঁকিয়ে মিরকজিম বললেন, 'মনে হয়েছিল ক্লাইভ সাহেব নারাজ থাকায় পাটনার নায়েব সুবাদারের কুরসিতে আমাকে বসাতে পারবেন না আপনি, তাই মরিয়া হয়ে–'

তাচ্ছিল্যের সুরে নবাব বললেন, 'বাহাদুর ইনসান!'

অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন মিরকাজিম।

'খুদ নিজে খতম করতে গিয়েছিলে রামনারায়ণকে?' ঝাঁঝালো গলায় প্রশ্ন করেন নবাব।

'না।'

'তবে?'

'রামনারায়ণজির খাস গোলাম লছমনকে টাকা দিয়ে বশ করেছিলাম। লছমনই—'

চকিতে এক কৌশল ঝিলিক দেয় মিরজাফরের মাথায়। আরও পেশকাশ দিয়ে লছমনকে বশীভূত করে তার জবানে যদি বলানো যায়, সে নায়েব সুবাদারকে খতম করতে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু এটা পাটনা দুর্গের অন্দরের কাজিয়া। এর সঙ্গে নবাব বা তাঁর রিস্তেদারদের কোনও যোগ নেই। তাহলে এই ওয়াক্তে বড় উপকার হয় তাঁর। প্রবল আগ্রহের সঙ্গে মিরজাফর প্রশ্ন করেন, 'কোথায় লছমন?'

'আজিব বাত। লছমন বেপাত্তা। কোনও খোঁজ নেই তার।' বললেন মিরকাজিম।

সহসা ঝড়ের গতিতে ঘরে প্রবেশ করে গোবিন্দমল্ল বললেন, 'লছমনের খোঁজ মিলেছে হুজুর। তাঁর লাশটা ভাসছে গঙ্গায়।'

চমকে উঠলেন মিরকাজিম। মিরজাফরের মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল।

গোবিন্দমল্ল ফের গুজারেশ করলেন, 'চিঠি আছে হুজুর। ক্লাইভ সাহেব পাঠিয়েছেন।'
চিঠিটা দ্রুত গোবিন্দমল্লের হাত থেকে নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরলেন নবাব।

৫১

ক্লাইভ লিখেছেন, '...শুনলাম আপনি গত পাঁচ সালের শালিয়ানা আদায়-উশুলের হিসেব দাখিল করবার হুকুম করেছেন রামনারায়ণের উপরে। আপনার মনসুবা আমি আন্দাজ করতে পারছি। আপনি রামনারায়ণের বরবাদিই চাইছেন। অবশ্য রাজমহল থেকে পাটনা আসার পথে আপনি কথা দিয়েছিলেন যে বিহারের কুরসিতে রামনারায়ণই বহাল থাকবেন। এখন দেখছি আপনার মত বদলে গিয়েছে। এ নিয়ে অবশ্য আমার কিছু বলার নেই। আপনি সুবে বাংলার নবাব। নিজামতের প্রশাসনে কী অদল-বদল ঘটবে তা আপনিই ঠিক করবেন। দেশের ভালো-মন্দের দায় আপনার, প্রজাদের সহি-সালামত রাখার জিম্মেদারও আপনি। আপনার খুশখেয়ালের এতেরাজ করা আমার আরমান নয়, আপনাদের ঘরোয়া কাজিয়ায় জড়িয়ে পড়ার ইরাদাও আমার নেই। তবে বড়ি আফশোস কি বাত হল এই যে, রামনারায়ণের বিষয়ে আপনার মতবদল আমাকে ঝুটা বলে সাবুত করেছে। রামনারায়ণের বরবাদিই যখন আপনার আরজু, তখন সে কথা আপনি আমাকে স্পষ্ট করে বলেননি কেন?...'

এই অবধি পড়ে থমকালেন মিরজাফর। মুখ তুলে মিরকাজিম ও গোবিন্দমল্লের মুখের দিকে চকিতে একবার চাইলেন। তারপরে ফের মনোনিবেশ করলেন চিঠিতে। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে পড়ে চললেন বাকি চিঠিটা।

'...পাটনার কুরসির জন্য আপনার ভাই মিরকাজিমের চেয়ে রামনারায়ণ অনেক চোস্ত ও চৌখস আদমি। রাজমহলে বসে এ কথা আপনাকে স্পষ্টই জানিয়েছিলাম। আমি শুধু আমার একিনের কথা বলেছিলাম। আপনার উপরে জবরানে কোনও কিছু আরোপ করতে চাইনি। সেই অধিকারও আমার নেই। কোন পদে, কাকে আপনি বহাল করবেন, এ বিষয়ে শোচবুঝ করার হকদার আপনিই। রামনারায়ণকে পাটনার কুরসিতে বহাল রাখার প্রস্তাব আপনি মেনে নিয়েছেন দেখে তাঁকে একটা চিঠি লিখেছিলাম আমি। সেই চিঠির খসড়া আমি আপনাকে দেখিয়ে মঞ্জুর করিয়েও নিয়েছিলাম। আমি লিখেছিলাম—মুসিবতের আন্দেশায় ভেঙে পড়বেন না। পাটনার কুরসিতে আপনিই বহাল থাকবেন। আপনার উপরে নবাবের কোনও আখেজ বা আদাওতি নেই। চিঠির এই বয়ান নিশ্চয়ই ইয়াদ আছে আপনার।'

এই অবধি পড়ে মিরজাফরের মনের মধ্যে সব কিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। পঙ্খের কারুকাজ করা ছাতের দিকে মুখ তুলে চোখ বন্ধ করে ক্ষণিকের জন্য ভাবলেন, কিন্তু ক্লাইভ খসড়া লিখে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন, এমন কোনও চিঠির কথা মনে পড়ল না। যাই হোক, চিঠিটা এখনও শেষ হয়নি। ফের চিঠিতে মন দিলেন মিরজাফর।

'...এখন আপনি যদি মত বদলে আমাকে ঝুটা আদমি বলে সাবুত করতে চান, সেটা নবাবি রিয়াসতের এক তরিকা হতে পারে, কিন্তু আমি মনে করি এ এক শরাফত ইনসানের বেইজ্জতি। আমি পাটনায় আসতে চাইনি। আপনিই জোর করে পাটনায় ডেকে এনে আমাকে বেইজ্জত করলেন। যাই হোক, ফৌজ নিয়ে দ্রুত কলকাতায় ফিরে যেতে হবে আমাকে। অবিলম্বে আমার একবার মাদ্রাজে যাওয়া প্রয়োজন। ওখান থেকে বার বার তলব আসছে। আগামী দু-তিন দিনের মধ্যেই আমি কলকাতার পথে রওনা হব। আপনি সহি-সালামত, খুশ তবিয়ত থাকবেন। তবে একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখি, নিজের ফৌজকে হুঁশিয়ার রাখবেন। যতদূর

খবর আমার কানে এসেছে তাতে মনে হচ্ছে খুব শিগগিরই শিবভট্ট ও সুজাউদ্দৌলা একযোগে সুবে বাংলা আক্রমণ করবেন।...'

মাথা ঘুরতে লাগল মিরজাফরের। গলা শুকিয়ে কাঠ। চিঠির বয়ানে খুবই স্পষ্ট ভয়ানক ক্ষুব্ধ হয়েছেন ক্লাইভ। কিন্তু ক্লাইভ যে চিঠির খসড়া তাকে দিয়ে মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছিলেন বলে লিখেছেন, তা কিছুতেই কেন মনে করতে পারছেন না তিনি। সত্যিই কি এরকম কোনও চিঠির খসড়া ক্লাইভ দেখিয়েছিলেন তাঁকে?

ব্যস্ত হয়ে খাস মুনশিকে তখনই তলব করলেন মিরজাফর।

'হালে কর্নেল ক্লাইভ কোনও চিঠির খসড়া পাঠিয়েছিলেন আমাকে?' শুধোলেন নবাব।

মাথা ঝুকিয়ে খাস মুনশি জানাল, 'জি হুজুর।'

'চিঠির খসড়া পাঠিয়েছিলেন?' পরম বিস্ময়ের সঙ্গে ফের শুধোলেন নবাব।

'আপনি দেখেছেন। মঞ্জুরও করেছেন। খসড়ার উপরে আপনার দস্তখত রয়েছে।'

ধন্দে পড়ে যান মিরজাফর। 'আমি দস্তখত করেছি? ইয়াদ নেই কেন?'

'জি হুজুর। আপনার দস্তখত করা ওই চিঠির নকল মহাফেজখানায় আছে।'

নবাব স্মৃতি হাতড়াতে থাকেন।

অস্বস্তিতে পড়ে মহাফেজখানা থেকে চিঠির নকল আনতে ছোটে খাস মুনশি।

গোবিন্দমল্ল বললেন, 'মুনশি ঠিকই বলছে। ক্লাইভ সাহেবের পাঠানো চিঠির খসড়ায় আপনি দস্তখত করার সময় আমি হাজির ছিলাম আপনার সম্মুখে।'

'দেখেছিলে চিঠিটা? কী ছিল চিঠির বিষয়? ইয়াদ আছে?'

'বিলকুল ইয়াদ আছে হুজুর। মুসিবতের আন্দেশায় বেচ্যায়েন হয়ে ওঠা রামনারায়ণজিকে ক্লাইভ সাহেব লিখেছিলেন যে পাটনার কুরসিতে তিনিই বহাল থাকবেন।'

'আমি মঞ্জুর করেছিলাম ওই বয়ান?'

গোবিন্দমল্ল মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন, 'জি হুজুর।'

এতক্ষণ নবাবের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এই আলাপ আলোচনা শুনছিলেন মিরকাজিম। সহসা তার মনে হল তাকে ধোঁকা দিয়েছেন নবাব। পাটনার কুরসিতে বসাবেন বলে এতকাল তাকে বুঝ দিয়ে গিয়েছেন। এখন সব ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। রাগে কাঁপতে লাগলেন মিরকাজিম। দরবারি সহবতের তোয়াক্কা না করেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আপনি নোটঙ্কি করছেন বড়ে ভাইয়া। দু-দিন আগে চিঠিতে কী লিখেছেন তা ইয়াদ নেই আপনার?'

মিরকাজিমের কথার ভঙ্গিতে শিউরে উঠলেন গোবিন্দমল্ল। এ যে ভয়ানক বেতমিজি। কেউ কখনও এ ভাবে নবাবের সঙ্গে কথা বলে না। তিনি নবাবের রিস্তেদার হোন বা অন্য যেই হোন।

নবাব নিজেও স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। প্রবল বিরক্তির সঙ্গে চাইলেন সহোদরের মুখপানে।

নবাবের প্রতিক্রিয়ার তোয়াক্কা না করে ফের গর্জন করে উঠলেন মিরকাজিম, 'আপনি ধোঁকা দিয়েছেন আমাকে। পাটনা অভিযান এক ধোঁকাবাজি। আপনি কর্নেল ক্লাইভের হাতের পুতুল।'

'খামোশ। বেওকুফ কাঁহিকা।' ঘর কাপিয়ে চিৎকার করে উঠলেন মিরজাফর খাঁ। নবাবের গলা থেকে এমন জোরালো আওয়াজ অনেকদিন কেউ শোনেনি। কেঁপে উঠলেন গোবিন্দমল্ল। ছুটে এল অন্দরমহলের গোলাম-দাখিলারা।

নবাবের অনুমতির তোয়াক্কা না করে দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেলেন মিরকাজিম।

রাগে লাল হয়ে উঠেছে মিরজাফরের মুখটা। থরথর করে তিনি কাঁপছেন। হাতের ইশারায় গোলাম-দাখিলাদের চলে যেতে বললেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন গোবিন্দমল্ল।

রাগে ফুঁসছেন মিরজাফর খাঁ। কিন্তু এ রাগ অক্ষমের। শুধু ফোঁসফোঁসানি আছে, বিষ নেই। তাঁর মনের এই আগুন অন্য কাউকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে না। শুধু পোড়ায় তাঁর নিজেরই কলিজা। নবাবি রিয়াসতে সরাসরি নবাবের উপরে কোনও ইলজাম আনা এক ঘোর বেতমিজি। এর একমাত্র সাজা হল মওতের নিদান। লেকিন মিরকাজিমের বিরুদ্ধে কোনও কড়া কদম ওঠানোর হিম্মত নবাবের নেই। তিনি আজ হীনবল।

হতাশায় ডুবতে থাকেন মিরজাফর খাঁ। তিনি নবাব হিসেবে নাজুক, নালায়েক—এই অপ্রিয় সত্যটা মেনে নিতে হচ্ছে। তাঁকে মাড়িয়ে যাচ্ছে সবাই, যেভাবে নরম ঘাস মাড়িয়ে যায় সকলে। তাঁর বুকের উপর পা দিয়ে রয়েছে ইংরেজ। তাঁকে অবজ্ঞা করছেন রায়দুর্লভ, রামনারায়ণ এমনকি সামান্য ফৌজদার রাজারাম। এদের কাউকেই সবক শেখানোর হিম্মত তাঁর নেই। কারণ ক্লাইভ। এ তো গেল ঘরের বাইরের কিসসা। কিন্তু ঘরের অন্দরে? যাদের সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্পর্ক, তারা আজকাল উঠতে বসতে ইলজাম আনে নবাবের উপরে। তাদের শিকায়ত– নবাবের রিস্তেদার হলেও এই নয়া জমানায় সে ভাবে প্রতিষ্ঠা পাননি তারা। মুর্শিদকুলি থেকে আলিবর্দি সকলেই নিজের রিস্তেদারদের নিজামতের শাসন কাঠামোয় উঁচু উঁচু পদ দিয়েছিলেন। কিন্তু নিজের পুত্র মিরন ছাড়া আর কার জন্য কী করেছেন মিরজাফর খাঁ?

মুখ বুজে এ-সব অভিযোগ সহ্য করেন মিরজাফর আর মনের মধ্যে গুমরে গুমরে মরেন। কী করে তিনি বোঝাবেন সকলকে যে নিজামতের শাসনযন্ত্রের পুরো রাশ তাঁর হাতে নেই। তিনি ইংরেজদের অগ্রাহ্য করে চলতে পারবেন না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও টোপিওয়ালাদের চাপে অনেক কিছুই তাঁকে মেনে নিতে হয়।

মাঝে মাঝে মাথার উষ্ণীষটা বড্ড ভারী বলে বোধ হয় নবাবের। মাথা টলমল করে। উষ্ণীষটা ছুড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে। কখনও কখনও মনে হয়, মসনদ ছেড়ে কোনও অজানা অচেনা এক দেহাতে পালিয়ে গিয়ে আজনবি এক আদমির মতো দিন গুজরান করতে পারলে হয়তো তিনি শান্তি পেতেন। কিন্তু বাস্তবে তা হয়ে ওঠে না। তাঁর অন্তর থেকে দুসরা মিরজাফর খাঁ বলে ওঠেন, 'হলেই না হয় পুতুল নবাব, তবুও তো নবাব। ভোগ-বিলাসের কথাটা একবার ভেবে দেখো। আর যাই হোক, কর্নেল ক্লাইভ তো তোমার ভোগের তাগদ কেড়ে নেয়নি। মসনদ ছেড়ে, কসবি-বাইজি-খুবসুরতিদের ছেড়ে, দৌলতের মোহ ছেড়ে ফকিরের মতো দিন গুজরান করতে পারবে তুমি?

না! পারবেন না মিরজাফর। ভোগের লালচ তাঁর মরেনি। আর এই মসনদ এক আজিব চিজ। মানুষকে আষ্টেপৃষ্টে আঁকড়ে ধরে। কেউ জোর করে টেনে নামিয়ে না দিলে নিজের ইচ্ছেয় মসনদ ছেড়ে যাওয়া যায় না।

হতাশা, হীনমন্যতা, গ্লানি আজকাল কুরে কুরে খায় মিরজাফরের অন্তঃস্থলকে। তবুও নেশা জমাট বাঁধলে জেগে ওঠে অহংবোধ। তকাব্বুরি - তিনি নবাব, সুবে বাংলার নবাব। ক্ষণেকের জন্য ফিরে আসে খুনজোশি। দোলা লাগে রক্তে। অকারণ এক ভালোলাগার অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হন মূর্খ মিরজাফর। নেশা ছুটলেই ফের হতাশার দরিয়ায় ডুবতে থাকেন।

বিক্ষিপ্ত মনকে শান্ত করতে ফরসির নলটা টেনে নিয়ে ঘন ঘন তাতে টান দিতে থাকেন নবাব। চিঠির খসড়া হাতে নিয়ে খাস মুনশি কক্ষে প্রবেশ করে সেলাম জানায়।

মুনশির হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে দ্রুত তাতে চোখ বুলিয়ে ফের একবার স্তম্ভিত হন মিরজাফর খাঁ। সত্যিই তিনি দস্তখত করেছেন খসড়ার নীচে। কী করে মঞ্জুর করলেন এই বয়ান?

খাস মুনশি ও গোবিন্দমল্ল চোখ চাওয়াচাওয়ি করে নীরবে হাসেন। এ কারসাজি তাদের। রামনারায়ণের কড়ি দুজনের জেবের ভিতরেই খানিকটা করে ঢুকেছে। আজকাল সুবহসাম নেশার ঘোরে বুঁদ হয়ে থাকেন নবাব। কখন কার উপরে কী হুকুম করেন নিজেরই খেয়াল থাকে না। এই সুযোগটাকেই কাজে লাগিয়েছিলেন খাস মুনশি ও গোবিন্দমল্ল।

মূল পরিকল্পনাটা অবশ্য গোবিন্দমল্লের। ক্লাইভের পাঠানো চিঠির নাম করে তারা নবাবকে পড়ে শুনিয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক বয়ান। মূল খসড়ার সঙ্গে তার কোনও মিলই ছিল না। নেশার ঘোরে ঝিম মেরে থাকা মিরজাফর কানে শুনে চিঠির বয়ানে আপত্তিকর কিছু খুঁজে পাননি। ঢুলু ঢুলু চোখ দুটোকে কোনওরকমে টেনে খুলে খাস মুনশির বাড়িয়ে দেওয়া কাগজে দস্তখত করে দিয়েছিলেন। নবাবকে শোনানো হয়েছিল এক বয়ান, সই করার জন্য এগিয়ে দেওয়া হয়েছিল অন্য একটা কাগজ।

সেদিনও চোখচাওয়াচাওয়ি করে মুখ টিপে হেসেছিলেন গোবিন্দমল্ল ও খাস মুনশি।

কাগজটা মুনশির হাতে ফিরিয়ে দিয়ে সচকিত হয়ে বসেন নবাব। এই কড়া শীতেও নবাবের কপালে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ছুটে গিয়েছে আফিমের নেশা। ভয়ানক রুষ্ট হয়েছেন ক্লাইভ। তাঁকে তুষ্ট করা দরকার। সত্যিই যদি এই ওয়াক্তে তিনি তার ফৌজ নিয়ে কলকাতায় ফিরে যান, আর শিবভট্ট ও সুজাউদ্দৌলা যদি একযোগে বাংলায় হানা দেন তাহলে?

এই মানসিক চাপ আর সইতে পারলেন না নবাব। খাস মুনশির উদ্দেশে হুকুম করলেন, 'দাওয়াত পাঠাতে হবে ক্লাইভকে। জলদি কাগজ নিয়ে এসো। চিঠির মুসাবিদা করতে হবে।'

নবাবের চিঠি নিয়ে ক্লাইভের কাছে হাজির হলেন চতুর গোবিন্দমল্ল। এঁর মনের হদিশ রাখেন না মিরজাফর। এখনও তিনি মনে করেন গোবিন্দমল্ল হলেন তাঁর অতি বিশ্বস্ত একজন কর্মচারী।

চিঠিটায় চোখ বুলিয়ে মুচকি হাসলেন ক্লাইভ। হাসির রেশ মুখে ধরে রেখেই শুধোলেন, 'অচানক এখানে দরবারের আনজাম কেন?'

'জানি না। তবে আমার আন্দাজ কোনও শুভ খবর আছে। আপনি যা চেয়েছিলেন তাই হবে।'

ক্লাইভ বললেন, 'সে তো আমার খুশনসিবি। নবাবকে জানাবেন, আমি হাজির থাকব।'

বিদায় নিলেন গোবিন্দমল্ল।

গঙ্গার চরের উপরে নিজের তাঁবুর সামনে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে আয়েস করছিলেন ক্লাইভ। শীতের দুপুরের রোদ তেরছা ভাবে এসে পড়েছে তার গায়ের উপরে। ক্যাম্পের ঘড়িয়াল ঘণ্টা পিটিয়ে জানাল, দুপুর তিনটে। আড়মোড়া ভাঙলেন ক্লাইভ। কোটের পকেট থেকে পাইপটা বের করে ঠোঁটে গুঁজলেন। চকমকি পাথরের খোঁজে পকেট হাতড়াচ্ছেন, এমন সময় তাঁবুর অন্দর থেকে হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন নবকৃষ্ণ।

ঠোঁটে গোঁজা পাইপ। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন ক্লাইভ।

তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে আসতে নবকৃষ্ণ বললেন, 'ঘরে ফেলে এসেছিলেন।'

চকমকি পাথরদুটো নব মুনশির হাত থেকে নিয়ে ক্লাইভ বললেন, 'তুমি যে ভাবে আমার সব দরকারি জিনিসের খেয়াল রাখো, সেভাবে আর কেউ খেয়াল রাখতে পারে না মুনশি।'

এই প্রশংসায় বিগলিত হয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে নবকৃষ্ণ বিনয়ের সঙ্গে বলেন, 'আমি হুজুরের ওফাদার। দাসানুদাস। আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উপর নজর রাখাই তো আমার কাজ।'

'বোসো মুনশি।' মুচকি হেসে বলেন ক্লাইভ।

ক্লাইভের ইজিচেয়ারের অদূরে রাখা একটা চৌপাইয়ের উপরে বসলেন নবকৃষ্ণ।

'গোবিন্দমল্লের সঙ্গে দেখা হয়েছে?' ক্লাইভ প্রশ্ন করেন।

'জি হুজুর।'

'কাল দরবার বসবে কেল্লায়। শুনেছ?'

'জি হুজুর। দরবারে হাজির থাকার জন্য আপনাকে তো এত্তেলা পাঠিয়েছেন নবাব।'

'কেন বলো তো?'

'কেন আবার? মনিবকে ঢুঁসো মারতে গিয়ে মদ্দা গর্ধভটি নিজেই চিৎপাৎ হয়ে পড়ে ভাবছে মহা বেতমিজি হয়ে গিয়েছে।' এই বলে নবকৃষ্ণ ফিক করে হাসেন। তারপর বলেন, এক চিঠিতেই নবাবের আত্মারাম খাঁচাছাড়া।'

'মতলব?' কথাটা বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করেন ক্লাইভ।

'হার্ট ইজ আউট অফ দ্য চেষ্ট।'

হেসে উঠে ক্লাইভ বলেন, 'লেকিন এর ক্রেডিট তো পুরো তোমার।'

জিভ কেটে নবকৃষ্ণ বলেন, 'এ কী কথা বলছেন হুজুর। আমার যে গর্দান যাবে।'

ক্লাইভ বলেন, 'ক্রেডিট তোমার নয়? চিঠিটা মুসাবিদা করেছিলে তুমি। আমি এক লাইনও ডিকটেট করিনি। শুধু ড্রাফটটা অ্যাপ্রুভ করেছিলাম।'

'প্যাঁচ দিয়ে এমন চিঠি লেখার কৌশল আপনার কাছ থেকেই তো শিখেছি হুজুর।'

'নোকরি তো অনেকেই করে লেকিন কাজ শেখে ক'জন?' এই বলে ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন ক্লাইভ। 'চলো মুনশি। একটু হাঁটাহাঁটি করে আসি।'

নদীর চর বরাবর হাঁটতে থাকেন ক্লাইভ সঙ্গে নবকৃষ্ণ।

রুপোলি বালির গায়ে রঙিন বুটিদার নকশা। সুনসান প্রকাণ্ড চরখানা জুড়ে রাজত্ব করে বেড়াচ্ছিল হরেক কিসিমের পরিযায়ী পাখি। তাদের এই নিশ্চিন্ত বিচরণের আনন্দে বাধ সাধল ক্লাইভ ও নবকৃষ্ণের পদসঞ্চার। মানুষের পায়ের আওয়াজ পেয়ে উড়ে পালাল পাখির দল। রঙিন চরটা সহসা বেরং হয়ে গেল।

ক্লাইভকে স্বাগত জানানোর জন্য নবাব স্বয়ং হাজির দুর্গের সদর দেউড়িতে। দেউড়ি থেকে বহুদূর পর্যন্ত বিছানো হয়েছে লাল গালিচা। এই পথে আসবেন ক্লাইভ। দেউড়ির দুপাশে পরপর রাখা রয়েছে তিনটি করে ছয়টি তোপ। তোপের নলগুলো চেয়ে রয়েছে আকাশের দিকে। ক্লাইভকে স্বাগত জানাতে শূন্যে তোপ দাগার জন্য প্রস্তুত গোলন্দাজেরা।

হঠাৎই আওয়াজ উঠল পথের ধারে জমায়েত মানুষের মধ্যে থেকে। দূরে দেখা যাচ্ছে আকাশে উড্ডীন ইউনিয়ন জ্যাক। হাতির পিঠে চেপে আসছেন ক্লাইভ। তাঁর পিছনে ছোটোখাটো একটা ফৌজ। তুমুল হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ল আমআদমি। কান খাড়া করে শুনলেন মিরজাফর। এরা ক্লাইভের নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে। কী আশ্চর্য! অবাক চোখে মিরজাফর দেখলেন ক্লাইভ নামের জাদুতে মোহিত হয়েছে পাটনাবাসীও। নবাব যেদিন পাটনা দুর্গে এসে ঢুকেছিলেন, সেদিনও হর্ষধ্বনি দিয়েছিল মানুষ। তবে এভাবে উল্লাসে ফেটে পড়েনি। সহসা মনের মধ্যে খানিকটা ঈর্ষা বোধ করলেন মিরজাফর খাঁ। কী রহস্য লুকিয়ে আছে ক্লাইভের ব্যক্তিত্বে? কী কলকাতা, কী মুর্শিদাবাদ, কী পাটনা, যেখানেই তাঁর পদসঞ্চার হোক না কেন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয় অগণিত মানুষ। ক্লাইভের পাশে অন্য কারও অস্তিত্ব একেবারে ম্লান হয়ে যায় কেন?

আসলে সহজ একটা সত্য অনুধাবন করতে পারছেন না নবাব, তা হল—আমআদমি তাগদের বশ। বাহুবল যার বেশি, আমজনতা তার দিকেই ঝোঁকে। শুধু পদের গরিমায় মানুষকে বুঝ দেওয়া যায় না। দেশের হালহকিকত দেখে তারা নিজেরাই বুঝে নেয় তাগদের চাবিকাঠি কার হাতে।

কর্নেল ক্লাইভকে খোশ আমদেদ করে দরবার ঘরে নিয়ে গেলেন নবাব। সদর দেউড়ি থেকে দরবার ঘর পর্যন্ত কালো পাথর বাঁধানো পথের উপর বিছানো নরম লাল গালিচা। সে পথের দু'ধারের সরু ইটে গাঁথা দেওয়াল সাজানো হয়েছে হরেক কিসিমের রংদার সুগন্ধি ফুল ও দেওদার পাতায়। ফুলের সুগন্ধে ম ম করছে চারিদিক। গুলাবের পাপড়ি বোঝাই রুপোর রেকাবি হাতে দাঁড়িয়ে আছে বাঁদিরা। হেঁটে চলেছেন ক্লাইভ। তাঁর দেহের উপরে খুশবুদার গুলাবের পাপড়ি ছুড়ে দিচ্ছে বাঁদির দল। গুলাবের রং, গালিচার রং মিলেমিশে একাকার।

ক্লাইভের পাশে পাশে হাঁটছেন নবাব। মুখে লেগে আছে মৃদু প্রসন্ন হাসি। নহবতখানার সানাইবাদক আবহে খুশির আমেজ অকাতরে বিলিয়ে দিতে নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছে। যে খাতিরদারি ক্লাইভের জন্য দেখাচ্ছেন মিরজাফর খাঁ, তা নজিরবিহীন। অতীতে সুবে বাংলার কোনও নবাবও পাটনায় এসে এমন খাতির পাননি।

তবুও ভয়ানক গম্ভীর ক্লাইভ। মুখে এক ফোঁটা হাসি নেই। গায়ে পড়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ জমানোর কোশিশ করছেন নবাব। খোশামুদে কথার প্রত্যুত্তরে কথা প্রায় বলছেনই না ক্লাইভ। তিনি জানেন কী করে প্রতিপক্ষের উপরে মানসিক চাপ তৈরি করতে হয়। ক্লাইভের গোমড়া, গম্ভীর মুখ দেখে সত্যিই চাপ বাড়ছে মিরজাফরের মনের উপরে। এখনও কি কর্নেল গোসা করে রয়েছেন? নবাব বিচলিত। মুখে লেগে থাকা মৃদু হাসির রেশ ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে।

দরবার কক্ষে প্রবেশ করলেন ক্লাইভ। তাঁকে দেখেই কুরসি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন অতিথি, অভ্যাগতরা। বিহার মুলুকের অনেক জমিদারই আজ উপস্থিত। কুরসিতে বসে চারিদিকে চোখ চালিয়ে ক্লাইভ খুঁজলেন রামনারায়ণকে। তাঁর বিষয়ে গোবিন্দমল্লের মুখ থেকে শুনেছেন সব কথা।

খানিকবাদে বচন সিং ও রঘুরামের কাঁধে ভর দিয়ে দরবার ঘরে প্রবেশ করলেন রামনারায়ণ। বুক ও কাঁধে এখনও বাঁধা রয়েছে কাপড়ের পট্টি। রামনারায়ণের অঙ্গসজ্জা ও অভিনয় একেবারে নিখুঁত। হাঁটতে যেন খুবই কষ্ট হচ্ছে এমন একটা ভাব করে এগিয়ে এসে নবাবকে তসলিম জানালেন তিনি। তারপর সেলাম জানালেন ক্লাইভকে।

ক্লাইভও নাটুকেপনায় কম যান না। ভারী অবাক হওয়ার মতো মুখ করে শুধোলেন, 'কী হয়েছে? তকলিফ কীসের?'

মুচকি হেসে রামনারায়ণ বললেন, 'কিছু নয় হুজুর, সামান্য চোট লেগেছে।'

মিরকাজিমের হাতে আক্রান্ত হওয়ার অপ্রিয় প্রসঙ্গটা ক্লাইভের সামনে উত্থাপন করলেন না রামনারায়ণ। এতে নবাব যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

ধীরে ধীরে হেঁটে গিয়ে নিজের জায়গায় বসলেন রামনারায়ণ।

দরবার শুরু হল। মিরজাফর খাঁ ঘোষণা করলেন, 'পাটনার নায়েব সুবাদার ছিলেন রামনারায়ণজি, নয়া জমানায় ওই পদেই উনি বহাল থাকবেন।'

হর্ষধ্বনি দিয়ে নবাবের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাল সকলে। আড়চোখে ক্লাইভকে জরিপ করলেন মিরজাফর। হাততালি দিচ্ছেন কর্নেল। তিনি খুশি। চাপমুক্ত হলেন নবাব।

কুরসি ছেড়ে উঠে রঘুরাম ও বচন সিং-এর কাঁধে ভর দিয়ে হেঁটে এসে ফের নবাবের মুখোমুখি দাঁড়ালেন রামনারায়ণ। তসলিম জানিয়ে রত্ন-বোঝাই একটি পেটিকা নবাবের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'হুজুরের নজরানা।'

কথাটা যেন ব্যঙ্গের মতো শোনাল মিরজাফরের কানে। রামনারায়ণের দিকে চেয়ে মুহূর্তের জন্য প্রবল আক্রোশে তাঁর চোখদুটো ধক করে একবার জ্বলে উঠল। যা তিনি মোটেই চাননি তাই করতে হল ক্লাইভের খায়েশে। প্রতিহিংসার আগুন এখনও জ্বলছে মিরজাফরের বুকের মধ্যে। রামনারায়ণকে বরবাদ করতে না

পারলে এত খরচ করে পাটনায় ছুটে আসা নিরর্থক। দরবারি সহবতের খাতিরে মুখে সৌজন্যের হাসি ফুটিয়ে তুললেন মিরজাফর খাঁ। মনে মনে বললেন, 'ক্লাইভ সাহেব তুরন্ত রওনা হবেন কলকাতার পথে। তারপর ফির বোঝা পড়া হবে আপনার সঙ্গে।'

এক দাখিলা রুপোর রেকাবিতে করে খেলাত নিয়ে এল। রামনারায়ণকে নায়েব সুবেদারের খেলাত পরিয়ে দিলেন মিরজাফর খাঁ।

নীরবে হাসছে ক্লাইভের দুই চোখ। গভীর কৃতজ্ঞতায় তার উদ্দেশে মাথা ঝোঁকালেন রামনারায়ণ। তারপর দুই সঙ্গীর কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে ফের নিজের আসনে গিয়ে বসলেন।

নবাব ঘোষণা করলেন, 'এই ওয়াক্ত থেকে পাটনার ডেপুটি সুবাদার পদে আমি বহাল করছি নবাবজাদা মিরনকে। মুর্শিদাবাদ ছেড়ে পাটনায় এসে শাসনকার্য সরাসরি দেখভাল করা তার পক্ষে মুশকিল। তাঁর হয়ে এই প্রদেশ দেখভালের জিম্মেদারি সামলাবেন রামনারায়ণ।'

এই ঘোষণা শুনে রামনারায়ণের মনের খুশি অনেকটাই গায়েব হয়ে গেল। নড়েচড়ে বসলেন ক্লাইভ। রামনারায়ণ বুঝলেন, মিরনের গুপ্তচরদের কড়া নজরদারির মধ্যে রাজ্যপাট চালাতে হবে। নবাব তাঁকে কঠিন এক আজমায়েশের মধ্যে ফেলে দিলেন।

ক্লাইভ যেন একচোট ধোঁকা খেয়ে গেলেন। মিরজাফরের এই চালটা তিনি আন্দাজ করতে পারেননি। সুকৌশলে ফি-সাল বিহারের শালিয়ানার বড় একটা অংশ মুঠোবন্দি করার সুন্দর বন্দোবস্ত করে ফেললেন নবাব। অন্তত একবারের জন্য হলেও মনে মনে নবাবের বুদ্ধির তারিফ করতে বাধ্য হলেন ক্লাইভ এবং এও বুঝলেন যে রামনারায়ণ এখনও নিরাপদ নন।

এবারে দ্বিতীয় প্রসঙ্গে এলেন মিরজাফর খাঁ। ক্লাইভকে দরবারি খেলাত প্রদান করে ঘোষণা করলেন, 'কোম্পানির ফৌজ সুবে বাংলায় যে ভাবে শান্তি বজায় রেখেছে, তা তারিফ করার মতো। তোফা হিসেবে ছাপরার সোরার একচেটিয়া অধিকার কোম্পানির হাতে তুলে দিলাম আমি।'

নবাবের এই ঘোষণা শুনে হাসি চওড়া হল, ক্লাইভ, ওয়াটস, লাশিংটন, ওয়ালশ সকলেরই।

ধূর্ত রবার্ট ক্লাইভ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সুবে বাংলার নবাবের সঙ্গে কোম্পানির উলফত মোবারক হোক। ইংরেজ এক ইমানদার জাত। তারা শুধু তোফা নিতে জানে না, তোফা দিতেও জানে। যদিও নবাব আমাদের জন্য যা করলেন, তার জন্য কোনও সওগাতই কাফি নয়, তবু এই ওয়াক্তে আমি ঘোষণা করতে চাই যে, হর সাল বিশ হাজার মন সোরা নবাব বাহাদুরকে আমি মুফতে দেব।'

এ যে আশমানে মেঘ না জমতেই তেজ বারিষের উম্মিদ। খুশিতে উদ্ভাসিত হল মিরজাফরের মুখ। এ তার কাছে অভাবনীয় প্রস্তাব। কয়েকদিন আগে ওয়াটসের মুখ থেকে ছাপরার সোরার উপরে ক্লাইভের একচেটিয়া দাবির কথা শুনে তিনি খুবই দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন। বর্তমানে ছাপরার সোরার একচেটিয়া কারবারের অধিকারী খোজা ওয়াজিদকে চাপ দিয়ে বছরে বেশ মোটা অঙ্কের একটা টাকা উপায় করে থাকেন নবাব। কিন্তু ক্লাইভের কাছ থেকে তিনি উপরি আদায় করবেন কী করে? চাইবেনই বা কোন মুখে? এই সমস্যার সমাধান করে দিলেন কর্নেল নিজেই।

মিরজাফরের মনে হল, আল্লা বহুত মেহেরবান। ইংরেজদের কোনও ওজর-আপত্তি ছাড়াই মিরনকে বিহারের ডেপুটি সুবাদারের পদে বহাল করে এই প্রদেশের উপরে তাঁর আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলেন। ছাপরার সোরার একচেটিয়া অধিকার ক্লাইভের হাতে তুলে দিয়ে তিনি হাসি ফোটালেন ক্লাইভের গোমড়া মুখে। সেই সঙ্গে হর সাল মুফতে বিশ হাজার মন সোরা। এখানেই শেষ নয়, সেদিন আরও খুশি অপেক্ষা করে ছিল নবাবের জন্য।

এর পরে যা ঘটল তা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। এর আগাম আভাস পাননি নবাব। পায়নি ইংরেজরাও। দরবার যখন প্রায় শেষের পথে তখন অচানকই জগৎশেঠের দিল্লি কুঠির জনৈক কর্মচারী রওশনলাল নাটকীয়

ভাবে দরবার ঘরে প্রবেশ করল। তার গন্তব্য ছিল মুর্শিদাবাদ। কিন্তু নবাব বর্তমানে পাটনা দুর্গে অবস্থান করছেন জেনে সে এখানে এসে হাজির হয়েছে।

'সেলাম হুজুর।' তসলিম জানায় রওশনলাল।

লোকটিকে কেমন যেন চেনা চেনা ঠেকে মিরজাফরের।

'আমি রওশনলাল।'

'জগৎশেঠজির দিল্লি কুঠির নোকর। তাই তো?'

'জি হুজুর।'

'কী পয়গাম?' প্রশ্ন করেন নবাব।

'আমি দিল্লি থেকে হুজুরের জন্য এক খুশখবর নিয়ে এসেছি। মোগল বাদশার পরোয়ানা।'

উত্তেজিত হয়ে পড়লেন মিরজাফর। উৎকর্ণ হয় সকলে।

'মোগল বাদশা আপনার নামে বাংলা-বিহার-ওড়িশার সুবেদারির পরোয়ানা জারি করেছেন।'

বেহেস্তের কওসর যেন অচানকই মাটিতে নেমে এসে নবাবকে খুশিতে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

গোটানো একখানা কাগজ নবাবের দিকে এগিয়ে দিল রওশনলাল। তার হাত থেকে পরোয়ানাটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরলেন মিরজাফর খাঁ। কাঁপছে তার হাত। হাসছে মুখচোখ। রওশনলাল যা বলছে তা সত্যি। নীচে রয়েছে বাদশার শিলমোহর। শুধু তাই নয়, নবাবকে একটা খেতাবও দিয়েছেন মোগল বাদশা। 'সুজা-উল্-মুলক্ হুসেনউদ্দৌলা মীর মুহম্মদ জাফর আলি খাঁ মহাবতজঙ্গ বাহাদুর'।

দরবারি সহবতের তোয়াক্কা না করে কুরসি ছেড়ে উঠে এসে রওশনলালকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন নবাব। বহু মূল্যবান মোতির একটা মালা পরিয়ে দিলেন তার গলায়।

হর্ষধ্বনিতে প্রায় ফেটে পড়ল দরবার ঘর।

সুবে বাংলার নবাব, নিজামত—এখনও মোগল প্রশাসনের অঙ্গ। মোগল বাদশার অনুমোদন ছাড়া মসনদের উপর কারও অধিকার বৈধ হয় না। ইংরেজদের হাত ধরে মসনদে বসেই দিল্লিতে দরবার করেছিলেন মিরজাফর খাঁ– তাঁর নামে সুবেদারির পরোয়ানা জারি করা হোক। এতদিনে মিরজাফরের সেই আরজু মঞ্জুর হল।

যদিও মোগল শাসকদের সে প্রতাপ আর নেই। নখদন্তহীন হয়ে পড়েছেন দিল্লির বাদশা। লোলচর্ম, জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ সিংহের মতো শক্তিহীন। বাদশার অনেক ফরমায়েশ, ফরমানকে আজ কেউ আমল দেয় না। তাঁর অনেক হুকুমই তামিল হয় না আজকাল। তবুও বাদশা বাদশাই। এখনও তাঁর নামে শাসনকার্য চলে হিন্দুস্তানে।

উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ছেন মিরজাফর খাঁ। বাদশার পরোয়ানা মুহূর্তের মধ্যেই বদলে দিয়েছে অনেক কিছু। রামনারায়ণের অনুগামী পাটনা মুলুকের যে জমিদারেরা এতকাল তাঁকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখেছে আজ সহসা যেন তাদের দেহের অভিব্যক্তি বদলে গিয়েছে। কুরসি ছেড়ে উঠে একে একে তারা এগিয়ে এসে নবাবকে তসলিম জানিয়ে যাচ্ছে। পেশ করছে মোটা নজরানা।

স্বস্তি ক্লাইভের চোখেমুখেও। মুর্শিদাবাদে নবাব বদলানোর অন্যায় খেলায় তিনি মদত দিয়েছিলেন সিরাজের উপরে ক্ষুব্ধ ওমরাহ-বেনিয়ান-মুৎসুদ্দিদের। সেই অবৈধ কাজের উপরে বৈধতার প্রলেপ লাগিয়ে দিলেন মোগল বাদশা। ইংরেজদের দিকে এখন কেউ আঙুল তুললে তারা এবারে বুক চিতিয়ে বলতে পারবে—'আমাদের কসুর কী? খামোখা ইলজাম ওঠাচ্ছ কেন আমাদের উপরে? সিরাজদ্দৌলাকে হটিয়ে আমরা মিরজাফরকে মসনদে বসাতে মদত দিয়েছি ঠিক কথা, কিন্তু তোমাদের দেশের বাদশাই তো মসনদের উপরে মিরজাফরের অধিকারকে বৈধ বলে শিলমোহর দিয়েছেন। হিন্দুস্তানে মোগল বাদশাই শেষ কথা। তাই নয় কি?'

উঠে দাঁড়িয়ে নবাবকে কুর্নিশ জানালেন ক্লাইভ।

ফের একবার মিরজাফরের গোটা শরীর জুড়ে উপচে পড়ল খুশি।

চমকের আরও কিছু বাকি ছিল।

কোমরবন্ধনী থেকে আর একটা গোটানো কাগজ বের করে রওশনলাল বলল, ‘পলাশিতে কুদরতির জন্য সাবিৎ জঙ্গ কর্নেল রবার্ট ক্লাইভকে ‘নওশেরউদ্দৌলা’ খেতাব দিয়েছেন দিল্লির বাদশা। শাহি হুকুমত আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।’

তোবা। তোবা। আরও একবার হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ল গোটা দরবার।

আর্কটের নবাব খেতাব দিয়েছিলেন সাবিৎ জঙ্গ—যুদ্ধে অপরাজেয়। আর দিল্লির বাদশা খেতাব দিলেন নওশেরউদ্দৌলা অর্থাৎ বীরপ্রবর। সপ্রসংশ দৃষ্টিতে ক্লাইভের দিকে চাইলেন মিরজাফর খাঁ।

ক্লাইভের মুখে লেগে আছে কৌশলী হাসি। পলাশিতে কুদরতির জন্য হিন্দুস্থানের বাদশার দেওয়া খেতাব ইংরেজদের অন্যায় কাজকে মান্যতা দেওয়ার পথে আরো জোরদার সাবুত। এই ভেবে তিনি উৎফুল্ল। তবে সবচেয়ে বড় কথা হল বাদশার দেওয়া খেতাব স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, ইংরেজদের সমীহ করছে তামাম হিন্দুস্তান।

দরবার ভাঙল। সপারিষদে বিদায় নিলেন ক্লাইভ।

উৎসবের আনন্দে মেতে উঠল গোটা পাটনা দুর্গ। রাতারাতি আলোকমালায় সেজে উঠল কেল্লা। রাতের অন্ধকার বিদীর্ণ করে আকাশের গায়ে ফুটে উঠল দুর্গের বুরুজ, প্রাকারের অবয়ব। আতশবাজির জলুসে হারিয়ে গেল নক্ষত্ররাজি। ফিকে হল রাতের আকাশের কালি। দুর্গ থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে আমআদমিকে মিঠাই বিলোতে লাগলেন রামনারায়ণ।

আনন্দ, ফূর্তি ও হইহুল্লোড়ের আবেশে কেটে গেল বেশ কয়েকটা দিন। হঠাৎই যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে মিরজাফর অনুভব করলেন, ক্লাইভের কলকাতায় ফেরার কোনও তাড়া নেই। পাটনায় বসে দিব্যি সোরার কারবারের দেখভাল করে চলেছেন তিনি। নৌকো বোঝাই হয়ে মন মন সোরা প্রতিদিনই চালান যাচ্ছে কলকাতায়।

নবাব ভেবেছিলেন ক্লাইভ কলকাতার পথে রওনা হলেই রামনারায়ণের সঙ্গে কড়া বোঝাপড়া সেরে নেবেন। যে মনসুবা নিয়ে পাটনায় আসা তা পূর্ণ করে তবে ফিরবেন মুর্শিদাবাদে। সবক শেখাবেন রামনারায়ণকে। কিন্তু সেই ফুরসত পাচ্ছেন কোথায়? ক্লাইভের মনসুবা কী তার আন্দাজ পাওয়ার জন্য গুপ্তচর গোবিন্দমল্লকে তিনি পাঠালেন ইংরেজ ছাউনিতে।

ফিরে এসে গোবিন্দমল্ল জানালেন, ‘ক্লাইভ সাহেবের এখনই কলকাতায় ফেরার কোনও তাগিদ নেই হুজুর। আমার আন্দাজ আপনি মুর্শিদাবাদ রওনা না হলে উনি পাটনা ছেড়ে নড়বেন না।’

‘কেন বলো তো?’ মিরজাফরের গলায় ধরা পড়ে শঙ্কার সুর।

গোবিন্দমল্ল বললেন, ‘লাগতা হ্যায়, আপনার ইরাদা কী, ক্লাইভ সাহেব আন্দাজ করেছেন।’

মিরজাফর প্রশ্ন করেন, ‘ইরাদা?’

‘আপনি তো রামনারায়ণজির বরবাদি চান।’

আঁধার নামল মিরজাফরের মুখে।

গোবিন্দমল্ল ফের বললেন, ‘লাগতা হ্যায় কর্নেল বিলকুল আন্দাজ করেছেন, উনি পাটনা ছেড়ে কলকাতার পথে রওনা হলেই আপনি রামনারায়ণকে খতম করবেন। তাই তিনি নজর রাখছেন আপনার উপরে। আপনি মুর্শিদাবাদের পথে রওনা না হলে উনি এখান থেকে তাঁবু গোটাবেন না।’

ফরসির নল হাতে। চোখ বুজে অম্বুরি তামাকের ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন নবাব।

'আমার মনে হয় এই ওয়াক্তে আপনার মুর্শিদাবাদে ওয়াপস যাওয়াই ভালো।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গোবিন্দমল্লের মুখপানে চাইলেন নবাব।

গোবিন্দমল্ল অকপটে বললেন, 'যতদিন ক্লাইভ ফৌজ নিয়ে পাটনায় বসে থাকবেন ততদিন ইংরেজ ফৌজের টাকা গুনতে হবে আপনাকে। হর মাস লাখ টাকা। কড়ার তো এমনই।'

হতাশার সঙ্গে মাথা নেড়ে গোবিন্দমল্লের কথায় সম্মতি জানালেন মিরজাফর।

'এই খরচ আনেওয়ালা দিনে আরও বাড়বে হুজুর।'

'কেন?' সহসা যেন চমকে উঠলেন নবাব।

'তাগদবাজ ভোজপুরী জোয়ানদের ফৌজে ভরতি করছেন ক্লাইভ সাহেব।'

'শুনেছি।'

'তায়দাদ এখন কত হয়েছে জানেন?'

'কত?'

'করিব এক হাজার।'

ধোঁয়া ছাড়তে গিয়ে বিষম খেলেন নবাব। সামলে নিয়ে বললেন, 'বলছ কী? এ-ক-হা-জা-র?'

'জি হুজুর। ক্লাইভ সাহেব এখন তালিম দিয়ে তাদের গড়েপিটে নেওয়ার কাজে ব্যস্ত। এই সেপাইদের খরচও তো আপনাকেই মেটাতে হবে।'

মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল মিরজাফরের। এই আর্থিক ধাক্কার কথাটা তিনি তেমন আমল দিয়ে ভেবে দেখেননি। অগত্যা পাটনা থেকে তাঁবু গুটিয়ে মুর্শিদাবাদে ফেরা মনস্থ করলেন নবাব।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন রামনারায়ণ।

স্বস্তি পেলেন ক্লাইভ। পাটনার কাজ শেষ। শুধু নবাবের উপর নজর রাখার জন্য এখানে বসে থাকা। এই ওয়াক্তে রামনারায়ণের মুসিবত চান না কর্নেল। সেটা সুবে বাংলার নিরাপত্তার খাতিরেই। মূর্খ নবাব এই কথাটা বুঝতে চাইছেন না। রামনারায়ণকে খতম করার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর। তিনি পাটনায় থাকতে সে হিম্মত নবাবের হবে না, একথা ক্লাইভ জানেন। ওদিকে দক্ষিণ থেকে একের পর এক খারাপ খবর আসছে। এবার হয়তো তাঁকে মাদ্রাজের উদ্দেশে রওনা হতেই হবে। প্রস্তুতির জন্য কলকাতায় ফেরাটা খুব জরুরি।

সৌজন্যের খাতিরে নবাবের সঙ্গেই ফিরে চলল ইংরেজবাহিনী। কিন্তু পথে অন্য এক সমস্যায় পড়লেন ক্লাইভ। নবাবের বিশাল বাহিনী চলে এমনিতেই ধীর গতিতে। তার উপরে মাঝে মধ্যেই থেমে পড়ে নবাব কখনও ভাসছেন আশরতে, কখনও মেতে উঠছেন শিকার খেলায়, কখনও বা আসরফি ছড়াচ্ছেন মুজরোর আসরে। অহেতুক বরবাদ হচ্ছে মূল্যবান সময়।

বিরক্ত হয়ে নবাবকে ছেড়ে কলকাতার উদ্দেশে দ্রুত মার্চ করতে শুরু করলেন ক্লাইভ।

৫৩

অনেক সময় দাবানলের চেয়েও দ্রুত গতিতে গুজব ছড়ায়। কোনও ঘটনা লোকের মুখে বিকৃত হতে হতে যখন দূরবর্তী কোনও জায়গায় গিয়ে যখন পৌঁছয় তখন তার অঙ্গ থেকে সত্যির আবরণটাই খসে পড়ে। প্রচারিত হয় ঝুটা কহানি। সত্য-মিথ্যা, সম্ভব-অসম্ভব হিসেব-নিকেশের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে মানুষ। বিকৃত সংবাদই মান্যতা পায় সাধারণ লোকের মুখে মুখে। অসত্য কাহিনিকে কেন্দ্র করে তপ্ত হয়ে ওঠে চারিদিক। সুযোগ বুঝে লুঠেরা-বদমাশের দল তৎপর হয়। খামোখা মুসিবতের মধ্য পড়ে আমআদমি। এমনই এক কাণ্ড ঘটে গেল মুর্শিদাবাদে।

একদিন সকালে অচানকই ত্রস্ত হয়ে পড়ল ব্যস্ত চকবাজার। ঝুপঝাপ করে ঝাঁপ ফেলতে লাগল দোকানিরা। একের পর এক দোকানে লুঠপাট চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দিতে লাগল লুঠেরা, দাঙ্গাবাজেরা। রায়দুর্লভের ঘনিষ্ঠ বলে যারা পরিচিত, তাদের ঘর থেকে টেনে বের করে প্রকাশ্য রাজপথে কোতল করতে লাগল মিরনের অনুচরেরা। এসব ঘটল মিরনের প্রত্যক্ষ মদতে। সাধারণ মানুষ প্রবল ত্রাসে অস্থাবর সম্পত্তি ফেলে রেখে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে পালাতে লাগল। শয়তানদের কামনার বলি হল অনেক জেনানা, আওরাত। সুবে বাংলার রাজধানী ফের অশান্ত হল। কিন্তু কেন?

পাটনা থেকে উড়ে এসেছে এক খারাপ খবর। রামনারায়ণের চক্রান্তে নিহত হয়েছেন নবাব মিরজাফর খাঁ। রামনারায়ণের অনুগত টিকারির রাজা সুন্দর সিং গভীর রাতে নবাব মিরজাফর খাঁর কক্ষে ঢুকে তরবারির আঘাতে তাঁকে খুন করেছেন। এ কাজে মদত দিয়েছেন রায়দুর্লভ।

একেবারে উলটপুরাণ। মিরকাজিমের চক্রান্তে আক্রান্ত হয়েছিলেন রামনারায়ণ— সেই খবরটাই লোকের মুখে মুখে বদলে গিয়ে এই চেহারা নিয়েছে।

খবরের সত্য-মিথ্যা ভালো করে যাচাই না করে রাগে ও আতঙ্কে অস্থির হয়ে পড়ল মিরন। দুর্বলচিত্ত নবাবজাদা প্রবল ত্রাসে খবরটা ছড়িয়ে দিল রাজধানীতে। আর নিজের তাগদের সাবুত দাখিল করতে গিয়ে নিজের অনুচরদের উসকে দিয়ে গোটা রাজধানীকে অশান্ত করে তুলল। হাহাকার করে উঠল পীড়িত মানুষ। তাদের করুণ আর্তনাদে গুমোট হল বাতাস।

ওদিকে জাফরাগঞ্জ প্যালেসের চারিদিকে সেনা মোতায়েন করে, ঘরের অন্দরে বসে ভয়ে কাঁপতে লাগল মিরন। সত্যি সত্যিই ফের ইনকিলাব ঘটে গেল। কী আছে তার নসিবে?

ভুল ভাঙল কয়েকদিন পর। মিরনের হাতে এসে পৌঁছল মিরজাফরের চিঠি। রাজমহল থেকে লিখেছেন। '...আশা করি আল্লার মেহেরবানিতে খুশ তবিয়ত, সহি সালামত আছ ও রাজধানীকে সালামত রেখেছ। আমি পাটনা থেকে ফিরছি। খুশ তবিয়ত আছি। তবে মন ভালো নেই। রাজমহলে বসে এই চিঠঠি লিখছি তোমাকে।...'

এই অবধি পড়ে থমকাল মিরন। আজিব বাত। আব্বাহুজুর চিঠঠি লিখছেন রাজমহল থেকে। ইয়ানে তাঁর কোতল হওয়ার পয়গাম ঝুটা? বাকি চিঠিটা দ্রুত পড়তে লাগল মিরন।

'...আপাতত কয়েকটা দিন রাজমহলে কাটিয়ে ফের মুর্শিদাবাদের পথে রওনা হব। এই ওয়াক্তে আমার জখমি দিলের ইলাজ জরুরি। আমার পাটনা অভিযানের মনসুবা বরবাদ হয়েছে। রামনারায়ণ খুশ তবিয়ত, সহি সালামত আছে। তাকে পাটনার নায়েব সুবাদারের জিম্মেদারি দিতে হয়েছে। জানি, এ কথা শুনলে তোমার গুসসা হবে। মিরকাজিমের এক আহাম্মকিতে আমার সব কোশিশ বরবাদ হয়ে গেল। সে সব কথা ফিরে এসে তোমাকে বলব। ক্লাইভ সাহেব ছিলেন রামনারায়ণের পক্ষে। তবে আমি মনে করি রায়দুর্লভই

আমার এই বেইজ্জতির জন্য দায়ী। রামনারায়ণের পক্ষ নেওয়ার জন্য ক্লাইভ সাহেবকে সেই বুঝিয়েছিল বলে আমার আন্দাজ। কী আর করা যাবে। বদকিসমতি আমারই।'

'ক্লাইভ সাহেব এতক্ষণে হয়তো ভগবানগোলা পৌঁছে গিয়েছেন। ক্লাইভ সাহেবের সঙ্গে মুর্শিদাবাদে ফিরছেন রায়দুর্লভ। রামনারায়ণ, রাজারাম, রায়দুর্লভ কাউকেই খতম করতে পারলাম না আমি। এই মায়ুসী আমার কলিজাকে জখম করেছে। বড় হতাশ লাগছে। রাজমহলে কয়েকটা দিন কাটিয়ে মনের ইলাজ করাতে চাই।'

এই অবধি পড়ে রাগে কাঁপতে লাগল মিরন। তাঁর আপত্তি, নবাবের আপত্তি সত্ত্বেও নায়েব সুবাদারের কুরসিটা ধরে রাখলেন রামনারায়ণ! কর্নেল ক্লাইভ এক দুষ্ট জিন। নবাবকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছেন। ইংরেজদের সুবে বাংলা থেকে তাড়াতে না পারলে নবাব কিছুতেই আজাদ হতে পারবেন না। এই ভাবনা দিনে দিনে বদ্ধমূল হয়ে উঠছে মিরনের মনের মধ্যে।

ফের চিঠিতে চোখ রাখে মিরন। মিরজাফর আরও লিখেছেন, '...তবে তোমাকে বলি বেটা দিমাগ শান্ত রেখো। আমার আগেই ক্লাইভ সাহেব পৌঁছে যাবেন মুর্শিদাবাদে, তাঁর খোশ আমদেদ ও খাতিরদারিতে যেন কোনও গলতি না হয়।...'

চিঠিটা ভাঁজ করে জেবের ভিতরে পুরে রাখল মিরন। অস্থির হয়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। হঠাৎ তার মাথায় উঁকি দেয় এক আশঙ্কা। ক্লাইভ সাহেবের মনসুবা কী? নবাব লিখেছেন, ফৌজ নিয়ে ভগবানগোলায় পৌঁছে গিয়েছেন তিনি। ওদিকে নবাব রাজমহলে। ক্লাইভ এত দ্রুত মুর্শিদাবাদে ফিরছেন কেন? ওদিকে আবার তাঁর সঙ্গেই ফিরছেন রায়দুর্লভ। তাহলে কী রফা হয়ে গিয়েছে দু'জনের? সত্যিই কী তবে ইনকিলাব ঘটবে? ক্লাইভ ও রায়দুর্লভ মুর্শিদাবাদে এসেই বন্দি করবে তাকে? তারপর কয়েদ করবে হাবুজখানায়? মিরনের কল্পনা বল্গাহীন তুর্কি ঘোড়ার মতো ছুটতে থাকে।

কেউ যেন হেসে উঠল আড়ালে। মনের ভ্রম।

চিৎকার করে ওঠে মিরন, 'কে?' ভয়ার্ত চোখে চারিদিকে চোখ ঘোরায় নবাবজাদা। না, কেউ কোথাও নেই। শুধু দেওয়ালের গায়ে কাঁপছে তার নিজের অতিকায় ছায়া।

হঠাৎই সিরাজের যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখটা মনে পড়ে যায় মিরনের। হ্যাঁ এখানেই তো, এই জাফরাগঞ্জ প্যালেসে মাটির নিচে গোপন কারাকক্ষে কালো পাথরের মেঝের উপরে মুখ থুবড়ে পড়েছিল দেহটা। মুখে তখনও স্পষ্ট যন্ত্রণার ছাপ। মাথার ঝাকড়া চুলগুলো রক্তে ভেজা। তাহলে তারও পরিণতি কি এমনই...ভয়ে কেঁপে উঠল মিরন। ঘামছে গোটা শরীর।

নবাবজাদার জরুরি তলব পেয়ে ছুটে এলেন রাজবল্লভ।

মিরন উত্তেজিত গলায় বলে, 'শুনেছেন তো, ইংরেজ ফৌজ দ্রুত এগিয়ে আসছেন।'

'জি হুজুর।'

'ক্লাইভের সঙ্গে ওয়াপস আসছেন খন্নাস রায়দুর্লভ।'

'জি হুজুর। শুনেছি।'

'আমার আন্দাজ ফের ইনকিলাব ঘটাতে চান ক্লাইভ।'

রাজনৈতিক কূটকৌশলে পোক্ত রাজবল্লভের এ কথায় একিন নেই। এখনই ইনকিলাব ঘটানোর কোনও ইরাদা ক্লাইভের আছে বলে তাঁর মনে হয় না। দিব্যি ক্লাইভের বশে রয়েছেন মিরজাফর খাঁ। ক্লাইভ যা চাইছেন, তাই ঘটছে সুবে বাংলায়। এই পরিস্থিতিতে খামোখা হুজ্জুতির মধ্যে যেতে চাইবে কেন ইংরেজরা। রাজবল্লভ যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারেন যে নবাবজাদা যা ভাবছেন তা ভুল। তবে সে পথে তিনি গেলেন না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। নবাবজাদা কোনও বিরুদ্ধমত বরদাস্ত করেন না। তিনি যা ভাবেন সেটাকেই সহি বলে মনে করেন।

'কী করা যায় এখন?' প্রশ্ন করে মিরন।

রাজবল্লভ বলেন, 'হুজুর আপনি যা হুকুম করবেন তাই হবে।'

'জাফরাগঞ্জ প্যালেস নিরাপদ নয়। সহজেই আমার নাগাল পেয়ে যাবে দুশমন।'

'কী চান—ফরমায়েশ করুন হুজুর।'

'ফৌজ নিয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে মোতিঝিল প্যালেসে ঘাঁটি গাড়তে চাই।'

'জি হুজুর।'

হঠাৎই গর্জন করে ওঠে মিরন, 'তক্ত ইয়া তাবুত। ফৌজ তৈয়ার করুন জলদি।

অবাক হয়ে রাজবল্লভ শুধোলেন, 'এখনই? এই রাতে?'

'হাঁ! হাঁ! আভি। ওয়াক্ত বহুত কম। এখনই মোতিঝিলে যেতে চাই আমি।'

'জি হুজুর।' মাথা ঝুঁকিয়ে কথাটা বলে বিদায় নিলেন রাজবল্লভ।

সেই রাতেই হাতি ঘোড়া, লোক-লস্কর, সেপাই-পেয়াদা, কামানের গাড়ি, পরিবার ও হারেমের খুবসুরতিদের নিয়ে রওনা হল মিরন। চেঁচামেচি, হইহুল্লোড়, কামানের গাড়ির ঘড়ঘড় আওয়াজে ভেঙে খান খান হল রাতের স্তব্ধতা। ঘুম ভেঙে চোখ কচলে বাইরে বেরিয়ে এসে মানুষজন দেখল, নবাবজাদার কাফেলা চলেছে মোতিঝিল প্যালেস অভিমুখে। খবরটা তামাম মুর্শিদাবাদে ছড়িয়ে পড়ল সেই রাতেই। ফের ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই বাঁধতে চলেছে।

সিরাজের সঙ্গে লড়াইটা হয়েছিল পলাশিতে। রাজধানী থেকে দূরে। সে সময় অক্ষত ছিল মুর্শিদাবাদ। কিন্তু এবার যে লড়াই মুর্শিদাবাদেই। দুশ্চিন্তায় দিশেহারা হয়ে পড়ল রাজধানীর আমজনতা। মিরজাফরের মওতের ঝুটা খবরকে কেন্দ্র করে যে আগুন জ্বলে উঠেছিল মুর্শিদাবাদে, তা ধীরে ধীরে নিভে আসছিল। কিন্তু সেই আগুনকে ফের উসকে দিল নবাবজাদার লড়াইয়ের আনজাম। ফের আগুন জ্বলল, সক্রিয় হল লুঠেরার দল। শুরু হল লুঠতরাজ। পুড়তে লাগল ঘরবাড়ি, মানুষের নসিব।

মুর্শিদাবাদ ফের বেচ্যায়েন। এই খবর পেয়ে ব্যস্ত হয়ে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে কাশিমবাজার থেকে ছুটে এলেন স্ক্র্যাফটন। রাজধানীর হালত দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি। মুর্শিদাবাদ নগরী কার্যত বিধ্বস্ত। বাতাসে পোড়া ইট-কাঠের গন্ধ। পথের ধারে এখানে ওখানে পড়ে থাকা শবদেহ ঠোকরাচ্ছে শকুন। সুনসান রাজধানীর পথঘাট। সদাব্যস্ত চকবাজার থমথমে। বহু দোকানপাট ভস্মীভূত। বাতাসে উড়ছে পোড়া ছাই।

লুঠতরাজের ভয়ে কুঠির সদর দেউড়ি বন্ধ করে ঘরে নিজেকে স্বেচ্ছা বন্দি করে রেখেছিলেন জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ। ফৌজ নিয়ে স্ক্র্যাফটনের মুর্শিদাবাদে প্রবেশের কথা শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তার মুখ থেকেই স্ক্র্যাফটন শুনলেন সব কাহিনি। রাগে ফুঁসতে লাগলেন স্ক্র্যাফটন। ফের একবার বেয়াদপ ছোকরা মিরন তাঁকে তকলিফের মধ্যে ফেলেছে।

দিন কয়েকের মধ্যেই ক্লাইভ এসে পৌঁছবেন মুর্শিদাবাদে। তার আগে শহরের এই বেলাগাম পরিস্থিতির উপরে রাশ টানা দরকার। বিশ-পঁচিশজন গোরা-পল্টনকে সঙ্গে নিয়ে ঝড়ের গতিতে স্ক্র্যাফটন এসে হাজির হলেন মোতিঝিলে। মিরনের কাণ্ডকারখানা দেখে হাঁ হয়ে গেলেন তিনি। রীতিমতো যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। তোপ দাগার জন্য গোলন্দাজরা প্রস্তুত। জঙ্গি হাতিগুলো গায়ে, মাথায় বর্ম চাপিয়ে তৈরি হয়ে আছে। সেপাইরা হাতিয়ারবন্ধ। ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঘামাসান লড়াই লড়তে হবে—কোরান ছুঁইয়ে সেনাপতিদের দিয়ে শপথ করিয়ে নিচ্ছে মিরন।

স্ক্র্যাফটনকে দেখে শশব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এলেন রাজবল্লভ।

ক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্ক্র্যাফটন। 'কোথায় নবাবজাদা?'

স্ক্র্যাফটনের চড়া গলার আওয়াজ মিরনের কানে গেল।

শপথ গ্রহণের কার্যক্রম ফেলে রেখে সেও ছুটে এল।

মনে মনে মুচকি হাসলেন রাজবল্লভ। ক্লাইভের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তাল ঠুকছেন নবাবজাদা ওদিকে স্ক্র্যাফটনের কড়া মেজাজ দেখেই মিইয়ে গিয়েছেন। বাহাদুর বটে তার মনিব।

মিরনকে এগিয়ে আসতে দেখেই স্ক্র্যাফটন গর্জন করে উঠলেন, 'ইউ হ্যাভ ডিস্টার্বড মুর্শিদাবাদ এগেইন বাই স্প্রেডিং রিউমারস। রাজধানী দেখভালের দায় আপনার। আর আপনি বারবার ট্রাবল ক্রিয়েট করে আমাদের পরেশান করবেন? কী ভেবেছেন আপনি?'

মিরন নিরুত্তর। অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

'লড়াইয়ের আনজাম কেন? কার সঙ্গে লড়বেন?'

রীতিমতো ঘাবড়ে যাওয়া গলায় মিরন বলে, 'ক্লাইভ সাহেব তুরন্ত আসছেন রাজধানীর দিকে। সঙ্গে দেওয়ানজি। তিনি মসনদ দখল করতে চান। ফির ইনকিলাব হবে। সেই আন্দেশায়—'

'আপনার দিমাগ খারাপ হয়ে গেছে। হু টোল্ড ইউ দিস ননসেন্স?'

মিরন নিরুত্তর।

'ইনকিলাব ঘটানোর কোনও মতলব ক্লাইভ সাহেবের নেই।'

মৃদু গলায় মিরন বলে, 'তবে আমি গলত আন্দাজ করেছিলাম।'

রক্ত চড়ে গেল স্ক্র্যাফটনের মাথায়। নবাবজাদা না হয়ে অন্য কেউ হলে হয়তো ঠাস করে এক চড় কষিয়েই বসতেন। নিজেকে সামলে নিয়ে চড়া গলাতেই বললেন, 'কাজটা আপনি ঠিক করেননি। আমআদমির চোখে কর্নেলকে আপনি বেইজ্জত করলেন।'

ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলেন স্ক্র্যাফটন। মিরনের চোখের সামনে একরাশ ধুলো উড়িয়ে তিরবেগে ফের চকবাজার অভিমুখে ঘোড়া হাঁকালেন।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মিরন।

রাজমহলে আমোদ-আশরতে বেশ দিন গুজরান করছিলেন মিরজাফর। দিনে শিকারখেলা, রাতে মেহফিল। হারেমের খুবসুরতিদের নিয়ে ফূর্তি, নাচগান, খানাপিনা আর হইহুল্লোড়। সহসা তাল কাটল। ক্লাইভের চিঠি একেবারে যেন তোপের গোলার মতো আছড়ে পড়ল মিরজাফরের মাথার উপরে।

ক্লাইভ লিখেছেন, '...গুজব ছড়িয়ে নবাবজাদা কী কাণ্ড ঘটিয়েছে, তা শুনলে আপনার হাড় হিম হয়ে যাবে। নিজের খেয়ালের বশে সে চারিদিকে প্রচার করেছে যে আমি নাকি আপনাকে মসনদ থেকে সরিয়ে রায়দুর্লভকে মসনদে বসানোর আনজাম করছি। তাই আপনাকে পিছনে ফেলে রেখে দ্রুত মুর্শিদাবাদে এসেছি।

'আপনি ভালো করেই জানেন ইংরেজ এক ইমানদার জাত। আপনার সঙ্গে যে ইকরারনামায় কোম্পানির হয়ে আমি দস্তখত করেছি, তা অচানক বরবাদ করে দিয়ে এমন বেওকুফি করার তামান্না আমার নেই। তাছাড়া কোম্পানির কাছেও আমার জিম্মেদারি আছে। আমি স্রেফ আমার খুশখেয়ালে চলতে পারি না। মরজি, খেয়াল– এসব নবাবি রিয়াসতে চলতে পারে, লেকিন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কারবারে চলে না।

'মুর্শিদাবাদে পৌঁছে আমিও তাজ্জব বনে গিয়েছি এ কথা শুনে যে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নবাবজাদা মোতিঝিল প্যালেসে ছাউনি ফেলেছেন। এ আমার বেইজ্জতি, কোম্পানির বেইজ্জতি। আমআদমির কাছে ইংরেজদের হেয় করেছে নবাবজাদা। আপনাকে মসনদ থেকে টেনে নামানোর আনজাম যদি আমরা করি তো আপনাকে জানিয়েই করব। লুকিয়ে ছুপিয়ে কোনও কাজ করা আমাদের ধাতে নেই। আপনি বলেছিলেন মুর্শিদাবাদে পৌঁছে আপনার জন্য ইন্তেজার করতে। আপনার এই অনুরোধ রাখতে

পারলাম না। এ ভাবে বেইজ্জত হওয়ার পর মুর্শিদাবাদে থাকার ইচ্ছে আমার আর নেই। আমি কলকাতায় ফিরে চললাম।

'সব শেষে বলি, নবাবজাদাকে আপনি সতর্ক করবেন। ভবিষ্যতে খামোখা রাজধানীকে বেচ্যায়েন করে কাশিমবাজারের রেসিডেন্টকে যেন তকলিফের মধ্যে না ফেলে। মনে রাখবেন আমাদেরও ধৈর্যের একটা সীমা আছে। নবাবজাদা যদি নিজেকে না শোধরান তো ভবিষ্যতে আমরা এমন কদম উঠাতে বাধ্য হব যে, সেটা আপনার বা নবাবজাদার, কারও পক্ষেই ভালো হবে না।...'

এই চিঠি পেয়ে আমোদ-ফূর্তি মাথায় উঠল নবাবের। রাজমহল থেকে তাঁবু গুটিয়ে দ্রুত তিনি মুর্শিদাবাদের পথে এগোতে লাগলেন।

৫৪

ইংরেজ আভিজাত্যের বুকে গভীর এক ক্ষতচিহ্ন কলকাতার পুরোনো ফোর্ট উইলিয়ামের ভাঙাচোরা ইমারত। ভেঙে পড়া দেওয়াল, গোলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত বুরুজগুলো ইংরেজদের পরাজয়ের স্মারক, সুবে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার কুদরতির নিশান। ১৭৫৬ সালে কলকাতায় এসে এই কেল্লার উপরে আঘাত হেনে ইংরেজ ঔদ্ধত্যকে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছিলেন সিরাজ। ইংরেজরা এখন এই খণ্ডহরকে বলে পুরোনো ফোর্ট উইলিয়াম।

দুঃসময়ের স্মৃতিকে উসকে দেয় এই ইমারত। এর অস্তিত্ব পুরোপুরি মুছে দিতে পারলে স্বস্তি পেতেন ক্লাইভ। বজরার গলুইয়ের উপরে দাঁড়িয়ে তিনি ভাবছিলেন সেই কথা। কিন্তু গোবিন্দপুরে নতুন কেল্লা গড়ে না তোলা পর্যন্ত গোলার আঘাতে জর্জরিত এই পুরোনো কেল্লাটাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া ফেলা যাচ্ছে না। কেননা এর ভিতরের কয়েকটা অক্ষত গুদামঘর মাল মজুত করার কাজে লাগে। তাছাড়া কয়েকটা অফিসঘরও অটুট আছে। এরই মধ্যে একটা ঘরে এখনও নিয়মিত কলকাতা কাউন্সিলের মিটিং বসে। নতুন কেল্লা সম্পূর্ণ গড়ে তুলতে অনেক সময় লাগবে।

ঘাটের দিকে এগোচ্ছে বজরা। পুরোনো ফোর্ট উইলিয়ামের হতশ্রী চেহারাটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্লাইভের চোখে। বিকেলের মরা আলোয় কলকাতা শহরের বুকে ইংরেজদের প্রথম স্থাপত্যকীর্তি অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে, যেন চিরতরে বিলীন হয়ে যাওয়ার প্রহর গুনে চলেছে।

নৌকোঘাটে এসে ভিড়ল বজরা।

ক্লাইভকে দেখে গভর্নর ড্রেক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। দক্ষিণে ফরাসিদের হাতে ইংরেজদের নাস্তানাবুত হওয়ার খবরটা কলকাতায় আসার পর থেকে আতঙ্কের প্রহর গুনছে গোটা ইংরেজসমাজ। দক্ষিণে কাড্ডালোর দুর্গ হাতছাড়া হয়েছে। ফরাসি জেনারেল মঁসিয়ে লালির সাফল্যে ভয়ের সঞ্চার হয়েছে ফোর্ট সেন্ট জর্জে। গভর্নর পিগট খুবই চিন্তিত। কলকাতার ভয়—চন্দনগরের বদলা নিতে লালি যদি যুদ্ধজাহাজ নিয়ে আচমকা কলকাতায় এসে হাজির হন তো তখন কী হবে?

রজার ড্রেক দ্রুত এগিয়ে এসে এগিয়ে এসে করমর্দন করে বললেন, 'উই আর রিলিভ্ড দ্যাট ইউ আর ব্যাক টু ক্যালকাটা।'

মুচকি হেসে রসিকতা করে ক্লাইভ বললেন, 'মিরজাফর যতদিন নবাব আছেন ততদিন নাথিং টু ওয়ারি অ্যাবাউট। সেদিক থেকে সত্যিই আমরা রিলিভ্ড।'

ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলেন ক্লাইভ। তাঁর এক পাশে রজার ড্রেক আরেক পাশে হলওয়েল। পিছনে বীচার, ম্যানিংহাম ও ওয়াটস। কলকাতা কাউন্সিলের হোমরা-চোমরা এই সাহেবেরা ক্লাইভকে প্রায়

অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে রেখেছেন।

ড্রেক বললেন, 'এখন তো ভাবনা নবাবকে নিয়ে নয়। উই আর থিংকিং অ্যাবাউট দ্য ফ্রেঞ্চ।'

ড্রেকের কথায় গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন ক্লাইভ।

হলওয়েল বললেন, 'দক্ষিণের খবর পেয়েছেন নিশ্চয়ই।'

সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে ক্লাইভ বললেন, 'হুঁ। দ্য বেস অফ কাড্ডালোর ওয়াজ লস্ট।'

হলওয়েল বললেন, 'মি. পিগটের চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে লালি ইজ অ্যা বিগ থ্রেট।'

ধোঁয়া ছেড়ে ক্লাইভ বললেন, 'আমার মনে হয় গোলমালটা আমাদের স্ট্র্যাটেজিতে। দেয়ার ইজ নো রিজন টু ফিয়ার ফ্রেঞ্চ পাওয়ার সো মাচ।'

ড্রেক বললেন, 'মি. পিগট রাইটস রিপিটেডলি, দ্যাট ইউ শুড সেট আউট স্পিডিলি ফর ম্যাড্রাস। কী করবেন আপনি?'

ক্লাইভ চকিতে একবার ড্রেকের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'নবাবের দিক থেকে কোনও থ্রেট না থাকলেও, বেঙ্গল সেটলমেন্ট কিন্তু এখনও পুরোপুরি সেফ নয়। অ্যাট প্রেসেন্ট দ্য সিচুয়েশন ইজ টু মাচ কমপ্লেক্স। নবাব ইজ হোস্টাইল উইথ রামনারায়ণ অ্যান্ড রায়দুর্লভ। ফের ডিসটার্বড হতে পারে মুর্শিদাবাদ। তাছাড়া যে কোনও সময় হানা দিতে পারেন সুজাউদ্দৌলা। মারাঠারাও বিগ থ্রেট। কাড্ডালোরের ঘটনা এখনও নবাবের কানে যায়নি। আজ নয়তো কাল নবাব শুনবেন সবই। মিরনকে বিশ্বাস নেই। ফরাসিদের সাকসেসের কথা শুনলে হি মে ইনফ্লুয়েন্স নবাব টু মেক অ্যান অ্যালায়েন্স উইথ সুজাউদ্দৌলা টু ড্রাইভ আস আউট ফ্রম বেঙ্গল। মঁসিয়ে ল সুজাউদ্দৌলার আশ্রয়ে রয়েছেন। তিনিও রিভেঞ্জ নিতে চাইবেন।'

হলওয়েল শঙ্কিত গলায় বললেন, 'ইফ ইউ গো টু ম্যাড্রাস দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন হিয়ার?'

ক্লাইভ চিন্তিত গলায় বললেন, 'বাংলার সিচুয়েশনটা বুঝতে পারছে না মাদ্রাজ কাউন্সিল। ইন মাই ওপিনিয়ন বেঙ্গল'স সিচুয়েশন ইজ মোর কমপ্লেক্স দ্যান সাউথ।'

এ সময়ে আপনি না থাকলে—

আমি এখনই ওয়াপস যাচ্ছি না।

ড্রেক খুশি গলায় শুধোলেন, 'হোয়াট ডু আই রাইট টু মি. পিগট?'

'আপনাকে কিছু লিখতে হবে না। যা লেখার তা আমি লিখে জানিয়ে দেব। আই উইল সেন্ড লায়নেল ফোর্ড টু ম্যাড্রাস উইথ অ্যা কনটিনজেন্ট।'

ফের একবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ড্রেক, হলওয়েল, বীচার, ম্যানিং হ্যাম, ওয়াটস সকলে। একসময় এদেরই অনেকে মনে করতেন, ক্লাইভ তাদের কাছে এক মস্ত আপদ। ড্রেক, হলওয়েল ভাবতেন, তাদের কর্তৃত্ব ফলানোর পথে ক্লাইভ এক মস্ত বাধা। যত দ্রুত তিনি বাংলা থেকে বিদায় নেন ততই ভালো। আজ তাঁরাই ক্লাইভকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছেন। ক্লাইভই তাঁদের ভরসা।

মে মাসের বিকেল। বড় বেলা। দীর্ঘায়িত হয়েছে লালদিঘির পাড়ে গাছগুলির ছায়া, তবে এখনও বাইরের তাপ যথেষ্ট বেশি। বেলা ফুরোতে এখনও ঢের দেরি আছে। এই গরমে নদীর বুকে এতটা পথ এসেছেন। বেশ ক্লান্তি শরীরে। তবুও লালদিঘির সামনে থেকে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলেন ক্লাইভ। সঙ্গে কাউন্সিলের সব সদস্যেরা। ক্লাইভের ইচ্ছেকে সম্মান জানাতে তাঁরাও চেপে বসলেন ঘোড়ার পিঠে। গোটা কলকাতা কাউন্সিল ঘোড়ার খুরে ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলল গোবিন্দপুর অভিমুখে। নতুন কেল্লা গড়ার কাজ কতটা এগোলো সরেজমিনে দেখে নিতে চান ক্লাইভ। এখনই।

হন্তদন্ত হয়ে রাজমহল থেকে মুর্শিদাবাদে এসে পৌঁছলেন মিরজাফর। নবাবকে স্বাগত জানানোর জন্য হিরাঝিল প্যালেসের নৌকোঘাটে দাঁড়িয়েছিল মিরন। নহবতখানায় বাজছে সানাই।

বজরা থেকে নেমেই ব্যস্ত হয়ে মিরনের দিকে এগিয়ে এলেন নবাব। শুধোলেন, 'কর্নেল আছেন না কলকাতা ওয়াপস গিয়েছেন?'

'ওয়াপস গিয়েছেন।' সংক্ষেপে জবাব দেয় মিরন।

'ইংরেজ ফৌজের সঙ্গে লড়াই করার জন্য তুমি মোতিঝিলে ঘাঁটি গেড়েছিলে?'

'জি আব্বাহুজুর।'

বেশ বিরক্তির সঙ্গেই মিরজাফর শুধোলেন, 'তুম অ্যায়সা কিঁউ কিয়া?'

মিরন ভাঙে, তবু মচকায় না। 'আমি হুঁশিয়ার ছিলাম। নয়তো ফের ইনকিলাব ঘটে যেত।'

ধন্দে পড়ে গিয়ে হাঁ হয়ে যান মিরজাফর। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা রাজবল্লভের মুখপানে চেয়ে আন্দাজ পাওয়ার কোশিশ করেন—মিরন যা বলছে তা সচ না ঝুটা? তিনি জানেন ইংরেজরা কৌশলবাজ। ক্লাইভ চিঠিতে একতরফা দোষারোপ করেছেন মিরনের উপরে। তিনি যা লিখেছেন, তা যে বিলকুল সত্যি তারই বা সাবুত কোথায়?

রাজবল্লভকে আগেই শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছিল মিরন।

রাজবল্লভ বললেন, 'নবাবজাদা সচ বলছেন। ক্লাইভ সাহেবের ভরসায় চুপিসারে মসনদ দখলের মতলবে ছিলেন দেওয়ানজি। নবাবজাদা হুঁশিয়ার থাকায় এই সাজিশি বরবাদ হয়ে গিয়েছে। আমার আন্দাজ তোশাখানা থেকে টাকা সরিয়ে ক্লাইভ সাহেবকে মোটা টাকা সওগাত দিয়েছেন দেওয়ানজি। আপনি তাকে হিসেব দাখিল করতে বলুন।'

সুযোগ পেয়ে নবাবের কানে রায়দুর্লভের নামে বিষ ঢেলে দিলেন রাজবল্লভ। তাঁর নজর সুবে বাংলার দেওয়ান পদটার উপরে। রায়দুর্লভের মুসিবত হলে তাঁর নসিব ফিরতে পারে। তবে তিনি একাই দেওয়ান পদের উমেদার নন। নন্দকুমারও শ্যেন দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন দেওয়ানের কুরসিটার দিকে। নিজামতের অন্দরে পরিবেশ একেবারে বিষিয়ে উঠেছে।

মিরনের প্রতি অন্ধ অপত্য স্নেহ থাকলেও তার বুদ্ধি, বিবেচনার উপর মোটেও ভরসা নেই মিরজাফরের। কিন্তু রাজবল্লভ আকলমন্দ আদমি। অতীতে নিজামতের শাসন ব্যবস্থায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। রাজবল্লভ যে ভাবে প্রত্যয়ের সঙ্গে কথাগুলো বললেন, তাতে নবাবের একিন হল রাজবল্লভ যা বলছেন তা সত্যি। আসলে নবাবের মন রাজবল্লভের জবানে এমন কথা শোনার জন্যেই উন্মুখ হয়েছিল।

ক্লাইভের উপস্থিতিতে নবাব ও দেওয়ান কিছুদিন আগে রাজমহলে বসে নিজেদের মধ্যে আখেজ-আদাওতি অন্ত্ করার ওয়াদা করেছিলেন। মুর্শিদাবাদে পৌঁছেই ফের বিগড়ে গেলেন নবাব। তাঁর মনে হল, রায়দুর্লভই তাঁর পয়লা নম্বরের দুশমন। তিনিই আড়াল থেকে যাবতীয় ঘোঁট পাকাচ্ছেন। তাঁকে বিনাশ করতে না পারলে স্বস্তি নেই।

বেশ কিছুদিন ধরে স্ক্র্যাফটন সাহেবের তবিয়ত মোটেই ভালো যাচ্ছে না। উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন। ঘুম আসে না রাতে। চোখের তলায় কালি পড়েছে। সারা দেহ জুড়ে ক্লান্তি। গত দুবছরের তীব্র মানসিক উত্তেজনা শরীরটাকে বেশ ভালোরকম জখম করে দিয়েছে।

ক্লাইভের নির্দেশে দরবার রাজনীতিকে হাতের মুঠোয় রাখার কোশিস-কসরতে এমনিতেই রেসিডেন্ট সাহেব জেরবার। তার উপরে মাঝে মাঝে কাসিদরা গলত খবর নিয়ে আসে—বর্গিরা বর্ধমান পেরিয়ে দ্রুত মুর্শিদাবাদের দিকে এগোচ্ছে। কখনও বা স্ক্র্যাফটনের কাছে খবর আসে সুজাউদ্দৌলা রাজমহল পেরিয়ে

গিয়েছেন। দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠেন স্ক্র্যাফটন। কাশিমবাজার কুঠিকে সুরক্ষিত রাখার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। খানিক পরেই আবার উলটো খবর আসে। আগের খবরটা ছিল ঝুটা। স্নায়ুর চাপ আর সইতে পারছেন না স্ক্র্যাফটন। আজকাল অল্পতেই বড় বিচলিত হয়ে পড়েন। রেসিডেন্টের দায়িত্ব থেকে তিনি অব্যাহতি চাইছেন। ক্লাইভের সঙ্গে আলোচনাক্রমে স্থির হয়েই আছে তাঁর পরে রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেবেন ওয়ারেন হেস্টিংস। তবে এখনই নয়। অগত্যা স্ক্র্যাফটন নিরুপায়। আরও কিছুদিন কাজ চালিয়ে যেতে হবে তাঁকে।

শরীরটা আজ মোটেই ভালো নেই। তবুও কর্তব্যের দায়ে হিরাঝিল প্যালেসে যেতে হচ্ছে স্ক্র্যাফটনকে। ভোরবেলা বেরিয়েছেন কাশিমবাজার থেকে। গ্রীষ্মের দাবদাহ এখনও ততটা অসহ্য নয়। ডাইনে গঙ্গা। বাঁধের উপর দিয়ে দ্রুত গতিতে ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে চলেছেন স্ক্র্যাফটন। সঙ্গে দশজন গোরা পল্টন।

কলকাতা রওনা হওয়ার আগে ক্লাইভ বারবার তাঁকে বলে গিয়েছেন, নবাব রাজধানীতে ফিরলেই তিনি যেন নবাবের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করেন। নবাবকে ভয়ানক কড়া একখানা চিঠি লিখে খানিকটা দুশ্চিন্তায় রয়েছেন ক্লাইভ। কর্নেলের আশঙ্কা হল, যে সুতোটা ধরে নবাবকে পুতুলের মতো তিনি নাচাচ্ছেন, ধমক-হুমকি—এসবের মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে সেই সুতোটাই না ছিঁড়ে যায়।

চিঠিটা পাঠানোর পরেই ক্লাইভের মনে হয়েছিল এতটা কড়া চিঠি না লিখলেই হত। অহংবোধ সকলেরই থাকে। তার উপরে সুবে বাংলার নবাব বলে কথা। ইংরেজদের উপরে বিরক্ত হয়ে তিনি যদি সুজাউদ্দৌলার হাত পাকড়ে ধরেন, আর জাঁ ল মারফত ফরাসিদের সঙ্গে দোস্তি গড়ে তোলেন, তাহলে ইংরেজদেরই তকলিফ বাড়বে। তাই তাঁর চিঠি পেয়ে নবাবের প্রতিক্রিয়া কী সেটা জানার জন্য ক্লাইভ উদগ্রীব। স্ক্র্যাফটনের মারফত নবাবকে একবার তিনি বাজিয়ে দেখতে চান। তাই এই উদ্দেশেই সাতসকালে স্ক্র্যাফটনের হিরাঝিল-অভিযান।

নবাবের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করে স্ক্র্যাফটন বললেন, ‘ক্লাইভ সাহেব খুব চটে গিয়েছেন।’

গিরদায় ঠেস দিয়ে ফরাসের উপরে কাত হয়ে শুয়েছিলেন নবাব। চোখদুটো বোজা। মুখে গোঁজা ফরসির নল। অম্বুরি তামাকের গন্ধে গোটা ঘর আমোদিত। নিরুত্তর রইলেন তিনি।

স্ক্র্যাফটন ফের বললেন, ‘নবাবজাদার বেওকুফিতে উনি খুবই বিরক্ত হয়েছেন। আমার মনে হয় নবাবজাদার হয়ে চিঠি লিখে আপনি একবার কর্নেলের কাছে মাফি মাঙলে ভালো হয়।’

‘কেন লিখব চিঠি?’ নবাবের জবান শুনে চমকে উঠলেন স্ক্র্যাফটন।

একটু অপ্রস্তুত গলায় স্ক্র্যাফটন বললেন, ‘পাটনা থেকে মুর্শিদাবাদে পৌঁছে খাতিরদারি আশা করেছিলেন কর্নেল, লেকিন নবাবজাদা খামোখা যে কাণ্ড ঘটালেন তাতে—’

‘খামোখা বলছেন কেন?’ স্ক্র্যাফটনকে বাধা দিয়ে প্রশ্ন করলেন নবাব।

‘ক্লাইভ সাহেব আপনার দোস্ত। মুর্শিদাবাদে এসে অহেতুক বেইজ্জত হতে হল তাঁকে।’

‘এতে নবাবজাদার কসুর হল কোথায়?’

স্ক্র্যাফটন হতবাক। কী বলছেন মিরজাফর খাঁ? এমন বেয়াদপির পরেও নবাবজাদাকে তিনি সমর্থন করছেন? মুখে বললেন, ‘কর্নেলকে বেইজ্জত করা বেতমিজি নয়?’

‘আপনারাই তো বেইজ্জত করছেন আমাকে। দোস্তকে ভুলে গিয়েছেন ক্লাইভ সাহেব। ইকরারনামায় বলা ছিল নবাবের যে দুশমন, সে আপনাদেরও দুশমন। কিন্তু রায়দুর্লভ, রাজারাম, রামনারায়ণ আমার সব দুশমনকেই তো মদত দিচ্ছেন ক্লাইভ। দেওয়ানের লালচ আছে মসনদের উপরে। চকবাজারের সামান্য এক আতরের কারবারিও এ কহানি জানে। কাজেই রায়দুর্লভকে সঙ্গে নিয়ে কর্নেল যদি দ্রুত মুর্শিদাবাদের দিকে এগিয়ে আসেন, আর সে কথা শুনে নবাবজাদা যদি মনে করে ফির ইনকিলাব ঘটতে চলেছে, তার জন্য কি নবাবজাদার নামে ইলজাম আনা যায়? সে নিজেকে সালামত রাখতে চেয়েছিল, হুঁশিয়ার ছিল, লেকিন হামলা তো করেনি।’

খুব ধীরে, থেমে থেমে, এতটুকু উত্তেজিত না হয়ে কথাগুলো বললেন মিরজাফর খাঁ। নবাবের গলায় অন্যরকম সুর শুনে ঘেমে উঠলেন স্ক্র্যাফটন। এ যে অচেনা মিরজাফর খাঁ। তাহলে কি সত্যিই সুতো ছিঁড়ে গেল? ইংরেজদের শিকলি কেটে আজাদ চিড়িয়ার মতো আকাশে উড়তে চাইছেন নবাব?

'আপনার কথা আমি কর্নেলকে জানাব।' এই বলে কোনওরকমে নবাবের সঙ্গে আলোচনা সেরে হিরাঝিল প্যালেস থেকে বেরিয়ে এলেন স্ক্র্যাফটন। ফের ঘোড়া হাঁকালেন কাশিমবাজারের উদ্দেশে।

১৭৫৮ সালের ২০ জুন। লন্ডন থেকে কলকাতায় এসে নোঙর ফেলল জাহাজ—হার্ডউইক ইন্ডিয়াম্যান। এই জাহাজে এসেছেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি জন স্যামসন। তিনি নিয়ে এসেছেন কোম্পানির বড় কর্তাদের পাঠানো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ডেসপ্যাচ।

ফোর্ট উইলিয়ামের নৌকোঘাটে স্যামসনকে স্বাগত জানালেন গভর্নর রজার ড্রেক।

জাহাজ থেকে নেমে ফোর্ট উইলিয়ামের হতশ্রী চেহারা দেখে শিউরে উঠলেন স্যামসন। ১৭৫৬ সালে নবাবের হাতে বেঙ্গল এস্টাবলিশমেন্টের বিপর্যয়ের কথা তাঁর অজানা নয়। কর্নেল ক্লাইভের নেতৃত্বে পলাশির প্রান্তরে ইংরেজদের ঘুরে দাঁড়ানোর কথাও জানেন স্যামসন। কলকাতা থেকে চিঠি লিখে সব জানানো হয়েছিল লন্ডনে। তবে ১৭৫৬ সালে নবাবের আক্রমণের ধাক্কা যে এতটা ভয়ানক ছিল, তা কলকাতা থেকে পাঠানো চিঠি পড়ে আন্দাজ করতে পারেননি লন্ডনের সাহেবদের কেউই। আন্দাজ করতে পারেননি স্যামসনও।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে তিনি ভাবছিলেন, সেই ভয়ানক আক্রমণ সামলে ইংরেজরা যে ফের ঘুরে দাঁড়িয়েছে এটা সত্যিই গর্বের বিষয়।

বোর্ডরুমে প্রবেশ করলেন স্যামসন। উপস্থিত কাউন্সিলের সকল সদস্যই। শুধু অনুপস্থিত ক্লাইভ। তিনি কয়েকদিনের জন্য বিশ্রাম নিতে গিয়েছেন দমদমায় তাঁর বাগানবাড়িতে।

মেহগিনি কাঠের গোল টেবিলকে ঘিরে সাজানো কুরসিগুলো দখল করে বসে পড়লেন সবাই।

লন্ডন থেকে কোম্পানির পাঠানো ডেসপ্যাচ গভর্নর ড্রেকের হাতে তুলে দিলেন স্যামসন। তাতে চোখ বুলিয়ে চমকে উঠলেন ড্রেক। তাঁর হাত কাঁপতে লাগল।

৫৫

গত সন্ধেয় কালবৈশাখী ঝড়ে তছনছ হয়েছে শহর কলকাতা। উপড়ে গিয়েছে, হেলে পড়েছে বেশ কিছু বড় বড় গাছ। ভাঙা ডালপালা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পথে। উড়ে গিয়েছে দিশিপাড়ায় বেশ কিছু বাড়ির খোলার চাল। ভেঙে পড়েছে দেওয়াল। চারিদিক একেবারে লণ্ডভণ্ড। ভোরের আলো ফুটতেই ঘরদোর মেরামতির কাজে লেগে পড়েছে অনেকে। কাটারি, কুড়ুল হাতে ভেঙে পড়া গাছের ডালপালা সরিয়ে পথকে মুক্ত করার কাজে জায়গায় জায়গায় ব্যস্ত মানুষজন।

ঘোড়া হাঁকিয়ে যেতে যেতে কলকাতার গভর্নর রজার ড্রেক লক্ষ করছিলেন ঝড়ের তাণ্ডবের চেহারাটা। ঝড়ের সঙ্গে জোর একপশলা বৃষ্টিও হয়েছে কাল। ভোরের হাওয়ায় নাকে ভেসে আসছে মাটির সোঁদা গন্ধ। গাছপালা যেন আজ বড় বেশি রকমের সবুজ। চিৎপুর রোডে ধুলোর উৎপাত নেই। পথ কর্দমাক্ত। খানাখন্দে জমে আছে জল। ঘোড়ার খুরে ছিটকে উঠছে জল-কাদা।

গভর্নর ড্রেক একা নন, তার সঙ্গে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলেছেন হলওয়েল, বীচার, ম্যানিংহ্যাম, ওয়াটস—কলকাতা কাউন্সিলের হোমরা-চোমরা সকলেই। এদের মুখগুলো কালবৈশাখীর পূর্বে আকাশের মতোই থমথমে। কাউন্সিলের সদস্যদের সামনে ও পিছনে ছুটছে দেহরক্ষীর দল। জনাবিশেক গোরা পল্টন। কাঁধে রাইফেল।

উদলা গায়ে দেশি মানুষেরা টালুসমালুস করে চেয়ে দেখছে এই ঘোড়সওয়ার বাহিনীকে। কোম্পানির নিশানের পাশাপাশি উড্ডীন আরেকটি নিশান জানান দিচ্ছে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলেছেন কলকাতার গভর্নর সাহেব। পথের পাশে জমায়েত দিশি লোকেদের মধ্যে গুঞ্জন, ফিসফাস—হঠাৎ কী হল? সাতসকালে দল বেঁধে কোথায় চলেছে সাহেবেরা? গুরুতর কিছু ঘটল নাকি?

বিষয়টা সত্যিই গুরুতর। কেল্লার কাছে কলকাতার ডেরা ছেড়ে স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে দমদমার বাড়িতে ইদানীং থাকছেন কর্নেল ক্লাইভ। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চলেছেন কলকাতা কাউন্সিলের সদস্যেরা। স্যামসনের হাত দিয়ে কোম্পানির ডিরেক্টরেরা লন্ডন থেকে যে ডেসপ্যাচ পাঠিয়েছেন, তা পড়ে চক্ষুস্থির হয়ে গিয়েছে সকলের। তাঁরা মনে করছেন এই ডেসপ্যাচ কলকাতার বুকে আরেকটা ঝড় ডেকে আনার জন্য যথেষ্ট।

মারাঠা ডিচ পেরিয়ে এসে বরানগর থেকে দমদমার রাস্তা ধরল ঘোড়সওয়ার বাহিনী। এদিকটায় জঙ্গল বেশ ঘন। গাছের পাতার ফাঁকফোকর দিয়ে মাঝে মধ্যে উঁকি মারছে নীল আকাশ। দিনের বেলাতেও শোনা যাচ্ছে ঝিঁঝির ডাক। এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অপ্রশস্ত পথ চলে গিয়েছে 'ক্লাইভ হাউসে'র দিকে। রাস্তার উপরে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে গাছপালা, ঝোপঝাড়। পথের যা হাল তাতে খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। মাঝে মধ্যেই অবরোধ তুলছে বৃক্ষচ্যুত শাখা, উপড়ে যাওয়া গাছ। গতকালের ঝড়ের সাবুত। সাবধানে এগোতে হচ্ছে। এই অঞ্চল বুনোশুয়োরের অবাধ বিচরণক্ষেত্র। ঝোপের আড়াল ঠেলে অতর্কিতে হানা দেয় এই খতরনক জানোয়ার। আচমকা ঢুঁ মেরে তাগড়াই ওয়েলার ঘোড়াকেও বেসামাল করে দিতে পারে। রাইফেল ও বল্লম হাতে গোরা পল্টনেরা তাই হুঁশিয়ার।

জঙ্গল গাছগাছালির মধ্যে উঁচু এক মাটির ঢিবির উপরে দাঁড়িয়ে আছে 'ক্লাইভ হাউস'। এ বাড়ির মাথায় উড্ডীন কোম্পানির পতাকা অনেক দূর থেকেই দেখা যায়। দিশি লোকেরা বলে ক্লাইভ সাহেবের বাগানবাড়ি। 'দমদমা' মানে চাঁদমারির জন্য আদর্শ উঁচু মৃত্তিকা স্তূপ। মাটির ঢিবির উপরে ক্লাইভের বাড়ি। তা থেকেই এই এলাকার নাম হয়েছে দমদমা।

মূল বাড়িটি ছিল একতলা। বরানগরের বাণিজ্যকুঠির সুরক্ষার জন্য সেনাছাউনি হিসেবে ডাচেরা এই বাড়িটি তৈরি করেছিল। পরে তাদের কাছ থেকে বাড়িটি লিজ নেন নবাব আলিবর্দি খাঁ। এই বাড়ি হয়ে ওঠে নবাবের হান্টিং হাউস। বরানগরে ছাউনি ফেলে অবস্থান করার সময়ই এই বাড়িটি নজরে আসে ক্লাইভের। তিনি দেখেন, বাড়িটি খুবই সুরক্ষিত। অবস্থান উঁচু ঢিবির উপরে। শত্রুপক্ষের গতিবিধির উপরে নজর রাখার জন্য আদর্শ। বাড়ির চারিদিকে রয়েছে ফুলের বাগান, সবুজ ঘাসের লন। সেই বাগানের প্রান্তে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় ঝাঁকড়া গাছ। চারপাশ হরেক রকম পাখির কলকাকলিতে মুখর। শীতের সময়ে পরিযায়ী পাখিরা এসে ভিড় জমায় এ বাড়ির চৌহদ্দিতে। চারিদিক থেকে বাড়িটিকে বেড় দিয়ে রেখেছে বিরাট চওড়া এক পরিখা। সেই পরিখা একটি খালের মাধ্যমে গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত। এই পরিখা ও খালে ভেসে পড়ে অবসর সময়ে দিব্যি নৌবিহারের মজা উপভোগ করা যায়।

বাড়িটি খুবই পছন্দ হয় ক্লাইভের। পলাশির যুদ্ধের পর নবাব মিরজাফর খাঁর কাছ থেকে এই বাড়িটি তিনি চেয়ে নিয়েছিলেন। মুর্শিদাবাদ থেকে একদল দক্ষ কারিগরকে নিয়ে এসে এই বাড়ি সংস্কারের কাজে নিয়োগ

করেন ক্লাইভ। কারিগরেরা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পরিত্যক্ত একতলা বাড়িটিকে বসবাসের উপযোগী দোতলা বাড়িতে রূপান্তরিত করে।

বাড়ির সঙ্গে বাড়ির চৌহদ্দি সংস্কারেও মন দেন ক্লাইভ। অযত্নে বাড়ির চারপাশের লন ভরে গিয়েছিল আগাছা ও বুনো ঘাসে। নতুন করে ফের লন তৈরি হয়। লনের চারপাশে রয়েছে নুড়ি বিছানো পায়ে চলার পথ। একদিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে কেয়ারি করা ফুলের বাগান। আরেকদিকে বিশাল গোলাপ বাগিচা। এছাড়াও লনের এক প্রান্তে পরিখার ধারে রয়েছে মোটা শালখুঁটির কাঠামোর উপরে ঠাসবুনোট বেতের ছাউনি দেওয়া চবুতরা। বেতের ছাউনি অবশ্য দেখা যায় না। ঢাকা পড়েছে মাধবীলতায়। ফুল ধরেছে গাছে। সব মিলিয়ে দমদমায় এই জঙ্গলের মধ্যে 'ক্লাইভ হাউস' যেন 'অ্যা পিস অফ হেভেন'।

পলাশির যুদ্ধের পর ক্লাইভের স্ত্রী মার্গারেট, পুত্র এডওয়ার্ড ও কন্যা জেনিকে নিয়ে কলকাতায় আসেন। তারা এসে ওঠে ফোর্ট উইলিয়ামের অদূরে ক্লাইভের জন্য বরাদ্দ কোম্পানির দেওয়া বাড়িতে। ১৭৫৭ সালে দুর্গাপুজোর পরপরই ক্লাইভের পরিবারে ঘটে যায় এক দুর্ঘটনা। কয়েকদিনের অজানা জ্বরে মারা যায় জেনি। কন্যার মৃত্যুশোক কাটিয়ে ওঠার আগেই ক্লাইভকে ছুটতে হয় চন্দননগরের সেনা ছাউনিতে। ছেলে এডওয়ার্ডকে নিয়ে মার্গারেট থেকে যান কলকাতায়। এবারে মুর্শিদাবাদ থেকে ফিরে স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে দমদমার বাড়িতে চলে এসেছেন ক্লাইভ। পরিবারের সঙ্গে একান্তে কিছুটা সময় কাটাতে চান এই মনোরম পরিবেশে। দৌড়-ঝাপ মানসিক উত্তেজনা সইতে সইতে ক্লান্ত রবার্ট ক্লাইভ দু'দণ্ড বিশ্রাম চান।

লনের প্রান্তে চবুতরার নীচে স্ত্রী মার্গারেটের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট সারছিলেন ক্লাইভ। শ্বেতপাথরের গার্ডেন টেবিল নানারকম খাবারে ভর্তি। ব্রেড, মাখন, স্ক্র্যাম্বেল্‌ড এগ, সসেজ, শরবত ও নানারকমের মরশুমি ফল। কয়েকজন গোলাম-দাখিলার সঙ্গে এডওয়ার্ড ছুটোছুটি করে খেলে বেড়াচ্ছে লনে। চিনাবাদাম খাওয়াচ্ছে লনের উপরে অবাধে বিচরণকারী কাঠবেড়ালি ও বুনো খরগোশদের। এই বাড়িতে এসে বেশ খুশি মার্গারেট। ফোর্ট উইলিয়ামের পাশে যে বাড়িটি ক্লাইভের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল, মার্গারেটের মনে হত, এই বাড়ি ক্লাইভের পদমর্যাদার উপযুক্ত নয়। বাড়ির চারপাশে এত জায়গাও ছিল না। তাছাড়া সেই বাড়িতেই জেনি মারা যায়। সে এক দুঃস্বপ্নের স্মৃতি।

ক্লাইভ শুধোলেন, 'এখানে কেমন লাগছে মার্গারেট?'

মার্গারেট হাসেন। 'খুব সুন্দর। বিউটিফুল।'

'প্রথম যেদিন বাড়িটা দেখেছিলাম, মনে হয়েছিল, আহা এমন একটা বাড়ি যদি আমার থাকত তো বেশ হত।'

মুচকি হেসে রসিকতা করেন মার্গারেট, 'বেঙ্গলের সব প্রপার্টিই তো তোমার। কোনটা নয়?'

একটু দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ক্লাইভ বললেন, 'বেঙ্গল ইজ অ্যা বিউটিফুল প্লেস।'

দূর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে মার্গারেটের মুখের উপরে সংহত করে ক্লাইভ বললেন, 'এদেশের নবাব-বাদশাদের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু পেয়েছি মার্গারেট। সম্মান পেয়েছি, খেতাব পেয়েছি, জমিদারি পেয়েছি, টাকা পেয়েছি। একদিন গরিব ছিলাম, কিন্তু আজ আমার যা টাকা আছে, তার হিসেব কষতে বসলে লন্ডনের বিত্তবানদের মাথা ঘুরে যাবে। কিন্তু খারাপ লাগে কী জান, কোম্পানির জন্য আমি যা করেছি, তার রিকগনিশন কোথায়? আমার জন্য কী করেছে কোম্পানি?'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানান মার্গারেট। বলেন, 'শুনতে পাই এই সুবে বাংলায় কী কাউন্সিল, কী নবাব সবাই তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ইউ ডিসার্ভ দ্য পোস্ট—গভর্নর অফ ক্যালকাটা।'

'লন্ডনে ডিরেক্টরেরা শুধু লাভের টাকা গুনতে ব্যস্ত। কিন্তু কী ভাবে, কার কন্ট্রিবিউশনের জন্য কোম্পানি প্রফিট আর্ন করছে, দে ডোন্ট হ্যাভ টাইম টু থিংক অ্যাবাউট ইট।' ক্লাইভের গলায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে হতাশা।

সহসা ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে এল দূর থেকে। একটা নয় অনেকগুলো ঘোড়ার পায়ের শব্দ। মার্গারেট ঘুরে তাকিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন দূরে।

শিমুল গাছের নুইয়ে পড়া একটা ডাল ক্লাইভের দৃষ্টি অবরুদ্ধ করেছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি দেখলেন, পরিখার উপরের কাঠের পুল পার হয়ে তাঁর বাড়ির চৌহদ্দিতে প্রবেশ করলেন, ড্রেক, বীচার, ম্যনিংহাম, হলওয়েল ও ওয়াটস। গোটা কলকাতা কাউন্সিল।

অবাক হলেন ক্লাইভ। কোনও আগাম খবর ছাড়াই কলকাতা কাউন্সিলের সব সদস্যের হঠাৎ একসঙ্গে এখানে হাজির হওয়ার কারণ? যাই হোক, গেস্টদের ওয়েলকাম জানানোর জন্য এগিয়ে গেলেন সাহেব ও মেমসাহেব দু'জনেই।

উচ্ছ্বসিত গলায় কর্নেল ক্লাইভ বললেন, 'ওয়েলকাম! ওয়েলকাম! হোয়াট অ্যা সারপ্রাইজ!'

ঘোড়া থেকে নামলেন সকলে। গেস্টদের নিয়ে বাড়ির অন্দরে প্রবেশ করলেন ক্লাইভ দম্পতি।

ড্রেক গম্ভীর গলায় বললেন, 'উই হ্যাভ অ্যান আরজেন্ট ম্যাটার টু ডিসকাস উইথ ইউ।'

ড্রেক ও হলওয়েলের গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে ক্লাইভ বুঝলেন ব্যাপার খুবই গুরুতর।

ক্লাইভ বললেন, 'চলুন। কনফারেন্স রুমে গিয়ে বসি।'

বাড়ির একতলায় বেশ বড়সড় একটা ঘর। মাঝে ডিম্বাকৃতির বড়সড় একটা মেহগিনি কাঠের টেবিল। শ্বেতপাথরের টপ। টেবিলকে ঘিরে রয়েছে অনেকগুলো গদিআঁটা মেহগিনি কাঠের চেয়ার। কাঠের পালিশ আরশির মতো চকচকে। মাটিতে পাতা পুরু লাল গালিচা। পা ডুবে যায়। মাথার উপরে বিরাটাকার সুদৃশ্য এক ঝাড়বাতি। দেওয়ালের গায়ে উপরের দিকে আটকানো অনেকগুলি বাহারি দেওয়ালগিরি। ঘরের একদিকের দেওয়ালের গায়ে আঁটা রয়েছে বেশ বড়সড় একটা বেলজিয়াম কাঁচের আয়না। ঝাড়বাতিকে কেন্দ্র করে সমদূরত্বে কড়িবরগার ছাত থেকে ঝুলছে টানা পাখা। ঘরের চার কোণায় বাহারি কর্নার স্ট্যান্ডের উপরে রাখা রয়েছে কালো পাথর খোদাই করা চারটি সিংহের মূর্তি।

গালিচা, ঝাড়বাতি, টেবিল, চেয়ার, কর্নার স্ট্যান্ড, টানা পাখা, দেওয়ালগিরি, সিংহের মূর্তি, বেলজিয়াম কাঁচের আরশি এসবই পলাশির গনিমত। হিরাঝিল থেকে নিয়ে আসা এসব উপকরণ দিয়ে নিজের বাড়িকে মনের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছেন রবার্ট ক্লাইভ। মিটিংরুমের বাহারি সাজসজ্জা দেখে মুগ্ধ কাউন্সিলের সকল সদস্য। দমদমার বাড়িতে এই প্রথম তাঁদের আসা। ওয়াটসের মনে হচ্ছিল যেন হিরাঝিল প্যালেসে এসে ঢুকেছেন।

'প্লিজ সিট'। এই বলে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন ক্লাইভ। ঠোঁটে গোঁজা জ্বলন্ত পাইপ। কাউন্সিলের সকল সদস্য বসলেন কুরসিতে। কয়েকজন দাখিলা এসে পলকাটা কাচের গেলাসে কাঁচা আমের শরবত নিয়ে এল। অতিথিদের আসনের পাশে রেখে গেল গড়গড়া।

পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে ক্লাইভ বললেন, 'বলুন, আপনাদের তকলিফ কী আছে?'

লং-কোটের জেবের ভিতর থেকে একটা কাগজ বের করে ড্রেক বললেন, 'লন্ডন থেকে এসে গতকাল কলকাতায় অ্যাঙ্কর করেছে হার্ডউইক ইন্ডিয়াম্যান।'

গভীর কৌতূহলের সঙ্গে ড্রেকের মুখপানে চেয়ে আছেন ক্লাইভ।

ড্রেক বললেন, 'লন্ডন থেকে এসেছেন কোম্পানির রিপ্রেসেন্টেটিভ জন স্যামসন।'

স্থির দৃষ্টিতে ড্রেকের মুখপানে চেয়ে ধোঁয়া ছেড়ে চলেছেন ক্লাইভ। ক্ষণিকের নীরবতা ঘরজুড়ে। মাথার উপরে দুলছে টানা পাখা। ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজ বেশ স্পষ্ট।

ড্রেক কাগজটা ক্লাইভের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, 'কোম্পানি সেন্ট অ্যা ডেসপ্যাচ।'

কাগজটায় চোখ রাখলেন ক্লাইভ। ক্রমশ গম্ভীর হয়ে উঠতে লাগল তাঁর মুখটা।

কোম্পানির ডিরেক্টরেরা কলকাতা কাউন্সিলের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বিষয়ে এক অর্ডার পাঠিয়েছেন। গভর্নরের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে রজার ড্রেককে। তাঁর জায়গায় নির্দিষ্ট কাউকে গভর্নর করা হয়নি। তার পরিবর্তে আজব এক সিস্টেমের কথা লিখেছেন লন্ডনের কর্তারা। দশজন মেম্বার নিয়ে এক কাউন্সিল তৈরি হবে। আর সেই কাউন্সিলের চারজন সিনিয়র মেম্বার তিন মাস করে কলকাতা কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট বা গভর্নর হবেন। এই চার সিনিয়র মেম্বার হলেন হলওয়েল, বীচার, ম্যানিংহাম ও ওয়াটস। গোটা ডেসপ্যাচে ক্লাইভের নামের উল্লেখ নেই কোথাও।

প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলেন ক্লাইভ। বাংলা থেকে প্রায় উৎখাত হতে বসা কোম্পানিকে তিনি প্রবল ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন, নিজের খায়েশের গোলাম বানালেন নবাবকে, অথচ তাঁর সাফল্যের কোনও দাম দিল না কোম্পানি? মনে মনে তিনি আশা করেছিলেন পলাশিতে কুদরতির জন্য কোম্পানি হয়তো তাঁকে কলকাতার গভর্নরের পদে বসাবে। লন্ডন থেকে আদেশনামা এল বলে।

বাংলা ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছে মোটেই নেই ক্লাইভের। গভর্নরের পদটা পেলে কলকাতায় তার থাকার একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত হয়ে যেত। কিন্তু তাঁর প্রতি এমন অবিচার কেন কোম্পানির বড় সাহেবদের? গভর্নর না হয়েও তিনিই তো কলকাতার অলিখিত গভর্নর। তাঁর সঙ্গে আলোচনা না করে আজকাল একটা সিদ্ধান্তও নিতে সাহস করে না কলকাতা কাউন্সিল। তিনি যা চান তাই মেনে নেয় কাউন্সিল। বেঙ্গল কাউন্সিল বলতে ক্লাইভকেই বোঝে নিজামত। অথচ গভর্নরের পদের উপরে অফিসিয়ালি তাঁর অধিকারকে বৈধতা দিতে কোম্পানির ডিরেক্টরদের এত কুণ্ঠা কেন? তাঁর পরিবর্তে তাঁর চেয়ে অযোগ্য চারজনকে পালা করে গভর্নরের পদটা দেওয়া হল। বোঝাই যাচ্ছে এঁদের কারও উপরেই কোম্পানির তেমন ভরসা নেই। তবুও বঞ্চিত তিনি? রাগে ও অপমানে ভিতরে ভিতরে ফুঁসতে লাগলেন ক্লাইভ। মনে মনে ঠিক করে ফেললেন, ঢের হয়েছে, আর নয়। এবারে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তিনি লন্ডনে ফিরে যাবেন। হিন্দুস্তানেই আর থাকবেন না।

গোটা ঘর জুড়ে স্তব্ধতা। কেবল মাথার উপরে শব্দ করে চলেছে টানা পাখা। বাইরে থেকে ভেসে আসছে পাখির কুজন। ক্লাইভের প্রতিক্রিয়ার জন্য অধীর হয়ে উঠেছে সকলে। কাগজটা ভাঁজ করে ঠোঁট থেকে পাইপটা হাতে নিয়ে চেয়ারের গায়ে দেহ এলিয়ে গম্ভীর মুখে ক্লাইভ বললেন, 'ডিরেক্টরেরা যখন এই বন্দোবস্ত করেছেন, তখন তা মেনে নিতে হবে। আই শ্যাল রিটার্ন টু মাদ্রাজ ফর নাউ। ফ্রম দেয়ার আই উইল গো ব্যাক টু লন্ডন ভেরি সুন।'

এ অভিমানের কথা। তবে এ কথাও সত্যি ক্লাইভকে উপেক্ষা করার জন্য লন্ডনের সাহেবদের পুরোপুরি দোষ দেওয়া যায় না। পলাশির যুদ্ধের আগে ক্লাইভ নিজেই কোম্পানির ডিরেক্টরদের চিঠিতে জানিয়েছিলেন বাংলার সমস্যার সমাধান করে দিয়ে তিনি মাদ্রাজে ফিরে যাবেন। পলাশির যুদ্ধের খবরটা কোম্পানির বড় সাহেবেরা জেনেছিলেন ঠিকই কিন্তু ক্লাইভ যে এখনও বাংলাতেই রয়েছেন, এটা তাঁরা জানতেন না। তাঁদের ধারণা ছিল, ক্লাইভ মাদ্রাজে ফিরে গিয়েছেন। তাই কলকাতা কাউন্সিলের জন্য নতুন নির্দেশিকা জারি করার সময় ক্লাইভের কথা তাঁরা ভাবেননি।

ড্রেক, বীচার, ম্যানিংহাম, হলওয়েল, ওয়াটস প্রমাদ গুনলেন। একদিকে ফরাসি আক্রমণের ভয়, অন্যদিকে সুজাউদ্দৌলা ও মারাঠাদের হানাদারির আশঙ্কা। এই অবস্থায় ক্লাইভ যদি দক্ষিণে ফিরে যান, তো কলকাতার কী হবে? কাউন্সিলের পাঁচ কর্তাব্যক্তি মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। ক্লাইভের মান ভাঙানোর জন্য কী করতে হবে, সে বিষয়ে শলাপরামর্শ অবশ্য আগেই তাঁরা সেরে এসেছেন।

ম্যানিংহাম বললেন, 'চারজন মিলে পালা করে গভর্নরগিরি করা এক হাস্যকর ব্যবস্থা। নবাব এতে কনফিউসড হয়ে যাবেন। দিস ডেসপ্যাচ উইল অলসো ক্রিয়েট ক্যাওস ইন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন।'

ওয়াটস টেবিল দাবড়ে বললেন, 'অ্যাবসোলিউটলি রাইট।'

হলওয়েল বললেন, 'উই মে ইগনোর দিস ডেসপ্যাচ।'

বীচার বললেন, 'দ্যাট শুড বি ডান রাইট নাউ।'

বিস্মিত হলেন ক্লাইভ। লন্ডনের ডেসপ্যাচ ইগনোর করা মানে? কী বলতে চাইছেন এঁরা?

ক্লাইভের মুখপানে চেয়ে ড্রেক বললেন, 'উই ওয়ান্ট ইউ অ্যাজ গভর্নর অফ ক্যালকাটা।'

ক্লাইভ বলে উঠলেন, 'না না, তা হয় না। আই ক্যাননট ডিসওবে কোম্পানিজ অর্ডার।'

হলওয়েল বললেন, 'আপনি একা নন, ডিসওবে করব আমরা সবাই। আমরা সবাই মিলে যে আপনাকে গভর্নরের চেয়ারে বসতে বাধ্য করেছি, সেটা মিনিটসে লেখা হবে। সেই মিনিটস পাঠিয়ে দেওয়া হবে লন্ডনে। তারপরে ডিরেক্টরেরা যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেবেন।'

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ক্লাইভ। এ কোন হলওয়েল? যিনি বহুদিন থেকে মনে মনে কলকাতার গভর্নরের পদটাকে কামনা করে আসছেন, ক্লাইভের প্রতিপত্তি তাঁর পথের কাঁটা ভেবে একসময়ে পদে পদে যিনি ক্লাইভের বিরোধিতা করেছেন, এই মানুষটা কি তিনিই?

ক্লাইভের চোখের দৃষ্টি আনত। হাতদুটো বুকের কাছে ভাঁজ করা।

সকলেই বিনীত ভাবে তাঁকে অনুরোধ করলেন, 'প্লিজ অ্যাকসেপ্ট দিস প্রোপোজাল।'

কোম্পানির ডেসপ্যাচ অগ্রাহ্য করলে ডিরেক্টরদের প্রতিক্রিয়া কী হবে ক্লাইভ তা জানেন না, তাঁকে কলকাতার গভর্নর হিসেবে কোম্পানি অফিসিয়ালি যে মেনে নেবে, তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই—এসব নিয়ে ভাবনাও ক্লাইভের তেমন নেই। তবে তাঁর কলিগসরা দমদমার বাড়িতে ছুটে এসে একযোগে যে ভাবে গভর্নরের পদটা তাঁকে অফার করে তাঁর প্রতি সম্মান দেখালেন তা এককথায় অভূতপূর্ব। ক্লাইভ অভিভূত। বললেন, 'ওয়েল। অ্যাজ ইউ অল আর রিকোয়েস্টিং আই এগ্রি উইথ দিস প্রোপোজাল।'

একসঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠলেন ড্রেক, হলওয়েল, বীচার, ম্যানিংহাম ও ওয়াটস।

কিছুক্ষণ পর কাউন্সিলের সদস্যদের সঙ্গে ক্লাইভও ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে চললেন ফোর্ট উইলিয়ামের উদ্দেশে। সন্ধের মুখে কলকাতা কাউন্সিলের জরুরি মিটিং বসবে।

ফোর্ট উইলিয়ামের সদর দেউড়িতে প্রস্তুত হয়েছিল ফৌজি ব্যান্ড। ঘোড়া থেকে ক্লাইভকে নামতে দেখেই ব্যান্ডে বেজে উঠল রুল ব্রিটানিয়া। কেল্লার ভিতরে প্রবেশ করলেন ক্লাইভ।

ক্লাইভের হাত ধরে গভর্নরের চেয়ারে তাঁকে বসিয়ে দিলেন রজার ড্রেক।

ফোর্ট উইলিয়াম থেকে তোপ গর্জন করে উঠতে লাগল ঘন ঘন।

রাতারাতি ঢোল শোহরত হল সুতানুটি-কলকাতা-গোবিন্দপুর জুড়ে। কলকাতার গভর্নর হয়েছেন সাবিৎ জঙ্গ, নওশেরউদ্দৌলা, কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ।

খুশিতে মাতল গোটা কলকাতা।

৫৬

ফরাসের উপরে কাত হয়ে শুয়ে আছেন মিরজাফর। হাতে ফরসির নল। পাশে রয়েছে গড়গড়া। সামনে রাখা রুপোর রেকাবিতে উপচে পড়ছে তেল চপচপে ভাজা মাংসের টুকরো। আরেকটি রেকাবির উপরে রাখা শরাবের বোতল ও কাট গ্লাসের পানপাত্র। মাথার উপরে ঝুলছে অতিকায় সুদৃশ্য ঝাড়বাতি। দুলছে টানা পাখা। জাফরি গলে ঢুকে আসা ভাগীরথীর হাওয়ায় থিরথির করে কাঁপছে বেলোয়ারি ঝাড়ের মোমবাতির শিখা, কুলুঙ্গিতে জ্বলতে থাকা চিরাগবাতি। নবাবের পোষা কাবলি বেড়াল গুটি পাকিয়ে শুয়ে আছে নবাবের পায়ের কাছে। জুলজুলে চোখে চেয়ে আছে একটা দেওয়ালগিরির আলোকে ঘিরে উড়তে থাকা একটি পতঙ্গের দিকে।

নেশার ঘোর নবাবের চোখে, তবে চেতনা অবসন্ন নয়। মন তোলপাড়। তীব্র অশান্তিতে ভুগছেন নবাব। এই অশান্তির কারণ রায়দুর্লভ। নবাবের দুশ্চিন্তা, সত্যিই কি ইংরেজদের মদতে রায়দুর্লভ তাকে মসনদচ্যুত করবেন? ফের ইনকিলাব হবে মুর্শিদাবাদে?

নবাবের সমুখে ফরাসের উপরে হাঁটু মুড়ে বসে আছেন নন্দকুমার। রায়দুর্লভের দেওয়ান। তাঁকে একান্তে ডেকে পাঠিয়েছেন নবাব। তিনি জানেন নন্দকুমারের নজর আছে দেওয়ানের পদের উপরে। পদোন্নতির লোভ দেখিয়ে তাঁকে কাছে টেনেছেন নবাব।

জ্বলজ্বল করছে নন্দকুমারের চোখদুটো। নবাবের কাছ থেকে যে গোপন বার্তা তিনি পেয়েছিলেন, তাতে ছিল তাঁর স্বপ্নপূরণের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। নন্দকুমার খুশিতে ভাসছেন, এবারে নিশ্চয়ই নসিবের চাকা ঘুরবে।

রায়দুর্লভ মনে করেন, তাঁর অতি বিশ্বস্ত কর্মচারী নন্দকুমার। কিন্তু তিনি যে নবাবের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছেন, দেওয়ান পদটার উপরে তাঁর নজর রয়েছে, এসবের বিন্দুমাত্র আঁচ পাননি রায়দুর্লভ। তিনি নবাবের কাছে নন্দকুমারকে পাঠালেন বিশেষ একটা কাজে। একই সঙ্গে নবাবের গোপন তলব পেলেন নন্দকুমার। দুটি বিষয় কাকতালীয়।

নবাব বললেন, ‘সেপাইরা পাটনা থেকে ফিরে হুজ্জুতি বাধিয়েছে শুনেছেন তো?’

‘জি হুজুর।’ জবাব দেন নন্দকুমার।

‘কারণটা কী জানেন?’

‘জি হুজুর। দেওয়ানখানা থেকে সেপাইদের পাওনাগণ্ডা মেটানো যায়নি।’

‘দেওয়ানখানার জাবেদা খাতা তো আপনার হেফাজতেই থাকে।’

‘জি হুজুর।’

‘সেপাইদের মাহিনা বাকি কেন? সত্যিই কি তোশাখানায় টাকা নেই?’

‘টাকা যথেষ্টই আছে হুজুর। হালে তামাম বাংলার শালিয়ানা জমা পড়েছে।’

‘তাহলে?’ প্রশ্ন করেন নবাব।

‘গোস্তাকি মাফ করবেন হুজুর। দেওয়ানজিকে ডেকে এ বিষয়ে পুছতাছ করলে ভালো হয়।’

ফরসির নলটা ছুড়ে ফেলে শরাবের পাত্র হাতে নিয়ে মিরজাফর বললেন, ‘দেওয়ানজিকে ডেকেই যদি শুধোব তো আপনাকে তলব করলাম কেন?’

সামান্য ইতস্তত করে নন্দকুমার বললেন, ‘রায়দুর্লভজি এখন নিজামতের টাকা সরিয়ে নেওয়ার মতলবে আছেন। কোনও খরচই মঞ্জুর করছেন না। তবে আমি কড়া নজর রেখেছি। দেওয়ানখানার কয়েকজন কর্মচারীকেও হুঁশিয়ার করে রেখেছি। তোশাখানার টাকা যেন তছরুপ না হয়।’

‘তোশাখানায় এখন কত টাকা আছে তার হিসেব আমার চাই। আপনি দিতে পারবেন তো?’

‘বেশক পারব হুজুর।’

‘ইংরেজদের সঙ্গে দেওয়ানজির কী গুফতগু চলছে, সেই পয়গামও আমার চাই।’

‘দেওয়ানজি কলকাতা যেতে চান। আপনার ইজাজত চেয়েছেন।’

এই বলে কোমরবন্ধনী থেকে একটা কাগজ বের করে নবাবের হাতে তুলে দিলেন নন্দকুমার।

‘কভি নেহি। আপনি এই আরজি মঞ্জুর করবেন না আব্বাহুজুর।’

দু’জনের আলোচনার মধ্যে সহসা তৃতীয় মানুষের অনুপ্রবেশে চোখ তুলে তাকালেন মিরজাফর খাঁ। চমকে ঘুরে তাকালেন নন্দকুমার। দু’জনের অজান্তে ঘরে প্রবেশ করেছে মিরন। নবাবজাদার কাঁধে বসে আছে তার পোষা বাজপাখি। কাঁধ থেকে পাখিটাকে হাতে নিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে মিরন বলল, ‘নিজামতের দৌলত নিয়ে কলকাতা পালানোর ফন্দি করছেন রায়দুর্লভজি।’

মিরজাফর বললেন, ‘সে খেয়াল রাখবেন নন্দকুমার।’

'দেওয়ানজির আর্জি মঞ্জুর করবেন আপনি?' বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করে মিরন।

'চোখের নজর থেকে আপদ বিদায় হওয়াই তো ভালো।'

মিরন বলল, 'আপনি হুকুমত দিলেও রায়দুর্লভজিকে কলকাতা যেতে দেব না আমি। পহেলে উনি সেপাইদের পাওনা মেটাবেন, তারপরে অন্য কথা। এই আমি সাফ বলে রাখলাম।'

মিরনের কথায় সায় দিয়ে নন্দকুমার বললেন, 'নবাবজাদা সহি বাত বলছেন।'

'আনেওয়ালা তিন দিনের মধ্যে দেওয়ানজি যদি সেপাইদের পাওনা না মেটান তো ফির হামলা করব দেওয়ান সাহেবের হাভেলিতে। বেশক কোতল করে ছাড়ব।'

বাপ-বেটার বাতচিতের মধ্যে থাকা কাম্য নয় ভেবে নন্দকুমার বললেন, 'আমি আসি হুজুর?'

নবাব বললেন, 'আসুন। হুঁশিয়ার থাকবেন। যা বললাম, ইয়াদ রাখবেন।'

'জি হুজুর।' নবাবকে তসলিম জানিয়ে বিদায় নিলেন নন্দকুমার।

মিরন বলল, 'এক খুশখবর আছে আব্বাহুজুর।'

কাবলি বেড়ালের লোমশ গায়ে হাত বোলাচ্ছিলেন নবাব। চকিতে মুখ তুলে তাকালেন।

'জাঁ ল-কে একটা চিঠি লিখেছিলাম আমি।'

চমকে উঠলেন নবাব। এ বিষয়ে কিছুই তিনি জানতেন না।

'আমাকে না জানিয়ে কেন চিঠি দিলে বেটা? রায়দুর্লভ, রামনারায়ণ, রাজারাম সবাই এখন ইংরেজদের ঘুঁটি। চারিদিকে ঘুরছে কাসিদ । তোমার চিঠির কথা ফাঁস হয়ে গেলে ফের চোখ রাঙাবে ইংরেজরা। গুসসা হবে ক্লাইভ সাহেবের।'

ক্লাইভভীতিতে ফের আচ্ছন্ন হলেন নবাব। অদ্ভুত দোলাচল মন তাঁর। কখনও ক্লাইভের মুঠো থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন, ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা ভাবেন, পরক্ষণেই আবার ভয়ে কুঁকড়ে যান।

নবাবের কথা শুনে হেসে ওঠে মিরন বলে, 'নসিবের চাকা ঘুরছে আব্বাহুজুর। এবারে ইংরেজদের তাড়াব। লালমুখো ইবলিশদের ভাগীরথীর পানিতে ডুবিয়ে মারব।'

'কী করে? সেই তাগদ কোথায় আমাদের?'

'তাগদ জোগাবেন জাঁ ল। তাগদ জোগাবে ফরাসিরা। দক্ষিণের পয়গাম জানেন?'

'কী পয়গাম?'

'মুসিবতের মধ্যে পড়েছে ইংরেজ। ফরাসিদের সঙ্গে লড়াইয়ে জেরবার।'

মুসিবত? ইংরেজদের মুসিবত? উৎসাহিত হয়ে ওঠেন নবাব। তাঁর মন নেচে ওঠে ইংরেজদের নাগপাশ ছিন্ন করার আশায়। ক্ষণেক আগে দেহের অভিব্যক্তিতে ফুটে ওঠা সন্ত্রস্ত ভাবটা দূর হয়ে যায়। উত্তেজনায় হাতে ধরা পাত্র থেকে শরাব ছলকে পড়ে নকশাদার গালিচায়। 'সচ বলছ?'

'বিলকুল সচ। জাঁ ল লিখে পাঠিয়েছেন। বেনারস থেকে চিঠিঠি নিয়ে এসেছে অঙ্গন সিং।'

এই বলে জেবের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে চিঠিটা বের করে মিরজাফরের হাতে তুলে দেয় মিরন।

চিঠি পড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়েন নবাব। মনিবের মনোযোগ হারিয়ে কাবলি বেড়ালটা নবাবের কোল থেকে লাফিয়ে নামে গালিচার উপরে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মিরনের কাঁধে বসে থাকা বাজপাখিটার দিকে। মিরনের ঠোঁটের কোণায় হাসি। সে চেয়ে আছে তার আব্বাহুজুরের মুখপানে। ধীরে ধীরে নবাবের বিমর্ষ মুখটা খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

জাঁ ল লিখেছেন, '...ইংরেজদের সম্বন্ধে নবাবের মোহভঙ্গ হয়েছে জেনে খুশি হলাম। আপনি লিখেছেন ইংরেজরা আপনাদের আজাদি কেড়ে নিয়েছে। এমন যে হবে তা আমি আগেই আন্দাজ করেছিলাম। যাই হোক জনাব, জানবেন, আপনাদের মদত দেওয়ার জন্য ফরাসিরা তৈয়ার আছে। ইংরেজরা কারও দোস্ত হয়

না। ফরাসিরা অনেক দিলখোলা মানুষ। দোস্তির কিম্মত বোঝে। ইংরেজদের মতো হরপল কৌশল করে না। আমাদের সঙ্গে দোস্তি হলে তফাৎটা আপনারা বুঝবেন। সিরাজদ্দৌলার আমল পর্যন্ত নিজামতের নিয়মকানুন মেনেই আমরা সওদা করেছি। ইংরেজরা কোনও নিয়মেরই তোয়াক্কা করে না। ইংরেজদের যদি আমরা এদেশ থেকে উৎখাত করতে পারি তো দেখবেন আমরা শুধু সওদাই করব, নিজামতের কোনও বিষয়ে হস্তক্ষেপ করব না।

'আপনি শুনলে খুশি হবেন, যে দক্ষিণে আমাদের হাতে জোর মার খাচ্ছে ইংরেজরা। ফোর্ট সেন্ট ডেভিড ইংরেজদের হাত থেকে আমরা কেড়ে নিয়েছি। কাউন্ট লালির নেতৃত্বে আমরা ওখানে দারুণ ভাবে এগোচ্ছি। আশা করছি মঁসিয়ে লালি দক্ষিণের সব ঘাঁটি থেকে ইংরেজদের উচ্ছেদ করে ছাড়বেন। তারপরে তিনি বেঙ্গলে আসবেন। আপনারা ইংরেজবিরোধী শক্তিকে মজবুত করতে থাকুন। আশা করছি খুব শিগগিরই আমাদের দু'পক্ষের জন্যই সুদিন ফিরবে বাংলায়...'

চিঠিটা মিরনের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে ভাজা মাংস মুখে ফেলে আয়েস করে চিবিয়ে মিরজাফর বললেন, 'সবই খোদাতালার মেহেরবানি বেটা।'

'আব্বাহুজুর, এই ওয়াক্তে রাজারাম-রামনারায়ণ-রায়দুর্লভ-ইবলিশের এই তিন আওলাদকে খতম করব। পহেলে দেওয়ান রায়দুর্লভ। ফের মওত নাচাব রাজধানীতে।' এই বলে হেসে উঠল মিরন। তার চোখমুখ ভয়ানক হিংস্র হয়ে উঠল। কাঁধে বসে থাকা প্রিয় বাজপাখির গায়ে হাত বুলিয়ে পাখির উদ্দেশে শুধোয়, কী রে বেগমজান মওত নাচবে তো?

কর্কশ স্বরে ডেকে উঠল পাখি। বড় মনহুশ আওয়াজ।

মিরন বেরিয়ে গেল কক্ষ থেকে।

শরাবের বোতলটা হাতে নিয়ে তলানিটুকু একবারে গলায় ঢেলে দিলেন নবাব। টান দিলেন ডোরিতে। ছুটে এল সাকি।

'শরাব লে আও।'

হঠাৎই যেন নবাবের শরীরে নয়া জোশ এসেছে। ধমনীতে তিরবেগে ছুটছে রক্ত। এই খুনজোশি খুশির। ক্লাইভের মুঠো থেকে বেরিয়ে এসে আজাদ চিড়িয়ার মতো আসমানে ডানা মেলার খোয়াবের। বিপাকে পড়েছে ইংরেজরা। মসিহা মঁসিয়ে লালি। সত্যিই বড় খুশির খবর শুনিয়ে গেল মিরন। দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে নবাবের মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত দীর্ঘদিনের অবসাদ।

নেশা জমাট বাধার পর টলমল পায়ে উঠে দাঁড়ালেন নবাব। তাঁর বেসামাল অবস্থা দেখে সাহায্যের জন্য ছুটে এল এক দাখিলা। হাতের ইশারায় তাকে সরে যেতে বলেন নবাব। নিজেই এলোমেলো পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন।

জেনানামহলের অন্দরে অলিন্দের পাশে দাঁড়িয়ে আসমানে চাঁদের পানে উদাস দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন মণি বেগম। কালো মেঘ এসে ধীরে ধীরে ঢেকে ফেলছে চাঁদকে। পরক্ষণেই মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে চাঁদ। মণি বেগম ভাবছিলেন ইনসান যেন এই চাঁদের মতো। ইতস্তত উড়ে বেড়ানো কালো মেঘ যেন বদ কিসমতি। থেকে থেকে ইনসানকে গহীন আঁধারে ডুবিয়ে দেয়।

'মণি!'

নবাবের গলার ঘুরে তাকালেন মণি বেগম। টলমল পায়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসেন নবাব।

'সরতাজ!' দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে নবাবের হাতটা ধরেন মণি বেগম।

'আজ বড় খুশির দিন মণি। খবরটা নিজের মুখে শোনাতে এলাম তোমাকে।'

দছমালে নবাবের কপালের ঘাম মুছে মণি বেগম বললেন, 'বড্ড ঘেমেছেন। হেকিমসাহেব বলেছেন শরাব আপনার জন্য খতরনক। তবুও আপনি শুনবেন না কোনও কথা।'

'নিষেধ করো না মণি। আজ খুশিকা দিন।'

সিরাজদ্দৌলার বিয়েতে নাচনেওয়ালি মণি বাই মুর্শিদাবাদে মুজরো করতে এসে ধরা পড়েছিল সিপাহসালার মিরজাফরের হাতে। সেদিন বয়সে প্রবীণ মিরজাফরকে মন থেকে গ্রহণ করতে পারেনি সে। তবু পুরুষের মন ভোলাতে ছলাকলায় দক্ষ ষোড়শী মণি বাই প্রৌঢ় মানুষটার কামনার আগুনে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল সুখ খরিদের নেশায়। তারপর ভাগীরথীর খাত বেয়ে গড়িয়ে গিয়েছে অনেক জল। মণি বাইয়ের নসিব বদলেছে। পশ্চিমদেশের গরিব ঘরের মেয়ে সেই মণি বাই আজ সুবে বাংলার নবাব-বেগম।

ক্ষমতা, অর্থ, প্রতিপত্তি সবই আজ পেয়েছে মণি। সে সব কিছুই মিরজাফরকে কেন্দ্র করে। মানুষটাকে একটু একটু করে ভালোবেসেছে মণি। সেই ভালোবাসার মধ্যে শরীরী আবেগ নেই, কামনার আগুন নেই, আছে সুখ ও নিরাপত্তা খরিদ করার চিরন্তন আকুতি। মণি চায় আরও অনেক কাল মুর্শিদাবাদের মসনদে বহাল থাকুন মিরজাফর খাঁ। তাহলে সহি সালামত থাকবে সে। সহি সালামাত থাকবে মিরজাফর খাঁর ঔরসজাত তাঁর দুই পুত্র নজম ও সইফ। ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠুক নজম ও সইফ, তাগদবাজ হয়ে উঠুক। মিরজাফরের অবর্তমানে তাদের আঁকড়ে ধরে সুখ দরিয়ায় ভাসতে চান মণি বেগম। যে অর্থ, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি কোনওদিনও পাওয়ার কথা ছিল না মণির, নসিবের কুদরতিতে সেসব সে পেয়েছে। মণি সুখের কাঙাল। এই পড়ে পাওয়া সুখকে কিছুতেই হারাতে চায় না সে।

মুর্শিদাবাদের রাজনীতি যে খাতে ইদানীং বইছে তা নিয়ে বড় চিন্তিত থাকেন মণি বেগম। রায়দুর্লভ, রামনারায়ণ, রাজারামকে কাছে টেনে নিজামতের শাসনযন্ত্রকে ভাঙন ধরানোর খেলায় মেতেছেন ক্লাইভ। ক্রমশ হতাশায় ডুবছেন মিরজাফর খাঁ। এই হতাশা ভুলতে বড় বেশি করে আজকাল আঁকড়ে ধরছেন শরাবকে। অথচ হেকিমসাহেব বারবার তাঁকে নিষেধ করছেন শরাব ছুঁতে। শরাব নবাবের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

মণি বেগম শুধোলেন, 'কীসের খুশি নবাব?'

মণি বেগমের কথার জবাব দিলেন না মিরজাফর খাঁ। প্রবল আবেগে মণি বেগমকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে চুম্বনে চুম্বনে অস্থির করে তুললেন।

শিহরিত হয়ে ওঠেন মণি বেগম। দু'হাতে আঁকড়ে ধরে নবাবকে। এভাবেই সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, তাগদ, জোশ সব কিছুকে নাছোড় জেদে আঁকড়ে ধরতে চায় ইনসান।

দুপুরের খরতাপে দগ্ধ পথঘাট। কাশিমবাজার থেকে মুর্শিদাবাদের দিকে ছুটে চলেছে একটা আট বেহারার পালকি। দরদর করে ঘামছে কাহারেরা। তারা ছুটছে দ্রুত। আরোহীকে দ্রুত হিরাঝিলে পৌঁছে দিতে পারলে বাড়তি বখশিস মিলবে। আট কাহারের মুখের হুনহুনা হুনহুনা শব্দে দুপুরের স্তব্ধতা ভেঙে চুরমার।

পালকির সামনে ও পিছনে চলেছে চারজন করে বন্দুকধারী গোরা ঘোড়সওয়ার। এক ঘোড়সওয়ারের হাতে উড্ডীন কোম্পানির পতাকা। পালকির চলার ছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ধীর গতিতে চলেছে ঘোড়সওয়ারেরা। পালকির অন্দরে আধশোয়া উইলিয়াম ওয়াটস। গরমে হাঁসফাঁস করছেন। ক্লাইভের জরুরি বার্তা নিয়ে তিনি চলেছেন নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

মুর্শিদাবাদ নগরীতে প্রবেশের মুখে পথের পাশে উঁচু একটা ঢিবির উপরে দাঁড়িয়ে পালকি ও ঘোড়সওয়ারদের দেখছিল মাঝবয়সি একটা লোক। পরনে ময়লা জোব্বা। দুকানে হিরের দুল। গলা থেকে ঝুলছে দামি পাথরের একাধিক মালা। মাথার চুল এলোমেলো। মুখে অযত্নে বেড়ে ওঠা খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি। লোকটার উন্মাদ দশা। আপনমনে কী সব বিড়বিড় করে চলেছে সে। ধকধক করে জ্বলছে কোটরে ঢোকা চোখদুটো।

লোকটা অচানকই একটা পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে পালকি লক্ষ্য করে ছুড়ে মারল গায়ের সর্বশক্তি দিয়ে। ‘ঠকাস’ শব্দে পাথরের টুকরোটা এসে পড়ল পালকির ছাতের উপরে। চমকে উঠলেন ওয়াটস। হইহই করে উঠল গোরা পল্টনেরা। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কাহারেরা।

উন্মাদ লোকটা এক দৌড়ে টিবির উপর থেকে নেমে এসে গোরা পল্টনদের মুখোমুখি দাঁড়াল ও তাদের সঙ্গে মারমুখী মেজাজে তুমুল ঝগড়া বাধিয়ে দিল।

আচমকা এই উৎপাতে থতমত খেয়ে কাহারেরা পালকি নামিয়ে রাখল মাটিতে। ব্যাপারটা কী বোঝার জন্য পালকি থেকে বেরিয়ে এলেন ওয়াটস। তাঁর মনে হল এই উন্মাদ লোকটা তার খুবই যেন পরিচিত। সহসা সকলকে হতচকিত করে দিয়ে ছুটে এসে ওয়াটসের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটা। শীর্ণ দুই হাতে ওয়াটসের গলা টিপে ধরল। আচমকা এই আক্রমণে বেসামাল হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন ওয়াটস। লোকটি তখন চিৎকার করছে, ‘বেতমিজ শয়তান, তোরা সিরাজকে বরবাদ করেছিস, আমাকে ঠকিয়েছিস, লাল কাগজ! লাল কাগজ! মনে পড়ে? লাল কাগজ!’

হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠে গোরা পল্টনেরা এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটার উপরে। টেনে হিঁচড়ে সরিয়ে আনল তাঁকে। এতক্ষণ চেনা চেনা ঠেকছিল, ‘লাল কাগজ’ কথাটা স্পষ্ট চিনিয়ে দিল লোকটাকে। উমিচাঁদ! ক্লাইভের পরিকল্পনায় প্রতারিত হয়ে টাকার শোকে উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন।

পথের মধ্যে গোলমাল দেখে ছুটে এল কোতোয়ালির সেপাইরা। তাদের হাতে উমিচাঁদকে তুলে দিল গোরা পল্টনেরা। সেপাইদের হাতে বন্দি উমিচাঁদ তখনও চেঁচাচ্ছেন, ‘...এই ইংরেজরা শয়তান—এদের ছলচাতুরীতে ভুলো না কেউ। এই খরিশের বাচ্চারা, সিরাজকে খুন করেছে, এবারে মসনদটা দখল করবে, পাথর ছুড়ে মারো ওদের, মুর্শিদাবাদ থেকে তাড়িয়ে দাও। পাথর ছুড়ে মারো, থেঁতলে দাও, মারো মারো...’

৫৭

পথে আর কোনও গোলমাল হয়নি। হিরাঝিল প্রাসাদে এসে থামল পালকি। ভাদুরে গরমে গলদঘর্ম স্থূলকায় উইলিয়াম ওয়াটস পালকি থেকে বেরিয়ে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। গলার কাছে গোলাপি চামড়ার গায়ে উমিচাঁদের আঙুলের ছাপ এখনও স্পষ্ট হয়ে আছে। দম প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছিল ওয়াটসের। গলায় হাত বোলালেন তিনি। এখনও বেশ ব্যথা রয়েছে। টনটন করছে ডান হাত ও কাঁধের সংযোগস্থল। মাটিতে পড়ে গিয়ে চোট লেগেছে।

ওয়াটসের আগমন সংবাদ নবাবকে আগেই চিঠিতে জানিয়ে রেখেছিলেন স্ক্র্যাফটন। কিন্তু কেন যে হঠাৎ কলকাতা থেকে ওয়াটস মুর্শিদাবাদে আসছেন সে বিষয়ে কিছু লেখেননি। দুশ্চিন্তায় রয়েছেন নবাব। সবোরোজ তাঁকে লবেজান করার নানা ফন্দি এঁটে চলেছে ইংরেজরা। এই তো সবে ক্লাইভের সঙ্গে কলকাতায় ফিরলেন ওয়াটস। এর মধ্যেই আবার মুর্শিদাবাদে ছুটে আসা কেন? ফের কি নতুন কোনও মতলব?

দরবার ঘরে প্রবেশ করলেন ওয়াটস। নবাবকে তসলিম জানিয়ে হাসিমুখে বললেন, ‘কর্নেল ক্লাইভ সাহেবের চিঠি নিয়ে আমি কলকাতা থেকে আসছি হুজুর।’

ক্লাইভের চিঠি! ফের কী মতলব? ভিতরে ভিতরে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন নবাব। বহিরঙ্গে গাম্ভীর্য বজায় রেখে শুধোলেন, ‘কী লিখেছেন কর্নেল? খাস পয়গাম কী আছে?’

‘বহুত খুশি কি বাত। আপনাকে কলকাতা যেতে হবে। কর্নেলের আবদার।’

‘আবদার? কেন?’

‘দাওয়াত পাঠিয়েছেন ক্লাইভ সাহেব।’

‘দাওয়াত?’ মিরজাফর খাঁ বিস্মিত।

‘কোম্পানি আপনাকে সম্মান জানাতে চায়।’

হঠাৎ এমন আবদার কেন? বিস্ময়ে চোখের পলক পড়ে না নবাবের।

আমরা তো আপনার গোলাম হুজুর। গোলামলোগের এই আবদার মঞ্জুর করবেন আশা করি।’

এই বলে ক্লাইভের চিঠিটা নবাবের দিকে বাড়িয়ে দিলেন ওয়াটস।

চিঠির বয়ানে চোখ রাখলেন নবাব। ক্লাইভ লিখেছেন ‘... হুজুর আপনি শুনলে খুশি হবেন যে আমি কলকাতা কাউন্সিলের গভর্নর হয়েছি। আমার এই খুশির ওয়াক্তে কোম্পানির তরফ থেকে আপনাকে আমরা সম্মান জানাতে চাই। কৃপা করে যদি একবার কলকাতা এসে কোম্পানিকে আপনার সেবা করার সুযোগ দেন তো খুশি হব। আপনাকে খোশআমদেদ করে কলকাতায় নিয়ে আসার জন্য আপনার বহুত পুরোনো দোস্ত উইলিয়াম ওয়াটসকে পাঠালাম। আশা করি আমার এই আরজু আপনি মঞ্জুর করবেন।...’

দুশ্চিন্তার মেঘটা আপাতত সরে গেল নবাবের মনের উপর থেকে। কথার প্যাঁচে স্নায়ুর চাপ তৈরি করে তার কাছ থেকে টাকা আদায়ের কোনও ফন্দিফিকির নয়। চোখরাঙানি নয়, ধমকানি বা চমকানিও নয়। কোনও শারারতি নয়। ক্লাইভের চিঠির ছত্রে ছত্রে রয়েছে একান্ত আনুগত্য। এমন আনুগত্য পলাশির যুদ্ধের পরে কখনও দেখাননি ক্লাইভ।

নবাব বুঝলেন, ফরাসিদের হাতে মার খেয়ে ভয় পেয়েছে ইংরেজরা। তাই খাতিরের এই বহর। খুশি উপচে পড়তে লাগল নবাবের চোখেমুখে। এতকাল তিনিই কেবল ভয় পেয়ে এসেছেন ইংরেজদের। আজ সত্যিই নসিবের চাকা ঘুরছে। ভয় পেয়েছে ইংরেজরা। এ সম্ভব হয়েছে কাউন্ট লালির সৌজন্যে! তিনিই এখন নবাবের কাছে পয়গম্বরের দূত। আশমানের ফেরেস্তা।

মনস্থির করে ফেললেন নবাব। তিনি যাবেন কলকাতায়। এ যাত্রায় কোনও লড়াই, ঝামেলা, হুজ্জুতি নেই। আছে শুধু ফরহাত-আশরতের উমিদ। সেই সঙ্গে রয়েছে যাত্রাপথে হুগলির ফৌজদার ওমর বেগ ও চুঁচুড়ার ডাচদের কাছ থেকে নজরানা আদায়ের আশা। ডাচদের সঙ্গে একপ্রস্থ আলোচনাও সেরে নেওয়া যায়, কাউন্ট লালি বাংলায় এলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নবাবকে তারা মদত দেবে কি না। ইংরেজদের একচেটিয়া ব্যাবসা ডাচদেরও তো তকলিফ বাড়াচ্ছে।

নবাব বললেন, ‘ক্লাইভ সাহেবকে জানাবেন তাঁর দাওয়াত আমি গ্রহণ করলাম।’

‘বান্দা এই খুশখবর ফওরান কলকাতায় লিখে পাঠাবে।’ শির ঝুঁকিয়ে বললেন ওয়াটস।

মুর্শিদাবাদ থেকে দূত ছুটল ঢাকায়। নবাব সদলবলে কলকাতায় যাবেন। ঢাকার নওয়ারার দারোগা বিরাট এক নৌবহর পাঠিয়ে দিলেন। কিছুদিন পরে অগ্রদ্বীপের ঘাটে এসে ভিড়ল এই নৌবহর। নবাবের বিলাসবহুল বজরাসহ আরও অনেকগুলি বজরা, সুলুপ, পানসি ও বড় বড় মালবাহী নৌকো।

কয়েকদিন পরে সদলবলে রওনা হলেন নবাব। সঙ্গে মোসাহেবের দল, কসবি, বাইজি, গোলাম, বাঁদি, বাবুর্চি, খানসামা, খাজাঞ্চি, হুকোবরদার, ছাতাবরদার, মুটে-মজুর ও আরও হরেক কিসিমের লোকলস্কর। কলকাতা শহর আগে কখনও দেখেননি মণি বেগম। দুই পুত্র নজম ও সইফকে নিয়ে এই যাত্রায় তিনিও চলেছেন নবাবের সঙ্গে। পালকিতে বসে চিলমন পর্দার ফাঁক দিয়ে মুর্শিদাবাদ শহরের প্যালেস, হাভেলি, চকবাজারের পথঘাট, মানুষজন, গাড়িঘোড়া সবকিছু যেন নতুন চোখে দেখছিলেন মণি বেগম। বহুকাল পরে জেনানামহল ছেড়ে বাইরে পা রাখা। মণি বেগমের মনে পড়ে যায় সেই দিনটার কথা।

তখন সবে দিনের আলো ফুরিয়ে গিয়ে আঁধার নামছে চকবাজারে। একে একে পথের ধারের বাতিগুলো জ্বেলে দিচ্ছে বাতিকরেরা। ব্যস্ত পথের দুধারের বিপণিগুলো ঝলমল করছে শামাদানের আলোয়। দিল্লি থেকে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে বাইজি বিশু বেগের দলবল পৌঁছেছে মুর্শিদাবাদে। চকবাজারের পথ দিয়ে ছুটছে চার-

পাঁচখানা জেনানাপালকি। নবাব আলিবর্দি খাঁর দৌহিত্র সিরাজের বিয়েতে মুজরোর দাওয়াত নিয়ে এসেছে বিশুবেগ। এই পথ দিয়েই নিজামতের সেপাইরা সেদিন খাতিরদারির সঙ্গে পালকি বয়ে নিয়ে চলেছিল মুসাফিরখানার উদ্দেশে। সেদিনও পালকিতে বসে অবাক চোখে সুবে বাংলার রাজধানীর রংঢং, জাঁক-জমক-জলুস অবাক চোখে দেখেছিল ষোলো বছরের এক কিশোরী। বিশুবেগের মেয়ে বব্বুর বাঁদি। মণি বাই।

মণি বেগমের মনে হল, রঙেঢঙে চকবাজার সেই একইরকম আছে। কিন্তু অনেক বদলে গিয়েছেন তিনি। প্রথম যেদিন মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন, সেদিন সুখ ছিল না জীবনে, ছিল না নিজের ভাবীকাল নিয়ে কোনও ভাবনা। আজ জলুসে, দৌলতে, তাগদে, সুখে ভরপুর মণি বেগম। কিন্তু মাথায় একরাশ ভাবনা। ভাবনা নবাবকে নিয়ে, নজম-সইফের ভবিষ্যৎ নিয়ে।

যখন আঁধার নামে, কেউ কালি ঢেলে দেয় ভাগীরথীর রুপোলি জলে, সে সময় কোনও কোনওদিন মণি বেগম হিরাঝিল প্যালেসের অলিন্দে পায়চারি করেন একাকী। মাথার উপরে উন্মুক্ত আকাশের বুকে ফুটে ওঠে দু-একটা তারা। কালচে মেরে যাওয়া গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে বেগম সাহেবার চোখে দৃশ্যমান হয় দূরে চলমান এক চিরাগের আলো। ওই জায়গাটা খোশবাগ। রোজ সন্ধেবেলা আলো হাতে সিরাজের সমাধিকে প্রদক্ষিণ করে লুৎফা। এগিয়ে চলেছে নবাব-বেগমের পালকি। মণি বেগমের নজর থেকে সহসা যেন হারিয়ে গেল চকবাজারের জলুস। মনের পর্দায় ভেসে ওঠে সন্ধেরাতের সেই চিরাগবাতি, লুৎফার মুখ। নিজের অজান্তেই মণি বেগম কেঁপে ওঠেন। এর নাম ভয়। দহসত।

বাইরে তখন তুমুল হুল্লোড়। চকবাজার তাজ্জব হয়ে দেখছে, অভূতপূর্ব খাতিরদারির সঙ্গে নবাবকে কলকাতায় নিয়ে চলেছে ইংরেজরা। নবাবের পিছনে ঘোড়ায় চেপে চলেছেন উইলিয়াম ওয়াটস। তাঁর পিছনে নবাবের বিশাল বাহিনী। একেবারে সামনে ও পিছনে চলেছে দুই দল গোরা পল্টন। ফৌজি ব্যান্ডে বাজছে খুশির সুর। এভাবে অগ্রদ্বীপ পর্যন্ত যাবেন নবাব। তারপরে বজরায় চড়ে কলকাতা।

আগে থেকেই মিরন প্রস্তুত রেখেছিল সেপাইদের। নবাব মুর্শিদাবাদ ছেড়ে বেরোতে না বেরোতেই বিরাট এক ফৌজ নিয়ে সে রায়দুর্লভের হাভেলি অবরোধ করল।

দোতলার অলিন্দ থেকে একঝলক দৃশ্যটা দেখে ত্রস্ত হয়ে পড়লেন রায়দুর্লভ। চারিদিকে থিক থিক করছে হাতিয়ারবন্ধ সেপাই। মিরনও হাজির অকুস্থলে। সেপাইরা ক্ষিপ্ত। তারা চিৎকার করছে, 'তনখা নিকালো। মাহিনার কড়ি নিকালো।'

এই সেপাইরা অনেকেই মিরজাফরের সঙ্গে পাটনা অভিযানে গিয়েছিল। মজুরি পায়নি। এদের বেশ কিছুদিন ধরেই উসকাচ্ছিল মিরন—'দেওয়ানজি তোদের বেতন মঞ্জুর করছেন না। গোপনে তিনি নিজামতের কড়ি চালান করছেন কলকাতায়। নিজেও কলকাতায় পালিয়ে যেতে চান। বেতনের কড়ি জোর করে কেড়ে নিতে না পারলে তোরা ভুখা মরবি।'

এই দাওয়াইয়ে কাজ হয়েছে। খানিক দূরে হাতির পিঠে বসে মজা দেখছে নবাবজাদা। কেরাহিয়াত, নফরতির আগুন সেপাইদের চোখেমুখে। নিজেদের পাওনা তারা আজ বুঝে নিতে চায়। এই ক্ষিপ্ত সেপাইদের দিয়ে প্রথমে রায়দুর্লভের হাভেলি লুঠ করাতে চায় মিরন। তারপর তাদের দিয়েই হাভেলি থেকে টেনে বের করে প্রকাশ্য রাজপথে দেওয়ানকে কোতল করবে সে। এই মনসুবা নিয়ে এসেছে মিরন। ফের মওত নাচাবে মুর্শিদাবাদে। পথের পাশে খুঁটি গেড়ে দেওয়ানজির লাশটা সে ঝুলিয়ে দেবে। সে দৃশ্য দেখে শিউরে উঠবে তামাম মুর্শিদাবাদ। ভয়ে কাঁপবে রাজারাম, রামনারায়ণ। আপন মনেই সজোরে হেসে ওঠে মিরন।

হাভেলির সমস্ত জানলা দরওয়াজা বন্ধ করে দিলেন রায়দুর্লভ। মিরনের হাতে তিনি ফের আক্রান্ত– একথা চিরকুটে লিখে ভাগীরথীতে গিয়ে পড়া এক গোপন সুড়ঙ্গ পথে এক কাসিদ কে পাঠিয়ে দিলেন কাশিমবাজারের উদ্দেশে। সাধারণ এক মাছমারার ছদ্মবেশে দ্রুতগামী ছিপনৌকো নিয়ে কাশিমবাজারের দিকে ছুটে চলল কাসিদ। আত্মরক্ষার্থে পরিবারের সকল সদস্যদের নিয়ে সেই সুড়ঙ্গের মধ্যেই আশ্রয় নিলেন রায়দুর্লভ। সেপাইরা হাভেলির দরজা ভেঙে অন্দরে ঢুকে পড়লেও চট করে এই সুড়ঙ্গপথের হদিশ পাবে না, এই আশায় বুক বেঁধে তিনি ইষ্টনাম জপতে লাগলেন।

নিরাপদেই কাসিদ পৌঁছে গেল কাশিমবাজারে। চিরকুটে চোখ বুলিয়ে আঁতকে উঠলেন স্ক্র্যাফটন। আক্রান্ত দেওয়ানজির হাভেলি। ফের অশান্ত মুর্শিদাবাদ।

স্ক্র্যাফটনের হাতে এখন তেমন সংখ্যক ফৌজও মজুত নেই। বাড়াবাড়ি রকমের খাতির করে নবাবকে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার জন্য ক্লাইভের নির্দেশে কাশিমবাজার থেকে গোরা পল্টনদের বড় একটা বাহিনীকে নবাবের এসকর্ট হিসেবে পাঠানো হয়েছে কলকাতায়। এখন উপায়?

চোখে অন্ধকার দেখলেন স্ক্র্যাফটন। কী করে এই পরিস্থিতি সামাল দেবেন। রায়দুর্লভের সালামতির জিম্মেদারি নিয়েছেন ক্লাইভ। অনেকেই জানে। তিনি সহায় বলেই এখনও দেওয়ানের গর্দান নিতে পারেননি নবাব। লেকিন এই ওয়াক্তে রায়দুর্লভ যদি খুন হয়ে যান তো সাধারণ মানুষের চোখে ক্লাইভের প্রতিপত্তি অনেকটাই খাটো হয়ে যাবে। যারা ইংরেজদের দুশমন, তারা মনে করবে ক্লাইভের ইরাদাকে ইনকার করার তাগদ হয়েছে নবাবের। অতএব ইংরেজ ঔদ্ধত্যকে চুরমার করতে এখন নবাবকে মদত দেওয়া যায়। ইংরেজ কোম্পানি দুর্দমনীয়—ভেঙে পড়বে এই মিথ। এতে পলাশিতে প্রাপ্ত সুবিধা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। যে ভাবেই হোক বাঁচাতে হবে রায়দুর্লভকে। অটুট রাখতে হবে ইংরেজ প্রতিপত্তি। কঠিন আজমায়েশের মধ্যে পড়লেন লিউক স্ক্র্যাফটন।

ওয়ারেন হেস্টিংসকে ডেকে জরুরি আলোচনায় বসলেন তিনি। যে কয়জন গোরা পল্টন কাশিমবাজারে রয়েছেন তাদের সঙ্গে নিয়েই মুর্শিদাবাদ রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। স্ক্র্যাফটনের নির্দেশে হেস্টিংস দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে চেপে ছুটলেন অগ্রদ্বীপের উদ্দেশে। পথে নবাবকে ধরে তাঁকে দিয়ে যে ভাবেই হোক মিরনকে নিরস্ত করার একটা পরোয়ানা লিখিয়ে নিতে হবে।

সেপাইদের খুনে মেজাজ দেখে ভয়ে সরে পড়ল রায়দুর্লভের হাভেলির সুরক্ষায় নিযুক্ত পাহারাদারেরা। কার্যত প্রায় বিনাবাধায় হাভেলির চৌহদ্দিতে ঢুকে পড়ল উন্মত্ত সেপাইয়ের দল। মুখে একটাই বুলি সকলের। ‘রুপেয়া নিকালো! আভি রুপেয়া নিকালো।’

সদর দরোয়াজা ভেঙে ফেলার হুকুম দিল মিরন। বিপুল আক্রোশে চল্লিশ-পঞ্চাশজন সেপাই ঝাঁপিয়ে পড়ল পোক্ত লোহার দরওয়াজাটার উপরে। মোটা মোটা শালের খুঁটি দিয়ে তারা ক্রমাগত আঘাত করতে লাগল দরজায়।

ক্রমশ অধৈর্য হয়ে উঠছে মিরন। রায়দুর্লভের রক্ত চাই। যত দ্রুত সম্ভব কাজটা হাসিল করতে হবে। আগেরবার দেওয়ানের হাভেলিতে হামলা করতে এসে স্ক্র্যাফটনের ধমক খেয়ে মানসম্মান খুইয়ে পিছু হটতে হয়েছিল মিরনকে। এবারে সে আর খালি হাতে ফিরতে চায় না। আজ সে মরিয়া। গোরা পল্টনেরা এবারেও এসে হাজির হলে যাতে নগরীতে প্রবেশ করতে না পারে, তার জন্য পরিকল্পনা করেই ত্রিপোলিয়া তোরণদ্বারের অদূরে সেনা মোতায়েন করেছে মিরন। সেবারে ঘোড়া দাবড়ে ফৌজ নিয়ে মুর্শিদাবাদে হাজির হয়েছিলেন স্ক্র্যাফটন।

কিন্তু মিরনের হুঁশ নেই যে কাশিমবাজার থেকে মুর্শিদাবাদে পৌঁছনোর আরও একটা পথ আছে। ভাগীরথী বেয়ে অনায়াসেই আসা যায়। সে পথে অবশ্য কোনও পাহারা নেই।

সহসা দড়াম শব্দে মাটিতে আছড়ে পড়ল লোহার দরজাটা।

'বহুত খুব। কেয়াবাৎ!' চেঁচিয়ে উঠল মিরন।

অন্দরে প্রবেশ করল সেপাইরা।

হাভেলি তোলপাড় করে রায়দুর্লভের সন্ধান করতে লাগল তারা।

বিরাট বড়সড় বাহিনী নিয়ে ঢিমে তালে চলেছেন নবাব। চলার পথে এই গড়িমসি আলস্যের ভাব দেখে মনে মনে খুবই বিরক্ত বোধ করছেন ওয়াটস। তবে বিরক্তি প্রকাশ করতে পারছেন না। ক্লাইভের কড়া নির্দেশ—যারপরনাই খাতির যত্ন করে মেহমানকে যেন কলকাতায় নিয়ে আসা হয়।

মুর্শিদাবাদ থেকে মানকরা পৌঁছতেই বেলা ফুরিয়ে গেল। ওখানেই আজ তাঁবু ফেলে রাত কাটাবেন নবাব। কাজেই নবাবকে পাকড়াও করার জন্য হেস্টিংসকে খুব বেশি ছুটতে হল না। সন্ধের মুখেই মানকরায় পৌঁছে গেলেন হেস্টিংস। ওয়াটসকে খুলে বললেন সব কথা।

চল্লিশ খুঁটির বিলাসবহুল তাঁবুর বাইরে খোলা আকাশের নীচে আরামকেদারায় দেহ এলিয়ে বসেছিলেন নবাব। হাতে ফরসির নল। চোখেমুখে বেশ একটা প্রশান্তির ছাপ। সন্ধে নামছে। খানিকবাদে মেহফিল বসবে। শামিয়ানা খাটিয়ে, বাহারি নকশার রংদার মোটা বনাত দিয়ে ঘিরে তৈরি হয়েছে অস্থায়ী রংমহল। রসুইখানা থেকে নাকে ভেসে আসছে স্বাদু গন্ধ।

কলকাতাযাত্রা বেশ উপভোগ করছেন নবাব। গন্তব্যে পৌঁছনোর বিশেষ কোনও তাড়াহুড়ো নেই। পথে পুরোদস্তুর আমোদ-ফূর্তি করতে করতে ধীরে-সুস্থে চলা। এ যেন নিশ্চিন্ত অলস অখণ্ড অবসরযাপন। মানসিক উত্তেজনায় জেরবার নবাব শরীর ও মন দুইয়েরই আরাম চান।

সহসা নবাবের সমুখে ঝড়ের মতো এসে হাজির হলেন হেস্টিংস ও ওয়াটস।

'নবাবজাদা ফের হামলা করেছেন দেওয়ান সাহেবের হাভেলিতে। ওয়ারেন সেই খবর নিয়ে এসেছে।' কোনও ভূমিকা ছাড়াই গুজারেশ করলেন ওয়াটস।

তাঁর অনুপস্থিতিতে মিরন যে এমন একটা কাণ্ড ঘটাতে পারে, তা মনে মনে আন্দাজ করেছিলেন মিরজাফর। কথাটা শুনে তিনি খুশিই হলেন। কোনও কিসিমে রায়দুর্লভ কাঁটা যদি পুরোপুরি উপড়ে ফেলা যায় তো মন্দ কী? তিনি রাজধানীর বাইরে। এই ওয়াক্তে দেওয়ান অচানক খুন হয়ে গেলে কোনও ইলজাম তাঁর উপরে আসবে না।

ভারী তাজ্জব হওয়ার মতো ভাব করে নবাব বললেন, 'এমন তো হওয়ার কথা নয়।'

হেস্টিংস বললেন, 'নবাবজাদা নাফরমান।'

ওয়াটস বললেন, 'এখন আপনিই ভরসা হুজুর।'

'কী করতে পারি আমি?'

'পরোয়ানা লিখে দিন।'

'কীসের পরোয়ানা?'

ওয়াটস বললেন, 'দেওয়ানজিকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চাই। তার পরোয়ানা।'

মিরজাফরের মনে হল চিৎকার করে বলে ওঠেন—আমি কী আপনাদের হুকুমের বান্দা? আপনারা যা চাইবেন, তাই লিখে দিতে হবে? তবে কথাটা বলার সাহস তাঁর হল না। তিনি এখন গোরা পল্টন পরিবৃত।

হেস্টিংস বললেন, 'দেওয়ানজির উপরে অন্যায় জুলুম হচ্ছে হুজুর। তাঁর কসুর কী?'

গুম মেরে রইলেন মিরজাফর। মিরন খতম করতে চাইছে দেওয়ানকে। মনে মনে বেটাকে সাবাশি দিলেও কী করে জোর গলায় তার সপক্ষে সওয়াল করবেন নবাব?

নবাবকে মৌন দেখে ওয়াটস বললেন, 'আপনাকে সম্মান জানাতে চলেছে কোম্পানি। আপনার এই খুশির ওয়াক্তে অচানক এই হুজ্জুতি-হাঙ্গামা বাধানো কি সহি কাম হবে হুজুর? আপনার সঙ্গে দেওয়ান সাহেবেরও কলকাতা রওনা হওয়াই ভালো। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন।'

'পরোয়ানাটা লিখে দিন হুজুর।'

প্রায় হুকুমের সুরে কথাটা বললেন হেস্টিংস। নবাবের প্রতি ইংরেজদের আনুগত্য প্রদর্শনের খোলসটা খসে পড়ল এক লহমায়। চমকে উঠলেন মিরজাফর। দেখলেন, ওয়াটস ও হেস্টিংসের পিছনে গোরা পল্টনেরা একে একে এসে সব জড়ো হচ্ছে। তাঁর বুক কেঁপে উঠল। ভয়। দহসত। মতলব কী ইংরেজদের? তাঁকে বন্দি করতে চায়? বড় অসহায় বোধ করলেন মিরজাফর খাঁ।

৫৮

মিরনের সেপাইদের হাতে ধরা পড়ে গেলেন রায়দুর্লভ।

সারারাত ধরে গোটা হাভেলি জুড়ে তাণ্ডব চালানোর পর ভোরের দিকে গুপ্ত সুড়ঙ্গপথের সন্ধান পেয়ে গেল সেপাইরা। সেখান থেকে তারা টেনেহিঁচড়ে বের করল রায়দুর্লভ ও তাঁর পুত্রদের। জেনানাদের বন্দি করে রাখা হল হাভেলির মধ্যেই একটা কক্ষে।

সেপাইরা ভেবেছিল দেওয়ানজির ধন-দৌলত জবরানে কেড়ে নেবে। কিন্তু তাদের সেই মনসুবা সফল হল না। মূল্যবান আসবাবপত্র, বহুত কিমতি কিছু ইস্পাহানি গালিচা, বেশ কয়েকটা বাহারি বেলজিয়ান ঝাড়বাতি, ও হারেমের কয়েকজন জেনানা ছাড়া রায়দুর্লভের হাভেলি ছেঁচে তেমন কোনও দৌলত পাওয়া গেল না। পাওয়ার কথাও নয়। বিপদ আন্দাজ করে বেশ কিছুদিন আগেই স্ক্র্যাফটন সাহেবের মদতে নিজের সঞ্চিত টাকা-কড়ি, সোনাদানা রায়দুর্লভ সরিয়ে দিয়েছেন কলকাতায়। নিজেও সরে পড়ার তালে ছিলেন কিন্তু শেষ রক্ষা হল না।

ভোরের আলো সবে ফুটেছে। রায়দুর্লভের হাভেলির অদূরে নিজামত কেল্লায় বিশ্রাম নিচ্ছিল মিরন। তার ঘুম ভাঙিয়ে রাজবল্লভ জানালেন, 'দেওয়ানজি গ্রেফতার হয়েছেন হুজুর।'

নবাবজাদার ঘুম ছুটে গেল এক লহমায়। তড়িঘড়ি বিছানা ছেড়ে নেমে এসে খুশিতে নিজের গলায় ঝোলানো মূল্যবান একটা চুনি-পান্নার হার রাজবল্লভকে উপহার দিল মিরন।

নবাবজাদাকে তসলিম জানিয়ে বিদায় নিলেন রাজবল্লভ।

প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে মিরনের দুই চোখে। তীব্র উত্তেজনায় আরশির সমুখে দাঁড়িয়ে সে নিজের সঙ্গেই কথা বলে চলে—'এবারে আপনাকে কে বাঁচাবে দেওয়ানজি? গত কয়েক মাস ধরে বড্ড পরেশান করেছেন আব্বাহুজুরকে, আমাকে। ইংরেজদের মদতে আব্বাহুজুরকে মসনদ থেকে ছুড়ে ফেলার খোয়াব দেখছিলেন। এখন কী হবে? নবাবজাদা সাদেক আলি যে কতটা সঙ্গদিল হতে পারে ধারণা নেই আপনার। মওত নাচছে আপনার মাথায়। কলিজা ফেটে খুন ঝরবে। সেই দৃশ্য দেখে শিউরে উঠবে তামাম মুর্শিদাবাদ। আর কেউ কোনওদিন নবাবের সঙ্গে গদ্দারি করবার কোশিস করবে না। আপনার অন্তিম কাল হাজির দেওয়ানজি। তৈয়ার থাকুন। আমি আসছি।' ভয়ানক হিংস্র হয়ে ওঠা নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে উল্লাসে ফেটে পড়ে মিরন।

সেপাইরা টেনে হিঁচড়ে সুবে বাংলার ইমানদার দেওয়ানজিকে তাঁরই হাভেলির চৌহদ্দির বাইরে এনে ফেলেছে। একের পর এক কোড়ার আঘাত এসে পড়ছে পড়ছে রায়দুর্লভের দেহের উপরে। পোশাক ছিন্নভিন্ন। থেকে থেকে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠছেন রায়দুর্লভ। অকুস্থলে পৌঁছে এই দৃশ্য দেখে মিরন উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে 'বহুত খুব। মারো বেতমিজকো। বহুত মারো।'

বাঁচার তাগিদে সামান্য বেতনের চাকুরে এই সেপাইদের কাছেই জোড়হাত হয়ে কাতর আর্জি জানিয়ে চলেছেন সুবে বাংলার মহামহিম দেওয়ান সাহেব। ক্রমাগত পিঠে এসে পড়ছে চাবুক। ভোরের নরম আলো রাজপথের উপর দিয়ে তখন গড়িয়ে যাচ্ছে। পথচলতি মানুষজন দূরে জমায়েত হচ্ছে একটু একটু করে। অবাক চোখে দেখছে সুবে বাংলার দাপুটে দেওয়ানের বেইজ্জতি।

চাবুক মারতে মারতে দেওয়ানকে এনে মিরনের সমুখে দাঁড় করাল সেপাইরা। দেহে যেন এক বিন্দু শক্তি নেই। কোনওরকমে দাঁড়িয়ে আছেন দুই পায়ের উপরে। চাবুকের ঘায়ে দেহের বেশ কিছু জায়গায় কালসিটে পড়েছে। রক্ত ঝরছে। ঝুঁকে গিয়েছে ঘাড়। মিরনের হিংস্র চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে থরথর করে কেঁপে উঠলেন রায়দুর্লভ। তারপর হাঁটু মুড়ে জোড়হাত হয়ে বসে পড়লেন মিরনের পায়ের কাছে।

পৈশাচিক উল্লাসে হেসে উঠল মিরন।

দড়িবাঁধা হাতদুটো জড়ো করে রায়দুর্লভ মিনতি করেন, 'আমার কসুর মাফ করুন হুজুর।'

'আরে বাঃ! কসুর আপনার কী হবে? আপনি তো ইংরেজদের দোস্ত আছেন। ক্লাইভ সাহেব আপনার মুরুব্বি। আপনি তো বহুত তাগদবাজ আদমি। ইতনে ডরতে কিঁউ হো?'

রায়দুর্লভ কেঁদে উঠে বললেন, 'ভিখ মাঙছি আপনার কাছে। আমার জান বাঁচান হুজুর।'

ফের হেসে উঠে মিরন বলল, 'লোকে বলে সাদেক আলি সঙ্গদিল। আজ সাবুত মিলবে।'

'রহেম করুন হুজুর। রহেম করুন।' হাহাকার করে ওঠেন রায়দুর্লভ।

'দিনের পর দিন সেপাইদের বেতন না চুকিয়ে এদের ভুখা মারার মতলব করেছিলেন আপনি। চেয়েছিলেন ভুখা সেপাইরা চড়াও হোক নবাবের উপরে। খতম করুক তাকে। আপনি গদ্দার।'

'না হুজুর না। ইয়ে ঝুটা ইলজাম। তোশাখানায় জেয়াদা টাকা নেই।'

'খামোশ। ইয়ে ঝুট বাত। হারামি বুড্ডহা, ইবলিশ কা আওলাদ কাঁহিকা।' এই বলে তীব্র নফরতির সঙ্গে রায়দুর্লভের মুখের উপরে একদলা থুতু ছুড়ে দিয়ে তাঁকে পা দিয়ে ঠেলে দেয় মিরন। জোব্বার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে নবাবজাদার পায়ের নাগরায় বসানো হিরের কুচিগুলো ঝকমকিয়ে ওঠে।

পথের উপরে চিৎ হয়ে পড়েন রায়দুর্লভ।

মিরনের চোখের ইশারায় রায়দুর্লভকে টেনেহিঁচড়ে ফের খাড়া করে দাঁড় করায় সেপাইরা। তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়ে পথের পাশে সদ্য পুঁতে রাখা এক শাল খুঁটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধতে থাকে। মনে মনে ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করতে থাকেন রায়দুর্লভ। মিরন সঙ্গদিল। রায়দুর্লভ বোঝেন যে তিলে তিলে তাকে যন্ত্রণা দিয়ে মারবে মিরন। জহর আছে ডান হাতের অনামিকার আংটির আধারে। গোখরোর বিষ। নিমেষে সব যন্ত্রণার জ্বালা জুড়োতে দড়িবাঁধা হাতদুটোকে সামান্য তুলে মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁত দিয়ে আংটির আধার খোলার জন্য উদ্যত হলেন রায়দুর্লভ।

ঠিক তখনই দূর থেকে ভেসে এল গুলির শব্দ। পর পর তিনবার। গুড়ুম! গুড়ুম! গুড়ুম!

থমকে গেলেন রায়দুর্লভ।

সহসা বন্দুকের আওয়াজ শুনে চমকে গিয়ে মিরন দেখল, শূন্যে গুলি ছুড়তে ছুড়তে নিজামত কেল্লার খেয়াঘাটের দিক থেকে দৌড়ে আসছে একদল গোরা পল্টন। নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্ট সাহেব—লিউক স্ক্র্যাফটন। পদাতিক সৈন্যদের পিছনে আসছে গোলন্দাজ বাহিনী।

কামানের নৌকো চরায় আটকে যাওয়ায় মুর্শিদাবাদে পৌঁছতে একটু দেরিই হয়েছে স্ক্র্যাফটনের। তিনি ভেবেছিলেন এ যাত্রায় দেওয়ানজিকে বোধ হয় আর রক্ষা করা গেল না। বেইজ্জত হবে কোম্পানি, বেইজ্জত হবেন ক্লাইভ। প্রবল উৎকণ্ঠায় ভুগেছেন স্ক্র্যাফটন। রায়দুর্লভের জান এখনও অক্ষত টের পেয়ে গোরা পল্টনদের নিয়ে আগ্রাসী মেজাজে তিনি ছুটে এলেন।

পলাশির পর থেকে নিজামতের সেপাইদের মধ্যে গোরা পল্টনভীতি ভয়ানক। পঞ্চাশ-ষাটজন গোরাপল্টনকে ছুটে আসতে দেখে ভয়ে গুটিয়ে গেল মিরনের সঙ্গে আসা কয়েকশো সেপাই। এ সেপাইরা কেউ মুর্শিদকুলি বা আলিবর্দির আমলের কুশলী যোদ্ধা নয়, লড়াইয়ের তরিকা-তরিবত না জানা, কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবককে ফৌজের নামে এক জায়গায় জড়ো করা। লড়াইয়ের কথা ভাবলেই এদের হাড়ে কাঁপন ধরে। তার উপরে সম্মুখে বেয়নেটধারী গোরা পল্টন।

ফৌজসহ স্ক্র্যাফটনের নাটকীয় অনুপ্রবেশে মিরন হতচকিত। সে বুঝল, মহা বেওকুফি করেছে সে। নগরে প্রবেশের মুখে সেনা মোতায়েন থাকলেও অরক্ষিত ছিল নদীপথ। ও পথেই এসেছে ইংরেজবাহিনী। ধূর্ত রায়দুর্লভ এবারেও গুপ্তচর মারফত তাঁর আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ তুরন্ত পাঠাতে পেরেছিলেন কাশিমবাজারে।

'স্টপ দিস ক্রুয়েলটি। স্টপ ইট।'

যে সৈন্যরা রায়দুর্লভকে খুটির সঙ্গে বাঁধার আনজাম করছিল, বেয়নেট হাতে স্ক্র্যাফটনের হুঙ্কার শুনে ছিটকে সরে গেল।

মিরনের মনে হচ্ছিল স্ক্র্যাফটনের সামনে রুখে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমি নবাবজাদা। নবাবের অনুপস্থিতিতে নিজামতের শাসনযন্ত্রের জিম্মেদারি আমার হাতে। আমার কাজে বাধা দেওয়ার আপনি কে? এখানে যা ঘটছে তা নিজামতের অন্দর কি কিসসা। এর মধ্যে মাথা গলাতে কেন এসেছেন আপনারা? এখনই ফিরে যান। নয়তো আপনাদের কয়েদ করব আমি। আমার সেপাইরা এক সঙ্গে যদি আপনাদের উপরে ঝাপিয়ে পড়ে, নিমেষে আপনাদের হাত থেকে বন্দুক, তোপের গাড়ি সব কেড়ে নিতে পারে। গুলি ছুড়ে, তোপ দেগে কতজনকে মারবেন আপনারা?'

মনের মধ্যে এসব কথা গজগজ করলেও স্ক্র্যাফটনের আগুনে মেজাজের সামনে পড়ে স্তিমিত হয়ে গেল মিরনের খুনজোশি। তফরা-তকরারের সাহসই হল না। সেপাইদের মতো তারও ইংরেজভীতি কম নয়। আড়ালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে শেরের মতো তর্জনগর্জন করলেও ক্লাইভ, আয়ারকুট, স্ক্র্যাফট, হেস্টিংসের সম্মুখে সে চুহা।

স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে সেপাইরা। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। নবাবজাদার দিক থেকে কোনও নির্দেশ নেই। গোরা পল্টনেরা ছুটে এসে দড়ির বাঁধন থেকে মুক্ত করল রায়দুর্লভকে।

কান্নায় ভেঙে পড়ে প্রবল আবেগে স্ক্র্যাফটনের পায়ে লুটিয়ে পড়ে রায়দুর্লভ বললেন, 'আপনি সাক্ষাৎ দেবতা সাহেব! সাক্ষাৎ গোবিন্দজি। চিরকাল আপনার গোলাম হয়ে থাকব।'

রায়দুর্লভকে মাটি থেকে তুলে, তাঁকে গোরা পল্টনদের হেফাজতে দিয়ে মিরনের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন স্ক্র্যাফটন। কৈফিয়ত তলবের সুরে উদ্ধত ভঙ্গীতে শুধলেন, 'হোয়াট আর ইউ ডুয়িং হিয়ার? ফের দেওয়ানজির উপরে হামলা কেন?'

মিরন জবাব দেয়, 'এতে আমার কোনও কসুর নেই।'

'নবাব ইজ আউট অফ স্টেশন। ইউ আর রেসপন্সিবল ফর মেইনটেনিং ল অ্যান্ড অর্ডার। হাউ সাচ ইনসিডেন্ট অকারস ইন ফ্রন্ট অফ ইউ?' স্ক্র্যাফটনের গলা আরও এক পর্দা চড়ে যায়।

'সেপাইরা বেতন পায় না অনেকদিন। বেতন মেটানোর জিম্মেদারি দেওয়ানজির। সেপাইরা আজ নিজেদের পাওনা বুঝে নিতে চায়। তাই এই হামলা।'

‘হোয়াট ননসেন্স ইউ আর টকিং। সুবে বাংলার দেওয়ান একজন ইমানদার ইনসান। মামুলি কোনও মুজরিম নন। তার উপর এমন জুলমাত করা যায় না।’

‘সেপাইরা নাফরমান। আমার কথা শোনেনি।’

‘ইয়ে ঝুট বাত। তাদের ইন্সটিগেট করেছেন আপনি।’

আর কথা না বাড়িয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মিরন।

স্ক্র্যাফটন বললেন, ‘আপনার হাতে জান খতরা দেওয়ানজির। মুর্শিদাবাদ ইজ নট সেফ ফর হিম। উই ওয়ান্ট টু সেন্ড হিম টু ক্যালকাটা।’

বেশ ফাঁপরে পড়ে গেল মিরন। রায়দুর্লভের হাভেলি ছেঁচে কোনও দৌলতের সন্ধান পাওয়া যায়নি। মিরনের আন্দাজ ব্যক্তিগত সম্পদ তো বটেই, সেই সঙ্গে নিজামতের তোশাখানা থেকে মোটা অঙ্কের টাকা সরিয়ে কলকাতায় আগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন রায়দুর্লভ। কলকাতায় পাড়ি দিলে তিনি নবাবের নাগালের বাইরে চলে যাবেন। ইংরেজদের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে বেঁচেছেন রাজারাম, একই কায়দায় রেহাই পেয়েছেন রামনারায়ণ, রায়দুর্লভও কি পার পেয়ে যাবেন?

মুখ তুলে স্ক্র্যাফটনের চোখের দিকে তাকিয়ে মিরন বলে, ‘নবাবের হুকুমত ছাড়া দেওয়ানজি মুর্শিদাবাদ ছেড়ে কোথাও যেতে পারবেন না।’

মুচকি হাসলেন স্ক্র্যাফটন। ‘হুকুমত?’

সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে মিরন বলে, ‘নিজামতের কানুন এমনই। নবাবের পরোয়ানা জরুরি।’

কাঁধ ঝাঁকিয়ে স্ক্র্যাফটন বললেন, ‘ইন্তেজার করুন। পরোয়ানা আসবে।’

মুচকি হাসল মিরন। কলকাতার পথে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছেন নবাব। কী করে আদায় করবেন তাঁর পরোয়ানা? এবারে আপনাকে শূন্য হাতে ফিরতে হবে সাহেব। কিছুতেই রায়দুর্লভকে কলকাতায় যেতে দেবেন না নবাব। আপনি মুর্শিদাবাদ ছেড়ে কাশিমবাজারে ফিরলেই দেওয়ানজিকে খতম করব আমি। তরোয়ালের এক কোপে দেওয়ানজির মুণ্ডুটা ধড় থেকে আলাদা করে দেব। তারপর কাটা মুণ্ডুটা সওগাত পাঠাব আপনাকে। মনে মনে এসব ভাবলেও মুখে মিরন বলল, ‘বেশ। ইয়ে সহি তরিকা। আপনি নবাবের পরোয়ানা আনিয়ে দিন। আমি ইন্তেজার করছি।’

খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না মিরনকে। খানিকবাদে দেখা গেল ধুলোর ঝড় উড়িয়ে ছুটে আসছে কয়েকজন ঘোড়সওয়ার। একেবারে সম্মুখে এক ঘোড়সওয়ারের হাতে ধরা দণ্ডের মাথায় চরম ঔদ্ধত্যের সঙ্গে উড়ছে কোম্পানির পতাকা।

স্ক্র্যাফটনের সম্মুখে এসে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামলেন হেস্টিংস। কোমরবন্ধনী থেকে গোটানো কাগজটা বের করে তিনি তুলে দিলেন স্ক্র্যাফটনের হাতে। তাতে চোখ বুলিয়ে মুচকি হাসলেন রেসিডেন্ট সাহেব, তারপর মিরনের সমুখে গিয়ে ব্যঙ্গের সুরে বললেন, ‘হুজুর, এই যে আপনার পরোয়ানা। পড়ে দেখুন।’

কাগজে চোখ বুলিয়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় মিরন। দেওয়ানজিকে কলকাতা যাওয়ার ইজাজত দিয়েছেন আব্বাহুজুর!

‘আমরা নিজামতের কানুনকে ইজ্জত করি। তাই ইন্তেজার করেছি। না হলে এতক্ষণে দেওয়ান সাহেবকে কলকাতার পথে রওনা করিয়ে দিতে পারতাম। আর এটাও মনে রাখবেন যে, রবার্ট ক্লাইভ যার সালামতির জিম্মেদারি নেন, তাকে খতম করা যায় না। এইসব বদখেয়াল ছেড়ে আপনি সহি তরিকায় নিজামতের দেখভাল করুন। এতে ভালাই হবে আপনারই।’

কথাগুলো ঝড়ের গতিতে বলে উলটো মুখে হনহন করে হাঁটতে লাগলেন স্ক্র্যাফটন। রায়দুর্লভের হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন নিজামত কেল্লার নৌকোঘাটের দিকে।

নবাবের পরোয়ানাটা হাতে নিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে স্ক্র্যাফটন ও রায়দুর্লভের দূরে চলে যেতে থাকা শরীরী অবয়বের পানে চেয়ে রইল মিরন। অপমানে, রাগে, হতাশায় তার গা জ্বলতে লাগল। খানিকবাদে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দ্রুত হাতির পিঠে চেপে বসল মিরন। এই বেইজ্জতির পর এখানে বেওকুফের মতো দাঁড়িয়ে থাকা মানে আশেপাশে জমায়েত বেবাক আদমির হাসি-মজাকের খোরাক হয়ে যাওয়া।

হঠাৎই ভিড়ের মধ্যে থেকে মিরনের কানে উড়ে এল একটা কথা—'বাহাদুর নবাবজাদা! স্রেফ ইংরেজ রেসিডেন্টের এক দাবড়ানিতেই ঘায়েল।' কান গরম হয়ে উঠল মিরনের।

চকবাজারের পথ ধরে জাফরাগঞ্জ প্যালেস অভিমুখে ফিরে চলেছে হাতি। মিরনকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে অবসাদ। অস্থির হয়ে আছে মন। হঠাৎই কোমরবন্ধনীতে গুঁজে রাখা ছোট্ট খাতাটার কথা ইয়াদ হল তার। মিরনের নিজের জবানে এ খাতার নাম 'কাতিলনামা'। সেই সব ইনসানের নাম এই খাতায় লালকালিতে প্রথমে লিখে রাখে মিরন, যাদের সে খুন করে দোজখে পাঠাতে চায়। কাজ হাসিল হলে দাফনের পর মরহুম ইনসানের নামটা খাতা থেকে কালো কালিতে সে কেটে দেয়। ইতিমধ্যে 'কাতিলনামা' থেকে কাটা পড়েছে নিজামতের অনেক ওমরাহের নাম। মিরনের ইরাদায় তারা কেউ জিন্দা নেই। কালো কালিতে ঢাকা পড়েছে মির্জা মেহেদির নামটা। তবে রাজারাম, রামনারায়ণ, রায়দুর্লভের নাম এখনও লাল কালিতে অমলিন সেই খাতায়। আফশোস। বড় আফশোস। মিরন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হঠাৎই তার চোখ আটকে কাতিলনামায় লিখে রাখা দু'টি নামের উপরে। দুশমনের খুন ঝরাতে না পারলে নবাবজাদার বেতাব দিলের চ্যায়েন হবে না।

নিজামত কেল্লার নৌকোঘাট থেকে রায়দুর্লভকে সঙ্গে নিয়ে বজরায় উঠলেন স্ক্র্যাফটন। জনা বিশেক গোরা পল্টনকে রেখে গেলেন রায়দুর্লভের হাভেলির পাহারায়। আপাতত দেওয়ানজির পরিবারের বাকি সদস্যদের সালামত রাখার জিম্মেদারি গোরা পল্টনদের হাতেই সঁপে দিয়েছেন রেসিডেন্ট সাহেব। পরে ধীরেসুস্থে তাদের পাঠানো হবে কলকাতায়।

মসনদকে কেন্দ্র করে তাগদ, প্রতিপত্তি, তাকাব্বুরির মোহ মুছে গিয়েছে রায়দুর্লভের মন থেকে। ফের মুর্শিদাবাদে ফিরে এসে নিজের জীবন বিপন্ন করতে তিনি চান না। বাকি জীবনটা পরিবারসহ ইংরেজদের আশ্রয়ে কলকাতায় কাটাবেন বলে মনস্থ করেছেন তিনি। অবশ্য কলকাতায় পাড়ি জমানোর ভাবনা অনেকদিন থেকেই ঘুরপাক খাচ্ছিল তার মনের মধ্যে। তাই নিজের সমস্ত ধনদৌলত একটু একটু করে আগেই সরিয়ে দিয়েছেন কলকাতায়।

চলতে শুরু করল ইংরেজদের নৌবহর, ইংরেজদের বজরা, নৌকো, সুলুপের ঠিক মাঝখানে রয়েছে সুবে বাংলার দেওয়ান সাহেবের মকরমুখী বিলাসবহুল বজরা। এই বজরাই সরাসরি গিয়ে ভিড়বে ফোর্ট উইলিয়ামের জেটিতে। গলুইয়ের উপরে একাকী দাঁড়িয়েছিলেন রায়দুর্লভ। ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে মুর্শিদাবাদের সারি সারি হাভেলি, নিজামত কেল্লার বুরুজ, হিরাঝিল প্যালেস, জাফরাগঞ্জের প্রাসাদ। মরে আসছে দিনের আলো। ঘরে ফিরছে পাখির দল। হঠাৎই আসমান সমান ঠেলে ওঠা বিশাল এক ব্যর্থতার অনুভূতি দেওয়ানজির চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দেয়। সব কাজের শেষে ঘরে ফেরে মানুষ। জীবন সায়াহ্নে এসে তিনি আজ ঘরছাড়া। যে নগরীতে বসে তামাম সুবে বাংলার উপরে প্রভুত্ব করার খোয়াব দেখেছিলেন, সেই মুর্শিদাবাদ শহর তাঁর পক্ষে এখন খতরনক।

উচ্চ রক্তচাপ ও বহুমূত্র রোগে শরীরটা ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে। যে ক'দিন বাঁচবেন সেই দিনগুলো সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কলকাতায় নিরুদ্বেগে শান্তিতে দিনগুজরান করতে চান রায়দুর্লভ। যাবতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে তিনি দাফন করে এসেছেন মুর্শিদাবাদে। তবুও মনে ধন্দ। শান্তি মিলবে কি কলকাতায়? উত্তর জানা নেই।

দ্রুত এগিয়ে চলেছে নৌবহর। রায়দুর্লভের কানে ভেসে আসছে অসংখ্য দাঁড়ের আঘাতে নদীর বুক থেকে উত্থিত ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। চোখের নজর থেকে হারিয়ে গিয়েছে মুর্শিদাবাদ নগরী। অন্ধকার নামছে। ভাগীরথীর রুপোলি জলে কালচে রঙের ছোপ লেগেছে। দূরে পাড়ের সবুজেও কালি ঢেলে দিয়েছে কেউ। অচিরেই আঁধারের কালো চাদরে ঢাকা পড়বে চরাচর।

আকাশের দিকে মুখ তুলে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন দেওয়ানজি। তাঁর মনকে তোলপাড় করে চলেছে অতীতের স্মৃতি। তাগদ, দৌলত, রওশন, জলুসের নেশায় সিরাজদ্দৌলাকে মসনদ থেকে হঠাতে মিরজাফর, জগৎশেঠের সঙ্গে দরবারি সাজিশিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর ভূমিকা ছিল বিশাল। ইনকিলাবের পূর্বে পলাশির ইকরারনামা তিনিই তো চূড়ান্ত করেছিলেন। কিন্তু ইনকিলাবের পরে দুবছরের মধ্যে তাঁর পরিণতি যে এমন হবে কে জানত? রায়দুর্লভ ভেবেছিলেন তাগদের জোশে ভাসবেন, গুমানিতে আশমানকে ছোঁবেন, মিরজাফর খাঁ'কে হাতের মুঠোয় রেখে সুবে বাংলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে উঠবেন। কোথায় পূর্ণ হল সেই বাসনা? আজ ইংরেজদের কৃপায় কোনওরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে চিরকালের জন্য পাড়ি জমাতে হচ্ছে কলকাতায়। মুর্শিদাবাদ ও জহান্নাম তাঁর কাছে এখন সমার্থক।

আকাশের মুখ ভার। হঠাৎই গুমরে উঠল মেঘ। রায়দুর্লভের মনে হল বেহেস্ত থেকে হেসে উঠলেন সিরাজ। নসিব কখন যে কী ভাবে ঘর বদলায়, তার আন্দাজ কেউ পায় না।

মুর্শিদাবাদ থেকে অগ্রদ্বীপ আসতেই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন নবাব। পরিশ্রান্ত তাঁর সঙ্গীসাথীরাও। শ্রাবণের ভ্যাপসা গরমে সকলেরই হাঁসফাঁস অবস্থা। আপাতত এখানে দিন কয়েক বিশ্রাম নিয়ে তারপরে নবাব কলকাতার উদ্দেশে রওনা হতে চান। এতে মনে মনে খুশিই হয়েছেন ওয়াটস। হাতে কিছুটা সময় পাওয়া গেল।

নবাবের পরোয়ানা নিয়ে মুর্শিদাবাদে গিয়েছেন হেস্টিংস। কিন্তু এখনও ওদিক থেকে কোনও খবর নেই। ওয়াটসের ইচ্ছা, রায়দুর্লভকে সঙ্গে নিয়েই কলকাতায় রওনা হবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হল দেওয়ানজির পরিণতি, প্রাণে বাঁচলেন কিনা এ নিয়ে বেশ চিন্তায় রয়েছেন ওয়াটস।

রায়দুর্লভের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা আছে ওয়াটসসহ কোম্পানির অনেকেরই। সিরাজদ্দৌলার জমানায় রেসিডেন্টের পদে যোগ দেওয়ার পর মুর্শিদাবাদ দরবারের জটিল রাজনীতির সহি আন্দাজ পেতে ওয়াটসকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন রায়দুর্লভ। তাঁর মাধ্যমেই পলাশির ইকরারনামা, ইংরেজদের পাওনা-গন্ডার হিসেব নিকেশ চূড়ান্ত হয়েছিল। রায়দুর্লভের সৌজন্যে প্রত্যাশার তুলনায় কোম্পানি পেয়েছে অনেক বেশি। শুধু কোম্পানি কেন, কী ওয়াটস, কী স্ক্র্যাফটন দরবারের প্রাক্তন ও বর্তমান রেসিডেন্ট সাহেব দেওয়ানের কাছ থেকে গোপনে কম সওগাত, পেশকাস তো পাননি, তাই এমন উপকারী বন্ধুর জন্য স্ক্র্যাফটনের মতো ওয়াটসেরও দুর্ভাবনার শেষ নেই।

বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে। অগ্রদ্বীপের জাহাজঘাটা সংলগ্ন এলাকায় বহু মানুষের সমাগম। আশেপাশের গ্রাম উজাড় করে এসেছে সাধারণ মানুষজন। এরা কেবল নবাবের কথা শুনেছে। চর্মচক্ষে কোনওদিন নবাবকে দেখেনি। নবাবের জলুস, রওশনের কহানি এদের কাছে খোয়াবের মতো। নবাবকে আজ একঝলক দেখে দেহাতের আনপঢ় মানুষেরা নিজের জীবনকে সার্থক করে নিতে চায়। দূর থেকে ভেসে আসছে তাদের হইহুল্লোড়ের শব্দ। কোড়া হাতে উত্তেজিত জনতাকে দূরে ঠেলছে সেপাই বরকন্দাজেরা।

আজ দুপুরে অগ্রদ্বীপে এসে পৌঁছেছেন নবাব। নদীর চরে বিরাট এলাকা জুড়ে তাঁবু গাড়ার কাজ প্রায় শেষের পথে। সন্ধের আগেই শেষ করতে হবে সব কাজ। সেই নিয়ে মুটেমজুরদের সীমাহীন ব্যস্ততা। নদীর তীরে নোঙর ফেলা মস্ত একখানা নৌকোর উপরে নহবত বসেছে। বাজছে সানাই। চরের উপরে তৈরি হচ্ছে রঙিন কানাতে ঢাকা অস্থায়ী রংমহল। রাতে মেহফিল বসবে। ঘাটের কোলাহল থেকে কিছুটা দূরে নদীর জল ও চরের বেশ কিছুটা এলাকা খুঁটি পুতে রংবেরঙের মোটা অস্বচ্ছ কাপড় দিয়ে ঘিরে নেওয়া হয়েছে। এই আবরুর আড়ালে বিবসনা সুন্দরীদের নিয়ে জলকেলিতে মেতেছেন নবাব। এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গুলতানিতে ব্যস্ত মোসাহেবের দল—অলস পরজীবী একদল মানুষ। রসুইখানা থেকে ছড়িয়ে পড়া পোলাও, দমপোক্ত, কাবাব, দুনিয়াজার স্বাদু গন্ধ ভুরভুর করছে বাতাসে। চরের উপর পসরা সাজিয়ে বসেছে গুলাব-গুলদস্তা, আতর, লস্যি, মালাইয়ের কারবারিরা। টাকার গন্ধ পেয়ে বেশ্যার দালালরাও এসে হাজির। তাদের সঙ্গে দরদস্তুরে ব্যস্ত অনেকে। সব মিলিয়ে যেন একখানা আস্ত মেলা বসে গিয়েছে নদীর চরে। অগ্রদ্বীপ তাজ্জব। ভিড় জমানো মানুষজন দূর থেকে জুলজুলে চোখে পর্যবেক্ষণ করছে সব কিছু। এই নবাবি মেজাজ, কেতা, রংঢঙের সঙ্গে এদের কোনও জান-পহেচান নেই।

বেশ উঁচুতে ঘাটের এক ছয়কোনা রানার উপরে দাঁড়িয়ে মনের মধ্যে একরাশ বিরক্তি নিয়ে নবাবের বাহিনীর আশরত-ফূর্তির আনজাম-আয়োজন লক্ষ করছিলেন উইলিয়াম ওয়াটস। ঠোঁটে গোঁজা চুরুট। কলকাতা রওনা হওয়ার পর থেকে নবাবের খরচের যা বহর দেখছেন ওয়াটস, তাতে তাজ্জব বনে যাচ্ছেন তিনি। এই আড়ম্বর দেখে কে বলবে যে নিজামতের তোশাখানায় টাকা নেই! নবাব দেউলিয়া হতে বসেছেন,

টাকার চিন্তায় জেরবার, বকেয়া পড়ে থাকছে ইংরেজদের পাওনা, তবুও বাজে খরচে রাশ টানার কোনও তাগিদ তাঁর নেই।

মুর্শিদাবাদ থেকে অগ্রদ্বীপের দিকে ভেসে আসা কোম্পানির নৌবহর চোখের পর্দায় সহসা যদি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে—এই আশায় নবাবের ছাউনির উপর থেকে নজর সরিয়ে বারবার উত্তর মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন ওয়াটস। গলায় ঝোলানো দূরবিনে চোখ রাখছেন বারবার। তারপরে সেটা নামিয়ে রাখছেন হতাশায়। সব ঠিকঠাক থাকলে এতক্ষণে হেস্টিংস ও স্ক্র্যাফটনের তো চলে আসার কথা। আশঙ্কায় বুক দুরু দুরু করতে থাকে ওয়াটসের। দুশ্চিন্তা বেড়ে চলে।

সূর্য হারিয়ে গেল ঝাঁকড়া একটা অশ্বত্থ গাছের আড়ালে। পশ্চিমাকাশে নানারঙের খেলা। একটু পরেই আঁধার ঘনিয়ে আসবে। নদীর ঘাটের উপরে দেবদেবীর দেউল থেকে ভেসে আসছে ঘণ্টাধ্বনির শব্দ, কাসর-ঘণ্টা, ঢাকের আওয়াজ। গোপীনাথের মন্দির থেকে ভেসে আসছে হরি-সংকীর্তনের সুর। সেখানে এখন পূজা নিবেদনের সাড়ম্বর আয়োজন। পুজো দিতে গিয়েছেন জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ। তিনিও নবাবের সঙ্গে চলেছেন কলকাতায়।

চুরুটটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আধপোড়া চুরুটটাকে ছুড়ে ফেলতে গিয়ে হঠাৎই সচকিত হয়ে উঠলেন উইলিয়াম ওয়াটস। মুটে-মজুরদের কোলাহল, বাতিকরদের হইচই, ঢাকের আওয়াজ, মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি, হরি-সংকীর্তনের সুরের সঙ্গে মিলেমিশে গেল দূর থেকে ভেসে আসা কোরাসে গাওয়া খুব পরিচিত একটি গানের সুর। গানের সঙ্গে বাজছে বিলিতি ব্যান্ড।

‘রুল ব্রিটানিয়া! ব্রিটানিয়া! রুল দ্য ওয়েভস।

ব্রাইটন্স নেভার, নেভার, নেভার শ্যাল বি স্লেভস...’

চকিতে ফের দূরবিনে চোখ রাখলেন ওয়াটস। কোনও ভুল নেই, ঘাটের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে গোটা কয়েক বজরা। প্রত্যেকটা বজরার মাথায় উড়ছে ইউনিয়ন জ্যাক। এই নৌবহরের ঠিক মাঝখানে একটি বজরার মাথায় ইউনিয়ন জ্যাকের পাশে উড়তে থাকা বিশেষ একটি পতাকা দেখে ওয়াটস বুঝলেন ওটি রেসিডেন্ট সাহেবের বজরা।

তীব্র উত্তেজনায় ঘাটের রানা থেকে সরে এসে সারি সারি পৈঠা বেয়ে দ্রুত নীচের দিকে নামতে লাগলেন ওয়াটস। গানের মেজাজ ও জোশ বলছে ইংরেজরা যা চেয়েছিল তাই হয়েছে। তবুও স্ক্র্যাফটনের মুখ থেকে সব না শুনলে, রায়দুর্লভকে চোখে না দেখলে স্বস্তি নেই।

নৌকোঘাটে এসে দাঁড়ালেন ওয়াটস। খানিকবাদে হেলতে দুলতে বজরাগুলো ঘাটে এসে ভিড়ল। রেসিডেন্টের বজরার গলুইয়ের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন স্ক্র্যাফটন, হেস্টিংস ও রায়দুর্লভ।

হাসি ফুটল ওয়াটসের মুখে।

হাসি রায়দুর্লভ, স্ক্র্যাফটন ও হেস্টিংসের ঠোঁটেও।

দুই আঙুল তুলে ওয়াটসের উদ্দেশে ভিকট্রি চিহ্ন দেখালেন স্ক্র্যাফটন।

প্রবল আবেগে ও উচ্ছ্বাসে ওয়াটস হেড়ে গলায় এবারে গেয়ে উঠলেন—

‘রুল ব্রিটানিয়া! ব্রিটানিয়া! রুল দ্য ওয়েভস।

ব্রাইটন্স নেভার, নেভার, নেভার শ্যাল বি স্লেভস...’

রায়দুর্লভ ঘাটে পা রাখতেই এগিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করলেন ওয়াটস।

জলে ভরে উঠল রায়দুর্লভের দুই চোখ। বললেন, ‘গোবিন্দজির অশেষ কৃপা হুজুর। তাই এখনও শ্বাস চলছে। আপনারাই আমার দেবতা। কী বলে যে আপনাদের—’

ওয়াটস বললেন, ‘আপনি আমাদের দোস্ত। ইন আওয়ার ব্যাড টাইমস বহুত মদত দিয়েছেন। আপনার জান বাঁচাতে পেরে আমরা খুশি। আর কোনও ভাবনা নেই, এবারে আরাম করুন।’

রসিকতার সুরে স্ক্র্যাফটন বললেন, 'আপনি জিন্দা আছেন শুনলে নবাব বহুত খুশি হবেন।'

ওয়াটস হেসে বললেন, 'আপনার অনারে মুজরোর আসর বসবে রাতে।'

হেসে উঠলেন রায়দুর্লভ। মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসার খুশি ঝলকাচ্ছে তাঁর চোখেমুখে।

ওয়াটস বললেন, 'নাউ ইউ উইল বি আওয়ার নেবার ইন ক্যালকাটা।'

'আমার খুশনসিব।'

'ইউ মাস্ট অ্যাকনলেজ, ক্যালকাটা ইজ অ্যা বেটার সিটি দ্যান মুর্শিদাবাদ।' বললেন ওয়াটস।

'বেশক। ওখানে ফূর্তি-আশরতে এই বান্দার বাকি দিনগুলো দিব্যি কাটবে।'

'চলুন।' এই বলে দেওয়ানজিকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাম্প অভিমুখে এগিয়ে গেলেন ওয়াটস।

তীব্র স্নায়ুযুদ্ধের অন্তে ক্লান্তি গ্রাস করেছে স্ক্র্যাফটনকে। হেস্টিংসের উদ্দেশে বললেন, 'আই অ্যাম ফ্যাটিগ্ড্। ফিলিং টায়ার্ড। লেটস হ্যাভ অ্যা সুইম ইন দ্য রিভার।'

হেস্টিংস মুচকি হেসে বলেন, 'গুড আইডিয়া। উইশ ফুলফিলমেন্ট হলে নেটিভ হিন্দুস নদীতে ডুব দেয়। দে ওয়রশিপ দ্য রিভার। উইস ফুলফিলমেন্ট তো আমাদেরও। উই হ্যাভ রেসকিউড রায়দুর্লভ। দেওয়ানজির সালামতির জিম্মেদারি নিয়েছিলেন ক্লাইভ। উই সেভড হিজ ফেস।'

'দ্যাটস ট্রু। তবে আমি ভাবছি অন্য কথা। আই অ্যাম গেটিং এক্সহস্টেড। ওয়ান্ট টু বি রিলিভড ফ্রম দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ রেসিডেন্টশিপ।'

'আপনার মতো এমন এফিসিয়েন্ট অফিসারকে ক্লাইভ সাহেব সহজে ছাড়বেন না।'

'থাক ওসব কথা। আলো ফুরিয়ে আসছে চলো সাঁতার কেটে আসি।'

লম্বা কোট ও ঢোলা ব্রিচেস ছেড়ে এদেশি লোকেদের মতো কোমরে একখানা কাপড় কৌপিনের মতো করে জড়িয়ে খালি গায়ে স্ক্র্যাফটন ও হেস্টিংস ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলে।

সাঁতারে খুব দক্ষ হেস্টিংস। নিমেষের মধ্যে স্ক্র্যাফটনকে ছাড়িয়ে চলে গেলেন অনেক দূরে। একেবারে প্রায় মাঝ নদীতে।

মৃদুমন্দ গতিতে নদীতে ভেসে বেড়াচ্ছে নবাব-বেগমের ময়ূরপঙ্খী বজরা। জানালায় ঝোলানো চিলমন পর্দার আড়াল থেকে নদীর শোভা উপভোগ করছিলেন মণি বেগম। হঠাৎ দেখলেন, সাঁতার কাটতে কাটতে বজরার দিকে এগিয়ে আসছে এক যুবক। জলের উপরে ভেসে থাকা মুখটা দেখে এই যুবককে মণি বেগমের কেমন যেন চেনা চেনা ঠেকল। তাঁর ধমনীতে রক্ত চঞ্চল হল।

সে-ই কী? সুপুরুষ, সুদর্শন সেই যুবককে আড়াল থেকে একবার দেখেছিলেন মণি বেগম। ঘাড় অবধি লম্বা চুল। ছিপছিপে চেহারা। চোখা নাক। কটা চোখদুটো বড় সুন্দর। মুগ্ধ হয়েছিলেন মণি বেগম। নিবিষ্ট মনে তাঁর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বেগম সাহেবার মনে হচ্ছিল দেহ, মন সব কেমন যেন অবশ হয়ে আসছে। সেদিন সে এসেছিল নবাবের সঙ্গে দেখা করতে। একজন গোলামের মুখ থেকে শুনেছিলেন, তাঁর নাম ওয়ারেন হেস্টিংস। কাশিমবাজার কুঠিতে থাকেন, দরবারের রেসিডেন্ট সাহেবের সহকারী।

বজরাটাকে দ্রুত ঘাটের দিকে একটু এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার হুকুম করলেন মণি বেগম। ব্যস্ত হয়ে দাড় টানতে লাগল মাঝিমাল্লারা। বজরা সামান্য এগোতে মণি বেগম বুঝলেন সাঁতারে মগ্ন যুবক ওয়ারেন হেস্টিংসই। অপলক দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতে লাগলেন মণি বেগম। তাঁর অজান্তে তাঁকে লুকিয়ে দেখা। মণি বেগম সহসা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলেন।

দূর থেকে স্ক্র্যাফটনের গলা ভেসে আসে। 'ওয়ারেন কাম ব্যাক। ইট ইজ গেটিং ডার্ক।'

আলো অনেকটাই মরে এসেছে। ঘাটের দিকে সাঁতার দিয়ে বেগম সাহেবার বজরা থেকে দূরে চলে যেতে লাগলেন হেস্টিংস।

বজরার কক্ষ প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। আঁধার নামল মণি বেগমের মনেও।

একজন বাঁদি বাতি নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে।

ঘাড় ঘুরিয়ে তার পানে চেয়ে বেগম সাহেবা বলেন, 'বাতিটা নিয়ে যা।'

বাঁদি চলে যায়। জানলায় মাথা রেখে অন্ধকারে একাকী চুপ করে বসে থাকেন মণি বেগম।

আকাশের চাঁদ আজ প্রায় থালার মতো গোল। সামনেই পূর্ণিমা। জোছনায় ভিজছে চরাচর।

স্ক্র্যাফটনের বজরায়, দোতলার কক্ষ সংলগ্ন রেলিং দিয়ে ঘেরা খোলা ছাতে পার্টির আয়োজন। নিরাপদে রায়দুর্লভের কলকাতা যাত্রা নিশ্চিত করার খুশিতে সেলিব্রেশনে মেতেছেন স্ক্র্যাফটন, হেস্টিংস ও ওয়াটস। মাঝে একটা গোল টেবিলকে ঘিরে কুরসিতে বসেছেন তিন সাহেব। টেবিলের উপরে সাজান রয়েছে ওয়াইনের বোতল, পানপাত্র, বুনো হাঁসের রোস্ট, গ্রিন স্যালাড ও আনারস।

লঘু মেজাজে হাসি-ঠাট্টায় মেতেছেন তিনজনেই। অভিনয় করে ওয়াটস দেখাচ্ছিলেন রায়দুর্লভ অক্ষত অবস্থায় অগ্রদ্বীপে পৌঁছে গিয়েছেন—এই কথা শোনার পর নবাবের প্রতিক্রিয়া কীরকম হয়েছিল। টেবিলের উপরে জ্বলতে থাকা প্রদীপের মৃদু আলোয় ওয়াটসের অঙ্গভঙ্গি ভয়ানক মজাদার দেখায়। সশব্দে হেসে ওঠেন হেস্টিংস ও স্ক্র্যাফটন। ওয়াটসও যোগ দিলেন হাসিতে।

হাসি থামিয়ে ওয়াটস বলেন, 'দ্য ওল্ড ডেভিল দেন জাস্ট কেম আউট অফ দ্য এনক্লোজার স্যাটিসফায়িং হিজ সেন্স অরগ্যানস আফটার ওয়াটার স্পোর্টস উইথ দ্য ন্যুড গার্লস। আই মেট হিম অ্যান্ড পুট মাই সাবমিশন।'

ওয়াইনের পানপাত্র হাতে নিয়ে স্ক্র্যাফটন বলেন, 'ইউ স্পয়েলড হিজ সুইট ফিলিংস স্যার।'

'ইউ আর রাইট।' মুচকি হেসে চুরুটটা ঠোঁটে গুঁজলেন ওয়াটস। হঠাৎই কী একটা কথা যেন মনে পড়ে গেল তাঁর। চুরুটটা ঠোঁট থেকে ফের দুই আঙুলের ফাঁকে ধরে বললেন, 'ও মাই গড! তোমাদের দু'জনের জন্যেই গুড নিউজ এসেছে ক্যালকাটা থেকে। চিঠির কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।'

কৌতূহলী হয়ে ওঠেন স্ক্র্যাফটন ও হেস্টিংস।

দ্রুত পকেট হাতড়ে দুটো চিঠি বের করেন ওয়াটস।

'গভর্নরের মেমো। আজই পেয়েছি।' এই বলে দু'জনের হাতে দু'টো চিঠি ধরিয়ে দেন ওয়াটস। তারপর বলেন, 'ইউ আর রিলিভড মি. স্ক্র্যাফটন। নাউ ওয়ারেন উইল সিট ইন দ্য হট চেয়ার।'

হেস্টিংস ও স্ক্র্যাফটন দু'জনেরই চোখমুখ খুশিতে উজ্জ্বল হল।

চাকরিতে উন্নতির আনন্দ হেস্টিংসের মনে। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে মুর্শিদাবাদ দরবারের রেসিডেন্টের পদে তাঁর অভিষেক হতে চলেছে। পদের গুরুত্বের নিরিখে বয়সটা বড়ই কম। তবুও তাঁর উপরে ভরসা রেখেছেন ক্লাইভ। গর্বে হেস্টিংসের বুক ফুলে ওঠে।

অন্যদিকে দরবার রাজনীতির জটিল আবর্তে পড়ে জেরবার স্ক্র্যাফটনের আনন্দ সাফল্যের সঙ্গে রেসিডেন্ট হিসেবে নিজের সময়কালটা শেষ করার। রায়দুর্লভকে অক্ষত অবস্থায় কলকাতা পাঠানোর জন্য ওয়াটসের হাতে তুলে দেবার মতো দুরূহ শেষ দায়িত্বও সুচারুভাবে শেষ করেছেন তিনি। ছুটিও মিলেছে স্ক্র্যাফটনের। ক্লান্ত শরীরটাকে ফের তরতাজা করে তুলতে হাওয়া বদলের উদ্দেশে কিছুদিনের জন্য মাদ্রাজে পাড়ি দেওয়ার আবেদন করেছিলেন। ছুটি মঞ্জুর করেছেন ক্লাইভ। সেই সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত প্রিয় এই কলিগের কথা মাদ্রাজের নতুন গভর্নর জর্জ পোকককে কয়েক ছত্র লিখেও দিয়েছেন। সেই চিঠির কপি পাঠিয়ে দিয়েছেন স্ক্র্যাফটনকে।

পোকককে লেখা ক্লাইভের চিঠিটা পড়ে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন স্ক্র্যাফটন। এমন ভালোবাসা, এমন স্বীকৃতি কোনও উপরওয়ালার কাছ থেকে আগে কখনও তিনি পাননি। কর্নেল লিখেছেন, '...ডিয়ার মি. পোকক...লিউক স্ক্র্যাফটন ইজ অ্যা ইয়ং ফেলো অফ গ্রেট ওয়ার্থ অ্যান্ড হনার। ও মাদ্রাজে যাচ্ছে

হাওয়াবদলের জন্য। আশা করি সমুদ্রের হাওয়ায় ওর স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে। মুর্শিদাবাদ দরবারের রেসিডেন্ট হিসেবে হি স্পেন্ট অ্যা টাফ টাইম। ইন মাই ওপিনিয়ন হি ম্যানেজড কোম্পানিজ অ্যাফেয়ার্স ভেরি ওয়েল। বেঙ্গলের পলিটিক্স স্ক্র্যাফটন খুব ভালো বোঝে। ওর হেল্প আমার প্রয়োজন। ওর স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিয়ে দ্রুত আমার কাছে আবার পাঠিয়ে দেবেন।...'

হাতে ধরা পানপাত্র নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দন সেরে নিলেন হেস্টিংস ও স্ক্র্যাফটন।

ওয়াটস বললেন, 'গভর্নর চাইছেন কুইক চার্জ হ্যান্ডওভার।'

'ইয়েস স্যার।' একসঙ্গে বলে উঠলেন স্ক্র্যাফটন ও হেস্টিংস।

'নাউ লেট আস সেলিব্রেট। চিয়ার্স।'

'চিয়ার্স।'

'চিয়ার্স।'

খানাপিনা শেষ হল অনেক রাতে। টলমল পায়ে নিজের তাঁবুতে ফিরে গিয়েছেন ওয়াটস। মদের নেশায় বেহেড স্ক্র্যাফটন এলিয়ে পড়ে আছেন ছাতের উপরেই। বেহুঁশ। বজরার ছাতের রেলিং ধরে একাকী দাঁড়িয়ে রয়েছেন হেস্টিংস। মৌতাতে ঝিমঝিম করছে মাথা। হেস্টিংসের গুণ হল প্রচুর মদ্যপান করলেও চট করে বেসামাল হন না। সচল থাকে মাথাটা। নদীর শীতল বাতাস বেশ ভালো লাগছিল হেস্টিংসের। চারিদিক একেবারে প্রায় নিঝুম। শুধু নবাবের রংমহল থেকে এখনও ভেসে আসছে বাইজির গানের খুশ ইলহান মৃদু আওয়াজ।

কাশিমবাজার কুঠির ওয়্যারহাউস ইনচার্জ থেকে খুব অল্প সময়েই মুর্শিদাবাদ দরবারের রেসিডেন্ট। চাকরিতে দ্রুত উন্নতি চেয়েছিলেন হেস্টিংস। যা চেয়েছিলেন তাই হয়েছে। হঠাৎই মেরির কথা মনে পড়ে হেস্টিংসের। তার পদোন্নতির খবরটা শুনলে খুব খুশি হবে মেরি।

এই মুহূর্তে মেরিকে খুবই মিস করছেন হেস্টিংস। মাঝে মাঝেই মেরি বলতেন, 'কোম্পানির চাকরিতে তোমার যা ডেডিকেশন ওয়ারেন, দেখে নিও একদিন তুমি অনেক উপরে উঠবে। সেদিন অবশ্য আমি থাকব কি না জানি না।'

'একথা বলছ কেন ডার্লিং?' মেরিকে বাহুবন্ধনে জড়িয়ে শুধোতেন হেস্টিংস।

হেস্টিংসের বুকে মাথা রেখে মেরি বলতেন, 'আমার ভয় করে ওয়ারেন। আই অ্যাম অ্যান ইল-ফেটেড লেডি।' জল ছলছল করে উঠত মেরির দু'চোখে।

সত্যিই মেরি ভাগ্যবিড়ম্বিতা। তার ফার্স্ট হাজব্যান্ড ক্যাপ্টেন জন বুকানন মারা গেলেন ফোর্ট উইলিয়ামের অন্দরে অন্ধকূপে। সে বড় দুঃসময়। তারপরে ফলতার শিবিরে ভালোবাসার বন্ধনে ধরা পড়লেন মেরি বুকানন ও ওয়ারেন হেস্টিংস। দু'জনের বিয়ে হল ফলতাতেই। অস্থায়ী চার্চে। পুরোনো জীবন, পুরোনো স্মৃতি ভুলে নতুন ঘর বাঁধলেন মেরি। জীবন যে শুধু সামনে বয়ে চলে। পিছন পানে চাইতে নেই। পলাশির যুদ্ধের পর ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে মেরি চলে এলেন কাশিমবাজার কুঠিতে। সন্তানসম্ভবা হলেন মেরি। এক কন্যাসন্তানের জন্ম দিলেন। আনন্দে মাতলেন দু'জনে। কিন্তু হঠাৎই ফের আঁধার ঘনিয়ে এল। জন্মের কয়েকদিন পরেই মারা গেল ওয়ারেন হেস্টিংস ও মেরি হেস্টিংসের প্রথম সন্তান। একরত্তি শিশুকন্যাকে নিজের হাতে গোর দিতে গিয়ে অঝোরে কেঁদেছিলেন হেস্টিংস। কিছুদিনের জন্য বাক্যহারা হয়ে গিয়েছিলেন মেরি। তারপরে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হলেন। তবে যে মেরি ঝরনার মতো উচ্ছল ছিলেন, বড্ড চুপচাপ হয়ে গেলেন।

চাঁদের রুপোলি আলোয় চিকচিক করছে নদীর জল। হেস্টিংসের দুই গাল বেয়ে জলের ধারা নেমে আসে। কোটের আস্তিনে চোখের জল মুছে দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন হেস্টিংস। মাঝ নদীতে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে মণি বেগমের ময়ূরপঙ্খী বজরা। সারি সারি দীপবর্তিকায় ফুটে উঠেছে জলযানটির অবয়ব। জোছনামাখা

জলের বুকে এই আলোকমালার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হেস্টিংসের মনের পর্দায় ভেসে ওঠে একটা ছবি। শূন্য বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন মেরি। তাঁর কোলে শায়িত প্রাণহীন একরত্তি শিশুকন্যা। যেন ঘুমিয়ে আছে। হঠাৎই হেস্টিংসের বুকের ভিতরটা কেমন যেন মুচড়ে উঠল। বজরার রেলিঙে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি।

৬০

আকাশজুড়ে ঘন কালো মেঘের আগ্রাসী বিস্তার। দিনের বেলাতেই চারিদিকে যেন আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। বৃষ্টি নেমেছে সকাল থেকে। শ্রাবণের ক্লান্তিহীন একঘেয়ে ধারাবর্ষণে ভিজছে ঢাকা শহর। ভিজছে জিঞ্জিরা প্যালেস। অলস, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ ভঙ্গিতে একটা বুরুজের মাথায় বসে ভিজছে কয়েকটা কাক। এই ধারাপাত নিয়ে কোনও হেলদোল তাদের নেই।

বর্ষায় ফুলেফেঁপে উঠে ফুসছে বুড়িগঙ্গা। চঞ্চল জলরাশি ছলাৎছলাৎ শব্দে ধাক্কা মারছে নদী গর্ভের কিনারা থেকে উঠে আসা প্যালেসের বিরাট চওড়া, পাথর গাঁথা প্রাকারের গায়ে। দোতলায় একটি কক্ষ সংলগ্ন ক্ষুদ্র অলিন্দে একাকী দাঁড়িয়ে রয়েছেন শরফ উন্নেসা—আলিবর্দির বেগম, সিরাজের নানি বেগম। চেয়ে আছেন কালো মেঘে ছাওয়া বর্ষণমুখর আকাশের পানে।

নানি বেগমের শরীরটা গত কয়েক মাসে অনেকটা ভেঙেছে। কালির প্রলেপ পড়েছে চোখের নীচে। মাথার চুল রুক্ষ। দেহভঙ্গিতে স্পষ্ট অবসাদের ছাপ। নানি বেগম আজ যেন মৃতকল্প এক মহীরুহ। শিকড় উপড়ে চিরতরে মাটিতে আশ্রয় নেওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনে চলেছেন।

কেন এই গর্দিশ? কেন এই বদ-কিসমতি? কেন এই দুঃখ-জহমত? কেন রাতারাতি হারিয়ে গেল সব খুশি? কেন বেরং হল জিন্দেগি? কেন অচানকই বরবাদ হয়ে গেল নবাব আলিবর্দি খাঁর খানদান? কার পাপে? কার অভিশাপে? বোবা করুণ চাহনিতে আকাশের দিকে চেয়ে সর্বশক্তিমান পয়গম্বরের কাছে জবাব মাঙেন শরফ উন্নেসা। তিনি ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত। দুঃসহ স্মৃতির বোঝা মাথায় নিয়ে দেহটাকে যেন শুধু শুধু বয়ে নিয়ে চলেছেন। অর্থহীন এই দিন গুজরান। মাটি নিয়ে রেহাই পেয়েছেন আলিবর্দি খাঁ। তাঁর কি কোনও নিস্তার নেই?

সহসা আকাশে গুমরে ওঠে মেঘরাশি। নানি বেগম চমকে ওঠেন। সেদিন রাতেও আকাশ এমনই গুমরে গুমরে উঠছিল, বুড়িগঙ্গার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া দমকা হাওয়ায় হঠাৎই যেন নানি বেগমের কানে ভেসে আসে নিষ্পাপ কিশোর মির্জা মেহেদির আর্তনাদ—'নানি বেগম আমাকে বাঁচাও। ওরা আমাকে খতম করবে।' জল্লাদের মতো দুই সেপাই মির্জাকে টেনে হিচড়ে নিয়ে চলে গেল। রক্ত রক্ত—শুধু চাপ চাপ রক্ত। পাষাণের মেঝের উপরে পড়ে আছে রক্তস্নাত একটা নিথর দেহ। কে পড়ে আছে ওভাবে? ওই তো মির্জা! চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। পাশে দাঁড়িয়ে শুঁড় দোলাচ্ছে পাহাড়ের মতো বিশাল একটা হাতি। মিরনের নির্দেশে হাতি দিয়ে পিষে মারা হয়েছে মির্জাকে। কি বীভৎস! কী ভয়ংকর!

'হে আল্লা—কোন গুণাহের কাজ করেছিল মির্জা? আমি ইনসাফ চাই।' আকাশের দিকে মুখ তুলে চিৎকার করে ওঠেন নানি বেগম। তারপর মাথা ঠুকতে থাকেন পাথরের দেওয়ালে।

ছুটে আসেন জেনেতুন্নেসা। মুর্শিদকুলি খাঁর কন্যা, শরফরাজ খাঁর আম্মিজান। এই প্যালেসেরই একতলার বাসিন্দা। বেনসিব এক জেনানা। তাঁর কথা মনে রাখেনি মুর্শিদাবাদ। দুঃখে-শোকে পাথর হয়ে যাওয়া জেনাতুন্নেসা বেগম ধীরে ধীরে মেনে নিয়েছেন নিজের বদ-কিসমতি। মাঝে মাঝেই দোতলায় আসেন, নানি বেগমের খোঁজখবর নিয়ে যান।

'কী করছ? এ কী করছ বহেন? শান্ত হও।'

শরফ উন্নেসাকে পরম স্নেহে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে তার হাত বোলাতে থাকেন জেনাতুন্নেসা। 'শান্ত হও বহেন শান্ত হও। নসিব বড় আজিব চিজ। সে তো তোমার আমার মুঠোবন্দি গোলাম-বাঁদি নয়, কেঁদে কী করবে বলো? তোমার আঁসুর কিম্মত কেউ বুঝবে না। এ দুনিয়া সঙ্গদিল।'

'তোমার খুশি বরবাদ করেছিলেন নবাব আলিবর্দি খাঁ। তাই আমার এই কিসমতি। রহেম করো দিদি, রহেম করো।' হাহাকার করে ওঠেন নানি বেগম।

জেনাতুন্নেসা শান্ত গলায় বলেন, 'ইনসান মামুলি এক চিজ। পয়গম্বরের যা খায়েশ, তাই হয়েছে। ঘরে চলো বহেন। জিন্দেগি স্রেফ এক সুনহারি খোয়াব নয়, সিদ্দত-জহমত-বেনসিবি-বদকিসমতি এই সব সয়েই দিন গুজরান করতে হয়।'

এই দেলাসায় খানিকটা শান্ত হন শরফ উন্নেসা।

বুড়িগঙ্গার যে পাড়ে ঢাকা শহর তার বিপরীত পাড়ে অবস্থিত জিঞ্জিরা প্যালেস। শহরের কোলাহল থেকে দূরে নির্জন নিরিবিলি এক স্থান। এখানে তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়েছে বুড়িগঙ্গা। সংলগ্ন তটভূমি সবুজে মোড়া, দ্বীপাকৃতির। একদা এখানেই আমোদফূর্তির জন্য হাভেলি গড়েছিলেন সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ। হাভেলি থেকে ঢাকা শহরে আসা যাওয়ার জন্য বুড়িগঙ্গার উপরে গড়ে তোলা হয়েছিল কাঠের সাঁকো। সেই সাঁকো এখনও অটুট আছে। তবে ইব্রাহিম খাঁ ও পরে ঔরঙ্গজেব বাদশার নাতি আজিমুশ্বানের অতিপ্রিয় এই হাভেলি এখন এক হাবুজখানা।

গিরিয়ার যুদ্ধে মারা গেলেন মুর্শিদকুলি খাঁর দৌহিত্র, সুবে বাংলার তৎকালীন নবাব সরফরাজ খাঁ। সিরাজের মতোই ওমরাহ, জমিদার ও দেশি বেনিয়ানদের চক্রান্তের শিকার হয়েছিলেন তিনি। সেবার সাজিশের কারবারিদের বাজি ছিলেন আলিবর্দি খাঁ। সরফরাজ খাঁকে মসনদচ্যুত করার জন্য পাটনার ডেপুটি সুবাদার আলিবর্দিকে উত্তেজিত করে তুলেছিলেন ষড়যন্ত্রীরা। সসৈন্যে পাটনা থেকে এগিয়ে এলেন আলিবর্দি। গিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে গোলা এসে লাগল সরফরাজ খাঁর মাথায়। তিনি হাতির পিঠ থেকে ছিটকে পড়লেন মাটিতে। গাদেলার উপর শায়িত নবাবের নিথর দেহটা নিয়ে রাতের অন্ধকারে চুপিসারে চেহেল সেতুনে ফিরে এল হাতি। এ দৃশ্য দেখে আর্তনাদ করে উঠছিলেন নবাবজননী জেনাতুন্নেসা। পুত্রশোকে কাতর মায়ের বুকফাটা আর্তনাদ সেদিন চেহেল সেতুনের বোবা পাথরে প্রতিধ্বনিত হয়ে বিষাদঘন আবহ রচনা করেছিল। মসনদে বসে শরফরাজ জননীকে জিঞ্জিরা প্যালেসে নির্বাসিত করলেন নবাব আলিবর্দি খাঁ। সেই থেকে জেনাতুন্নেসা ও সরফরাজ খাঁর খানদানের বাকি সদস্যরা এখানে বন্দি হয়ে আছেন।

আলিবর্দির হাতে মওত হয়েছিল সরফরাজের। মুসিবত হয়েছিল, মুর্শিদকুলি ও সুজাউদ্দৌলার রক্তের সম্পর্কের উত্তরাধিকারীদের। তবে এ নিয়ে আলিবর্দি বা তাঁর পরিবারের কারও উপর নফরতি নেই জেনাতুন্নেসা বেগমের। নফরতি-কেরাহিয়াত এসবের উর্দ্ধে চলে গিয়েছেন তিনি। মেনে নিয়েছেন এই সারসত্য—এ দুনিয়া চলে খোদাতালার খুশ খেয়ালে। ইনসান তাঁর হাতের পুতুল।

জমানা বদলেছে। গিরিয়ার পর ফির ইনকিলাব হয়েছে মুর্শিদাবাদে। জেনাতুন্নেসার মতো আজ আলিবর্দির বেগম ও দুই বেটিও একই হাভেলিতে বন্দি। নসিবের কী পরিহাস!

দেওয়ালে মাথা ঠুকতে থাকা নানি বেগমকে কক্ষের অন্দরে টেনে নিয়ে এসে পালঙ্কে শুইয়ে দিলেন জেনাতুন্নেসা। হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন তাঁর কপালে।

দেওয়ালজোড়া মস্ত বেলজিয়ান কাচের আরশির সামনে একাকী দাঁড়িয়ে আছেন ঘসেটি বেগম। স্তনযুগল অনাবৃত। ঘসেটি বেগমের দৃষ্টি নিবদ্ধ আরশিতে। সম্মোহিতের মতো চেয়ে আছেন নিজের প্রতিবিম্বের দিকে।

কোমরে জড়ানো একখানা স্বচ্ছ মসলিনের কাপড়। কোমরের বাঁধন আলগা করে দিলেন বেগম সাহেবা। গা পিছলে কাপড়া খসে পড়ল ফরাসের উপরে। নিজের নিরাবরণ দেহের দিকে চেয়ে রইলেন বেগম সাহেবা। তারিফির ভাষা ফুটে উঠল চোখে।

মধ্যতিরিশে পৌঁছেছেন ঘসেটি বেগম। শরীরের বাঁধন এখনও এতটুকু টোল খায়নি। অসামান্য রূপ, হুকুমতের তাগদ, একাধিক পুরুষের সংসর্গ, বিত্তসুখ এ জিন্দেগিতে প্রায় সবকিছুই পেয়েছিলেন তিনি, অনেক জেনানাই যা পায় না এক জনমে। লেকিন নসিবের খেয়ালে হারিয়েছেন প্রায় সবই। শুধু রয়ে গিয়েছে এই দেহ, এই রূপরাশি। নিজের এই শেষ সম্পদটুকুকে আগলে রাখতে চান, হয়তো সেকারণেই ইদানীং রূপচর্চা ও প্রসাধনের প্রতি বাড়াবাড়ি রকমের ঝোঁক হয়েছে তাঁর। অনেকে বলে তিনি উন্মাদ দশাগ্রস্ত। কথাটা পুরোপুরি মিথ্যে নয়। দীর্ঘদিন হতাশা ও অবসাদে ভুগতে ভুগতে ঘসেটি বেগম খানিকটা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছেন। সারাক্ষণই বিচরণ করেন এক কল্পনার জগতে। ভয়ানক উগ্রসুন্দর রূপে নিজেকে সাজিয়ে তুলে অপেক্ষা করেন কোনও এক আশিকের জন্য। অলিন্দে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকেন পথের পানে। প্রত্যাশা করেন, ঘোড়া হাঁকিয়ে আসবে কোনও সুপুরুষ ওমরাহ। কেউ আসে না। আসার কথাও নয়। ফের তিনি হতাশায় নিমজ্জিত হন। তখন শরাবের নেশায় ডুবে গিয়ে মনের ইলাজ করেন।

জিঞ্জিরা প্যালেসকে আজকাল কখনও কখনও মোতিঝিল বলে ভুল করেন ঘসেটি বেগম। তখন ফিরে আসে নবাবজাদির মেজাজের পুরোনো ঝাঁঝ। অস্থির হয়ে কোড়া হাতে পদচারণা করেন ঘরের মধ্যে। রাজবল্লভের পথ চেয়ে প্রতীক্ষা করেন। একদা রাজবল্লভ ছিলেন তাঁর দেওয়ান। অলীক কল্পনায় ভাসতে ভাসতে বেগম সাহেবা ভাবেন, মসনদ ফিরে পাওয়ার কোনও উপায় বাতলাতে রাজবল্লভ ছুটে আসবেন তাঁর কাছে। শোনাবেন খুশির খবর। ফের নসিবের চাকা ঘুরবে। বাঁদিরা কানাকানি, ফিসফাস করে, বেগম সাহেবার দিমাগ ঠিক নেই।

সারা দেহে সুগন্ধি তেল মাখলেন ঘসেটি বেগম। স্তনের উপরে ও কেশবিহীন বাহুমূলে ছিটিয়ে দিলেন গোলাপজল, আতর। ময়ূরকণ্ঠী রঙের কাঁচুলি আটোসাটো করে বাঁধলেন বুকে। ত্বকের সঙ্গে এঁটে বসা সাদা রঙের পেশোয়াজের উপরে পরলেন প্রায় পা অবধি লুটিয়ে পড়া আসমানি রঙের ঘাগরা। চোখে লাগালেন সুরমা, কাজল। ভুরু আঁকলেন যত্ন করে। তাম্বুলে রাঙা করলেন ঠোঁট। কপালে পরলেন বিন্দিয়ার টিপ। জরির ফিতে দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে চুল বাঁধলেন খুব যত্ন করে। চুলে গুঁজলেন কদম ফুল। হাতে লাগালেন মেহেন্দি। এরপর সোনা, হিরে, চুনি, পান্নার বহুমূল্যবান গয়না পরে, কাঁচুলির উপরে উড়নি বিছিয়ে আরশির সামনে এসে ফের যখন দাঁড়ালেন, গোটা আরশি যেন রূপের জলুসে ঝলমল করে উঠল।

কড়া নাড়ার আওয়াজ হল দরজায়। এ আওয়াজ ঘসেটি বেগম চেনেন। একমাত্র খাস বাঁদি মেহেরেরই অধিকার আছে বেগম সাহেবার ঘরের দরজায় কড়া নাড়ার। খুব জরুরি কোনও দরকার না থাকলে মেহের বিরক্ত করে না। কী হল?

দরজা খুললেন ঘসেটি বেগম।

তসলিম জানায় মেহের।

'কী হয়েছে?' খানিকটা বিরক্তির সুর ধরা পড়ে ঘসেটি বেগমের গলায়।

'গোস্তাকি মাফ করবেন মালকিন। রাজবল্লভ দূত পাঠিয়েছেন মুর্শিদাবাদ থেকে। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। বললে বহুত জরুরি বাত।' চাপা গলায় বলে মেহের।

খুশিতে হঠাৎই উচ্ছল হয়ে ওঠেন ঘসেটি বেগম। রাজবল্লভ দূত পাঠিয়েছেন তাঁর কাছে! কী পয়গাম? তাহলে কী এতদিন ধরে যে একিন ও ইরাদা নিয়ে তিনি ইন্তেজার করছিলেন, তা সত্যি হতে চলেছে? ফের ইনকিলাব হবে মুর্শিদাবাদে?

ঘসেটি বেগম প্রবল উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলেন, 'জলদি তাকে ডেকে নিয়ে আয় অন্দরে।'

বেহেস্তের ফেরেস্তার মতো দেখাচ্ছে তার মালকিনকে। মেহের মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে থাকে মালকিনের মুখপানে।

'হাঁ করে দেখছিস কী? যে এসেছে তাকে জলদি নিয়ে আয়।'

হুঁশ ফেরে মেহেরের। 'জি হুজুরাইন।'

খানিকবাদে বোরখা পরিহিতা এক আগন্তুককে অন্দরমহলে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নেয় মেহের।

সন্তর্পণে কক্ষের দোর বন্ধ করে দেন ঘসেটি বেগম।

মুখের অবগুণ্ঠন সরায় আগন্তুক।

'ব-ক-র আ-লি!' বিস্ফারিত হয়ে ওঠে ঘসেটি বেগমের দুই চোখ।

'জি হুজুরাইন! সেলাম!'

আলিবর্দির জমানায় নিজামত কেল্লার দেওয়ানের অধীনে নোকরি করত বকর আলি। ঘসেটি বেগমের খুবই পরিচিত। বেগম সাহেবা শুধোলেন, 'কী পয়গাম এনেছ বকর ভাইয়া?'

'পয়গাম শুভ হুজুরাইন।' মুচকি হাসে বকর আলি।

'সচ?' উৎসাহিত হয়ে ওঠেন ঘসেটি বেগম।

বকর আলি বলে, 'আমি অনেক মেহেনত করে নবাব ও নবাবজাদার নজর এড়িয়ে এখানে এসেছি। হাতে ওয়াক্ত খুবই কম। আপনাকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যেতে এসেছি হুজুরাইন।'

'মুর্শিদাবাদ?'

'জি হুজুরাইন।'

'সচ বলছ বকর ভাইয়া?' আবেগে গলা কেঁপে যায় ঘসেটি বেগমের।

'আমি এসেছি রাজবল্লভজির হুকুমে। তার সঙ্গে গোপন বোঝাপড়া হয়েছে কোম্পানির।'

'কী বোঝাপড়া? জলদি বলো।' ঘসেটি বেগম অধীর হয়ে ওঠেন।

'ইদানীং নেশায় বুঁদ হয়ে থাকেন নবাব খাঁ সাহেব। নবাবজাদা মিরন নাদান, নালায়েক। থমকে গিয়েছে নিজামতের কাজ-কারবার। সওদা চালাতে গিয়ে ভয়ানক তকলিফের মধ্যে পড়তে হচ্ছে ইংরেজ কোম্পানিকে। মুর্শিদাবাদে ফির ইনকিলাব ঘটাতে চান ক্লাইভ। তিনি চান আপনিই নিজামতের রাশ ধরুন। আপনি নবাব আলিবর্দির বড়ি বেটি। আপনার চেয়ে মসনদের বড় দাবিদার আর তো কেউ নেই হুজুরাইন।'

প্রবল আবেগে বকর আলির হাতটা চেপে ধরেন ঘসেটি বেগম। বলেন, 'আল্লার নামে কসম খেয়ে বল তুমি সচ বলছ বকর ভাইয়া?'

বকর আলি মুচকি হেসে বলে, 'বহুকাল নবাব আলিবর্দি খাঁর নিমক খেয়েছি। তার বড়ি বেটির সঙ্গে নিমকহারামি তো করতে পারি না।'

খুশিতে উদ্বেল হয়ে ঘসেটি বেগম ছুটে যান পাশের কক্ষে। একমুঠো আশরফি নিয়ে ছুটে এসে বলেন, 'এই নাও বকর। তোমার নজরানা। বহুত খুশির খবর শোনালে তুমি।'

আশরফিগুলো দ্রুত জেবের অন্দরে চালান করে বকর আলি বলে, 'খুব সাবধান হুজুরাইন। কেউ যেন এ বিষয়ে কিছু জানতে না পারে।'

ঘসেটি বেগম বলেন, 'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো বকর ভাইয়া। আমি বেওকুফ নই।'

'আজ রাতেই রওনা হতে হবে হুজুরাইন।'

'আজই?' ঘসেটি বেগম ভয়ানক উত্তেজিত।

'দেরি হলে সব বানচাল হয়ে যেতে পারে।'

'কিন্তু এই জিঞ্জিরখানা থেকে কী করে বেরোব ভাইয়া?'

'তৈয়ার থাকবেন হুজুরাইন। আমি আসব জেনানার জালসাজিশে। গোপন সুড়ঙ্গপথে আপনাকে বের করে নিয়ে যাব এই হাবুজখানা থেকে।'

'মেহেরকে আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।'

থমকে যায় বকর আলি। কী যেন ভাবতে থাকে।

'মেহেরকে ভরসা করা যায়। অনেকদিন আমার কাছে রয়েছে।'

মুচকি হেসে বকর আলি বলে, 'আপনার যা ইরাদা, তাই হবে হুজুরাইন। তবে কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন, বাঁদিকে আগাম ভেঙে কিছু বলবেন না যেন।'

'বুঝেছি ভাইয়া।'

'আমি আসি। বান্দার কোনও গুস্তাকি হয়ে থাকলে রহেম করবেন হুজুরাইন।'

মুখের সামনে কালো আবরণটা নামিয়ে দিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায় বকর আলি।

দরওয়াজা বন্ধ করে ফের আরশির সামনে এসে দাঁড়ান। হর্ষে, উল্লাসে বন্ধ ঘরের মধ্যে একাকী উচ্চস্বরে হেসে ওঠেন। বহুদিন পরে ঘসেটি বেগম এমন প্রাণ খুলে হাসলেন।

চোখের নীচে কালির প্রলেপ। বেশবাস মলিন। মাথার চুল এলোমেলো। জিঞ্জিরা প্যালেসে নিজের কক্ষ থেকে কখনও বেরোন না সিরাজদ্দৌলার আম্মিজান- আমিনা বেগম। কথা বলেন না কারও সঙ্গে। মাঝে মাঝে একাকী করুণ সুরে কাঁদেন। আফিং, গাঁজা, সিদ্ধি, ভাঙ, সিরাজি সব রকমের নেশার প্রতিই ইদানীং বড় বেশি রকমের ঝুঁকেছেন আলিবর্দির ছোটি বেটি। দিনের বেশির ভাগ সময় নেশায় বেসামাল হয়ে থাকেন। গতকাল রাতে ফরাসের উপরেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুম যখন ভাঙল তখন প্রায় বিকেল হয়ে এসেছে।

দুধে খুরমা ভিজিয়ে নিয়ে এসেছে বাঁদি। আমিনা বেগমের খেতে ইচ্ছে করে না কিছু। তবুও খেতে হয়। চামচে করে বাদিই মুখে তুলে দিচ্ছে খাবার। কয়েক চামচ খাওয়ার পর সবেগে মাথা নাড়েন আমিনা বেগম - 'এসব নিয়ে যা। ভালো লাগছে না।'

'বিকেল হতে চলল। কিছু খাওয়া হয়নি আপনার। খেয়ে নিন হুজুরাইন।' বাঁদি জোর করে।

'বলছি তো ভালো লাগছে না।' চিৎকার করে উঠে আমিনা বেগম। হাতের এক ঝটকায় উলটে দেন বাঁদির হাতে ধরে রাখা দুধ-খুরমা ভর্তি পাথরের পাত্র।

ফরাস পরিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে বাঁদি।

'কী করে খাই বল দেখি? কতদিন খায়নি আমার সিরাজ, আমার মির্জা। ঘুমিয়ে আছে কবরে।' এই বলে হঠাৎই ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন আমিনা বেগম।

বাঁদির দুচোখও জলে ভরে ওঠে। কোন দেলাসায় শান্ত হবে তার হুজুরাইন, ভেবে পায় না।

নিজেকে সামলে নিয়ে দছমালে চোখ মোছেন আমিনা বেগম।

'হ্যাঁ রে কোয়েল, মুর্শিদাবাদের কোনও খবর কানে আসে তোর? কে জানে কেমন আছে লুৎফা, কেমন আছে সায়েরা—'

'সায়েরা খুশ তবিয়ত আছে হুজুরাইন। লুৎফা বেগমও সহি সালামত আছেন।'

সহসা পুরুষকণ্ঠ শুনে সচকিত হয়ে ওঠেন আমিনা বেগম।

চমকে উঠে ঘুরে তাকায় কোয়েলও।

দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে বকর আলি। হাতে একটা ডালি। তাতে উপচে পড়ছে বসরাই গুলাব।

চোখ কুঁচকে আমিনা বেগম বলেন 'কে? মিরনের কাসিদ? খতম করতে এসেছ আমাকে?'

'আমি বকর আলি। আপনার বান্দা। চিনতে পারছেন না ছোটি হুজুরাইন?'

'বকর আলি? দেওয়ানখানার নোকর? মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছ?'

'জি ছোটি হুজুরাইন। আপনার জন্য বসরাই গুলাব নিয়ে এসেছি। আপনি ভালোবাসেন।' এই বলে গুলাবের ডালি আমিনা বেগমের সমুখে ফরাসের উপরে রাখে বকর আলি।

একটা গুলাব তুলে নিয়ে আমিনা বেগম হতাশ গলায় বলেন, 'বরবাদ হয়ে যাওয়া এক জেনানার জন্য তুমি এত ফুল নিয়ে এসেছ বকর ভাই? ইয়াদ রেখেছ আমাকে?'

'বহুকাল খিদমত খেটেছি আপনাদের। আমি কি আপনাদের ভুলতে পারি ছোটি হুজুরাইন?'

'মুর্শিদাবাদের কথা বলো। কেমন আছে আমার সিরাজ? কেমন আছে মির্জা? লুৎফা রোজ ফুল ছড়িয়ে দেয় কবরে? চিরাগ জ্বালে?'

'লুৎফা বেগম খোশবাগকে বেহেস্ত করে তুলেছেন। বড় শান্তিতে ঘুমিয়ে আছেন নবাব।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমিনা বেগম বলেন, 'লুৎফা সাক্ষাৎ ফেরেস্তা। এক খুশনসিব আওরাত। তাই বোধ হয় কোনও হাবুজখানা কয়েদ করতে পারেনি ওকে।'

'মুর্শিদাবাদে যাবেন ছোটি হুজুরাইন? নবাবের কবরকে জেয়ারত করে আসবেন।'

'ইচ্ছে তো করে বকর ভাইয়া। লেকিন যাব কী করে?'

'আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি?'

করুণ হাসি হেসে আমিনা বেগম বলেন, 'মজাক করছ বকর ভাইয়া?'

'মজাক নয় ছোটি হুজুরাইন। আমি সচ বলছি। মরহুম নবাবের নামে কসম খেয়ে বলছি।'

'পরোয়ানা কোথায়? কী করে বেরোব এখান থেকে?'

'পরোয়ানা আমি নিয়ে এসেছি ছোটি হুজুরাইন।'

অবাক চোখে বকর আলির দিকে তাকালেন আমিনা বেগম।

বকর আলি মুখে হাসির রেশ নিয়ে বলে, 'আমি সচ বলছি। বিলকুল সচ।'

'কী বলছ? সিরাজের কবর জেয়ারত করার পরোয়ানা দিয়েছেন খাঁ সাহেব?'

'মিরজাফর খাঁ তো নামেই নবাব। ক্লাইভ সাহেবের খায়েশের গোলাম তিনি। হুকুমত দিয়েছেন ক্লাইভ সাহেব। নবাবের সাধ্য কী তা ইনকার করার? আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন খাঁ সাহেব। আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আরও একটা খুশির খবর আছে ছোটি হুজুরাইন। আর এখানে ফিরে আসতে হবে না আপনাকে। এখন থেকে মুর্শিদাবাদেই থাকবেন। রোজ নবাবের কবরে ফুল ছড়িয়ে, চাদর চড়িয়ে চিরাগ জ্বেলে দেবেন।'

'ক্লাইভ সাহেবের অনেক মেহেরবানি।' এই বলে ফুপিয়ে কেঁদে ওঠেন আমিনা বেগম।

'তৈরি থাকবেন ছোটি হুজুরাইন। আজ রাতেই রওনা হতে হবে। আমি এখন আসি।'

কান্না থামিয়ে আমিনা বেগম বলেন, 'কত খুশির খবর নিয়ে এলে তুমি? কিন্তু বলো তো কী সওগাত দিই তোমাকে? আজ যে কিছুই আমার নেই।'

মাথা ঝুঁকিয়ে বকর আলি বলে, 'আপনার খুশিই আমার সওগাত।'

একটু দাঁড়াও। এই বলে দ্রুত ভিতরের ঘরে গিয়ে দেরাজ খুলে সুন্দর কারুকার্য করা ছোট্ট একটা কাঠের পেটিকা নিয়ে আসেন আমিনা বেগম।

'সিরাজের পছন্দের চিজ। তোমাকে দিলাম।' এই বলে পেটিকা খুললেন আমিনা বেগম।

বকর আলির চোখ ঝলসে যায়। বাক্সের মধ্যে রয়েছে হিরকখচিত বহুমূল্যবান একটি আংটি।

'তোমার ইনাম।'

হাত পেতে আংটিটা নিয়ে বকর আলি বলে, 'আমি বোধ হয় এর যোগ্য নই ছোটি হুজুরাইন।'

কথাটা বলতে গিয়ে বকর আলির গলা কেঁপে যায়।

কাশিমবাজারে ওয়ারেন হেস্টিংসের ছোট্ট বাংলোটা যেন এক স্বপ্নের দেশ। সরু লাল ইটের তৈরি কোঠাবাড়িটাকে ঘিরে রেখেছে নানারকমের গাছপালা, সবুজ লন ও কেয়ারি করা রকমারি ফুলের বাগান। পলাশির যুদ্ধের পর রেসিডেন্টের সহকারীর পদে বহাল হওয়ার পর পত্নী মেরিকে নিয়ে এই বাংলোর বাসিন্দা হয়েছেন ওয়ারেন হেস্টিংস। আগে এখানে থাকতেন স্ক্র্যাফটন। সে সময় এ বাড়ির চারপাশের পরিবেশ এমন মনোরম ছিল না। এখানে এসে অল্প সময়ের মধ্যেই রকমারি গাছপালা দিয়ে বাংলোর বাগানটা সুন্দর করে সাজিয়ে তুলেছেন মেরি। নিজেই ঘুরে ঘুরে দেখভাল করেন মালিদের কাজ। নিজের হাতেও গাছের পরিচর্যা করেন।

বাংলোয় প্রবেশের মুখে গেটের উপরে বাঁশের বাখারি দিয়ে তৈরি ধনুকের মতো কাঠামোর গা বেয়ে এলোমেলো ভাবে বেড়ে উঠেছে মাধবীলতা। মই বেয়ে উঠে একজন মালি কাঁচি হাতে যত্ন করে ছেটে দিচ্ছিল উচ্ছৃঙ্খল ভাবে বেড়ে ওঠা শাখাপ্রশাখাকে। নীচে দাঁড়িয়ে তার কাজ তদারক করছিলেন মেরি। পরনে ফুলেল নকশাতোলা সিল্কের গাউন। জরির ফিতে দিয়ে খোঁপা বাঁধা চুল। ছোট্ট একটা সূর্যমুখী ফুল গুঁজেছেন খোঁপায়। মুখ তুলে নির্দেশ দিচ্ছিলেন মালিকে। তাঁর নিজের অজান্তেই একগাছি চুল এসে পড়েছে গালের উপরে। বড় অপূর্ব দেখাচ্ছিল তাঁকে।

‘মেরি-ই-ই! মেরি-ই-ই! মাই ডার্লিং—’

সচকিত হয়ে ওঠেন মেরি। ঘুরে তাকিয়ে দেখলেন নদীর দিক থেকে ছুটতে ছুটতে আসছেন ওয়ারেন হেস্টিংস।

মেরি-ই-ই! মেরি-ই-ই। ভয়ানক উত্তেজিত হেস্টিংস।

ছুটে এসে শূন্যে দু-হাত প্রসারিত করে মেরির সামনে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন ওয়ারেন হেস্টিংস। ‘মেরি মাই সুইটি। মাই ডার্লিং।’

‘কী হয়েছে? হোয়াই সো এক্সাইটেড?’

ওয়ারেনের হাত ধরে তাকে টেনে তোলেন মেরি।

‘মেরি মেরি মাই ডার্লিং—’ মেরিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে চুম্বনে উদ্যত হলেন ওয়ারেন।

‘আঃ! কী অসভ্যতা করছ? ছাড়ো। বাগানে কাজ করছে লোকজন। পাগল কোথাকার। এত খুশি কীসের?’

হেস্টিংস হেসে বলেন, ‘কোথায় লোকজন? কেউ তো নেই।’

চারিদিকে চোখ বুলিয়ে অবাক হয়ে যান মেরি। সত্যিই তো কেউ নেই। একটু আগেই তো তিনজন মালি কাজ করছিল বাগানে। সাহেব ও মেমসাহেবের কান্ডকারখানা দেখে সব ছুটে পালিয়েছে। খিলখিল করে হেসে উঠলেন মেরি। হাসলে তাঁর দুগালে টোল পড়ে।

প্রথম কন্যাসন্তানের অকালমৃত্যুর পর থেকে খুব মনমরা হয়ে থাকতেন মেরি। অনেকদিন পর মেরিকে এভাবে প্রাণ খুলে হাসতে দেখলেন ওয়ারেন। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে রইলেন মেরির মুখের দিকে। সত্যিই হাসলে মেরিকে অপূর্ব দেখায়।

‘হাঁ করে অমন দেখছ কী?’

‘তোমাকে!’

‘সত্যিই তুমি পাগল একটা। ঘরে চলো।’

বাগানের পথ ধরে হাঁটতে থাকেন হেস্টিংস দম্পতি।

মেরি শুধোলেন, 'অমন এক্সাইটেড হয়ে ছুটতে ছুটতে এলে যে? কী হয়েছে?'

'ছুটে আসব না? পারলে উড়ে আসতাম। আই হ্যাভ বিন অ্যাংশাস সিন্স ইয়েসটারডে।'

'ও মাই গড! হোয়াট হ্যাপেনড?'

'আমি দরবারের রেসিডেন্ট হয়েছি মেরি।'

'রিয়েলি?' আনন্দে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন মেরি। খুশিতে উদ্ভাসিত হয় মুখ।

'গভর্নরের অর্ডার এসেছে। অগ্রদ্বীপে পৌঁছে হাতে পেলাম।' তারপর নিমেষে মেরিকে পাঁজাকোলে করে তুলে ঘরে ঢুকে পড়লেন ওয়ারেন হেস্টিংস।

'এই দ্যাখো দ্যাখো কী করছ?'

'ইউ ব্রট মাই গুড লাক।'

মেরিকে বিছানার উপরে ফেলে তার উপরে উপুড় হয়ে পড়ে ওয়ারেন বললেন, 'তোমাকে খুব আদর করতে ইচ্ছে করছে ডার্লিং।'

মেরি হাসেন। সোহাগ করে হেস্টিংসের টিকালো নাকটা নেড়ে দিয়ে বলেন, 'আই অলসো হ্যাভ অ্যা গুড নিউজ ফর ইউ।'

'গুড নিউজ?'

'আই অ্যাম প্রেগন্যান্ট।'

'রিয়েলি?' এবারে ওয়ারেন হেস্টিংস আনন্দে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন।

মৃদু হেসে ইতিবাচক ঘাড় নাড়েন মেরি।

খুশিতে উচ্ছল হেস্টিংস মুখটা আরও নীচের দিকে নামিয়ে আনেন।

সাড়া দিলেন মেরি। ধরা দিলেন প্রগাঢ় চুম্বনে।

বিকেলের আলো প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। বাগান থেকে ভেসে আসছে পাখির কলকাকলির শব্দ। বাতিদান হাতে ঘরে আসছিল এক নোকর। আলিঙ্গনে মত্ত সাহেব ও মেমসাহেবকে দেখে উলটো মুখে ছুটে পালাল।

সপ্তাহখানেক হতে চলল, অগ্রদ্বীপ থেকে যাত্রা করে হুগলি এসে পৌঁছেছেন নবাব মিরজাফর খাঁ। নবাবের খোশ-আমদেদ, আমোদ ফূর্তি, আশরতের এলাহি আনজাম করে রেখেছিলেন ফৌজদার ওমর বেগ। খুশিতে ভাসছেন নবাব। তাঁর সঙ্গীসাথীরাও গা এলিয়ে দিয়েছে আলস্যে। কলকাতা পৌঁছনোর কোনও আগ্রহ নেই কারোরই। অবশ্য রায়দুর্লভকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় গিয়েছেন স্ক্র্যাফটন। ক্লাইভের সঙ্গে কিছু জরুরি আলোচনা সেরে কয়েকদিন পরে স্ক্র্যাফটন ফিরবেন কাশিমবাজারে। তারপর রেসিডেন্টের চার্জ হ্যান্ডওভার করবেন হেস্টিংসকে।

ওদিকে নবাবকে দ্রুত কলকাতায় নিয়ে আসার জন্য বারবার ক্লাইভের বার্তা আসছে। কী করে এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করে নবাবকে দ্রুত কলকাতায় টেনে নিয়ে যাওয়া যায়, তা নিয়ে ওয়াটস চিন্তিত। নবাব এখানে বেশিদিন বসে থাকলে ডাচেরা না তাঁর কান ভাঙানোর সুযোগ পেয়ে যায়। বাংলার ব্যাবসায় এই মুহূর্তে ডাচেরাই তো ইংরেজদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী।

নবাবকে হাতের মুঠোয় নিয়ে ব্যাবসার ক্ষেত্রে একতরফা অনেক সুযোগ আদায় করে নিয়েছে ইংরেজরা। ডাচেরা পিছিয়ে পড়ছে। সুযোগ পেলেই নবাবের কাছে তারা ক্ষোভ উগরে দেবে। এটাই স্বাভাবিক। আর নবাব যদি ডাচেদের দিকে ঝুঁকে পড়েন তাহলে ইংরেজদের তকলিফ বাড়বে। ইদানীং এমনিতেই সুরে বাজছেন না নবাব। তাই তার অহংবোধকে তোয়াজ করার জন্য ক্লাইভের এত ব্যস্ততা। দক্ষিণে নাস্তানাবুদ

হতে হচ্ছে ফরাসিদের হাতে। এই সময়ে নবাব ডাচেদের দিকে ঝুঁকলে সমূহ বিপদ। তবে ওয়াটসের কাছে আশার কথা হল, সপ্তাহ খানেক হয়ে গেলেও এখনও নবাবের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পায়নি ডাচেরা। ডাচ গভর্নর, বিসডাম নবাবের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি চেয়ে চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু আমোদে মশগুল নবাব এখনও সে চিঠির জবাব দেননি। তবে বিসডাম কিন্তু হাল ছেড়ে বসে নেই। নবাবের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

যাই হোক, কলকাতাযাত্রার কথা ফের একবার নবাবকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য হুগলি দুর্গে এসে হাজির হলেন উইলিয়াম ওয়াটস। বেলা বেশ গড়িয়েছে কিন্তু এখনও ঘুম থেকে ওঠেননি নবাব। গতকাল গভীর রাত পর্যন্ত মুজরোর আসরে ছিলেন। কখন যে শয্যাত্যাগ করবেন, তার কোনও ঠিক নেই। দুর্গের অলিন্দে অস্থির ভাবে পায়চারি করতে লাগলেন ওয়াটস। কুঞ্চিত ভুরুযুগল। মুখে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট। খানিকবাদে ফৌজদার ওমর বেগ এসে তাঁকে জানালেন, 'বেগম সাহেবা আপনাকে এত্তেলা দিয়েছেন।'

'বেগম সাহেবা?' অবাক হলেন ওয়াটস।

'জি সাহেব। নবাব বেগম।'

দু'জন বাঁদি এসে অন্দরমহলে নিয়ে গেল ওয়াটসকে।

সূর্যের আলো জাফরির ফাঁক গলে চকমিলানো মেঝের উপরে এসে পড়েছে। ফরাসের উপরে হাঁটু ভাঁজ করে বসে আছেন বেগম সাহেবা। তার পরনের জামদানি কাজ করা, শাদা জমির উপরে ফুলেল নকশাতোলা সিল্কের ঘাগরা অর্ধবৃত্তাকারে ফুলের পাপড়ির মতো ছড়িয়ে রয়েছে ফরাসের উপরে। মণি বেগমের সামনে কিছুটা দূরে রাখা রয়েছে রাখা রয়েছে জল ভর্তি মস্ত এক রুপোর রেকাবি। তাতে ভাসছে লাল গুলাব। আতরের উগ্র গন্ধে ম-ম করছে ঘর। তার সঙ্গে মিশেছে অম্বুরি তামাকের সুবাস। বেগম সাহেবার হাতে ফরসির নল। পাশেই রাখা রয়েছে একটা রুপোর গড়গড়া। সামনে চিকের আড়াল। ওপাশে উইলিয়াম ওয়াটস।

'সেলাম হুজুরাইন।'

'বসুন সাহেব। কিছু জরুরি কথা আছে। তাই আপনাকে একটু তকলিফ দিলাম।'

খুশইলহান গলার আওয়াজ ওয়াটসকে যেন অবশ করে দিল।

'না না তকলিফ কোথায়? আপনি ডেকেছেন, এ তো আমার খুশনসিব।' এই বলে ফরাসের অদূরে একটা চৌপাইয়ের উপরে বসলেন ওয়াটস। চিকের ওপারে আবছা মণি বেগমের অবয়ব।

'আপনাদের মনসুবা কী?' শুধোলেন বেগম সাহেবা।

বেমক্কা এই প্রশ্নে খানিকটা যেন থতমত খেয়ে গেলেন ওয়াটস। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'কোন মনসুবার কথা বলছেন আপনি?'

মণি বেগম বললেন, 'এই যে অচানকই নবাবের প্রতি আপনাদের এই খাতিরদারি?'

অবাক হওয়া গলায় ওয়াটস জবাব দেন, 'এতে কসুর কোথায়? আমরা নবাবের প্রজা।'

'কলকাতায় নিয়ে গিয়ে নবাবকে কোনও মুসিবতের মধ্যে ফেলতে চান না তো আপনারা?'

ওয়াটস মুখে হাসির রেশ নিয়ে বললেন, 'আপনি সন্দেহ করেন আমাদের?'

মেহেন্দি রাঙানো করতলের দিকে চেয়ে আনত চোখে মণি বেগম বললেন, 'না, তা নয়। নবাব মসনদে বসেছেন এক সাল হয়ে গেল। এতদিন বাদে খাতির দেখিয়ে আপনারা তাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চাইছেন, তাই মনে হল আপনাকে ডেকে একবার পুছতাছ করি।'

মোলায়েম গলায় ওয়াটস বলেন, 'ক্লাইভ সাহেব কলকাতার গভর্নর হয়েছেন। সেই খুশিতে কোম্পানির তরফ থেকে নবাবকে উনি সম্মান জানাতে চান।'

'স্রেফ ওইটুকুই? আশা করি আপনি আমাকে ঝুট বলছেন না।'

‘আমাদের অন্য কোনও মতলব নেই হুজুরাইন।’

‘আপনাকে ডেকে এসব পুছতাছ করার জন্য কিছু মনে করবেন না সাহেব। আসলে ভয় করে। নবাব না অচানক বরবাদ হয়ে যান।’ শঙ্কা ফুটে ওঠে মণি বেগমের গলার আওয়াজে।

‘একথা ভাবছেন কেন?’

‘নবাবের দুশমন তো কম নেই।’

‘আমরা নবাবের দোস্ত।’

মুচকি হেসে বেগম সাহেবা বললেন, ‘জানি।’

কথাটা যেন বিদ্রুপের মতো শোনাল ওয়াটসের কানে। ব্যস্ত হয়ে তিনি বললেন, ‘আপনি অহেতুক পরেশান হবেন না হুজুরাইন। মসনদে খাঁ সাহেবই বহাল থাকবেন। আমরা তাই চাই।’

ক্ষণেকের জন্য নস্তব্ধতা নেমে এল ঘরে। ভুর ভুর করে ফের খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে মণি বেগম বললেন, ‘জাফর আলি খাঁ সাহেব কিন্তু আপনাদের অনেক কিছু দিয়েছেন।’

‘জরুর। তাঁর মদত না মিললে মুসিবত হত আমাদের। এ কথা আমরা কবুল করি।’

‘খাঁ সাহেব সিধাসাদা ইনসান। কে তার দোস্ত, আর কে তার দুশমন বোঝেন না। আপনারা তাকে সালামত রাখবেন। এইটুকুই মণি বেগমের আরজু।’

‘আমরা তো খাঁ সাহেবকে সালামতই রাখতে চাই, লেকিন তাঁর মুসিবত ডেকে আনতে পারেন নবাবজাদার খুশখেয়াল।’

‘নবাবজাদা নাফরমান। সে কথা আমি জানি।’

মণি বেগমের মনের আন্দাজ পেয়ে ওয়াটস বললেন, ‘গুস্তাকি মাফ করবেন হুজুরাইন। আমার মনে হয়, তার উপরে জেয়াদা জিম্মেদারি দিয়ে ভালো করেননি নবাব।’

‘সে কথা ওঁকে সমঝানোর কোশিশ করে চলেছি আমি। আশা করি তিনি বুঝবেন।’

‘ইয়ে তো বহুত খুশি কি বাত।’

‘জানবেন মণি বেগম আপনাদের দোস্ত। আপনারা যে শর্তে সওদা করতে চাইবেন, তাই হবে। শুধু নবাবকে সালামত রাখবেন আপনারা। নবাবের মুসিবত হলে বরবাদ হয়ে যাবে আমার দুই লেড়কা নজম ও সইফের ভাবীকাল। মির্জা মেহেদির মওত কী ভাবে হয়েছে আমি জানি। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন সাহেব আমার দহসতের কারণ কী?’

‘আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন হুজুরাইন। শুধু নবাব নন, আপনি ও আপনার দো লেড়কার সালামতির জিম্মেদারি যেন নয়া রেসিডেন্ট সাহেব নেন, আমি বলে দেব।’

‘শুনেছি স্ক্র্যাফটন সাহেবের ছুটি হয়ে গিয়েছে।’

‘জি হুজুরাইন। নতুন রেসিডেন্ট হয়েছেন ওয়ারেন হেস্টিংস।’

‘নয়া রেসিডেন্ট সাহেবকে আমার সেলাম জানাবেন।’ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন মণি বেগম।

‘আমি বলে দেব। আপনি মুর্শিদাবাদে ফিরলেই নয়া রেসিডেন্ট সাহেব যেন আপনার সঙ্গে মোলাকাত করেন।’ একটু থেমে ওয়াটস ফের বললেন, ‘একটা আরজি ছিল হুজুরাইন।’

‘বলুন।’

‘ক্লাইভ সাহেব অপেক্ষা করছেন কলকাতায়।’

‘তো?’

‘নবাব ফওরান যদি কলকাতা রওনা হন তো খুব ভালো হয়। আমরা তো বারবার কথাটা তুলছি। নবাব কানেই নিচ্ছেন না।’

মণি বেগম বললেন, 'আপনারা যা চাইছেন, তাই হবে। নবাব যাতে তুরন্ত এখান থেকে কলকাতার উদ্দেশে রওনা হন সে বন্দোবস্ত আমি করে দিচ্ছি। তবে কী বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা হল তা নিজামতের কোনও ওমরাহ যেন জানতে না পারেন।'

'আমার উপরে আপনি ভরসা রাখতে পারেন।' এই বলে ফের বেগম সাহেবাকে তসলিম জানিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন ওয়াটস।

'মণি বেগম আপনাদের দোস্ত—কথাটা ইয়াদ রাখবেন।'

ঘুরে তাকিয়ে ওয়াটস বললেন, 'জি হুজুরাইন।'

বেশ হালকা মেজাজে ফৌজদারের কেল্লা থেকে বেরিয়ে এলেন ওয়াটস। বেশ কিছুদিন ধরে কানাঘুষোয় তিনি শুনে আসছেন, নিজামতের উপরে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন মণি বেগম। হিরাঝিলের অলিন্দে, চেহেল সেতুনের আনাচেকানাচে আলোচনা হয়, কিছুদিনের মধ্যেই নাকি নিজামতের রাশ তিনি হাতের মুঠোয় নেবেন। এই জেনানা অতীব বুদ্ধিমতী। দ্বিতীয় নূরজাহান বেগম হয়ে ওঠার ক্ষমতা রাখেন। মণি বেগমের সঙ্গে আজ কথা বলে ওয়াটসের মনে হল এই সব গুঞ্জন সম্পূর্ণ মিথ্যে নয়। আর তিনি যদি সত্যিই ইংরেজদের সাচ্চা দোস্ত হয়ে ওঠেন, তাতে খুবই সুবিধা হবে কোম্পানির। এসব ভাবতে ভাবতে নিজের ক্যাম্পে ফিরছিলেন ওয়াটস। সহসা পালকি বাহকেরা সরে গেল রাস্তার এক পাশে। উলটো দিক থেকে তীব্র গতিতে ছুটে আসছে একদল ঘোড়সওয়ার।

পালকি থেকে মুখ বাড়িয়ে ওয়াটস দেখলেন, গভর্নর বিসডামের নেতৃত্বে পথের ধুলো উড়িয়ে হুগলির কেল্লা অভিমুখে ছুটে চলেছে ডাচ প্রতিনিধিদল।

৬২

'আমাদের কসুর কী হুজুর?' নবাবের সমুখে জোড়হাত হয়ে শুধোলেন ডাচ গভর্নর বিসডাম।

নবাব নিরুত্তর। আনত চোখে কোলের উপরে বসে থাকা পোষা কাবলি বিড়ালের মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন। আরামে চোখ বুজে নবাবের কোলের উপরে গুটিসুটি মেরে বসল বিড়ালটা।

অনেক কসরত করে নবাবের সঙ্গে একান্তে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছেন বিসডাম। দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভ নবাবের কাছে তিনি উগরে দিলেন।

'ইংরেজরা আপনার প্রজা, আমরাও আপনার প্রজা। ইংরেজদের আগে এদেশে এসেছি আমরা। সওদার ক্ষেত্রে ইংরেজরা আমাদের থেকে বাড়তি সুবিধা পাবে কেন? আমরা চিরকাল নিজামতের কানুনকে, পরোয়ানাকে ইজ্জত করে এসেছি। সময় মতো শুল্ক দিয়েছি। তবু আমরা ইংরেজদের জবরজুলুমের শিকার। বার বার শিকায়ত করার পরেও কোথাও কোনও ইনসাফ না পেয়ে বাধ্য হয়েই আজ আপনার কাছে দরবার করতে এসেছি।'

মাথা নিচু করে রইলেন নবাব। বিসডামের অভিযোগকে খণ্ডন করার কোনও উপায় নেই। জবাবে কী বলবেন তিনি? ইয়ে তো বিলকুল সচ বাত। তামাম বাংলা জানে। পলাশির পরে ইংরেজদের নানা বাড়তি সুবিধা দিয়েছেন নবাব। ক্লাইভ যা চেয়েছেন, তাই মঞ্জুর করেছেন। কোনও নিয়মকানুনের ধার ধারেননি।

আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলার সোরার খুবই চাহিদা। পাটনায় পাওয়া যায় সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সোরা। ক্লাইভকে খুশি করতে পাটনার সোরার কারবারের একচেটিয়া অধিকার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দিয়েছেন নবাব। ইংরেজদের কাছ থেকে চড়া দামে সোরা কিনতে হচ্ছে ডাচদের। তাও চাহিদা মতো, সময় মতো পাওয়া যাচ্ছে না।

বিসডাম বললেন, 'কেন আমাদের জাহাজ জবরদস্তি খানাতল্লাশি করবে ইংরেজরা?'

মিরজাফর খাঁ অবাক চোখে বিসডামের মুখপানে চাইলেন।

'আপনি পুছতাছ করে দেখুন। সাগর থেকে নদী বেয়ে জাহাজ নিয়ে আসার জন্য আমাদের ভরসা করতে হচ্ছে ইংরেজ পাইলটদের উপরে। তাদের মর্জি মাফিক চলতে হচ্ছে।'

'আপনাদের পাইলটরা কোথায়?' শুধোলেন নবাব।

'ইংরেজদের জবরদস্তিতে তারা কাজ করতে পারছে না।'

'তাজ্জব ব্যাপার! এ তো জানা নেই আমার।' নবাব যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

'গুস্তাকি মাফ করবেন হুজুর। এমন পরোয়ানা তো আপনিই দিয়েছেন।'

বিস্ফারিত চোখে নবাব শুধোলেন, 'আমি দিয়েছি?'

'সেই পরোয়ানার কপি আমরাও পেয়েছি।' এই বলে একটা কাগজ পেশ করলেন বিসডাম।

মালিকের মনোযোগ আর তার প্রতি নেই দেখে নবাবের কোল থেকে নেমে সামান্য দূরে মেঝের উপরে গিয়ে আয়েশ করে শুয়ে পড়ল নবাবের পোষ্য।

নবাব বেশ উত্তেজিত। বিসডামের পেশ করা কাগজে চোখ বোলাতে বোলাতে অন্যমনস্ক ভাবে হাতে টেনে নিলেন ফরসির নলটা। ভুরভুর করে খানিকটা তামাক টানলেন। ধোঁয়া ছেড়ে বিস্মিত গলায় বললেন, 'তাজ্জব ব্যাপার। এ দস্তখত তো আমারই।'

'আমি কোনও ঝুট বাত বলতে আসিনি হুজুর। এখন আপনি বলুন এই জুলুম কেন?'

নবাব অন্যমনস্ক। বিসডামের পেশ করা পরোয়ানাটা নিয়ে ভাবনায় পড়েছেন। এমন কোনও পরোয়ানায় তিনি যে দস্তখত করেছিলেন, মনে করতে পারছেন না। মনে রাখবেনই বা কেমন করে। দিনের বেশির ভাগ সময়ই তিনি শরাবের নেশায় বেসামাল হয়ে থাকেন। খাস মুনশি এসে কখন যে কোন পরোয়ানার মুসাবিদা পড়ে শোনায়, সবটা সমঝবুঝ করে উঠতে পারেন না। মৌতাতের আমেজে কানেও যায় না সব কথা। অনেক কিছু ভালো করে না বুঝেই তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি দিয়ে দেন। যে সব কাগজ খাশ মুনশি তার সামনে পেশ করেন, সেসবে চোখ না বুলিয়েই দস্তখত করে দেন। নবাবের এই অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে যে যেমন চায় খাস মুনশিকে সওগাতে খুশি করে তেমনই পরোয়ানা আদায় করে নেয়। ইদানীং নানারকম পরস্পর বিরোধী হুকুমত নিয়ে নিজামতের অন্দরে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। সে সব সামলাতে পরেশান হয়ে যাচ্ছেন নবাব। বিসডামের কাছে কার্যত নিজের অক্ষমতার কথা কবুল করে নিলেন তিনি।

'এ আমারই ভুল।'

'গোস্তাকি মাফ করবেন হুজুর। তাহলে এই পরোয়ানা আপনি বাতিল করে দিন।'

অনুনয় করলেন বিসডাম।

'দেখি কী করা যায়।' এই বলে বিসডামের দেওয়া কাগজটা গুটিয়ে রাখেন নবাব।

বিসডাম ফের গুজারেশ করেন, 'আমাদের বহুত লোকসান হচ্ছে হুজুর। ধৈর্যেরও তো একটা সীমা আছে। এই জুলুম যদি চলতে থাকে তো ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের লড়াই বেধে যাবে।'

কৌতূহলী চোখে বিসডামের মুখের দিকে চেয়ে নবাব বললেন, 'লড়াই?'

'সুবে বাংলা ফের বেচ্যায়েন হোক, আমরা চাই না। স্রেফ সওদা ও মুনাফা ছাড়া অন্য কোনও মতলব আমাদের নেই। লেকিন ইংরেজরা যদি জবরজুলুম করে আমাদের কারবারে বাধা দেয়, দিনের পর দিন যদি আমাদের লোকসান হতে থাকে, যদি কোথাও কোনও ইনসাফ আমরা না পাই তো কী করব বলুন? লড়াই ছাড়া উপায় কী?' বেশ উত্তেজিত গলায় কথাগুলো বললেন বিসডাম।

মিরজাফরের চোখ দুটো সহসা চকচক করে উঠল। তিনি শুধোলেন, 'লড়াইয়ের ময়দানে ইংরেজদের বেকায়দায় ফেলার হিম্মত রাখেন আপনারা?'

‘আমরা শান্তি চাই। তাই বলে আমাদের নালায়েক, বুজদিল ভাববেন না।’

‘দক্ষিণের খবর রাখেন?’ প্রশ্ন করেন নবাব। মুখে খুশির ছাপ।

‘জানি পরেশানিতে রয়েছে ইংরেজরা। কাউন্ট লালির হাতে নাজেহাল।’

‘ক্লাইভ সাহেবের হাতে এখন ফৌজি খুবই কম।’

‘তাও জানি হুজুর। কলকাতায় এখন ইংরেজদের যুদ্ধজাহাজ আছে স্রেফ চারখানা।’

‘এই ওয়াক্তে লড়াই করে ইংরেজ কোম্পানিকে পরেশান করতে পারবেন আপনারা?’

নবাবের এই প্রশ্ন শুনে বেশ চমকে গেলেন বিসডাম। কী চাইছেন নবাব? ইংরেজদের মুসিবত? তাঁর মোহভঙ্গ হল কি? ইংরেজদের সঙ্গে দোস্তির রিশতেদারি তুড়ে দিতে চাইছেন? বিসডাম ভেবেছিলেন ইংরেজদের নামে কোনও শিকায়ত শুনতে চাইবেন না নবাব। উলটে ডাচদের উপরেই তিনি বিরক্ত হবেন। কারণ যেসব সুযোগসুবিধা ইংরেজদের তিনি দিয়েছেন, তা সমঝবুঝ করেই দিয়েছেন। সে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক। এ নিয়ে ইলজাম আনার অর্থ নবাবের কাজের সমালোচনা করা। নিজামতের ভাষায় এ হল বেতমিজি। বেসহবত কান্ড।

ইনসাফ মিলবে না ধরে নিয়েই খানিকটা কর্তব্যের খাতিরে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন বিসডাম। বাটাভিয়া থেকে উপরওয়ালাদের নির্দেশ এসেছে, ‘...বাংলার ব্যাবসা যে ডুবতে বসেছে। হয় নবাবের সঙ্গে কথা বলে অবিলম্বে এর বিহিত করো। ইনসাফ যদি না মেলে তো বলপ্রয়োগের পথেই হাঁটতে হবে আমাদের। ইংরেজদের সঙ্গে সত্যিই যদি লড়াই বেধে যায়, তাহলে তিনি যেন ডাচদের একতরফা দোষারোপ না করেন। একথা তাঁকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।...’

বিসডাম প্রশ্ন করলেন, ‘আপনি কি সত্যিই ইংরেজদের মুসিবত চাইছেন?’

মিরজাফর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ‘আমি আজাদ হতে চাইছি।’

মরিয়া আকুতি ঝরে পড়ল নবাবের গলায়। নড়েচড়ে বসলেন বিসডাম।

নবাব বলে চললেন, ‘ইংরেজদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে সুবে বাংলা থেকে তাড়িয়ে দিতে চাই আমি। কিন্তু পারছি কোথায়? উলটে ইংরেজ কোম্পানি ফাঁস হয়ে চেপে বসছে আমার গলায়। আমার নিজের তাগদ নেই। আমি একদল কামিল-ই-ইনসানের তালাশ করে বেড়াচ্ছি। পারবেন আপনারা? ইংরেজদের তাড়িয়ে আমার তকলিফ দূর করতে পারবেন?’

এ যে উলটপুরাণ। মেঘ না চাইতে জল। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে বিসডাম বললেন, ‘আপনার মদত পেলে নিশ্চয়ই পারব।’

‘মদত মিলবে। ফৌজ আনান আপনারা। আমি ফির একবার ইনকিলাব ঘটাতে চাই বাংলায়।’ কথাগুলো বলতে বলতে নবাবও উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন।

বিসডাম বললেন, ‘আপনাকে এক খুশখবর জানাই হুজুর।’

কৌতূহলী চোখে বিসডামের মুখপানে চাইলেন মিরজাফর।

‘বাটাভিয়া থেকে ফৌজ নিয়ে কয়েকখানা জাহাজ বাংলা মুলুকের উদ্দেশে রওনা হয়েছে।’

ভিতরে ভিতরে কেঁপে উঠলেন নবাব। হঠাৎই মনের মধ্যে দেখা দিল সংশয়। যে বিপজ্জনক খেলা তিনি খেলতে চাইছেন তাতে কামেয়াব হতে পারবেন তো? কিন্তু এ ছাড়া আর উপায়ই বা কী আছে? মন চাইছে আজাদি। নিজের আজাদি বিকিয়ে দিয়ে একজন ইনসান কখনও সুখী হতে পারে না। মসনদ, দৌলত এসবের থেকেও আজাদি অনেক কিমতি চিজ।

সংশয় ঝেড়ে ফেলে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে এসে বিসডামের মুখোমুখি দাঁড়ালেন নবাব। ডাচ গভর্নরের সঙ্গে কোলাকুলি সেরে নিয়ে বললেন, ‘আমি মোনাজাত করব পয়গম্বরের কাছে, আপনারা কামেয়াব হোন।’

আবেগে বিসডাম বলে উঠলেন, 'আপনার সঙ্গে এই নয়া রিস্তেদারির ইজ্জত রাখতে জান কবুল করে লড়াই করবে ডাচেরা। আমি ওয়াদা করছি সুবে বাংলা থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে ছাড়ব।'

খুশিতে ভাসতে ভাসতে বিদায় নিলেন বিসডাম।

নবাবও দারুণ খুশি। এখনই তার মনে হচ্ছে বুক থেকে যেন পাষাণভার নেমে গেল। ওমর বেগকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'বজরা তৈয়ার করো। দিল চাইছে দরিয়ার তাজা বাতাস।'

'জি হুজুর।'

নবাবের নদী ভ্রমণের আনজাম করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ওমর বেগ।

৬৩

জিঞ্জিরা প্যালেসে নিজের কক্ষে অস্থির ভাবে পায়চারি করছেন ঘসেটি বেগম। নদীর দিক থেকে বয়ে আসা হাওয়ায় থিরিথিরি কাপছে শামাদানের আলো। ঘরের এক কোণায় বসে হাঁটুতে মাথা রেখে ঘুমে ঢুলছে ঘসেটি বেগমের খাস বাঁদি মেহের। অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। বেগম সাহেবার কাছ থেকে শুনেছিল, আজ রাতেই তাদের রওনা হতে হবে মুর্শিদাবাদের উদ্দেশে।

রাত গড়িয়ে যাচ্ছে। ঘণ্টা বাজিয়ে জানান দিচ্ছে জিঞ্জিরা প্যালেসের ঘড়িয়াল। উত্তেজনা বাড়ছে ঘসেটি বেগমের। থেকে থেকে ছুটে যাচ্ছেন জানলার কাছে। জাফরির ফাঁক দিয়ে তাকাচ্ছেন নদীর দিকে। বাইরে যত দূর চোখ যায়, একেবারে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। শুধু কয়েকটা বিন্দু বিন্দু আলো ঘুরে বেড়াচ্ছে নদীর বুকে। ওগুলো মাছমারাদের নৌকা। বেগম সাহেবার কানে ভেসে আসছে বর্ষায় উচ্ছল বুড়িগঙ্গার জলতরঙ্গের শব্দ ও আশপাশ থেকে উত্থিত ঝিঁঝির কলতান।

মুর্শিদাবাদ রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত ঘসেটি বেগম। মন ভয়ানক চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিন পরে বন্দিদশা ঘুচিয়ে নিস্তরঙ্গ, নিশ্চিন্ত দিন গুজরান ছেড়ে ফের সুবে বাংলার রাজনীতির জটিল আবর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ার খোয়াবে তিনি ভাসছেন। মসনদ যেন তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ডাকছে মোতিঝিল। ডাকছে চেহেল সেতুন। তাঁকে কেন্দ্র করে ফের ইনকিলাব হবে মুর্শিদাবাদে?

তবুও থেকে থেকে ঘসেটি বেগমের মনে উঁকি দিচ্ছে সংশয়। মিথ্যে আশা দেয়নি তো বকর আলি? শেষ পর্যন্ত আসবে তো সে? আশায়-নিরাশায় দুলছেন আলিবর্দির বড়ি বেটি। আজাদি চাইছে দিল। মনের গহীনের আশার নকশিকাঁথা বুনে চলেন তিনি। নিরাশাকে চাপা দেওয়ার কোশিশ করেন। বকর আলি ছিল আলিবর্দির একান্ত অনুগত, সামান্য একজন নোকর, কেন মিথ্যে আশা দেবে সে? কেনই বা অচানক এভাবে ছুটে আসবে ঢাকায়?

সহসা মৃদু টোকা পড়ে দরজায়। পরপর তিনবার।

মেহেরের ঢুলুনি ছুটে যায়। উঠে দাঁড়িয়ে দরজা খুলতে যাচ্ছিল সে। তাকে বাধা দিয়ে ব্যস্ত হয়ে নিজেই ছুটে গিয়ে দরজা খোলেন ঘসেটি বেগম।

দরজার ওপাশে দাঁড়ানো বোরখা পরিহিত মানুষের অবয়ব দেখে হাসি ফোটে বেগম সাহেবার মুখে। মুখের সামনের ঘুঙ্ঘট একঝলক সরিয়ে বকর আলি বলে, 'চলুন হুজুরাইন।'

বোরখায় নিজেকে দ্রুত আবৃত করে নেন ঘসেটি বেগম। বোরখায় নিজেকে আড়াল করে মেহেরও। কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে বকর আলির পিছু নেয় দু'জনে। গোটা জিঞ্জিরা প্যালেস অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন। আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। অলিন্দে চাতালে নিভু নিভু বাতিদানের আলো। শুধু ঘুমহীন চোখে প্রহর গুণে চলেছে ঘড়িয়াল।

ঘসেটি বেগম ও তার বাঁদি মেহেরকে নিয়ে সন্তর্পণে গোপন এক সুড়ঙ্গ পথে ঢুকে পড়ে বকর আলি। খুবই অপরিসর পথ। দুটো মানুষ কোনওরকমে পাশাপাশি হেটে যেতে পারে। সামনে বকর আলি, তার পিছনে ঘসেটি বেগম, একেবারে পিছনে মেহের। খানিকবাদে সুড়ঙ্গ পথ ধরে নদীর ঘাটে এসে পড়ে তারা। খোলা আকাশের নীচে পৌঁছে সিনা ভরে শ্বাস নেন বেগম সাহেবা। তিনি পুলকিত, রোমাঞ্চিত। অদূরে নদীর উপর ভাসছে দুটো বিলাসবহুল বজরা। বকর আলির প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে ঘসেটি বেগমের মন। লজ্জাবোধও হয়। অহেতুক তিনি সন্দেহ করছিলেন বকর ভাইয়াকে।

ঘাটে বাঁধা রয়েছে ছোট একটা ডিঙি নৌকা। বকর আলি দড়িটা খুলে নিয়ে নৌকোয় উঠে দাঁড় হাতে নেয়। দ্রুত নৌকোয় ওঠেন ঘসেটি বেগম। সঙ্গে মেহের। ঘাট থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকে নৌকো। দূরে সরে যেতে থাকে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা জিঞ্জিরা প্যালেসের কালচে অবয়ব।

বজরায় উঠে বকর আলি ঘসেটি বেগমকে নিয়ে যায় দোতলার একটা বিলাসবহুল কক্ষে। একজন গোলাম এসে নিঃশব্দে একটা বাতি রেখে যায় ঘরে। বকর আলি মুখের নেকাব সরিয়ে পানের ছোপ ধরা দাঁত বের করে হাসে। মেহেন্দি রাঙানো দাড়ি মুচড়ে বলে, ‘আর কোনও ভাবনা নেই হুজুরাইন। এবারে আয়েশ করুন। আমি আসি।’

আবেগে আপ্লুত হয়ে ঘসেটি বেগম বলেন, ‘বকর ভাই, কী বলে যে সুক্রিয়া জানাব তোমাকে।’

মাথা ঝুঁকিয়ে বকর আলি বলে, ‘সুক্রিয়া জানানোর জরুরত নেই হুজুরাইন। আমি আপনার বান্দা। মালকিনের খুশিই আমার খুশি।’

বকর আলি চলে যায়। নোঙর তুলে দুলে ওঠা বজরা। মাঝিমাল্লাদের দাঁড় টানার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ বড় মধুর সুরে বাজে ঘসেটি বেগমের কানে। অবশেষে মুক্তি। আল্লা মেহেরবান।

পরিপাটি করে শয্যা রচনা করে মেহের বলে, ‘আরাম করুন মালকিন। রাত অনেক হল।’

‘আমি একটু বসে থাকি জানলার পাশে। তুই শুয়ে পড়।’

মেহের পাশের কক্ষে চলে যায়।

বাইরে অতলান্ত অন্ধকার। শ্রাবণের মেঘে ছেয়েছে আকাশ। একটা তারারও দেখা নেই। থেকে থেকে ঝলকাচ্ছে বিদ্যুৎ। গুমরে উঠছে মেঘ। দুর্যোগের রাতে দুঃসাহসিক নদীযাত্রা। তবুও সব কিছু আজ বড় ভালো লাগছে ঘসেটি বেগমের। জানালায় মাথা রেখে তিনি জলের শব্দ শুনতে থাকেন।

এই বজরাতেই একতলার অন্য একটি কক্ষে রয়েছেন আমিনা বেগম। দুই বোন একই বজরার যাত্রী অথচ একজন জানেন না আরেকজনের কথা। বহুদিন হয়ে গেল দুই বোনের কোনও বাতচিত নেই। মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ। এ সব কিছুই জানা ছিল বকর আলি। তাই কাউকেই সে ঘুণাক্ষরে বলেনি দ্বিতীয় জনের কথা। ঘসেটি বেগমকে নিয়ে আসার আগেই সে বজরায় এনে তুলেছে আমিনা বেগমকে। তাঁকে রেখেছে একতলার একটি কক্ষে। নিখুঁত পরিকল্পনা বকর আলির।

বজরায় উঠেই কক্ষের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন আমিনা বেগম। জিঞ্জিরা প্যালেসে এতকাল শরাব পিয়েছেন মনের দুঃখ ভুলতে। আজ শরাবে ডুব দিয়েছেন খুশিতে। বেসামাল বেগম সাহেবাকে পালঙ্কে শুইয়ে দিয়ে সংলগ্ন পাশের কক্ষে বিশ্রাম নিতে গিয়েছে তাঁর খাস বাঁদি কোয়েল।

বুড়িগঙ্গার জল ভেঙে স্রোতের অনুকূলে ভেসে চলেছে দুটি বজরা। দ্বিতীয় বজরার যাত্রী বকর আলি ও তার সঙ্গের জনা দশেক পাইক বরকন্দাজ।

বকর আলি উত্তেজিত। যে গুরু দায়িত্ব নিয়ে সে মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছে তা হাসিল হবে তো ঠিক মতো? এ কাজে কামেয়াব হলে নিজামতের সামান্য এক নোকর বকর আলির নসিব বদলে যেতে পারে।

থেকে থেকেই কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে গলুইয়ের উপরে দাঁড়াচ্ছে বকর আলি। বজরা কতদূর এল, তার আন্দাজ পাওয়ার কোশিশ করছে। হাঁকডাক করে মাঝিমাল্লাদের বলছে, 'আরও জলদি চল, জলদি।'

ভোররাতের দিকে বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরীর সংযোগ স্থলে এসে পৌঁছল বজরা দু'টি। চারিদিকে শুধু জল আর জল। নদী এখানে বিশাল চওড়া। এপার ওপার দেখা যায় না। গলুইয়ের উপরে এসে দাঁড়াল বকর আলি। প্রায় নিঃশব্দে মাঝ নদীতে নোঙর ফেলে দু'টি বজরা প্রায় গা ঘেঁষাঘেষি করে দাঁড়াল। আমিনা বেগম ও ঘসেটি বেগমের বজরা থেকে মাঝিমাল্লারা চুপিসারে এসে উঠল বকর আলির বজরায়। নোঙর তুলে খানিকটা দূরে সরে গেল বজরাটা।

ঘুমের মধ্যে বিছানা থেকে হঠাৎই গড়িয়ে পড়ে গেল আমিনা বেগমের বাঁদি কোয়েল। ঘুম ছুটে গেল তার। একদিকে অনেকটা হেলে গিয়েছে বজরা। ভিতরে জল ঢুকছে কুলকুল করে। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল কোয়েল। ছুটে গিয়ে আমিনা বেগমের কক্ষের দরজা ঠেলে অন্দরে ঢুকল সে। কোয়েলের চেঁচামেচিতে জেগে উঠলেন আমিনা বেগম। ঢুলু ঢুলু দুই চোখ। নেশার রেশ তখনও কিছুটা রয়েছে। সহসা পাক খেয়ে উলটো দিকে হেলে পড়ল বজরা। টলে গিয়ে মেঝেতে পড়লেন আমিনা বেগম। মেঝেতে গোড়ালি-সমান জল। বজরার অন্দরে জলস্তর দ্রুত বাড়ছে। নেশা ছুটে গেল আমিনা বেগমের। চিৎকার করে উঠলেন, 'বকর ভাই! বাঁচাও! বাঁচাও! বজরা ডুবছে।'

হঠাৎই জলের চাপে ভেঙে পড়ল কক্ষ থেকে বাইরে বেরোনোর দরজাটা। এবারে হুড়মুড়িয়ে জল ঢুকতে লাগল ঘরে। জলের ঝাপটায় বেসামাল হয়ে গেলেন আমিনা বেগম। আর্তনাদ করে উঠল কোয়েল। বজরার পুরো একতলা প্রায় জলের নীচে চলে গিয়েছে। বাঁচার তাগিদে জলস্রোত ঠেলে আমিনা বেগম ও তাঁর বাঁদি সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ওঠার কোশিশ করতে লাগলেন।

সহসা দোতলা থেকে ভেসে এল ঘসেটি বেগমের আর্তনাদ– 'বকর ভাই! বকর ভাই এ কী হল? কোথায় তুমি? নাও ডুবছে। বাঁচাও বকর ভাই। তুমি কোথায়?'

ঘসেটি বেগমের গলা শুনেই চিনতে পারলেন আমিনা বেগম। চেঁচিয়ে উঠলেন, 'দিদি! দিদি!'

ছোটি বহেনের গলা চিনতে পারলেন ঘসেটি বেগমও। 'ছো-টি ব-হে-ন!'

'আমরা বদ কিসমতির শিকার দিদি।'

মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে নিমেষে ভেঙে পড়ল দুই বোনের মধ্যবর্তী এতকালের দুস্তর ব্যবধান।

আমিনা বেগমের দেহের অর্ধেক জলমগ্ন। বড়ে বহেনের সাহায্যের জন্য বাড়িয়ে দিলেন হাত। ঘসেটি বেগম টেনেহিঁচড়ে দোতলায় কাঠের পাটাতনের উপরে তুলে নিলেন বোনকে। অনেক কসরত করে উঠে এল কোয়েলও। দিদিকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন আমিনা বেগম।

ক্রমশ কাত হচ্ছে বজরা। চারপাশে শুধু বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরীর অতল জলরাশি। কোনওরকমে দোতলার ছাতের অপরিসর স্থানে এসে দাঁড়াল চার নারী। আলিবর্দির দুই বেটি ও তাদের দুই খাস বাঁদি। শিয়রে সাক্ষাৎ মৃত্যু। এতক্ষণে পুরো ছবিটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে দুই বোনের কাছে। তাঁরা বুঝেছেন তাঁদের প্রতারিত করেছে বকর আলি। নির্ঘাত বজরার তলদেশে আগে থেকেই কোনও ছিদ্র পথ ছিল। গভীর রাতে সেই ছিদ্রপথের ঢাকনা খুলে দিয়ে বকর আলির লোকজন সরে পড়েছে। তাই এই বজরায় এই চারজন অবলা নারী ছাড়া আর কেউ নেই। ষড়যন্ত্রীরা আগে থেকেই উঠেছে গিয়েছে পাশের বজরায়।

আকাশ পরিষ্কার হয়েছে অনেকটা। ওই তো সামান্য দূরে ভাসছে বকর আলির বজরা। ওই তো ওখানে গলুইয়ের উপরে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন মানুষ। ওই বজরাটা যদি আর একটু কাছে এগিয়ে আসে তাহলে

ঝাঁপিয়ে তার উপরে পড়া যায়। এখনও বাঁচার উপায় আছে। চিৎকার করে কাতর আর্তি জানান ঘসেটি বেগম, 'বকর ভাই। বাঁচাও! আমাদের বাঁচাও!'

বকর আলি চেঁচিয়ে বলে, 'বান্দার গোস্তাকি মাফ করবেন হুজুরাইন। এই বান্দা নবাবজাদা মিরনের হুকুম তামিল করেছে। আপনাদের মওতের পরোয়ানা দিয়েই তিনি পাঠিয়েছিলেন আমাকে।'

ঘসেটি বেগম চেঁচিয়ে ওঠেন, 'তুইও মরবি শয়তান। তোর কলিজা ফেটে যাবে।'

বকর আলি নিষ্ঠুর ভাবে হেসে উঠে বলে, 'রহেম করুন হুজুরাইন। আমার কসুর কী? আমি স্রেফ তাগদের গোলাম।'

আমিনা বেগম ও ঘসেটি বেগমের বুক অবধি জলের তলায়। দু'জনে কোনওরকমে আঁকড়ে ধরে আছেন পাল খাটানোর একটা দণ্ড। বুক ছাপিয়ে দ্রুত গলা পর্যন্ত উঠে আসছে জলস্তর।

সহসা আকাশের দিকে মুখ তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন আমিনা বেগম, 'হে আল্লা, ইনসাফ চাই আমি। মওত চাই মিরনের। আসমান থেকে তার শিরের উপরে যেন বিজলি ভেঙে পড়ে।'

মাথা ছাপিয়ে গেল জলস্তর। কোনও রকমে নাকটা ভাসিয়ে প্রাণপণে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন দুই বোন ও তাদের দুই বাঁদি। কিছুক্ষণের এই মরণপণ লড়াইয়ের অন্তে বুড়িগঙ্গার গর্ভে অতলান্ত অন্ধকারে হারিয়ে গেল চার নারী। নদীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল বজরাটা। ক্ষণেক আগে ঘটে যাওয়া এই পৈশাচিক ঘটনার চিহ্ন রইল না কোথাও। প্রকৃতি আবার আগের মতোই শান্ত, সুন্দর। তাজা বাতাসে প্রাণ ভরে শ্বাস নিয়ে মাঝিমাল্লাদের উদ্দেশে বকর আলি বলল, 'জলদি চল। খুশ খবরের জন্য নবাজ্জাদা ইন্তেজার করছেন।'

৬৪

নবাব আসছেন শহরে। এবারে ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে কলহবিবাদ নয়, লড়াই-মোকাবিলাও নয়, তিনি আসছেন সৌহার্দ্যের আবহে, সৌজন্যের খাতিরে, ফোর্ট উইলিয়ামের নয়া গভর্নর রবার্ট ক্লাইভের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে। তাঁকে সম্মান জানাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।

হুগলিতে বেশ কিছুদিন নিশ্চিন্ত অবসরযাপনের পর কলকাতার উদ্দেশে মিরজাফরর খাঁ রওনা হবেন আগামীকাল। দ্রুতগামী ছিপনৌকো বেয়ে এই খবর নিয়ে এসেছে কোম্পানির প্রতিনিধি। হুগলি থেকে চিঠি লিখে এ কথা জানিয়েছেন নবাবের সঙ্গী উইলিয়াম ওয়াটস। নবাবের মতিগতি নিয়ে বেশ চিন্তায় পড়েছিলেন ক্লাইভ। কেন হুগলিতে এত দিন ধরে বসে আছেন নবাব? শেষ পর্যন্ত তিনি আসবেন তো? যদি তিনি কোম্পানির দাওয়াত উপেক্ষা করেন তো ঘোর বেইজ্জতি হবে ইংরেজদের। যাই হোক, নবাব আসছেন। ক্লাইভ এখন চিন্তামুক্ত।

নবাবের সফরসঙ্গী মণি বেগম, জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ, রায়দুর্লভের পরিবর্তে নবনিযুক্ত দেওয়ান উমিদ রায় ও গোলাম হোসেন। তাঁদের খাতির-যত্নের সব আয়োজন চূড়ান্ত করতে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে কলকাতায়।

এই নিয়ে বিগত দুই বছরে তৃতীয়বার কলকাতায় আসছেন সুবে বাংলার নবাব বাহাদুর। ১৭৫৬ সালের মাঝামাঝি ও ১৭৫৭ সালের গোড়ায় কলকাতায় এসেছিলেন নবাব সিরাজদ্দৌলা। দু'বারই ইংরেজদের বাংলা থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করার মনসুবা নিয়ে এসেছিলেন তিনি। প্রথমবারে তছনছ করে দিয়েছিলেন গোটা কলকাতা শহরকে, ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়াম। ইংরেজরা পালিয়ে গিয়েছিল ফলতায়। সুবে বাংলায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল ইংরেজদের ব্যাবসাবাণিজ্য।

কিছুদিন পরে ক্লাইভ ও ওয়াটসন মাদ্রাজ থেকে বাংলায় এসেই পুনর্দখল করে নিলেন ফোর্ট উইলিয়াম। এই খবর পেয়ে ক্ষিপ্ত সিরাজদ্দৌলা ফের ফৌজ নিয়ে কলকাতায় ধেয়ে এলেন ১৭৫৭ সালের গোড়ায়। কিন্তু সেবারে এক কুয়াশামাখা শীতের ভোরে ক্লাইভের দুঃসাহসিক অভিযান বেসামাল করে দিয়েছিল নবাব ও তাঁর গোটা বাহিনীকে। ত্রস্ত নবাব ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করে ফিরে গিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদে। সেই থেকে সিরাজদ্দৌলার বিপর্যয়ের শুরুয়াত, যার চূড়ান্ত পরিণতি পলাশির প্রান্তরে।

১৭৫৬ ও ১৭৫৭ সালে নবাবের আগমন সংবাদে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল কলকাতা শহরে। কী সাহেবপাড়া, কী দেশি পাড়া কেঁপে উঠেছিল বিপর্যয়ের আতঙ্কে। কলকাতা ছেড়ে পালানোর হিড়িক পড়ে গিয়েছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে। এবারে পরিস্থিতি ভিন্ন। ইংরেজরা এখন নবাবের দুশমন নয়, দোস্ত। পলাশিতে সিরাজের মুসিবতের পর ইংরেজদের হাত ধরে মসনদে বসেছেন মিরজাফর খাঁ। এবারে সেই বন্ধু নবাবের পদসঞ্চার ঘটতে চলেছে কলকাতায়। ভয়ভীতির আবহ নয়, উল্লাস, সেলিব্রেশনের পটভূমি। ত্রাসের সঞ্চার নয়, কলকাতার হাওয়ায় এবার খুশির আমেজ। নবাবকে স্বাগত জানানোর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কলকাতা। কী দেশিপাড়া, কী সাহেবপাড়া সর্বত্রই ফূর্তির মেজাজ।

নদী বেয়ে এসে কেল্লাঘাটে নামবেন মিরজাফর খাঁ। সেখান থেকে তাঞ্জামে চড়ে যাবেন চিৎপুরে গোবিন্দরাম মিত্তিরের বাগানবাড়িতে। ওখানেই তিনি থাকবেন। পাশেই আরেকটি বাগানবাড়িতে জগৎশেঠ, উমিদ রায় ও গোলাম হোসেনের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে। দুই বাড়িতেই এখন চলছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি। নবাবের খোশ আমদেদের জন্য বহু টাকা খরচ করেছে কোম্পানি। কেনা হয়েছে মেহগিনি কাঠের নতুন নতুন আসবাবপত্র, বাহারি ঝাড়বাতি, চিনেমাটির বাসনপত্র। চকমিলানো মার্বেলের মেঝে মুড়ে দেওয়া হয়েছে দামি গালিচায়। ঘরদোর, অলিন্দ সাজিয়ে তুলতে বেশ কয়েকখানা মার্বেল পাথরের ভেনাসের মূর্তি বসানো হয়েছে জায়গায় জায়গায়। নবাবের খাতিরযত্নে কোনও ত্রুটি রাখতে চায় না ক্লাইভ। তাঁর নির্দেশে সরেজমিনে সব দেখতে এসেছিলেন ওয়ালস। সব দেখেশুনে প্রসন্ন চিত্তে বেরিয়ে এসে তিনি চেপে বসলেন ঘোড়ার পিঠে। চিৎপুরের রাস্তা ধরে ঘোড়া ছুটে চলল ফোর্ট উইলিয়ামের উদ্দেশে।

নবাবকে স্বাগত জানানোর জন্য ফোর্ট উইলিয়াম থেকে গোবিন্দ মিত্তিরের বাগানবাড়ি যাওয়ার পথে বিভিন্ন জায়গায় স্থাপন করা হয়েছে বড় বড় বাহারি নকশার তোরণদ্বার। সেসবের মাথায় পাশাপাশি উড়ছে কোম্পানি ও নিজামতের নিশান।

কেল্লাঘাটেও চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। ঘাট থেকে ফোর্ট উইলিয়ামের দেউড়িতে পৌঁছনোর পথে সিঁড়ির ধাপগুলো মুড়ে দেওয়া হয়েছে লাল গালিচায়। ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে সদর দেউড়ি। ক্লাইভ, ড্রেক, হলওয়েল, মানিংহ্যাম, বীচার সকলেই উত্তরপানে চেয়ে অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে আছেন—কখন নবাবের নৌবহর দৃশ্যমান হয়ে উঠবে চোখের পর্দায়। ফোর্ট উইলিয়ামের নড়বড়ে বুরুজের উপরে বসানো হয়েছে কামান। প্রস্তুত হয়ে আছে গোলন্দাজেরা। ভাগীরথীর বুকে নৌবহরের দেখা মিললেই খুশিতে শূন্যে তোপ দাগবে তারা। সেই আওয়াজে নবাবের আগমনবার্তা ছড়িয়ে পড়বে গোটা কলকাতা শহরজুড়ে। নবাবকে ওয়েলকাম জানাতে ঘাটের উপরে প্রস্তুত হয়ে আছে ফৌজি ব্যান্ড।

খানিকবাদে এল সেই প্রতীক্ষিত শুভক্ষণ। দূরে দেখা গেল নবাবের নৌবহর। এগিয়ে আসছে অজস্র বজরা শালতি, সুলুপ, ছিপনৌকা। প্রত্যেক জলযান থেকেই উড়ছে নিজামতের পতাকা।

দুম-দুম-দুম! তোপ গর্জনে কেঁপে উঠল গোটা কলকাতা। হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ল নদীর তীরে জমায়েত আম-আদমি। ওই যে নবাব আসছেন।

পড়ন্ত বিকেলের আলো গায়ে মেখে বজরার ছাতে বসেছিলেন মিরজাফর খাঁ। উপভোগ করছিলেন তাঁর খাতিরদারির খাতিরে তোপের গর্জন, নদীর পাড়ে জমায়েত আম-আদমির কৌতূহল, হুড়োহুড়ি, ঠেলাঠেলি, ফৌজি ব্যান্ডের বাজনা।

তোপ দাগার আওয়াজে ত্রস্ত হয়ে কেল্লার বুরুজের নিশ্চিন্ত আবাস ছেড়ে আকাশে চক্কর কাটতে লাগল একঝাঁক পায়রা।

নবাবের বজরা এসে ভিড়ল কেল্লাঘাটে। নবাব নেমে আসতেই এগিয়ে গিয়ে করমর্দন করলেন গভর্নর ক্লাইভ। তারপর ওয়ালশের হাত থেকে রুপোর কাজ করা একটা মেহগিনি কাঠের সুদৃশ্য বাক্স নিয়ে নবাবের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'আপনার নজরানা হুজুর, একশো আশরফি।'

প্রসন্ন হাসি হাসলেন মিরজাফর খাঁ। বজরা থেকে নামার সময়েই চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়েছেন তাঁর খাতিরদারির জন্য এলাহি আনজাম-ইন্তেজাম। অতীতে কোনও নবাবকেই এভাবে সম্মান জানায়নি ইংরেজরা। কলকাতায় পা রেখেই মন ভরে গিয়েছে মিরজাফরের। সিরাজের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত পুরোনো ফোর্ট উইলিয়ামের কঙ্কালসার কলেবরে চোখ বোলাতে বোলাতে ক্লাইভের পাশাপাশি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছিলেন নবাব। সেবারে তিনি ছিলেন সিরাজদ্দৌলার সিপাহসালার। কামানের গোলার ঘায়ে ভয়ানক জখম হওয়া কেল্লাটাকে দেখে কেমন যেন একটা অপরাধবোধে সংকুচিত হয়ে পড়লেন মিরজাফর খাঁ। শুকনো হাসি হেসে বললেন, 'সেবারে খুবই তকলিফ হয়েছিল আপনাদের।'

একচিলতে সরস হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে ক্লাইভ বললেন, 'হুজুর আপনি কলকাতায় এসেছেন, আমাদের সব তকলিফ দূর হয়ে যাবে।'

হেলে পড়েছে একটা বুরুজ। সেদিকে তাকালেন মিরজাফর।

ক্লাইভ হেসে বললেন, 'আপনার কুদরতির ইয়াদগার।'

বেশ কুণ্ঠিত গলায় নবাব বললেন, 'সে সময় তো আমি নেহাতই এক সিপাহসালার। হুকুমের বান্দা। আমার কি কসুর বলুন?'

'কসুর আপনার নয়, কোম্পানির বদবখতি।' হাসলেন ক্লাইভ।

'নতুন কেল্লার ইমারত গড়ছেন কোথায়?' শুধোলেন নবাব।

'কাছেই। গোবিন্দপুরে। সবে কাজ শুরু হয়েছে। শেষ হতে অনেক সময় লাগবে। আপনাকে একদিন দেখিয়ে নিয়ে আসব। এই কেল্লার হালত যে কী, তা তো চোখে দেখেই বুঝতে পারছেন। এই ওয়াক্তে অচানক আমাদের উপরে কেউ যদি হামলা করে তো আপনিই ভরসা।'

'আপনারা বাহাদুর ইনসান। কার হিম্মত হবে যে আপনাদের উপরে হামলা করে?'

'নসিবের কথা কে বলতে পারে হুজুর? আমাদের দুশমন তো কম নেই। ফরাসি জেনারেল জাঁ ল সুজাউদ্দৌলার তাঁবে রয়েছেন। ডাচেরাও আমাদের উপরে সন্তুষ্ট নয়।'

ক্লাইভের মুখে ডাচেদের নাম শুনেই মিরজাফরের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। তাহলে কি ডাচদের সঙ্গে মিরজাফরের গোপন দোস্তির কথা জেনে ফেলেছেন ক্লাইভ? কিন্তু তা কী করে সম্ভব? বিসডামের সঙ্গে একান্তে আলোচনা হয়েছিল তার। তৃতীয় কেউ ছিল না কক্ষে।

নবাব শুধোলেন, 'আপনি কি মনে করেন, ডাচেরা হামলা করতে পারে আপনাদের উপরে?'

‘কার মনসুবা যে কী, তার আগাম আন্দাজ কী করে পাব বলুন?’

মিরজাফর বললেন, ‘আর যাই হোক, সুবে বাংলাকে ফের বেচ্যায়েন হতে দেব না আমি।’

ক্লাইভ মুচকি হেসে বললেন, ‘তাই তো বলছিলাম হুজুর, আপনিই ভরসা।’

ফোর্ট উইলিয়াম থেকে গোবিন্দরাম মিত্তিরের বাগানবাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করলেন নবাব। চিৎপুর রোড ধরে এগিয়ে চলল নবাবের ডুলি। পথের দুপাশে জড়ো হয়েছে বহু উৎসাহী মানুষজন। বাংলার নবাবকে কোনওদিনও এরা চোখে দেখেনি। সকলেরই চোখেমুখে নবাবকে একঝলক দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

মিরজাফর জানেন কলকাতার মানুষজন বরাবরই ইংরেজদের দিকে ঝোঁকা। ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নরই এদের কাছে নবাব-বাদশা। সেবার সিরাজদ্দৌলার সিপাহসালার হিসেবে কলকাতা অভিযানে এসে তিনি নজর করেছিলেন আম-আদমির চোখেমুখে নবাবের প্রতি তীব্র নফরতি। সদ্য গড়ে ওঠা শহরটা তছনছ হয়ে যাওয়ায়, বহু মানুষের রুটিরুজির উপায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছিল সাধারণ মানুষজন। সিরাজদ্দৌলা শখ করে এই শহরের নামকরণ করেছিলেন আলিনগর। সেই আলিনগরকে খালি করে দিয়ে কোথায় যেন গায়েব হয়ে গিয়েছিল লোকজন। সে যেন নবাবের প্রতি নফরতি প্রকাশের আরেক তরিকা। সেই কলকাতাবাসী আজ তাঁকে একঝলক দেখার জন্য ভিড় করেছে পথের পাশে। মনের মধ্যে বেশ গর্ব অনুভব করতে লাগলেন নবাব।

নবাবের ডুলির পিছু পিছু পর্দা ঢাকা পালকিতে চলেছেন মণি বেগম। বিকেলের আলো ফুরিয়ে আসছে, পুরোপুরি আঁধার নামতে অবশ্য এখনও ঢের দেরি। পর্দার আড়াল থেকে অবাক চোখে শহরটাকে দেখছিলেন মণি বেগম। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার পিছনপানে তাকালেন। চিকের আড়াল থেকে দেখা যাচ্ছে নজম ও সইফকে। গোরা পল্টন পরিবৃত হয়ে টাট্টুর পিঠে চড়ে আসছে। পরনে নবাবের মতোই পোশাকাশাক। দুজনেরই মাথায় উষ্ণীষ, কোমরবন্ধনী থেকে ঝুলছে খুদে আকারের তলোয়ার। খুব আমোদ হয়েছে দুই ভাইয়ের। পাশাপাশি চলতে চলতে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে আর হাসাহাসি করছে। ফুলের মতো নিষ্পাপ দুই শিশু। প্রাণশক্তিতে ভরপুর। জল চিকচিক করে মণি বেগমের চোখে। এ আঁসু খুশির।

সহসা নহবতের সানাইয়ের সুর কানে আসতে সচকিত হয়ে ওঠেন বেগম সাহেবা। দেউড়ি টপকে গোবিন্দ মিত্তিরের বাগানবাড়ির অন্দরে প্রবেশ করল মণি বেগমের পালকি।

হাসি-আনন্দ, ফূর্তি-আসরতে, মজলিশ, হুল্লোড়, মুজরো, শিকারখেলা এই সব কিছু নিয়ে কলকাতায় বেশ কয়েকটা দিন কাটালেন নবাব। তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের উপহার পেশকাশ, সওগাতে ভরে দিল ইংরেজরা। ইংরেজ কোম্পানির কাছে এই অভূতপূর্ব খাতির পেয়ে আবেগে ভেসে গেলেন মিরজাফর খাঁ। বারবার তাঁর মনে হতে লাগল সত্যিই ইংরেজদের চেয়ে, ক্লাইভের চেয়ে পরম সুহৃদ তাঁর আর কেউ নেই। কলকাতা আসার পথে বাংলা থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করার মনসুবা নিয়ে তিনি যে চুঁচুড়ার ডাচ গভর্নর বিসডামের সঙ্গে একপ্রস্থ আলোচনা সেরে এসেছেন সে কথা মনে হতে ভিতরে ভিতরে ভয়ানক অপরাধবোধ হতে লাগল নবাবের। মনে হতে লাগল, বিসডামের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মস্ত আহাম্মকির কাজ করে এসেছেন তিনি। আর যাই হোক ডাচেরা ইংরেজদের মতো বাহাদুর নয়, ক্লাইভের হাতেই তিনি সুরক্ষিত থাকবেন। সুরক্ষিত থাকবে তাঁর মসনদ।

নবাবের দিনগুলো সুনহারি এক খোয়াবের মতো দিব্যি কেটে যাচ্ছিল কলকাতায়। কিন্তু তাল কাটল হঠাৎই। একদিন সাতসকালে কলকাতায় নবাবের বাসভবনে এসে হাজির হলেন ওমর বেগ। তাঁর এক কাসিদ চুঁচুড়া থেকে নিয়ে এসেছে বিসডামের একটা চিঠি। আঁতকে উঠলেন নবাব। বিসডাম লিখেছেন, ‘...হুজুর আপনি যেমন বলেছিলেন, ইংরেজদের মোকাবিলা করার জন্য আমরা প্রস্তুত। আমাদের একটা

জাহাজ হুগলি নদীর মোহনায় এসে পৌঁছেছে। খুব শিগগিরই আমরা কলকাতার উপরে হামলা করব। এই ওয়াক্তে কলকাতায় থাকা আপনার পক্ষে নিরাপদ নয়। আপনি তুরন্ত মুর্শিদাবাদে ফিরে যান।...'

মুখ গম্ভীর হল নবাবের। ওমর বেগকে বিদায় দিয়ে ভাবতে বসলেন এখন কী করা যায়। তবে ভাবার অবকাশ পেলেন না বেশিক্ষণ। ওমর বেগ বিদায় নেওয়ার কিছুক্ষণ পরেই ঘোড়া হাঁকিয়ে গোবিন্দরাম মিত্তিরের বাগানবাড়িতে এসে হাজির হলেন রবার্ট ক্লাইভ ও উইলিয়াম ওয়াটস। থমথম করছে ক্লাইভের চোখমুখ। কলকাতায় আসার পর থেকে সর্বদাই ক্লাইভের মুখে যে মৃদু হাসির রেশ দেখে আসছিলেন নবাব, সেটা আজ অন্তর্হিত।

দরবার ঘরে নবাবের মুখোমুখি কুরসিতে বসলেন ক্লাইভ ও ওয়াটস। কোনও ভূমিকা ছাড়াই গম্ভীর গলায় ক্লাইভ বললেন, 'আজ আমি শিকায়ত জানাতে এসেছি হুজুর।'

ক্লাইভের গলায় ক্ষোভের সুর। থতমত খাওয়া ভঙ্গিতে নবাব শুধোলেন, 'তকলিফ কী হল সাহেব? কীসের জন্য শিকায়ত?'

'কারণ খুবই গহেরা। আমার কাছে খবর এসেছে ডাচদের একখানা জাহাজ বাটাভিয়া থেকে ফৌজিদের নিয়ে হুগলি নদীর মোহনায় এসে পৌঁছেছে। শুধু তাই নয় আমি আরও শুনলাম কাশিমবাজার ও চুঁচুড়ায় দেশি লোকেদের টাকার টোপ দিয়ে ফৌজে বহাল করছে ডাচেরা।'

এই বলে স্থির দৃষ্টিতে নবাবের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন ক্লাইভ। সেই ধারাল চাহনি যেন নবাবের মনের অন্দরমহলকে ছানবিন করতে লাগল।

ক্লাইভের চোখের দিকে তাকাতে অস্বস্তি বোধ করলেন নবাব। ঢোক গিলে বললেন, 'তাজ্জব বাত। এরা চায় কী?'

'ডাচেরা আপনার প্রজা। এ সওয়াল তো আপনার কাছে আমারই করার কথা।'

'ডাচদের মনসুবা কী– আমি পুছতাছ করে দেখব।'

ক্লাইভ বললেন, 'আমার মনে হয় ডাচেরা কলকাতায় হামলা করতে চায়।'

'এই ওয়াক্তে আপনিই তো ভরসা।' বেশ নরম গলায় বললেন ওয়াটস।

'আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন সুবে বাংলাকে আমি কিছুতেই বেচ্যায়েন হতে দেব না।'

ক্লাইভ এবারে স্পষ্টতই আদেশের সুরে বললেন, 'আপনি ডাচদের কড়া একটা চিঠি লিখে দিন। ডাচদের জাহাজ যেন হুগলি নদীর মোহনা থেকেই ফিরে যায়। কৈফিয়ৎ তলব করুন, কেন তারা ফৌজি মজুত করছে চুঁচুড়ায়, কাশিমবাজারে?'

নবাবের প্রত্যুতরের অপেক্ষা না করে বুটের শব্দ তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ক্লাইভ।

ওয়াটস উঠে দাঁড়িয়ে চাপা স্বরে বললেন, 'গভর্নর সাহেব খুব রেগে গিয়েছেন।'

মিরজাফর মরিয়া হয়ে বললেন, 'আমাকে গলত সমঝাবেন না আপনারা। ডাচেরা কী করল, তা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আমার রিশতেদারি যেন না টুটে যায়। আমি আজই লিখে দিচ্ছি ডাচ গভর্নরকে। তাদের জাহাজ যেন ফওরান বাংলা মুলুক ছেড়ে চলে যায়।'

'চিঠিটা তুরন্ত পাঠিয়ে দিন।' এই বলে দ্রুত কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন ওয়াটস।

নবাবের কলকাতাবাসের সুখ ঘুচে গেল নিমেষে। ইংরেজদের উপরে হামলা করার জন্য ক'দিন আগেই তিনি মদত দিয়ে এসেছেন গভর্নর বিসডামকে। সেসব ভুলে গিয়ে কড়া একখানা চিঠি না হয় তিনি লিখে পাঠাবেন, কিন্তু তাঁর হুকুমকে উপেক্ষা করে সত্যিই যদি ফৌজিদের নিয়ে ডাচ জাহাজ কলকাতায় এসে হাজির হয়, তখন কী হবে? মিরজাফরের মনে হল, আর যাই হোক, নিজের নিরাপত্তার খাতিরে অবিলম্বে তাঁর কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়া খুবই জরুরি।

উমিদ রায়কে ডেকে মুর্শিদাবাদে দ্রুত ফেরার আয়োজন করতে বললেন নবাব।

কিছুক্ষণ পরে নবাবের চিঠি নিয়ে চুঁচুড়া অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন ওমর বেগ।

ডাচ গভর্নরের উদ্দেশে নবাব লিখলেন, '...শুনলাম ফৌজিদের নিয়ে আপনাদের একখানা জাহাজ এসেছে হুগলি নদীর মোহনায়। আমি স্পষ্ট জানতে চাই আপনাদের ইরাদা কী? আপনারা কি সুবে বাংলাকে বেচ্যায়েন করতে চাইছেন? লড়াই বাঁধাতে চান ইংরেজদের সঙ্গে? অবিলম্বে যেন আপনাদের জাহাজ যেন হুগলি নদীর মোহনা ছেড়ে চলে যায়। কোনও ফৌজি যেন সুবে বাংলার মাটিতে পা না রাখে। ইয়াদ রাখবেন এটা আমার হুকুম...'

নবাবের চিঠি পেয়ে তাজ্জব বনে গেলেন বিসডাম। কয়েকদিন আগে একান্ত আলোচনায় নবাব হুগলিতে বসে যা বলে গেলেন তার সঙ্গে এ চিঠির বয়ানের যে কোনও মিল নেই। বিসডাম বুঝলেন, যতই ক্ষোভ থাকুক না কেন, ক্লাইভের বিরুদ্ধে যাওয়ার হিম্মত নেই নবাবের। অতএব তাঁর কাছে দরবার করে ইনসাফ চাওয়া অর্থহীন। নবাবকে উপেক্ষা করেই ইংরেজদের সঙ্গে সরাসরি বোঝাপড়াটা এবারে সেরে নিতে হবে ডাচেদের। যদিও এই মুহূর্তেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যাওয়ার ইচ্ছে বিসডামের নেই। তিনি চাইছিলেন ধীরে ধীরে চুঁচুড়া ও কাশিমবাজের সেনা মজুত করতে। কিন্তু বিধি বাম। বিসডাম সব কথা লিখে জানালেন বাটাভিয়ায়।

'...নবাবের কাছ থেকে ইনসাফ পাওয়ার কোনও আশা নেই। লড়াই করেই সুবে বাংলায় আমাদের অধিকার বুঝে নিতে হবে। এই ওয়াক্তে নিজেদের শক্তি না বাড়িয়ে নবাবের হুকুমতের বিরুদ্ধে যাওয়া মস্ত আহাম্মকির কাজ হয়ে যাবে। কাজেই নবাবের হুকুম মোতাবেক হুগলির মোহনায় পৌঁছনো জাহাজটা আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি। খুব দ্রুত অনেক ফৌজি ও গোলাবারুদসহ বেশ কয়েকখানা যুদ্ধজাহাজ একসঙ্গে বাংলায় পাঠান। অচানক জোরদার হামলা করতে পারলে সুবে বাংলায় ইংরেজদের বেসামাল করে দেওয়া যাবে।...'

ওদিকে নবাবের চিঠি পাওয়ার পরপরই বিসডামের হাতে এসে পৌঁছয় ক্লাইভের চিঠি। ক্লাইভ কৈফিয়ৎ চাওয়ার ঢঙেই জানতে চেয়েছেন হুগলি মোহনায় ডাচ যুদ্ধজাহাজ আগমনের উদ্দেশ্য কী?

বিসডাম জবাবে বেশ নরম সুরেই লিখলেন, '...আমাদের ভুল বুঝবেন না সাহেব। আপনাদের সঙ্গে আমাদের দোস্তি অনেকদিনের। হুগলির মোহনায় আমাদের যুদ্ধজাহাজ এসেছে ঠিকই, তবে আপনাদের সঙ্গে লড়াই করার কোনও মতলব আমাদের নেই। আসলে জাহাজটার যাওয়ার কথা ছিল নেগাপত্তনম। খারাপ আবহাওয়ার কারণে এদিকে এসে পড়েছে। জাহাজিদের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ চুঁচুড়া থেকে আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি। কয়েকদিনের মধ্যেই জাহাজটি মোহনা ছেড়ে নেগাপত্তনমের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাবে।...'

এই চিঠি পেয়ে অনেকটা হালকা বোধ করলেন ক্লাইভ।

কলকাতা ছেড়ে তখন মুর্শিদাবাদের উদ্দেশে রওনা হয়ে গিয়েছেন নবাব। তিনি নিঃশব্দে চুঁচুড়া ও হুগলি পেরিয়ে গেলেন। ফের যদি ডাচ গভর্নরের মুখোমুখি হতে হয়, সেই সংকোচে এবারে আর হুগলিতে থামলেন না। তাছাড়া অন্য একটা কারণে সে সময়ে দ্রুত মুর্শিদাবাদে ফেরাটা নবাবের পক্ষে খুব জরুরি হয়ে পড়েছিল। মুর্শিদাবাদ থেকে খবরটা নিয়ে এসেছিল নিজামতের এক কাসিদ। বাগি মোগল শাহজাদা আলিগোহর এলাহাবাদে বসে বাংলা আক্রমণের মতলব ভাঁজছেন। তাঁকে মদত দিচ্ছেন অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা।

কয়েকদিন বাদেই বিদায় নেবে ১৭৫৮ সাল। বিপরীতমুখী উত্তুরে হাওয়া ঠেলে দ্রুত গতিতে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে এগিয়ে চলল নবাবের নৌবহর। মিরজাফরের কপালে ভাঁজ। একদিকে ডাচদের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই বাধার আশঙ্কা, অন্যদিকে বাগি শাহজাদা। নবাব বুঝতে পারছেন ফের একটা অশান্তির মেঘ জমাট বাঁধছে বাংলার আকাশে। আসন্ন এই ঝঞ্ঝা যে কোন খাতে টেনে নিয়ে যাবে তাঁর নসিবকে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় নবাবের মন তোলপাড়। দুশ্চিন্তার দাওয়াই শরাব। নবাব ডুবলেন নেশায়।

সারা বছরই ফুলে ফুলে ভরে থাকে খোশবাগ। ঠিক যেন এক খণ্ড বেহেস্ত। চারিদিকে শুধু রঙের বাহার। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। এই রঙের হাটের মাঝে শায়িত রয়েছেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা। লতানো গোলাপের শাখাপ্রশাখা নুয়ে পড়েছে সিরাজের সমাধির উপরে। ঝুঁকে পড়ে সমাধির উপরের প্রস্তরখণ্ডকে যেন চুম্বন করছে অজস্র লাল গোলাপ। এই গাছগুলো লুৎফা নিজের হাতে লাগিয়েছিল। প্রাণশক্তিতে ভরপুর আগ্রাসী গোলাপলতা নিবিষ্ট ভাবে ঘিরে ধরেছে সমাধিকে। লুৎফা মুগ্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে। তার মনে হয় এই গোলাপলতা যেন তারই অন্তরাত্মা। শাখাপ্রশাখার বেষ্টনীতে আগলে রেখেছে মাটিতে ঘুমিয়ে থাকা সিরাজকে। এ ভাবেই তো জিন্দেগিভর সিরাজকে আগলে রাখতে চেয়েছিল সে।

খোশবাগের একপ্রান্তে ছোট্ট একটা কোঠাবাড়ি। লুৎফুন্নেসার আবাসগৃহ। এখানেই সিরাজের কন্যা উম্মেসায়েরাকে নিয়ে তার ছোট্ট সংসার। লুৎফার কাছে এই খোশবাগই হল জন্নত। এই স্থান ছেড়ে একদিনের জন্যেও অন্য কোথাও যাওয়ার কথা সে ভাবতে পারে না। যতদিন শ্বাস চলবে, রক্ত ছুটবে ধমনীতে ততদিন সে কেবল সিরাজের সেবা করে যেতে চায়। খোদার বহুত মেহেরবানি। তাই তিনি সিরাজের থেকে তাকে দূরে রাখেননি। কোনও হাবুজখানা লুৎফাকে কয়েদ করে রাখতে পারেনি। মিরন তাকে বন্দি করতে পারেনি জাফরাগঞ্জের হারেমে। কোনও ঘাতকের অস্ত্র তাকে খতম করতে পারেনি। তার শরীরটাকে ভোগ করতে পারেনি মিরন। সর্বশক্তিমান পয়গম্বর যেন সিরাজের সেবার জন্যই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তামাম চকবাজার আলোচনা করে - লুৎফা বেগম এক পাকিজা দিল খুশনসিব জেনানা। সচমুচ জন্নত থেকে এই মাটির দুনিয়ায় নেমে আসা এক ফেরেস্তা।

সিরাজের সমাধিতে লুৎফা রোজ ছড়িয়ে দেয় খোশবাগের বাগানের তরতাজা ফুল। জ্বেলে দেয় ধূপ, সমাধির উপরে রোজ নতুন একটা চাদর চড়িয়ে ঢেলে দেয় আতর। সন্ধেবেলায় সমাধির উপরে জ্বেলে দেয় চিরাগবাতি। বাতিদান হাতে জেয়ারত করে সিরাজের সমাধি। তারপর চুপ করে বসে থাকে সমাধির পাশে। মনের মধ্যে কাল্পনিক সংলাপ রচনা করে সে কথা বলে চলে। কোনও কোনও দিন রাত গভীর হয়ে যায়। নিবিষ্ট মনে বসে থাকে লুৎফা। দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। 'সরতাজ তুমি আছ, আমাকে ঘিরে তুমি আছ, আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে মিলেমিশে আছে তোমার অস্তিত্ব। তোমার মওত হয়েছে আমি বিশ্বাস করি না।'

সেদিনও সন্ধে নামার পরে সমাধিতে চিরাগ, আগরবাতি জ্বেলে সিরাজের শিয়রে চুপ করে বসেছিল লুৎফা। তার অতীত জীবনের খুশনসিবির তসবির আনাগোনা করছিল চোখের পর্দায়। হঠাৎই পিছন থেকে নারী কণ্ঠের সম্ভাষণ শুনে সে চমকে ওঠে—'বহেন!'

'কে?' চমকে গিয়ে লুৎফা ঘুরে তাকায়। মশালের মৃদু আলোয় সে দেখে অদূরে দাঁড়িয়ে আছে এক রহস্যময়ী নারী। বেশবাস ভৈরবীর মতো। মাথার চুলে জট পড়েছে। জট পাকানো চুল চুড়ো করে বাঁধা। পরনে রক্তাম্বর। শীর্ণ চেহারা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। গায়ে জড়ানো মেটে রঙের মলিদা বহু ব্যবহারে মলিন। হাতে রয়েছে একটা ত্রিশূল। সাপের জিভের মতো লকলক করছে ত্রিশূলের তিনটি ধারালো ফলা।

ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায় লুৎফা। কে এই নারী? মিরনের পাঠানো কোনও আততায়ী নয়তো? লুৎফা ভয়ে দুপা পিছিয়ে গিয়ে বলে, 'ক-কে আপনি?'

'ভয় পেয়ো না বহেন। আমি তোমার দুশমন নই।' স্নেহ ঝরে পড়ে খুশ ইলহান কণ্ঠের আওয়াজে। রহস্যময়ীর মুখে ফুটে ওঠে এক টুকরো হাসির রেখা। লুৎফার মনে হয় সেই মুহূর্তে যেন কলঙ্কহীন চাঁদের

উদয় হল এই খোশবাগে। ভৈরবী অতীব সুন্দরী। লুৎফার কৌতূহল বেড়ে যায়। ফের সে চাপা স্বরে শুধোয়, ‘কে আপনি? কী আপনার পরিচয়?’

‘পরিচয় না দিলে বুঝি তাড়িয়ে দেবে বহেন?’ কয়েক পা সামনে এগিয়ে এসে লুৎফার মুখোমুখি দাঁড়ায় রহস্যময়ী। ‘ভালো করে চেয়ে দেখো তো চিনতে পারো কি না?’

একখানা জ্বলন্ত চিরাগ হাতে নিয়ে রহস্যময়ীর মুখমণ্ডল ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে লুৎফা। বুক ধড়ফড় করতে থাকে তার। খুব যেন চেনা মুখ। গলার আওয়াজও যেন খুবই পরিচিত।

‘অত কী দেখছ অমন করে? চিনতে পারছ না বহেন?’

বিস্ফারিত হয়ে ওঠে লুৎফার চোখদুটো। ‘হি-রা-দি-দি!’

কথাটা বলেই মুখে হাতচাপা দেয় লুৎফা। বাতাসেরও কান আছে।

‘সহি আন্দাজ করেছ বহেন। আমি হিরা। দেওয়ান মোহনলালের বহেন।’

‘কোত্থেকে এলে তুমি? তোমাকে যে নিজামতের কাসিদরা এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছে।’

‘ভেবো না বহেন। আমাকে ছোঁয়ার হিম্মত তাদের নেই।’

হিরার সঙ্গে সিরাজের সম্পর্কের কথা লুৎফার অজানা নয়। তখন লুৎফা ছিল সিরাজের জারিয়া। সিরাজের সঙ্গে আশনাই চলছে হিরার। মাঝে মাঝে লুৎফার হাত দিয়ে হিরার কাছে বার্তা পাঠাত সিরাজ। সেই সূত্রেই হিরার সঙ্গে লুৎফার আলাপ। তারপর হঠাৎই একদিন যেন কোথা থেকে কী হয়ে গেল। সিরাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হল হিরার। এরপর ফৈজিকে নিয়ে কিছুদিন বিভোর হয়ে থাকল সিরাজ। তারপর সিরাজের জীবনে লুৎফার প্রবেশ। নিজের কোনও কথা লুৎফার কাছে গোপন করেনি সিরাজ। সিরাজ ও হিরার অবৈধ সন্তান শ্রীমন্তলালের কথাও জানে লুৎফা। এ ঘটনা নবাব আলিবর্দি খাঁ মেনে নিতে পারেননি। সেই কারণেই ছিন্ন হয় তাদের সম্পর্ক। তারপর থেকে হিরা গৃহবন্দি। লুৎফা সব জানে। একদা সিরাজের মুখেই এসব শোনা। মনে মনে লুৎফা শ্রদ্ধা করত হিরাকে। বুয়ার পরিচয়ে সে বড় করে তুলেছিল সিরাজের রক্তের উত্তরাধিকারী নিজের সন্তান শ্রীমন্তলালকে। সিরাজকে কলঙ্কমুক্ত রাখতে কোনওদিনও মায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়নি। আজ সিরাজের সমাধিক্ষেত্রে হিরার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে এক খুশনসিব আওরাত বলে মনে হতে লাগল লুৎফার। সে তো অনেক কিছু পেয়েছে এই জীবনে। পেয়েছে পেয়ার, মহব্বত, সিরাজের একান্ত সান্নিধ্য, নবাব-বেগমের ইজ্জত। এমনকি সিরাজের মওতের পরও পেয়েছে তাঁকে সেবা করার অধিকার। অথচ সিরাজের জন্য নিজের অন্তরের সবটুকু ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েও কিছুই তো পায়নি হিরাদিদি। দুঃখ উথলে ওঠে লুৎফার অন্তরে। হিরাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে সে চোখের জলে ভাসে।

হিরা বলে, ‘কেঁদে কি করবে বহেন? জিন্দেগি নসিবের বান্দা। আমরা বদকিসমতির শিকার।’

‘এতকাল কোথায় ছিলে হিরাদিদি?’

‘নবাবের মুসিবতের পর পালিয়ে গিয়েছিলাম। সেই থেকে পাহাড়ে জঙ্গলে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি।’

‘শ্রীমন্তলাল কোথায়?’

‘শুনেছি ময়মনসিংহের রাজবাড়িতে ঠাঁই পেয়েছে। এই বন্দোবস্ত করে গিয়েছেন বড়ে ভাইয়া।’

‘কোথায় আছেন দেওয়ানজি?’

‘জানি না বহেন।’ দীর্ঘশ্বাস ফেলে হিরা।

‘ঘরে চলো দিদি।’

‘না বহেন। অত সময় হাতে আমার নেই। নিজামতের কাসিদদের হাতে গ্রেফতার হতে চাই না। ভেবেছিলাম, আর কোনওদিন ফিরব না মুর্শিদাবাদে। লেকিন নসিবের কী খেয়াল দেখ, সিরাজই আমাকে টেনে নিয়ে এলো এখানে। হঠাৎ ইচ্ছে হল তাঁর সমাধিকে একবার জেয়ারত করে আসি। চিরাগ জ্বেলে দিয়ে আসি আমার সরতাজের বুকে। তুমি ইজাজত দাও বহেন।’

হিরার হাত ধরে লুৎফা বলে, 'আমি কী ইজাজত দেব দিদি? এ তো তোমার অধিকার। এসো দিদি। ফুল ছড়িয়ে দাও সমাধিতে। সিরাজের ভালো লাগবে।'

চিরাগ হাতে সিরাজের সমাধি প্রদক্ষিণ করে হিরা। রোজই রেকাবি বোঝাই করে ফুল রেখে যায় মালিরা। সেই ফুলে ভরা রেকাবি হিরার হাতে তুলে দেয় লুৎফা।

সোনা ও রুপোর সুতোর কাজ করা নিজের একখানা উড়নি ঝুলির ভিতর থেকে বের করে সিরাজের সমাধিতে বিছিয়ে দেয় হিরা। তার উপরে ছড়িয়ে দেয় লাল গুলাবের পাপড়ি। নিজের হাতে জ্বেলে দেয় চিরাগবাতি। তারপর পর হাঁটু মুড়ে বসে সমাধির প্রস্তরখণ্ডে মাথা ঠেকিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে। জলের ধারা নামে লুৎফার দু'চোখেও।

খানিকবাদে চোখ মুছে উঠে দাঁড়ায় হিরা। লুৎফার চিবুক ছুঁয়ে বলে, 'আসি বহেন।'

'আবার এসো দিদি। বড় একলা লাগে আমার।'

'যদি জিন্দা থাকি তো নিশ্চয়ই আসব বহেন।'

'এখন কোথায় যাবে?'

'ময়মনসিংহের দিকে যাওয়ার ইচ্ছে আছে। এক ঝলকের জন্যও যদি শ্রীমন্তের দেখা মেলে। আর যদি বড়ে ভাইয়ার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়।' ক্লান্তি ঝরে পড়ে হিরার গলায়। লুৎফা জল ছলছল চোখে তার মুখপানে চেয়ে থাকে।

ক্ষণিকের বিষাদঘন স্তব্ধতা অন্তে লুৎফা শুধোয়, 'এখান থেকে যাবে কী ভাবে দিদি? চারিদিকে যে কাসিদদের কড়া নজরদারি।'

'ভেবো না বহেন। ঠিক চলে যাব আমি। ঘাটে ডিঙি নৌকো বাঁধা আছে। নদীতে ভেসে পড়ব।'

ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে লুৎফা।

দস্তমালে লুৎফার চোখ মুছিয়ে দিয়ে হিরা বলে, 'কেঁদো না বহেন। মন শক্ত করো।'

নিমেষে অন্ধকারে মিলিয়ে যায় হিরা। তার প্রস্থানপথের দিকে নির্নিমেষ চোখে চেয়ে থাকে লুৎফা। তার দৃষ্টিপথে এলোমেলো ছন্দে নেচে বেড়াতে থাকে অজস্র জোনাকি।

'বেগমসাহেবা।'

'কে?' ভয়ানক চমকে উঠে ঘুরে তাকায় লুৎফা। দেখে বাতিদান হাতে দাঁড়িয়ে আছে বাঁদি।

'ও তুই।'

'ঘরে চলুন বেগম সাহেবা। রাত অনেক হল।'

সায়েরা ঘুমিয়েছে?

'জি। বেগম সাহেবা।'

'চল।' বাঁদির পিছু পিছু ঘরের পথে পা বাড়ায় লুৎফা।

খোশবাগ থেকে বেরিয়ে এসে অন্ধকারে ঘাটের দিকে দ্রুত হাঁটতে থাকে হিরা।

ঘাটের কাছাকাছি আসতেই অন্ধকার ফুড়ে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক আততায়ী। ছেলেবেলায় মোহনলালের কাছ থেকে ঘোড়ায় চড়া থেকে শুরু করে লড়াইয়ের হরেক কলাকৌশল হিরা আয়ত্ত করেছিল। ঘাটে আসার পথেই সে টের পেয়েছিল কেউ তার পিছু নিয়েছে। লোকটাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে চুপচাপ হাঁটছিল হিরা। হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে রেখেছি ত্রিশূলটা।

আততায়ী ঝাঁপিয়ে পড়তেই চকিতে ঘুরে গিয়ে চোখের নিমেষে ত্রিশূলটা তার বুকে গেঁথে দেয় হিরা। বিকট আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল লোকটা।

তিরবেগে ঘাটের দিকে ছুটতে লাগল হিরা, যেখানে তার ছিপনৌকো বাধা রয়েছে।
চোখের নিমেষে নৌকার দড়ি খুলে নদীতে ভেসে পড়ল হিরা। কৃষ্ণপক্ষের রাত।
মোহনলালের বহেন অদৃশ্য হয়ে গেল আঁধারের আড়ালে।
রাতের স্তব্ধতা ভঙ্গকারী মানুষের প্রাণঘাতী আর্তনাদ শুনে মশাল হাতে ছুটে এল খোশবাগের পাহারায় নিযুক্ত কয়েকজন সেপাই। দৃশ্যটা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল তারা।
নদীর চরে বালির উপরে পড়ে রয়েছে মিরনের গুপ্তচর অঙ্গন সিং-এর নিথর দেহ। তার বুকে বিঁধে রয়েছে একটা ত্রিশূল।

থানা দুর্গের একটা বুরুজে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ পানে চেয়েছিলেন রবার্ট ক্লাইভ। চোখে দূরবিন। সকালের রোদ সরাসরি এসে পড়েছে তাঁর মুখের উপরে। বা হাত দিয়ে টুপিটা একটু টেনে রোদ আড়াল করলেন ক্লাইভ। তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন ম্যানিংহাম, নবকৃষ্ণ ও কোম্পানির সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ব্রোহিয়ার। তাঁদের দৃষ্টিও দক্ষিণ পথে। ১৭৫৭ সালের একেবারে গোড়ায় ফোর্ট উইলিয়াম দখল করে নেওয়ার পর এই থানা দুর্গের দিকে আর মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পাননি ক্লাইভ। সাগর থেকে নদী বেয়ে শত্রু ধেয়ে এলে কলকাতা পৌঁছনোর আগে তাদের রুখতে এই দুর্গ যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা যেন আজ আবার নতুন করে তিনি অনুভব করলেন। বুরুজে দাঁড়িয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন দুশমনের নওয়ারার উপরে জোরদার আক্রমণ হানার জন্য কোথায় কোথায় কামান বসানো জরুরি।
খানিকবাদে দূরবিন থেকে চোখ সরিয়ে ম্যানিংহামের উদ্দেশে বললেন, 'দিস ইজ অ্যান আইডিয়াল এস্টাবলিসমেন্ট টু প্রোটেক্ট আওয়ার ফোর্ট ইন ক্যালকাটা। বাট ইট নিডস আরজেন্ট রিপেয়ারিং ওয়ার্ক।'
সত্যিই। দীর্ঘ দিনের অযত্নে নড়বড় করছে থানা দুর্গ। ফাটল ধরেছে বুরুজের গায়ে। কামানের ভার বহন করার জন্য বুরুজগুলোকে আরও মজবুত করা দরকার।
ক্লাইভের কথায় সায় দিয়ে ম্যানিংহাম বললেন, 'দ্যাটস ট্রু স্যার।'
'দ্য রিপেয়ারিং ওয়ার্ক মাস্ট বি ডান উইদিন অ্যা মান্থ।' ব্রোহিয়ারের উদ্দেশে বললেন ক্লাইভ।
'ইয়েস স্যার। আই উড ট্রাই মাই বেস্ট।'
'নবকিসেন—'
'হুজুর—'
'একদল ওস্তাদ কারিগর চাই।'
ক্লাইভের কথার জবাবে নবকৃষ্ণ বলেন, 'সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে হুজুর।'
'বুরুজগুলোকে মজবুত করতে হবে। বড় পাল্লার কামান বসাতে হবে বুরুজে। উই হ্যাভ টু স্ট্রেনদেন দ্য আউটার ওয়াল অলসো।'
নবকৃষ্ণ শুধোলেন, 'হুজুর কি হামলার আশঙ্কা করছেন?'
ক্লাইভ মাথা নেড়ে বললেন, 'নাউ ডাচ ফোর্স ইজ অ্যা থ্রেট টু আওয়ার বেঙ্গল এস্টাবলিসমেন্ট। এবারে মোহনা থেকে ফিরে গেলেও আমার মন বলছে ফের ডাচ জাহাজ আসবে। উই আর রিয়েলি শর্ট অফ রিসোর্সেস অ্যাট প্রেসেন্ট। আলসো হ্যাভ ভেরি লেস টাইম টু প্রিপেয়ার আওয়ারসেলভস।'
বুরুজ থেকে নেমে এলেন ক্লাইভ। থানা দুর্গ থেকে কোণাকুনি অবস্থানে গঙ্গার ওপারে রয়েছে আরেকটি ছোট কেল্লা। মাটির তৈরি। গাছপালার মাথা টপকে দূর থেকে দেখা যায় এর মাটির বুরুজগুলো। এ থেকে স্থানীয় লোকের মুখে মুখে জায়গাটার নাম হয়ে গিয়েছে মেটিয়াবুরুজ। কোম্পানির রেকর্ডে এর নাম চার্নকস ব্যাটারি।

থানা দুর্গ থেকে বেরিয়ে নৌকোয় চেপে চার্নকস ব্যাটারি পরিদর্শনে চললেন ক্লাইভ। এই দুর্গেরও মেরামতি দরকার। ওখানে মোতায়েন করতে হবে কয়েক প্ল্যাটুন গোরা পল্টন। সামান্য প্রস্তুতির অভাবে বিরাট অঘটন ঘটে যায়। এতদিনের যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা থেকে একথা ভালোই জানেন ক্লাইভ। তাই নবাব মুর্শিদাবাদের অভিমুখে রওনা হতেই তিনি লেগে পড়েছেন নিজের কাজে।

বিপদ সংকেত খুব দ্রুত পড়তে পারেন রবার্ট ক্লাইভ। কপালে তাঁর চিন্তার ভাঁজ। নবাবের উপরে আস্থা তাঁর নেই। ডাচেদের যুদ্ধজাহাজ সচমুচ যদি কলকাতায় এসে পড়ে, নবাব তখন যে কোন দিকে ঝুঁকবেন, তা বলা কঠিন। এই মুহূর্তে কলকাতায় ক্লাইভের হাতে রয়েছে সীমিত সংখ্যক সৈন্য। দক্ষিণে ফারাসিদের সঙ্গে লড়াইয়ে ইংরেজদের হাল এই মুহূর্তে যে কি, তা ক্লাইভের জানা নেই। আপাতত এই সামান্য সংখ্যক সেনা নিয়েই ডাচদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের স্ট্র্যাটেজি ছকতে হবে তাঁকে। কাজটা সহজ নয়। লড়াই পরিচালনা করার মতো দক্ষ অফিসার এই মুহূর্তে কলকাতায় খুব বেশি নেই। ভরসা ভাগ্যদেবী। যিনি বরাবর ক্লাইভের পক্ষে থেকে লড়াইয়ের ময়দানে তাকে অজেয় করে তুলেছেন। গলুইয়ের উপরে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে পাইপ গুঁজে এসব নানা কথা ভাবছিলেন ক্লাইভ।

নৌকা ভিড়ল ঘাটে। ব্রোহিয়ার, ম্যানিংহাম ও নবকৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে মেটিয়াবুরুজের কেল্লার অন্দরে প্রবেশ করলেন ক্লাইভ। অনেকদিন বন্ধ পড়ে রয়েছে এই কেল্লা। দরজা খুলতেই ক্লাইভের প্রায় মাথা ঘেষে উড়ে গেল একটা বাদুড়। মাথা ঝুঁকিয়ে সংঘাত এড়ালেন তিনি।

কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদে ফিরে দু'দণ্ড জিরোতে না জিরোতেই নবাবের হাতে এসে পড়ল রামনারায়ণের চিঠি। চোখে অন্ধকার দেখলেন নবাব। পাটনা থেকে এই চিঠি নিয়ে এসেছেন চরাধিপতি গোবিন্দমল্ল।

রামনারায়ণ লিখেছেন, '...ঘোর সংকট হুজুর। শাহজাদা আলি গোহর সুবে বাংলা দখলের মনসুবা নিয়ে বিরাট ফৌজসহ এলাহাবাদ থেকে পাটনার অভিমুখে রওনা হয়েছেন। শাহজাদার সঙ্গে রয়েছেন এলাহাবাদের কেল্লাদার মহম্মদ কুলী খাঁ ও ফরাসি সেনাপতি জাঁ ল। শুনতে পাচ্ছি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাও তার ফৌজ নিয়ে যোগ দেবেন শাহজাদার সঙ্গে। আপনি তুরন্ত ফৌজ পাঠান পাটনায়। আমার একার সামর্থ কী যে এই বিরাট ফৌজের মোকাবিলা করি।...'

এই সময় দিল্লির তখতে আসীন মহম্মদ আজীজউদ্দিন। ঔরঙ্গজেব বাদশার নাতি জাহান্দার শার ছেলে। তখতের চাবিকাঠি উজির ঘাজীউদ্দিনের হাতে। তিনি ঔরঙ্গজেবের একেকজন বংশধরকে টেনে নিয়ে দিল্লির তখতে বসান, পছন্দ না হলে তখত থেকে টেনে নামিয়ে দেন। অন্য একজনের উপরে বাজি ধরেন। দিল্লির বাদশা কার্যত উজিরের হাতের পুতুল।

বাদশা আহম্মদ শাকে টেনে নামিয়ে কিছুদিন আগে আজীজউদ্দিনকে তখতে বসিয়েছেন ঘাজীউদ্দিন। তখন আজীজউদ্দীনের বয়স পঞ্চান্ন বছর। পিতা জাহান্দার শার মৃত্যুর পর থেকে দীর্ঘ দিন কয়েদখানায় বন্দি থেকে রক্তের জোশ হারিয়ে বসেছেন। অস্তাচলে যেতে বসা মোগল সাম্রাজ্যের হাল ধরার ক্ষমতা একেবারেই তাঁর নেই। যদিও তখতে বসে তিনি নাম নিয়েছেন আলমগীর শানি। অর্থাৎ দ্বিতীয় আলমগীর।

মহম্মদ আজীজউদ্দীন ওরফে আলমগীর শানি নিতান্তই ভালো মানুষ। লেখাপড়া নিয়ে থাকেন। নিরীহ বাদশাকে হাতের মুঠোয় রেখে দিল্লির রাজ্যপাট দিব্যি চালাচ্ছিলেন ঘাজীউদ্দিন। কিন্তু গোলযোগ বাধল শাহজাদা আলি গোহরকে নিয়ে। উজিরের খবরদারি তাঁর সহ্য হল না। পদে পদে উজিরের বিরোধিতা শুরু করলেন। তাঁকে কয়েদ করার মতলবে ছিলেন ঘাজীউদ্দিন, কিন্তু একদিন লালকেল্লা থেকে পালিয়ে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার রাজত্বে চলে এলেন শাহজাদা। তাঁকে আশ্রয় দিলেন ধূর্ত সুজাউদ্দৌলা।

শাহজাদাকে আঁকড়ে ধরে তিনি এখন দিল্লির উজিরের পদ দখলের ভাবনায় মশগুল। সুজাউদ্দৌলা মনে করেন, সে পদ যেন তাঁর হকের পাওনা। কেননা তাঁর আব্বাহুজুর সফদারজঙ্গ মৃত্যুকাল পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যের উজির ছিলেন।

শাহজাদা আলি গোহর আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন সুবে বাংলা দখল করে ওখানেই আপাতত ঘাঁটি গাড়বেন, যতদিন না দিল্লির তখত তিনি দখল করতে পারছেন। কারণ বাংলা অনেক দূরে। উজির ঘাজীউদ্দিন সহজে তার নাগাল পাবে না। সুজাউদ্দৌলার পরামর্শে অযোধ্যা থেকে এলাহাবাদে এলেন আলি গোহর। বাংলা দখলের মনসুবায় তাঁকে মদত দিচ্ছেন এলাহাবাদের কেল্লাদার মহম্মদ কুলি খাঁ।

এলাহাবাদে পৌঁছেই ছত্রপুর থেকে ফরাসি সেনাপতি জাঁ লকে ডেকে পাঠালেন শাহজাদা আলি গোহর। বাংলা মুলুকের সুলুকসন্ধান জানেন বাহাদুর যোদ্ধা ল সাহেব। ফরাসিরা ইংরেজদের জাত শত্রু। শাহজাদার ডাক পেয়েই ছুটে এলেন ল সাহেব। আলি গোহর শুনেছেন বাংলার সুবাদার মিরজাফর খাঁ ইংরেজ সওদাগরদের হাতের পুতুল। ইংরেজ সওদাগরেরা বাংলায় এখন খুবই শক্তিমান। এদের বাংলা থেকে উচ্ছেদ করতে পারলে তাঁর নামে জয়জয়াকার পড়ে যাবে। এমনই পরিকল্পনা শাহজাদার। এলাহাবাদে বসে বাংলা দখলের নামে তিনি বেশ ভালোই সাড়া পেলেন। লুটপাঠের আশায় অনেকে এসে তাঁর সৈন্যদলে নাম লেখাতে লাগল। এই অভিযানে শাহজাদার সেনাপতি মহম্মদ কুলি খাঁ। সুজাউদ্দৌলা জানিয়েছেন হাতের কয়েকটা কাজ সেরে তিনিও এসে যোগ দেবেন শাহজাদার সঙ্গে।

এলাহাবাদে বসে থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে পড়ছিলেন আলি গোহর। সুজাউদ্দৌলার জন্য অপেক্ষা না করেই একটা শুভ দিন দেখে ফৌজ নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েছেন বাংলার পথে।

কী করা যায় এখন? গোবিন্দমল্লের মুখ থেকে এই কহানি শুনে ভয়ানক বিচলিত বোধ করলেন মিরজাফর খাঁ। শলাপরামর্শের জন্য মিরনকে তলব করলেন নবাব।

৬৬

নদীতে ভাসছে দুটো বজরা। একটার ছাতে মিরন ও তার কয়েকজন ইয়ারদোস্ত। আরেকটা বজরার ছাতে মিরকাজিম খাঁ ও তার অনুচরেরা। দুই দল ঘুড়ির লড়াইয়ে মেতেছে। উপস্থিত দর্শকদের প্রবল হর্ষধ্বনিতে আপ্যায়িত হয়ে আকাশে উড়ল মস্ত ল্যাজওয়ালা মসলিনের তৈরি আলিশান দুটো ঘুড়ি। সুতো ছাড়ছে দুই পক্ষই। ঘুড়িদুটো তরতর করে উঠছে উপরে। দেখতে দেখতে অনেক উপরে উঠে গিয়ে নীল আশমানের বুকে সচল দু'টো বিন্দুতে পরিণত হল। নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থাকা ও নদীর বুকে নৌকোয় ভাসমান দর্শকদের জোড়া জোড়া চক্ষু ঊর্ধ্বমুখী। এ লড়াইয়ের সবটুকু মজা তারা উশুল করে নিতে চায়।

হর সাল শীতের মরশুমের শুরুয়াতে ঘুড়ি উৎসবের আনজাম করে মিরন। ইয়ারদোস্ত, সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে তাঁবু ফেলে ভাগীরথীর চরে। মিরনের তরফ থেকে আমির-ওমরাহদের কাছে ঘুড়ি ওড়ানোর লড়াইয়ে যোগ দেওয়ার দাওয়াত যায়। একেক দিন একেক জনের সঙ্গে লড়াই। সূর্যোদয়ের খানিক পরেই শুরু হয় ঘুড়ির খেলা। চলে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। নবাবজাদার দাওয়াত গ্রহণ করে যারা আসেন তারা কয়েকদিনের জন্য মিরনের মেহমান হন নদী তীরবর্তী অস্থায়ী ছাউনিতে।

ভাগীরথীর বুকে বজরার ছাত থেকে ওড়াতে হবে ঘুড়ি। এটাই নিয়ম। খেলোয়াড়ের সঙ্গে থাকে বাজনদারের দল। ঢাকঢোল, কাড়ানাকাড়ার শব্দে সরগরম হয়ে ওঠে বিস্তীর্ণ এলাকা। দুই পক্ষের বজরা ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলে নদীতে। লড়াইয়ে মত্ত দুই দলের বেশ কিছু সমর্থক শালতি নিয়ে ভেসে চলে বজরার পিছু পিছু। নদীর বুকের উপর দিয়ে উড়ে চলা কাটি পতঙ্গ নিজেদের জিম্মায় নেওয়ার জন্য

শালতিগুলোর মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। এই হুড়োহুড়ি, উত্তেজনায় বেসামাল হয়ে কেউ কেউ শালতি থেকে টুপ করে খসে নদীতে পড়ে হাবুডুবু খায়। অনেক সময় শালতিটাই উলটে যায়। দুর্ঘটনা ঘটে। এসব নিয়ে অবশ্য কারোরই কোনও হেলদোল নেই। ঘুড়ির লড়াইকে কেন্দ্র করে রগড়, তামাশা, হুল্লোড়বাজিই শেষ কথা।

দিনের শেষে প্রতিযোগীদের বজরা ফিরে আসে ঘাটে। আমআদমি ঘরের পথ ধরে। তখন সরগরম হয়ে ওঠে নদীর চরে কয়েকমাইল জুড়ে বিস্তৃত ছাউনিগুলো। আলোর মালায় সেজে ওঠে তাঁবু। মেহমানদের নিয়ে ফূর্তিতে মেতে ওঠে নবাবজাদা। মজলিশ, গুলতানি, মুজরো, মেহফিল, জুয়া—সেই সঙ্গে খানাপিনার শাহি আনজাম। কয়েক সপ্তাহের এই উৎসবে উড়ে যায় মুঠো মুঠো টাকা। ফূর্তির এই বহর দেখলে কে বলবে সেনাদের বেতন মেটানোর কড়ি নেই নিজামতের তোশাখানায়। সদ্য ঢাকা থেকে ফিরেছে বকর আলি। নিয়ে এসেছে খুশখবর। নবাবজাদার পরিকল্পনা মতোই মওত হয়েছে আমিনা বেগম ও ঘসেটি বেগমের। সেই খুশিতে এবারের উৎসবের আয়োজন আরও জাঁকাল।

প্রতিবছরই মিরনের এই ঘুড়ি উৎসবের দাওয়াতে নিয়ে আসেন মিরকাজিম খাঁ। নবাবের সহোদর। মিরনের মতোই ওস্তাদ খেলোয়াড় হিসেবে নামডাক আছে তাঁর। চাচা-ভাইপোর ঘুড়ির লড়াই নিয়ে সকলের জোর উৎসাহ। আগে একবার মিরন কেটেছে মিরকাজিমের ঘুড়ি, একবার তিনি কেটেছেন মিরনের ঘুড়ি। এবারে চূড়ান্ত লড়াই। ওদিকে দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে। বজরা ও শালতিতে ভাসমান সকলের নজর আকাশের দিকে। প্যাঁচ লেগেছে দুই ঘুড়ির সুতোয়। শেষ পর্যন্ত মিরকাজিমের ঘুড়িটাই ভোকাট্টা হল। হেলে দুলে ভেসে যেতে লাগল বাতাসে। ঘুড়ি ধরার জন্য দৌড় শুরু হয়ে গেল শালতিগুলোর মধ্যে। বিজয়োল্লাসে মাতল মিরনের অনুচরেরা।

সন্ধে গড়িয়ে যাওয়ার পর নিজের ছাউনিতে ফিরে জমকালো পোশাকে সজ্জিত হয়ে মিরকাজিম এলেন মিরনের তাঁবুতে। বিশেষ দাওয়াত দিয়েছে নবাবজাদা। খানাপিনা হবে, গানবাজনা হবে, ঘুড়ির লড়াইয়ের কুদরতি, কেরামতি নিয়ে গুলজার, গুলতানি হবে। সেই সঙ্গে খুবসুরত জেনানাদের নিয়ে নরম বিছানায় ফূর্তি। বেশ ফুরফুরে মেজাজে মিরনের তাঁবুতে প্রবেশ করলেন মিরকাজিম।

ফরাসের উপরে কাত হয়ে আয়েশ করছিল মিরন। হাতে শরাবের পাত্র।

নবাবজাদাকে তসলিম জানালেন মিরকাজিম। দু'জনের মধ্যে চাচা-ভাতিজার রিস্তেদারি থাকলেও এটাই দরবারি সহবত। মিরন নবাবজাদা। হবু নবাব। একমাত্র নবাব ও নবাব বেগম ছাড়া তার সমুখে মাথা ঝোঁকাতে হয় সকলকেই।

'আলেকুম সালাম। আপনারই ইন্তেজার করছিলাম চাচাজি।' মিরন উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়।

এগিয়ে এসে আসন গ্রহণ করেন মিরকাজিম।

একজন দাখিলা এসে শরাবপূর্ণ পানপাত্র দিয়ে যায়। সঙ্গে রেকাবি বোঝাই ভাজা মাংস।

শরাবে গলা ভিজিয়ে খোশামুদে গলায় মিরকাজিম বলেন, 'হুজুর, আপনি এক নাজুক খিলাড়ি। ঘুড়ির লড়াইয়ে আপনার সঙ্গে টক্কর নেওয়া মুশকিল।'

এরই মধ্যে মিরনের নেশা বেশ জমাট হয়েছে। জড়ানো গলায় সে বলে, 'শুধু ঘুড়ির লড়াই কেন, মরজি হলে সাদেক আলি অনেক কিছু করতে পারে। ইনসানের নসিব, তালেনামার হিসেব-নিকেষ সব উলটে পালটে দিতে পারে।'

'বিলকুল পারেন হুজুর।' মোসাহেবি ঢঙে বলেন মিরকাজিম।

'টোপিওয়ালা ইংরেজদেরও বাংলা থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে সাদেক আলি।'

'বেশক পারেন। আপনি কামিল-ই-ইনসান। দিলওয়ার আদমি।'

'ইয়ে কি আপনার মন কি বাত?' প্রশ্ন করে মিরন।

'বেশক মন কি বাত। আপনাকে ঝুট বলব কেন হুজুর?'

'লেকিন অনেকে বলে সাদেক আলি খন্নাস। খতরনক এক খুনিয়ারা।'

'ইয়ে গলত বাত। দুশমনের চাপানো ঝুটা ফৈজত।'

খিলাল দিয়ে খুচিয়ে দাঁতে আটকে থাকা মাংসের কুচি থু করে ফেলে দিয়ে মিরন বলে, 'এই দুশমনেরা অনেকে মসনদের খোয়াব দেখে। ফির ইনকিলাব ঘটাতে চায়।'

পানপাত্রে চুমুক দিয়ে মিরকাজিম বলেন, 'এদের চাবকে সবক শেখাতে হয়।'

'উঁহু উঁহু। চাবুক নয়। সবক শেখানোর একটাই তরিকা জানে সাদেক আলি। ম-ও-ত।'

'ইয়ে সচমুচ আচ্ছা তরিকা। খরিশের বাচ্চাদের জিন্দা রাখতে নেই।'

'সহি সমঝবুঝ আপনার।' এই বলে মিরন জোরে একটা চাপড় মারে মিরকাজিমের হাঁটুতে হাঁটুতে। পানপাত্র থেকে ছলকে পড়ে পানীয়। তাঁবুর এক কোণায় রুপোর দাঁড়ে বসা মিরনের বাজপাখি চঞ্চল হয়ে ওঠে। গিরদা কোলের উপরে টেনে নিয়ে হঠাৎই মিরকাজিমের মুখপানে চেয়ে হেসে ওঠে মিরন।

মিরনের কথাবার্তার ধরন ও আচরণে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন মিরকাজিম।

হাসি থামিয়ে মিরন বলে, 'আপনার তকলিফ হল বোধ হয়।'

'না না তকলিফ কেন হবে?'

'হল না? হাতের শরাব ছলকে গেল।'

'ও ঠিক হ্যায়।' এই বলে বেওকুফের মতো হাসেন মিরকাজিম।

'দুশমনের কলিজা ফাড়লে খুন এভাবেই ছলকায়।' এই বলে বিশ্রি ভাবে হেসে ওঠে মিরন।

মিরকাজিমও হাসেন। লেকিন মনহুশ এক আন্দেশায় তাঁর কলিজা কেঁপে ওঠে। পাটনা অভিমুখে রওনা হয়েছেন শাহজাদা আলি গোহর। মিরকাজিম জানেন। অনেকদিন থেকেই শাহজাদার সঙ্গে তাঁর চিঠি চালাচালি চলছে। সম্প্রতি একটা চিঠিতে শাহজাদাকে তিনি লিখেছেন—

'...জাঁহাপনা আপনি মুর্শিদাবাদে এসে পড়লেই এই গোলাম ফৌজসহ আপনার সঙ্গে যোগ দেবে। সুবে বাংলায় আরও অনেকে আপনার সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য তৈয়ার হয়ে রয়েছে। আপনি নির্ভয়ে দ্রুত মুর্শিদাবাদে আসুন। নবাব মিরজাফর খাঁ বুজদিল আদমি। নবাবজাদা মিরন শয়তান, সঙ্গদিল। তামাম মুর্শিদাবাদবাসী ফির ইনকিলাব চায়। আপনি এসে মসনদ দখল করুন। স্রেফ এক গুজারেশ– কাজ হাসিল হলে এই বান্দাকে ইয়াদ রাখবেন।...'

শঙ্কার মেঘ জমাট বাঁধে মিরকাজিমের মনে। চারিদিকে ঘুরছে মিরনের গুপ্তচরেরা। তাঁর সঙ্গে শাহজাদার সম্পর্কের কথা কি জেনে ফেলেছে মিরন? যে কাসিদের হাত দিয়ে তিনি চিঠি পাঠিয়েছিলেন শাহজাদার কাছে, বেশ কিছুদিন হয়ে গেল তার কোনও খবর নেই।

মিরকাজিমের মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ ধরা পড়ে যায় মিরনের চোখে। সে হেসেই প্রশ্ন করে, 'লাগতা হ্যায় আপ কিসি চিজ সে ডরে হুয়ে হ্যায়।'

মুখে হাসি এনে সহজ হওয়ার চেষ্টা করেন মিরকাজিম। বলেন, 'এই বান্দা আপনার ওফাদার। আপনার গোলাম। আপনি হবু নবাব। আমার কি ভয়ের কিছু থাকতে পারে?'

মিরকাজিমকে চমকে দিয়ে সহসা তার পিঠে একটা জোরালো চাপড় মেরে মিরন বলে, 'আপনি এক নাজুক খিলাড়ি।'

'মতলব?' ঘাবড়ে গিয়ে প্রশ্ন করেন মিরকাজিম।

হেসে ওঠে মিরন। 'ফিরসে আপ ডরতে হ্যায়? আমি ঘুড়ি ওড়ানোর কৌশলের কথা বলছি।'

'হুজুর মেহেরবান।'

মিরন ঠোঁটের কোণে হাসি ঝুলিয়ে বলে, 'প্যাঁচ আপনিও কম জানেন না। এমন ওস্তাদ খিলাড়ির মোকাবিলা করতে পারলে মজাক হয়।'

'বহুত সুক্রিয়া।'

মিরকাজিমের মুখপানে চেয়ে এবারে শীতল কঠিন গলায় মিরন বলে, 'আপনি স্রেফ এক জবরদস্ত খিলাড়ি নন, খতরনক ভি।'

ভয়ানক হিংস্র হয়ে ওঠা মিরনের দুই চোখের দিকে তাকিয়ে মিরকাজিমের শিরদাঁড়া বেয়ে যেন ঠান্ডা রক্তস্রোত বয়ে যায়।

কাতর গলায় মিরকাজিম বলেন, 'কোনও গোস্তাকি হয়ে থাকলে মাফ করবেন হুজুর।'

সহসা সজোরে দুই হাতে তালি দেয় মিরন।

তাঁবুর কানাতের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে মিরনের অতি বিশ্বস্ত কয়েকজন অনুচর। প্রত্যেকের হাতেই ঝকঝক করছে উন্মুক্ত তরবারি।

বিপদ বুঝে চকিতে উঠে দাঁড়িয়ে কোমরবন্ধনী থেকে তরোয়াল বের করার কোশিস করেন মিরকাজিম। তার আগেই চারজন ঝাপিয়ে পড়ে তাঁর উপরে। একজন সজোরে তরবারি ঢুকিয়ে দেয় তাঁর পেটে। আর্তনাদ করারও ফুরসত পান না মিরকাজিম। নিথর দেহটা লুটিয়ে পড়ে ফরাসের উপরে। শাদা জমির উপরে ফুলেল নকশা তোলা সুজনি রক্তে লাল হয়ে ওঠে।

পৈশাচিক আনন্দে হেসে উঠে মিরন বলে, 'শালা খন্নাসের আওলাদ খালাস।'

ঘাতকেরা শির ঝুঁকিয়ে তসলিম জানায়।

মোহরে বোঝাই একটা খেরিয়া তাদের উদ্দেশে ছুড়ে দিয়ে মিরন বলে, 'তোদের ইনাম। ইবলিশের আওলাদ নবাব হওয়ার খোয়াব দেখছিল। ছুপিয়ে মদত দিচ্ছিল আলি গোহরকে। সাবুত মিলেছে। লাশটা নদীতে ভাসিয়ে দে।'

উঠে দাঁড়ায় মিরন। মাটিতে পড়ে থাকা মিরকাজিমের দেহে পদাঘাত করে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে তাঞ্জামে চড়ে বসে। কাহারদের উদ্দেশে বলে, 'জলদি চল।'

রাতের অন্ধকারে নবাবজাদাকে নিয়ে পালকিবাহকেরা ছুটে চলে হিরাঝিল প্যালেসের উদ্দেশে।

'...আমার বেটা আলি গোহর বাগি হয়েছে। আমাকে খতম করে দিল্লির তখতে বসতে চায়। সে নাফরমান। এই বেতমিজি আমি বরদাস্ত করব না। শুনলাম সে বাংলা মুলুকে যাচ্ছে। আপনি যদি তাকে মদত দেন তো আপনার বিরুদ্ধে গদ্দারির ইলজাম আনব। মোগল বাদশার রোষে মুসিবত হবে আপনার। তাই আপনার ভালোর জন্য বলছি, বাগি শাহজাদা বাংলা মুলুকে পৌঁছলেই তাকে কয়েদ করে তুরন্ত দিল্লিতে ওয়াপস পাঠাবেন।...'

চিঠিটা সদ্য এসে পৌঁছেছে মুর্শিদাবাদে। মোগল বাদশার চিঠি। পাঠিয়েছেন উজির ঘাজীউদ্দিন। তিনিই বাদশাকে চাপ দিয়ে লিখিয়েছেন এই চিঠি। খাস মুনশি পড়ে শোনাচ্ছিলেন। ভয়ে কেপে উঠলেন নবাব মিরজাফর খাঁ। দিল্লির বাদশার হুকুমে শাহজাদাকে বন্দি করতে হলে লড়াই অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু লড়াই করার মুরোদ কোথায় তাঁর? রামনারায়ণ লিখে যা পাঠিয়েছেন, তা রীতিমতো ভীতিকর। বিরাট বাহিনী নিয়ে পাটনার দিকে আসছেন শাহজাদা। ক্রমশ ভারী হচ্ছে তার দল। এরই মধ্যে বিহারের অনেক জমিদার শাহজাদার দলে যোগ দিয়ে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। অবিলম্বে পাটনায় ফৌজ পাঠানোর জন্য বার বার অনুরোধ করেছেন রামনারায়ণ। না হলে অচিরেই হয়তো হাতছাড়া হয়ে যাবে পাটনা। সেখানেই থামবেন না আলি গোহর। এগিয়ে আসবেন মুর্শিদাবাদের দিকে।

ফৌজ নিয়ে পাটনা অভিমুখে রওনা হওয়া মানে বিরাট খরচের ধাক্কা। টাকা কোথায়? কে মেটাবে খরচ? কার কাছে হাত পাতবেন নবাব? যিনি টাকা ধার দিতে পারতেন সেই জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ এখন রাজধানীতে নেই। কলকাতা থেকে ফিরেই সহোদর মহারাজ স্বরূপচাঁদকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছেন। গন্তব্য পরেশনাথ।

নবাবের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে তাতে চোখ বোলালেন মণি বেগম। তারপর চিঠিটা নবাবের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনি কোম্পানির মদত চেয়ে ক্লাইভ সাহেবকে চিঠি লিখুন।'

'ফের ইংরেজদের মদত চাইব মণি?' অসহায় গলায় প্রশ্নটা ছুড়ে দিলেন নবাব।

'এছাড়া আর উপায় কী?'

'আগে মিরনের সঙ্গে বাতচিত করে দেখি।'

'কী দেখবেন সরতাজ? আপনি এখনও তার উপরে ভরসা রাখেন?' বিরক্তি ফুটে ওঠে মণি বেগমের গলার আওয়াজে।

'সে ছাড়া এই আওকাতে আমার মদতদার আর কে আছে মণি?'

'তার কি সেই মুরোদ আছে যে ঘামাসান লড়াই করে শাহি ফৌজকে রুখতে পারবে?'

'নিজামতের অনেক ক্ষমতা এখন তার হাতে। তার মতামত নেওয়া জরুরি।'

'বেগমের গোস্তাকি মাফ করবেন। নিজের রুকসত যদি না চান তো ফওরান ক্লাইভ সাহেবকে সব লিখে জানান। এছাড়া অন্য পথ নেই। আপনিই বলেছেন বিরাট ফৌজ নিয়ে আসছেন শাহজাদা। কোম্পানি ছাড়া এই সুবে বাংলায় এখন কার হিম্মত আছে যে তাকে রুখবে?' কথাগুলো বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়েন মণি বেগম।

খুবই যুক্তিপূর্ণ কথা। তবুও নিশ্চুপ থাকেন নবাব। ইংরেজদের সাহায্য চাইতে সায় দিচ্ছে না মন। আজাদি চাইছেন নবাব। ফের ক্লাইভকে ডেকে আনার অর্থ ইংরেজদের হাতের মুঠোয় বন্দি হয়ে থাকা। তাছাড়া নবাব জানেন, এই সুযোগে ফের মোটা টাকা চেয়ে বসবে কোম্পানি। যুদ্ধ চালানোর যা খরচ, তার কয়েকগুন টাকা মেটাতে হবে ইংরেজদের। আপাতত তাদের মদত না চেয়ে এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার অন্য উপায় হাতড়ে বেড়াচ্ছেন নবাব।

নবাবকে চুপ করে থাকতে দেখে মণি বেগম মিনতির সুরে বলেন, 'আমাকে গলত সমঝবেন না সরতাজ। আর যাই হোক মণি বেগম আপনার বরবাদি চায় না। কোম্পানির ফৌজ আপনার মদতে এগিয়ে না এলে মসনদ খোয়াতে হবে আপনাকে। আপনি আকলমন্দ ইনসান। বহু লড়াইয়ের সিপাহ সালার। আপনি বুঝছেন না এ কথা?'

'মিরন যে ইংরেজদের পছন্দ করে না।'

মণি বেগম বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে ওঠেন, 'সে কি পারবে আপনাকে সালামত রাখতে? মিরন নালায়েক। স্রেফ কিছু বেনসিব আদমির উপর সে জবরজুলুম করতে পারে, তাদের খতম করতে পারে। লেকিন শাহজাদার ফৌজের মোকাবিলা করার মুরোদ তার আছে কি? কোনওদিন কোনও লড়াই কি সে লড়েছে? মিরন নাদান, বেওকুফ, বুজদিল। তার সঙ্গে কী পরামর্শ করবেন আপনি? তার মতামতের কী গুরুত্ব আছে?'

হাঁ করে মণি বেগমের মুখপানে চেয়ে থাকেন নবাব।

'এসব বাত বুরা লাগতে পারে আপনার লেকিন ইয়ে সচ।'

বেগম সাহেবার কথায় সম্মতি জানিয়ে মরিয়া গলায় বললেন, 'তুমি হয়তো ঠিকই বলছ মণি, লেকিন ইংরেজ কোম্পানি যে আমাকে তাদের গোলাম বানিয়ে রাখতে চায়।'

'ভুলে যাবেন না সরতাজ তারাই আপনাকে মসনদে বসিয়েছে। তাদের হাত ধরেই নসিব বদলেছে আপনার। মসনদের উপরে আপনার অধিকারকে সালামত রেখেছেন ক্লাইভ। তিনিই ভরসা। আজই আপনি

চিঠি লিখে ক্লাইভ সাহেবের মদত চান। এতে আপনার ভালো হবে।'

ফরসির নল মুখে দিয়ে নীরবে তামাক টানতে থাকেন মিরজাফর খাঁ।

'শুধু আপনার কথা নয়, নিজের কথাও ভাবছি আমি। ভাবছি আমার দুই পুত্র নজম ও সইফের কথা। আপনি সালামত থাকলে আমরাও সালামত থাকব। এখন আপনি যা ভালো মনে করবেন তাই করুন। আমার নসিবে যা আছে তাই হবে।' এই বলে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন মণি বেগম।

'মণি—'

কাঁদতে কাঁদতে মণি বেগম ছুটে চলে যান অন্দরমহলে।

খাস দরবারে একাকী বসে রইলেন নবাব। মানসিক উত্তেজনা আজকাল আর সহ্য হয় না তাঁর। ক্লান্তিতে বুজে আসছে চোখদুটো। কখনও মনে হয় অর্থহীন এই মসনদ, অর্থহীন এই রওনক, নবাবিয়ানার জোশ, রওশন। ফকির দরবেশের মতো নিশ্চিন্তে দিন গুজরান করতে পারলে বোধ হয় ভালো হত। সব কিছু ছেড়ে খোদার পথের রাহী হয়েছেন যাঁরা, তাঁরাই সুখী এই দুনিয়ায়। আবার পরক্ষণেই নবাব ভাবেন, অনাবিল পার্থিব সুখের আস্বাদ, ভোগের ক্ষমতা অর্জনই হল আসল। এসব থেকে বঞ্চিত হয়ে মামুলি এক ইনসানের মতো দিন গুজরান অর্থহীন।

নাঃ! মসনদ ছাড়া তিনি বাঁচতে পারবেন না। যে ভাবেই হোক রুখতে হবে শাহজাদাকে। তিনি মসনদও চান আবার ইংরেজদের গড়া পিঁজরা ভেঙে আজাদ চিড়িয়ার মতো আকাশে উড়তেও চান। মনের এই দুই ইরাদাকে কিছুতেই মেলাতে পারেন না নবাব। কী করে আলি গোহরের মোকাবিলা করবেন তিনি? তাগদ কোথায় তাঁর? মণি বেগমের যুক্তিকে উড়িয়ে দিতে পারছেন না মন থেকে। তাহলে এই ওয়াক্তে উপায় কী? ক্লাইভ সাহেবকে ইয়াদ করা? ফের ইংরেজদের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়া? দুমুখী ভাবনার টানাপোড়েনে জেরবার হয়ে পড়েন নবাব।

সহসা ঝড়ের বেগে মিরন এসে প্রবেশ করে খাস-দরবারে।

'তলব করেছিলেন আব্বাহুজুর?' শরাবের নেশায় পা টলছে মিরনের।

'এসেছ বেটা? তোমারই ইন্তেজার করছিলাম। শুনেছ নিশ্চয়ই আলি গোহর বিরাট ফৌজ নিয়ে পাটনার দিকে আসছেন।'

'শুনেছি। আমি জানি নিজামতের অন্দরে অনেকেই তার মদতদার। আপনি পরেশান হবেন না আব্বাহুজুর। নিজামতের কাসিদরা সব শয়তানকে খুঁজে বের করবে। সব শারারতি আমি ঘুচিয়ে দেব। আপনি শুনলে হয়তো খুশি হবেন যে ইতিমধ্যেই এক গদ্দারকে সবক শিখিয়ে দিয়েছি।'

'কে গদ্দার?' কৌতূহলী হয়ে ওঠেন নবাব।

'চাচাজি। মিরকাজিম খাঁ। চিঠিটা পড়ে দেখুন।'

মিরনের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরেন মিরজাফর। বিস্ফারিত হয়ে ওঠে নবাবের দুই চোখ। নবাব শুধোলেন, এ চিঠি কী করে হাতে এল তোমার?

মিরন বলে, 'চাচাজির এক কাসিদ কে ঘায়েল করে এই চিঠি নিয়ে এসেছিল অঙ্গন সিং।'

'বাহাদুর আদমি। আমার তরফ থেকে শ-আসরফি ইনাম দিও ওকে।'

'অঙ্গন সিং-এর মওত হয়েছে। আন্দাজ মিরকাজিমের ওফাদারেরাই খুন করেছে তাকে।'

মিরজাফর প্রবল আক্রোশে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'বেইমান। মিরকাজিমের গর্দান নেব আমি।'

'শান্ত হোন আব্বাহুজুর। ও কাজ আমি হাসিল করে এলাম।'

'মিরকাজিম খতম?'

'বেতমিজের লাশ এখন নদীতে ভাসছে।'

‘সাবাশ বেটা।’ পৈশাচিক উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠেন নবাব। জিঘাংসা মূর্ত হয়ে ওঠে তাঁর প্রতিক্রিয়ায়। পরক্ষণেই অবশ্য আশু বিপদের কথা ভেবে বদলে যায় নবাবের অভিব্যক্তি। চিন্তার ছাপ ধরা পড়ে মুখে। নবাব বললেন, ‘পাটনায় ফৌজ পাঠানো দরকার। হাতে কড়ি নেই। কী করব তুমি বল বেটা?’

‘লড়াইয়ের জরুরত নেই।’

‘কী বলছ তুমি বেটা?’ মিরনের কথায় বিস্মিত হলেন নবাব।

‘সওগাতে বশ করব শাহজাদাকে। সুবে বাংলার মসনদ নয়, শাহজাদা চান দিল্লির তখত। আমার আন্দাজ মোটা নজরানা পেলে তিনি খুশি হয়ে ফিরে যাবেন।’

কথাটা মনে ধরল মিরজাফরের। তিনি যেন আশার আলো দেখতে পেলেন। কিন্তু ফের হতাশ হয়ে পড়লেন। শাহজাদার নজরানা মানে মোটা টাকার ব্যাপার। কোথায় টাকা?

‘শাহজাদার নজরানা মেটানোর কড়ি কোথায় পাব বেটা?’

‘জগৎশেঠজি জোগাবেন।’ মিরন জবাব দেয়।

‘তিনি রাজধানীতে নেই। পরেশনাথের পথে রওনা হয়েছেন।’

‘ফওরান ওয়াপস আসার জন্য চিঠি পাঠিয়ে দিন।’

‘কালই পাঠিয়ে দেব চিঠি। বেশক।’ খুশি ঝলকায় মিরজাফরের মুখে।

‘আমি আসি আব্বাহুজুর।’

‘এসো বেটা।’

দরজার মুখে গিয়ে ঘুরে তাকিয়ে মিরন বলে, ‘শেঠজি যদি টাকা দিতে ইনকার করেন তো এই খন্নাসি বরদাস্ত করব না আমি। শেঠজির কোঠি লুঠ করে তাঁকেও খতম করব।’

শিউরে ওঠেন মিরজাফর খাঁ। ‘অ্যায়সা মাত শোচো বেটা।’

নবাবের প্রতিক্রিয়াকে উপেক্ষা করে ঘর থেকে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হয় মিরন।

৬৭

প্রতিদিন সকালে বেশ কয়েক মাইল ঘোড়া দাবড়ে শরীরটাকে ধাতে রাখেন ওয়ারেন হেস্টিংস। কাকভোরে ঘুম থেকে উঠে বেরিয়ে পড়েন। ঘাম ঝরিয়ে ফিরে আসেন সকাল সাতটার মধ্যে। তারপর বাংলোর বাগানে চবুতরার নীচে এসে বসেন। ওখানেই কফি ও ব্রেকফাস্ট দিয়ে যায় আর্দালি। ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে মেরি মেমসাহেব এসে যোগ দেন ব্রেকফাস্টের টেবিলে।

এই সময়টুকু খুবই উপভোগ করেন মেরি। এরপরে সারাদিনে ওয়ারেনের টিকিটিরও দেখা মেলে না। রেসিডেন্ট সাহেবের হরেক ব্যস্ততা। অনেক দায়দায়িত্ব। কোনও কোনও দিন কাজ সেরে ঘরে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায়।

মাস তিনেক হতে চলল, প্রথম কন্যা সন্তানের অকালমৃত্যুর পর মেরি ফের গর্ভবতী হয়েছেন। শরীরটা বিশেষ ভালো নেই। রক্তচাপ বেড়েছে। কয়েকদিন অন্তর অন্তর তাকে দেখে যান কাশিমবাজার কুঠির সাহেব ডাক্তার। মাঝে মাঝে স্থানীয় এক কবিরাজকে নিয়ে আসেন কৃষ্ণকান্ত নন্দী। এদেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির উপরে ওয়ারেন ও মেরি দু’জনেরই বিশেষ আস্থা রয়েছে।

মেরিকে চিন্তামুক্ত থাকতে বলেছেন সাহেব ডাক্তার ও কবিরাজমশায়। স্ত্রীর শারীরিক অবস্থা নিয়ে বেশ উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছেন ওয়ারেন হেস্টিংস। অবশ্য বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক উত্তাপ নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তাও কম নয়। পাটনা কুঠির প্রধান অ্যামিয়ট সাহেবের কাছ থেকে ঘন ঘন তাগাদা আসছে, ‘... বিরাট ফৌজ নিয়ে

এগোচ্ছেন আলি গোহর। মুর্শিদাবাদে বসে কী করছেন আপনি? অবিলম্বে নবাবকে বলে বড়সড় ফৌজ পাঠানোর বন্দোবস্ত করুন। আমরা কি সব পাটনার কুঠি আগলাতে গিয়ে পোকামাকড়ের মতো মরব? ফৌজ না এলে কুঠি ফেলে রেখে পালাতে হবে আমাদের।...'

পাটনায় ফৌজ পাঠানোর জন্য বার বার নবাবের কাছে গিয়ে তদ্বির করছেন হেস্টিংস। কিন্তু নবাব ঠিক কী যে চাইছেন তা তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। এখনও নবাবের দিক থেকে পাটনায় সেনা পাঠানোর কোনও উদ্যোগ আয়োজন নেই। ইদানীং তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে কোনও সদর্থক আলোচনা করাও দুষ্কর হয়ে পড়েছে। দিনরাত হয় তিনি নেশায় বুঁদ হয়ে থাকছেন নয়তো হারেমের অন্দরে জেনানাদের নিয়ে ফূর্তি করছেন। এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে নবাবের উদাসীনতা দেখে তাজ্জব বনে যাচ্ছেন হেস্টিংস। চিঠি লিখে ক্লাইভ সাহেবকে জানিয়েছেন সব কথা। কিন্তু কলকাতা থেকে এখনও কোনও জবাব আসেনি।

দরবার রাজনীতির অনেক বিষয় নিয়েই স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর খোলাখুলি আলোচনা হয়। কোন বিষয়ে কী করা উচিত এ নিয়ে মেরির মতামতও শোনেন মন দিয়ে। কিন্তু তিনি বিচলিত হয়ে পড়বেন ভেবে মোগল শাহজাদার বাংলায় আসার খবরটা তাঁর কাছে গোপন রেখেছেন ওয়ারেন। ১৭৫৬ সালের কলকাতা যুদ্ধে বেসাহারা হয়ে পড়ার স্মৃতি হেস্টিংস দম্পতিকে এখনও দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করে বেড়ায়। শাহজাদাকে ঠেকানোর হিম্মত রামনারায়ণের নেই। পাটনা জয় করে শাহজাদা মুর্শিদাবাদের দিকে এগিয়ে এলে কী হবে? এমন শক্তিশালী প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করার ক্ষমতা নবাবেরও যে নেই, হেস্টিংস তা ভালো করেই জানেন। বিপর্যয়ের আশঙ্কায় তিনি ভুগছেন। ফের কি সুবে বাংলার এই অস্থির রাজনীতির আগুনে ঘর পুড়বে তাঁর?

ডাচদের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা টানাপোড়েন চলছে। শোনা যাচ্ছে ডাচ নৌবহর হানা দিতে পারে কলকাতায়। ক্লাইভ সাহেবের অধীনস্থ বেশির ভাগ ফৌজিই এখন দক্ষিণে ফরাসিদের সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যস্ত। এরই মধ্যে শাহজাদার আগমন। ক্লাইভ একা কতদিক সামলাবেন? এসব ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন হেস্টিংস।

'কী হয়েছে ওয়ারেন?' শুধোলেন মেরি।

দু'জনে মুখোমুখি বসে আছেন বসেছেন বাংলোর বাগানে চবুতরার নীচে ব্রেকফাস্ট টেবিলে।

হাতে ধরে রাখা কফির কাপে চুমুক দিয়ে মুচকি হেসে হেস্টিংস জবাব দেন, 'কিছু না।'

'কী ভাবছ এত? তোমাকে খুব পারটার্বড বলে মনে হচ্ছে।'

'কিছু না।' মুচকি হেসে জবাব দেন ওয়ারেন।

'উঁহু। ইউ আর হাইডিং সামথিং ফ্রম মি।'

'অহেতুক ভেবো না ডার্লিং। অ্যাংজাইটি ইজ হার্মফুল ফর ইউ।'

'এনি নিউ ট্রাবল অ্যাট দরবার?'

'আরে না না ওসব নয়।'

'তাহলে কী ভাবছ এত?'

'আমি ভাবছিলাম তার কথা, যে আসছে।'

মুচকি হেসে কফির কাপে চুমুক দিলেন মেরি।

'তোমাকে একদিন হিরাঝিল প্যালেসে নিয়ে যাব ডার্লিং। বেগম সাহেবা দাওয়াত দিয়েছেন।'

'আমাকে? বেগম সাহেবা?' মেরি অবাক হওয়া গলায় প্রশ্ন করেন।

'ইয়েস। মণি বেগম।'

'আই হ্যাভ হার্ড শি ইজ অ্যা ভেরি চার্মিং লেডি।'

'ইন আর্লি লাইফ, শি ওয়াজ অ্যা ''নচ'' গার্ল। বাইজি ছিলেন।'

ফিক করে দুষ্টুমির হাসি হেসে ফেললেন মেরি। দুগালে টোল পড়ল। খুনসুটি করে হেস্টিংসের গালে বাহাতের তর্জনী দিয়ে ঠোনা মেরে বললেন, 'তুমি বোধহয় বেগম সাহেবার কথা ভাবছিলে।'

হঠাৎই কাহারদের মুখের 'হুনহুনা হুনহুনা' শব্দ শুনে সচকিত হয়ে উঠলেন হেস্টিংস দম্পতি।

সদর দেউড়ি পেরিয়ে হেস্টিংসের বাংলোর অন্দরে এসে ঢুকল একটা পালকি। পালকির সমুখে দণ্ডধারীর হাতে ধরে রাখা দণ্ডের মাথায় উড়ছে নিজামতের নিশান।

হেস্টিংস কুরসি ছেড়ে উঠে ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন।

পালকির অন্দর থেকে বেরিয়ে এলেন উমিদ রায়।

হেস্টিংস উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, 'ওয়েলকাম দেওয়ানজি। হোয়াট অ্যা সারপ্রাইজ।'

'একটা জরুরি কাজে হঠাৎই আসতে হল সাহেব।'

'ইটস ওকে। উই আর অনারড।'

মেরি এসে দাঁড়িয়েছেন ওয়ারেনের পাশে। উমিদ রায় মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন, 'সেলাম ম্যাডাম।'

'সেলাম দেওয়ানজি।'

রুপোর একটা বাক্সের ডালা খুলে মেরির দিকে এগিয়ে দিয়ে উমিদ রায় বললেন, 'নবাব বেগম সওগাত পাঠিয়েছেন। আপনার জন্য।'

বাক্সের অন্দরে তাকিয়ে চোখ ঝলসে গেল মেরির। উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বললেন, 'হোয়াট অ্যা বিউটিফুল নেকলেস। বেগম সাহেবাকে আমার তরফ থেকে সুক্রিয়া জানাবেন।'

'জি ম্যাডাম।'

মেরি চলে গেলেন বাংলোর অন্দরে।

বাংলো লাগোয়া অফিস ঘরে ঢুকে নিজের কুরসিতে বসলেন হেস্টিংস। সামনে মস্ত সেক্রেটারিয়েট টেবিল। উমিদ রায় বসলেন টেবিলের উলটোদিকে। কোমরবন্ধনী থেকে গোটানো একটা কাগজ বের করে দেওয়ানজি বললেন, 'মণি বেগম পাঠিয়েছেন। তারই হুকুমে এই চিঠি নিয়ে আসতে হল আমাকে। পড়ে দেখুন।'

দেওয়ানের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরলেন ওয়ারেন হেস্টিংস।

'...আমার সেলাম নেবেন। আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন যে মোগল শাহজাদা পাটনার দিকে আসছেন। গতকাল কাসিদ খবর এনেছে উনি এলাহাবাদ থেকে রওনা দিয়ে বেনারসে ছাউনি ফেলেছেন। পাটনা খুব দূরে নয়। কাজেই বুঝতে পারছেন হাতে সময় খুবই কম।

'নবাবের তরফ থেকে লড়াইয়ের কোনও আনজাম নেই। তাঁর মনসুবা হল সওগাতে বশ করবেন শাহজাদাকে। মোটা নজরানা পেলে শাহজাদা বাংলা ছেড়ে চলে যাবেন। বেওকুফ নবাবজাদা এমনই বুঝিয়েছে নবাবকে। আমার মনে হয় এই তরিকা খুবই খতরনক। তামাম হিন্দুস্তান বুঝবে নবাব বুজদিল। তখন অযোধ্যার নবাব, মারাঠা, আফগান, পাঠান সকলে একে একে হাজির হবে বাংলায়। তখন কতজনকে নজরানা দেবেন নবাব? টাকা কোথায় তাঁর?

'তাছাড়া নজরানা দিলেই যে শাহজাদা ফিরে যাবেন হলফ করে কে বলতে পারে? নবাবের বিচার-বুদ্ধি নাশ হয়েছে। এই ওয়াক্তে কোম্পানি ও ক্লাইভ সাহেবই ভরসা। আমি চাই নবাব সালামত থাকুন। সালামত থাকুক কোম্পানি। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি সব কথা জানিয়ে তুরন্ত চিঠি পাঠান কলকাতায়। ক্লাইভ সাহেব যেন ফৌজ নিয়ে ফওরান পাটনার উদ্দেশে রওনা হন। না হলে নবাবের পক্ষে মসনদ ধরে রাখা মুশকিল হয়ে পড়তে পারে। আপনারা কি মনে করেন না যে এতে আপনাদেরও তকলিফ বাড়বে।...'

হেস্টিংসের মুখ গম্ভীর। চিঠিটা গুটিয়ে রাখলেন।

উমিদ রায় শুধোলেন, 'কী বুঝলেন সাহেব?'

হেস্টিংস বললেন, 'শি ইজ ইনটেলিজেন্ট। রাইটলি অ্যাসেসড দ্য সিচুয়েশন।'

'সহি বাত বলেছেন আপনি। আমিও তাই মনে করি।' বললেন উমিদ রায়।

'কিন্তু নবাব যে সওগাত দিয়ে শাহজাদাকে ওয়াপস পাঠাতে চাইছেন, এত টাকা কি তার হাতে আছে?' প্রশ্ন করেন হেস্টিংস।

'নেই। নবাব ভাবছেন জগৎশেঠজি টাকা দেবেন।'

'তাঁকে এই ওয়াক্তে পাবেন কোথায় নবাব? তিনি তো এখন রাজধানীতেই নেই।'

'চিঠি পাঠিয়েছেন নবাব। তুরন্ত ওয়াপস আসার জন্য লিখেছেন শেঠজিকে।'

'আপনার কি মনে হয় শেঠজি টাকা দেবেন?'

'শেঠজি চতুর ইনসান। এই কাজিয়ায় নিজেকে জড়াবেন বলে মনে হয় না।'

সবেগে মাথা নেড়ে হেস্টিংস বললেন, 'রাইট। আমি এই কয়েক বছরে জগৎশেঠজিকে যতটা চিনেছি, তাতে আমিও তাই মনে করি।'

'আপনি কী ভাবছেন সাহেব? এখন কী করা উচিত?'

'আমার মনে হয় লড়াই করাই একমাত্র পথ। বেগম সাহেবা ঠিকই বুঝেছেন। আমি আগেই একটা চিঠি পাঠিয়েছি কলকাতায়। তার জবাব আসেনি। ক্লাইভ সাহেব কী ভাবছেন জানি না।'

'ফিরে গিয়ে কী বলব নবাব-বেগমকে?'

'বেগম সাহেবার চিঠি আমি আজই পাঠিয়ে দেব কলকাতায়। সেই সঙ্গে আমিও ফের না হয় একটা চিঠি লিখে দেব ক্লাইভ সাহেবকে। দেখা যাক, তারপরে কী হয়?'

'বহুত বহুত সুক্রিয়া।' এই বলে উমিদ রায় কুরসি ছেড়ে উঠে পড়লেন।

জৈন ধর্মাবলম্বীরা বলে সম্মেদ সিখর বা সমাধি শিখর। তাঁরা বিশ্বাস করে সুবে বাংলার এই সুউচ্চ পাহাড়ে চব্বিশজন তীর্থঙ্করের মধ্যে কুড়ি জন সমাধির মাধ্যমে মোক্ষলাভ করেছিলেন। জৈনদের তেইশতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের নাম থেকে এই পাহাড়ের নাম হয়েছে পরেশনাথ।—জৈন ধর্মাবলম্বীদের কাছে অতি পবিত্র একটি তীর্থস্থান।

সারি সারি তাঁবু পড়েছে পরেশনাথ পাহাড়ের পাদদেশে। পরিবার ও আত্মীয়বর্গসহ তীর্থে এসেছেন জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ ও তার সহোদর মহারাজ স্বরূপচাঁদ। তাঁদের সঙ্গে রয়েছে হাজার দুয়েক সেপাই ও হাজিরা-দাখিলা, গোলাম, বাঁদি, মুটে মজুর, বাজনদারের দলসহ বিশাল বাহিনী। আপাতত এই দেবভূমিতে, সবুজে ঘেরা পাহাড়ের কোলে বেশ কিছু দিন কাটানোর পরিকল্পনা নিয়ে এসেছেন শেঠজি। বড় অশান্ত হয়ে রয়েছে তাঁর মন। মনের ইলাজ চান শেঠজি। কোনও কিছুই মনমতো হচ্ছে না। চারপাশে সব কিছু যেন দ্রুত বদলে যাচ্ছে।

শেঠজি আজ যেন নতুন করে অনুভব করছেন, যতদিন সুবে বাংলার নবাব প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন ততদিন কোনও ভাবনা ছিল না। শেঠদের চমকপ্রদ উত্থানের নেপথ্যে রয়েছে মুর্শিদকুলি ও আলিবর্দি খাঁর মতো দোর্দণ্ডপ্রতাপ নবাবের স্নেহাশিস। তামাম বাংলার জমিদারের খাজনা জমা হয় জগৎশেঠের গদিতে। এই ব্যবস্থা চালু করেছিলেন আলিবর্দি খাঁ। খাজনার টাকা সুদের কারবারে বিনিয়োগ করে জগৎশেঠের বিত্ত অর্জন। সেই সঙ্গে জগৎশেঠ পেয়েছিলেন মুদ্রা ছাপানোর একচেটিয়া অধিকার। রৌপ্যখণ্ড জগৎশেঠের টাঁকশালে জমা দিয়ে, বা দক্ষিণে নিজেদের টাঁকশাল থেকে ছাপিয়ে আনা আর্কট মুদ্রা জগৎশেঠের কুঠি থেকে সিক্কা টাকায় রূপান্তরিত করতে এতদিন বাংলায় কারবার চালাত ইংরেজ কোম্পানি। আর্কট মুদ্রা সিক্কা মুদ্রায় রূপান্তরিত করে বাটা বাবদ প্রচুর লাভ হত জগৎশেঠের।

কিন্তু পলাশির পর থেকে পরিস্থিতিটা বদলে গিয়েছে। সুবে বাংলার খাজনা আদায় ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ ঘটেছে ইংরেজদের। সম্প্রতি কোম্পানির বকেয়া পাওনা টাকা মেটাতে না পেরে বর্ধমান, হুগলি ও নদীয়ার খাজনা ইংরেজদের নামে লিখে দিয়েছিলেন নবাব। সে টাকা মুর্শিদাবাদে জমা না হয়ে সরাসরি জমা পড়েছে কলকাতায়। এতে মহাতপচাঁদের বহুত লোকশান হয়েছে। এতদিন সুবে বাংলায় ইংরেজদের নিজস্ব কোনও টাঁকশাল ছিল না। মহাতপচাঁদের আপত্তি সত্ত্বেও কলকাতায় টাঁকশাল স্থাপনের অনুমতি দিয়েছেন নবাব মিরজাফর খাঁ। ইংরেজরা এখন কলকাতায় বসেই সিক্কা মুদ্রা ছাপিয়ে নিচ্ছে। এও তো জগৎশেঠের বিরাট লোকসান।

মহাতপচাঁদ ভেবেছিলেন পলাশির ইনকিলাবের পর নবাব মিরজাফর খাঁকে হাতের মুঠোয় রেখে খুশি মতো নিজের কারবারের আরও বিস্তার ঘটাবেন। যা ভবেছিলেন, তা হয়নি। বরং দিনে দিনে প্রবল প্রতাপশালী হয়ে উঠছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। নবাব এখন তাদের হাতের পুতুল। আগামী দিনে কী আছে নসিবে তা নিয়ে খুবই চিন্তিত মহাতপচাঁদ। তিনি ছিলেন সিরাজকে মসনদ থেকে সরানোর ষড়যন্ত্রের অন্যতম মূল কারিগর। তিনি না চাইলে ইনকিলাব হত না। কিন্তু ইংরেজদের মদতে সিরাজকে সরানোর পদক্ষেপ কি সঠিক ছিল? এতে তার মুনাফা হল কোথায়? মস্ত ভুল হয়ে গেল কি রাজনীতির চালে? এসব প্রশ্ন ইদানীং তোলপাড় করে মহাতপচাঁদের অন্তরকে। দেবভূমিতে এসেও শান্তি নেই। ঈশ্বরচিন্তায় মনকে সংহত করতে পারছেন না শেঠজি।

অপেক্ষারত ডুলিবাহকেরা। প্রস্তুত হয়ে আছে কাঠের কাঠামোর উপরে নকশাদার হাতির দাঁতের পাতে মোড়া দুটি বাহারি ডুলি। দাঁড়িয়ে আছে গাদা বন্দুকধারী একদল সেপাই। এরা মহাতপচাঁদের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী। জঙ্গলে ঘেরা পাকদণ্ডী পথে রয়েছে বুনো জন্তুর ভয়। শেঠজি যাবেন পাহাড়চুড়োয় দেবভূমিতে। সামনে উচ্চৈঃস্বরে বাজনা বাজাতে বাজাতে এগোবে বাদ্যকরেরা। যাতে শব্দের ত্রাসে বুনো জন্তুরা তফাতে যায়। ডুলির সামনে ও পিছনে থাকবে হাতিয়ারবন্ধ সেপাই, গোলাম ও দাখিলারা।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন মহাতপচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ। দূরের পাহাড় টপকে একদল ঘোড়সওয়ার দ্রুত এগিয়ে আসছে। দূরবিনে চোখ রেখে মহাতপচাঁদ দেখলেন একেবারে সামনে একজন ঘোড়সওয়ারের হাতে ধরা দণ্ডের মাথায় উড়ছে নিজামতের পতাকা। মহাতপচাঁদের হাত থেকে দূরবিনটা নিয়ে তাতে চোখ লাগিয়ে ভালো করে ঠাহর করে স্বরূপচাঁদ বললেন, 'গোবিন্দমল্ল ও তার দলবল।'

'গোবিন্দমল্ল? চরাধিপতি?'

'হুঁ।'

'হঠাৎ আগমনের হেতু?'

চিন্তিত হয়ে পড়লেন জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ।

দমদমার বাড়িতে নিজের অফিস চেম্বারের ভিতরে উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করছিলেন ক্লাইভ। ঠোঁটে গোঁজা জ্বলন্ত পাইপ। ঘরের এক কোণায় দাঁড়িয়ে নব মুনশি পড়ে শোনাচ্ছিলেন হেস্টিংসের পাঠানো মণি বেগমের চিঠিটা।

চিঠি পড়া শেষ হতেই দু'আঙুলের ফাঁকে পাইপটা গুঁজে উত্তেজিত গলায় ক্লাইভ বললেন, 'নবাব যা ভাবছেন, সেটা ডেঞ্জারাস ফর হিম। ফর আস অলসো। সহি সমঝবুঝ বেগম সাহেবার। তোমার কী মনে হয় মুনশি?'

‘স্রেফ সওগাত দিয়ে শাহজাদাকে রোখা যাবে? এই মুহূর্তে দিল্লির উজিরের যা দাপট তাতে তাঁর মদত ছাড়া কারও পক্ষে তখতে বসে সম্ভব নয়।’

ক্লাইভ পায়চারি করে চলেছেন। একটু থেমে নবকৃষ্ণ ফের বললেন, ‘কাজেই দিল্লির তখত শাহজাদার কাছে বহুত দূরের চিজ। আসমানের চাঁদের মতো। আমার কি মনে হয় জানেন হুজুর, বাংলা মুলুকে এসে নবাবকে হটিয়ে শাহজাদা নিজেই না মসনদে বসে পড়েন।’

‘রাইট। এতে তকলিফ বাড়বে আমাদের। দুশমনেরা একজোট হয়ে শাহজাদার দিকে ঝুঁকবে।’

নবকৃষ্ণ বলেন, ‘লড়াই ছাড়া কোনও উপায় নেই হুজুর। ওদিকে আবার আপনাকে চোখে না দেখলে পাটনা যাওয়ার সাহসই হবে না নবাবের। ফওরান আপনার বেরিয়ে পড়া উচিত।’

ক্লাইভের চোখ দুটো হঠাৎ যেন দপ করে জ্বলে উঠল। এর নাম জোশ। এতকাল ক্লাইভের সঙ্গে কাটিয়ে তাঁর চোখের ভাষা বিলক্ষণ নবকৃষ্ণ বোঝেন। মুনশিজি বরাবরই দেখে আসছেন লড়াইয়ের নামে তাঁর খুনজোশি উপচে পড়ে হুজুরের শরীরের ভাষায়।

ক্লাইভ পায়চারি করতে করতে বললেন, ‘ইট ইজ অ্যা গোল্ডেন অপারচুনিটি মুনশি।’

‘অপারচুনিটি?’ নবকৃষ্ণ বিস্মিত। এই দুর্যোগকে জবরদস্ত মওকা বলছেন সাহেব?

‘ইয়েস। যদি মোগল শাহজাদাকে বাংলা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করতে পারি তো এ কথা ছড়িয়ে পড়বে তামাম হিন্দুস্তানে। উই উইল বি বেনিফিটেড। এদেশের বাদশা-নবাব-রাজারা কোম্পানির তাগদকে ভয় পাবে।’

উৎসাহের সঙ্গে নবকৃষ্ণ বলেন, ‘সহি বাত হুজুর। আপনি তো নিজেই বলেন, জুত করে ভয় দেখিয়ে দিতে পারলে অর্ধেক কাজ হাসিল হয়ে যায়।’

পায়চারি থামিয়ে ক্লাইভ বললেন, ‘এসো মুনশি। একটা চিঠির মুসাবিদা করতে হবে।’

ক্লাইভ এসে বললেন তাঁর কুরসিতে। জ্বলজ্বল করছে চোখদুটো।

সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উলটো দিকে কাগজ-কলম নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসলেন নবকৃষ্ণ।

নবাবের উদ্দেশে ক্লাইভ লিখলেন, ‘...শুনলাম আপনি সওগাত দিয়ে শাহজাদাকে রুখতে চাইছেন। মনে রাখবেন, ইট ইজ অ্যা ডেঞ্জারাস প্ল্যান। এই পথ থেকে সরে না আসলে খুব বেশিদিন আর নবাবি করতে হবে না আপনাকে। শেষে হয়তো দেখবেন, আপনাকে হটিয়ে শাহজাদাই মসনদের মালিক হয়ে গিয়েছেন। সওগাত পেলেই যে উনি ফিরে যাবেন, এমন একিন কী করে হল আপনার? আমি চাই আপনি সহি সালামত থাকুন। সহি সালামত থাকুক আপনার মসনদ। কালই আমি ফৌজ নিয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে রওনা হচ্ছি। আপনি আপনার ফৌজ তৈয়ার রাখুন। দ্রুত পাটনার দিকে রওনা হতে হবে আমাদের। লড়াই করেই রুখতে হবে শাহজাদাকে। অন্য কোনও উপায়ের কথা আপনি এই ওয়াক্তে মাথায়ও আনবেন না।...’

সেদিনই ক্লাইভের চিঠি নিয়ে দ্রুতগামী নৌকোয় চড়ে মুর্শিদাবাদের দিকে রওনা হয়ে গেলেন উইলিয়াম ওয়াটস। তাঁর উপরে ক্লাইভের নির্দেশ, ওয়ারেন হেস্টিংসকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে হিরাঝিল প্যালেসে। চিঠিটা নবাবের হাতে ধরিয়ে একটু ধমক-ধামক দিয়ে তাঁকে ধাতে রাখা চাই। তিনি যেন ত্রস্ত হয়ে শাহজাদার কাছে আগাম সন্ধিপ্রস্তাব পাঠিয়ে না দেন।

পাটনা থেকে পাঠানো অ্যামিয়টের চিঠিতে শাহজাদার আগমন সংবাদ আগেই পেয়েছিলেন ক্লাইভ। যুদ্ধই যে একমাত্র পথ তা তিনি আগাম ভেবেও রেখেছিলেন। নবাব নিজের অসহায়তার কথা জানিয়ে তাঁকে চিঠি লিখবেন, এজন্য তিনি অপেক্ষা করছিলেন। সে ক্ষেত্রে দর কষাকষি করে সেনাবাহিনীর খরচ বাবদ মোটা টাকা নবাবের কাছ থেকে আদায় করে নেওয়া সহজ হত।

কিন্তু নবাব যে ইংরেজদের সাহায্য না চেয়ে এবারে অন্য উপায় হাতড়াবেন তা আন্দাজ করতে পারেননি ক্লাইভ। তিনি বুঝতে পারছেন, তাঁর হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে আজাদ হতে চাইছেন মিরজাফর খাঁ। কিন্তু

যে পথ তিনি গ্রহণ করতে চাইছেন, তাতে তাঁর মুসিবত অনিবার্য। নবাবের মুসিবত হলে তকলিফ বাড়বে ইংরেজদের। আলি গোহর তো আর ইংরেজদের হুকুম-ইরাদার গোলাম হবেন না, কাজেই তাঁকে অদৃশ্য সুতোয় পুতুলের মতো নাচানো যাবে না।

অতএব চুলোয় যাক টাকাকড়ির হিসেবনিকেশ। আপাতত পলাশি থেকে প্রাপ্ত সুবিধে যাতে ইংরেজদের হাতছাড়া না হয়ে যায় সেটা নিশ্চিত করা দরকার। তাই আর নবাবের অনুরোধের অপেক্ষা না করে একতরফা ভাবে ফৌজ নিয়ে মুর্শিদাবাদ রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন ক্লাইভ। চাপে রেখে নবাবকে খেলানোর সময় এখন নেই। আলি গোহর বেনারস পার হয়ে এগোচ্ছেন। হাতে সময় সত্যিই খুব কম।

পরের দিনই ফৌজসহ মুর্শিদাবাদের দিকে মার্চ শুরু করলেন ক্লাইভ। বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পায়ের নীচের জমি আরও মজবুত করতে এই অভিযান তাঁর কাছে এক নয়া চ্যালেঞ্জ।

৬৮

নবাব মিরজাফর খাঁ স্তম্ভিত। একেবারে হাঁ হয়ে গিয়েছেন। ঝুলে পড়েছে নীচের ঠোঁট। কম্পমান হাতে ধরা ফরসির নল। দু'চোখে শূন্য বিহ্বল দৃষ্টি। এই মাত্র খাস মুনশি যা পড়ে শোনাল, তা যেন ঠিক হজম করে উঠতে পারছেন না।

খাস মুনশি অদূরে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। আনুগত্য দেখাতে ঈষৎ ঝুঁকে আছে সামনের দিকে। নবাবের ইজাজত না মিললে স্থান ত্যাগ করার উপায় নেই।

গোবিন্দমল্ল নিয়ে এসেছে চিঠিটা। বাংলা মুলুকে শাহজাদার আগমন সংবাদ জানিয়ে নবাব যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন জগৎশেঠকে, তার জবাবি চিঠি।

তুরন্ত ওয়াপস আসার জন্য জগৎশেঠকে কার্যত হুকুম করেছিলেন নবাব। লিখেছিলেন, তিনি যুদ্ধ চান না। নজরানা দিয়ে বশ করতে চান শাহজাদাকে। অতএব টাকা চাই। লম্বা চিঠিতে নবাব এ কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, অতীতে যখনই সংকটে পড়েছেন সুবে বাংলার নবাব, টাকা দিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন জগৎশেঠ। এবারেও যেন তার ব্যতিক্রম না হয়।

জগৎশেঠ জবাবে স্পষ্টই জানিয়েছেন যে, পরিবার নিয়ে তিনি তীর্থে এসেছেন। এখনই মুর্শিদাবাদে ফেরা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া এই মুহূর্তে শাহজাদার নজরানা মেটানোর মতো তহবিল তাঁর কাছে নেই।

খুবই সংক্ষিপ্ত চিঠি। শেঠজির ভাষায় বিনয় নেই। আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ নেই। হতে পারে সত্যিই হয়তো বাড়তি টাকা নেই তাঁর, কিন্তু এ জন্যে নবাব যেন তাঁকে মার্জনা করেন, এ নিয়ে একটি শব্দও খরচ করা হয়নি। এ যে সরাসরি নবাবের হুকুমতকে ইনকার করার সামিল। একধরনের বেয়াড়াপনা, বেতমিজি। বেসহবত কাণ্ড। শেঠজির স্পর্ধা দেখে তাই বাক্যহারা নবাব।

রায়দুর্লভের মতো জগৎশেঠও যে সুরে বাজছেন না, তা মসনদে বসার পর থেকেই একটু একটু করে অনুভব করছিলেন মিরজাফর খাঁ। এবারে স্পষ্ট ইঙ্গিত পেলেন। রায়দুর্লভ বরবাদ হয়ে গিয়েছেন, নিজামতের রাশ নিজের মুঠোয় নেওয়ার আশা ছেড়ে ইংরেজদের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন কলকাতায়। তাঁকে মুর্শিদাবাদ থেকে কার্যত পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল মিরন। এবার কি তবে জগৎশেঠের সঙ্গে চূড়ান্ত বোঝাপড়া সেরে নেওয়ার সময় এসেছে?

হঠাৎই পুত্রের জন্য মিরজাফরের মনটা হু-হু করে উঠল। মিরন ছাড়া এই দুশমনে ভরা দুনিয়ায় তাঁর আপনজন বলতে কেউ নেই। মসনদে বসার পর থেকে প্রিয় পুত্রের নামে নানান শিকায়ত শুনে শুনে পরেশান হয়েছেন নবাব। কখনও ইংরেজ রেসিডেন্ট, কখনও রায়দুর্লভ, কখনও জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ ও তাঁর ভাই মহারাজ স্বরূপচাঁদ মিরনের নামে নবাবের কানে বিষ উগরে দিয়েছেন। বিরক্ত হয়েছেন নবাব। তিরস্কার করেছেন পুত্রকে। আজ মনে হচ্ছে মিরনের পথই সঠিক। সব দুশমনকে খতম করতে চায় মিরন। এটাই সহি তরিকা।

এখনই মিরনকে ডেকে পাঠিয়ে জগৎশেঠের জবাবি চিঠির কথা জানাবেন বলে মনস্থ করলেন নবাব কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিলেন নিজেকে। সব শুনলে মিরন নির্ঘাত হামলা চালাবে জগৎশেঠের কুঠিতে। কিন্তু এই সংকট সময়ে অন্তর্কলহ মহাঅনর্থের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। শাহজাদার মোকাবিলা করাই এখন প্রধান কাজ। জগৎশেঠের সঙ্গে বোঝাপড়াটা না হয় পরে সারা যাবে। এই বলে নিজের মনকে প্রবোধ দিলেন নবাব। কম্পিত হাতে ধরে রাখা ফরসির প্যাঁচানো নলটার দিকে নজর পড়তে সম্বিৎ ফিরল। তামাকের ধোঁয়া ছেড়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, শির ঝুঁকিয়ে এখনও দাঁড়িয়ে আছে খাস মুনশি। হাতের ইশারায় নবাব তাকে চলে যেতে বলে চোখ বুজে ফের ডুব দিলেন গভীর চিন্তায়।

ফরাসের উপরে গিরদায় ঠেস দিয়ে কাত হয়ে শুয়ে আছেন নবাব। পিছনের দেওয়ালের মস্ত জাফরির ফাঁক দিয়ে গায়ে এসে পড়েছে দুপুরের রোদ। জগৎশেঠের চিঠি ঝাঁঝরা করে দিয়েছে নবাবের অহংবোধকে। অপমানে জ্বলেপুড়ে যেন খাঁক হয়ে যাচ্ছে বুকের ভিতরটা। কিন্তু কী হবে এখন? শাহজাদা আলি গোহর যে প্রায় পাটনার দরজায় এসে হাজির হয়েছেন। তাহলে কি লড়াই অনিবার্য? কিন্তু কোথা থেকে নবাব জোগাড় করবেন লড়াইয়ের খরচ?

নবাব বুঝলেন, এখন যা পরিস্থিতি তাতে এ যাত্রা পরিত্রাণ পেতে ক্লাইভকে ইয়াদ করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। এতে আবার হয়তো ইংরেজ-ফাঁস জোরালো হয়ে চেপে বসবে তাঁর গলায় কিন্তু অন্য উপায় তো কিছু নেই। তবুও সাহায্য চেয়ে ক্লাইভকে চিঠি লিখতে কেমন যেন কুণ্ঠাবোধ করতে লাগলেন নবাব। এতদিন তিনি চিঠি লিখে ইংরেজদের মদত চাননি, এই অন্তিম সময়ে কাতর আর্তি জানালে ক্লাইভও যদি মুখ ফিরিয়ে নেন? যদি বলেন, এত অল্প সময়ে লড়াইয়ের আনজাম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তখন?

ঘেমে উঠলেন মিরজাফর খাঁ। গায়ের উপরে বিছানো সোনার সুতোয় বোনা নকশাদার চাদরটা ছুড়ে ফেললেন পাশে। আনচান করছে শরীর। সোজা হয়ে বসে অস্থির ভাবে ঘন ঘন টান দিতে লাগলেন ফরসিতে।

এমন সময় অচানকই ঝড়ের গতিতে নবাবের খাস দরবারে হাজির হলেন দেওয়ান উমিদ রায়। সঙ্গে উইলিয়াম ওয়াটস ও ওয়ারেন হেস্টিংস।

দরবারের প্রাক্তন ও বর্তমান রেসিডেন্টকে দেখে চমকে উঠলেন নবাব। এদের আগমনের তো কোনও পয়গাম ছিল না। উমিদ রায় এগিয়ে এসে জানালেন, 'ওয়াটস সাহেব খুশখবর নিয়ে এসেছেন হুজুর।'

কৌতূহলী হয়ে পড়লেন নবাব। 'খুশখবর? মতলব?'

ওয়াটস ও হেস্টিংস কয়েক পা এগিয়ে এসে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একসঙ্গে তসলিম জানালেন। ওয়াটস বললেন, 'গভর্নর সাহেব ফৌজ নিয়ে কলকাতা থেকে রওনা হয়েছেন।'

খুশিতে উদ্ভাসিত হল মিরজাফরের মুখচোখ। বুকের উপর চেপে বসা দুশ্চিন্তার পাষাণভার যেন সরে গেল এক লহমায়। তিনি ক্লাইভের মদত চাননি, এই মদতের কিম্মত কত হবে তা নিয়ে দরকষাকষি করেননি ক্লাইভ, তবুও এই আওকাতে নবাবকে সাহায্য করতে তিনি ফৌজ নিয়ে মুর্শিদাবাদে আসছেন। ক্লাইভের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় পানিতে ভিজে উঠল মিরজাফরের দুই চোখ। পলকে ভেসে গেল ইংরেজদের প্রতি তাঁর নফরতি, কেরাহিয়াত। আবেগে ভেসে তিনি ভাবতে লাগলেন, আজ এই দুনিয়ায় ক্লাইভের মতো এমন তাগদবাজ দোস্ত তাঁর আর কে আছে? নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন নবাব। তিনি ভুল বুঝছিলেন ক্লাইভ সাহেবকে। আজ যেন ফের নতুন করে তিনি উপলব্ধি করলেন ক্লাইভ কখনোই তাঁর দুশমন নন, বিলকুল সাচ্চা দোস্ত। না হলে এভাবে বিনা পরোয়ানায় মুর্শিদাবাদে আসার তকলিফ কেন ওঠাবেন ক্লাইভ? তিনি সচমুচ তাঁর ভালাই চান। না হয় তিনি নবাবকে বন্দি করেই রাখলেন পিঁজরায়, লেকিন সে পিঁজরা তো সোনার। সেখানে জহমত, জিগরপস্তানি নেই। আছে কেবল ভোগ করার অধিকার। ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট যা কিছু সেসব ক্লাইভ সাহেবই সামলে নেবেন। এ ব্যবস্থা মন্দ কী? মসনদের উপরে তাঁর অধিকারকে সালামত রাখার জন্য এর চেয়ে বেহেতরিন তরিকা আর কী হতে পারে? ক্লাইভের মতো দোস্তকে দুশমন ভাবা তাঁর বদিয়তি। গুনাহের কাজ। 'আস্তাগফেরুল্লাহ।'

দছমালে চোখ মুছলেন নবাব। তারপরে ওয়াটসের মুখপানে চেয়ে আবেগতাড়িত গলায় মিরজাফর বললেন, 'কর্নেল আসছেন? সচ বলছেন আপনি? ফৌজ নিয়ে তিনি আসছেন?'

ওয়াটসের মুখে স্মিত হাসি। শির ঝুঁকিয়ে বললেন, 'ক্লাইভ সাহেব আপনার দোস্ত। আপনার তকলিফের কথা শুনে তিনি কি চুপ করে বসে থাকতে পারেন?'

'কর্নেলের আরমান কী?'

'শাহজাদার সঙ্গে লড়তে চান নবাব। আপনার মসনদকে সালামত রাখতে চান। মুর্শিদাবাদ হয়ে তিনি পাটনায় যাবেন। আপনাকে ফৌজ তৈয়ার রাখতে বলেছেন।'

'জরুর। নবাবজাদা মিরন ফৌজ নিয়ে যাবে তাঁর সঙ্গে।'

ওয়াটস বললেন, 'শুনেছি আপনি মোটা নজরানা দিয়ে রুখতে চাইছিলেন নবাবজাদাকে।'

'ঠিকই শুনেছেন। তবে সে পথ বন্ধ। জগৎশেঠজি টাকা দিতে পারবেন না।'

ওয়াটস বললেন, 'ভালোই হয়েছে। নজরানার কথা ভুলে যান। ক্লাইভ সাহেব মনে করেন আপনার ও মসনদের সালামতির জন্য লড়াই হল একমাত্র তরিকা। চিঠিতে সব লিখেছেন তিনি। পড়ে দেখুন।' এই বলে ক্লাইভের চিঠিটা নবাবের হাতে তুলে দিলেন ওয়াটস।

চিঠিটা চোখের সামনে মেলে ধরলেন নবাব। ক্লাইভের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতাবোধে ফের তাঁর দুচোখে চিকচিক করে উঠল জল। অক্ষরগুলো সব চোখের জলে ঝাপসা হয়ে গেল।

পাটনায় ঢুকে পড়েছেন শাহজাদা আলি গোহর। গোটা শহর জুড়ে তাণ্ডব চলছে। আগুনে পুড়ছে শহর। চলছে লুঠতরাজ। ভিটেমাটির মায়া ত্যাগ করে পালাচ্ছে আম-আদমি। পালিয়ে গিয়েছেন পাটনার ইংরেজ কুঠির কুঠিয়াল অ্যামিয়ট সাহেব। প্রাণ বাঁচাতে কলিগসদের নিয়ে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন গঙ্গার বুকে নৌকায়। নিরাপদ দূরত্ব থেকে পরিস্থিতির উপরে নজর রাখছেন। এখনও মুর্শিদাবাদ থেকে সাহায্য আসার কোনও খবর তাঁর কাছে নেই।

ওদিকে নায়েব রামনারায়ণ পাটনা দুর্গের দুয়ার এঁটে বসে রয়েছেন। কয়েকদিন আগে তাঁকে তলব করেছিলেন শাহজাদা। শাহি ফৌজের সেনাপতি মহম্মদ কুলি খাঁ অভয় দিলেও ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে শাহজাদার তাঁবুতে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন রামনারায়ণ। শাহজাদার মবারকে নজর পেশ করেছিলেন একশো এক আশরফি। এ নিয়ে অবশ্য এখন রামনারায়ণজির কম আফশোস নেই। কেবলই মনে হচ্ছে আশরফিগুলো ফালতু গচ্চা গেল। ও একেবারে অপাত্রে দান।

আসলে শাহজাদার তাঁবুতে গিয়ে সরেজমিনে সব কিছু দেখে চোখ খুলে গিয়েছে রামনারায়ণের। তিনি বুঝেছেন আলি গোহর একজন হতদরিদ্র অসহায় মানুষ। নেহাতই অপগণ্ড তাঁর দলবল। টুটাফাটা, রংচটা তাঁবুর কানাত দেখেই বোঝা যায় শাহজাদার আর্থিক হাল কী। হাতিয়ার, রসদের জোগানও এদের বড় একটা নেই। আর ফৌজ বলতে যা আছে, তা হল লুঠতরাজের নামে এক জায়গায় জড়ো হওয়া হাড়হাভাতে, আনপড় আদমির দল। অভুক্ত, হাড়-জিরজিরে চেহারা বেশিরভাগের। ভালো করে হাতিয়ারও ধরতে শেখেনি। কোম্পানির মাত্র কয়েকশো সুশিক্ষিত গোরা পল্টনের সামনে এই ফৌজ যে নিমেষে ছারখার হয়ে যাবে তা নিয়ে রামনারায়ণের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

যাই হোক, মোগল শাহজাদা বলে কথা, তাঁর দরবারে হাজির হয়ে সেলাম ঠুকে নজরানা পেশ করলেন রামনারায়ণ।

শাহজাদা বসেছিলেন একটা তক্তপোশের উপরে বসানো রাংতায় মোড়া কাঠের কুরসিতে।

রামনারায়ণের হয়ে মহম্মদ কুলি গুজারেশ করলেন, 'জাঁহাপনা রামনারায়ণজি আপনার একান্ত অনুগত। কাজেই পাটনা জয় করার জন্য খুন, পসিনা ঝরানোর কোনও জরুরত নেই। আপনার মবারকে হাজির হয়ে একথাই বলতে এসেছেন তিনি।'

ফের একবার তসলিম জানালেন রামনারায়ণ।

'শাহজাদা খুশ হুয়া।' আলি গোহরের গম্ভীর মুখে এক চিলতে হাসি খেলে গেল।

রামনারায়ণের জন্য ইনাম এল। খেলাত এল। ইনাম আর খেলাত দেখে শাহজাদার উপরে রামনারায়ণের ভক্তি টুটে গেল। খেলাত বলতে মোটা দাগের জরির কাজ করা সস্তা দরের একখানা পোশাক। এত সস্তা দরের কাপড় রামনারায়ণের হাজিরা-দাখিলারাও গায়ে ওঠায় না। আর ইনাম হল ঝুটা মোতির মালা ও হাতলে হিরের বদলে পলকাটা কাঁচ বসানো তলোয়ার।

মনের অভক্তি প্রকাশ না করে শির ঝুঁকিয়ে এই খেলাত ও ইনাম গ্রহণ করলেন রামনারায়ণ। তারপর তিনি নিজের পোশাক বদলে খেলাতি পোশাক পরতে পাশের তাঁবুতে ঢুকলেন। দেহের আকারের তুলনায় ছোট খেলাতি পোশাক কোনওরকমে গায়ে চড়িয়ে মাথায় পাগড়ি চাপিয়ে কোমর থেকে তলোয়ার ঝুলিয়ে, ঝুটা মোতির মালা গলায় পরে শাহজাদার সামনে এসে দাঁড়ালেন রামনারায়ণ। মাপে খাটো খেলাতি পোশাক একেবারে এঁটে বসেছে গায়ে। হাঁসফাস অবস্থা স্থূলকায় রামনারায়ণের। তসলিম জানানোর জন্য ঈষৎ সামনে ঝুঁকতেই চাপ খেয়ে পটাং করে ছিড়ে গেল কোমরের দড়ি। কোমর থেকে পোশাক খুলে পড়ার উপক্রম। দুই দাখিলা ছুটে এসে সামাল দিল। বড় রকমের বেইজ্জতির হাত থেকে বাঁচলেন রামনারায়ণ। অতঃপর দ্রুত পোশাক বদলানোর তাঁবুতে ঢুকে নিজের পোশাক পরে ধাতস্থ হলেন।

আলি গোহর সরল মনে ধরেই নিয়েছেন যে পাটনার নায়েব রামনারায়ণ তাঁর আনুগত্য শিকার করে নিয়েছেন, অতএব পাটনা জয় হয়েই গিয়েছে। এক হুকুমনামা জারি করে মহম্মদ কুলির ভাই মির্জা হাসানকে পাটনার ডেপুটি সুবাদার পদে নিযুক্ত করলেন শাহজাদা। ডেপুটি সুবাদারের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হলেন রামনারায়ণ। তিনি এই হুকুমত মাথা পেতে গ্রহণ করে বললেন, 'জাঁহাপনা এবারে ইজাজত দিন। আমি কেল্লায় ফিরে যাই। পাটনার কুরসিতে মির্জা হাসানকে বসানোর আনজাম করি।'

খুশি মনেই ইজাজত দিলেন আলি গোহর।

কেল্লায় ফিরেই নিজের সেপাইদের ডেকে কেল্লার সব দুয়ার বন্ধ করে দেওয়ার হুকুম দিলেন রামনারায়ণ। কেল্লার বুরুজে বুরুজে মোতায়েন করলেন কামান। কেল্লার চারপাশে মোতায়েন করলেন হাতিয়ারবন্ধ সেপাইদের। আর একখানা চিঠি ঠুকে মহম্মদ কুলিকে জানালেন, '...ভেবেছেন কী আপনারা? রাজা রামনারায়ণ আপনাদের হুকুমের গোলাম? শাহজাদা আমার দেশে এসেছেন, তাঁর সম্মানে আমি দরবারে হাজিরা দিয়েছি, নজরানা দিয়েছি—ব্যস সব সবক, সহবত চুকে গিয়েছে। মনে রাখবেন একমাত্র নবাব মিরজাফর খাঁ হলেন আমার মনিব। আমি আর কাউকে মানি না। পাটনার কেল্লা দখল করবেন, এই যদি আপনাদের মনসুবা হয় তো লড়াই করেই আপনাদের তা দখল করতে হবে।...'

এমনিতে রামনারায়ণের মতো ভীতু লোকও গলার শির ফুলিয়ে লড়াইয়ের কথা লিখলেন, তার কারণ দূত মারফত খবর এসেছে গোরা পল্টনদের নিয়ে পাটনার প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছেন ক্লাইভ। তাঁর সঙ্গে রয়েছে নবাবজাদা মিরন ও নিজামতের ফৌজ।

রামনারায়ণের চিঠি পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন মহম্মদ কুলি। পাটনা বিজয়ের মনসুবায় ফৌজ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মুহুর্মুহু গোলা এসে আছড়ে পড়তে লাগল কেল্লার উপরে। কিন্তু কোথায় ক্লাইভ? কোথায় তাঁর বাহিনী? বিচলিত হয়ে পড়লেন রামনারায়ণ। বুঝলেন, আগেভাগে অমন একখানা কড়া চিঠি লেখাটা মস্ত আহাম্মকির কাজ হয়ে গিয়েছে। এতদিন ঘন ঘন পেশকাশ, সওগাত পাঠিয়ে মহম্মদ কুলিকে বশ করে রেখেছিলেন, ক্লাইভ সাহেব না এসে পড়া পর্যন্ত এই কায়দাতেই আর একটু সময় অতিবাহিত করা উচিত ছিল।

শাহজাদার বাহিনীতে রয়েছেন জাঁ ল ও তার অধীনে কয়েকজন দক্ষ ফরাসি গোলন্দাজ। এই সামান্য শক্তি নিয়েই রামনারায়ণকে অতিষ্ট করে তুললেন ল সাহেব। গোলার আঘাতে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হল কেল্লা। রামনারায়ণের গোলন্দাজরা তেমন কোনও প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারল না। পাটনার কেল্লা প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম। পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে লাগলেন রামনারায়ণ। ঘাটে নৌকো প্রস্তুত রাখার হুকুম দিলেন। যদিও তখনও মনে তাঁর আশা, যে কোনও মুহূর্তে ক্লাইভ এসে পড়বেন।

দু'একটা গোলা দিবার টপকে কেল্লার ভিতরে এসে পড়ল। রামনারায়ণ তড়িঘড়ি কেল্লার ছাতে উঠে দূরবিনে চোখ রাখলেন। আহা এখনও যদি ক্লাইভ এসে পড়েন তো একটা হিল্লে হয়ে যায়। দূরে ধু-ধু করছে আইরান প্রান্তর। পশ্চিম দিক থেকে ভেসে আসছে শাহজাদার সেপাইদের উল্লাসধ্বনি। ভয়ে কাঁপছেন রামনারায়ণ। ফুরিয়ে আসছে বিকেলের আলো। আজ রাতেই হয়তো কেল্লায় ঢুকে পড়বে দুশমনেরা। পালানো ছাড়া আর উপায় নেই। সন্ধের মুখেই পালাতে হবে। কেল্লার ঘাটে প্রস্তুত হয়ে আছে বজরা।

দুম! দুম! দুম!

হঠাৎই পুব দিক থেকে ভেসে এল কামানের গর্জন। চমকে গিয়ে প্রায় উলটে পড়ছিলেন রামনারায়ণ। নিজেকে সামলে নিয়ে শব্দের দিক আন্দাজ করে ফের চোখ রাখলেন দূরবিনে। তাঁর চোখে পড়ল আকাশে উড্ডীন কোম্পানির পতাকা। দূরে ধুলোর ঝড়।

এসে পড়েছেন! এসে পড়েছেন কর্নেল ক্লাইভ! আনন্দের চোটে উদ্বাহু হয়ে দুর্গের ছাতে ধেই ধেই করে নাচতে লাগলেন রামনারায়ণ। জয় বজরংবলী! জয় সিয়ারাম!

'ভাগো ভাগো! গোরা পল্টন আসছে। আসছেন সাবিৎজঙ্গ। বাঁচতে চাও তো পালাও'—শোরগোল পড়ে গেল আলি গোহরের সেপাইদের মধ্যে। চারিদিকে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। শত্রুপক্ষকে লক্ষ্য করে দূর থেকে তখন উড়ে আসছে কোম্পানির গোলন্দাজদের ছোড়া একের পর এক কামানের গোলা। সে আক্রমণে ঝাঁঝ মারাত্মক।

বিশৃঙ্খল বাহিনীকে সংহত করার জন্য ল সাহেব তখন গলার শির ফুলিয়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছেন–'ডরো মাত! ফাইট! ফাইট! ফাইট এগেইনস্ট দ্য এনিমি...'

কিন্তু কে কার কথা শোনে! পলাশির যুদ্ধের পর থেকে এদেশীয় সেপাইদের কাছে ক্লাইভ ও তাঁর ফৌজ ভয়ানক এক আতঙ্ক। লড়াই ছেড়ে পালাতে লাগল শাহজাদার সেপাইরা। ঘাবড়ে গিয়ে শাহজাদা নিজেও পালালেন। পালালেন মহম্মদ কুলি। জাঁ ল একা একা আর কী করবেন? অগত্যা তাঁকেও পালিয়ে যেতে হল। শাহজাদার গোটা বাহিনি ছত্রখান। মহম্মদ কুলি পালালেন এলাহাবাদের দিকে। শাহজাদা ধরলেন লখনউয়ের পথ। অনুচরদের নিয়ে জাঁ ল ছত্রপুরের দিকে সরে পড়লেন।

ক্লাইভ ঢুকলেন পাটনা শহরে। কিন্তু কার সঙ্গে লড়াই করবেন তিনি? ধারেপাশে শত্রুর কোনও চিহ্ন নেই। গোটা শহর জুড়ে বিরাজ করছে শ্মশানের স্তব্ধতা। জায়গায় জায়গায় পথের উপরে পড়ে রয়েছে শাহজাদার ফৌজের সেপাইদের লাশ। হুড়োহুড়ি করে পালানোর সময় পদপিষ্ট হয়ে মারা গিয়েছে অনেকে। কেল্লার আশেপাশের ঘরবাড়ি আগুনে পুড়িয়ে তাণ্ডব চালিয়েছে শাহি ফৌজ। বাতাসে উড়ছে পোড়া ছাই। কোথাও ধিকিধিকি জ্বলছে আগুন। ধোঁয়ায় চোখ জ্বলছে।

প্রশান্তি ক্লাইভের মনে। আর যাই হোক লড়াইয়ের ঝক্কি পোহাতে হল না। সেই চিরাচরিত উদ্ধত ভঙ্গিতে পাটনার কেল্লার সদর দেউড়িতে এসে দাঁড়ালেন ক্লাইভ।

বিশাল বপু নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে ক্লাইভের পায়ে লুটিয়ে পড়ে রামনারায়ণ বললেন, 'আমি আপনার বান্দা হুজুর। আপনার জন্য ফের একবার নয়া জিন্দেগি লাভ করলাম। হুজুর আমার বজরঙ্গবলী। জয় সিয়ারাম!'

অদূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছিল নবাবজাদা মিরন। সে আশা করেছিল ক্লাইভের সামনে লড়াইয়ে বাহাদুরি দেখিয়ে নাম কিনবে। লেকিন লড়াই-ই যে হল না। ক্লাইভের নামেই কাজ হাসিল? খোদ মোগল শাহজাদা পালিয়ে গেল পাটনা ছেড়ে?

মিরন স্তম্ভিত। বাক্যহারা।

৬৯

হিরাঝিল প্যালেসে মণি বেগমের মহল-সংলগ্ন দোতলার অলিন্দে রয়েছে এক চিলতে বাগান। পোর্সেলিনের তৈরি বিভিন্ন আকারের বাহারি আধারে বেড়ে উঠেছে লতাগুল্ম, বনসাই। পাথুরে মেঝের উপরে মাটি বিছিয়ে তৈরি হয়েছে সবুজ ঘাসের লন। অলিন্দের খোলা অংশ সূক্ষ্ম তারের জাল দিয়ে ঢাকা। সেই অর্থে গোটা অলিন্দই যেন মস্ত এক খাঁচা—টিয়া, ময়না, কবুতর, বুলবুলি, কাকাতুয়াসহ আরও হরেক কিসিমের পাখির আস্তানা। গোলাম-বাঁদিরা বলে নবাব-বেগমের চিড়িয়াঘর। রোজ সকালে এখানে এসে নিজের হাতে পাখিদের দানাপানি দেন বেগম সাহেবা। তাঁকে দেখলেই ডানা ঝাপটে আনন্দে হল্লা বাধিয়ে দেয় পাখির দল। টিয়া, ময়না, কাকাতুয়া শেখানো বুলি আওড়ায়– 'বেগম সাহেবা সেলাম।' মণি বেগম খুশিতে হেসে ওঠেন।

রোজকার মতো আজও সবুজ ঘাসের উপরে শ্বেতপাথরের একখানা চৌপাইয়ের উপরে বসে পাখিদের গমের দানা খাওয়াচ্ছিলেন মণি বেগম।

'মণি!'

এই সম্বোধন শুনে চমকে গিয়ে ঘুরে তাকালেন মণি বেগম।

তারজালির দরজা ঠেলে খাঁচা-অলিন্দে ঢুকলেন নবাব।

গমের দানা বোঝাই রেকাবি পাশে রেখে শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন বেগম সাহেবা।

ক্ষুধার্ত পাখিরা দল বেধে ডানা ঝাপটে ঝাপিয়ে পড়ল গমের দানায় বোঝাই রেকাবির উপরে।

নবাব মিরজাফর খাঁ বিস্তরখানা ছাড়েন অনেক বেলায়। সূর্য তখন আশমানের মধ্যিখানে চলে আসে। এত সকালে অচানকই এই চিড়িয়াঘরে নবাবকে হাজির হতে দেখে বেশ আশ্চর্যই হয়েছেন মণি বেগম। 'সরতাজ! আপনি? এই অনওয়াক্তে?'

নবাব মিরজাফর খাঁর চোখে ঝলকাচ্ছে খুশি। মুখে প্রশান্তির ছাপ। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেশ। মণি বেগমের মনে হল, তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা যেন অন্য কেউ। পাহাড় প্রমাণ দুশ্চিন্তায় সর্বদা নিমজ্জিত, অবসাদগ্রস্ত, মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত নবাব মিরজাফর খাঁ নন।

'তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে পড়লাম মণি।'

'আমার খুশনসিব।'

শ্বেতপাথরের চৌপাইয়ের উপরে বসে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে পাখিগুলোকে দেখছিলেন নবাব। হঠাৎই রুপোর দাঁড় ছেড়ে মণি বেগমের কাঁধে এসে বসল একটা কাকাতুয়া। শির ঝুঁকিয়ে বলল, 'সেলাম নবাব বাহাদুর।'

মিরজাফর খাঁ শিশুর মতো হেসে উঠে বললেন, 'বেশ সবক জানে তো তোমার চিড়িয়া।'

মণি বেগম কাকাতুয়াটাকে হাতে নিয়ে তার মাথায় হাত বুলোতে থাকেন।

নবাব হঠাৎ বললেন, 'আচ্ছা মণি তোমার এই চিড়িয়ারা আজাদি চায় না?'

নবাবের প্রশ্নের ধরনে হাঁ হয়ে গিয়ে চকিতে মুখ তুলে তাকালেন বেগম সাহেবা।

নবাব ফের শুধোলেন, 'চায় না আজাদি?'

'না। দরজা খুলে দিলেও এরা কেউ উড়ে পালাবে না। আমি যে কত যত্ন করি এদের। এই এক চিলতে বাগানে রুপোর দাঁড়ে বসে নিশ্চিন্তে দোল খায় এরা। বাইরের দুনিয়ায় লড়াই বড় কঠিন। মণি বেগমকে এরা এদের দোস্ত বলে মনে করে। এরা জানে বেগম সাহেবার হাতে এরা সালামত থাকবে। কোনও ভাবনা নেই।'

মাথা নাড়িয়ে নবাব বললেন, 'ভালো বলেছ। বেশ বেশ!'

'আজ এত সকালে উঠে পড়লেন যে।'

'দেওয়ানজি এসে ঘুম ভাঙালেন। পাটনা থেকে খুশির খবর নিয়ে এসেছে কাসিদ।'

'এর মধ্যেই খুশখবর? জিত হাসিল করে নিলেন ক্লাইভ সাহেব?' খুশি ঝরে বেগমের গলায়।

সজোরে হেসে ওঠেন নবাব। নবাবের হাসির শব্দ শুনে আহার্য ছেড়ে ডানা ঝাপটে উড়ে গিয়ে ছাত থেকে ঝুলতে থাকা রুপোর দাঁড়ে গিয়ে বসল পাখির দল।

গলার আওয়াজে দুনিয়ার সব খুশি যেন উজাড় করে দিলেন নবাব। 'লড়াই হল কোথায়? কসিদের মুখে শুনলাম ক্লাইভ সাহেব ফৌজ নিয়ে পাটনায় পৌঁছতেই শাহজাদা পালিয়ে গিয়েছেন।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মণি বেগম। 'আল্লা মেহেরবান।'

'এই খুশির খবরটা তোমাকে জানানোর জন্য ছুটে এলাম মণি।' বললেন নবাব।

‘আমি তো সমানে মোনাজাত করে চলেছি পয়গম্বরের কাছে—কোনও মুসিবত যেন না আসে।’ হাসলেন মণি বেগম।

‘ক্লাইভ সাহেবের মদত চাওয়ার জন্য তুমি পরামর্শ দিয়েছিলে। আমি চিঠি লিখিনি। মস্ত বেওকুফির কাজ করেছি। অথচ দেখো উনি নিজেই ছুটে এলেন। যাই বল, ইংরেজলোগ দোস্তির কিম্মত বোঝে।’ ফের খুশিতে উদ্ভাসিত হল মিরজাফরের মুখমণ্ডল।

‘ক্লাইভ সাহেব সঙ্গে থাকলে কোনও মুসিবত আপনাকে ছুঁতে পারবে না সরতাজ। ইংরেজদের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়ার কথা আপনি ভুলেও কখনও ভাববেন না যেন।’

নবাবের পায়ের কাছে হাঁটু ভাজ করে বসেছিলেন মণি বেগম। তার চিবুক ছুঁয়ে নবাব বললেন, ‘সচ বাত বলেছ তুমি। কে দোস্ত আর কে দুশমন তার সহি আন্দাজ পাওয়া সহজ নয়।’

‘আপনি গোটা রাজধানী জুড়ে খুশি মানানোর আনজাম করুন। খোদ মোগল শাহজাদা পালিয়ে গিয়েছেন। এ তো আপনার বিরাট জিত।’

বেগম সাহেবার কথায় মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালেন নবাব। তারপর বললেন, ‘লেকিন আমি যে বহুত পরেশানির মধ্যে পড়েছি মণি।’

‘এই খুশির পলে কীসের পরেশানি আপনার?’ অবাক হয়ে শুধোলেন বেগম সাহেবা।

‘ক্লাইভ সাহেবকে কী সওগাত দিই বলো তো? কীসে খুশি হবেন উনি? ভেবে ভেবে হয়রান হয়ে যাচ্ছি আমি। তোমার উপরে ভরসা আছে। একটা উপায় বাতলাও মণি।’

মণি বেগম একটু ভেবে বললেন, ‘জায়গির দিন ক্লাইভ সাহেবকে।’

‘বাঃ! চমৎকার। কথাটাতো আমার মাথায়ই আসেনি।’ খুশিতে উচ্ছল হন নবাব, পরমুহূর্তেই ভুরু কুঁচকে চিন্তিত গলায় বলেন, ‘লেকিন...’

‘আবার কী ভাবছেন?’

‘কলকাতা থেকে দূরে জায়গির দিলে কি খুশ হবেন তিনি?’

‘দূরে কেন? কলকাতার কাছে জায়গির দিন।’ হেসে বলেন মণি বেগম।

‘ও তল্লাটে সবই তো দোফসলা জমি। অমন জমি জায়গির দেওয়ার রেওয়াজ যে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আমল থেকে উঠে গিয়েছে।’

মণি বেগম গালে হাত দিয়ে ফের ভাবতে লাগলেন। কথাটা সত্যি বটে। বিহার, ওড়িশার অনাবাদি জমি জায়গির দেওয়ার প্রথা চালু করে গিয়েছেন মুর্শিদকুলি খাঁ। বহু বছর ধরে চালু এই রীতি। আমির-ওমরাহ-মনসবদাররা মুখ বুজে মেনে নিয়ে আসছে। হঠাৎ এই রীতি ভাঙলে সকলে আবাদি, উর্বর জমি জায়গির পাওয়ার জন্য আবদার জানাবে। এতে তকলিফ বাড়বে নবাবের। জায়গির পাওয়া জমির জন্য খাজনা দিতে হয় না। উর্বর জমির খাজনা অনেক বেশি। এই জমি জায়গির হিসেবে বিতরণ করলে নিজামতের অনেক লোকসান। অনেক দিন আগে একথা বুঝেছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। ঔরঙ্গজেব বাদশার প্রিয়পাত্র এই মানুষটির সে সময়ে যা দাপট ছিল তাতে কেউ তাঁর এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার হিম্মত দেখায়নি। পরে ধাতস্থ হয়ে গিয়েছে সকলে। কোনও ওমরাহ, মনসবদার এ নিয়ে এতদিনে প্রশ্ন ওঠায়নি।

মণি বেগম বললেন, ‘এক কাজ করুন। কলকাতার আশেপাশে যে গ্রামগুলো আপনি ইংরেজ কোম্পানিকে জমিদারি হিসেবে দিয়েছেন সেগুলোই ক্লাইভ সাহেবকে জায়গির হিসেবে দান করুন।’

চিন্তিত মুখে নবাব বললেন, ‘এতে হর সাল তিন লাখ টাকা লোকসান হবে নিজামতের।’

‘লোকসান তো এমনিতেই হচ্ছে। দেড় সাল হয়ে গেল। কলকাতার জমিদারির খাজনাবাবদ কোম্পানি তো আপনাকে একটা আশরফিও দেয়নি।’

মিরজাফর অবাক হন। ‘তুমি এত কথা জানো মণি?’

মণি বেগম মুচকি হেসে বললেন, 'দোস্তের থেকে শালিয়ানা আদায় করা সহজ নয়। ওই জমিদারি ক্লাইভ সাহেবকে জায়গির দিলে উনিও খুশি হবেন আর বকেয়া আদায়ের জন্য আপনারকেও পরেশান হতে হবে না। তিন লাখ টাকা না হয় অন্য খাতে উশুল করে নেবেন।'

নবাব এবারে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, 'বা বা! চমৎকার বুদ্ধি বাতলেছ মণি। তোমারই নিজামতের দেওয়ান হওয়া উচিত।'

নবাবের কথা শুনে বালিকাসুলভ চাপল্যে খিলখিল করে হেসে উঠলেন মণি বেগম। হাসিতে মুক্তো ঝরল। নবাবের প্রতি কটাক্ষ হেনে তিনি বললেন, 'মসনদ কোন তরিকায় সালামত রাখতে হয়, তা মণি বেগম বিলকুল বোঝে।'

বিলোল এক কটাক্ষেই ঘায়েল হলেন নবাব। এ যেন বহুবছর আগে দেখা সেই ষোড়শী মণি বাই। সহসা মণি বেগমের হাত ধরে প্রবল ভাবে তাঁকে নিজের দিকে আকর্ষণ করলেন নবাব।

'আঃ করছেন কী?'

এক ঝটকায় নিজের দুই উরুর উপরে মণি বেগমকে বসিয়ে তাঁর চিকন শরীরটাকে শক্ত বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে প্রবল আবেগে তাঁর মুখমণ্ডলে ঘন ঘন চুম্বন করতে লাগলেন নবাব। আদরের ঘটায় হাঁসফাঁস করতে লাগলেন মণি বেগম। খাঁচা-অলিন্দের চিড়িয়ারা ডানা ঝাপটে মেলা কিচিরমিচির বাধিয়ে দিল।

পাটনা থেকে ফিরলেন ক্লাইভ।

খুশির বান ডাকল মুর্শিদাবাদে। হিরাঝিল প্যালেস, মোরাদবাগ প্যালেস, জাফরাগঞ্জ, নিজামত কেল্লা সেজে উঠল আলোকমালায়। আতশবাজির রোশনাইয়ে ম্লান হল রাতের অন্ধকার। নহবতখানা বাতাসে বিলোতে লাগল খুশির সানাই।

খুশির রেশ ছড়িয়ে পড়ল চকবাজারেও। ইংরেজ ফৌজ পাটনায় পা রাখতেই ভয়ে পালিয়ে গিয়েছেন মোগল শাহজাদা আলি গোহর। এই খবর শুনে আনন্দে মাতোয়ারা মিশকিন থেকে রইস আদমি সকলেই। বিগত মাসখানেক বিপর্যয়ের আন্দেশায় ভয়ে কাঁটা হয়েছিল এরা। অতি সাবধানী যারা মুর্শিদাবাদ নগরী ছেড়ে আগেই পালিয়ে গিয়েছিল, তারা সব একে একে ফিরে আসতে লাগল। চকবাজারের পথের ধারে চবুতরাগুলো ফের সরগরম হয়ে উঠল মালপত্রের পসরায়। মিঠাই, শরাব, লস্যি, আতর, গুলাবজল বিকোতে লাগল দেদার। কাবাব, দুনিয়াজা, দমপোক্ত, বিরিয়ানির স্বাদু গন্ধে ম-ম করতে লাগল গোটা চকবাজার। বসরাই গুলাব, গুলদস্তার কারবারিরা ফুলেফেঁপে ঢোল। বাইজি, কসবিদের কোঠি থেকে ভেসে আসতে লাগল দাদরা, ঠুমরি, কাহারবা। রইস আদমিদের হাভেলিতে জ্বলল ঝাড়বাতি। মুজরোর আসরে দামি গালিচার উপরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল মুঠো মুঠো আশরফি। খানাপিনা, মেহফিল, মজলিশ, গুলতানিতে মাতোয়ারা হল সুবে বাংলার রাজধানী। আম-আদমি লড়াই চায় না, শান্তি চায়। লড়াই বিপর্যস্ত করে জনজীবন। দূর হয়েছে মুসিবতের আন্দেশা। তাই এই খুশির আমেজ।

কী রইস আদমির হাভেলির খাসমহল, কী চকবাজারে পথের ধারের গুমটি সর্বত্রই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু কর্নেল ক্লাইভ। ফোর্ট উইলিয়াম পুনর্দখল, হালসিবাগানের জবরদস্ত লড়াই, চন্দননগরের ফরাসিদের মুসিবত, তারপরে পলাশি, হালে পাটনা– আমজনতার চোখে অতিমানব হয়ে উঠেছেন রবার্ট ক্লাইভ।

মণি বেগমের পরামর্শ মতো কলকাতার আশেপাশের পঞ্চান্নটা গ্রাম ক্লাইভকে জায়গির দিলেন নবাব মিরজাফর খাঁ। ক্লাইভের চোখেমুখে খুশি উপচে পড়ল। মোগল বাদশার কাছ থেকে নওশেরউদ্দৌলা খেতাব পাওয়ার পর থেকে মনটা খুঁতখুঁত করছিল তাঁর। একান্তে অনেককে বলেওছিলেন এদেশের সব আমির-ওমরাহেরই জায়গির আছে। কেবল তাঁরই নেই। একটা জায়গির না পেলে এদেশের আমির-ওমরাহদের

কাছে মান থাকছে না। এতদিনে ক্লাইভের এই মনসুবা পূর্ণ হল। এই জায়গিরের শালিয়ানা মনে মনে হিসেব করে ফের একবার তিনি পুলকিত হলেন। কোনও বিনিয়োগ, ঝুটঝামেলা ছাড়াই হর সাল কোম্পানির কাছ থেকে আদায় হবে তিন লাখ টাকা। যতদিন তিনি বাঁচবেন ততদিন বলবৎ থাকবে এই বন্দোবস্ত। তাঁর মৃত্যুর পর এই জায়গির ফের জমিদারি হিসেবে কোম্পানির হাতে ফিরে যাবে।

নবাবের হাত থেকে জায়গিরের পরোয়ানাটা নিলেন ক্লাইভ। তাঁর মুখে মুখে পরম তৃপ্তির হাসিটা মিরজাফর খাঁর নজর এড়ালো না। মিরজাফরের মুখেও খুশির হাসি।

মাথা ঝুঁকিয়ে ক্লাইভ বললেন, 'বহুত বহুত সুক্রিয়া।'

এরপর ফৌজ নিয়ে কলকাতা ফিরে চললেন ক্লাইভ। দাবদাহ উপেক্ষা করে ঝড়ের গতিতে কলকাতা থেকে পাটনায় ছুটে যাওয়া ফের লম্বা পথ ভেঙে কলকাতায় ফেরা। ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে ক্লাইভের শরীর। গত কয়েকদিন ধরে খরতাপে দগ্ধ বাংলা। শরীরটাকে জুড়োতে চান ক্লাইভ। এক্ষেত্রেও ভাগ্যদেবী তাঁর সহায়।

সহসা আকাশে পুঞ্জীভূত হল মেঘ। বৃষ্টি নামল অঝোরে। প্রাকবর্ষার বারিধারা।

ছাউনি পড়েছে দাউদপুরে। বৃষ্টি নামতেই তাঁবু থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন ক্লাইভ। উন্মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে দু'দিকে দু'হাত প্রসারিত করে ভিজতে লাগলেন অঝোর ধারাপাতে।

বর্ষার মরশুমে সুবে বাংলায় হাতি, ঘোড়া, তোপের গাড়ি লোকলস্কর নিয়ে কোনও সামরিক অভিযান করা যায় না। কাজেই বেশ নিশ্চিন্তে থাকেন নবাব। বাইরে থেকে কোনও হানাদারির ভয় নেই, কোনও ঝুট-ঝামেলাও নেই। চলাচলের অসুবিধার কারণে সওদাগরদের কাজকর্মেও ভাঁটা পড়ে। সকলেই এই সময়টা একটু আয়েশ করে। দুদণ্ড জিরিয়ে নেয়।

১৭৫৯ সালের জুলাই মাস। আকাশের মুখ ভার। গত কয়েকদিন ধরে একনাগাড়ে ধারাবর্ষণ হয়ে চলেছে। কাশিমবাজার ডুবুডুবু। ইংরেজ কুঠির কাজকর্ম এই দুর্যোগে প্রায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। উপচে পড়ছে নদীগুলো। কোথায় নদী আর কোথায় ডাঙা তার আন্দাজ পাওয়া দুষ্কর। স্তব্ধ নিজামতের কাজকারবারও। ইদানীং নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্কে যে ফাটল ধরেছিল, আলি গোহরের বাংলা অভিযানের গুঁতোয় তা মেরামত হয়ে গিয়েছে। মাঝে বেসুরো হয়ে ওঠা নবাব ফের সুরে বাজছেন। ইংরেজরা বেজায় খুশি। দরবারের জটিল রাজনীতির উত্তাপ এখন অনেকটাই স্তিমিত। দরবারের রেসিডেন্ট ওয়ারেন হেস্টিংস এদিক থেকে চাপমুক্ত। তবে পরিবারে নতুন অতিথির আগমনহেতু বর্তমানে তিনি ভয়ানক উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছেন।

বারবার ঘর থেকে বেরিয়ে গাড়িবারান্দায় এসে দাঁড়াচ্ছেন হেস্টিংস। না এখনও কৃষ্ণকান্তর দেখা নেই। ওদিকে বিছানায় শুয়ে ছটফট করছেন মেরি। প্রসববেদনা উঠেছে। একবার ছুটে গিয়ে স্ত্রীর খাটের পাশে দাঁড়াচ্ছেন হেস্টিংস। স্ত্রীর কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আবার পরক্ষণেই ছুটে বেরিয়ে এসে গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন সদর দেউড়ির দিকে। সাহেব ডাক্তার ও কবিরাজকে ডেকে আনতে গিয়েছেন কৃষ্ণকান্ত। এখনও তাদের দেখা নেই।

খানিকবাদে তালপাতার ছাতা মাথায় দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে সদর দেউড়ি ঠেলে রেসিডেন্ট সাহেবের বাংলোর চৌহদ্দিতে ঢুকলেন কৃষ্ণকান্ত। পিছনে সাহেব ডাক্তার কবিরাজ ও দক্ষ একজন ধাইমা। দ্রুত ছুটে এসে তারা মেরির ঘরে ঢুকে পড়লেন।

বন্ধ ঘরের দরজার সামনে তীব্র উত্তেজনায় পায়চারি করতে লাগলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। এমন উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা আগে কখনও তিনি অনুভব করেননি। প্রথম কন্যাসন্তানের অকালমৃত্যুর পর ফের সন্তান প্রসব

করতে চলেছেন মেরি। রুগ্ন শিশুকন্যাটি মাত্র পক্ষকালের আয়ু নিয়ে এসেছিল পৃথিবীতে। প্রভু যিশুর উদ্দেশে একনাগাড়ে মনে মনে প্রার্থনা জানিয়ে চলেছেন হেস্টিংস সাহেব—যেন সব কিছু ঠিক থাকে। এবারে কোনও অঘটন ঘটলে মেরিকে সামলানো কঠিন হয়ে পড়বে।

কৃষ্ণকান্ত বললেন, 'ভাববেন না হুজুর। গোবিন্দের কৃপায় সব কুশল হবে। এবারে পুত্রসন্তান আসবে আপনার ঘরে। স্বয়ং প্রভু যিশু আবির্ভূত হবেন।'

'বাজনদারদের বলে রেখেছ?'

'হ্যাঁ হুজুর। খবর হলেই ডেকে নিয়ে আসব তাদের।'

হেস্টিংসের দু'চোখ খুশিতে চকচক করে ওঠে। 'আই ওয়ান্ট অ্যা গ্র্যান্ড সেলিব্রেশন কান্ত।'

'জি হুজুর। বাজিকর, বাতিকর সবাইকে বলে রেখেছি।'

'মেরি খুব খুশি হবে।'

সহসা বন্ধ ঘরের ভিতর থেকে সদ্যোজাত শিশুর কান্নার আওয়াজ ভেসে এল। ভয়ানক চঞ্চল হয়ে উঠলেন হেস্টিংস।

অন্দর থেকে বেরিয়ে এসে এক বাঁদি বলে, 'আপনার ছেলে হয়েছে সাহেব।'

বাইরে তখন অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। ফুরিয়ে আসছে দিনের আলো।

বৃষ্টি মাথায় নিয়েই কৃষ্ণকান্ত ছোটেন বাজনদার, বাজিকর বাতিকরদের ডেকে আনতে। উৎসব হবে, খানাপিনা হবে, বাজনা বাজবে, বাজি পুড়বে। আজ উৎসব হবে রেসিডেন্ট সাহেবের বাংলোয়।

খানিকবাদে বিমর্ষ মুখে বেরিয়ে এলেন সাহেব ডাক্তার ও কবিরাজ। তাদের অভিব্যক্তি দেখেই অজানা আশঙ্কায় হেস্টিংসের বুক কেঁপে উঠল। ছুটে এসে শুধোলেন, 'কী হয়েছে?'

সাহেব ডাক্তার বললেন, 'দ্য বেবি ইজ ওয়েল। বাট—'

'বাট? কী হয়েছে? মেরি? স্পিক আউট ডক্টর।' ডাক্তারের কাঁধ ধরে ঝাকুনি দেন হেস্টিংস।

মাটির দিকে আনত চোখ তুলে বলে, 'শি ইজ ক্রিটিক্যাল।'

ঝড়ের গতিতে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন ওয়ারেন হেস্টিংস।

মেরি শুয়ে আছে। নিস্তেজ। অদূরে বেতের দোলনায় তুলোর নরম বিছানায় শায়িত রয়েছে সদ্যোজাত। তার পরিচর্যায় ব্যস্ত ধাইমা।

হেস্টিংস উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটে শিশুপুত্রের পাশে গিয়ে একবার দাঁড়ালেন। তারপর ফের ছুটে এসে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন খাটের পাশে। মেরি প্রায় বেহুঁশ।

হেস্টিংস অস্ফুট স্বরে ডাকলেন, 'মেরি, মেরি! মেরি মাই ডার্লিং।'

একবার বহু কষ্টে চোখ খুলে তাকালেন মেরি।

ব্যাকুল হয়ে উঠলেন হেস্টিংস। 'মেরি! মেরি! মেরি মাই ডার্লিং—'

মেরির চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। ফের চোখ বুজলেন। বাকরুদ্ধ মেরি। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়ে কৃষ্ণকান্ত বাজনদারদের সঙ্গে নিয়ে হাজির হল রেসিডেন্ট সাহেবের বাংলোয়। বাইরে থেকে ঢাক-ঢোলের শব্দ ভেসে এল।

ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন হেস্টিংস সাহেব। একেবারে বিধ্বস্ত চেহারা।

সাহেবের অভিব্যক্তি দেখে অমঙ্গল আশঙ্কায় কৃষ্ণকান্তর বুকটা ছাঁৎ করে উঠল।

ওয়ারেন হেস্টিংস বললেন, 'ওদের ফিরে যেতে বলো কান্ত। বাজিকর, বাতিকরদেরও না করে দাও। মেরি ইজ ভেরি ক্রিটিক্যাল। আগে সে সুস্থ হোক। তারপরে না হয়–' কথাটা শেষ করতে পারলেন না। মনের মধ্যে তীব্র সংশয়। মেরি শেষ পর্যন্ত ভালো হয়ে উঠবে তো?

পরের কয়েকটা দিন কাটল তীব্র উৎকণ্ঠার মধ্যে। ডাক্তার, কবিরাজদের সঙ্গে হেস্টিংস নিজেও দিনরাত মেরির পরিচর্যায় ব্যস্ত রইলেন।

পরপর কয়েকরাত জেগে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন হেস্টিংস। ভোরের দিকে পাশের ঘরে গিয়ে আরাম কেদারায় দেহটা এলিয়ে দিলেন। ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে ডেকে তুললেন কৃষ্ণকান্ত।

ধড়ফড় করে জেগে উঠে ত্রস্ত গলায় হেস্টিংস শুধোলেন, 'কান্ত? কী ব্যাপার?'

'হুজুর—' কান্নায় ভেঙে পড়লেন কৃষ্ণকান্ত।

হেস্টিংস ছুটে গেলেন মেরির ঘরে। ঘরের ভিতরে জানালার পাশে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন ডাক্তার। তখনও নাড়ি ধরে বসে আছেন কবিরাজ। হতাশায় দু'দিকে মাথা নেড়ে সরিয়ে নিলেন নিজের হাতটা। হেস্টিংস খাটের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে ঝুঁকে পড়লেন মেরির মুখের উপরে।

'মেরি! মেরি! মাই ডার্লিং!'

মেরি নিঃসাড়। নিস্পন্দ। এই দুনিয়ার মায়া-মোহ, বাধা-বন্ধন সব ছিন্ন করে অমৃতলোকে চলে গিয়েছেন খানিক্ষণ আগে।

কাশিমবাজারের গোরস্থানে, যেখানে শায়িত আছেন হেস্টিংস দম্পতির শিশুকন্যা, তার পাশেই মেরিকে সমাহিত করার ব্যবস্থা করা হল।

জোর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল খানিক আগে। এখনও আকাশের মুখ ভার। গাছের পাতা থেকে টুপটাপ করে জল ঝরে পড়ছে মাথায়। গোরস্থানে একটা বটগাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছিলেন হেস্টিংস। অশ্রুসজল দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন সামনের দিকে। মনের মধ্যে চলমান মেরিকে ঘিরে অজস্র সুখস্মৃতি। কুলি-মজুরেরা তখন বেলচা চালিয়ে ঢেকে দিচ্ছে মাটির নীচে শায়িত মেরির কফিনবন্দি দেহটাকে।

হঠাৎই গোরস্থানে এসে পৌঁছল নিজামতের দেওয়ান উমিদ রায়ের পালকি। সঙ্গে বেশ কয়েকজন দাখিলা। মেরির প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে রাশি রাশি বেল ও জুঁই ফুল পাঠিয়েছেন মণি বেগম। নিজের হাতে সেই ফুল কবরের ভিজে মাটির উপরে ছড়িয়ে দিতে দিতে কান্নায় ভেঙে পড়লেন ওয়ারেন হেস্টিংস। জুঁই ও বেল ফুলের গন্ধে সুবাসিত হল গোটা গোরস্থান।

৭০

১৭৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ক্লাইভ পা রেখেছিলেন ফলতায়। কলকাতা থেকে বিতাড়িত ইংরেজ বণিকেরা ওখানে তখন মৃত্যুর প্রহর গুণে চলেছে। তারপর দেখতে দেখতে আড়াই বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেল। ভাগীরথী নদী বেয়ে গড়িয়ে গেল অনেক জল। ক্লাইভের হাত ধরে সুবে বাংলায় পুনরুত্থান হল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির। পলাশিতে মুসিবত হল সিরাজদ্দৌলার। নানা ঘটনাস্রোতের মধ্যে দিয়ে নতুন পথ তৈরি করে নিল আধুনিক ভারতের ইতিহাস। সে ইতিহাস এদেশে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তির আগ্রাসী ক্ষমতা বিস্তারের। সে ইতিহাস এক অভূতপূর্ব দস্যুবৃত্তির। সে ইতিহাস বিদেশি শক্তির কাছে এদেশের নবাব-বাদশাদের কাপুরুষোচিত আত্মসমর্পণের। সে হল এক তমসাচ্ছন্ন সময়। আর সেই সময়ের কালো নায়ক রবার্ট ক্লাইভ।

ক্লাইভের নামে থরহরিকম্প তামাম হিন্দুস্তান। দিল্লির বাদশা খেতাব দিয়েছেন নওশেরউদ্দৌলা। নবাব দিয়েছেন জায়গির। কলকাতা কাউন্সিল তাঁকে বসিয়েছে গভর্নরের কুরসিতে। ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সামান্য এক কেরানি। পলাশির যুদ্ধের আড়াই বছর পরে তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির খতেন দেখলে লন্ডনের যে কোনও বিত্তবান মানুষ ভিরমি খাবে। তবুও তুষ্ট নন ক্লাইভ। তাঁর মাথায় ঘুরছে বিরাট বড় এক

পরিকল্পনা। তা রূপায়ণের জন্য একবার লন্ডনে যাওয়াটা খুবই জরুরি বলে মনে করলেন তিনি। পাটনা থেকে কলকাতায় ফিরেই লন্ডনযাত্রার তোড়জোড় করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

পলাশি পরবর্তী সময়ে ইংরেজ প্রতাপ সম্বন্ধে এদেশীয় লোকেদের মধ্যে প্রচণ্ড ভীতির সৃষ্টি হয়েছে। এদেশের মনসবদার, জমিদার, মহাজনদের অনেকেই ক্রমশ ইংরেজদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এসব গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে লক্ষ করছিলেন ক্লাইভ। শুধু একচেটিয়া ব্যবসা-বিস্তার নয়, সেই সঙ্গে তামাম হিন্দুস্তান জুড়ে ইংরেজ রাজত্ব গড়ে তোলার ফন্দি ঘুরছে ক্লাইভের মাথায়। এই মনসুবা পূর্ণ করতে চাই একদল সুশিক্ষিত সেনা। এই বাহিনীর খরচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেবে না। তারা কারবার ও মুনাফা ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না। এদিকে ক্লাইভ দেখছেন, একদল ট্রেইনড সোলজার হাতে থাকলে গোটা হিন্দুস্তান দখল করে নেওয়াটা তেমন কোনও কঠিন কাজ নয়।

ধূর্ত রবার্ট ক্লাইভের চোখদুটো লোভে চকচক করছে। আপাতত তাঁর নজর বাংলার দেওয়ানির উপরে। রায়দুর্লভের কাছ থেকে তিনি আঁতিপাতি করে বুঝে নিয়েছেন বাংলা-বিহার-ওড়িশার রাজস্ব আদায়ের অন্ধিসন্ধি, হিসেব নিকেশ। এই তিন প্রদেশের রাজস্ব আদায় ক্ষমতা হাতে এলে হর সাল পঞ্চাশ লাখ টাকাও যদি মোগল বাদশাকে পেশকাশ দিতে হয়, তবুও কোম্পানির হাতে থাকবে আড়াই কোটি টাকা। প্রজাদের উপরে আর একটু চাপাচাপি করলে এই আড়াই কোটিকে পাঁচ কোটিতে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। ঘর থেকে খরচ করতে হবে না একটা টাকাও। বাংলার রাজস্বের টাকাতেই সৈন্য পুষে ধীরে ধীরে গোটা হিন্দুস্তান দখল করে নেওয়া যাবে। এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়নের জন্য অধীর হয়ে পড়েছেন ক্লাইভ। এ কথাই লন্ডনে গিয়ে মুখোমুখি আলোচনায় বসে প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিটকে তিনি বোঝাতে চান। এই প্রস্তাবে ইংল্যান্ডের রাজার শিলমোহর পেলে আর ভাবনার কিছু নেই। পাওয়া যাবে চাহিদা মতো সেনা। তারপর বাংলার দেওয়ানি ইংল্যান্ডের রাজার হাতে তুলে দিয়ে তামাম দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দেবেন ক্লাইভ। এই তাঁর মনসুবা।

পাটনা থেকে ফেরার পর কিছুদিনের মধ্যেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে লন্ডনে ফেরার অনুমতি আদায় করে নিলেন ক্লাইভ। ঠিক হল ১৭৬০ সালের গোড়ায় তিনি লন্ডনের উদ্দেশে রওনা হবেন। খবরটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে—রবার্ট ক্লাইভ দেশে ফিরে যাবেন। অনেকে ভাবল এদেশে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত ক্লাইভ আলবিদা জানাতে চাইছেন চাকরিকে। জীবনের বাকি সময়টা দেশে ফিরে আয়েশে আরামে কাটাতে চান। কিন্তু ক্লাইভের লন্ডন যাত্রার পিছনে মূল কারণটা যে কী, তা জানল না কেউই।

ক্লাইভের চলে যাওয়ার কথা শুনে নবাব দোলাচলে। ক্লাইভের প্রস্থান তাঁর পক্ষে ভালো না মন্দ, সেই আন্দাজ পেতে তিনি পরেশান। তাঁর মনোজগতের প্রতিক্রিয়া বিচিত্র। একদিকে শঙ্কা, মনখারাপের অনুভূতি, আবার অন্যদিকে আনন্দও। তিনি ক্লাইভের হাত থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন। ক্লাইভ নিজেই চলে যাচ্ছেন বাংলা ছেড়ে। ‘নবাব হলেন কর্নেলের মদ্দা গর্ধভ’– এই অপবাদ ঘুচিয়ে এবারে আজাদ হয়ে নবাবি করার উমিদ মনের মধ্যে। এদিক থেকে তিনি খুশি। অন্যদিকে আবার ভাবনাও আছে। হাত ধরে তাঁকে মসনদে বসিয়েছিলেন ক্লাইভ। তিনি ছিলেন তাঁর দোস্ত। বিপদে আপদে তাঁকে সালামত রেখেছিলেন কর্নেল সাহেব। তাঁর পরিবর্তে যিনি কলকাতার গভর্নর হবেন তিনি কি এমন দোস্ত হয়ে উঠবেন? বিপদের দিনে ক্লাইভের মতো পাশে এসে দাঁড়াবেন?

এই দোলাচল মন নিয়েই রবার্ট ক্লাইভকে বিদায় জানাতে নবাব ছুটে এলেন কলকাতায়। ক্লাইভের পরিবর্তে কে কলকাতার দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন এখনও ঠিক হয়নি। কর্নেল সাহেবকে বিদায় জানানোর পাশাপাশি এই ওয়াক্তে কলকাতা কাউন্সিলের বাকি সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্কটাকে ঝালিয়ে নিতে চান মিরজাফর খাঁ। এতদিন তিনি বুঝতেন ক্লাইভ মানেই কোম্পানি, আর কোম্পানি মানেই ক্লাইভ। কলকাতা কাউন্সিলের বাকি সদস্যদের নিয়ে তাঁকে কখনও মাথা ঘামাতে হয়নি। অনেকের সঙ্গে তাঁর ভালো করে

আলাপ-পরিচয়ও নেই। হলওয়েল, বীচার, মানিংহ্যাম প্রমুখ কাউন্সিলের সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্কটা সহজ করে নেওয়া দরকার। ক্লাইভ থাকুন বা না থাকুন সুবে বাংলায় ইংরেজ শক্তিকে উপেক্ষা করার কোনও উপায় নেই। এটুকু বুঝতে না পারার মতো বেওকুফ নন নবাব।

১৭৫৯ সালের অক্টোবর মাস। নবাব তখন কলকাতায়। সময় কাটাচ্ছেন ক্লাইভের সঙ্গে। আগামী দিনে কেমন করে চালাতে হবে নিজামতের শাসন ব্যবস্থা, কেমন করে রুখতে হবে দুশমনদের– সে বিষয়ে নানা উপদেশ দিচ্ছেন ক্লাইভ। বাধ্য ছাত্রের মতো সেসব মন দিয়ে শুনছেন মিরজাফর খাঁ। কখনও দু'জনে শিকার করতে যাচ্ছেন আদিগঙ্গা পেরিয়ে কলকাতা লাগোয়া সুন্দরবনের জঙ্গলে। কখনও বা গঙ্গার বুকে দু'জনে ভেসে বেড়াচ্ছেন বজরায়। কখনও আবার নবাবের অনারে দমদমার বাড়িতে মুজরোর আসর বসাচ্ছেন ক্লাইভ। বেশ কাটছিল দিনগুলো। কিন্তু এই মিঠে আবহ তিক্ত হয়ে উঠল অচানকই।

গঙ্গার বুকে নবাবের সঙ্গে বিহার করতে করতেই খবরটা পেলেন ক্লাইভ। মোহনা থেকে ফেরত এসেছে ইংরেজদের একটা মালবাহী নৌকা। মাঝিমাল্লারা নিয়ে এসেছে খবরটা। বিষয়টা গুরুতর। সাগরদ্বীপের কাছে নোঙর ফেলেছে ডাচদের সাত-সাতটা যুদ্ধজাহাজ। এসেছে সাতশো ওলন্দাজ ও আটশো দেশি সৈন্য।

খবরটা শুনেই ক্লাইভ কৈফিয়ত তলবের সুরে প্রশ্ন করলেন নবাবকে, 'আপনার মদত না থাকলে ডাচরা বাংলা মুলুকে যুদ্ধজাহাজ নিয়ে আসার হিম্মত দেখায় কী করে?'

হকচকিয়ে গিয়ে নবাব বললেন, 'এ ব্যাপারে আমি সচমুচ কিছু জানি না সাহেব।'

'আপনি যে সচ বলছেন তা বুঝব কেমন করে?'

চমকে গেলেন নবাব। এতকালের দোস্তের গলায় অবিশ্বাসের সুর।

ক্লাইভ বললেন, 'আগেও একবার ফৌজ নিয়ে আসার কোশিশ করেছিল ডাচেরা।'

'সেবার আমি কড়া চিঠি লিখে তাদের হুশিয়ার করেছিলাম।'

'লেকিন সুবে বাংলাকে বেচ্যায়েন করার কোশিশ তারা জারি রেখেছে।'

'আমাকে গলত সমঝবেন না সাহেব। আমি স্রেফ আপনাদেরই দোস্ত।'

'দ্য ডাচেস ওয়ান্ট টু ডেস্ট্রয় আস।'

মিরজাফর নিশ্চুপ।

ক্লাইভ ফের গজরালেন, 'নবাবের হুকুমতকে ইনকার করার হিম্মত রাখে ডাচেরা—যাই বলুন হুজুর, আই ফাইন্ড ইট ডিফিকাল্ট টু অ্যাকসেপ্ট দ্যাট।'

মিরজাফর মরিয়া গলায় বললেন, 'এই বেতমিজি আমি বরদাস্ত করব না।'

'আগেও আপনি এই কথাই বলেছিলেন। আপনার জবানে ভরসা রাখব কী করে?'

ক্রমশ কঠোর ও রুক্ষ হয়ে পড়ছে ক্লাইভের গলার আওয়াজ। এই আগুনে মেজাজের সামনে পড়ে রীতিমতো বেসামাল মিরজাফর খাঁ। বললেন, 'আমি তুরন্ত হুগলি ফিরে গিয়ে ডাচদের তলব করব। যদি তাদের যুদ্ধজাহাজগুলো ফওরান মোহনা ছেড়ে না চলে যায় তো খোদ আমি ফৌজ নিয়ে ধাওয়া করব তাদের। জাহাজগুলোকে দরিয়ায় ডুবিয়ে ছাড়ব।'

'বেশ তাই করুন।'

এ ঘটনার একদিন পরেই কলকাতা ছেড়ে হুগলি পথে যাত্রা করলেন নবাব।

ক্লাইভ নেমে পড়লেন নিজের কাজে। হাতে রয়েছে মাত্র তিনশো গোরা পল্টন, হাজার খানেক স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দেশি সেপাই ও চারটে ছোট আকারের যুদ্ধজাহাজ, তবুও ক্লাইভ আত্মবিশ্বাসী। ভাগ্যদেবী তাঁকে বরাবর সাহায্য করে এসেছেন। এবারেও নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন।

চন্দননগর থেকে ফরাসি শক্তিকে নির্মূল করা গিয়েছে। এখন যদি ডাচদের সঙ্গে একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়া সেরে নেওয়া যায় তো তাঁর লন্ডন যাত্রার প্রাক্কালে ষোলোকলা পূর্ণ হয়। আরও শক্ত জমির উপরে দাঁড়

করানো যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে। সুবে বাংলায় বিদেশি বণিক হিসেবে বিজয়কেতন ওড়াবে কেবল ইংরেজরা। প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ থাকবে না। ফের মনের মতো একটা কাজ জুটিয়ে দিয়েছেন বিধাতা। উত্তেজনায় ফুটতে লাগলেন ক্লাইভ।

আরাকান উপকূলে রয়েছেন অ্যাডমিরাল কর্নিস। তাকে খবর দেওয়ার জন্য চারটি জাহাজের মধ্যে ক্লাইভ পাঠালেন সবচেয়ে ছোট জাহাজটিকে। বাকি তিনটে জাহাজ রইল ফোর্ট উইলিয়ামের সুরক্ষায়। অ্যাডমিরাল কর্নিস এসে পড়লে শক্তি বাড়বে ইংরেজদের।

এরপরে টানা ও চার্নক ব্যাটারিতে কামান বসিয়ে সেনা মোতায়েন করলেন ক্লাইভ। কলকাতায় শোরগোল পড়ে গেল ফের যুদ্ধ বাধতে চলেছে। তবে এবারে আর লোকজনের মধ্যে কলকাতা ছেড়ে পালানোর হিড়িক নেই। ক্লাইভ আছেন, অতএব ভাবনা কীসের? তিনি ঠিক ঘায়েল করে ছাড়বেন ডাচদের। কলকাতার বেশির ভাগ লোকেরই মনোভাব কতকটা এই গোছের।

ক্লাইভ নিজে অবশ্য সামান্য বিচলিত। এবারে যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য দক্ষ সেনাপতির অভাব তাঁর বাহিনীতে। মেজর আয়ারকুট, লায়নেল ফোর্ড দক্ষিণে গিয়েছেন ফরাসিদের সঙ্গে লড়াই করতে। তাদের ফিরে আসার কোনও খবর নেই।

সংকট-সময়ে বরাবরই নসিবের দেবী আশির্বাদ করেছেন ক্লাইভকে। এবারেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। যুদ্ধের তোড়জোড় তখন চলছে, এই সময়ে মুসলিপত্তনম জয় করে যুদ্ধজাহাজ নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন কর্নেল ফোর্ড ও ক্যাপটেন নকস। ক্লাইভ উল্লসিত হয়ে উঠলেন। টানা ও চার্নক ব্যাটারির দায়িত্ব দিলেন নকসকে। কর্নেল ফোর্ডের উপরে রইল বাকি ফৌজ চালনা করার দায়ভার।

কিছুদিন পরে কলকাতায় কড়া একটা চিঠি পাঠালেন ডাচ গভর্নর বিসডাম।

লিখলেন, '...আপনারা যদি ডাচ জাহাজ বা নৌকোয় তল্লাশি বন্ধ না করেন তো এর জন্যে চরম মূল্য চোকাতে হবে আপনাদের...'

ক্লাইভ জবাব দিলেন, '...আপনাদের কোনও ক্ষতি তো আমরা করছি না, এদেশ সওদা করার জন্য নবাবের কাছ থেকে যে সব সুবিধা আপনারা পেয়েছেন, তা নিয়েও উই আর নট বদার্ড। আপনাদের নৌকো বা জাহাজ সার্চ করার অধিকার আমাদের দিয়েছেন নবাব। এ ব্যাপারে কিছু বলার থাকলে আপনারা নবাবকে বলতে পারেন। বরং আপনাদের নামে এই ইলজাম আমি আনতে পারি যে, যুদ্ধজাহাজ নিয়ে এসে আপনারা বাংলাকে বেচ্যায়েন করছেন। ফওরান জাহাজগুলোকে ফিরে যেতে বলুন, আদারওয়াইজ উই উইল গিভ ইউ অ্যা বিফিটিং রিপ্লাই।...'

এই চিঠি পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ডাচেরা। ততক্ষণে তাদের জাহাজগুলো ফলতা পর্যন্ত চলে এসেছে। আর চিঠি চালাচালির পথে না গিয়ে প্রত্যক্ষ সংঘাতের পথ নিল তারা। ফলতার কাছে নোঙর করেছিল ইংরেজদের কয়েকটা মালবাহী ভড়। ডাচেরা এগুলো দখল করে নিয়ে সব মালপত্র কেড়ে নিল, মাঝিমাল্লাদের বন্দি করল আর নৌকার উপরে উড্ডীন ব্রিটিশ পতাকাগুলোকে ছিঁড়ে আগুনে পুড়িয়ে দিল। অ্যাডমিরাল কর্নিসের খোঁজে যে জাহাজটি আরাকানের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল সেটিও ডাচেদের হাতে বন্দি হল। এখানেই শেষ নয়, ডাঙায় নেমে ডাচ সৈন্যরা ইংরেজ এজেন্টের ঘরবাড়ি ও মালের গুদামে আগুন ধরিয়ে দিল। এসব খবর ক্লাইভের কানে এসে যখন পৌঁছল, ডাচ জাহাজগুলো তখন ফলতা ছাড়িয়ে সাঁকরাইলের কাছে এসে হাজির হয়েছে।

কী করে লড়াইটা শুরু করবেন, এই লড়াইয়ের অনিবার্য কারণ নিয়ে কোন যুক্তির জাল বুনবেন - এসব নিয়ে ক্লাইভ বেশ দুশ্চিন্তায় ছিলেন। কারণ বিষয়টা গুরুতর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংরেজদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রয়েছে ডাচদের। বাংলায় ইংরেজদের হাতে ডাচেরা প্রথমে আক্রান্ত হলে ক্লাইভ ও কলকাতা কাউন্সিলকে কোম্পানির ডিরেক্টরদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এমনকি গভর্নর ও গোটা কলকাতা কাউন্সিলের

উপরে শাস্তির খাঁড়া নেমে আসতে পারে। হুগলি নদীর বুকে ডাচেদের কাণ্ডকারখানা এই সমস্যার সমাধান করে দিল। ক্লাইভ বুঝলেন, লড়াইয়ের কারণ হিসেবে সহজেই এবারে আত্মরক্ষার যুক্তি সাজানো যাবে।

সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছেড়ে ক্লাইভ এবারে রণংদেহী মেজাজে আসরে নেমে পড়লেন।

নবাবকে চিঠি লিখে জানালেন, '...ডাচ নওয়ারা বাংলায় এসে কী কাণ্ড ঘটিয়েছে শুনলে আপনার রক্ত হিম হয়ে যাবে। আমরা শান্তির পক্ষে। বাংলাকে বেচ্যায়েন করতে চাই না কিন্তু ডাচেরা যা কাণ্ড ঘটালো তাতে লড়াই অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এই লড়াই ইউরোপের দুই দেশের। এটা দুই পক্ষকে বুঝে নিতে দিন। আই অ্যাম এক্সপেক্টিং নিউট্রালিটি ফ্রম ইওর এন্ড।...'

চিঠিটা পাঠিয়েই কর্নেল ফোর্ডকে ডেকে ক্লাইভ বললেন, 'কুইকলি প্রসিড টুয়ার্ডস চিনসুরা।'

বেরিয়ে পড়লেন ফোর্ড। সঙ্গে একশো গোরা সৈন্য, চারশো দেশি সেপাই ও চারটে ফিল্ড পিস কামান। বরানগরে ছিল ডাচেদের একটা কুঠি। সেই কুঠি আক্রমণ করলেন ফোর্ড। যে সামান্য সংখ্যক ডাচ-সৈন্য মোতায়েন ছিল কুঠির সুরক্ষায়, ইংরেজবাহিনীর দাপটে তারা কুঠি ছেড়ে ছিপনৌকো নিয়ে পালিয়ে গেল চুঁচুড়ায়। ডাচ কুঠিয়াল আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। বরানগরের কুঠিও ইংরেজদের দখলে এল। এরপরে হুগলি নদী পেরিয়ে শ্রীরামপুর হয়ে ফৌজ নিয়ে চুঁচুড়ার উদ্দেশে মার্চ করতে লাগলেন ফোর্ড। চন্দননগরে গেরেটির বাগানে ঘাঁটি গাড়লেন।

সাঁকরাইলে বেশ কিছু ডাচ সৈন্য জাহাজ থেকে ডাঙায় নেমে চুঁচুড়ার উদ্দেশে এগোতে লাগল। এই খবর পেয়ে ফোর্ডের উদ্দেশে দ্রুত একটা চিঠি পাঠালেন ক্লাইভ। লিখলেন, '...বাটাভিয়া থেকে আসা ডাচ সৈন্যরা চুঁচুড়ার দিকে যাচ্ছে। তারা সেখানে পৌঁছনোর আগেই ডাচ ঘাঁটি দখল করে নিতে হবে, যাতে ডাচ সৈন্যরা ফোর্ট গুস্তাভাসে আশ্রয় না নিতে পারে।...'

ওদিকে ক্যাপটেন নকসের উপরে হুকুম হল, টানা ও চার্নক ব্যাটারি থেকে ফৌজিদের নিয়ে কর্নেল ফোর্ডকে অনুসরণ করো।

ইংরেজদের ক্ষুদ্র নৌবহরের অধিনায়ক কমোডোর উইলসনের উদ্দেশে ক্লাইভ লিখলেন, '...সাঁকরাইলে গিয়ে হুগলি নদীর বুকে ডাচ জাহাজগুলোকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দাও। যাতে ফোর্ডের হাতে আক্রান্ত হলে পিছু হটে ডাচ সৈন্যরা জাহাজে ফের আশ্রয় না নিতে পারে।...'

ক্লাইভের স্ট্র্যাটেজি হল একই সঙ্গে জল ও স্থল, সাঁকরাইল ও চুঁচুড়া দুই জায়গাতেই ডাচ ঘাঁটি একসঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া, যাতে অপরিচিত বাংলায় সদ্য পা রাখা বাটাভিয়া থেকে আসা ডাচ সৈন্যরা কোথাও আশ্রয় না পায়।

ইংরেজদের ক্ষুদ্র নৌবহরের কমান্ডার-ইন-চিফ, কমোডর উইলসনের সম্বল তিনটে মাত্র ছোট্ট জাহাজ—ডিউক অফ ডরসেট, ক্যালকাটা ও হার্ডউইক। কলকাতা শহরের সুরক্ষায় নদীর বুকে মোতায়েন ছিল এই জাহাজগুলো। এই তিনটি জাহাজ নিয়ে সাঁকরাইলে গিয়ে পৌঁছলেন উইলসন। দুপক্ষের ঘনঘন তোপ দাগার শব্দে কেঁপে উঠল সাকরাইল। ২৪ নভেম্বর, ১৭৫৯। মাত্র দু'ঘণ্টার কুশলী লড়াইয়ে ডাচ নৌবহরকে বিপর্যস্ত করে দিলেন উইলসন। ডাচ কমোডরের জাহাজ ভ্লিসিনজেন ডুবল গঙ্গায়। আগুনে পুড়ে ধ্বংস হল চারটে জাহাজ। প্রাণ হারাল বেশ কিছু ডাচ সেনা। ক্ষতবিক্ষত তিনটে জাহাজ কোনওরকমে নোঙর তুলে পালাল সাগরদ্বীপের উদ্দেশে। ইংরেজদের জাহাজগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হলেও হতাহতের সংখ্যা খুবই কম। ওদিকে প্রাণ হারাল বহু ডাচ সৈন্য। শুধু ভ্লিসিনজেনেই নিহত হল তিরিশ জন। আহত হল এর দ্বিগুণেরও বেশি ডাচ সেনা।

ইংরেজদের জাহাজ—ডিউক অফ ডরসেট, ক্যালকাটা ও হার্ডউইক মারাত্মক জখম। পালিয়ে যাওয়া ডাচ জাহাজগুলোকে তাড়া করার ক্ষমতা নেই তাদের। তবুও ডাচেদের কপাল মন্দ। এই সময় দক্ষিণ থেকে

কলকাতায় ফিরছিল ইংরেজদের জাহাজ—রয়্যাল জর্জ ও অক্সফোর্ড। কুলপির কাছে এই দুটি জাহাজ সাঁকরাইল থেকে পালিয়ে যাওয়া ডাচ জাহাজগুলোর পথ আটকে দিল।

বিকেল শেষের আলোয় ডিউক অফ ডরসেটের ডেকের উপরে এসে দাঁড়ালেন কমোডর উইলসন। হাতে মস্ত এক ব্রিটিশ পতাকা। অদূরে কাত হয়ে গিয়ে জলে ডুবছে ডাচ অধিনায়কের জাহাজ ভ্লিসিনজেন। কিছু দূরে দাউ দাউ করে জ্বলছে আরও তিনটে ডাচ জাহাজ। বিজয় গর্বে আকাশে ইউনিয়ন জ্যাক ওড়াতে লাগলেন উইলসন। সামান্য শক্তি নিয়ে আলিসান ডাচ নৌবহরকে বিধ্বস্ত করে, সাঁকরাইলের জলযুদ্ধে তিনি ইতিহাস রচনা করলেন।

জলের লড়াই খতম। এবারে ডাঙার লড়াই।

চালে মস্ত এক ভুল করলেন ডাচ গভর্নর বিসডাম। ইংরেজ বাহিনীর পিছন দিক থেকে মার্চ করে আসছে সাঁকরাইলে নেমে পড়া প্রায় পনেরোশো ডাচ সৈন্য। চুঁচুড়া থেকে তারা তখন মাত্র একদিনের পথ দূরে। এরা এসে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলে সামনে ও পিছন থেকে যুগপৎ আক্রমণ করে, ইংরেজদের কড়া প্রতিরোধের মুখে ফেলতে পারতেন বিসডাম। নিজের আহাম্মকিতে এই সুযোগ তিনি হাতছাড়া করলেন।

গেরেটির বাগানে ফৌজ নিয়ে ফোর্ডের পৌঁছনোর কথা শুনেই বিসডাম ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি ঠিক করলেন এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ করে চন্দননগর থেকে ইংরেজ ফৌজকে বিতাড়িত করবেন। এই পরিকল্পনা মতো ফোর্ট গুস্তাভাস খালি করে দেড়শোজন ডাচ ও তিনশোজন দেশি সেপাই চন্দননগরের দিকে এগিয়ে এল।

সাঁকরাইলে জলের উপরে যখন লড়াই চলছে ঠিক তখনই ডাচদের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই বেঁধে গেল চন্দননগরে। ডাচ সৈন্যরা এদেশে কখনও যুদ্ধ করেনি। লড়াইয়ে তারা অনভিজ্ঞ। দক্ষ সেনাপতি ফোর্ডের সামনে পড়ে তারা দিশেহারা হয়ে গেল। ঘনঘন তোপ দেগে তাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন ফোর্ড। ক্লাইভের সঙ্গে দোস্তির কিস্মত চোকাতে একশো ঘোড়সওয়ার পাঠিয়েছিলেন নবাব মিরজাফর খাঁ। তবে ডাচদের উপরে হামলা করার কোনও হুকুম ছিল না তাদের উপরে। মূলত গুপ্তচরবৃত্তির উদ্দেশে তাদের পাঠিয়েছিলেন নবাব। নিজামতের ঘোড়সওয়াররা চন্দননগর থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল কী হয় এই লড়াইয়ের পরিণতি।

অনভিজ্ঞ ডাচ বাহিনীকে দুরমুশ করে দিলেন কর্নেল ফোর্ড। এখানেও মাত্র কয়েকঘণ্টার মধ্যেই লড়াইয়ের নিস্পত্তি হয়ে গেল। ছত্রভঙ্গ ডাচবাহিনী পিছু হটতে লাগল। অনেক ডাচ সেনা বন্দি হল ফোর্ডের হাতে। তাদের রসদ, অস্ত্রসস্ত্র কেড়ে নিয়ে নিজের শক্তি বাড়িয়ে নিলেন ফোর্ড। বিধ্বস্ত, আহত সামান্য কয়েকজন ডাচ সৈন্য পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল ফোর্ট গুস্তাভাসে।

লড়াই শেষ করে সন্ধের মুখে গেরেটির বাগানে নিজের ক্যাম্পে ফিরলেন ফোর্ড। ওদিকে সাঁকরাইলে হুগলি নদীর বুকে ডিউক অফ ডরসেটের ডেকের উপরে দাঁড়িয়ে কমোডর উইলসন তখন বিজয় পতাকা ওড়াচ্ছেন। একই দিনে জলে ও স্থলে দুই জায়গাতেই জবরদস্ত ঝটকা খেল ডাচবাহিনী। তাদের ভরসা তখন কেবল বাটাভিয়া থেকে আসা চুঁচুড়ার দিকে ধাবমান সৈন্যরা।

সেদিনই সন্ধেবেলা কয়েকশো সৈন্য নিয়ে টানা দুর্গ থেকে মার্চ করে গেরেটির বাগানে এসে পৌঁছলেন ক্যাপ্টেন নকস। তাঁর সঙ্গে আসা কনটিনজেন্টদের নিয়ে ফোর্ডের হাতে তখন তিনশো কুড়ি জন গোরা পল্টন, আটশো দেশি সেপাই ও পঞ্চাশজন ঘোড়সওয়ার। সংখ্যার নিরিখে দুই দল প্রায় সমান সমান। ইংরেজ গুপ্তচরেরা খবর নিয়ে এল ডাচ সৈন্যরা চন্দননগরের কাছাকাছি এসে পড়েছে। আগামিকাল ভোরেই

পৌঁছে যাবে। চূড়ান্ত লড়াইয়ের স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে নকসের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন ফোর্ড। দু'জনে এক বিচিত্র সমস্যার মুখোমুখি হলেন।

ক্লাইভের কথায় ফৌজ নিয়ে গেরেটির বাগানে ঘাঁটি গেড়েছেন ফোর্ড ও নকস। ফোর্ড ডাচদের সঙ্গে একপ্রস্থ লড়াইও সেরে ফেলেছেন। পরিস্থিতি যা তাতে আগামিকাল চূড়ান্ত লড়াই অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এখনও কলকাতা কাউন্সিলের তরফ থেকে লড়াইয়ের জন্য কোনও লিখিত নির্দেশ নেই।

নকস শুধোলেন, 'উড ইট বি ওয়াইজ টু ফাইট এগেইন্সট দ্য ডাচ ডেসপাইট এনি রিটেন অর্ডার ফ্রম কাউন্সিল?'

তাঁবুর বাইরে খোলা আকাশের নীচে আলোচনায় বসেছেন দুই ইংরেজ সেনাপতি। পাশে জ্বলছে আগুন। অঘ্রাণের শেষেই বেশ ঠান্ডা পড়েছে। আগুনে একটা কাঠ গুঁজে দিয়ে নকসের কথার প্রত্যুত্তরে ফোর্ড বললেন, 'ঠিকই বলেছ। এ নিয়ে আমিও চিন্তিত।'

'উই ক্যান্ট ইগনোর দ্য ফরেন পলিসি অফ আওয়ার নেশন।'

'রাইট। উই হ্যাভ ফ্রেন্ডলি রিলেশন উইথ দ্য ডাচ ইন ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ড।'

'কাউন্সিলের অর্ডার ছাড়া লড়াই করলে উই মে বি অ্যাকিউসড লেটার।'

'তুমি বলছ ভার্বাল অর্ডারের কথা ডিনাই করবেন ক্লাইভ?'

'করতেও তো পারেন। যদি এই লড়াইয়ের জন্য ডিরেক্টরেরা তাঁকে শোকজ করে?'

জ্বলন্ত আগুনের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন ফোর্ড। তারপর বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম মি. ক্লাইভ উইল ডেসপ্যাচ দ্য অর্ডার ইন টাইম।'

'বাট দ্য রিয়েল স্টোরি ইজ উই নট ইয়েট রিসিভড দ্যাট।'

'ডাচ কনটিনজেন্ট উইল রিচ হেয়ার টুমরো।'

'সো হোয়াট টু ডু?'

হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে ফোর্ড বললেন, 'লেট আস সেন্ড অ্যা রিমাইন্ডার টু মি. ক্লাইভ।'

ক্লাইভের উদ্দেশে ফোর্ড লিখলেন, '... ডাচ কনটিনজেন্ট চন্দননগরের কাছাকাছি এসে পড়েছে। তাদের স্ট্রেনথ সম্বন্ধে যা খবর আমি পেয়েছি তাতে মনে করি লড়াই হলে অনায়াসে ডাচদের হারিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু লড়াই করার জন্য কলকাতা কাউন্সিলের অর্ডার কোথায়? প্লিজ সেন্ড দ্য রিটেন অর্ডার অ্যাট দ্য আরলিয়েস্ট।...'

ফোর্ডের দুই প্রতিনিধি চিঠিটা নিয়ে সন্ধেবেলা ক্লাইভের দমদমার বাড়িতে যখন পৌছল তখন সেখানে হইহুল্লোড় চলছে। সাঁকরাইলের যুদ্ধে ডাচদের ডিবাকলের খবর পেয়ে সেলিব্রেশনে মেতেছেন ক্লাইভ ও কলকাতা কাউন্সিলের অন্যান্য মেম্বাররা। সকলে তাসের জুয়ায় মত্ত।

জুয়ার আসরে প্রবেশ করে ক্লাইভের হাতে চিঠিটা ধরিয়ে দিলেন মুনশি নবকৃষ্ণ।

তাস বাঁটতে গিয়ে থমকালেন ক্লাইভ। বিরক্তির সঙ্গে শুধোলেন, 'হোয়াট হ্যাপেন্ড মুনশি?'

'চিঠি। কর্নেল ফোর্ড পাঠিয়েছেন।'

বা হাতে চিঠিটা নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরলেন ক্লাইভ। চিঠিটা পড়ে মুচকি হাসলেন।

'এখন রিপ্লাই দেবেন কি হুজুর?'

'রিপ্লাই? ওয়েল। একটা পেনসিল নিয়ে এসো।' তাসের বাজি জেতার নেশায় মত্ত ক্লাইভ বেশ বিরক্ত হলেন। বিরক্তিটা প্রকাশ পেল মুখের অভিব্যক্তিতে। যাই হোক, পেনসিল দিয়ে ফোর্ডের চিঠিরই উলটো দিকে ক্লাইভ লিখলেন, 'ডিয়ার ফোর্ড– ফাইট দেম ইমিডিয়েটলি। আই উইল সেন্ড ইউ দ্য অর্ডার ইন কাউন্সিল টুমরো।' কাগজটা নবকৃষ্ণর হাতে ধরিয়ে দিয়ে ফের তাস বাঁটতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ক্লাইভ।

গভীর রাতে গেরেটির বাগানে ফিরে এল ফোর্ডের দুই প্রতিনিধি।

ক্লাইভের নিজের হাতে পেন্সিলে লেখা মেসেজটি পড়ে সন্তুষ্ট হলেন ফোর্ড ও নকস। আরও অনেকের মতো তাঁদের কাছেও ক্লাইভ মানে কাউন্সিল আর কাউন্সিল মানে ক্লাইভ।

২৫ নভেম্বর। ১৭৫৯ সাল।

চন্দননগর ও চুঁচুড়ার মাঝখানে প্রকাণ্ড এক ডাঙা। বুনো ঝোপঝাড় আগাছায় ভর্তি। এই ডাঙার উপর দিয়ে উত্তর মুখে চলে গিয়েছে চুঁচুড়া যাওয়ার রাস্তা। ডানদিকে রয়েছে বেদারা নামে ছোট্ট একটা গ্রাম। সেই থেকে এই ডাঙা 'বেদারার ডাঙা' নামে পরিচিত। এর বাঁ দিকে রয়েছে মস্ত এক আমবাগান। বেদারার ডাঙা পেরোনোর পর চুঁচুড়ার দিকে রয়েছে ঘাস-আগাছায় ঢাকা বেশ চওড়া একটা নালা। প্রায় সাত-আট ফুট গভীর। বর্ষায় জলে টইটম্বুর থাকে। শীতের মরসুমে শুকিয়ে যায়। এই মুহূর্তে জল নেই নালায়। গোটা নালা ভরে আছে জংলি ঘাসে।

ভোরের আলো ফুটতেই এই নালার কিনারা বরাবর কামান বসালেন ফোর্ড। চারটে ফিল্ড পিস কামান। কৌশলগত অবস্থান অনুযায়ী এই নালা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ডাচ সৈন্যরা নালা টপকে চট করে ইংরেজ বাহিনীর ঘাড়ের উপরে হামলা করতে পারবে না।

সকাল দশটা নাগাদ দেখা মিলল ডাচবাহিনীর। ক্যাপটেন রাসেলের নেতৃত্বে তারা এগিয়ে আসছে দ্রুত। উপুড় হয়ে শুয়ে মাটির সঙ্গে প্রায় মিশে রইল ইংরেজ সৈন্যরা। ডাচবাহিনী কামানের পাল্লার মধ্যে আসতেই এক সঙ্গে গর্জন করে উঠল চারটে ফিল্ড পিস কামান।

দুম! দুম! দুম! দুম!

শত্রু যে পথের উপরে ঘাঁটি গেড়ে আছে তা আন্দাজই করতে পারেনি ডাচবাহিনী। তার উপরে অচিন দেশ। পথঘাট অচেনা। দিশেহারা হয়ে পড়ল ডাচ সৈন্যরা। এমনিতেই সাঁকরাইল থেকে দীর্ঘ পথ হেটে আসার ধকলে তারা ক্লান্ত। পথে যে যুদ্ধ করতে হবে তারা মোটেও ভাবেনি। তেমন কোনও সতর্কতাও অবলম্বন করেনি তারা। গোলন্দাজ বাহিনী, পদাতিক সেনা কেউই প্রস্তুত নয়।

ওদিকে তখন একনাগাড়ে তাদের দিকে ছুটে আসছে কামানের গোলা। ছুটে গিয়ে শত্রুপক্ষের ঘাড়ের উপরে লাফিয়ে পড়ে হাতাহাতি লড়ারও উপায় নেই। প্রতিবন্ধক বিরাট চওড়া নালা।

লড়াইয়ের ময়দানে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একবার দিশেহারা হয়ে পড়লে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। কাজেই ইংরেজদের তোপের সামনে ডাচ সৈন্যরা পোকামাকড়ের মতো মরতে লাগল। চারিদিকে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। অনেক চিৎকার চেঁচামেচি করেও নিজের বাহিনীকে সংহত করতে পারছেন না ক্যাপটেন রাসেল।

এরই মধ্যে নালার গর্ভে আশ্রয় নিয়ে লুকিয়ে থাকা ইংরেজ ঘোড়সওয়ার বাহিনী আচমকা যেন মাটি ফুঁড়ে উপরে উঠে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ডাচেদের উপরে। পঞ্চাশজন মাত্র দক্ষ ঘোড়সওয়ার। তাতেই বাজিমাত। লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে উদভ্রান্তের মতো ছুটতে লাগল ডাচেরা। তাদের পরাজয় নিশ্চিত বুঝে ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে এসে যোগ দিল নবাবের পাঠানো একশো ঘোড়সওয়ার। বিদেরার ডাঙায় মাত্র কয়েকঘণ্টার মধ্যেই জিত হাসিল করে নিলেন কর্নেল ফোর্ড ও নকস। ভালো করে গোলাগুলি ছোড়ারই অবকাশ পেল না ডাচেরা। ইংরেজ বাহিনী মোটামুটি অক্ষত। ওদিকে ইংরেজদের ছোড়া গোলায় ও ঘোড়সওয়ারদের হানাদারিতে প্রাণ হারাল প্রায় একশো কুড়ি জন ডাচ সৈন্য ও মালয় থেকে আসা প্রায় তিনশো সেপাই।

রক্তে ভিজল বেদেরার ডাঙা। তাজা লাশের লোভে আকাশে চক্কর কাটতে লাগল শকুনের দল। সাঁকরাইলের পর বেদারা। ইউনিয়ন জ্যাক আকাশে উড়িয়ে ফের উল্লাসে মাতল ইংরেজবাহিনী। সুবে বাংলায়

ডাচ-সূর্য অস্তাচলে গেল।

চোদ্দোজন অফিসারসহ ক্যাপটেন রাসেল ও বহু ডাচসেনা বন্দি হলেন ইংরেজদের হাতে। বেদেরার মাঠ থেকে কোনও রকমে পালিয়ে চুঁচুড়ায় পৌঁছতে পেরেছিল মাত্র কুড়ি-পঁচিশজন সৈন্য।

লড়াইটা মোটেই সহজ ছিল না। সাঁকরাইলের যুদ্ধে যদি ইংরেজদের পরাজয় হত আর বেদেরার ফলাফল যদি অন্যরকম কিছু হত, তবে বিফলে যেত ফোর্ট উইলিয়াম পুনর্দখলের সংগ্রাম, হালসিবাগানের লড়াই, পলাশির যুদ্ধ, ক্লাইভের গত দু'বছরের পরিশ্রম। পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ার নিয়ে প্রস্তুত হয়েছিল মিরন। ইংরেজরা বেকায়দায় পড়লে ডাচদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ত কলকাতার উপরে। নিজামতের প্রচ্ছন্ন মদত থাকলেও ডাচদের দুর্ভাগ্য হল এই যে, ক্লাইভের মতো দক্ষ সেনাপতি তাদের ছিল না। সেনা সংখ্যায়, রসদে, যুদ্ধ উপকরণে ইংরেজদের থেকে সামান্য এগিয়ে থাকলেও ক্লাইভের স্ট্র্যাটেজির কাছে একতরফা হার হল তাদের।

ফরাসিরা শেষ হয়েছিল আগেই। বেদেরার প্রান্তরে ডাচ-স্বপ্নের সমাধি ঘটল। সুবে বাংলায় ইংরেজদের সঙ্গে বাণিজ্য উদ্যোগে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা আর রইল না তাদের। চন্দননগরের ফরাসিদের মতো চুঁচুড়ার চৌহদ্দিতে আবদ্ধ হয়ে সুবে বাংলায় কোনওরকমে টিকে রইল ডাচেরা।

চুঁচুড়া থেকে দূত এসেছে। নবকৃষ্ণ ছুটে গিয়ে বেদারার যুদ্ধে জয়লাভের খবরটা দিলেন ক্লাইভকে। সব শুনেও ক্লাইভ অবিচল। তিনি তখন দমদমার হাভেলির পাশের জঙ্গলে পাখি শিকারে ব্যস্ত। কোনও ভাবলেশ নেই। এত বড় যুদ্ধজয়, তবুও নেই উল্লাসের কোনও বহিঃপ্রকাশ। অবাক হলেন নবকৃষ্ণ। দু'বছর ধরে কাছ থেকে দেখছেন তবুও মানুষটাকে এখনও ঠিকমতো চিনে উঠতে পারলেন না মুনশিজি। সাহেবের মনের গতির তল পাওয়া মুশকিল।

আকাশের পানে উদ্যত বন্দুকের নল। উড়ছে একপাল বক। ক্লাইভের নজর সেদিকে। ট্রিগার টিপলেন পরপর দু'বার। অব্যর্থ নিশানা। দুটো বক খসে পড়ল মাটিতে। পাখির সন্ধানে ছুটল কুলি মজুররা। বন্দুকটা দেহরক্ষী স্ট্রেনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে পাইপ ধরালেন ক্লাইভ।

নবকৃষ্ণ জোড়হাত হয়ে বললেন, 'আপনাকে যত দেখছি তত তাজ্জব বনে যাচ্ছি হুজুর। এত বড় একটা লড়াই জিতে নিলেন, অথচ এতটুকু উল্লাস নেই আপনার?'

মুচকি হেসে ক্লাইভ বললেন, 'লড়াইয়ের ফলাফল কী হবে আমি জানতাম।'

'জানতেন?' বিস্ফারিত চোখে ক্লাইভের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন নবকৃষ্ণ।

'ফোর্ড ও নকসের উপরে আমার একিন ছিল।'

কথাটায় যেন নবকৃষ্ণর ঠিক প্রত্যয় হল না।

ধোঁয়ার কুণ্ডলী উড়িয়ে ক্লাইভ বললেন, 'ফোর্ডের পাঠানো চিঠির ভাষা আমাকে এই ভরসা দিয়েছিল। আসলে সবটাই হল স্ট্র্যাটেজি মুনশি। যুদ্ধ হল একটা অঙ্ক। নিখুঁত হিসেব নিকেশের কারবার। ঠিকঠাক অঙ্ক কষতে পারলে জিত তোমার হবেই। ডাচেরা আমাদের সঙ্গে লড়াই বাধাতে চেয়েছিল, ওদের তাগদ আমাদের থেকে খুব কম কিছু ছিল না, কিন্তু ওরা হোমওয়ার্ক করেনি। লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাই এই হাল হল ওদের।'

'আপনি তো লন্ডনে ফিরে যাবেন, তখন কী হবে কোম্পানির? তারা কী এখনকার মতো এই তাগদ বজায় রাখতে পারবে?' শুধোলেন নবকৃষ্ণ।

মুচকি হাসলেন ক্লাইভ। কপালের ঘাম মুছে বললেন, 'আর তো না পারার মতো কিছু নেই। ফরাসিরা নেই। ডাচেরা শেষ হল। নবাব মিরজাফর খাঁ কোম্পানির হাতের পুতুল। আর কী চাই?'

বুলেট বিদ্ধ বক দুটোকে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে এল এক দাখিলা। শিকারির কামেয়াবির স্মারক।

ক্লাইভ সেদিকে ফিরেও তাকালেন না। যা ঘটে গিয়েছে তা নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকা তাঁর ধাতে নেই। তাঁর মন তোলপাড় করছে ভবিষ্যতের ভাবনা।

ক্লাইভ বললেন, 'চলো মুনশি ফেরা যাক। একটা চিঠি পাঠাতে হবে নবাবকে।'

জঙ্গলের মধ্যে শুঁড়িপথ ধরে দ্রুত হাঁটতে লাগলেন ক্লাইভ। বন্দুক হাতে সামনে হেঁটে চলেছে স্ট্রেন। পিছনে নবকৃষ্ণ। তাঁর পিছনে লটবহর নিয়ে চলেছে কুলি-মজুর, গোলাম-দাখিলারা।

হাঁটতে হাঁটতে স্ট্রেনের উদ্দেশে শুধোলেন, 'তুমি কি লন্ডনে ফিরে যেতে চাও?'

'নো স্যার।'

স্ট্রেন ফের বলে, 'আপনি চলে গেলে আই উইল কুইট দিস জব।'

'দেন?'

'এখানেই থেকে যাব। সওদা করব। সাদি করব। ফলেন ইন লাভ উইথ অ্যা কান্ট্রি গার্ল।'

'কান্ট্রি গার্ল?' কৌতূহলী গলায় প্রশ্ন করেন ক্লাইভ। হাসছে তাঁর চোখদুটো।

'হার নেম ইজ বিদ্যা।'

'ওঃ দ্যাট গার্ল। যাকে তুমি রাজমহলে রেসকিউ করেছিলে।'

'ইয়েস স্যার।' লাজুক গলায় জবাব দেয় স্ট্রেন।

নবকৃষ্ণ বলে ওঠেন, 'স্ট্রেন সাহেব রসে ফ্লোটিং স্যার। আমাকে সব কথাই বলে।'

স্ট্রেনের পিঠে হাত রেখে ক্লাইভ বললেন, 'ওয়েল। সওদা করবে যে, ক্যাপিটাল কোথায়?'

স্ট্রেন নিরুত্তর। চুপচাপ হাঁটতে থাকে।

দমদমার বাড়িতে ফিরে মুনশি নবকৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে নবাবের চিঠিটা মুসাবিদা করতে বসলেন ক্লাইভ। লিখলেন, '...হুজুর আপনি শুনলে খুশি হবেন যে সুবে বাংলাকে বেচ্যায়েন করার যে মতলব ডাচেরা করেছিল, তা আমি বানচাল করে দিয়েছি। সাঁকরাইল ও বেদারার লড়াইয়ে মুসিবত হয়েছে ডাচেদের। ইয়াদ রাখবেন ইংরেজরা আপনার দোস্ত। আমরা থাকতে কেউ এই সুবে বাংলায় আপনার তকলিফের কারণ হয়ে উঠতে পারবে না।

'মাস দুয়েক পরে আমি ইংল্যান্ডের পথে রওনা হব। আমার জায়গায় কোম্পানির ফৌজের জিম্মেদারি নেবেন মেজর ক্যাইলোড। আমি রওনা হওয়ার আগেই দক্ষিণ থেকে এসে পড়বে সে। মেজর ক্যাইলোড কাবিল ইনসান। আপনাকে সে সালামত রাখতে পারবে। মেজর ক্যাইলোড কলকাতায় পৌঁছলেই আপনার সঙ্গে মোলাকাত করার জন্য তাঁকে পাঠিয়ে দেব মুর্শিদাবাদে।

'কলকাতা কাউন্সিলের নতুন গভর্নর হবেন হেনরি ভ্যানসিটার্ট। তিনি এখন দক্ষিণে রয়েছেন। ওদিককার কাজ সেরে কলকাতায় আসতে তাঁর কয়েকমাস সময় লাগবে। আমি লন্ডনের পথে রওনা হওয়ার পর অল্প কিছু দিনের জন্য কলকাতা কাউন্সিলের গভর্নরের দায়িত্ব সামলাবেন মি. হলওয়েল। তাঁর সঙ্গে তো আপনার আলাপ আছে, আর মি. ভ্যানসিটার্টকে চিঠিতে আপনার বিষয়ে সব কথা আমি জানিয়ে যাব। আশা করি আপনার কোনও তকলিফ হবে না। আপনি সহি সালামত খুশ তবিয়ত থাকবেন।...'

ফারসিতে চিঠি মুসাবিদা করে ক্লাইভকে পড়ে শোনালেন নবকৃষ্ণ।

ক্লাইভ বললেন, 'ওয়েল। চিঠিটা চটপট পাঠিয়ে দাও।'

নবকৃষ্ণ বললেন, 'গোস্তাকি মাফ করবেন হুজুর। ইজাজত দেন তো এক বাত গুজারেশ করি।'

'বলো।' একটু অবাক হয়ে নবকৃষ্ণর মুখপানে চাইলেন ক্লাইভ।

'নবাব যে তলায় তলায় ডাচদের মচত দেওয়ার কথা ভাবছিলেন, নবাবজাদা মিরন পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ার নিয়ে ডাচেদের মদত দেওয়ার জন্য তৈয়ার ছিলেন, আপনি তো জানতেন।'

'জানতাম।'

'এ নিয়ে নবাবের উপরে কোনও ইলজাম আনলেন না তো চিঠিতে?'

মুচকি হাসলেন ক্লাইভ।

'নবাবের উপরে আপনার গুসসা নেই?'

'মনের অন্দরের সব কথা খুলে বলতে নেই মুনশি। এও এক কৌশল। চিঠিটা পাঠিয়ে দাও।'

চেয়ারের গায়ে গা এলিয়ে দিলেন ক্লাইভ। বিদায় নিলেন নবকৃষ্ণ।

এরপর স্ট্রনকে তলব করলেন ক্লাইভ।

'ইয়েস স্যার।' ঘরে ঢুকে ক্লাইভকে সেলাম জানাল স্ট্রন।

দেরাজ খুলে একটা চামড়ার খেরিয়া বের করে ক্লাইভ বললেন, 'গোরস্থানে তুমি আমাকে সাপের ছোবল থেকে বাঁচিয়েছিলে, লেকিন কোনও ইনাম দেওয়া হয়নি তোমায়। এই তোমার ইনাম। নাও। টেক ইট।'

স্তম্ভিত হয়ে গেল স্ট্রন। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

'নাও। টেক ইট। সওদা কোঁড়ার ক্যাপিটাল।'

ধীর পায়ে এগিয়ে এসে ক্লাইভের হাত থেকে খেরিয়াটা নেয় স্ট্রন।

ক্লাইভ বললেন, 'দুশো আশরফি আছে। এ দিয়ে তুমি তোমার কারবার শুরু করতে পার। তারপর নিজের নসিব তোমাকেই গড়ে নিতে হবে।'

স্ট্রনের দু'চোখে জল চিকচিক করে ওঠে।

মুচকি হাসেন ক্লাইভ।

কিছু বলতে যাচ্ছিল স্ট্রন। কিন্তু বাধা পড়ল। হুড়মুড় করে ফের ঘরে ঢুকলেন মুনশি নবকৃষ্ণ। হাতে একটা কাগজ। চামড়ার খেরিয়াটা হাতে নিয়ে নীরবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল স্ট্রন।

'কী হল মুনশি?' শুধোলেন ক্লাইভ। তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল।

'বিষয় খুবই গুরুতর। চিঠিটা পড়ে দেখুন হুজুর।'

'কার চিঠি?'

'ডাচ গভর্নর বিসডাম সাহেব পাঠিয়েছেন।'

চিঠিটা টেবিলের উপরে রেখে ঝুঁকে পড়লেন ক্লাইভ। বিসডাম লিখেছেন, '...প্লিজ রেসকিউ আস। ছয় হাজার ঘোড়সওয়ার নিয়ে নবাবজাদা মিরন চুঁচুড়ায় এসে হাজির হয়েছেন। জুলুম করছেন আমাদের উপরে। আমি হাতজোড় করে মাফ চেয়েছি, বলেছি ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই বাধিয়ে গলত কাজ করেছি আমরা, কিন্তু কোনও কথা শুনতে চাইছেন না নবাবজাদা। সুবে বাংলায় গোলমাল পাকানোর অজুহাতে আমাদের চুঁচুড়া থেকে এক্সপেল করতে চাইছেন। যে যুদ্ধ-বন্দিদের আজাদ করে দিয়েছিলেন আপনারা, তাদের আমরা আপনাদের কথামতো বাটাভিয়ায় ফেরত পাঠাচ্ছি। ওয়ার কমপেনসেশন বাবদ কর্নেল ফোর্ড তিন লাখ টাকা দাবি করেছিলেন, তা আমরা দিতে রাজি আছি। শুধু একটাই অনুরোধ নবাবজাদার জুলুম থেকে আমাদের বাঁচান।...'

চিঠিটা পড়ে ধূর্ত ক্লাইভের চোখদুটো চকচক করে উঠল। এ এক মস্ত সুযোগ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ডাচদের সঙ্গে ইংরেজদের সুসম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও, সুবে বাংলায় ডাচদের কোমর ভেঙে দিয়েছেন তিনি। আর কখনও ডাচেরা বাংলায় ইংরেজদের ব্যবসায়িক প্রতিপক্ষ হয়ে উঠতে পারবে না। ওদিকে বিসডাম স্বীকার করে নিয়েছেন গোলমাল পাকানোর দায় তাদের এবং তার খেসারত দিতেও তিনি রাজি। কাজেই ডাচদের সঙ্গে কাজিয়া বাঁধানোর জন্য কলকাতা কাউন্সিল বা তাঁকে দায়ী করতে পারবে না কোম্পানির ডিরেক্টরেরা। এখন

যদি তিনি ডাচদের পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তো সুবে বাংলায় দুই দেশের মধ্যে তৈরি হওয়া তিক্ত সম্পর্কের উপরে একটা মোলায়েম প্রলেপ লাগানো যায়। শুধু তাই নয়, কৃতজ্ঞতাবশত ডাচেরা এদেশে ইংরেজদের তাঁবে থাকবে। সব মিলিয়ে যাকে বলে মধুরেণ সমাপয়েৎ।

কখনোই এ সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। কর্নেল ফোর্ড তখনও চন্দননগরে রয়েছেন। তার উদ্দেশে জরুরি কিছু নির্দেশ পাঠালেন ক্লাইভ। সেই নির্দেশ পেয়েই চুঁচুড়ায় গিয়ে মিরনকে পেল্লায় এক ধমক লাগালেন ফোর্ড। ভাবখানা এমন—আমরা ইউরোপের দুই দেশ নিজেদের মধ্যে ঝামেলা পাকিয়েছি আবার মিটমাটও করে নিয়েছি। তুমি নবাবজাদা মিরন এর মধ্যে নাক গলানোর কে হে?

ফোর্ডের ধমক খেয়ে ভয়ে গুটিয়ে গেল মিরন। ফৌজ নিয়ে দ্রুত সরে পড়ল চুঁচুড়া থেকে। ক্লাইভের নির্দেশ মতো মিরনের হাত দিয়ে নবাবকে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিলেন ফোর্ড। তিনি লিখলেন, '...ডাচেরা আগে সুবে বাংলার বাণিজ্যে যে সুযোগসুবিধা পেত, আগের মতোই সে সব তারা যেন পায়। গভর্নর বিসডাম চান বালেশ্বর, চুঁচুড়া, কাশিমবাজার, পাটনা কুঠির নিরাপত্তার জন্য মোট একশো পঁচিশজন সৈন্য মোতায়েন রাখতে। তার এই আরজি যেন মঞ্জুর করা হয়...'

খুশি হলেন বিসডাম। যুদ্ধের ক্ষতিপুরণ বাবদ ফোর্ডের হাতে তুলে দিলেন তিন লাখ টাকা। বেদারার যুদ্ধের পর যে সমস্ত ডাচ সৈন্যদের মুক্তি দিয়েছিল ইংরেজরা তাদের নিয়ে চুঁচুড়া থেকে একখানা জাহাজ রওনা হয়ে গেল বাটাভিয়ার উদ্দেশে।

হাসিমুখে বিসডামের সঙ্গে করমর্দন সেরে ফোর্ড ফিরে এলেন কলকাতায়। দমদমার বাড়িতে গিয়ে ক্লাইভের সঙ্গে দেখা করে খুলে বললেন সব কথা। ফোর্ডকে বুকে জড়িয়ে ধরে ক্লাইভ বললেন, 'ওয়েলডান মাই ডিয়ার। নাউ উই বোথ মে সেফলি লিভ ফর লন্ডন।'

শ্যাম্পেনের পাত্র হাতে তুলে নিয়ে ফোর্ড বললেন, 'চিয়ার্স।'

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৭৬০ সাল।

পুরোনো কেল্লার নৌকোঘাট থেকে ফোর্ডকে সঙ্গে নিয়ে নৌকোয় উঠলেন রবার্ট ক্লাইভ। মাঝ নদীতে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে জাহাজ রয়্যাল জর্জ। ক্লাইভকে নিয়ে পাড়ি দেবে লন্ডনের উদ্দেশে। ক্লাইভের সঙ্গে কর্নেল ফোর্ডও লন্ডনে ফিরছেন।

রবার্ট ক্লাইভকে বিদায় জানাতে বহু মানুষের সমাগম হয়েছে নৌকোঘাটে। হাজির কলকাতা কাউন্সিলের সমস্ত সদস্য, সাহেবপাড়ার হোমরাচোমরা লোকেরা ও কলকাতার দিশিসমাজের কেষ্টবিষ্টুরা। ভিড় জমিয়েছে আম-আদমিও। ক্লাইভের দেশে ফেরার দিনক্ষণ লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল সুতানুটি-কলকাতা-গোবিন্দপুর জুড়ে।

জল ছলছল করছে নব মুনশির দু'চোখে। কর্নেল রবার্ট ক্লাইভের জন্যই তিনি আজ এ শহরের অন্যতম বিত্তবান মানুষ। টাকার জোরে দিশিসমাজের মাথা। শোভাবাজার রাজবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা। একই দশা একদা কোম্পানির দেওয়ান ষাট টাকা মাস-মাইনের চাকুরে রামচাঁদের। ক্লাইভের খাতিরে তিনিও আজ অঢেল বিত্তের অধিকারী। আন্দুল রাজপরিবারের জনক। রয়্যাল জর্জের দিকে ভেসে চলেছে ক্লাইভের নৌকো। সেদিকে চেয়ে ধুতির খুঁটে চোখ মুছলেন রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণ।

থমথম করছে কলকাতা কাউন্সিলের সদস্যদের চোখমুখ। চলে যাচ্ছেন ক্লাইভ। গতকালই কলকাতা শহরে খবর এসেছে যে ফের বাংলা অভিযানের তোড়জোড় করছেন শাহজাদা আলি গোহর। যতদিন ক্লাইভ ছিলেন ততদিন ভাবনা ছিল না। এখন কী আছে নসিবে এ নিয়ে চিন্তিত কাউন্সিলের সব মেম্বারই। তবে খুশি ঝিলিক দিচ্ছে জেফানিয়া হলওয়েলের মুখে। যোগ্যতা তেমন নেই, তবুও এই মানুষটা বরাবরই ভীষণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী।

মনে মনে ভাবতেন, একদিন কলকাতা কাউন্সিলের গভর্নর হবেন। তার সে আশা পূর্ণ হয়েছে। হেনরি ভ্যানসিটার্ট এসে না পৌঁছনো পর্যন্ত আগামী দু'মাসের জন্য তিনি কলকাতার অ্যাকটিং গভর্নর।

নৌকোর গলুইয়ের উপরে দাঁড়িয়ে আছে ক্লাইভ। কোমরে দুই হাত। ঠোঁটে গোঁজা পাইপ। সেই বহু পরিচিত উদ্ধত দেহভঙ্গিমা। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন কর্নেল ফোর্ড। অন্য একটা সুলুপে চড়ে জাহাজের উদ্দেশে চলেছেন ক্লাইভের স্ত্রী মার্গারেট ও পুত্র এডওয়ার্ড।

ঘাটের দিকে তাকালেন ক্লাইভ। ঘাটে জমায়েত লোকজনের উদ্দেশে হাত নাড়লেন।

তারপর ফোর্ডের উদ্দেশে বললেন, 'দেখো, কয়েক বছর পরে আবার আমি ফিরে আসব এদেশে। কোম্পানি আমাকে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হবে।'

ফোর্ড বললেন, 'সার্টেনলি। আওয়ার নেশন উইল বি ব্লেসড উইথ ইওর প্রেসেন্স ইন বেঙ্গল।'

দড়ির মই বেয়ে জাহাজে উঠলেন ক্লাইভ। এসে দাঁড়ালেন ডেকের উপরে।

কেউ চেঁচিয়ে উঠল, 'গুড বাই স্যার।'

কথাটা ভেসে এল ক্লাইভের কানে। ঘুরে তাকালেন তিনি। অদূরে ভাসমান বজরার ছাতে দাঁড়িয়ে আছে স্ট্রেন। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে বিদ্যা। যুগলে এসেছে ক্লাইভকে বিদায় জানাতে।

স্ট্রেনের উদ্দেশে হাত নাড়লেন ক্লাইভ। হাত নাড়ল স্ট্রেন ও বিদ্যা।

নোঙর তুলল রয়্যাল জর্জ। চলতে শুরু করল দক্ষিণমুখে।

বিদ্যাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করল স্ট্রেন। তার বুকে মাথা রাখল বিদ্যা।

বসন্তের বাতাস ছুঁয়ে গেল দু'জনকে।

সমাপ্ত

সমাপ্ত